CUK-H04777-15-P01406

ভগীরথী

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা

15

সুভাষ-রচনাবলী প্রথম খণ্ড ঃ ১৯১৬-১৯২৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : H. V. KAMATH **Rs. 15/-**
NETAJI THROUGH GERMAN LENS : NANDA MOOKERJEE **Rs. 20/-**
NETAJI SPEAKS : VOL I **Rs. 4/-**

নেতাজীর জীবনবাদ ঃ অনিল রায় ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ঃ পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড ৩৪·৫০ এর পরিবর্তে ২৭ টাকায়। বাংলায় একমাত্র পূর্ণাংগ জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় ঃ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীতার প্রেক্ষায় ৬১টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত। প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের এই বই ভাল লাগবে। দাম ঃ দশ টাকা

সুবদেশি উপকথা ঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গপ্পো, গণেশ পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম ঃ নয় টাকা

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম ঃ নয় টাকা

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন ঃ ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম ঃ কুড়ি টাকা

রামমোহন ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দাম ঃ ছয় টাকা

P 1406

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়ন্তী

সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা : লীলা রায়

৪৩ বর্ষ। বৈশাখ ১৩৮৫

756.3
004/4

15

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা

নবতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিত

DR. RAMESH CHANDRA MAJUMDAR VOLUME

DEDICATED ON THE OCCASION OF HIS
90TH BIRTH ANNIVERSARY

সম্পাদক
সুনীল দাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বার বার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। সেই সময় ডায়ারির ভঙ্গিতে এবং পত্রে ও প্রবন্ধের আকারে লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত ॥

জাপান-যাত্রী ॥ ৮·০০, ১০·০০
জাভা-যাত্রীর পত্র ॥ ৪·৫০
পথের সঞ্চয় ॥ ৫·০০, ৬·০০
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ॥ যন্ত্রস্থ
পারস্য-যাত্রী ॥ ৫·০০, ৬·৫০
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ॥ ৪·৫০, ৬·০০
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ॥ যন্ত্রস্থ
রাশিয়ার চিঠি ॥ ৫·০০, ৯·০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলা দেশের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড [প্রাচীন যুগ] ১৫.০০ঃ দ্বিতীয় খণ্ড [মধ্য যুগ] ২৫.০০ঃ তৃতীয় খণ্ড [আধুনিক যুগ ১৯০৫ খৃঃ] ৩৫.০০ঃ চতুর্থ খণ্ড [মুক্তি সংগ্রাম ১৯০৫-৪৭] ৪০.০০

বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারীপ্রগতি [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা] ৬·০০

রাজা রামমোহন

[এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদত্ত ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার স্মৃতিবক্তৃতাবলী] ৮.০০

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

॥ জেনারেল বুকস্ ॥

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০০৭

সূচীপত্র

কবিতা

বাসন্তিকা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১

চিঠি। আচার্য রমেশচন্দ্রকে ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯, L. D. Barnett ১১, Vincent. A. Smith ১১, A. Berriledale Keith ১২, E. W. Hopkins. ১২, J. W. Thomas ১৩,

পুনর্মুদ্রণ

কবিস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ	ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার	১৪

স্মৃতিচারণ/মূল্যায়ন/আলোচনা

স্মৃতিচারণ	কালীপ্রসন্ন পিপলাই	১৭
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার : যেমন তাঁকে দেখেছি	অমিয়কুমার দাশগুপ্ত	২৩
গুরু প্রণাম	হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৬
ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র	অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
আচার্যদেব	অমূল্যভূষণ সেন	৩৪
Dr. R. C. Majumdar : The Historian	B. C. Mukherjee	৩৮
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ	ননীকুমার চক্রবর্তী	৪৪
ইতিহাসের সাধক : আচার্য রমেশচন্দ্র	অমলেন্দু বসু	৪৬
নমঃ শ্রীরমেশচন্দ্রায়	দীনেশচন্দ্র সরকার	৫১
শ্রদ্ধাঞ্জলি	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	৫৪
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার	সুকুমার রায়	৫৮
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ইতিহাস-চর্চা	হিমাংশুভূষণ সরকার	৬২
আমার দৃষ্টিতে আচার্য রমেশচন্দ্র	সুখময় মুখোপাধ্যায়	৬৮
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার	আশুতোষ ভট্টাচার্য	৭১
তস্মৈ নমঃ	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬
শ্রদ্ধেয় আচার্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার	যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৭৮
অর্ঘ্য	মন্মথ রায়	২৮
আচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার	কালীকিংকর দত্ত	৮৫
কাছের মানুষ রমেশচন্দ্র মজুমদার	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭
রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস-চিন্তা	নিমাইসাধন বসু	৯৩
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার আমি তাঁকে যেভাবে জেনেছি	জগদীশনারায়ণ সরকার	৯৭

সত্যার্থী ঐতিহাসিক	সমর গুহ	১০১
আচার্যদেব ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার	মাধবচন্দ্র নাথ	১০৪
On Dr. R. C. Majumdar : The Historian of India	S. B. Chaudhuri	১০৭
Nonagenarian Acharyya ; A Tribute	V. V. Mirashi	১১২
Dr. R. C. Majumdar : My Reminiscences	P. N. Chopra	১১৩
Acharya Ramesh Chandra Majumdar ; A Humble Tribute	Bisheswar Prasad	১১৮
সার্থক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র	অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১২০
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার	কালীচরণ ঘোষ	১২৩
ইতিহাস-দার্শনিক আচার্য রমেশচন্দ্র : জয়শ্রীর নিবেদন	সুনীল দাস	১২৫
Biographical Notes on Dr. R. C. Majumdar & Bibiliography		১২৮

চিত্রসূচী

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৬—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যক্ষ অনিলকুমার চন্দ (মাঝখানে), ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান (বাম হতে দক্ষিণে) ইন্দু বসু, সুবোধ ঘোষ, প্রেমরঞ্জন সেন, সুরেন আইচ, কিরণ দাস, সতীপ্রসন্ন ভৌমিক, মন্মথ চৌধুরী।

দ্বিতীয় সারিতে (উপবিষ্ট চেয়ারে)—পিয়ার্সন, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, জি. এইচ. ল্যাংলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফর্মিকি, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রমেশ রায়।

তৃতীয় সারি (মাটিতে উপবিষ্ট)—অরুণ মুখার্জী, সুবোধ সেনগুপ্ত, প্রতাপ গুহ, অমিয় দাশগুপ্ত, সুবোধ দত্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

খালেদ চৌধুরী

PRESIDENT OF INDIA FELICITATES

ACHARYA RAMESH CHANDRA MAJUMDAR

In a Telegram from New Delhi On 27th May, 1978
The PRESIDENT of India Observed. :

''The many facets of our country's ancient past have been highlighted by Historians over the Ages. Dr. Ramesh Chandra Majumdar is a stalwart among those. On the occasion of his Ninetieth Birthday I am glad to note that His Contribution has been recognised in such a handsome manner. Dr Ramesh Chandra Majumdar's Devotion to His Subject will serve as an inspiration to succeeding generations of aspiring young Historians not only in this country but elsewhere in the world.''

N. Sanjeeva Reddy
President of India

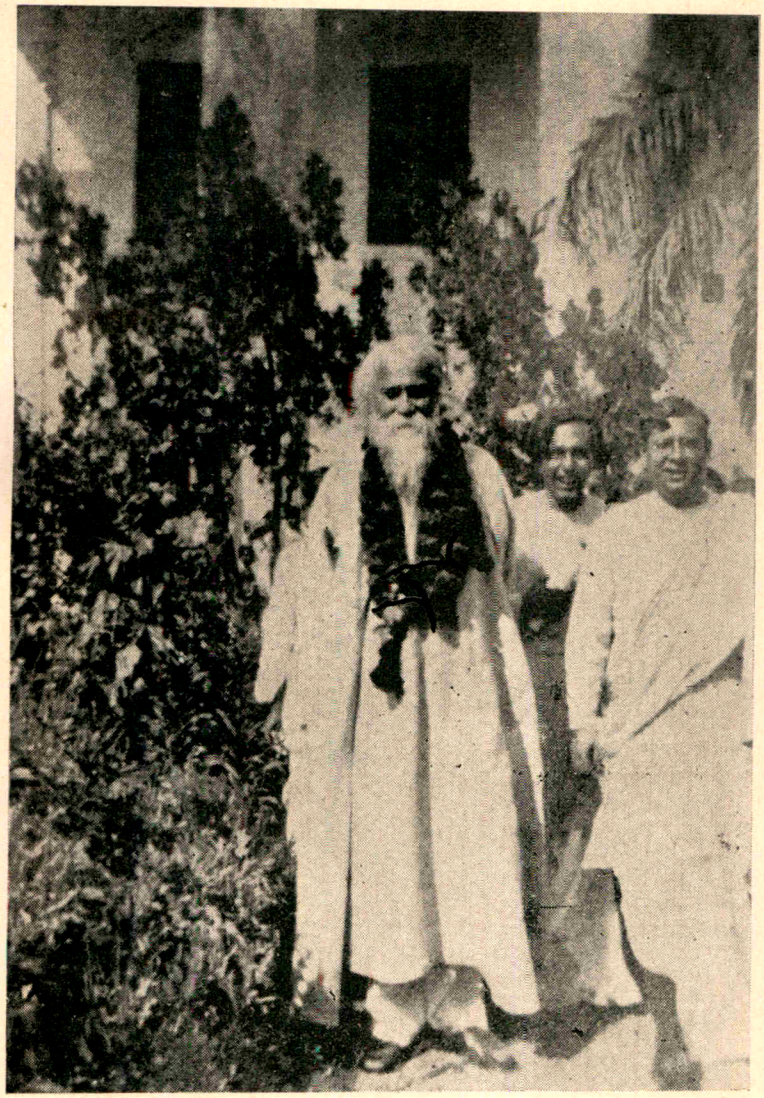

Tagore at Dacca, 1926
with Dr. Majumdar and A. K. Chanda (Middle)

On the chair (from left) : Pearson, R. C. Majumdar, G. H. Langley, Tagore, Formichi, Jnan Ch. Ghosh, Ramen Roy.

বাসন্তিকা।

জয়শ্রী ৪৩ বর্ষ
বৈশাখ। ১৩৮৫
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা

এই কথাটি মনে রেখো,—
যেমনদের এই হাসিখেলায়
আমিও গান গেয়েছিলেম
কীর্তনতার সবার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বাটে, আমের মুকুলে,
সবারদেরে সবাইলেম
আমিও গান গেয়েছিলেম
কীর্তনতার সবার বেলায়॥

দিনের পথিক মনে রেখো,—
আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাতারাটির দিকে হাত।
সবার আমার ওপার থেকে শেষ ডেকে,
ভেসেছিলেম তরুর ভেলায়,
আমিও গান গেয়েছিলেম
কীর্তনতার সবার বেলায়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ ফেব্রুয়ারি
১৯৩২

জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে তাদের 'বাসন্তিকা' নামে পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা। মূল পাণ্ডুলিপি ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের কর্তৃক রক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ড রমেশচন্দ্র মজুমদারকে

১.

6 DWARKANATH TAGORE LANE
CALCUTTA

কল্যাণীয়েষু,

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন সাহিত্য ও কলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়া কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। ইঁহার কথা বোধ করি জান। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপনাভার লইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছেন। তুমি ইঁহার আনুকূল্য করিলে সুখী হইব। ইতি ৩ অগস্ট ১৯২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ও*

কল্যাণীয়েষু,

ঢাকায় যাওয়া স্থির করেছি। ভেবেছিলুম এই বৎসরেই যাব, হার্টগ সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তিনি আসবেন শান্তিনিকেতনে, অতএব তাড়া নেই। ইতিমধ্যে তোমাদের ছুটি। ছুটি শেষ হোক্, জানুয়ারির শেষভাগে যাওয়া স্থির করেছি। কথার অন্যথা হবেনা। যদি তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফর্ম্মীকি ও টুচিকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা একসঙ্গে যেতে পারি। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে খুসি হবে। ইতি রবিবার

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA

৩. ও*

কল্যাণীয়েষু,

তাহলে এই কথাই পাকা রইল, তোমার ওখানেই আশ্রয় নেব। নাৎনীর অভিসারে যদি কখনো কখনো যাত্রা করি আশা করি তাহলে কোনো কথা উঠবে না। চিঠিতে জানিয়েছি যে ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে তোমাদের ওখানে আমাদের কাজের পালা। তার এক আধদিন আগে পেঁছিতেও পারি। অনিশ্চয়তার কারণ জলপথে যাত্রা। কলকাতা থেকে সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ যোগে যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়—রেলপথের আন্দোলন ক্লান্তিকর। সিউড়িতে ২৩শে জানুয়ারি তারিখে আমি আবদ্ধ, ২৪শে পর্য্যন্ত বন্ধন। ২৫শে আশ্রমে ফিরব। ২৬শে কলকাতায় যাব। ২৭শে জাহাজে উঠ্‌ব। জাহাজে কতদিন লাগে জানিনে। আন্দাজ করছি ৩রার পূর্ব্বে পেঁছিতে বাধা ঘটবে না। যদি সে আশঙ্কা থাকে আমাকে জানালে ২৩শে তারিখে সিউড়ি থেকে কলকাতায় গিয়ে ২৫শে অথবা ২৬শে জাহাজে উঠ্‌তে পারি। যদি বিঘ্নের সম্ভাবনা বুঝি তাহলে ১লা তারিখে রেলপথেই বেরিয়ে

পড়ব। আমার অভ্যর্থনার জন্যে বিরাট আয়োজন কোরো না। জনতার পরিমাণ দিয়ে আমি আমার সম্মানের ওজন যাচাই করিনে। বাহ্য কৌতূহলের চেয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। পূর্ব্ববঙ্গের চিত্ত সরল ও সহজেই শ্রদ্ধাবান এই ভরসাতেই সেখানে যাবার প্রস্তাবে আনন্দ বোধ করচি। ইতি ১২ পোষ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

RABINDRANATH TAGORE

কল্যাণীয়েষু,

লক্ষ্ণৌ থেকে আহ্বান এসেছে সেখানে যাচ্ছি। পাঞ্জাবে সিরসুরে নিমন্ত্রণ আছে এই সুযোগে সেটাও সেরে আসব। তাই ঠিক ৩রা তারিখে পাছে এসে পৌঁছতে না পারি এই ভেবে আরো দুটো দিন পিছিয়ে দিতে চাই। পাঁচই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পৌঁছিয়ে ৬ই তারিখ থেকে কাজে লাগব—এই সংকল্প করেছি। আশা করি অসুবিধা হবেনা। জাহাজে করে যাবার খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি। সঙ্গে কে কে যাবেন তার পুরো তালিকা যথাসময়ে পাবে। আপাতত এইটুকু বলে রাখছি আমাদের চিত্রকলাকুশল নন্দলাল বসুকে নিয়ে যাব, কালীমোহন ঘোষও যাবেন। আমার পুত্র রথীরও যাবার কথা আছে কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারচি নে।

এখনি শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। সেখান থেকে ১৩।১৪ই নাগাদ লক্ষ্ণৌ রওনা হব। ইতি ১০ জানুয়ারী ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫.

VISVA BHARATI
SANTINIKETAN, INDIA

কল্যাণীয়েষু,

পূর্বে যেদিন স্থির করা হয়েছে তাই পাকা রইল। অর্থাৎ ১০ই তারিখে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তৃতা।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ইতালীয় অধ্যাপকদের জন্য কি কিছু আর্থিক ব্যবস্থা করেছ?

লক্ষ্ণৌ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি—মনটাও অত্যন্ত অবসন্ন। ইতি ১১ই মাঘ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে দূত এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছি। ৬ই তারিখে রাত্রে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ থেকে তাঁদেরই জলযানে ভেসে পড়ব। ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত তাঁদের আতিথ্য ভোগ করে' কর্ত্তব্য অন্তে তোমার আশ্রমে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ পালন করব। নইলে আমাকে দীর্ঘকাল ঢাকায় থাকতে হয়। আমার সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিঃস্থিত ঢাকার লোকের নিমন্ত্রণ কোনোমতেই উপেক্ষা করা উচিত বোধ করিনে। তাই দুই নিমন্ত্রণক্ষেত্রে আমার সময়কে বিভক্ত করে দিলুম। যে কয়দিন তোমাদের দেব স্থির করেছিলুম সে কয়দিন সম্পূর্ণই রইল। ইতি ১৬ মাঘ ১৩৩২.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭.

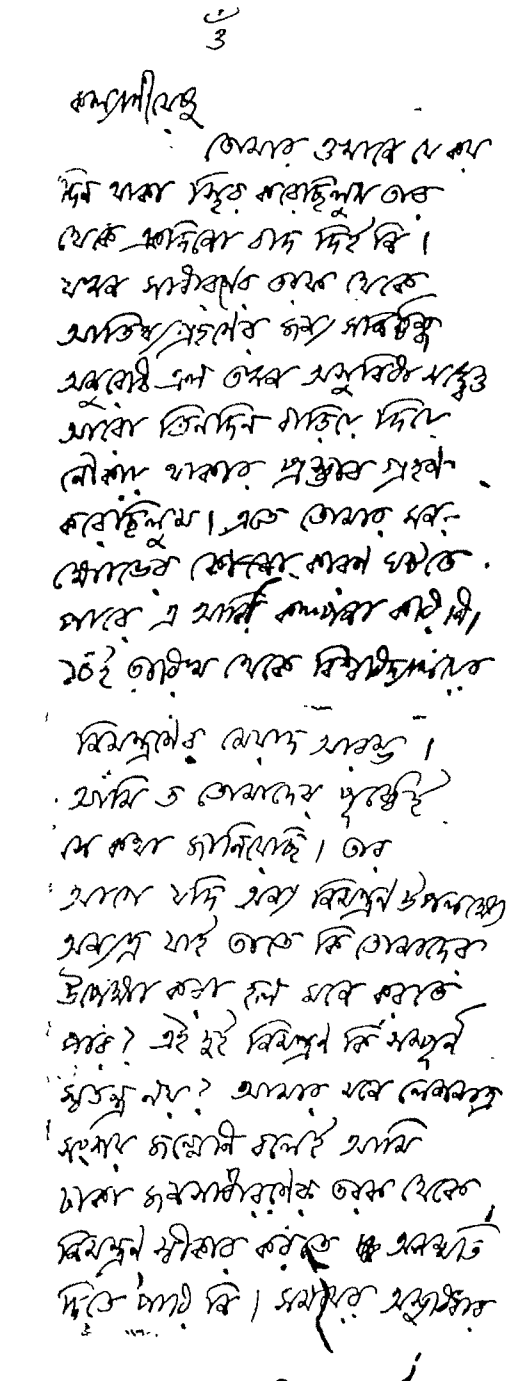

৩

সাধারণ নিবেদন

সাদর সম্ভাষণ শুভেচ্ছা বিশেষ—

তোমার কুমার সম্পাদিত চমৎকার ইতিহাসসমৃদ্ধ বিশেষ উপহারে হইয়াছে। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের নতুন একটি আলোর সন্ধানের সবেকালের সবকিছু মূল তোমরা খুঁজিয়া দিলে— ভারতীয় পাঠকদের পক্ষে তোমাদের এই সুন্দর কেবল শিক্ষার নয় আনন্দ ও গৌরবের বিষয় হইবে। তোমাদের মূল্যবান প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিবেশ স্থাপনির ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীরাধার আরাধ্য তুমারে তোমাদের শুভ কামনা করিয়া স্মিত হইয়াছি। ইতি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

তোমাদের

সুধীর চট্টোপাধ্যায়

৩

ভাবের ঘোর হইতে তোমার মতো
একেবারেই সরাসরি।
আমার কাছে বিক্রয় বিমুখ
তাকার সম্পূর্ণ সাধারণের কাছ থেকে
এই কারণেই সরাসরি। সুতরাং
যাঁরা আমার কাছে নিয়মিত
তাঁদের বিশ্বাস করেই বিমুখ
মন্তব্য করেছি। যদি প্রত্যাহার হয়
থাকি তবে তাকার দৌড়ি
এক প্রতিকারের দোষ করব।

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

৯. ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

শান্তিনিকেতনে চীনভবন প্রবেশের উৎসবে তুমি উপস্থিত থাকতে পারলে আনন্দিত হতুম। এশিয়ার প্রাচ্যখণ্ডে ভারতের প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে তুমি আলোচনা করেছ এবং তার নিদর্শন তোমার প্রত্যক্ষ জানা আছে। এই কারণে এই অনুষ্ঠানে তোমার উপস্থিতি বিশেষভাবে সংগত হত। অনিবার্য কারণে আসতে পারনি ; সত্যেন্দ্র তোমার হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে এই উৎসবের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। গ্রীষ্মাবকাশের পরে যখন আশ্রমে ফিরে আসব একবার যদি আসতে পার খুসি হব। আষাঢ়ের শেষভাগে আমাদের বিদ্যালয় খুলবে। ইতি—

৪।৪।৩৭

শ্রদ্ধান্বিত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGAL
MARCH 30, 1937

১০.

I shall never forget the thrill I experienced at the sight of some of the glorious monuments of our cultural conquest and colonisation in the Far East. And I have never since ceased regretting the paucity of our knowledge of that golden period of our history when our culture transcended its narrow geographical limits and spread its light in the distant parts of the world. Dr. Ramesh Chandra Mazumdar is one of the few reliable historians in India to have taken up this branch of research with all the earnestness that it demands and he has rendered a distinct service to the cause of Indological studies with his latest book on Suvarnadipa. It is an interesting theme told in an interesting manner and I hope it will not fail to draw the attention of Orientalists all over the world.

Rabindra Nath Tagore

পত্রপরিচিতি ঃ

১৯২৫।২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে শ্রীনিকেতনের কালীমোহন ঘোষ জগন্নাথ হলের ছাত্রসভার সদস্যদের অনুরোধে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে জগন্নাথ হলের লোকসেবা বিভাগটি দেখতে যান।

কালীমোহনবাবু ঢাকায় গেলে রমেশচন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ করলে আসবেন কিনা এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। তাঁরা কবিকে আমন্ত্রণের প্রস্তাব করেন এবং ফিরে গিয়ে সেকথা তাঁকে জানাতে বলেন, কবি কোন্ সময়ে আসতে পারবেন ইত্যাদি কালীমোহনবাবু জানালে রমেশচন্দ্র ও অন্যরা ভাইস-চ্যান্সেলারকে বলে যথাযথ আমন্ত্রণ পত্র পাঠাবেন।

মি. হার্টগ ১৯২৫ ডিসেম্বর, অথবা ১৯২৬ জানুয়ারিতে তাঁর ভাইস-চ্যান্সেলর পদ থেকে অবসর নেবেন এই সংবাদ কালীমোহনবাবু জেনে যান। কবিকে ঢাকার অধ্যাপকদের প্রস্তাবের কথা শোনাবার পর হার্টগ-এর অবসরের কথাও কালীমোহনবাবু তাঁকে জানালেন। ১৪।১২।২৫ তারিখে কালীমোহনবাবু কবির নির্দেশে রমেশচন্দ্রকে লিখলেন—

...'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের আন্তরিকতার কথা অবগত হইয়া তিনি (রবীন্দ্রনাথ) অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।...৭ই পৌষ উৎসবের পরই তিনি ঢাকা যাইতে চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা, যে Mr. Hartog ঢাকা থাকিতেই তিনি তথায় যান। কারণ Mr. Hartog সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল ধারণা।'...

কবির ঢাকা যাত্রা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চিঠি কালীমোহনবাবু ১৬।১২।২৫ তারিখে ড. হরিদাস ভট্টাচার্যকে লিখলেন,... 'Mr. Hartogকে তিনি খুব ভালবাসেন। তিনি ঢাকা থাকতে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যেতে চান।'...এদিকে মি. হার্টগ, এই চিঠি দুটিতে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার কথা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। হার্টগ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন তিনি ঢাকায় আসার আগেই তিনি (হার্টগ) শান্তিনিকেতন যাবেন ও তাঁকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আসবেন। হার্টগ শান্তিনিকেতনে আসছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রকে এই চিঠি (২নং) লেখেন।

মি. হার্টগ অবসর গ্রহণ করলেন, নতুন ভাইস-চ্যান্সেলার হলেন মি. জি. এইচ. ল্যাংলি। মি. ল্যাংলি রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য নতুন করে আমন্ত্রণ জানালেন। মি. ফর্মিকি ও মি. টুচিকেও পৃথক আমন্ত্রণ পাঠালেন।

কবি জানালেন ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন। মি. ল্যাংলি সব কথা বিবেচনা করে রমেশচন্দ্রকে জানালেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বাড়ীর অতিথিরূপে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে। রমেশচন্দ্র কবিকে সেই মর্মে জানালে কবি ৩নং চিঠিটি লেখেন। তারপর ১২ পৌষ ১৩৩২ চিঠিতে দিন পরিবর্তন ও কে কে যাবেন তার কিছুটা হদিশ পাঠালেন। ১১ মাঘ ১৩৩২ লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে লিখছেন,...'মনটা অত্যন্ত অবসন্ন।' এই অবসন্নতার কারণ লক্ষ্ণৌয়ে থাকাকালীন ১৯ জানুয়ারী ১৯২৬ কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন। ৪নং চিঠিতে ভুলবশত কবি ১৯২৬-এর স্থলে ১৩২৬ লিখেছেন।

১৬ মাঘ ১৩৩২ রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রকে আরেকটি চিঠি লিখলেন। রমেশচন্দ্রর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের থাকা নিয়ে কারো কারো আপত্তি থাকাতেই কবির এই ব্যবস্থা, এবং সেকথা বুঝতে পেরেই রমেশচন্দ্র কবিকে telegram করলেন—

'Your decision to remain public guest till tenth a painful surprise to me. Posted letter yesterday describing how that proposal emanated not from public but from interested individuals for humiliating me. My earnest prayer that you select

one residence for the whole period of stay. If you prefer remain in town as public guest. Please wire decision.'

১।২।২৬ রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রকে Telegram করলেন : 'Not the least change in programme of stay in your house, only extra three days promised to public. Letter follows. RABINDRANATH

টেলিগ্রামের পর রবীন্দ্রনাথের একটি তারিখ ও সই বিহীন চিঠি এলো রমেশচন্দ্রর কাছে ।

রবীন্দ্রনাথের থাকা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনায় তিনি অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে ঢাকায় সরেজমিনে থাকার ব্যবস্থাদি দেখে আসার জন্য পাঠাবেন স্থির করলেন । রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই মর্মে রমেশচন্দ্রকে Telegram করলেন ঃ

Father sending Nepal Chandra Ray to settle all details

Rathindra Nath Tagore.

রবীন্দ্রনাথ অবশেষে ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে চিটাগং মেলে রওনা হলেন । সঙ্গে ছিলেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ, প্রতিমা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিরজিভাই পেস্তোনজি মরিস্, ফর্মিকি ও তুচি ।

পত্র-পরিচিতি ঃ 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ', গোপালচন্দ্র রায়, ৩০ কার্তিক ১৩৭৫ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ভিত্তিতে রচিত ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে

24, ASWINI DUTT ROAD
CALCUTTA

প্রিয়বরেষু,

আপনাকে আমার মনে থাকবে না এ কি রকম কথা ? মনে বরাবরই আছে এবং থাকবে। চারু আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তাঁর বাড়ীতে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতেই মন চায়।

তবে দিনকয়েক যখন থাকতেই হবে তখন প্রতিদিনই দেখা সাক্ষাৎ হবে।

তুলসী গোঁসাই বলেছিলেন আমার সঙ্গে যাবেন তাই আমি লিখেছিলাম তাঁর থাকার একটা ব্যবস্থা করতে, কারণ বাহ্যতঃ ওরা যত দুঃখই স্বীকার করুক ওদের অভ্যাস আলাদা, খুব গরিবের মত থাকতেও পারে কিন্তু পারা উচিত নয় মনে হয়।

পরশুরাত্রে তুলসীর বাড়ী থেকে ডাক্তার বিধান রায় আমার গাড়ীতে এ বাড়ীতে এলেন—বললেন কথা আছে তাই সঙ্গে যেতে চাই। পথে বললেন, চার মাস পূর্বে বহুকষ্টে ওকে বাঁচিয়েছি, blood pressure উঠেছিল ২৪০° ॥ তার পরে একে নামিয়ে এনেছিলাম ১৪০°তে। কিন্তু কিছুদিন থেকে Communal award নিয়ে খেটে খেটে আবার হয়েছে ১৭৫° ॥ সুতরাং আপনি কিছুতেই নিয়ে যাবেন না। গেলে অবশ্য খুবই ভালো হোতো। কারণ, এই মানুষটি যেমন পণ্ডিত তেমনি সজ্জন। আপনাদের সংগে পরিচয় হতো। কিন্তু তা ঘটলে না, বোধহয় আমাকে একলাই যেতে হবে। তাই তুলসীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই করতে হবে না।

রাধাকুমুদকে চিঠি লিখেছি লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসতে। যদি রবিবারের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় তাহলে সে যেতে পারে। তাকেই secretary করে নিয়ে যাবো। অবশ্য তার কাজ হবে আলাদা। আপনাদের কারও সঙ্গেই তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যাই হোক রওনা হবার পূর্বে তার করে সমস্ত জানাবো।

জগন্নাথ হল ব্যাপারে আপনারা যা হুকুম করবেন তাই করবো।

আপনাকে এবং গৃহের শ্রীযুক্তা গৃহিণীকে আমার প্রীতি ও নমস্কার জানালুম। ইতি

৮ই শ্রাবণ '৪৩

আপনাদের
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

R. C. Majumdar Ph. D
Professor, Dacca University, Ramna. Dacca

খামের উপর কলিকাতার ডাকঘরের ছাপ ২৪ জুলাই ১৯৩৬

24, Aswini Dutt, Road..
Calcutta.

The Vice Chancellor Dr. R.C. Majumdar Ph.D.
Dacca.

শ্রদ্ধেয় ডক্টর, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবা।
স্নেহের ঠাকুরমাকে নমস্কার দিবা ও চারুর সহিত যদি দেখা
হয় আমার কথা বলিবা।

শ্রীবিভূতিভূষণ

এদিকে আমার ঘুর ও সারিলনা। ডাক্তারের দল
রোজ নিয়মিত আসিয়া [redacted],

"আমার ঘুমাবার জায়গা নিবি
আয় মায়ের কোলে দুজনে মিলে।
বুকটি রেখে আধি দুটি বুজে, করলে যখন আধি
জুর-জুর,
ডাক্তারদের চলনে ওঘর হাতুড়া বদল করে।

অতএব, দুই তিন দিনেই সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে যাব। [redacted] নয়
অনুমান। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সাধ্যারাধনার নিত্য
সহচর নও ঘুর, তুমি আর একটু যদি প্রসন্ন হও তোমার আরও
কাছে টানুক। চরণে রেখে সেবা, আমি এতদাসী লাই। ইতি
সাং কোটি সলাম॥

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

London.
11. iii. 19.

Dear Sir.

I am greatly obliged to you for your kindness in sending me your book on the Corporations of Ancient India. I have read it with much pleasure and profit, for it seems to me that you have handled your theme with skill and sound judgment. It is very gratifying to us to see the growth of a really scientific historical method among Indian scholars.

Naturally there are some points in the book on which our opinions do not fully coincide ; but they are slight. I note one omission (perhaps it was intentional)—namely, you say nothing of the Banañju-dharma or Vīra-Valañjiyas. that singular corporation of traders who have left their records on many inscriptions and seem to have covered in their operations most of southern India.

Believe me

Yours very faithfully,
L. D. Barnett

R C. Majumdar. Esq.

P. S —Allow me to point out that I have no longer any connection with University College

116, BAUBURY ROAD
OXFORD
5 MARCH 1919

Dear Sir,

I am much indebted to you for your.....compliments to my writings and for the nicely bound copy of your *Corporate Life in Ancient India*, which is a good book.

But you have a rival in Mr. Mukherjee who has written for the new Mysore University a book on the same subject with a different title, which I have not by me at the moment. I am seeing his book through the Press. He deals in great detail with the southern inscriptions while in other sections you are fuller. Between both books the subject has been well explored.

I agree with your theory of the origin of the Brahman group of castes which includes people of the most Divine birth—all sorts of people who performed priestly functions were recognised as Brahmans of sorts. The Brahma Kshatria royal families (such as Udaidur, the Senas etc.) linked together the Brahmanas and Kshatriyes.

I agree about the date of Panini. The case of Gopala the first Pala is a famous instance of election of a king.

For Pallava history now see the works of the French professor Jowveall-Dubrenie publ, at Pondicherry. They are very good (Apply to Professor of English, Colonial College. Pondicherry.)

I hope you will continue your careful studies and you can make any use you please of my favourable opinion of your scholarly book.

I remain
Dear Sir
Yours truly
Vincent. A. Smith

Ramesh Chandra Majumdar
Calcutta

122, POLWARTH TERRACE,
EDINBURGH,
4 MARCH, 1919

Dear Sir,

I am much obliged for your letter of the 1st February. and of the copy of your work on Corporate Life in Ancient India.

I have read your book with pleasure and profit. Its value is much enhanced by the abundant and most useful citations of authorities Ancient and Modern, and every student of the political and social life of Ancient India will have to reckon with the suggestions made by you. I desire also to congratulate you on the admirable temper and courtesy shown in discussing views which you do not accept. Your work is undoubtedly a valuable and originat contribution to the study of questions. which are fundamental to permit of any final solutions, but which by their importance and intricacy offer every temptation fcr scholarly investigation.

There is, of course, much in your book with which I cordially agree, and much on which I feel doubtful. It will doubtless be of most value to you if I indicate a few points in which your case appears to me to be defective. The most serious is the assumption made throughout that the Jatakas are evidence for the 7th and 6th centuries B. C. That is an assumption for which no evidence worth considering has been adduced, and one against which opinion in Europe is steadily hardening. Similarly the acceptance of the early date of the Arthasastra appears to me, for reasons which I have given elsewhere, to be unsupported by any real evidencc. Any chronological results which rest in part on these assumptions are ipso facto open to grave doubt.....

With renewed thanks for your interesting work

Yours truly
A. Berriedale Keith

Ramesh Chandra Majumdar, Esq. M. A.

Yale University. New Haven, Conn. April 11.1919.

Mr. Ramesh C. Majumdar,
Calcutta, India :—

Dear Sir,

I am much indebted to you for your kind presentation copy of the admirable Corporate Life In Ancient India. I have read it through with the greatest interest and regard it as a very useful addition to our knowledge of Indian history, a field in which accuracy and certainty are difficult to obtain.

As you ask for suggestions, permit me to say that in my view you are a little too decided in assuming so late a work as the Jatakas to represent a period of five to ten centuries before it was reduced to writing. Of course Jatakas existed say in the third

or fourth century B. C. and probably earlier and some of the printed Jatakas existed in some form by the third century ; but there is a difference perhaps of centuries between the time when the prose and verse were composed and we know for certain that the Jatakas as we have them now were not in existence before 500 A. D. It is therefore, as I think somewhat too assured to say that Jataka stories represent a period designated as the "7th and 6th centuries B. C.". I was much interested in your note on the difference between the Kautilyan and epic usage in respect of samgha and gana (on p. 107). I agree with you as to the probable relation between the Buddhist Sangha and the corporations ; it was not direct. In regard to Kautilya I think you should have discussed the question as to his date ; it is not all clear sailing. In some regards he is later than the legal manuals ; but you know the discussion on this point and have doubtless read Jolly's articles.

I see you dismiss my article on guilds with scant respect. But one must remember that it was a popular presentation and that the chief object was to give modern condition as I found them personally. I am the more surprised that you ignore completely my Position of the Ruling Caste in Ancient India, in which I have spoken of several of the points discussed by you This monograph was published in 1888 (American Oriental Society Journal Vol. xiii) and was of course confined to the epic, but it comprised also other scattered data on guilds and governmental forms.

Thanking you for your book again, I remain

Yours very sincerely, E. Washburn Hopkins

161, WOODSTOCK RGAD
OXFORD
JAN 25, 1928.

Dear Professor Majumdar,

Please accept my sincere thanks for the copy of your 'Outline of Ancient Indian History & Civilisation' which you have kindly sent to me. It seems to me a very sound & useful work, & I hope that it may be widely used, though I do not agree entirely with all that you say concerning Brahmans, Caste etc. I approve in general of what you wrote in your preface p.p. III-V & on p.p 3-4 of the Introduction. Inspite, however. of a high respect for Pānini I cannot admit that his book should be, as you quote on p. 260, a model for a similar work. A strong feature of the book is the rather full account which you give of the Post-Harsha Period, which, as one of the obscure parts of Indian history, deserves to be treated as completely as the available information allows. Southern India also receives due attention, though I think you should not include much of Travancore in the Pandya region. On p. 564 a quotation from tne poet Milton

'Into what pit thou seest
'From what height fallen'

appears in rather a strange shape.

I am pleased to possess a copy of the book, which is written with much knowledge & good sense & is not disfigured by fancies.

Believe me, with thanks, yours truly,

Prof. R. C. Majumdar. M. A., Ph. D..
The University. Dacca.

J. W. Thomas

কবিস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ

রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯০৫ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতার কলেজে ভর্তি হই। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের আড্ডায় প্রায়ই তর্ক হত নবীন সেন বড় কবি না হেমচন্দ্র। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বেশী বয়সে কলেজে ভর্তি হয়ে আমার সংগেই পড়ত। একদিন সে বলল—ও সব কবিদের কথা ছেড়ে দাও, এখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকে বলে উঠল, আরে, তাঁর কবিতা নাকি আমাদের পক্ষে বোঝাই কঠিন। কুলদা বললে, আচ্ছা, আমি তোমাদের কাছে তাঁর কবিতা পড়ব সংগে সংগে আলোচনা হবে। ফলে অনেক সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউটে, কখনও বা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমাদের এই ছোট্ট রবীন্দ্রচক্রের বৈঠক বসত এবং আমরা কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত হয়ে উঠলাম। তারপরে ৬৭ বছর কেটেছে— সে ভক্তি কখনও কমেনি, শতগুণ বেড়েছে।

এই সময় স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হল। রবীন্দ্রনাথের গানে দেশ মেতে উঠল। অনেক সভা-সমিতিতে এবং জাতীয় বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছি। দু'-তিন বছর পরে যখন প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস বেরুতে আরম্ভ করল – তখন কলেজের ছাত্রাবাসে যে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হল—তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এখনও মনে আছে কিভাবে প্রতিমাসের শেষে 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম।

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ জুটে গেল। তখন এম-এ ক্লাসে পড়ি। সময়টা বোধ হয় ১৯০৯—১০ সাল, হায়দ্রাবাদ থেকে একজন বড় সংগীতজ্ঞ ও বাদক কলকাতায় এসেছিলেন। ইনস্টিটিউটে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হলো। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। গান বাজনার পর রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণ কেবল শেষ করেছেন, এমন সময় তখনকার কালের স্বনামধন্য হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, রবিবাবু, ছেলেদের বড় ইচ্ছা আপনার একটি গান শোনে। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন ৫০ বছর বয়স হল এখন কি আর গানের গলা আছে? গুরুদাসবাবু বললেন, ছেলেদের আবদার আমি কি করব—তারা তো ছাড়বে না। তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন আজ সকালেই একটি গান রচনা করেছি সেইটিই গাই। তাঁর বিখ্যাত গান 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' গাইলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কথা আজও মনে পড়ে। পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর গলায় যে সুর-ধ্বনিত হল সারা সভাকক্ষ তার মূর্ছনায় ভরে গেল। গানের প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল—যা আজকালের রবীন্দ্রসংগীতে দুর্লভ। আমরা পরস্পর গানের কথাগুলি লিখে নিয়েছিলাম তা মিলিয়ে মিলিয়ে পুরোপুরি গানটি আমাদের ছাত্রাবাসের মুখপত্র একটি হাতে লেখা পত্রিকায় তিন চারদিন পরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লিখেছিলাম, "রবীন্দ্রনাথ যখন গাইছিলেন 'সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে' তখন মনে হচ্ছিল এ যেন তাঁরই গানের বর্ণনা—কিন্তু তারপর যখন গাইলেন 'কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই'—তখন তিনি সত্যের অপলাপ করলেন"। পরে রবীন্দ্রনাথের সংগে দু-চারবার সাক্ষাৎ হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমার বই পড়ে খুশী হয়ে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন আমার লেখক জীবনে তা আমি অমূল্য সম্পদ জ্ঞান করে সযত্নে রক্ষা করেছিলাম। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অনুরোধে আমার নিকট লিখিত অন্যান্য চিঠির সংগে এটিও বিশ্বভারতীকে দিয়েছি।

কিন্তু ১৯২৬ সনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় তা আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কবি রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল থেকেই জানতাম—কিন্তু এই উপলক্ষেই সর্বপ্রথম মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এর অনেক কথা হয়ত আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে—তাই একটু বিস্তারিতভাবে বলছি।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'জগন্নাথ হল' নামক ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি হল ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই এর কোন একটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে দুটি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করল—এবং আমি রবীন্দ্রনাথকে আমার বাড়ীতে অতিথি হবার নিমন্ত্রণ করলাম। তখন তাঁর এক নাতনী ঢাকায় ছিলেন। আমার নিমন্ত্রণ পেয়ে লিখেছিলেন, "তোমার ওখানেই আশ্রয় নেব। নাতনীর অভিসারে যদি কখনো কখনো যাত্রা করি আশা করি তাহলে কোন কথা উঠবে না।" নাতনীর দিক থেকে কোন কথা উঠলো না কিন্তু ঢাকায় দু-চারজন লোক বেশ সোরগোল পাকিয়ে তুলল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানাল যে ঢাকায় জনসাধারণের এ ইচ্ছা নয় যে তিনি আমার বাড়ীতে থাকেন। এই নিয়ে অনেক অপ্রীতিজনক ব্যাপার ঘটে ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অনেক চিঠি লেখালেখি হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক শ্রীনেপালচন্দ্র রায়কে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য ঢাকায় পাঠালেন। নেপালবাবু ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন যে দু-একটি লোক ছাড়া আমার বাড়ীতে থাকায় সকলেরই সম্মতি আছে। তখন স্থির হল রবীন্দ্রনাথ আমার বাড়ীতেই থাকবেন।

বলা বাহুল্য আমার অতিথি হলেও রবীন্দ্রনাথের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় শহরের সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। নদীবক্ষে ঢাকার নবাবের লঞ্চে দুদিন থাকবার ব্যবস্থা হল। ভাওয়ালের রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড দুই ঘোড়ার ফিটন গাড়ী আমার বাড়ীতেই থাকত। বহু বাড়ী থেকে তাঁর জন্য খাদ্যসামগ্রী রান্না হয়ে আসত। অনেক মেয়েরা দু-তিন দিন ধরে আমার বাড়ীর দরজা থেকে দোতালায় তাঁর শোবার ঘর পর্যন্ত সমস্ত বাড়ীটি আলপনা দিয়ে চিত্রিত করলেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে আমি যখন গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে আমার বাড়ীতে ঢুকলাম তখন শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হল—দুধারে কলাগাছের সারির মধ্য দিয়ে তিনি এসে বাড়ীতে উঠলেন। আলপনা দেখে খুশী হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন—যে মেয়েরা এঁকেছিল তারা কৃতকৃতার্থ হল। বর্তমান যুগের সুপরিচিত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় তখন জগন্নাথ হলের ছাত্র। তার অধীনে একদল ছাত্র রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যার ভার নিল। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী আর এক বাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, বাবা বড্ড অবুঝ, খামখেয়ালী—আপনাদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে। সময় অসময় অনেক ফরমাস করেন তা পালন করা যে কতকষ্ট তা বোঝেন না। আমার স্ত্রী বললেন, তাঁর যে কোন ফরমাস পালন করা আমাদের সৌভাগ্য বলেই মনে করব। আমার বাড়ীর পাশে দুশো ছাত্র আছে তারা তাঁর যে কোন হুকুম পালন করতে পারলে সুখী হবে। এ রকম ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত দিই। যখন রবীন্দ্রনাথ বুড়ীগঙ্গা নদীতে লঞ্চে থাকতেন শহরের অনেক লোক দেখা করতে আসতো। একদিন বিকালে প্রায় ৪০-৫০ জন উপস্থিত—রবীন্দ্রনাথ আমার স্ত্রীকে ডেকে বললেন এদের একটু জলযোগের ব্যবস্থা কর। আমার বাড়ী সেখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। কিন্তু মন্মথ তার ছাত্রদলকে নানা দিকে পাঠিয়ে আধ-ঘণ্টার মধ্যেই শহর থেকে প্রচুর মিঠাই ও চায়ের ব্যবস্থা করল।

রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন যে আমার বাড়ীর ঠিক সামনে একটি আমের গাছ মুকুলে ভরে আছে, তখন বললেন—রোজ সকালে আমি দোতলার বারান্দায় বসে থাকব—সে সময়টা কারো সঙ্গে দেখা করব

না। একখানা ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। আমার ছেলের ডাক নাম রবি—সকলকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ যতদিন থাকবেন তাকে যেন কেউ রবি বলে না ডাকে। একদিন আমার ছেলেকে ডেকে বললেন, তোমার ডাক নাম কি? সে বলল 'রবি'। কিছুক্ষণ পরে অমোকে ও আমার স্ত্রীকে ডেকে গম্ভীরভাবে বললেন—"তোমরা তো দেখছি লোক মোটেই ভাল নও।" আমাদের তো মুখ শুকিয়ে গেল। একটু হেসে বললেন আমার নামটা তো আগেই চুরি করেছ—এর পর তো টাকা পয়সাও চুরি করতে পার। তখন আমরা সকলেই হাসতে লাগলাম। আর একদিন আমার মেয়ে তাঁকে বলল 'আপনি, নাকি কবিতা লেখেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ দুর্নাম আমার আছে'। তখন সে ছোট একটা খাতা বার করে বললে, আমার নামে একটি কবিতা লিখে দিন। রবীন্দ্রনাথ তার ভাল নাম 'শান্তি' ও ডাক নাম 'সুষমা' এই দুইটি জেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা লিখে দিলেন। তাতে এ দুটি নামই সাধারণ শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে তাদের বার্ষিক পত্র 'বাসন্তিকায়' একটি কবিতা লিখে দিলেন। এ দুটি কবিতাই তাঁর রচনাবলী গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মুশলিম হলের ছাত্র সভায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা। তিনি ও আমি ফরাসের উপর বসেছি। উপরের বৈদ্যুতিক পাখাটি যেই খোলা হল অমনি তাঁর মাথায় বড় বড় গাঁদা ফুল পড়তে লাগল। আমাকে বললেন: 'কালিদাস বর্ণনা করেছেন যে ফুলের মালা মাথায় পড়ায় ইন্দুমতীর মৃত্যু হল। এটা কি করে হতে পারে আমার মনে এই একটা সমস্যা ছিল—আজ তা সমাধান হল—দেখছি ফুলের আঘাতেও মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে'। পুরানো ঢাকা শহরটি খুব ঘিঞ্জি—আমরা শহরের বাইরে রমনায় থাকতাম। একদিন তাঁকে নিয়ে গাড়ী করে শহর থেকে রমনার প্রান্তে পৌঁছতেই বললেন— এতক্ষণ ছিলাম ঢাকায় এবারে পেঁছুলাম খোলায়। এরকম বহু কথাবার্তা শুনে মনে হত তিনি বোধ হয় চেষ্টা করেও কবিত্বের খোলস ছাড়তে পারেন না—তাঁর মধ্যে কবির সত্তাটিই সর্বদা জেগে থাকে।

মানুষ রবীন্দ্রনাথের আর দুটি কাহিনী বলেই শেষ করব। আমার স্ত্রী পান খেতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম গুরুজনের সামনে পান খাওয়া দোষের ছিল। আমার স্ত্রী তার পরই ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেললেন এবং পান খাওয়া বন্ধ করলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা এড়ায়নি। এর পরে দেখা হওয়া মাত্রই বললেন তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, পান খাওনি। স্ত্রী মাথা নীচু করে বললেন, আমাকে আপনিই তো বলেছেন গুরুজনের সামনে পান খেয়ে আসতে নেই। রবীন্দ্রনাথ খুব জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, আরে সে তো আমাদের ছেলেবেলার কথা। যাও এখুনি পান খেয়ে এস, আর দেখ নিজের বাড়ী হলেও সব সময় ভাল কাপড় চোপড় পড়ে আমার কাছে আসবে।

একদিন এক বৈঠকে একজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথের বই থেকে একটা কবিতা পড়ছিল। দুই এক মিনিট শুনেই রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—কিছুই হচ্ছে না—বলেই তার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে নিজেই পড়তে লাগলেন। সভার শেষে অনেকেই সেই ছাত্রটিকে লাঞ্ছনা করছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম ওকে বোকো না। ওর জন্যেই আজ রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর কবিতার এই অপূর্ব আবৃত্তি শুনতে পেলাম।

নয়দিন রবীন্দ্রনাথ আমার অতিথি ছিলেন। তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মানুষ রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পেয়েছি তা চিরদিন আমার মনে থাকবে। ঢাকা থেকে কলকাতা ফেরবার পথেই এক জায়গা থেকে আমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন। আমার মেজ মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে এক কবিতা লিখে পাঠালেন।" আমার স্ত্রী ও দুই মেয়ে তাঁর কবিতা ও লিপি পেয়ে চিরদিন নিজেদের অশেষ সৌভাগ্যবতী মনে করত। আজ তারা কেউ বেঁচে নেই। শুধু আমিই সেই স্মৃতি বহন করে আছি।

পুনর্মুদ্রণ, বেতার জগৎ ২২-৪-১৯৭৩

স্মৃতিচারণ

কালীপ্রসন্ন পিপলাই

শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিচারণা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। ইহা আমার একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণাই হইবে। স্থানে স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে কোনো কোনো বিষয়ে আমার নিজস্ব ধারণা প্রকাশ পাইবে, কিন্তু পাওয়া যাইবে না আচার্যের বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডিত্যের, প্রতিভার বা গবেষণার পরিচয় বা আভাস।

তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে (B. M. Collge) এফ, এ (F. A) (এখনকার আই এ I. A.) ক্লাসের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। ১৯০৫ সালে কটক গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে এনট্রান্স (Entrance-এখনকার Class-Xর সমকক্ষ) পাশ করিয়া তিনি এই কলেজে ভর্তি হন। আমিও ঐ বৎসর বি, এম, স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলেজের ঐ শ্রেণীতে ভর্তি হই। প্রথম দিনেই কলেজে ঢুকিয়া অধ্যাপক ক্লাসে আসার পূর্বেই তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি আমাদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি যে বেঞ্চে বসিয়াছিলাম তাহার পাশের বেঞ্চে তিনি বসিয়াছিলেন। আমাদের বেঞ্চের ছেলেরা তাঁহাকে আমাদের কাছে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করে। তিনি আসেন, কিছু কথাবার্তা বলেন, কিন্তু নিজ স্থান পরিত্যাগ করেন না। যাহা হউক তাঁহার অমায়িক প্রকৃতির জন্য তাহার সঙ্গে আমাদের অনেকের ভাব হইয়া গেল।

তিনি থাকিতেন কলেজ বোর্ডিং-এ। কয়েকখানা ছোট ছোট খড়ের ছাউনী, বাঁশের কঞ্চি-ঘেরা বেড়া-দেওয়া ও মাটির ভিতের ঘরই ছিল বেশির ভাগ ছাত্রদের। একটা একতলা পাকা দালানও ছিল কিন্তু তাহাতে অল্পসংখ্যক ছাত্রই স্থান পাইত। ঐ ঘরের একখানাতে রমেশবাবু থাকিতেন। ইহার অনেক বৎসর পরে সরকারের তৎকালীন শিক্ষা-আধিকারিক (D.P.I.) কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া বোর্ডিং-এর এই ছোট ছোট ঘরগুলি দেখিয়া প্রথমে মুখে বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশী-যুগের বিখ্যাত নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাকে বলেন যে এই কলেজের অধিকাংশ ছেলেই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের। তাহাদের ঐ ঘরে থাকিতে আপত্তির কারণ হইতে পারে না। এখনই দোতলা বা তেতলা পাকা ইমারতে থাকিয়া বিলাসিতা অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে যখন তদনুরূপ অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে না তখন গভর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট হইবে। ইহা কাহারো পক্ষে মঙ্গলকর নয়। দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে। অশ্বিনীবাবুর এই যুক্তি শিক্ষা-আধিকারিক ড. হর্নেল সাহেব মানিয়া নেন এবং পরিদর্শন-মন্তব্যে ব্রজমোহন কালেজের ও প্রবর্তিত ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূজার বন্ধ হইলে রমেশবাবু কলেজ বদলির ছাড়পত্র (Transfer certificate) নিয়া কলিকাতা পড়িতে যান। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কলেজের অনেকের আন্তরিক সৌহার্দ্য তিনি পাইয়াছিলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রজনীকান্ত গুহ। পণ্ডিত লোক। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার গ্রীক রাজদূতে মেগাসথেনিস-এর (Megasthenis) বিখ্যাত 'ভারত বিবরণ' গ্রন্থের যে অংশ এখনো পাওয়া যায় তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রীর (Physics and Chemistry) অধ্যাপক ছিলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশী-

যুগে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি যে নয় জন প্রসিদ্ধ দেশনেতাকে গভর্ণমেণ্ট deport (নির্বাসিত) করিয়া ব্রহ্মদেশের জেলে আটক রাখিয়াছিল সতীশবাবু তাঁহাদের অন্যতম। সংস্কৃতের অন্যতম অধ্যাপক কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (যাঁহাকে বরিশালের লোক কালীশ পণ্ডিত বলিত) কলেরা ও অন্যান্য কঠিন রোগগ্রস্ত লোকের, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, সেবা করিতেন। বরিশালে তখন জলের কল হয় নাই। প্রতি বৎসরই খুব কলেরা হইত। সময় সময় রাস্তার পাশে অজ্ঞাত-পরিচয় কোনো কোনো লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। খবর পাইলেই কালীশ পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া কোলে করিয়া তাহাকে কলেরা হাসপাতালে নিয়া যাইতেন ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন। কঠিন ব্যারামে পীড়িত অসহায় লোকদের তিনি ভরসাস্থল ছিলেন। বরিশালে অশ্বিনীবাবুর উদ্যোগে 'Little brother of the poor' ('দরিদ্রের ছোট ছোট ভাই') নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও কলেজের ছেলেরা তাহার সভ্য ছিল। ছেলেরা পণ্ডিত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিত।

আর একজনের কথা লিখিতেছি। তিনি আমাদের ক্লাসে পড়াইতেন না, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে লজিক (Logic) ও বি, এ ক্লাসে জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) পড়াইতেন। বি, এম স্কুলের বিখ্যাত হেডমাস্টার জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি। আজীবন ব্রহ্মচারী, পূতচরিত্র এই লোকটিকে বরিশালের লোকেরা দেবতুল্য বলিত ও অনেকে মনে করিত যে তাঁহার সান্নিধ্যই অন্যলোককে পবিত্র করে। ছেলেদের মাথা আপনা হইতেই তাঁহার নিকটে নত হইয়া যাইত। ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা তাহাকে "Sir" এই নামে অভিহিত করিতেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও কালীশ পণ্ডিত মহাশয় আজীবন নিজেদের দৃষ্টান্তদ্বারা বরিশালের ছেলেদের প্রকৃত 'মানুষ' করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এখনো বরিশালের লোকেরা তাঁহাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে।

আমাদের একজন সমপাঠী ছিলেন। নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত। পরে ডঃ উপাধি পান ও হুগলি ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রামের সাধু তারাচরণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও গুরুর অবর্তমানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, কিন্তু নিজ বাড়িতে থাকিয়া, শিষ্যদের মন্ত্রদীক্ষা দেন।

ইহার পর রমেশবাবুর সহিত দেখা হয় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। উভয়েই কলেজের ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকিতাম, কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে (ward)। সে-সময়ে আমাদের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন পার্সিভ্যাল সাহেব। অতি চমৎকার পড়াইতেন। সে-সময় শুনিয়াছি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ টনি (Tawny) সাহেবের পর পার্সিভ্যাল সাহেবের মত ইংরেজী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অধ্যাপক আর আসেন নাই। তিনি আমাদের পলিটিক্যাল ফিলসফিও (Political Philosophy) পড়াইতেন। তাহাও খুব ভাল পড়াইতেন। ক্লাসে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়াইতেন। শরীর বাঁকিত না। আমাদেরই মত এক পয়সা দামের কাঠের পেন্সিল ব্যবহার করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটিয়া ফিটন গাড়ীতে কলেজে আসিতেন। অবশ্য তখনকার দিনে অধিকাংশ অধ্যাপকগণই ট্রামে বা ছ্যাকড়া গাড়ীতে আসিতেন। অধ্যাপক সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের একখানা ব্রুহাম (Brougham) গাড়ী ছিল। এই পার্সিভ্যাল সাহেবের বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম। পর্তুগীজ বংশজাত দেশী সাহেব। তাহার মা-ও বাংগালী খৃষ্টান ছিলেন। সেই জন্য অনেক সময় ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে H. M. Percival সাহেবকে বাংলায় 'হরিমোহন পার্সভ্যাল' বলিত কিন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত।

তিনি লোক খুব ভাল ছিলেন। একবার হিন্দু হোস্টেলে একটা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তখন ছেলেরা তাহাকে বাংলায় বলিতে অনুরোধ করে। তিনি জানান যদিও তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বাংলা বলিতে পারেন না, যদিও বুঝেন। কিছুকালের জন্য তিনি অস্থায়ী অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তখন স্বদেশী-যুগ। ১৯০৫ সালে ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলের বিরাট সভায় 'বয়কট' প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল, তদবধি প্রতি বৎসর ঐদিনে প্রতিবাদ সভা হইত। গভর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম আসিয়াছিল যে ঐ অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রগণ যেন যোগ না দেয়। পার্সিভ্যাল সাহেব অধ্যক্ষরূপে কলেজের নোটিশ বোর্ডে এই বিজ্ঞাপন টাঙাইয়া দিলেন: 'The Principal requests the students not to join the 7th Aug celebration but he wishes them to understand clearly that this is a mere request and nothing more' (প্রিন্সিপ্যাল ছাত্রদের ৭ই আগষ্টের অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে চান যে ইহা অনুরোধ মাত্র, তাহার বেশী কিছু না।) ইহার অর্থ ছাত্রেরা নিজেদের পছন্দ মত বুঝিয়াছিল।

ইংরাজীর আর একজন অধ্যাপক ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ইনি কবি ছিলেন কিন্তু কবিতা লিখিতেন ইংরেজী ভাষায়। ইনি শ্রীঅরবিন্দের দাদা। বিনয়ভূষণ সেন ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। বেশ ভাল পড়াইতেন। ইহারা ভিন্ন অন্য বহু অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগে ছিলেন বিখ্যাত ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় (P. C. Roy)। আমরা একদিন ডঃ পি, সি, রায়ের ক্লাসে পড়া শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র কম কেন? ছাত্রেরা কি ইংরেজী ভাষার অথবা ইংরেজের প্রেমে পড়িয়াছে?'

এখন আমাদের সমপাঠীদের কিছু পরিচয় দিই। অনেকের নামই বাদ পড়িল। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাই প্রধান কারণ। যাঁহাদের নাম দিলাম তাহাদের পরিচয়ও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাঁহাদের নামের পর ব্রাকেট-এর (Bracket) মধ্যে ভবিষ্যতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

১। ক্ষিতীশচন্দ্র সেন (আই, সি, এস্, জজ, বম্বে হাইকোর্ট)।
২। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারাল, বঙ্গদেশ ও অন্যত্র)।
৩। যোগেন্দ্রনাথ দাস (জজ, কলিকাতা হাইকোর্ট)।
৪। সুধীন্দ্রনাথ হালদার (আই, সি, এস; ডিভিসন্যাল কমিশনার)
৫। সতীশচন্দ্র ঘোষ (ভাইস্-চ্যানসেলর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেয়র কলিকাতা করপোরেশন)
৬। সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এ্যাসিস্ট্যাণ্ট একাউন্ট্যাণ্ট জেনারাল)
৭। সুশীলচন্দ্র দে (ডঃ; অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস লেখক)।
৮। প্রফুল্লচন্দ্র বসু (ডঃ; ভাইস-চ্যানসেলর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়)।
৯। নির্মলচন্দ্র বসু (রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী স্বামী মাধবানন্দ)।
১০। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (এটর্নি ও কলকাতার মেয়র, বাংলা কংগ্রেসের পঞ্চ-প্রধানদের একজন)।
১১। সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জ্যোতীশ্বরানন্দ। অনেকদিন আমেরিকায় ছিলেন)।
১২। কালীপ্রসাদ খৈতান (এ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট)।
১৩। পরেশলাল সোম (এ্যাডভোকেট-জেনারাল, আসাম হাইকোর্ট)।

১৪। চন্দ্রশেখর সেন (সরকারী উকীল, কলিকাতা হাইকোর্ট)।
১৫। মুকুন্দবিহারী মল্লিক (বঙ্গদেশের মন্ত্রী)।
১৬। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (সাহিত্যিক)।
১৭। কুমুদবিহারী সেন (বার্ড কোম্পানির ডিরেক্টর ও গভর্ণমেন্টের বহু কমিটির সভ্য)।
১৮। চারুচন্দ্র বসু (ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স্‌ জজ)।

ইহার পরে হিন্দু হোস্টেলে আমাদের সমসাময়িক, উপরের ও নিম্নশ্রেণীর কয়েকজনের ছাত্রের নাম দিতেছি। এই নামেরও কোনো পৌর্বাপর্য নিয়ম নাই। শেষের ৪ জন আমাদের জুনিয়র ছিলেন।

১। রাজেন্দ্র প্রসাদ (স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট)
২। ভূপতিমোহন সেন (প্রিন্‌সিপ্যাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ)।
৩। প্রিয়দারঞ্জন রায় (বিখ্যাত কেমিস্ট)।
৪। শরৎচন্দ্র বসু (ব্যারিস্টার ও ভারত গভর্মেন্টের মন্ত্রী)।
৫। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)।
৬। যোগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (জজ, কলিকাতা হাইকোর্ট)।
৭। নেপালচন্দ্র সেন (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট)।
৮। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (ডঃ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল প্রফেসর (ইতিহাস শাস্ত্রের)
৯। সত্যেন্দ্রনাথ মোদক (আই, সি, এস ; জজ)।
১০। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (ডঃ ; বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ভাইস-চ্যানসেলর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।
১১। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)

হিন্দু হোস্টেলে একবার আমাদের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "প্রণয় পরিণাম" গল্পের নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছিল। গল্পের নায়ক প্রণয়ী মাণিকলাল সাজিয়াছিলেন রমেশবাবু।

আমরা হোস্টেলে থাকিতে ক্ষুদিরাম বসু বা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি হইয়াছিল। আমরা বহু ছেলেই সেদিন নিরামিষ খাইয়াছিলাম এবং নগ্নপদে কলেজে গিয়াছিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো আপত্তি করেন নাই।

হোস্টেলে থাকিতেই রমেশবাবুর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর তখন বয়স ছিল ১০। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ তখন প্রায় সব মেয়েদের ১০/১২ বৎসরের মধ্যেই বিবাহ হইত।

হিন্দু হোস্টেলে বহু ছেলে হওয়ায় এম, এ ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের প্রেসিডেন্সী কলেজ মেসে (৬১নং মেছোবাজার স্ট্রীটে) যাইতে হইত। আমরাও অনেকে সেখানে গিয়াছিলাম। রমেশবাবুও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। কিছু কিছু কলেজের ছাত্র, যাহারা পূর্বে হোস্টেলে থাকিত না, তাহারাও আসিয়াছিল।

কলেজে বি, এ ও এম, এ পড়ার সময় রমেশবাবুর বন্ধু জুটিয়াছিল বিস্তর। তিনি তাহাদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করিতেন। চুপচাপ প্রকৃতির স্বভাব তাঁহার ছিল না। কণ্ঠস্বর স্বভাবতই একটু উঁচু ছিল। কলেজ মেসে অন্য কোনো ঘরে রমেশবাবু গিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে আমরা বলিতাম : "Ramesh is making his presence felt"।

এই মেসে থাকিতে রমেশবাবু একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন। সেখানে সীতানাথ-তত্ত্বভূষণ মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানা দোষ দেখাইয়া শেষে বলিলেন তাহাদের

রামায়ণ 'ঘোড়ার ডিম', তাহাদের মহাভারত 'ঘোড়ার ডিম'। তখন শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে রমেশবাবু উহার প্রতিবাদ করিতে দাঁড়ান। কিন্তু সমাজ-কর্তৃপক্ষ কিছুতেই বলিতে দিবেন না। ফলে সভায় বেশ গোলমাল হয়। পরে তৎকালীন প্রসিদ্ধ Bengali কাগজে এই নিয়া লেখালেখি হয়। তখনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়ানোর সৎসাহস তাঁহার দেখা যায়।

এম, এ পরীক্ষা হইয়া যাওয়ার পর আমরা সকলে মেস ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকার জন্য আমাদের যোগসূত্র ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে একেবারেই ছিন্ন হয়।

অনেক বৎসর পর তিনি যেবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর নিযুক্ত ছিলেন আমি তখন চাকুরী উপলক্ষে ঢাকায় বদলি হই। সেখানে পূর্বের বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবিত হয়। সস্ত্রীক তিনি আমার বাসায় আসিতেন, আমিও সস্ত্রীক তাঁহার ওখানে যাইতাম। ইহা ভিন্ন বাড়িতে, রাস্তায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক সময় দেখা-সাক্ষাৎ হইত। এখানে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল। সময় সময় বন্ধুদের বাড়িতে গিয়া খোঁজ নেওয়া তাহার স্বভাব। উহা এখন পর্যন্তও বজায় আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। যেমন: ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ হীরালাল দে, ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ শহিদুল্লা, ডঃ মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সংগে রমেশবাবুর মাধ্যমে আমার আলাপ হইয়াছিল। সেখানে শুনিয়াছি রমেশবাবু শুধু প্রফেসরদের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিলেন তাহা নহে, ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি ও তাহা নিরাকরণের চেষ্টা ও তাহার নিজস্ব শিক্ষাপ্রদান প্রণালীর জন্য তিনি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন।

আমার অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী হইতে যথেচ্ছ বই নেওয়ার অনুমতি তিনি লাইব্রেরীয়ানকে (Librarian) বলিয়া দিয়াছিলেন। ফলে এই লাইব্রেরীর বই পড়িতে আমি বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি ঢাকা থাকিতেই তাহার ১ বা ২ জন মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর পর পুনরায় দেখা হয় রাজগিরে। সেখানে স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে নিয়া গিয়াছিলেন। আমিও আমার ছোট ছেলেকে নিয়া সেখানে ছিলাম। রাজগিরে তাহার বাসাও আমার কাছেই ছিল। প্রায় রোজই দেখা হইত। যাতায়াতও বাড়িয়া গিয়াছিল। একসংগে অনেকদিন বেড়াইয়াছি। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কিছু কিছু স্থান আমাকে দেখাইয়া তাহার বিশেষ তাৎপর্য বলিয়া ছিলেন। এই সময় যেন আমরা পরস্পরের আরও নিকটবর্তী হইয়াছিলাম।

অনেকের অনুরোধে একদিন ওখানে জাভার (Java) বিখ্যাত বড়বদুর বৌদ্ধ-মন্দিরের বিষয়ে একটি ভাষণ দিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেরই বক্তৃতাটি খুবই ভাল লাগিয়াছিল।

ঐখানে একদিন রমেশবাবু তাহার নিকট লেখা, একদা অজানা, একটি লোকের একখানি চিঠি আমাকে দেখান। ঐ চিঠি পাওয়ার কিছু পূর্বে ভারত গভর্ণমেন্ট আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস লেখার জন্য রমেশবাবুর অধ্যক্ষতায় এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লেখক রমেশবাবুকে লিখিয়াছেন যে এ ব্যাপারে তিনি খুশী হইয়াছেন, কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন গভর্ণমেন্ট-নিযুক্ত ঐ কমিটিতে তিনি কাজ করিতে বা থাকিতে পারিবেন কিনা। কারণ বোধ হয় গভর্ণমেন্টের ইচ্ছার সংগে তাঁহার মতের মিল হইবে না। ছেলেটির সন্দেহ যে অমূলক ছিল না পরবর্তী ঘটনায় তাহা প্রকাশ পায়। রমেশবাবু প্রভৃতি ঐতিহাসিক মেম্বারদের মত গভর্ণমেন্টের ইচ্ছার সংগে মিলে

না। তখন গভর্ণমেণ্ট ঐ কমিটি বাতিল করিয়া দেন এবং আর একজন লোকের উপর ঐ কমিটির ভার ন্যস্ত করেন।

ইহার কিছু পরে আমি কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করি। রমেশবাবু এখানে পূর্ব হইতেই বাস করিতে ছিলেন। তখন অনেক সময়ই তাঁহার ওখানে যাইতাম। তিনিও মাঝে মাঝে আসিতেন। তাহার একটা বিরাট লাইব্রেরী আছে। উহা হইতে বহু বই আনিয়া পড়িয়াছি। তাঁহার বাড়িতে যখনই গিয়াছি তখনই কোনো বই পড়িতে বা Proof (প্রুফ) সংশোধন করিতে দেখিতাম। কখনই আলস্যে সময় কাটাইতেন না। প্রুফ দেখার সময় অনেক সময় দীর্ঘ Passage কাটিয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিতেন। তাঁহার বক্তব্য যাহাতে প্রাঞ্জল ভাষায় নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কোনো বিষয়ে লিখিবার বা বক্তৃতা করিবার পূর্বে সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত লেখা বা শিলালিপি প্রভৃতি সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ও সম্যক পর্যালোচনা করিয়া যাহা সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভব মনে হইত সেই সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিতেন এবং অন্যমত নিরপেক্ষভাবে তাহা প্রকাশ করিতেন। এই মত অন্যান্য ঐতিহাসিকের সমর্থিত কিনা বা প্রচলিত লোক-বিশ্বাসের পরিপন্থী কিনা বা গভর্ণমেণ্টের মনঃপূতে কিনা সে বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্বিকার। ভারতবর্ষের ইতিহাস, সভ্যতা বা সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় প্রদানে এই নীতিই তিনি বরাবর অনুসরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে তাহার পি, আর, এস-এর (P. R. S) জন্য লিখিত থিসিসে (Thesis) খৃষ্টপূর্বে প্রথম শতকের উজ্জয়িনী রাজ মহেন্দ্রাদিত্যের পুত্র বিক্রমাদিত্যকেই কিম্বদন্তী ও লোক-বিখ্যাত 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া প্রচার করেন। ইহা তখনকার প্রচারিত ঐতিহাসিক মতবিরুদ্ধ ছিল। তাহারা গুপ্ত রাজবংশের চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে ঐ বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য বলিতেন। ঐ থিসিস পাইয়া একজন পরীক্ষক ডঃ থিবো (Dr. Thebau) তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং রমেশবাবু যে ভুল করিয়াছেন তাহা বলেন এবং প্রচলিত ঐতিহাসিক মত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থিসিস পরিবর্তন করিয়া দিতে বলেন। রমেশবাবু কিন্তু স্বীয় মতে দৃঢ় থাকেন এবং থিসিস যেমন ছিল তেমনিই রাখিলেন। বাংলাদেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে মধ্যযুগের যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যকে তিনি মোটেই বীর বলিয়া স্বীকার করেন নাই বা নবাব সিরাজদ্দৌলার দেশপ্রেমও তিনি বিশ্বাস করেন নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংসা আন্দোলনকে একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের গৃহীত মত ও নীতির বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এ বিষয়ে সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদের দান উপেক্ষণীয় তো নয়ই বরং তাহা স্বাধীনতা অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা (তাঁহার মতে যাহা যুক্তিসহ সত্য) উদ্ধার ও প্রকাশ করাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত। মাঝে মাঝে তিনি ঐতিহাসিকদের বা অন্য সভায় এবং রেডিও ও দূরদর্শনে ভাষণ দেন। উদ্দেশ্য একই : প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রচার ও ভ্রান্তধারণা নিরসন।

আমাদের পাড়ায় ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকের এক লাইব্রেরী ছিল। রমেশবাবু তাহাতে নিজের লিখিত ও অন্যান্য গ্রন্থকারদের লিখিত অনেক পুস্তক দান করিয়াছিলেন। তাহার দামও যথেষ্ট।

কয়েক বৎসর পূর্বে তাহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। এই মর্মান্তিক শোকেও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। নিজ কর্তব্য যথাবিধি পূর্ববৎ করিয়া যাইতেছেন। ভগবানের নিকট তাহার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার : যেমন তাঁকে দেখেছি

অমিয়কুমার দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধেয় আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে কিছু লিখবার সুযোগ দিয়ে "জয়শ্রী"র কর্তৃপক্ষ আমাকে সম্মানিত করেছেন।

আচার্য রমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যে কয়জন মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলেছিলেন এর গোড়ার দিকে, আচার্য রমেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং ওখানেই বহু বছর শিক্ষকতা করেছি। ঢাকা ছাড়বার পর দেশের বহু শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছি। নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমন পরিবেশ আর কোথাও দেখিনি। এই পরিবেশের উল্লেখ করাতে একদিন আচার্য আমাকে বলেছিলেন যে এর মূলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলর, ফিলিপ হারটগ। কথাটি সত্য হলেও আংশিক সত্য। কারণ সেই বেঁটে-খাটো আনকোরা ইংরেজ ভদ্রলোকটি বাংলাদেশের তখনকার আবহাওয়ায় বেশীদূর এগুতে পারতেন না কখনই যদি না নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ, এফ, রহমান, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত সুযোগ্য সহকর্মী না পেতেন।

ছাত্রজীবনে আচার্য রমেশচন্দ্রকে দেখেছি দূর থেকে। আমি অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। ইতিহাস ছিল আনুষঙ্গিক বিষয়। তা-ও আবার আমাদের সময় ঐ বিষয়ে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল দু'টি পেপার; ভারতবর্ষের ইতিহাস তার মধ্যে ছিল না। তবুও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ওপর ওঁর ক্লাশে বক্তৃতা শুনতে যেতাম সহপাঠীদের সঙ্গে। এত প্রাঞ্জল ছিল ওঁর বক্তৃতা। এবং এত তথ্য বহুল যে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কথাগুলি এখনও, এত বছর পরেও কানে রয়ে গেছে। তারপর বহির্ভারত সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা, ক্লাসের বাইরে সাধারণের জন্য। তখন সবে এ-বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে—আচার্য রমেশচন্দ্রই এ বিষয়ে একজন পথিকৃৎ। বহির্ভারত ঘুরে এসে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন। অভিভূত হয়েছিলাম ওঁর পান্ডিত্যের গভীরতায়।

কিন্তু তখনও তিনি দূরের মানুষ। আমি ঢাকা হলের ছাত্র, আচার্য রমেশচন্দ্র জগন্নাথ হলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরে সেই হলের প্রোভোষ্ট। সুতরাং সাক্ষাৎ যোগাযোগের সুবিধা ছিল না। সভা-সমিতিতে ওঁর সৌম্য মূর্তি দেখেছি, ওঁর বাগ্মিতা উপভোগ করেছি। কিন্তু কাছে এগুতে পারি নি। দ্বিধা ছিল—ভেবে পেতাম না অতবড় একজন মনীষীর সঙ্গে কি কথা বলব।

ভুল ভাঙ্গল চাকুরী জীবনে। বিশ বছর শিক্ষকতা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শেষের দিকে আচার্য রমেশচন্দ্র ছিলেন ওখানকার ভাইস্-চ্যান্সেলর। তখন দেখেছি ওঁর দুটি ব্যক্তিত্ব। একটি সরকারী; আর একটি ঘরোয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় একটি রূপ; নিজের বাড়ীতে অবসর সময়ে আর একটি রূপ। এ যেন দুজন মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে যাঁকে দেখলে নমস্কার দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতাম, তাঁকেই ঘরোয়া বৈঠকে মনে হত কত নিকট আত্মীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পটভূমিকায় যাঁকে দেখলে মনে হত কি কঠোর, তাঁকেই আবার গৃহের আবহাওয়ায় মনে হত কি স্নিগ্ধ। এমন কি পোষাকেও এই বিভক্ত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত। বিশ্ববিদ্যালয়ে টাই সমেত বিলিতি পোষাক; বাড়ীতে খাঁটি বাঙ্গালী।

এই বাঙ্গালীত্ব আচার্য রমেশচন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য। তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষিত, বিশেষ করে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে একটুখানি বিলিতি ভাব এসে যেত। আচার্য রমেশচন্দ্রের আচার-ব্যবহারে কোনোদিনই উগ্র পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করি নি। পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখেছি, যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর ছিলেন। একথা বিশেষ করে বলছি এজন্য যে ওঁর এই ব্যবহারে আমি তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম,—যদিও জানতাম যে এটা আমাদের দেশীয় প্রথা। অথচ নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা—এ-সবের দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি সাধারণ বাঙ্গালী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী চরিত্রে যে একটু ঢিলে-ঢালা ভাব, একটুখানি ভাবপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায় সেটা ওঁর মধ্যে একেবারেই নেই। রমেশচন্দ্র কবি নন, তিনি ঐতিহাসিক। আর এই ঐতিহাসিক গবেষণা তাঁর কাছে নিছক সত্যানুসন্ধান। এই সেদিনও দিল্লীতে দূরদর্শনের মারফত একটি আলোচনায় তিনি এই কথা বিশদভাবে বলে গেছেন। যে তথ্য খাঁটি সত্য বলে প্রমাণ করা সম্ভব, ঐতিহাসিক শুধু সেই তথ্যই পরিবেশন করবেন, তার বেশী নয়;—এই ওঁর মত। এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের বহু প্রশংসিত একখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলেছিলেন "বইখানি ত' ভালই লেখা,— তবে বড্ড কল্পনাশ্রয়ী (imaginative)—ঠিক ইতিহাস নয়।"

খাঁটি সত্য বলতে গিয়ে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে এই প্রবীণ ঐতিহাসিকের। কংগ্রেস সরকার ওঁকে কোনোদিন ভাল চোখে দেখেনি। ওঁর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার ইতিহাস আজ অনেকেই জানেন। ঐ বিরাট গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি নিজেই সে-সব কথা লিখেছেন। গোড়ার কাহিনীটি বহুদিন আগে বেনারসে থাকতে গল্পচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন। কোনোরকম উষ্মার প্রকাশ দেখিনি ওঁর মনোভাবে। অটল গাম্ভীর্যে এ-সব ক্ষুদ্রতা উপেক্ষা করে গেছেন। তাই এই সেদিন দিল্লীতে যখন দেখলাম ভারতীয় বিদ্যাভবনের তরফ থেকে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই প্রবীণ আচার্যের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন তখন বড়ই আনন্দ হল—মনে হ'ল ওঁকে এই সম্মান দেখিয়ে প্রধান মন্ত্রী নিজেকেই সম্মানিত করলেন।

আচার্য রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর পত্নী স্বর্গতা প্রিয়বালা দেবীর কথা স্বতঃই মনে আসে। এঁদের দুজনার কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ পেয়েছি। ওঁরা কিছুদিন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। সেখানে আমাদের দুটি বাড়ী ছিল পাশাপাশি। মাঝখানে একটি তারের বেড়া; আসা-যাওয়া করতে হ'ত সদর রাস্তা পেরিয়ে। প্রিয়বালা দেবীর সেটা পছন্দ হল না। তিনি তারের বেড়াটির খানিকটা অংশ কেটে ফেলে সেখানে একটি ছোট্ট দরজা তৈরী করিয়ে নিলেন, যাতে যখন-তখন আমার স্ত্রী, শান্তিকে দেখে যেতে পারতেন। রোজ অন্ততঃ একবার শান্তির এবং ছেলেমেয়ের খোঁজ নেওয়া চাই-ই। নিজের মেয়ের মত দেখতেন শান্তিকে; আর আমাদের ছেলেমেয়ের ওঁরা ছিলেন দাদু ও দিদিমা। দাদু ইতিহাসের গল্প শোনাবার জন্য সন্ধ্যায় নাতি-নাতনিকে ডেকে নিতেন বাড়ীর পেছনের চাতালে। আমরাও গিয়ে বসতাম। অতি মনোজ্ঞ ভাষায় শিশুদের উপযোগী করে ইতিহাসের গল্প বলতেন। প্রাচীন মিশরের বা প্রাচীন ভারতের, বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের গল্প। ইতিহাসের মালমসলা যোগাড় করবার জন্য যে-সব জায়গায় ঘুরেছেন, যে-সব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন—সে সবার গল্প। তা ছাড়া প্রাচীন মিশরের অথবা প্রাচীন ভারতের শিলালিপির পাঠোদ্ধার কি করে করলেন পণ্ডিতরা তার বিশদ বিবরণ। শিশুরা তন্ময় হয়ে শুনত। আমরাও উপভোগ করতাম। ইতিহাস যে বিজ্ঞানেরই একটি শাখা তার পরিচয় পেয়েছি ওঁর এই কথকতার মাধ্যমে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ওয়াশিংটনে অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে

আমি একটি নিয়োগপত্র পাই। আচার্য রমেশচন্দ্রকে সে খবর জানাতে তিনি মহা খুসী। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন আমি সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিয়েছি কিনা। আমার হাবভাব দেখে ওঁর সন্দেহ হ'ল হয়ত আমি ওয়াশিংটন যেতে ইচ্ছুক নই—সন্দেহ নিতান্ত অমূলক ছিল না, সত্যি আমি ইতস্তত করছিলাম। একদিন আমাকে বললেন নিয়োগপত্রটি ওঁর হাতে দিতে। পরের দিনই আমাকে ডেকে পাঠালেন। সম্মতি-পত্র ওঁর অফিস থেকে টাইপ করিয়ে নিয়ে এসেছেন, আমাকে সে-পত্রে সই করতে হবে। সেদিন ওঁর দরদী মনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তা'তে অভিভূত হয়েছিলাম। ওয়াশিংটন থেকে তিন বছর পরে যখন ফিরে এলাম তখন ওঁরা কাশী ছেড়ে চলে গেছেন। এর পরে যতদিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, ওঁদের অভাব অনুভব করেছি আমরা দুজনেই।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। আমিও এখন বৃদ্ধের পর্যায়ে। তবে সে-কথা একেবারেই মনে হয় না যখন ভাবি আচার্য রমেশচন্দ্রের মত একজন শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, সক্রিয় অবস্থায়। আমাদের আচার্য শতায়ু হন এই প্রার্থনা করি; আর ওঁর এই নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে "জয়শ্রীর" মারফত ওঁকে আমাদের দুজনার প্রণাম জানাই।

নয়া দিল্লী
৬ই বৈশাখ, ১৩৮৫।

গুরু প্রণাম

হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাহান্ন বছর আগে তরুণ শিক্ষার্থীরূপে আচার্য রমেশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হই। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ। মনে ভয় ছিল আচার্যদেবের পদতলে স্থান পাইব কি না। প্রথম দর্শনেই বুঝিলাম সে ভয় অমূলক, আচার্য যেমন বিদ্যার সাগর তেমনই তিনি স্নেহের পারাবার। সেদিন হইতে যে স্নেহের ধারায় প্লাবিত হইলাম, অর্ধশতাব্দী পরে আজও তাহা অবিরাম বর্ষিত হইয়া জীবন ধন্য করিতেছে।

আচার্য রমেশচন্দ্রের বিদ্যাবত্তার মূল্যায়ন, ভারতের ইতিহাসকার হিসাবে তাঁহার অবদান ইত্যাদি দুরূহ বিষয়ে আলোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। শিক্ষক হিসাবে, স্নেহশীল গুরু হিসাবে এবং এক হৃদয়বান, স্থিতধী জ্ঞানতপস্বীরূপে তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি এবং তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহারই দু'চারটি কথা বলিব।

ছাত্রজীবনেই দেখিয়াছি আচার্যদেব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হইয়াও এই সকল আন্দোলনের প্রতি কি অসীম আগ্রহ ও সহানুভূতি পোষণ করিতেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের উপর তাঁহার স্নেহ যেন আরও নিবিড় ও প্রগাঢ় ছিল। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে কখনও কোন শাস্তিমূলক বা নিবারক-ব্যবস্থা তো গ্রহণ করিতেনই না বরঞ্চ ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় আমাদের কাজের প্রতি সপ্রশংস মনোভাব প্রকাশ করিতেন। পুলিশী গ্রেপ্তার এবং নির্যাতনের হাত হইতে ছাত্রদের রক্ষা করিবার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। একবার পুলিশ একটি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া হাঁটাইয়া থানায় নিয়া যাইতে উদ্যত হইলে আচার্যদেব পুলিশকে বলেন ঃ "একে গাড়ী করিয়া নিয়া যাওয়া হোক, গাড়ী ভাড়া আমি দিব।"

ছাত্রদের প্রতি তাঁহার স্নেহ যে কত গভীর ছিল তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। তাঁহার এক ছাত্র গত ত্রিশের দশকে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। আচার্যদেব গোড়া হইতেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকেন এবং ছাত্রের ব্যাঙ্কে নিজের একটি অ্যাকাউন্ট রাখেন। বিখ্যাত অলঙ্কার ব্যবসায়ী সত্রামদাস ধলামলের দোকানে কিছু জিনিষ কিনিয়া আচার্যদেব ঐ ছাত্রের ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া মূল্য পরিশোধ করেন। ব্যাঙ্কের তখন অবস্থা খুব খারাপ, চেকটি ফেরৎ হইয়া গেল। ইহাতে আচার্যদেব রুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, ছাত্রকে টেলিফোনে ডাকিয়া আনিলেন এবং জানিতে চাহিলেন কত টাকা হইলে ব্যাঙ্ক এই সংকট হইতে মুক্ত হইতে পারে। ছাত্রটির কথামত আচার্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উপর বেশ কয়েক হাজার টাকার চেক্ কাটিয়া ছাত্রটির হাতে দিয়া দেন।

তাঁহার ছাত্র-প্রীতির বহু পরিচয়ই পাইয়াছি, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এম্, এ পরীক্ষার্থীরূপে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে চিঠি লিখিয়া গুরুদেবকে বই-এর অভাবের কথা জানাই। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি নিজের নামে Asiatic Society Library ও অন্যান্য পুস্তকাগার হইতে ধার করিয়া বেশ কয়েকখানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়া যান।

জ্ঞানচর্চায় আচার্যদেব চিরজীবন একনিষ্ঠ এবং তাঁহার নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা বিস্ময়কর। এই পরিণত বয়সেও তাঁহাকে যখনই দেখিতে যাই, দেখিতে পাই তিনি লেখাপড়া নিয়াই ব্যস্ত আছেন। জীবনে শোক-তাপ অনেক পাইয়াছেন, কিন্তু শোক-তাপ এই স্থিতধী জ্ঞানতপস্বীকে তাঁহার সাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

পিতৃপ্রতিম গুরুদেব নব্বই বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তিনি শতায়ুঃ হোন, তিনি রোগমুক্ত থাকুন, এই কামনা করি এবং তাঁহাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র

অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার প্রয়াস চলছে ; এই বৃহৎ জ্ঞান-যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছেন অগণিত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত। বিভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, নতুন ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে। বহু সাধকের সম্মিলিত সাধনায় জ্ঞানের বিচিত্র সৌধ গড়ে উঠছে। কিন্তু আচার্য রমেশচন্দ্রই একমাত্র সাধক যাঁর প্রতিভা এই বিশাল সৌধের সকল স্তর আলোকিত করেছে, যাঁর স্তূপীকৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন না করে কোন গবেষক বা শিক্ষার্থী ভারতের ইতিহাসের যে কোন একটি যুগ সম্বন্ধে সত্যের সন্ধান পাবেন না। মহামনীষী আচার্য যদুনাথ সরকারের গ্রন্থাবলী প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ; ভাণ্ডারকর-রায়চৌধুরী-র‍্যাপ্‌সন-কীথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের রচনা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের সহিত সর্বতো-ভাবে সম্বন্ধহীন ; টড-গ্র্যান্ট ডাফ-কানিংহামের রচনার গুরুত্ব নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু রমেশচন্দ্র বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন।

সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার যুগ শেষ হয়েছে, আধুনিক কবিদের প্রতিভা সনেট জাতীয় রচনায় সীমাবদ্ধ ; একটি সাময়িক ভাব, কল্পনার এক টুকরো মেঘ নিয়ে তাঁদের কারবার। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও কয়েকটি বছরের কাহিনী বা কয়েকটি ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে সাধকের ব্যস্ততা ; ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিশাল পটভূমি নানা রঙে রঞ্জিত করার কল্পনাও কেহ করেন না। এমন কি, আচার্য যদুনাথের মত দুই শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে দশ বারো 'ভলুম' রচনার চিন্তাও নিতান্ত অবাস্তব মনে করা হয়। অথচ আমাদের চোখের সামনে রমেশচন্দ্রের বইগুলি সাজানো রয়েছে : *Corporate Life in Ancient India* থেকে *History of Freedom Movement in India* পর্যন্ত। একজন মানুষের পক্ষে এক জীবনে কত কাজ করা সম্ভব তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে তিনি সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছেন, অনেক কাজ করার জন্য অনেক সময় পেয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপনা ও প্রশাসনিক কাজে তাঁর অনেক সময় কেটেছে। জীবনের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কাজের পরিমাণের প্রাচুর্য খুব কম ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আসল কথা একাগ্র সাধনা, অবিচলিত নিষ্ঠা। রমেশ-চন্দ্রের চরিত্রে এই দুইটি মৌলিক গুণের সম্মিলন ঘটেছে, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে অসামান্য প্রতিভা। যে অন্তর্দৃষ্টি ইতিহাসের সামগ্রিকরূপকে বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সংঘাত থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে তা' রমেশচন্দ্রের পক্ষে সহজাত কবচ-কুণ্ডলের কাজ করেছে। তিনি শল্য চিকিৎসকের কৌশল ও ক্ষিপ্রতা নিয়ে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করেছেন, তারপর শিল্পীর সৃজনী প্রতিভা নিয়ে বিশ্লেষণভিত্তিক সিদ্ধান্তকে যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দিয়েছেন। দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে অবিরাম এই কাজ চলেছে ; সাংসারিক জীবনের সহস্র প্রয়োজন, শোকের মর্মভেদী আঘাত, স্বাস্থ্যভঙ্গের বেদনা কর্মস্রোত রুদ্ধ করতে পারেনি। 'It is not growing like a tree/That makes man better be'—রমেশচন্দ্রের কাজের পরিমাণ গণিতের হিসাবে ধরা পড়ে না, সত্যান্বেষীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধাই তার যথার্থ মাপকাঠি।

রমেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ পরিক্রমা আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের তীর্থক্ষেত্রে। তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ চলছে, স্নাতকোত্তর বিভাগে

গবেষণাভিত্তিক অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সূত্রপাত হয়েছে। ইতিহাস বিভাগে নবনিযুক্ত অধ্যাপকদের মধ্যে আছেন যুবক রমেশচন্দ্র। কয়েক বছরের মধ্যেই অধ্যাপক ও গবেষকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি চলে গেলেন নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষরূপে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে তাঁর আন্তরিকতা ও উদারতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রল। অবিভক্ত বাঙ্গালায় মুসলমান-প্রাধান্যের যুগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অভিষিক্ত হলেন। যাঁরা আজকাল তাঁর রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষের দুর্গন্ধ পাচ্ছেন তাঁরা হয়তো ভুলে গেছেন যে দীর্ঘকাল তিনি ঢাকায় মুসলমানদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ভোগ করেছেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পূর্ণভাবে পরিস্ফুট না হলে এটা সম্ভব হত না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক গবেষণায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। আমাদের দেশে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি প্রশাসকের মর্যাদা ও ক্ষমতা পেয়ে প্রথম জীবনের আরাধ্যা দেবী সরস্বতীকে অকাতরে বিস্মৃতির গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছেন। রমেশচন্দ্র এই সাধারণ প্রথার ব্যতিক্রম। বরঞ্চ তিনি গবেষণার জন্য বেছে নিলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার। যে ইংরেজ পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চর্চা করতেন, তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এই দিকটি অবহেলা করেছিলেন ; কিন্তু ফরাসী ও ওলন্দাজ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন—সম্ভবতঃ এই কারণে যে এশিয়ার এই অঞ্চল প্রধানতঃ ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রমেশচন্দ্র তাঁদের পথিকৃৎ বলে স্বীকার করে নতুন তথ্য সংগ্রহ করলেন, পুরাণো তথ্যকে নতুনভাবে সাজালেন। ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাইরে ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প কি ভাবে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশ করেছিল তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হল। 'যারা কেবল ইংলণ্ডকে জানে তারা ইংলণ্ডকে জানে না'—এই কথাটি প্রাচীন ভারত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। প্রাচীন ভারতীয়েরা কূপমণ্ডুক ছিলেন না, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে রূপান্তর গ্রহণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত, বিশাল এশিয়া ভূখণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনে প্রাচীন ভারতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এদিকে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন নি।

মধ্য বয়স পার হয়ে গেলে রমেশচন্দ্র আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। এই নতুন ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল রাজা রাজবল্লভ সম্বন্ধে তাঁর লেখা একটি ছোট বইতে। ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড যখন সাধারণ মানুষের দৃষ্টির বাইরে রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হচ্ছিল সেই সন্ধিক্ষণের কাহিনী নিয়ে রমেশচন্দ্রের যাত্রা সুরু হল। পরে তিনি লিখলেন সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী এবং (তিন খণ্ডে) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। বোম্বাইর ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রকাশিত History and Culture of the Indian People সিরিজের তিনটি খণ্ডে আধুনিক ভারতের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। রমেশচন্দ্র এই সিরিজের সম্পাদক, তা'ছাড়া ঐ তিনটি খণ্ডের অধিকাংশ অধ্যায়ের তিনিই লেখক। এই অধ্যায়গুলিতে তিনি আধুনিক ভারতের ইতিহাসের পূর্ণ পরিক্রমা করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন, পূর্ববর্তী লেখকদের মতামতকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি সমস্যা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিকাশ আলোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, ইংরেজ লেখকদের প্রদর্শিত সংকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করে তিনি ইতিহাসের প্রশস্ত রাজপথে অগ্রসর হয়েছেন, শাসকের কীর্তি ও কুকীর্তির সঙ্গে সঙ্গে শাসিতের ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির নব অভ্যুদয়ের বিস্তারিত বর্ণনা

করেছেন। British Paramountcy and Indian Renaissance : দুই খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের দুটি বিভিন্ন অথচ পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছে। কালের নির্দেশে—Renaissance এর প্রভাবে পরিপুষ্ট জাতীয় জীবনের শক্তিতে—বিংশ শতাব্দীতে British Paramountcy-র অন্তিম দশা উপস্থিত হল। এই ক্ষীয়মাণ বিদেশী প্রভুত্বের অবসানের কাহিনী বিধৃত হল রমেশচন্দ্রের Struggle For Freedom গ্রন্থে। বিদ্যাভবন সিরিজের এটিই শেষ খণ্ড। রামমোহন ও Bengal Renaissance সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের পৃথক রচনা British Paramountcy and Indian Renaissance গ্রন্থের পরিপূরক বলা যেতে পারে।

বিদ্যাভবন সিরিজের সম্পাদকরূপে রমেশচন্দ্র যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই। একাদশ খণ্ডে বিভক্ত বিরাট গ্রন্থে ভারতের সমগ্র ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে—প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত। কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস নয়; ধর্ম, সমাজ, আর্থিক অবস্থা, ভাষা ও সাহিত্য—জাতীয় জীবনের সকল দিকই যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। এই মহাভারতের পরিকল্পনা করেন রমেশচন্দ্র, বহু ভারতীয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় তিনিই একে রূপায়িত করেন, দীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অবিচলিত নিষ্ঠায়। তাঁর আমন্ত্রণে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করেন, তাঁর নিজের লেখা অধ্যায়গুলিও সংখ্যায় এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। কোন লেখকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা তিনি সংকুচিত করেন নি; কিন্তু যেখানে তাঁর নিজের মতের সঙ্গে অপর লেখকের মতের পার্থক্য ঘটেছে সেখানে তিনি নিজের বক্তব্য যোগ করে বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সম্পাদনার এই রীতি নতুন, কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে রমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই খণ্ডে প্রাচীন যুগে এবং মধ্য যুগে বাঙ্গালার ইতিহাস প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। তার আগে আমাদের দেশে এমন পরিকল্পনা কেউ করেন নি; এর একমাত্র আদর্শ ছিল *Cambridge Modern History, Cambridge Ancient History, Cambridge Medieval History* এবং *Cambridge History of India*। সেই বিলাতী আদর্শকে রমেশচন্দ্র ভারতে এনেছিলেন। এদেশে তাকে সম্পূর্ণ স্বদেশী রূপ দেওয়া হল; লেখক এবং সম্পাদক সকলেই বাঙ্গালী, কোন ইংরেজ বিশেষজ্ঞকে লেখক হিসাবে নেওয়া হল না। দেখা গেল, বাঙ্গালার ইতিহাস বিদেশীর সাহায্যে ছাড়া বাঙ্গালীরাই লিখতে পারেন। প্রথম খণ্ডের সম্পাদক হলেন রমেশচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা করলেন আচার্য যদুনাথ। কয়েক বছর পরে ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশের ব্যবস্থা হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন রমেশচন্দ্র; একটি খণ্ডের সম্পাদনার ভারও তিনি নিয়েছেন।

যৌথ প্রচেষ্টায় ইতিহাস রচনার প্রধান কর্মকর্তাকে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন অধ্যায় লেখার ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদকের কাছে রচনাটি পাঠিয়ে দেওয়া অনেকেই অনাবশ্যক মনে করেন। মাসের পর মাস, এমন কি বছরের বছর, কেটে যায়; সম্পাদক চিঠির পর চিঠি পাঠান। কিন্তু লেখা পাবার আশ্বাস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। লেখা যখন সম্পাদকের হাতে পৌঁছল, তখন দেখা গেল তাতে নানারকম ত্রুটি রয়েছে—যেমন, বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য, নতুন গবেষণাভিত্তিক তথ্য বা সিদ্ধান্তের অনুল্লেখ, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের অসম্পূর্ণ আলোচনা, অসম্পূর্ণ পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জী, ইত্যাদি। এ-সব ত্রুটি সংশোধনের জন্য সম্পাদককে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। আবার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন

লেখক কর্তৃক প্রকাশিত মতের মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকতে পায়ে ; সম্পাদক কোন লেখকের মতই বাদ দিতে বা পরিবর্তন করতে পারেন না, কিন্তু বিষয়টি এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে পাঠক বিভ্রান্ত না হন। তা' ছাড়া মানচিত্র প্রস্তুত করার ব্যবস্থা, চিত্র নির্বাচন ও সংগ্রহ, বিষয়-সূচী (Index) সঙ্কলনের ব্যবস্থা—এগুলিও সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। হাজার হাজার পৃষ্ঠার প্রুফ দেখা তো আছেই। একজন সম্পাদকের পক্ষে এই সব অসুবিধা অতিক্রম করে দশ বারো খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। বিভিন্ন খণ্ডের জন্য তিনি বিভিন্ন সহকারীর সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু মূল দায়িত্ব নিজেই পালন করেছেন। তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে, তাঁর সম্পাদিত সিরিজের সকল খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেস কর্তৃক পরিকল্পিত সিরিজের বারো খণ্ডের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বৎসরে মাত্র দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই সিরিজের প্রত্যেক খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব পৃথক সম্পাদককে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নানারকম অসুবিধার জন্য কাজটি আটকে আছে। এই দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের সম্পাদনায় রমেশচন্দ্রের সাফল্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক ধরণের প্রাদেশিকতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালীরা মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস লিখেছেন, কিন্তু ঐ সকল অঞ্চলের কোন ঐতিহাসিক বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হন নি। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ইতিহাস সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসের প্রধানতম অংশ, কিন্তু অবাঙ্গালী ঐতিহাসিকদের লেখায় এই গুরুত্বের স্বীকৃতি দেখা যায় না। বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরাও বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে রমেশচন্দ্রই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন। অবশ্য রমেশচন্দ্রের বিপুল কর্মকাণ্ড বাঙ্গালাকে অতিক্রম করে সমগ্র ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর ভারতে প্রসারিত হয়েছে, প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা তাঁর বিষয় নির্বাচন কখনও প্রভাবিত হয়নি। কিন্তু যে বিশেষ অর্থে বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভূমি সে সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা সজাগ ছিল। তাঁর উদ্যোগে, এবং আংশিকভাবে তাঁর সম্পাদনায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙ্গালার ইতিহাসের *(History of Bengal)* কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ বিভাগের পর তিনি নতুন তথ্যে এবং ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ বাংলার ইতিহাস তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ইতিহাসের বিস্তৃতি ; রমেশচন্দ্র এককভাবে এর রচয়িতা, তিনি বিভিন্ন লেখকের রচনা সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে একত্র সন্নিবদ্ধ করেন নি। রাজা রাজবল্লভ, রাজা রামমোহন এবং Bengal Renaissance সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি এরই পরিপূরক। বাঙ্গালার ঐতিহাসিক বিবর্তনের এই বিরাট কাহিনী তথ্য সমাবেশে ও ব্যাখ্যার গভীরতায় অতুলনীয়।

ঐতিহাসিকরূপে রমেশচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য সত্যের সন্ধান। সকল রকম উপাদান সংগ্রহ করতে হবে, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে পুঞ্জীভূত উপাদানের বিশ্লেষণ করতে হবে, তারপর যে সিদ্ধান্ত নিজের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হবে তাকে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কাল এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ বিচার করবে। অপ্রিয় সত্যকে বাদ দেবার, এমন কি মোলায়েম করে বলবার, বিন্দুমাত্র অধিকার ঐতিহাসিকের নেই। অপরের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করবার পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে, আবার তাঁর সিদ্ধান্ত সমালোচনা করবার সম্পূর্ণ অধিকার অপরের আছে। ইতিহাসের প্রশস্ত উদ্যানে শত পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে, শত পুষ্পের সৌরভে পাঠকের মন রসসিক্ত হবে। রাষ্ট্রের নির্দেশে বা রাজনীতির ইঙ্গিতে সত্যের যথার্থ রূপ পরিবর্তন করা চলবে না। যদি এমন নির্দেশ

বা ইঙ্গিত আসে তবে সেটা অকুণ্ঠভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, প্রয়োজন হলে তার জন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের জীবন-দর্শনে আপসের স্থান নেই। কঠিন মূল্য তিনি দিয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের সরকারী ইতিহাস রচনায় তিনিই ছিলেন প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা; কিন্তু সরকারী ইঙ্গিতে বিপ্লবীদের অবদান তুচ্ছ করতে তিনি অস্বীকার করেন, তাই তাঁকে সরকারী পরিকল্পনা থেকে সরে যেতে হয়েছিল। তারপর তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য স্বাধীনভাবে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। বিপুল অর্থব্যয়ে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী রচিত গ্রন্থ এখন পোকায় কাটছে, অথচ রমেশচন্দ্রের তিন খণ্ড সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। সরকারী খেতাব ও দাক্ষিণ্য তিনি পাননি। চারদিকে পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণের ছড়াছড়ি; কিন্তু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের নাম সরকারী ফর্দে দেখা যায়নি। অশীতিবর্ষ বয়সে যিনি সমাহিত চিত্তে জ্ঞান-চর্চায় নিযুক্ত তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' রূপেও স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব হয়নি।

কিছুকাল যাবৎ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে। শোনা যাচ্ছে, রমেশচন্দ্র 'জাতীয়তাবাদে' কলঙ্কিত ঐতিহাসিক ('nationalist historian'), তাঁর রচনায় বৈজ্ঞানিক রীতি—অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামভিত্তিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী—স্বীকৃত হয়নি, তিনি সাম্প্রদায়িক মতবাদে আচ্ছন্ন হয়ে মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার সৃষ্টি করেছেন। সমালোচকেরা অবশ্য পরোক্ষভাবে রমেশচন্দ্রের বিরাটত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, কারণ তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই তিনি—তাঁর কাজকে ছোট করে দেখতে পারলেই তাঁদের প্রগতিশীল মতবাদ জয়যুক্ত হবে। ছোট-খাট রথী-অর্ধরথীকে উপেক্ষা করে তাঁরা মহারথীর প্রতিই শরনিক্ষেপ করছেন। ভীষ্ম শয্যাশায়ী হলে 'জাতীয়তাবাদী' ঐতিহাসিক আলোচনার মূল উৎপাটিত হবে।

একথা ঠিক যে রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে কোন পূর্ব-কল্পিত নীতি বা সূত্রের বন্ধনে টেনে আনতে প্রস্তুত নন। কোন একটি formula প্রয়োগ করে সকল দেশের সকল যুগের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে বুঝতে পারা যাবে, এটা তিনি স্বীকার করেন না। ইতিহাস বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন পথে চলে, কোন মনীষীর রচিত সূত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য দেশকালপাত্র নির্বিশেষে একই পথে চলে না। গণিতের ছাত্র গাণিতিক সমস্যার সমাধানে formula ব্যবহার করে, কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে সে সুবিধা নেই। তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্য সংগ্রহ ও যাচাই করতে হবে এবং সিদ্ধান্তকে যাচাই-করা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইতিহাসের জন্মকাল থেকে এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে রমেশচন্দ্র এই নীতি পরিত্যাগ করার কোন কারণ খুঁজে পাননি। যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই, কারণ এই জাতীয় বিরোধের মূলে সাধারণতঃ যে অসহিষ্ণুতা এবং দৃষ্টিশক্তির যে ক্ষীণতা থাকে সেটা তাঁর চরিত্রে নেই। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীর চর্চা করে তিনি যে উদার, নিরপেক্ষ ও ক্ষমাশীল জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন সেটা সাময়িক কোলাহলের অনেক উপরে। হয়তো তিনি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারেন: "They say? What do they say? Let them say."

কোন ঐতিহাসিক যখন কোন ব্যক্তি বা ঘটনা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন তখন তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবেই তথ্যনির্ভর হতে হয়। আলোচনা যখন কোন গবেষণামূলক গ্রন্থে বা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয় তখন সংগৃহীত তথ্যের সূত্র সম্বন্ধে মোটামুটি ইঙ্গিত দিতে হয়, যেন অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করলে ঐ সূত্রের সঙ্গে তথ্যের সম্বন্ধ যাচাই করতে পারেন। রমেশচন্দ্রের রচনায় এই সর্বজনস্বীকৃত নীতির

কখনও ব্যতিক্রম করা হয়নি। মুসলমান শাসকদের সম্বন্ধে তিনি তথ্যসংগ্রহ করেছেন ফার্সি ভাষায় লেখা মুসলমান লেখকদের গ্রন্থ থেকে। হিন্দুদের মধ্যে ইতিহাস লেখার রীতি ছিল না। মধ্য যুগে হিন্দুশাসিত রাজ্যের বাহিরে সংস্কৃতে রচিত শিলালিপি ছিল না। সুতরাং, মুসলমান শাসনের প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে বর্তমানকালের ঐতিহাসিক মুসলমান-প্রদত্ত তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে বাধ্য হন। কোন ক্ষেত্রে যদি এই তথ্য উপেক্ষা করে বা বিকৃত করে কোন মুসলমান শাসককে অযথা নিন্দা করা হয় তবে সেটা ঐতিহাসিকের চরম অপরাধ হবে। এমন অপরাধের দৃষ্টান্ত রমেশ-চন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় না ; কিন্তু তাঁর সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন যাঁরা ঔরংজীব কর্তৃক হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কাহিনী উড়িয়ে দিতে চান, যদিও ঔরংজীবের সরকারী দলিল-পত্রেই মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেখা যায়।

ক্লাইভের অসাধুতা সম্বন্ধে মন্তব্য করলে অথবা হেস্টিংসের নানাবিধ অত্যাচারের নিন্দা করলে সেটা ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষের প্রমাণ বলে গণ্য করা যায় না। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে ইংরেজের বন্ধু বলে দাবি করতেন, কিন্তু ডায়ারের নৃশংসতার তীব্র নিন্দা করতে তিনি সংকুচিত হন নি। মুসলমান শাসকদের নীতি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল, একথা অনস্বীকার্য। সে-ধর্ম সুফীদের উদার মতবাদ নয়, গোঁড়া মোল্লা-মৌলভীদের প্রভাবই রাজ-দরবারে প্রবল ছিল। ঐতিহাসিক বদায়ুনী আকবরকে ইসলাম পরিত্যাগের অপরাধে অপরাধী করেছিলেন। দারার শোচনীয় পরিণাম অনেকাংশে তাঁর উদার ধর্মমতের ফল। যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে শাসকের এবং শাসন-নীতির বিচার করতে হয়। আলাউদ্দীন, ফিরোজ তুঘলক বা ঔরংজীবের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যেই বিচার্য, বর্তমান কালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে সেটা আদৌ প্রযোজ্য নয়। ইতিহাসকে বিকৃত করে, মুসলমান-শাসনের কুফল গোপন করে বর্তমান কালে সাম্প্রদায়িক ঐক্য দৃঢ় করা যাবে না। যদি সেটা সম্ভব হবে বলে তর্কস্থলে স্বীকার করা যায়, তবুও প্রকৃত ঐতিহাসিক সে পথে যেতে পারবেন না, কারণ তাঁর প্রথম আনুগত্য সত্যের প্রতি, সত্যকে বলিদান করে ইতিহাসের সৌধ গড়তে তিনি পারবেন না। এই মূল কথাটি মনে রাখলে রমেশচন্দ্রের তথাকথিত মুসলমান-বিদ্বেষ সম্বন্ধে যে বক্তব্য প্রচারিত হচ্ছে তার মূলোচ্ছেদ হবে।

যিনি এত লিখেছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকবে না, সমালোচনার ক্ষেত্র থাকবে না, এটা অসম্ভব। সিপাহী-বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের অবদান সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের মত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই বিতর্কের মূল লেখকের বিচারের দুর্বলতা নয়, স্বীকৃত তথ্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ। এ-জাতীয় বিতর্ক চলতেই থাকে ; যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বিচারের মাপকাঠি পরিবর্তিত হয়, পুরাণো ঘটনাকে নতুন আলোকে আলোকিত করার জন্য চেষ্টা করা হয়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব সম্বন্ধে নতুন বিতর্ক চলছে ; পুরানো ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা বাতিল করে নানারকম নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হচ্ছে। যেখানে নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হয়, সেখানে ব্যাখ্যার লড়াই আরো প্রবল হয়ে উঠে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে এটাই ঘটবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কথা বাদ দিলেও আধুনিক যুগের অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের তথ্যসংগ্রহ নিতান্তই অসম্পূর্ণ। ভবিষ্যতে যখন নতুন তথ্যসম্ভার ঐতিহাসিকের সামনে পড়বে তখন ভারতের ইতিহাসের চেহারা হয়তো নানাদিকে বদলে যাবে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের মত মনীষীর রচনা বাতিল হয়ে যাবে না। এক বিশিষ্ট যুগের মহান ঐতিহাসিক প্রতিভা তাঁর রচনায় বিধৃত হয়ে রইল। যুগ পরিবর্তন হলেও এই কীর্তির মূল্য থাকবে। *Cambridge*

Modern History প্রকাশিত হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে। পরে সেটাকে বাতিল করে *New Cambridge Modern History* প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি পুরানো সিরিজ আবার ছাপা হয়েছে, কারণ একালের পণ্ডিতেরা জানতে চান তাঁদের পূর্বসূরীরা ইতিহাসকে কি ভাবে দেখতেন। একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক চিন্তাধারার পরিচয় পাবার জন্য রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়বেন।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণী কথা ভূতলে প্রচরিষ্যতি॥

কোন ঐতিহাসিক এমন কথা বলতে পারেন না। Gibbon, Hallam, Grote, Stubbs, Ranke, Mommsen কেবল ইতিহাস রচনার ইতিহাসে বেঁচে (History of Historiography) আছেন। Herodotus, Thucydides এবং Polybius বেঁচে আছেন এজন্য যে, তাঁদের গ্রন্থ ইতিহাসের অপরিহার্য আকর (source book)। রমেশচন্দ্র বেঁচে থাকবেন দীর্ঘকাল—ভারতীয় প্রতিভার ইতিহাস-চর্চার জয়স্তম্ভ রূপে।

আচার্যদেব

অমূল্যভূষণ সেন

মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশ কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে সাগর-প্রশস্তি রচনায় রামচন্দ্রকে উদ্বেল করে তুলেছেন। কতো ভাবে কতো বিভিন্ন দিক দিয়ে সাগরের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রামচন্দ্র বলে চলেছেন সীতাকে উপলক্ষ করে। অবশেষে রামচন্দ্র ইতি টানলেন এই বলে যে, সাগর বর্ণনাতীত 'ইয়ত্তয়া ইদত্তয়া বা'। পূজ্যপাদ আচার্য রমেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী ভারতেতিহাস-সাধনার ব্যাপকতা ও গভীরতা নির্ণয় প্রয়াসে এই প্রকার অনুভূতিরই সম্মুখীন হতে হবে।

বস্তুত প্রাচীন ভারত, বৃহত্তর ভারত এবং আধুনিক ভারতের বিরাট ও জটিল ইতিহাসে তাঁর অনলস গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব সমূহকে পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তা কী সংখ্যার দিক দিয়ে, কী গুণগত বিচারে পরিমাপ করা আমাদের সাধ্যাতীত। ঐতিহাসিক রমেশ-চন্দ্রের জীবনবেদ তাঁরই নিজের ভাষায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে :

"সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু তবু সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব"। এ'সত্যকে' খুঁজতে ও বুঝে, গ্রহণ করতে তিনি আজীবন 'পরমসত্যানুসন্ধানীর' নিষ্ঠা ও দার্ঢ্য নিয়ে বন্ধুর পথে চলেছেন। আজ নবতিতম বর্ষের শারীরিক জীর্ণতাকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর জ্ঞান-দীপ্তি, তাঁর তপস্যার জ্যোতির্ময় রূপ। ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কার ও বিশ্লেষণে তিনি যে সত্যলাভ করে প্রচার করেছেন তা থেকে একচুলও তিনি সরে যান নি, রাজনৈতিক কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কিম্বা জাগতিক জীবনে আরও সম্মান লাভের নিমিত্ত। বর্তমান ভারতে এতবড়ো সত্যসন্ধ দৃঢ়চিত্ত মনীষী আর কেউ আছেন কিনা জানিনে।

আচার্যদেবের চরিত্রের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক স্বরূপ নানা ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র তুলে ধরা হচ্ছে। স্বাধীনতালাভের অল্পকাল পরে তৎকালীন সুখ্যাত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন—শিরোনাম—'ইংরেজ ভারত ছাড়িল কেন'। উক্ত প্রবন্ধে তিনি নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পশ্চাতে তিনটি বড়ো ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হবে—যথাক্রমে গান্ধীজী ও সত্যাগ্রহ, হিট্‌লার ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ। এবং এ বিশাল দেশের মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিককুলের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র'—এ সত্যকে তিনি তথ্যনিষ্ঠ প্রামাণিকতা দান করেছিলেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি এই সত্যকেই আঁকড়ে আছেন, তাঁর অজস্র লেখায় একথাই তিনি বলে এসেছেন। ইংরেজিতে লেখা তাঁর বিরাট গ্রন্থ—ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডকে এ-লব্ধসত্যই বিধৃত করে রেখেছে। তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন ভারতের সশস্ত্র মুক্তি-প্রয়াসকে, প্রতিষ্ঠা করেছেন এই সত্যকে যে, কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন এ-দেশের স্বাধীনতা লাভে একমাত্র কথা নয়; নির্দ্বিধায় বলেছেন "ভারতের মুক্তিলাভের কৃতিত্ব একমাত্র—এমন কি প্রধানতঃ, মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য, এই বহুল প্রচারিত মত ও সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।" নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর 'দিল্লী চলো' অভিযান পরম ব্যর্থতার মধ্যেও দ্রুতঘটনা পরম্পরায় ইংরেজকে বাধ্য করেছিল ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে এবং ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী এ্যাট্‌লি সাহেবের উদ্যোগে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে পাশ করিয়ে নিতে।

এ-ঐতিহাসিক সত্যকে আচার্যদেব সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তাঁর ইংরেজি গ্রন্থে (History and Culture of the Indian People—Vol XI Pp. 788-90)।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আচার্যদেব যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তার অপ্রত্যাশিত সমর্থন এসেছে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মনীষী ফণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের একখানা লিপির মাধ্যমে। ১৯৭৫ ডিসেম্বরে প্রকাশিত আচার্যদেবের সুপ্রসিদ্ধ 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের শেষ খণ্ড পাঠ করে তিনি আনন্দিত হন এবং উক্ত লিপিখানি প্রেরণ করেন। ১৯৫৬ সালে যখন চক্রবর্তী মহাশয় পশ্চিম বঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল, তখন এ্যাট্‌লি সাহেব কলকাতায় তাঁর অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রশ্নোত্তরে এ্যাট্‌লি সাহেব বলেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতালাভে গান্ধীজীর কার্যকলাপের প্রভাব 'অকিঞ্চিৎকর (mi-ni-mal)' প্রধানত নেতাজী সুভাষের দ্বারা ভারতের স্থলবাহিনী ও জলবাহিনীর দেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করে দেবার মধ্যেই ইংরেজের ভারত ছাড়ার কারণ নিহিত রয়েছে। উক্ত মহামূল্য দলিলটি 'জয়শ্রী'র ১৩৮৩ আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে (পৃঃ-১৫০)। —এই সন্দেহাতীত প্রমাণলাভে প্রবীণ আচার্যদেবের মুখমণ্ডলে যে প্রশান্তি দেখেছিলাম, কণ্ঠে সত্যের বিজয় ঘোষণার যে সংযত বলিষ্ঠ ভাষা শুনেছিলাম, তা অবিস্মরণীয়।

অপরদিকে এই সত্যপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন স্বাধীন ভারতের শাসকবর্গের কঠোর রাজনৈতিক সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। শোনা যায় যে আচার্যদেবের নাম নাকি জাতীয় সরকারের 'কালো খাতায়'(Black Book এ) স্থান পেয়েছিল। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক তাই বোধ হয় কোন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাননি, যোগ্যতার দাবিতে প্রাপ্তব্য 'জাতীয় অধ্যাপকে'র (National Professor) পদও তাঁকে দেয়া হয়নি। তৎকালীন শাসকবর্গ নানাভাবে একথাই শুধু প্রচার করতেন দিনের পর দিন, জনগণকে একথাই শুধু বোঝাবার প্রয়াস করতেন, যে গান্ধীজীর অভিনব সত্যাগ্রহ এদেশকে স্বাধীন করেছে, এবং স্বাধীন ভারতের কর্ণধার হয়েছেন গান্ধীজীর শিষ্যবর্গ, যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই। এ রাজনৈতিক, কিন্তু অনৈতিহাসিক, প্রচারে তখন ভারতের আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হোতো। এ প্রচারের পথে দুর্লঙ্ঘ্য কণ্টক সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। সুতরাং, জাতীয় সরকারের তখন দারুণ অস্বস্তি। তাঁকে হেয় করবার সূক্ষ্ম সরকারী প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

তবুও 'জাতীয় অধ্যাপক' নিয়োগের প্রস্তাব আচার্যদেবের কাছে এসেছিল—অবশ্য পরোক্ষে লোক-চক্ষুর অন্তরালে। মতের ও পথের মৌলিক প্রভেদ সত্ত্বেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আচার্যদেবের ঐতিহাসিক প্রতিভাকে স্বীকার করার মতো ঔদার্য ছিল, এবং যোগ্যতম মনীষী হিসেবে তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' করার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সরকারের ও সহকর্মীদের সংহত বিরূপতা নাকি অন্তরায় হয়েছিল! তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পরম বৈদগ্ধবান ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন আচার্য রমেশচন্দ্রের পারিবারিক সুহৃদ্। তিনি আচার্যদেবকে বলেছিলেন যে কংগ্রেসের সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণটি যদি তাঁর তূণে অন্তত ছ' মাস কাল তোলা থাকে, তবে প্রধানমন্ত্রী একটি কর্তব্য পালন করে তৃপ্ত হতে পারবেন। আচার্যদেব সস্মিতমুখে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—তিনি ঐতিহাসিক সত্য বলে যা বুঝেছেন, কোন পদের মোহই তা থেকে তাঁকে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত করতে পারবে না।

উপরিউক্ত তথ্যটি আচার্যদেবের কাছ থেকে বর্তমান লেখক কথাচ্ছলে বার করে নিতে পেরেছিল স্নেহের দাবিতে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুস্লিমসমস্যা, রামমোহন রায়ের পথিকৃৎ হিসেবে ভূমিকা, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের স্বরূপ নির্ণয়, গান্ধীজীর অবদান প্রভৃতি বড়ো বড়ো ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে তিনি নিজস্বতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে চলেছেন। বিরূপ

সমালোচনার ঝড় আজও বয়ে চলেছে, কিন্তু আচার্যদেব রয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্তসমূহে অনড়, অবিচল। এ কিন্তু মোটেই গোঁড়ামি নয়। তথ্যনিষ্ঠ বাস্তবানুগ বিরূপ সমালোচনাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন, এমন কি তিনি বর্তমান লেখকের মতো অর্বাচীনদের মতামতও ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন। তথ্য-ভিত্তিক হলে তাদের স্বীকৃতি দেন তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজির অভ্যন্তরে। (তাঁর শেষ মৌলিক গ্রন্থ 'বাংলাদেশের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ড ; পৃঃ ১৮৯-৯০।) কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অথবা কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা কিংবা পোষণকল্পে ইতিহাসের তথ্যাদির যে বিকৃত বা পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা, অথবা ইতিহাসের কোন ঘটনাকে ভিত্তি করে যে নাটকীয় বাগ্ময় উচ্ছ্বাস—এ-সবের তিনি আপসহীন বৈরী। তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির বিরূপ সমালোচনাসমূহের একাংশ দুর্ভাগ্যক্রমে উপরিউক্ত কোন না কোন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত। পূর্ব-পরিকল্পিত কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাকল্পে সুবিধেমতো তথ্যাদির গ্রহণ ও বর্জন এবং বিশেষ ছকে ফেলে তার সরলীকরণ—এই মানদণ্ডে তাঁর সমালোচনা কোথাও কোথাও অশালীন হয়ে উঠেছে। আমাদের আচার্যদেব প্রধানত ও প্রথমত ভারততত্ত্ব-বিদ্, তিনি সত্যই 'ভারততত্ত্ব ভাস্কর'। তাঁর অনবদ্য অধ্যাপনার অর্ণবযানটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সাগরেই আবর্তিত হোতো। প্রাচীন ভারতের বিতর্কমূলক কোন ঘটনা বা তারিখের উপর তিনি তাঁর অনন্য বিশ্লেষণী প্রতিভার সাহায্যে যে আলোকপাত করতেন, সে আলোতে বহু মৌলিক গ্রন্থপাঠের তুল্য জ্ঞান লাভ হতো।

বর্তমান লেখক ছেচল্লিশ বৎসর পূর্বে এম-এ ক্লাশে 'প্রাচীন ভারত' পাঠ করেছিল ঐচ্ছিক পত্র হিসেবে, আচার্য মজুমদারের অনন্য অধ্যাপনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে ধন্য হয়েছিল! মহাশূর গৌররাজ শশাংককে স্বাধীন পূর্বভারতের (বঙ্গদেশের) প্রতিষ্ঠাতারূপে ; কনৌজের সম্রাট হর্ষবর্ধনের অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের ইতিহাসে আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রধানত আচার্যদেবের। এ কারণে স্বনামধন্য ভারততত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতের সহিত তাঁর মতের সংঘর্ষ হয়েছিল। রাখালদাস মনে করতেন শশাংকদেব মগধের 'পরবর্তী' গুপ্ত বংশের সম্রাট মহাসেনগুপ্তের পুত্র বা কোন নিকট বংশধর। এবং এ মতই তখন পর্যন্ত গ্রাহ্য ছিল। স্নেহভাজন ডঃ মজুমদারকে রাখালদাস যে ভর্ৎসনার বাক্য নিক্ষেপ করেছিলেন, আচার্যদেব সে কাহিনী একদা শ্রদ্ধার সঙ্গে সরস করে তাঁর ছাত্রদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। প্রাচীন ভারতে বঙ্গদেশের স্বাধীন সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক বিকাশের কাহিনীতে শশাঙ্কদেব আজ অবিস্মরণীয় পথিকৃৎ-এর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মূলত আচার্যদেবের গবেষণার ফলস্বরূপ প্রাচীন ভারতেতিহাসের শেষার্ধে একটি স্থায়ী তাৎপর্যময় অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। ইহা নবম ও দশম শতাব্দীর ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী। কনৌজ তখন উত্তরভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু। কনৌজকে ঘিরেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রাজপুতনার গুর্জর-প্রতিহার বংশ, গৌড়বঙ্গের পাল বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ—এদের মধ্যেই ছিল প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পালাক্রমে সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিভিন্ন বংশকে বরণ করেছেন। অবশেষে সম্রাটের দাবী স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন গুর্জর-প্রতিহারগণ, যাঁরা পুরুষানুক্রমে মুস্লিম আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন। তারপর পুরুষানুক্রমেই কনৌজ হতে বিশাল সাম্রাজ্য শতাধিক বর্ষ কাল শাসন করে গেলেন। এই অধ্যায়টি আজও অবশ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। তবে এটুকু আজ প্রমাণিত হয়েছে যে হর্ষবর্ধন (সপ্তম শতাব্দীর) ভারতের শেষ পরাক্রান্ত হিন্দু সম্রাট নন। হিন্দু ভারতের পতনের ইতিহাস গুর্জর-প্রতিহার বংশের পতনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে, এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তার সূত্রপাত হয়েছিল।

আচার্যদেব আরও কতোভাবে যে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রারম্ভিক অধ্যায়কে বিকশিত করেছেন, অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যে কতো নবনব তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত যোজনা করেছেন, সামগ্রিক ইতিহাস পাঠকে কতো সমৃদ্ধ ও জটিলতামুক্ত করেছেন, তার হিসেব নিতে গেলে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। বর্তমান নিবন্ধে তার বিশদ আলোচনার স্থানাভাব।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অধ্যাপকের জ্ঞানের গভীরতা সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে একটি বিষয়কে দুর্বোধ্য করে তোলে। তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারে। উচ্চগবেষণার ক্ষেত্রে শুধু মহাজ্ঞানী অধ্যাপককে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কঠিন বিতর্কমূলক একটি বিষয়কে সাধারণ শিক্ষার্থীর স্তরে নেমে এসে সহজ করে পরিবেশন করা সে কারণে মহামনীষী অধ্যাপকদের একটি অসামান্য গুণরূপে-বিবেচিত। সেই অসামান্য গুণ আচার্য মজুমদারকে মণ্ডিত করে রেখেছে। যেমন তিনি বরণীয় বিদগ্ধ সমাজে, তেমনই প্রিয় তিনি তাঁর সকল ছাত্রের কাছে। একাধারে এত বড়ো পণ্ডিত ও এতবড়ো শিক্ষক, একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞান-লাভেচ্ছুদের নিমিত্ত অফুরন্ত রসদ জোগানো এবং কিশোর ও তরুণদের বোধগম্য করে গ্রন্থ রচনা—অধ্যাপক মজুমদারের এটিই বোধ হয় মহত্তম বৈশিষ্ট্য। এতো সহজ করে জটিল কোনো বিষয়ের পর্যালোচনা ও পরিবেশনা আর দৃষ্ট হবে কিনা; জানিনে।

যখন তিনি অধ্যাপনা করতেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তাঁকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হোতো, কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে তিনি সবার উপরে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর গৃহে, বাইরের দেয়ালে একটি বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো থাকতো—অন্য কোন কাজ নিয়ে সকালবেলা তাঁর কাছে কেউ যেন দয়া করে না আসেন, কারণ সকালবেলা তাঁর অধ্যয়ন করতে হয়, ক্লাশে পড়াবার পাঠ প্রস্তুত করতে হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আড়ালে কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা শোনা যেতো। যারা উক্ত বিষয়ে হাল্কা কথা বলতেন তাঁদের ধারণাতেই আসতো না যে এতবড়ো পণ্ডিতের আর কি পড়ে জানার থাকতে পারে, বিশেষ করে তাঁকে পড়াতে হবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্লাশে। কিন্তু এই সদাব্যস্ত মানুষটি জীবনের ছোটবড়ো সকল কাজকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। শুধু গবেষক ছাত্রদের পথ নির্দেশক তো তিনি নন, বি, এ, এম, এ ক্লাশের ছাত্রদেরও তিনি শিক্ষক। আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপকদের কাছে তিনি এইভাবে তাঁর সমন্বিত কার্যধারায় জীবন্ত প্রেরণা হয়ে রয়েছেন।

মহাকালের অনিবার্য প্রভাবে আজ এই নবতিতম বর্ষে সাংসারিক নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর খানিকটা বিস্মৃতি এসেছে। কিন্তু তাঁর সাধনার ধন ইতিহাসের খুঁটিনাটি আজও তাঁর নখদর্পণে। তাঁর ক্ষুরধার মেধা আজও ইতিহাস অনুশীলনে কার্যকরী। ঋষি-প্রতিম আচার্যদেবের চরণে প্রণতি জানাই, বিশ্ববিধাতার কাছে তাঁর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শতায়ুর প্রার্থনা নিবেদন করি।

DR. R. C. MAJUMDAR : THE HISTORIAN

B. C. Mukherjee

Dr. R. C. Majumdar was born in 1888 and his first published work—'Corporate Life in Ancient India'—came out in print in 1919. In 1919 the First Great World War was just over, and several Englishmen like Vincent A. Smith, F.J. Monahan, William Irvine, Edward Gait and a few others had opened up the study of Indian history in a systematic and scientific manner, but their endeavour was circumscribed by their treatment of the country as a colonial possession. The result, though illuminating in many respects, was mostly topical, not analytical, and the subjective factor was predominant in their treatment of objective conditions. A systematic and organized research in Indian History—the history of the teeming millions of India—was never undertaken. In brief, by 1919 the study of Indian history was casual and often inaccurate and patronizing. Mr. Stanley Lane Poole had observed in 1903 that in the East the people does not change, and the 'simple annals of the poor, however moving and pathetic, are indescribably trite and monotonous compared with the lives of the more fortunate...' V. A. Smith goes a step further when he remarks, 'the Indian commonalty has no history that can be told'. The Western historians, imbued with the definition of History as given by Ibn Khaldun several centuries earlier, found the absence of fast changes in their study of Indian history. They failed to appreciate that the pattern of change from primitive society to the modern society need not be uniform everywhere, that evenness of change would make change itself mechanical.

That was the background when R. C. Majumdar published his 'Corporate Life in Ancient India,' bursting through the barrier that had been imposed on the writing of Indian History. The subject itself revealed the historian. This was the first history, written by an Indian youth, of the people of India. For Dr. Majumdar, history and its facts are derived from research or enquiry. Research or enquiry presupposes not the superabundance of knowledge, but the want of it. Once a person is conscious of ignorance, it becomes easy for him to fight it, and start a sequence of enquiries which culminate in finding facts of history. What kind of things does history find out ?—asks Dr. Majumdar. Of course, human actions done in the past which may have an important bearing on the present. History, to him, proceeds by the interpretation of evidence, and here the subjective factor may have a dominating influence ; but facts and evidences are there to arrive at the conclusive truth. The value of history, then, is that it teaches what man has done and is likely to do, and thus what man is. This a-priori judgment is clear from his enquiries, but Dr. Majumdar is conscious that it is not possible to exclude philosophy from history. Our philosophical tradition goes back to the Vedas, the Upanishad and the Buddhist councils. The central problems of thought right upto the end of the Middle Ages

were concerned with theology, with the relations of God and man. But Dr. Majumdar's critical, enquiring mind was not satisfied with problems of theology as the Ultimate in man's concept of history. He was prepared to accept theology as a part of History, but not as the fundamental part of his enquiry and research. Like Gibbon, who looked upon history from the point of view of the 18th Century Englishman, and like Mommsen who wrote with an attitude of the 19th Century German, Dr. R. C. Majumdar brought a powerful and eager mind to bear on theology, art, and history from the point of view of an early 20th Century Indian. It will be of interest here to note what some foremost European Scholars of the time felt about the first two publications of Dr. Majumdar—the Corporate Life In Ancient India (1918) and the Outline of Indian History and Civilization (1927). 'I have read your book (Corporate Life) with pleasure and profit', writes Professor A. Berreidale Keith. 'Its value is much enhanced by the abundant and most useful citations of authorities, ancient and modern, and every student of the political and social life of ancient India will have to reckon with the suggestions made by you. I desire to congratulate you on the admirable temper and courtesy shown in discussing views which you do not accept. Your work is a valuable and original contribution to the study of questions .....which by their importance and intricacy offer every temptation for scholarly investigation.....'. V. A. Smith writes in the English Historical Review : "The treatise entitled Corporate Life in Ancient India, is written in a detached and historical spirit. The author knows German, and has arranged his material in a German rather than an English fashion. The author justly observes that 'it requires great effort to believe, even when sufficient evidence is forthcoming that institutions (Kingless states) which we are accustomed to look upon as of wetern growth had also flourished in India long long ago...'. Mr. Majumdar's book gives promise of further well-designed researches calculated to throw much light upon the history of ancient India." Professor J. Jolly writes from Wurzburg on 13. 9. 27 about Dr. Majumdar's Outline of Ancient Indian History and Civilization : 'This great work presents a vivid picture both of the political and cultural history of India. As a native of India, the author takes a thoroughly sympathetic view of the achievements of his countrymen in art and sciences, and objects to the racial superiority of European writers on India. The chapters on religion and literature, art and architecture, education and society, trade and commerce are particularly interesting'. Dr. L. D. Barnett writes from London on 13. 11. 27 : '...it seems to me excellent, well designed, well executed and certain to prove most useful to teachers and students'.

Ancient Indian History and Culture, and their influence abroad are the basic themes of Dr. Majumdar's work. In these spheres he has been the pioneer, and has thrown open a vast field of research and enquiry in which generations of his pupils and young men and women of India and outside India have worked and succeeded in dispelling the thesis that the 'Indian Commonalty has no history that can be told.'

If Dr. Majumdar's scholarship is solid and vast, his work in various areas of Indian history is massive. He was the editor of, and the main contributor to the big and valuable History of Bengal Vol. I (1943), a product of seven years of intense research and study ; the author of Ancient Indian Colonies in the Far East (1944) in three volumes (Champa and Suvarnadipa) ; history of Bengal in four volumes in Bengali (and lately in English) ; the classical Accounts of India, and several other volumes in allied subjects. These publications, particularly the illuminating analysis in the History of Bengal. Vol. I, attracted the attention of the late Dr. K.M. Munshi, himself a fine scholar with insatiable thirst for knowledge and a man of great ideas, and he entrusted to Dr. Majumdar as General Editor, the task of writing a comprehensive History and Culture of the Indian people, planned by the Bharatiya Vidyabhavan in eleven large volumes. Working with a team of 85 scholars, a difficult exercise in co-ordination, Dr. Majumdar completed his great work in 1977 after Herculean labour of 35 years. But what is amazing is that during these 35 years Dr. Majumdar had found time to publish several other works of high standard—the result of intense research, devotion and enquiry. These are the History of the Freedom Movement in India in three volumes, the Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, History of Medieval Bengal and the Renascent India, besides publishing more than 500 original articles touching every conceivable aspect of the life and history of the people of India. (These articles have been planned to be published in three volumes, the first of which has already come out in print under the title of 'Readings in Political History of India'). These authoritative publications made Dr. Majumdar a figure of international repute and distinctions were conferred on him as the doyen of Indian History. He was appointed Vice-President of the International Commission for publishing a "History of Mankind—Cultural and Scientific Development" sponsored by the U.N.E.S.C.O. (work since completed). There is hardly a Conference, Society or Body sponsoring the study and research in history in India that did not harness the services of Dr. Majumdar for successful completion of projects. At the age of seventy (1957-58) he was appointed Visiting Professor of Indian History for two years at the Universities of Chicago and Pennsylvania.

Quantitatively Dr. Majumdar's contributions to the different areas and problems of Indian history are massive, perhaps unsurpassed by any previous or contemporary historian of India. But what about the value of his work and quality of his studies ? The judgments of some outstanding authorities of Europe on the first two publications of the author have already been quoted. With regard to his History of Bengal Vol. I, published in 1943, it will not perhaps be an exaggeration to state that, in spite of formidable difficulties faced by the historian on account of scanty evidence, his patient and penetrating researches made it possible to assign some identity to ancient Bengal when there was apparently none noticeable. His passion for objectivity in the face of so much that can only be surmised, and his flair for considering anything that is available bearing on his subject, would give credit to any

pioneer seeking knowledge of his motherland. Even the name of Bengal, Dr. Majumdar argues, is derived from Portuguese rather than from Sanskrit. No written annals resembling history existed, and he had to rely mainly on the remnants of artistic and literary records for the reconstruction of history of ancient Bengal—its ruling dynasties, conditions of its people in general, its administrative set up, and its social and economic conditions. Dr. Majumdar has not offered idyllic views on Bengal but has shown what scientific research in an obscure area can accomplish. He has proved beyond doubt that there existed such a thing as a Bengali identity in ancient times.

The eleven elaborate volumes on the History and Culture of the Indian People, popularly known as the Bharatiya Vidya Bhavan series, written under the supervision of Dr. Majumdar as the General Editor, have provided the world of research and scholarship with authoritative texts, period-wise, on the pattern of the Cambrigde Histories—ancient, medieval and modern—from the Vedic times till the struggle for freedom and eventual independence of India in 1947. Teachers, research fellows and advanced students of Indian history have now at their disposal these sound volumes for their study of India—past or present. Dr. Majumdar himself has contributed copiously to the early and later divisions of this work, which has incorporated the full and authentic results of latest research. A few opinions on this massive work will not be out of place. "This history unlike its predecessors is first and foremost a history of India and her people... The standard in a word is very high"—Times Literary Supplement, London. "A magnificent piece of exact and unbiassed scholarship...pages are alive with the spirit of modern Indian Renaissance"—Statesman, Calcutta. "Unique in the annals of modern Indian Scholarship...these volumes will transform the study of Indian history in our times"—Sunday Standard, Bombay. This is the history of India one would like to have, and Dr. R. C Majumdar has delivered it to the Indians after thirty five years of untiring work. The last volume came out in 1977, when Dr. Majumdar was 89. One peculiar matter cannot be overlooked on reading these volumes. Whenever Dr. Majumdar does not agree to the opinion expressed by the writer of a Chapter,—an expert in the field,—his own opinion in this regard invariably appears in a footnote, so that others may judge. Here is a rich legacy of excellent scholarship and competent interpretations.

Though generally a very affable man, noble and dignified, and tolerant of views on history with which he does not agree, it is difficult to find a more unbending and uncompromising person when it comes to facts and principles. He would never think of compromising with any official interference (Government or semi-Government) in matters concerning facts of history. History written to order is repulsive to him. History should be left to history without any attempt to cook it. This stubborn attitude is apparent from the volumes of his History of Freedom Movement of India. He could not agree to the official line taken on certain aspects of this movement, and relinquishing his Chairmanship of the Board set up by the

Central Government for writing a history of this movement, Dr. Majumdar himself published his own version of the History of Freedom Movement in three volumes, while the official history of the movement was composed by Dr. Tarachand. The American Historical Review (1962) has scathingly criticised Dr. Tarachand's publication, but about Dr. Majumdar's first volume the same paper holds : "It is well written, concise and replete with penetrating ideas and new meanings for often-cited facts...he holds the 'Two-Nation" theory in respect of Hindus and Moslems, and also refutes the idea that the 1857 outbreak was a 'war of independence', a view suggested in another government sponsored work by Dr. Surendra Nath Sen" (1964)

In Vol. III of this work Dr. Majumdar posed the question as to whether Gandhiji's movement had alone been responsible for winning India's freedom, or whether the I.N.A. of Netaji Subhas had a better claim for this honour. In the second edition of his work he has published a letter with the declaration of Mr. Attlee, the then Prime Minister of England, that it was the I.N.A. of Netaji which was responsible for the withdrawal of the British from India, and that Gandhiji's contribution in this regard was 'minimal'.

Another work of Dr. Majumdar's faithful research was published in April, 1976 under the title 'Renascent India', which is the first full study of the genesis and development of the Renaissance in Bengal and eventually of India. The various facets of this awakening have been analysed in detail with lucidity and authority. In one chapter he has clearly shown that India, before the advent of the British, was one of the foremost countries of the world in trade and industry, and that it was on account of English exploitation that the Indians were reduced to the strait of poor agriculturists. He has exhaustively dealt with the role of distinguished persons and of contemporary literature and the press in this movement of awakening. He has devoted two chapters on the contributions of Raja Rammohan Roy and Henry Louis Vivian Derozio to this Renaissance movement. Incidentally, the author has convincingly determined the exact date of Derozio's birth,—a matter of controversy till recently—from an unambiguous statement of Calcutta Gazette which published the obituary on Derozio the day after his death. This is what industry and alertness of mind at the age of 88 can accomplish.

In retrospect, it may be said that the concept of History does generally change with the change of time. Each generation, almost each decade will have its own idea of the meaning of history. Therefore, historians old and young, the pioneers and the beneficiaries are very likely to differ as to the proper perspective and methodology of history. Different ideologies will also invariably get focussed on history and new interpretations of old facts are bound to come up. But the facts of history do not readily change although interpretations on them may vary. Naturally, the historian who by sheer perseverance, application and patience has established irrefutable historical facts, cannot be smartly set aside as a man of no consequence. It is because Dr. Majumdar has, by his lifelong devotion and hard work established

great historical facts, that different theories about the interpretation of these facts have become possible. Facts will bear interpretation, and not the vice-versa. Again when a person's eminence and authority in a field are universally acknowledged, he is invariably approached by the press and the public for opinion and message in a given context. These are often cynical, often didactic, and very often meaningless. But who would underestimate Voltaire the Philosopher or Bernard Shaw the Playwright, although their devastatingly cynical utterances and messages are often shocking ?

Sri S. Gopal has recently published an article—"Fear of History", in which he has raised multiple issues, often unrelated, such as academic freedom, politicians and history, historiography and methodology, and has condemned the Bharatiya Vidya-Bhavan for undertaking useless projects. But Sri S. Gopal's virulence against the veteran historian, Dr. R. C. Majumdar, appears to surpass decency. He writes : "Even worse ; for who is he (Dr. Majumdar) whom the Prime Minister and Dr. V. K. R. V. Rao are commending ? Dr. R. C. Majumdar, who even thirty years ago was twenty years out of date and writing, at length and in profusion, traditional blinkered history.....His longevity has earned him the right to be preserved in cotton wool.....". This is a filthy attack totally unjustified. A versatile Nonagenarian historian, who has made prolific contributions to Indian history, ancient and modern, whose 'History and Culture of the Indian People' in eleven volumes is a monument of scholarship and research, whose 'Renascent India' was published as late as April, 1976 and whose writings on the last volumes of the History of Bengal are still in progress, has been dubbed totally out of date, and has to be preserved in 'Cotton Wool' because he writes 'in profusion traditional blinkered history' ! Sri S. Gopal's approach to history may be different from Dr. Majumdar's, but what competence has he to judge a scholar whose books on history are a daily help to millions of students and thousands of teachers in India in Degree and Post-Degree disciplines ? Has Sri Gopal alternative authoritative books to offer them ? Write off the works of Dr. Majumdar, Prof. J. N. Sarkar, Dr. Sardesai and Dr. Kane, and consider what remains of Indian history. Can Sri Gopal even think of rewriting the works in the respective areas of these masters, helpful to teachers and students alike ? How can one explain the gimmicks of a person to whom unexceptionable facts of history are an anathema ? Whom is Sri S. Gopal kidding, if not himself ? Dr. Majumdar will survive in his works in spite of the modernists' attempts to bury him.

.....তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

নলীকুমার চক্রবর্তী

বন্ধুবর শ্রীসুনীল দাস এসে বললেন ঃ 'আমরা আমাদের সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পত্রিকার একটা "আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার নব্বইতম বৎসর পূর্তি সংখ্যা" বার করছি, আপনাকে কিছু লিখতে হবে।' একজন অ-লেখকের পক্ষে এটা যে কী কঠিন, প্রায় অসাধ্য কাজ বিনীতভাবে তা স্মরণ করিয়ে দিতেই বন্ধুবর আরো জোর করে চেপে ধরলেন, 'ভাষার জারিজুরি ত' আমরা চাইছিনে, ডঃ মজুমদারকে যারা নিবিড়ভাবে চিনেছেন তাদের সাহচর্যের স্মৃতিবিজড়িত দু একটি কথা লিখে দেওয়া মোটেই দুঃসাধ্য কাজ নয়, সুতরাং কোন ওজর আপত্তি চলবে না।' বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করতে পারলাম না। তাই অক্ষম লেখনীতে দু' একটি কথাই লিখছি।

তখন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক চলছে। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত চাটগাঁ কলেজের ছাত্র। প্রাক্-স্নাতক শ্রেণীতে ইতিহাস পড়েছিলাম চাটগাঁ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ আর. বি. র‍্যাম্‌স্‌বোথাম-এর নিকট। ১৯৩২ সালে চাটগাঁ কলেজ থেকেই স্নাতক হয়ে ভাবলাম ইতিহাসেই স্নাতকোত্তর উপাধি নেব। তখন বাংলাদেশে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়—কলকাতা ও ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার প্রফেসর ও ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তখনই শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের নাম প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন ডঃ এইচ্ সি রায় চৌধুরী। ভেবে দেখলাম ইতিহাস পড়তে হলে একজন বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের কাছে পড়াই ভাল। সুতরাং শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের পদাশ্রয় নিতে হবে।

মনস্থির করে তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অপূর্বকুমার চন্দের নিকট হতে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (যিনি ঢাকা হলের প্রভোস্ট ছিলেন) ও ডঃ মজুমদারের নামে দুটি চিঠি নিয়ে ঢাকা চলে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের সাথে দেখা করে তাঁর কাছে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ইতিহাস পড়বার অভিপ্রায় প্রকাশ করলাম। তিনি দু' একটি প্রশ্ন করেই আমাকে গ্রহণ করলেন। আমার মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন প্রতিভার চিহ্ন দেখতে পাননি যাতে দু একটি প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রত্বে গ্রহণ করা যায়। বুঝেছিলাম ওটা তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের একটা দিক। প্রকৃত শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে বিমুখ করেন না। মূঢ়জনকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চোখ ফুটিয়ে শিক্ষিত করে তোলাতেই শিক্ষকের গৌরব—এটা তিনি ভাল করেই জানতেন। প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যক্ষ চন্দের পরিচয়পত্র না পেলেও তিনি আমাকে তাঁর অন্তেবাসিত্বে স্থান দিতেন।

প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর সুমধুর ব্যবহার আমাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট ক'রল। প্রফেসর ডঃ মজুমদার জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। আমি ঢাকা হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। আমাদের সময় ঢাকা ও জগন্নাথ হলের মধ্যে বেশ একটু দ্বৈরথের ভাব ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে হল-জীবনের বিভিন্ন extra-academic কার্যকলাপের মধ্যে, যেমন ক্রীড়াক্ষেত্রে, নাট্যাভিনয়ে, সমাজসেবায়, হলের বার্ষিক সাহিত্যপত্র সম্পাদনায় কে কাকে ডিঙিগয়ে যাবে তা নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলত এবং হলের সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকবৃন্দ, মায় প্রভোস্ট পর্যন্ত, এই প্রতিদ্বন্দ্বের সামিল হয়ে কৌতুকামোদ উপভোগ করতেন।

তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ

আমি ঢাকা হলের আবাসিক ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয় আমাকে তাঁর স্নেহ, ভালবাসা ও বিদ্যা অকৃপণ হস্তে দান করেছিলেন।

পুরানো দিনের কত স্মৃতিই না মনে পড়ে। চলার পথে যখনই ছাত্রবন্ধুদের তরফে কোন অসুবিধায় পড়েছি তখনই ছুটে এসেছি আচার্য মজুমদারের নিকট। অসঙ্কোচে চেয়েছি তাঁর উপদেশ। সবসময়েই তিনি ঠিক পথ বাৎলে দিয়েছেন এবং সত্যি সত্যিই দেখা গিয়েছে তাঁর নির্দেশমত চলে সমস্ত অসুবিধার প্রতিবিধান হয়েছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩২ হতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ছিলাম। শেষের দিকে ডঃ মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

আমাদের মত অসাহিত্যিকের পক্ষে ভাবের প্রাচুর্য ভাষার অসংকুলান ঘটায়। আচার্য মজুমদারের সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের স্বল্পপরিসর সময়টুকুর মধ্যে এত খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত স্মৃতিজড়িত আছে যা লিখতে গেলে আমার ভাষায় কুলোবেনা এবং 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায়ও স্থান সংকুলান হবে না। সুতরাং সে চেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। শুধু এই প্রার্থনা করি তিনি শতং জীবতু। আমাদের উত্তরপুরুষরা ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের খ্যাতি কীর্তন করবেন আর মানুষ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে চেনাবে তখনকার পুরাতন 'জয়শ্রী'র এই বর্তমান সংখ্যাটি।

ইতিহাসের সাধক : আচার্য রমেশচন্দ্র

অমলেন্দু বসু

"বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি"—একথা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বলেছিলেন আজ থেকে একশো বছর পূর্বে। আত্মবিস্মরণের প্লানিপূর্ণ ধূসরতা এখন আর বাঙালীর গায়ে লেগে নেই, কারণ এই শতাব্দী কালের মধ্যে বাঙালীর ইতিহাস-চেতনা আশ্চর্যরকম সমৃদ্ধ ও দেদীপ্যমান হয়েছে। জনকয়েক মহামনীষীর ক্লান্তিহীন সত্যানুসন্ধানী গবেষণার ও ব্যাখ্যার ফলে আজ বাঙালী জনসাধারণ প্রশস্ত ইতিহাস-চেতনার উজ্জ্বল পথে এগিয়েছে। এই ইতিহাস-চেতনা প্রতিভাত হয়েছে বাঙালীর সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজকল্যাণ-কর্মে। আজকের বাঙালী আবৃত্তি করতে পারেন, "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।" আমাদের গল্পে উপন্যাসে নাটকে আমরা চলে গেছি প্রতাপাদিত্যের যুগে, তারও পূর্বে শিশোদীয় মহারাণা প্রতাপ সিংহের কালে, মহারাজ শশাঙ্কদেবের কালে, তারও পূর্বে হর্ষবর্ধনের, সমুদ্রগুপ্তের, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কালে, পরিব্রাজক ভিক্ষুদের কালে, ছায়াচ্ছন্ন বন-ভূমিতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত গুরু-শিষ্যের কালে। এই ইতিহাস-চেতনার উত্তাল প্রেরণায় ভারতীয় এক জাতিত্ব প্রতিষ্ঠার ও বিদেশীর শক্তিশালী কবল থেকে মুক্তিলাভ করার দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছে বাঙালী জাতীয় সংহতি। এবং এই ইতিহাস-চেতনায় আমাদের প্রতীতি জন্মেছে যে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ অবধি এক সুদীর্ঘ ক্রমবিচিত্র জাতীয় জীবনের ভাগ্যবান উত্তরাধিকারী আমরা। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব হলে তিনি বলতেন, বাঙালী তীব্রভাবে ঐতিহ্য-সচেতন জাতি।

এই ইতিহাস-চেতনা এবং ইতিহাস জ্ঞান যে সব নিরলস, মহামেধাবী জ্ঞান-ভাণ্ডারীদের পথ-নির্দেশে আমাদের আয়ত্তে এসেছে তাঁদের মধ্যে আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের গৌরবময় সুপ্রতিষ্ঠা চিরউজ্জ্বল। আমাদের ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে, জনকয়েক ইউরোপীয় মনীষীর গবেষণা থেকে। সেই গবেষণা ভারতীয় জীবন ও ঐতিহ্যের সব দিকেই প্রসারিত হয়েছিল : রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস ; ধর্ম, দর্শন, ভাষা, যাবতীয় শিল্প ; শিক্ষা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য—মানবজীবনের কোনো দিকই অবহেলিত হয়নি। সার উইলিয়ম জোন্স্, মনিয়ের-উইলিয়াম্স্, ম্যাক্স্ মুলার, গোল্ড্স্টুকার, ডয়সেন, সিল্ভ্যাঁ লেভি, বুলার, কোলব্রুক, বুর্নুফ, প্রিন্সেপ, ফার্গুসন—অল্প কয়েকটি নাম এখানে উল্লিখিত হল। সামগ্রিক ইতিহাসের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল জেম্স্ মিল্-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে, কিন্তু তখনই বোঝা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সুদীর্ঘকালব্যাপী, জটিল, কখনো প্রদীপ্ত, কখনো বা তমিস্রায় ও সংশয়ে আবৃত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে শুরু করে বাঙালী ঐতিহাসিক যখন স্বদেশীয় ইতিহাসের—বিশেষত বঙ্গদেশের ইতিহাসের—দিকে মন দিলেন তখন থেকে আধুনিক জ্ঞানচর্চার যে লক্ষণ—সেই specialization-এর, বিশেষীকৃত অধ্যয়নের প্রভাব দেখা দিল আমাদের ঐতিহাসিকদের মধ্যে। বাঙালী ইতিহাসবিদ্দের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজন জ্ঞানীর নাম সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও তাঁর জ্ঞান-তপস্যা শুরু করেছিলেন বিশেষীকৃত জ্ঞানচর্চার পথে, প্রাচীন ভারতেতিহাসের কয়েকটি বাছাই-করা দিকের আলোচনায়।

বিশেষীকৃত জ্ঞান যতই প্রশংসনীয় ও মূল্যবান হোক, এর উপরে যায় সর্বধাত্রী জ্ঞান। ষোল শতকে ইংলণ্ডের ফ্রান্সিস্ বেকন্ বলেছিলেন ঃ I have taken all knowledge for my province। সেই সর্বানুসন্ধানী জ্ঞান, যাকে ইউরোপীয় চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি এন্সাইক্লোপিডিক জ্ঞান, কেবল সহস্র তথ্যের মধ্যেই নিয়োজিত থাকে না, সেই সহস্র তথ্যগুলিকে সমন্বিত করে। এই সমন্বয়ী শক্তি—যাকে বলে Syncretism—না থাকলে শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ্ হওয়া যায় না। ইতিহাস তো অগণিত ঘটনার পুঞ্জ। সে সব ঘটনাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখলে তাদের পুঞ্জত্ব, তাদের সামগ্রিক শক্তি আমরা কখনোই সমুচিতরূপে বুঝতে পারি না।

এই Syncretism আচার্য রমেশচন্দ্রের জ্ঞান-তপস্যার উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ইতিহাসের যে যে ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত অধ্যয়ন করেছেন, সে সব ক্ষেত্রে তিনি অনন্য এবং তাঁর অনন্যতা আজ অবধি বিচলিত হয়নি, কোনো কালে যদি হয়ও (সব মানবিক জ্ঞানই কালক্রমে অল্পবিস্তর বিচলিত হয়) তা হলেও গুরুতর রকমে হবে কিনা সন্দেহ। আচার্য রমেশচন্দ্র কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূর্বে যাবতীয় তথ্যগুলিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পন্থায় বিশ্লেষণ ও বিচার করে নেন। আচার্যের specialised, অর্থাৎ বিশেষীকৃত ইতিহাস-জ্ঞান বহু-সংখ্যক কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর যাবতীয় 'তথ্যগুলিকে তিনি একটি সমন্বয়ী সূত্রে গ্রথিত করে ইতিহাসভুক্ত ঘটনাবলীকে একটি বিশাল প্রবাহের রূপ দিয়েছেন। এই সমন্বয়ী জ্ঞান ইতিহাস-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। এই সমন্বয়ী জ্ঞান ছিল গিবনের, এই সমন্বয়ী জ্ঞান আর্নল্ড টয়ন্বির। আমাদের দেশে বেশ কিছু সংখ্যক মেধাবী, প্রজ্ঞাশীল, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ্ জন্মেছেন, আজও কর্মনিরত আছেন, কিন্তু আমার বিনীত বিচারে আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো একই কালে ইতিহাসের বিশেষাত্মক রূপ ও সমন্বয়ী রূপ, বাস্তব রূপ ও পরাবাস্তব রূপ, দেখার ও অপরকে দেখাবার শক্তি অন্য কোনো ভারতীয় ইতিহাসবিদের মধ্যে অতীতে দেখা যায়নি, আজও দেখা যাচ্ছেনা। আচার্য রমেশচন্দ্র ভারতের টয়ন্বি। তাঁর সঙ্গে টয়ন্বির প্রভেদ দ্বিবিধ ঃ টয়ন্বির ইতিহাস-দৃষ্টিতে বিধৃত হয়েছে বিশাল বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি জাতি। রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি সংহত থেকেছে প্রধানত ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশের প্রতিটি ঘটনায়, প্রতি যুগে, প্রতি অধিবাসী-গোষ্ঠীতে। দ্বিতীয়ত, টয়ন্বির ইতিহাস-জ্ঞান কিছু দার্শনিক-তত্ত্বের ছন্দে উদ্বেলিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দার্শনিকতায় মুগ্ধ হননি, কেননা ইতিহাসের দার্শনিক-বোধ হেগেলধর্মী (অর্থাৎ, মূলতঃ মার্কস্ধর্মী) হতে পারে, অথবা মূলতঃ বোয়েম্-সুইডেন্বর্গ-পন্থী হতেও পারে এবং এই দ্বিবিধ (বহুবিধ হতেও কোনো তাত্ত্বিক বাধা দেখছিনা) দার্শনিক সম্ভাবনায়, অর্থাৎ ইতিহাসের কি কোনো অরোধ্য গতিপ্রকৃতি আছে না, কি ইতিহাস খামখেয়ালি ? আচার্য রমেশচন্দ্র বরাবর তথ্যের সন্ধান করেছেন, এমন নয় যে কোনো দার্শনিক তত্ত্বে নিজেকে বেঁধে রেখে তারপরে সেই তত্ত্বের নিরিখে তথ্যের মূল্যায়ন করেছেন (যেমন করেছেন ধর্মনৈতিক অথবা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ)। তাঁর ইতিহাসে তথ্যপ্রাধান্য কিন্তু কোনোক্রমেই নিষ্প্রাণ, অন্তঃসারহীন নয়, বরং স্বতস্ফূর্ত কিছু সিদ্ধান্তের অনুকূল।

আচার্য রমেশচন্দ্রের এই ব্যাপক সমন্বয়ী ইতিহাস-চেতনা প্রথমে দেখা গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তিন খণ্ডে বিস্তৃত বঙ্গের ইতিহাসে। এই ইতিহাসের পরিকল্পনাটি ছিল আচার্য রমেশচন্দ্রের। স্বাধীনতার পরে যখন নেহরু-সরকার ভারতের Freedom Movement-এর ইতিহাস রচনার জন্য রমেশচন্দ্রকে সম্পাদনাভার গ্রহণে আহ্বান করলেন, তখন সেই সরকারই

আচার্যের মৌলিক চিন্তাগুলি মানলেন না, তাঁদের ইতিহাস-চিন্তা ছিল নিতান্তই একদেশদর্শী, এবং ফলে আচার্য সেই কর্মত্যাগ করলেন।

কিন্তু এরপরে তিনি ভারতীয় বিদ্যাভবনের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষীয় ইতিহাস-গ্রন্থমালা সম্পাদনার যে গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হলেন, সে-রকম কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মেধা, সৃজনী দৃষ্টি এবং নেতৃত্বশক্তি সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র রমেশচন্দ্র মজুমদারেরই আছে এবং সে-দায়িত্ব তিনি যে নিষ্ঠা ও নিপুণতা দিয়ে সম্পন্ন করেছেন তা' অতুলনীয়। এই এন্‌সাইক্লোপিডিক, সিন্‌থেটিক জ্ঞান ও দৃষ্টি অতঃপর প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থ কয়টিতে। রমেশচন্দ্র কর্মজীবনে হয়েছিলেন উচ্চাসীন অ্যাড্‌মিনস্ট্রেটার, এই আসনের দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন অতীব দক্ষতা দিয়ে, নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভা দিয়ে। সেই নেতৃত্ব-প্রতিভা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল বিদ্যাভবন-প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। অনেক স্বল্প-পরিসরে, জ্ঞানজগতের অন্য অঞ্চলেও এই নেতৃত্ব-প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে, যেমন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব্ কালচার-প্রকাশিত "চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ"-শীর্ষক গ্রন্থে, যেখানে বহুসংখ্যক লেখক প্রস্তাবিত বিষয়টির বিবিধ প্রত্যন্তের আলোচনা করেছেন।

দশকের পরে দশক পেরিয়ে যায়, সময় তো বহতা নদী। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের কর্মপ্রবৃত্তি ও কর্মশক্তি আজো অক্ষুণ্ণ আছে। বরঞ্চ আমা হেন ক্ষুদ্র মুগ্ধ ভক্তের দৃষ্টিতে যেন আচার্যের কর্মশক্তির উজ্জ্বলতম এবং (বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে দেখলে) কঠিনতম দৃষ্টান্ত তাঁর চারখণ্ডে বিভক্ত "বাংলাদেশের ইতিহাস।" এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সনে, এর চতুর্থ ও শেষ খণ্ড ("আধুনিক যুগ, মুক্তি সংগ্রাম") প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সনে। আচার্যের মতো মহাপণ্ডিত নিরলস জ্ঞানীর সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতিতেও যে কাজ সম্পন্ন করতে ত্রিশটি বৎসর লাগল, যে-কাজের সবটাই তিনি স্বয়ং করেছেন (এর ব্যতিক্রম "মধ্যযুগ" শীর্ষক দ্বিতীয় খণ্ডে যেখানে আরো তিনজন বয়োকনিষ্ঠ গবেষক কয়েকটি বিষয়ে অধ্যায় রচনা করে আচার্যের সহায়তা করেছেন), সে কাজ যে কত গভীর ও ব্যাপক, কত বহুমুখী তার তত্ত্ব, তথ্য, সমস্যা, সে কথা প্রণিধান করা কঠিন নয়। যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে এই গ্রন্থগুলি আমি কয়েকবারই পড়েছি, কোনো কোনো অংশ বারংবার পড়েছি, এবং প্রতিটি অধ্যয়নের পরে মনে হয়েছে, আমি যেন আমার বাংলাদেশকে আবার ভালো করে চিনলাম, আমার বাঙালী ঐতিহ্য সম্বন্ধে আবার সচেতন হলাম। কবি বলেছিলেন ঃ—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ক্ষণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—

সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

(জীবনানন্দ দাস, "রূপসী বাংলা," ২)

কবির অনুভূতির জগৎ বিস্তীর্ণ বিধৃত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আচার্য রমেশচন্দ্রের সুসংগৃহীত সুবিন্যস্ত তথ্য সম্ভারে। ইতিহাসবিদের অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে সত্য, সেই সত্যই শিল্পের প্রাণসত্তা। হেরোডোটাস্ ও ট্যাসিটাস্ না থাকলে গ্রীক রোমান সাহিত্যের অনেক অংশ ম্লান হয়ে যেত। গিবনের ইতিহাস সম্ভব করেছে উনিশ শতাকী জার্মান ক্লাসিসিজ্‌ম্। টড্ সাহেবের রাজস্থানী কাহিনী বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক ও কাব্যের উৎস। রমেশচন্দ্রের এই চারখণ্ডী ইতিহাস, বিশেষত সর্বশেষ খণ্ড (আধুনিক যুগ—মুক্তিসংগ্রাম) ভবিষ্যৎ সাহিত্য স্রষ্টার আকর গ্রন্থ হয়ে রইল।

রমেশচন্দ্র বাংলাকে ভালোবেসেছেন কবিপ্রাণ নিয়ে, সেই ভালোবাসাকে দৃঢ় মনঃশক্তিতে রূপায়িত করেছেন জ্ঞান-তপস্যা দিয়ে। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আজ নবতিবর্ষ বয়স্ক, তবুও যতদিন বাঙালী ও বাংলাদেশ থাকবে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সমাজবোধ থাকবে, বাঙালীর ইতিহাস-চেতনা থাকবে, ততদিন আচার্য-প্রণীত বাংলাদেশের ইতিহাস থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আচার্যদেব থাকবেন।

আচার্যদেব থাকবেন। থাকবেন রাজনৈতিক দলগত সংকীর্ণতা সত্ত্বেও। স্বাধীনতার পরে থেকে ভারত-সরকার কতকগুলি কী যেন সব শিরোপা সৃষ্টি করেছেন, সরকারী খেতাব, পদ্মশ্রী থেকে ভারতরত্ন। কেউ কোনোদিন নাম শোনেনি এমন সব লোকেদের খেতাব দেওয়া হল, মায় ভারতরত্ন। আচার্য রমেশচন্দ্রের কথা সরকারের চিন্তায় এলোনা। তাতে আচার্যের কিছু যায় আসেনি, খেতাবটাই মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারলনা। সরকার জাতীয় অধ্যাপক বলে একটি পদ সৃষ্টি করলেন। আচার্যের কথা সরকারের চিন্তায় এলোনা। স্বাধীনতার পরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত রচনার জন্য আচার্যকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হল, কিন্তু যেহেতু আচার্যের বিশ্বাস যে এই ইতিবৃত্তে কেবল অহিংস আন্দোলনকারীদের কথাই থাকবে না, দেশের সর্বত্র যে সব সশস্ত্র সংঘ লড়াই করেছে প্রাণ দিয়েছে তাদের কথাও থাকবে, সুভাষচন্দ্রের সামরিক প্রয়াসের কথাও থাকবে, সরকার আচার্যের এই বিশ্বাসের অনুমোদন করলেন না, তিনি সেই কমিটি ছেড়ে চলে এলেন। চলে এসে কে এম্ মুন্সীর অনুরোধে ভারতীয় বিদ্যাভবন-প্রকাশিত মহার্ঘ বহুখণ্ডী ইতিহাসের সম্পাদনা করলেন, স্বয়ং বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করলেন। অন্য রাজনীতিপন্থীদেরও প্রীতিভাজন নন ডক্টর মজুমদার। তাঁর ইতিহাস চিন্তায় তথ্য হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ, তার পরে হচ্ছে তত্ত্ব। কিছু রাজনীতিপন্থী, কিছু ধর্মমন্দিরপন্থী এমন আছেন যাঁরা সর্বাগ্রে পরমুখনিঃসৃত, আপন অভিজ্ঞতাবর্জিত তত্ত্বের সাযুজ্যে ইতিহাস রচনা করেন ; তাঁরা ডক্টর মজুমদারের প্রশংসায় বিমুখ এবং এরা রাজনীতির আসর গরম রাখতে জানেন।

এসব রাজনৈতিক অসূয়ায় আচার্যের মর্যাদা হানি হয় না। আমাদের দেশের লোক gullible নয়, তাদের সাধারণ কিন্তু শুভ্র দৃষ্টির সামনে ধাপ্পার কুয়াশা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আচার্যের ব্যক্তি

অমলিন থাকছেই। এই অমলিনতার প্রধান কারণগুলির মধ্যে যেমন আছে তাঁর নিয়ত-নিযুক্ত তথ্যনিষ্ঠা, তথ্যের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় অর্থাৎ তথ্যের ভিত্তিতে যে দার্শনিক নীতি অথবা নীতির অভাব জ্ঞানীব্যক্তির লক্ষ্যসাধ্য হয়, সেই দার্শনিক বিচার শক্তি, এসবের সঙ্গে তেমনই জড়িয়ে আছে আচার্যের মানবিক সংবেদনা এবং দৃঢ় দেশপ্রেম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকালীন অধ্যাপকদের অনেকেই দেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় ভাস্বর ছিলেন। এই ভাস্বরতা আচার্য রমেশচন্দ্রের মধ্যে ছিল বলেই স্বর্গতা লীলা রায়কে (তখন আমরা লীলা নাগ বলে জানতাম) স্নেহ করতেন, নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এই অকুতোভয় দেশপ্রেম থেকে যে আরো কত ছাত্র সাহায্য পেয়েছে বোধ হয় তার একটা নিরিখের প্রয়োজন হয়েছে কেননা এই নিরিখ থেকে প্রমাণ হবে যে পরবর্তী যুগের রাজনীতি-বিশারদ ইতিহাসবিদের তুলনায় আচার্য রমেশচন্দ্রের দেশপ্রেম কত নির্মল, কত নিয়ত-অকুণ্ঠ, কত দুঃসাহসী, কত মানবিক। এক জন নয় দু' জন নয়, বহু বিপ্লবী ছাত্র পুলিশের ব্যূহ এড়িয়ে আচার্য রমেশচন্দ্রের আবাসে প্রবেশ করেছে, সেখানে আচার্যের ও আচার্য-গৃহিণীর (তিনি আজ স্বর্গে) যত্নে তারা গোপন আশ্রয় পেয়েছে। আচার্য রমেশচন্দ্রের অনবশেষ হৃদয়বত্তা অবশ্য জীবনের মাত্র দুই একটি দিকেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছাত্রদের মধ্যে কত যে খেলোয়াড়, কত যে অভিনেতা, কত যে সুবক্তা, কত যে সমাজ-কর্মী, কত যে সাহিত্যিক তাঁর কাছে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছে সার ইয়ত্তা নেই। আমার বন্ধু স্বর্গত বুদ্ধদেব বসু যখন বিয়ে করে, তার কাছে টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু ছিলনা, আচার্য রমেশচন্দ্র তাকে সাহায্য করেন। এই যেমন আচার্যের মানবিকতার একটি অধ্যায়, অন্য অধ্যায়ে পাই সে যুগের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতায়। ঢাকাবাসী সর্বভারতীয় বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের সঙ্গে আচার্যের আন্তরিক ও আদর্শিক সম্পর্ক ছিল। বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলির ভাই ডক্টর ধীরেন গাঙ্গুলিকে আচার্য নিজ ইতিহাস-বিভাগে রীডার নিযুক্ত করেছিলেন। আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, দুর্ধর্ষতম এবং দুর্বারতম স্বাধীনতা-সংগ্রামী—যাঁর সংগ্রাম তৎকালীন সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চালিত হয়েছিল—সেই সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আচার্যের নিকট সম্পর্ক ছিল। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পরে আজ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কেটে গেছে, আজও এদেশে এমন রাজনৈতিক দল আছে যারা সুভাষচন্দ্রের দেশাত্মিক কর্মভূমিকার দিকে বক্রদৃষ্ঠিতে তাকান, ইতিহাসবিদ্‌গণ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নির্বাক অথবা সীমিত-বাক থাকেন। কিন্তু আমাদের পূজনীয় আচার্য তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থের 'মুক্তি সংগ্রাম' খণ্ডে সুভাষচন্দ্রের দেশকর্মের আলোচনা করেছেন সমসাময়িক সর্বভারতীয় ইতিহাসের এবং সর্বজাগতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। সন্দেহ নেই যে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। অদূর ভবিষ্যতে তেমন আলোচনা অবশ্যই হবে। ইতিমধ্যে এই নবতিবর্ষবয়স্ক দেশপ্রেমী ইতিহাসবিদ্ আচার্য রমেশচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের তাৎপর্য সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল রেখাচিত্র এঁকেছেন সেজন্য ভারতবাসী তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

সরকার আসে সরকার যায়। আজকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আগামী দিনের জড়ত্ব। স্থায়ী থাকে মনুষ্যত্ব, হৃদয়বত্তা, জ্ঞান, মনীষা। সর্বরকমে যিনি মানবতাবাদী, যিনি অপার মনীষা ও জ্ঞানসমৃদ্ধ সেই আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে প্রণতি জানিয়ে আমরাই ধন্য হই। গুরুদেব, আপনি শতায়ু হোন।

নমঃ শ্রীরমেশচন্দ্রায়

দীনেশচন্দ্র সরকার

আমি রমেশচন্দ্রের ছাত্র ছিলাম না। কারণ ১৯২৯ সালে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হবার বহুকাল আগেই তিনি ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন ছাত্রের চেয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি কম, একথা আমি স্বীকার করব না। তাই রমেশচন্দ্রের নবতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে 'জয়শ্রী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত উল্লসিত। ঐ সংখ্যায় আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করে পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমার অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

রমেশচন্দ্র আমাদের এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। ছাত্রবন্ধুদের কাছে শুনতাম, তিনি নাকি বড়ই কড়া পরীক্ষক, পরীক্ষার্থীদের অত্যন্ত কম নম্বর দেন। অবশ্য আমার তাতে বিশেষ অসুবিধা হয়েছে বলে মনে করি নি।

এম. এ. পাশ করার পর কয়েক বছরের মধ্যে রমেশচন্দ্রের একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হ'লাম। ১৯৩৫ সালের সূচনায় The Successors of the Satavahanas in the Lower Deccan সংজ্ঞক আমার একখানি ১২৬ পৃষ্ঠার ছোট্ট বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters পত্রিকার ২৬শ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সেদিনের যে-সকল পণ্ডিতের মধ্যে আমি বইখানি বিতরণ করি, তাঁদের একজন ছিলেন রমেশচন্দ্র। আশ্চর্যের বিষয়, বইটি পেয়েই তিনি পড়ে ফেলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে জানান, "You have advanced our knowledge of the subject much further." আমার গবেষক জীবনের প্রারম্ভে তাঁর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকের এই প্রশংসাবাণী আমাকে যে কতটা উৎসাহিত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনৈক অখ্যাত নবীন লেখকের গবেষণামূলক রচনা পাঠ ক'রে তার গুণাগুণ বিচার করলেন। এই ব্যাপারটি ক্রমে আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুললো। কারণ আমাদের পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জনৈক বাঙালী পণ্ডিত আমার বইটি পেয়ে আমাকে কিছুই লেখেননি। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দেখেছিলাম, Epigraphia Indica পত্রিকায় কোন কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি বইটির মতামত সমর্থন করেছেন। আবার একজন বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত বইটি পেয়ে আমাকে লিখেছিলেন তার বেশ কিছুকাল পরে। এবিষয়ে বিদেশীয় পণ্ডিতগণের কাছে বরং ভাল ব্যবহার পাওয়া গিয়েছিল।

যাহ'ক, আমার বইখানি রমেশচন্দ্রের পড়া থাকায় আর একদিক থেকে আমার কিছু লাভ হয়েছিল। ঐ সময়ের প্রেমচন্দ রায়চন্দ বৃত্তিপ্রার্থীদের মধ্যে একজন প্রার্থীর পরীক্ষক ছিলেন রমেশচন্দ্র। কিন্তু আমার পরীক্ষক না থেকেও তিনি আমাকে বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। আবার অল্পকাল পরে তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন, তখন তিনি এম. এ. ক্লাশে যে-সকল শিলালেখ ও তাম্রশাসন পড়াতেন সেগুলি আমি পড়াতে পারব কিনা, জানার জন্য আমাকে ডেকেছিলেন। অবশ্য নানা কারণে আমাকে ঢাকায় নেওয়া সম্ভব হয় নি।

উপরে রমেশচন্দ্রের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রেছি এবং যার জন্য তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমে

গভীর থেকে গভীরতর হয়, আসলে সেটা তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়, সুতীক্ষ্ণ মেধা, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এবং অধ্যয়নের গভীরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেখানে যা কিছু গবেষণার ফল প্রকাশিত হ'ত, তিনি অবিলম্বে তার সব পড়ে ফেলতেন এবং সমস্তই তাঁর নখদর্পণে থাকত। এই গুণই তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারত-বিদ্যাবিদ্ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। এটা যে কত বড় গুণ, তা Vincent. A. Smith নামক বরেণ্য ভারত-বিদ্যাবেত্তার ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পারসী প্রভৃতি কোন ভাষাতেই Smith সাহেবের গভীর জ্ঞান ছিলনা। কিন্তু তা সত্বেও তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, অশোকের অনুশাসন, বিভিন্ন যুগের ভারতীয় মুদ্রা, সম্রাট আকবর, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখে ঐতিহাসিক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি এবং অধ্যবসায় ব্যতীত এইরূপ সাফল্য সম্ভব ছিলনা। তাঁর অধ্যয়নের পরিধি এত বিরাট্ ছিল যে, তাঁর রচনায় ভাষাজ্ঞানের অগভীরতাজনিত ত্রুটি প্রায় নজরেই পড়ে না।

আমাদের শ্রমবিমুখ দেশে যদুনাথ, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি দুচারটি ব্যতিক্রম। আমরা প্রায় দেখতে পাই, একব্যক্তি একখানি গবেষণাগ্রন্থ লিখে Doctorate Degree পেলেন ; ফলে একটা চাকুরীও হয়ত জুটে গেল। কিন্তু তার পরে সারা জীবনে তিনি আর বিশেষ কিছু লিখলেন না। এদিকে রমেশচন্দ্র সমস্ত জীবন ধরে নিরলসভাবে বাণীর আরাধনা ক'রেছেন এবং এই অতিবৃদ্ধ বয়সেও তা থেকে নিবৃত্ত হন নি। এই গুণ আমাদের শিক্ষক এবং ছাত্রগণের অনুকরণীয়।

রমেশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় এবং অধ্যয়নক্ষেত্রের প্রসারের জন্যই তিনি নানা বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হ'য়েছেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিধি বিশাল। তাই তিনি প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন ভারতীয় শিলালেখ ও তাম্রশাসন, এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার, প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর গবেষণামূলক বহু রচনা প্রকাশ করতে পেরেছেন। বাণীর একাগ্র সাধক ব্যতীত কারও পক্ষে এমন বিরাট কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে করা সম্ভব হয় না।

আর একটি বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতা দেখতে পাই। ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পণ্ডিতের রচনায় সমৃদ্ধ Cambride History of India প্রসিদ্ধগ্রন্থ। ভারতবর্ষে প্রকাশিত ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে রমেশচন্দ্রের সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত History of Bengal, Vol. I, কেবল যে সর্বপ্রথম তাই নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ। পরে এই ধরণের আরও কতকগুলি গ্রন্থ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে ; তার মধ্যেও রমেশচন্দ্র সম্পাদিত এবং বোম্বাই ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক নানা খণ্ডে প্রকাশিত History and Culture of the Indian People সর্বোত্তম। আসল কথা এই যে, এই ধরণের গ্রন্থ যথাসম্ভব ত্রুটিহীনভাবে প্রকাশ করা সম্পাদকের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় ব্যতীত সম্ভব হয় না। আর আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজে এই দুটি গুণেরই অত্যন্ত অভাব। তাই মহাপ্রাজ্ঞ রমেশচন্দ্রের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, অন্যের পক্ষে তা সহজ হয়নি।

রমেশচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বোধ হয় আমার পক্ষেই বলা সম্ভব। ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের জন্য আমাকে অনেক সময় নানা পণ্ডিতের সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হ'তে হ'য়েছে। রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার বিতর্কের সংখ্যা অনেক। ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে পরমত-অসহিষ্ণুতা এত বেশী যে, কেউ কেউ মতদ্বৈধের জন্য আমাকে তাঁদের শত্রু মনে ক'রেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র বরাবর বুঝেছেন যে বিতর্কের ব্যাপারে আমার উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়, তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়। তাই তাঁর স্নেহ থেকে আমি কোনদিনই বঞ্চিত হইনি।

নমঃ শ্রীরমেশচন্দ্রায়

রমেশচন্দ্রের সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। তা নাহ'লে তিনি শীর্ষস্থানীয় গবেষকের মর্যাদা পেতেন না। তাঁর রচনায় যে নিজের পূর্বপ্রকাশিত মতামতের প্রতি মমত্ববোধসূচক মানবিক দুর্বলতা একেবারে দেখা যায় নি, তা নয়। যেমন ২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কণিষ্কের রাজ্যারম্ভ, ধর্মপাল কর্তৃক পরাজিত ইন্দ্ররাজ দক্ষিণ গুজরাতের রাষ্ট্রকূট শাসক, বিক্রমসংবৎ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য নামক নরপতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির সংখ্যা এত কম এবং রমেশচন্দ্রের বিচারবুদ্ধির প্রখরতার পরিচয় এত বেশী যে, আমাদের পক্ষে ওগুলিকে বড় ক'রে দেখা অসম্ভব।

পরিশেষে আর একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারের উল্লেখ ক'রে রমেশচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন শেষ করব। ১৯৪৭ সালে আমি যখন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রত্নলেখবিদ্যাশাখার জন্য নির্বাচিত হই, তখন নির্বাচকমণ্ডলীতে রমেশচন্দ্র ছিলেন প্রার্থীদের ঐতিহাসিক জ্ঞানপরীক্ষার ব্যাপারে প্রশ্নকারক। প্রথমে স্বর্গীয় নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে কতকগুলি প্রাচীন লেখ পড়তে দিলেন। তারপর রমেশচন্দ্রের পালা। তিনি আমাকে বললেন, "I shall ask you a question which you may consider to be of the Matriculation standand. Since, however, I have put it to the other candidates, I am putting the same to you." এই ভূমিকার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে অতবড় হিন্দু সাম্রাজ্যের পত্তন আরও সম্ভব হ'য়েছিল কিনা। ঐরূপ ভূমিকা করার কারণ অবশ্য এই যে, তার পূর্বেই আমি তাঁকে তাঁর History and Culture of the Indian People-এর নির্ধারিত বহুসংখ্যক অধ্যায় লিখে দিয়েছিলাম, এবং তিনি জানতেন যে, হেমচন্দ্র রায় মহাশয় কলম্বো চ'লে যাওয়ায় এবং হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় অসুস্থ থাকায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে রাজনৈতিক ইতিহাসের বেশীর ভাগ ক্লাশ তখন আমি নিচ্ছিলাম। সে যাই হ'ক, নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণের সামনে আমার পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রশংসাসূচক ইঙ্গিত করাতে আমি নিজেকে পুরস্কৃত বোধ ক'রেছিলাম।

আজ রমেশচন্দ্রের নবতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হ'ন। আজকাল দেশে বিদ্যাচর্চার যে দুর্দশা দেখতে পাচ্ছি, তাতে তাঁর মত কোন পণ্ডিতের উদ্ভব সম্ভব হবে ব'লে আশা করা কঠিন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

ড. মজুমদারকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪২ সালে। আমি তখন দেওঘর রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যাপীঠের কর্মী। ড. মজুমদারকে আমরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি বিদ্যাপীঠের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করার জন্যে। ড. মজুমদার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আমাদের আমন্ত্রণে যে তিনি আসবেন, তা আমরা অনেকে আশা করি নি। কিন্তু তিনি আসেন, এবং যতদূর মনে পড়ে নিজের খরচেই আসেন। অর্থাৎ যাতায়াতের খরচ বিদ্যাপীঠ থেকে নেন নি। এর পিছনে দুটি কারণ বিদ্যমান ছিল ঃ প্রথম, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-এর আদর্শের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ; দ্বিতীয়, তাঁর ছাত্র, বিদ্যাপীঠের তখনকার শিক্ষক এবং পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ সেনের প্রতি স্নেহ-আকর্ষণ।

ড. মজুমদারকে পেয়ে কয়েকটা দিন তখন আমাদের খুব আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে কেটে যায়। ড. মজুমদার অনেক রকমের গল্প বলতেন, আমরা সাগ্রহে তা শুনতাম। পথে আসতে তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা ড. মজুমদার বলেছিলেন মনে পড়ে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যসামন্ত তখন ভারতের সর্বত্র। তাদের হাতে ভারতের সাধারণ নাগরিক কত জায়গায় কতভাবে নিগৃহীত হ'তো, তার কাহিনী সংবাদপত্রে বেশী না বেরোলেও লোকমুখে প্রচুর শুনতে পাওয়া যেতো। একবার পাটনা রেল ষ্টেশনে এক কাণ্ড ঘটে গেল পাটনা ডিভিসনের কমিশনারকে নিয়ে। তিনি ভারতীয়, তিনি কোথায় যেন যাচ্ছেন সরকারী কাজে, তাঁর জন্যে যে নির্দিষ্ট আসন, তাতে তিনি বসে আছেন। এ-সময় একদল ইংরেজ সেনা সেখানে এসে উপস্থিত, তারা ঐ কামরায় যাবে। তারা দেখলো তাদের কামরায় একজন ভারতীয়। এ তাদের কাছে অসহনীয়। তারা দাবী করলো তাঁকে অবিলম্বে ঐ কামরা ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। তিনি অস্বীকার করলে তাঁকে জোর করে তারা ট্রেন থেকে নামিয়ে দিল, আর তাঁর জিনিষপত্র প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ট্রেন তখন ছাড়ো-ছাড়ো। কমিশনার সাহেব ষ্টেশনমাষ্টার ও গার্ডকে সব বললেন, তাঁরা ট্রেন থামিয়ে ঐ ইংরেজ সেনাদের অনেক অনুনয়-বিনয় করে বোঝালেন, কিন্তু ফল হ'লো না। তখন মিলিটারী পুলিশ ডাকিয়ে এনে তাদের ঐ কামরা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হলো। বহুক্ষণ ট্রেন আটকানো থাকলো, বহুলোকের অসুবিধা হ'লো, আর কমিশনার সাহেব শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'লেও যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলেন। এই ছিল তখনকার অবস্থা। ড. মজুমদার অনুরূপ অবস্থায় পড়তে পারতেন, কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়ে কি-ভাবে রক্ষা পেলেন, তার গল্প আমাদের কাছে করেছিলেন। ট্রেনে তিনি যখন দেওঘরে আসছিলেন, তখন তাঁর সহযাত্রীরা প্রথমে ভারতীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁরা নেমে যেতে কয়েকজন ইংরেজ সেনা তাঁর কামরায় ঢুকলেন। তাঁদের ভাবগতিক ড. মজুমদারের ভালো লাগলো না। পাছে তাঁর প্রতি তারা দুর্ব্যবহার করে, তাই তিনি এক উপায় ঠাওরালেন। যুদ্ধকালীন ব্যবস্থানুসারে তাঁরও এক সামরিক পদবী ছিল। তিনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তাই তাঁর পদবী ছিল, যতদূর মনে পড়ে, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল। অর্থাৎ তাঁর সহযাত্রী ইংরেজ সেনাদের চেয়ে অনেক উপরে। ড. মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পদবী অনুযায়ী সামরিক

পোষাকও ছিল। তিনি বাথরুমে গিয়ে সেই পোষাক পরে ফেললেন। সেই পোষাকে তিনি যখন নিজের আসনে ফিরে এলেন, তখন সঙ্গে-সঙ্গে ঐ ইংরেজ সৈন্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় তাঁকে অভিবাদন করলেন।

ড. মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালীন ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান, তখন তিনি ড. মজুমদারের অনুরোধে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন তাঁর যে-সব আলাপ-আলোচনা হ'তো, তাঁর টুকরো-টুকরো, অথবা রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস, রুচি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ যে-জ্ঞান, তার খানিকটা কথাচ্ছলে আমাদের কাছে পরিবেশন করে আমাদের তিনি প্রচুর আনন্দ দিতেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে যে একদা অতিথি হিসেবে পেয়েছিলেন, তাতে যে তিনি গর্বিত, তা ড. মজুমদারের বর্ণনাভঙ্গীতে বেশ বুঝতে পারা যেতো।

ড. মজুমদার বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে যাবেন ইচ্ছা প্রকাশ করায় একদিন তাঁকে নিয়ে আমরা সদলবলে মন্দিরে যাই। এর আগেই তিনি মন্দিরের ইতিহাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। আমরা দেওঘরে থেকেও সেই ইতিহাস জানতাম না। বস্তুতঃ মন্দিরের যাঁরা পরিচালক তাঁরাও জানতেন না। এই প্রসঙ্গে ড. মজুমদার একটা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঐ শ্লোকটী মন্দিরের গায়ে কোথাও খোদাই করা আছে আমরা দেখেছি কিনা। আমরা দেখিনি বলায় তিনি বলেন : "নিশ্চয়ই আছে, খুঁজে দেখতে হবে।" তাঁকে নিয়ে মন্দিরে গেলে পূজাদির পর তিনি এই শ্লোকটি আবিষ্কার করেন। শ্লোকটি মন্দিরের প্রবেশদ্বারে খোদাই করা আছে, সহজে কারো নজরে পড়ে না। যতদূর মনে পড়ে, শ্লোকটি কোন্ রাজার দ্বারা কোন্ সময়ে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, সেই সম্পর্কে।

ড. মজুমদার যখন দেওঘরে আসেন, তখন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছিলেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশপ্রেমিক, বহুবার কারাগারে নির্যাতন সহ্য করেছেন। অন্যদিকে আবার ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করতেন, তখন ড. মজুমদার তাঁর ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হতেই ড. মজুমদার নত হয়ে তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন, দেখলাম। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁকে স্নেহভরে নানারকম প্রশ্ন করলেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেও আপ্যায়িত করেছিলেন।

ড. মজুমদার যখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন রামকৃষ্ণমঠ মিশনের কয়েকজন প্রাচীন সন্ন্যাসী তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁদের ছাত্র-জীবনের অনেক গল্প আমরা ড. মজুমদারের কাছে শুনতাম। এইসব সহপাঠিদের অন্যতম ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ। স্বামী মাধবানন্দ দীর্ঘদিন মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে অধ্যক্ষও হন। স্বামী মাধবানন্দ সমসাময়িক ছাত্রদের মধ্যে তাঁর মেধার জন্যে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন।

ড. মজুমদারকে পরে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি ও জেনেছি। কোন-কোন কমিটিতে একসঙ্গে কাজও করেছি। তিনি সভাপতি বা সহ-সভাপতি, আমি সাধারণ সদস্য। বর্তমানে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট-অব-কালচারের সহ-সভাপতি, আমি সম্পাদক। এ-সুবাদে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ অনেক পেয়েছি। অনেক সময় তাঁর কাছে এমন অনুরোধ করেছি যা প্রায় অত্যাচারের সামিল। অন্য কেউ হলে বিরক্তির সঙ্গে সে-সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করতেন। ড. মজুমদার কিন্তু তা করেন নি। আমার প্রতি স্নেহ তার একটা গৌণ কারণ হতে পারে, কিন্তু মুখ্য কারণ বোধহয় এই যে তিনি বুঝেছেন যে আমার অনুরোধ রক্ষা করলে তিনি একটা সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে

সাহায্য করবেন। উদাহরণ স্বরূপ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' বইতে তাঁর লেখা দেওয়ার কথা বলা যেতে পারে। খুব দ্বিধা ও সংকোচ নিয়ে তাঁকে অনুরোধ করি এই বইতে একটা লেখা দিতে। ভেবেছিলাম, তিনি বলবেন : 'পারবো না'। কিন্তু তিনি যখন বুঝলেন বিবেকানন্দ-বিচারের একটা সুন্দর প্রচেষ্টা হতে চলেছে, তখন লেখা দেবার জন্য তাঁকে আদৌ পীড়াপীড়ি করতে হ'লো না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, লেখা পেতে আমাদের বেশিদিন অপেক্ষাও করতে হ'লো না। অনেকে আছেন যাঁরা কথা দেন, কিন্তু কথা রাখেন না বা রাখতে পারেন না। ড. মজুমদারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কথা দিতে হয়ত অনেক ইতস্ততঃ করবেন, কিন্তু দিলে তা রাখবেনই।

ড. মজুমদার বহুদিন ধরে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট-অব-কালচারের পরিচালনা সমিতির সহ-সভাপতি। আগে রাজ্যপাল এ. এল. ডায়াস এর সভাপতি ছিলেন, এখন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ডায়াস ড. মজুমদারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, লক্ষ্য করেছি। ত্রিভুবন নারায়ণ আগে থেকেই ঐতিহাসিক হিসাবে ড. মজুমদারকে সম্মান করতেন। এখন ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করতে শুরু করেছেন। ড. মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহার দেখবার মতো। রাজ্যপাল ডায়াস কর্মব্যস্ততার জন্যে অনেক সভায় আসতে পারতেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে ড. মজুমদার পরিচালক-সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করতেন। তাঁর সভা-পরিচালনা দেখবার মতো। অনর্থক বাক্যব্যয় নেই, যে-কয়টি কথা বলার শুধু সেটুকুই বলবেন। কিন্তু প্রত্যেককে বলবার সুযোগও দেবেন। তা বলে আলোচনা কর্মসূচীর বাইরে চলে যাবে, তা হতে দেবেন না। কর্মসূচীর প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে, মাসের কাজের হিসাবও ভালো করে বুঝে নেওয়া চাই। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। সভাপতি হিসেবে তাঁর নিয়ম-নিষ্ঠা, সংযম ও সৌজন্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এর ফলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যায়। অনর্থক বাগ্‌বিতন্ডা বা মতবিরোধ হবার অবকাশ নেই।

ড. মজুমদার কোন সভায় দেরী করে এসেছেন, মনে পড়ে না। সুস্থ আছেন অথচ সভায় এলেন না, এ-ঘটনাও একবার ছাড়া কখনও ঘটেনি। একবার যে ঘটেছিল সে কেবল তারিখ ভুল করেছিলেন বলে। ড. মজুমদার যে-বিষয়ে কিছু জানেন না, সে-বিষয়ে সহজে মুখ খুলতে চান না। ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীর জন্যে যখন বই বাছাই করা হয়, তখন ইতিহাসের বই হ'লে তার চুলচেরা বিচার করেন। অন্য বিষয়ের বই হ'লে অন্য সভ্যদের দিকে বই ঠেলে দিয়ে বলেন : 'আপনারা দেখুন, এ-বিষয়ে আমি কিছু জানি না।'

ড. মজুমদারকে বহু সভায় বক্তৃতা করতে দেখেছি। তাঁর বক্তৃতা বস্তুনিষ্ঠ, একেবারে উচ্ছ্বাসবর্জিত, পরিমিত, নির্দিষ্ট সময় ছাড়িয়ে কখনও যান না। বাক্য-বিন্যাস চমৎকার। কণ্ঠস্বর মিষ্ট। একবার এক সভায় ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বক্তা, ড. মজুমদার সভাপতি। সেদিন ড. চট্টোপাধ্যায় পান্ডিত্যের তুঙ্গে উঠেছিলেন। এমনটি আর কখনও দেখি নি। শ্রোতারা মুগ্ধ। এর পর যখন ড. মজুমদার উঠলেন, তখন ভাবলাম, "এর পর ড. মজুমদার আর কি বলবেন? এখন তিনি কিছু না বল্‌লেই ভালো হয়।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে জ্ঞান-ভান্ডার তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, তার রূপসৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা বুঝতে পারলাম তাঁরা উভয়েই অতুলনীয়, তাঁদের বিচার করার সাধ্য আমাদের নেই।

আমাদের ইনস্টিটিউট-অব-কালচার থেকে ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে 'দি কালচারাল হেরিটেজ অব

ইণ্ডিয়া' নামে যে বিরাট গ্রন্থটি বেরুচ্ছে, তার কথা হয়ত অনেকেই জানেন। এই গ্রন্থটির প্রকাশিতব্য অষ্টম খণ্ডের সম্পাদক হচ্ছেন ড. মজুমদার। এই গ্রন্থে ড. মজুমদারের জ্ঞান-গরিমার পরিচয় যা রয়েছে, তা পাঠকমাত্রকেই তাক লাগিয়ে দেবে। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই কর্তব্যনিষ্ঠা। সম্পাদনা যাতে নিখুঁত হয়, সেদিকে কি অতন্দ্র দৃষ্টি! খুব নামজাদা পণ্ডিতের লেখা প্রবন্ধ, কিন্তু ভুলে ভরা। তা প্রত্যাখান করতে ড. মজুমদারের এতটুকু বাধে না। যতক্ষণ না কোন লেখা নির্দিষ্ট মানে পেঁছুতে পারছে, ততক্ষণ তিনি তা প্রকাশ করার জন্য অনুমোদন করবেন না। এ-নীতি তিনি নির্মমভাবে অনুসরণ করে আসছেন। ড. মজুমদার নবতিবর্ষ বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর জ্ঞান-তপস্যার বিরাম নেই। এখনও তিনি দিনের অধিকাংশ সময় বই-এর মধ্যে ডুবে থাকেন। আনন্দের বিষয়, এখনও তাঁর চিন্তা বলিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও সুস্থ, বাক্-বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত, কণ্ঠস্বর সতেজ।

বাস্তবিক, জ্ঞান-গরিমায় ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় ড. মজুমদার একেবারে অনন্য।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুকুমার রায়

বিশ্ববিখ্যাত পেন্‌গুইন গ্রন্থাবলী-প্রকাশিত ভারতের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক স্পিয়ার খ্যাতনামা ভারতীয় বর্তমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকটি ১৯৭৩-এ সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ১৯৭৩-এর ভারতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই। আচার্য মজুমদার যে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক তাহাই নয়; তিনি বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম পরিগণিত হইয়াছেন। UNESCO হইতে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস প্রণয়নের জন্য যে আন্তর্জাতিক কর্মনির্বাহক সমিতি (Commission) গঠিত হইয়াছে তাহার তিনি উপাধ্যক্ষ (Vice-President) নিযুক্ত হইয়াছেন।

এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক হিসাবে আচার্য মজুমদারের মূল্য বিচার নহে; সে-বিচার করিবার যোগ্যতা আমার নাই—ইহা আমি তাঁহাকে যেরূপ জানি তাহার বিবরণ। আচার্য মজুমদারের সহিত আমি সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর উপর সংশ্লিষ্ট—১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাস হইতে। আমি ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এবং এম. এ. ক্লাসে তাঁহার ছাত্র ছিলাম; তিনি ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান ছিলেন। অধ্যাপকের তিন রকম কর্তব্য: অধ্যাপনা, গবেষণা ও গবেষণা পরিচালনা। আচার্য মজুমদার এই তিন বিষয়েই সফলতা লাভ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই, যে-অধ্যাপক গবেষণায় পারদর্শী, অধ্যাপনায় তিনি তেমন পারদর্শী নহেন। গবেষণায় এবং অধ্যাপনায় পারদর্শিতার যোগাযোগ খুব কম অধ্যাপকের মধ্যেই দেখিতে পাই। আচার্য মজুমদারের ক্লাসের আলোচনা এত সুন্দর, সহজ অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল যে আমরা বিমোহিত হইয়া তাহা শুনিতাম এবং সারাংশ লিখিয়া লইতাম। তাঁহার জাতিভেদপ্রথা, অশোকের ধর্ম এবং বলশেভিক বিপ্লবের আলোচনা এখনও আমার মনে আছে। প্রথমে আমি অনার্স ক্লাসে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়িতাম; পরে সে কলেজ ছাড়িয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তাহা না হইলে আর আমার আচার্য মজুমদারের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য হইত না। যাহা কিছু শিখিয়াছি তাঁহারই নিকট—তিনিই ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবার পূর্বেই তাঁহার প্রথম পুস্তক *Corporate Life in Ancient India* রচিত হয়। ঢাকায় আসিবার পর তিনি ভারতের উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং চম্পা (১৯২৭) সুবর্ণদ্বীপ (দুই খণ্ডে, ১৯৩৭, ১৯৩৮) প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি কম্বুজদেশ (১৯৪৪), কম্বুজানুলিপি (Inscriptions of Kambuja ১৯৫৩) ইত্যাদি পুস্তক রচনা করেন। ভারতীয় উপনিবেশ ও তাহার সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

১৯৩৩ সালে তিনি ভারতে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক-মণ্ডলী রচিত ইতিহাস (Syndicate History) প্রণয়নের পরিকল্পনা করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল লর্ড একটন পরিকল্পিত *Cambridge Modern History*। সেই আদর্শ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুই খণ্ডে বাংলার ইতিহাস, বিশেষজ্ঞ

ঐতিহাসিকগণ দ্বারা রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড—প্রাচীন যুগের—সম্পাদনা করিয়াছেন আচার্য মজুমদার স্বয়ং এবং দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যযুগের—সম্পাদনা করিয়াছেন স্যার যদুনাথ সরকার। এখন পর্যন্ত এই পুস্তকটির দুই খণ্ড বাংলার ইতিহাসের প্রামাণিক গ্রন্থ। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আচার্য মজুমদার স্বয়ং বাংলার সমগ্র ইতিহাস, প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত, বাংলা ভাষায় লিখিয়া তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি শুধু রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ দেন নাই ; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও বিবরণ দিয়াছেন।

আচার্য মজুমদার বহুসংখ্যক ছাত্রকে গবেষণায় পরিচালিত করিয়াছেন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহার অনেক ছাত্র। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. জে. এন. ব্যানার্জী ; ঢাকা ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. কে. আর. কাননগো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের ভূতপূর্ব Curator এবং Secretary ড. ডি. সি. গাঙ্গুলি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. পি. সি. চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধিপাল (Vice-Chancellor) ড. এস. বি. চৌধুরী।

অধ্যাপনা কার্যের সহিত আচার্য মজুমদার অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন। তিনি প্রোভোস্ট (Provost) হিসাবে ছাত্রনিবাস ও ছাত্রদের সুচারুভাবে চালিত করেন এবং তাঁহার আমলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায় নাই। অফিস সংক্রান্ত কার্য তিনি পূর্ণ শৃঙ্খলার সহিত চালনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মনির্বাহকারী সমিতির (Executive Council) সভ্য হিসাবে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং সেই যুগে ইংরেজ সভ্যদের বিরোধিতা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ১৯৩৯-এর ভারতীয় ইতিহাস মহাসভার (Indian History Congress) প্রধান সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার এই নানারূপ কর্মক্ষমতার জন্যই তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল (Vice-Chancellor) নিযুক্ত করা হয়। এবং তিনি যোগ্যতার সহিত অধিপালের কার্য ছয় বৎসর কাল সমাপন করেন। তাঁহার কার্যকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করার পর আচার্য মজুমদারকে ভারতীয় দুইটি বিশ্ব-বিদ্যালয়—নাগপুর ও বানারস—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পুনর্গঠনের জন্য অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি কৃতিত্বের সহিত বিভাগীয় সংগঠনের কার্য সম্পাদন করেন। আমেরিকার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ও—শিকাগো ও পেন্‌সিলভেনিয়া—তাঁহাকে Visiting Professor হিসাবে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে তিনি সমভাবে পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

ভারত সরকারও আচার্য মজুমদারকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করেন। একটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আর অপরটি সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস প্রণয়ন। ভারত সরকারের সহিত মতভেদ হওয়াতে তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াও পদত্যাগ করিলেন। তিনি আত্মস্বার্থ বা বিকৃত স্বদেশপ্রীতির বেদীতে সত্যকে বলিদান করিতে পারিলেন না। ভারত সরকার অবশ্য অন্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করিয়া সরকারী আদেশ অনুযায়ী এই দুইটি ইতিহাস রচনা করাইয়া লইয়াছেন। তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইয়াছে। আচার্য মজুমদার স্বয়ং সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ইহা ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস নয় ; ইহাতে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের যথেষ্ট প্রভাব ছিল—ইহাতে স্বাধীনতা বা জাতীয়তার ভাব বিশেষ ছিল না। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ফুস্তেল দ্য কুলাঁজ বলিতেন : আমার রচিত ইতিহাসে যে কথা বলে সে আমি নই—সে দলিলপত্র (It is not I that speak but the documents)। আচার্য মজুমদারেরও

সেই অভিমত। সেই মতানুযায়ী তিনি রাজা রামমোহন সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য দায়ী নহেন, তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা বা আধুনিকতার (modernisn) মূর্তরূপ নহেন, তিনি বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠাতাও নহেন ; বাস্তবিক তিনি ছিলেন ভারতে বিশ্বপ্রেমিকতা এবং আন্তর্জাতিকতার শুকতারা।

যদিও তিনি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিকল্পিত ভারতের ইতিহাসের একখণ্ড সম্পাদনা করিয়াছেন এবং ভারতীয় ইতিহাস মহাসভার (Indian History Congress) পক্ষ হইতেও ভারতের ইতিহাস সম্পাদনা করিতেছেন, আচার্য মজুমদারের সর্বোত্তম অবদান *(magnum opous)* হইল ভারতীয় বিদ্যাভবন হইতে এগার খণ্ডে প্রকাশিত ভারতীয়দের ইতিহাস ও সংস্কৃতি *(History and Culture of the Indian People)*। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৫১ সালে আর সর্বশেষ প্রকাশিত হইয়াছে অষ্টম খণ্ড ১৯৭৭ সালে। ইহা সম্ভব হইয়াছে তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশবৎসর অক্লান্ত চেষ্টা ও অপরিসীম একাগ্রতার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় স্যার যদুনাথ লিখিয়াছেন যে বিভিন্ন লেখক দ্বারা ইতিহাস রচনা করানো এক দুরূহ কাজ ঃ অনেক লেখক তাঁহাদের অধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে দেন না আর কিছু সংখ্যক লেখক তাঁহাদের অধ্যায় একেবারেই লিখিয়া দেন না। পুনর্বার নূতন লেখক নিযুক্ত করিতে হয়। আচার্য মজুমদারকেও এই সকল বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভারতীয় বিদ্যাভবনের এগার খণ্ডে প্রকাশিত ইতিহাস তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। এইরূপ ইতিহাস *(Syndicate History)* লর্ড একটন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি *Cambridge Modern History* সম্পাদনা করিতে পারেন নাই। আর অধ্যাপক বেরী *Cambridge Medieval History*-র কয়েক খণ্ড সম্পাদনা করিতে সমর্থ হন। আচার্য মজুমদার তাঁহার পরিকল্পিত ইতিহাসের সম্পাদনা সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন ইহা ভারতীয় ইতিহাসের সৌভাগ্য। পাঠক জানেন যে এই ইতিহাস গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে আচার্য মজুমদার স্বয়ং অনেক অধ্যায় লিখিয়াছেন।

আচার্য মজুমদারের মতে ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক ঘটনার পঞ্জি নহে—ইহা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনের সমন্বিত ঘটনাবলী—ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় integrated history। এই বিষয়ে লর্ড একটন ও অধ্যাপক বেরীর পরিকল্পিত ইতিহাস হইতে আচার্য মজুমদারের ইতিহাস একটু ভিন্ন ও অধিকতর প্রসারিত। অবশ্য যুগের তারতম্যের জন্য এই প্রভেদ সম্ভব হইয়াছে। আচার্য মজুমদারের প্রকৃত আদর্শ হইল সত্য। সত্যের অপলাপ করিতে রাজী নহেন বলিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এবং সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় ভারত সরকারের বিরূপভাজন হইয়াছেন। রাজা রামমোহন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের বিরূপভাজন হইয়াছেন। আর জাতীয়তার স্বার্থে মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও একতা ছিল একথা না বলিতে পারায়, তিনি কংগ্রেস শাসিত ভারত সরকারের এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। আত্মস্বার্থ বা জনপ্রিয়তার নিকট তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে খর্ব করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইলেও সেই অনুযায়ী জনপ্রিয়তা লাভ করেন নাই। স্যার যদুনাথও তাহা পারেন নাই। এমনকি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গিবনও এই কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেন নাই। তিনি চিরকালের জন্য রোম্যান ক্যাথলিকগণের বিরূপভাজন হইয়া আছেন।

ভারতের ইতিহাস অতি সুদীর্ঘ ইতিহাস। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ শাসনের অবসান (১৯৪৭) পর্যন্ত। এই ইতিহাসকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগ। এমন কোনো বর্তমান ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করা যায় না যিনি এই সমগ্র ইতিহাস আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। আচার্য মজুমদার সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে এই সমগ্র ইতিহাস তাঁহার আয়ত্তাধীন। আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে বর্তমান ভারতেতিহাসের তিনি প্রমাণ্য সাধক—The Oracle of Indian History.

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ইতিহাস-চর্চা

হিমাংশুভূষণ সরকার

কথিত আছে যে কেহ নাকি বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিকটর হিউগোকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে নির্জন দ্বীপে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইলে তিনি কোন লেখকের রচনাকে নিঃসংগ দিনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করিবেন। তিনি নাকি উত্তর দিয়াছিলেন যে সেই অবস্থায় তাঁহার নিত্য সঙ্গী হইবে মহাকবি সেক্সপীয়ারের রচনাবলী। আমাকে যদি অনুরূপ অবস্থায় কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিকের লেখা লইয়া নির্জন নিঃসঙ্গ দিন কাটাইতে হয় তাহা হইলে আমি অবশ্যই আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের গবেষণামূলক রচনাবলীর কথাই বলিব। এই সমস্ত রচনা এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় রচিত। মানব-সভ্যতার গোড়াপত্তন হইতে পরবর্তী কাহিনী টয়েনবি যেমন অসামান্য দক্ষতার সহিত জহুরীর মত পণ্ডিত সমাজে পরিবেশন করিয়াছেন, আচার্য রমেশচন্দ্রও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইহার পরিপ্লাবন সেইরূপ নৈপুণ্য লইয়াই পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ঘটনাবলী, কিম্বদন্তী ও গুজব কোনটিই তাঁহার অনুসন্ধিৎসার অনুবীক্ষণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। টমাস সাহেব একদা বুদ্ধদেবের জীবনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে ইহার তথ্য নির্বাচনে আমাদিগকে যেমন অলৌকিক উদ্ভট কাহিনীগুলিকে বিচার করিতে হইবে, তেমনি সাধারণ ঘটনাগুলিকেও যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ উভয় শ্রেণীর তথ্যের ভিতরেই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে। আচার্য রমেশ-চন্দ্রের রচনাতেও এই দিকটি উপেক্ষিত হয় নাই। বস্তুনিষ্ঠ রচনার প্রতিছত্রে তাঁহার সত্য-অন্বেষণের বিপুল প্রয়াস লক্ষ্য করিবার মতো। প্রাচীন পুঁথি, অনুশাসন লিপি, ভাষাতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব কোন কিছুই তাঁহার সন্ধানী-দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে নাই। উচ্চস্তরের গবেষণার ক্ষেত্রে কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। মাটি খুঁড়িয়া যে-জিনিষ আবিষ্কৃত হইতেছে সেই মাটির স্তর-বিন্যাস বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হইতেছে। কার্বন-টেস্ট করিয়া প্রাপ্ত জিনিষের বয়স নির্ণীত হইতেছে এবং সমসাময়িক সাহিত্য থাকিলে তাহার সহিত প্রাপ্ত জিনিষের মূল্যায়ন করা হইতেছে। এই বহুমুখী সন্ধানের পটভূমিকায় আজিকার ইতিহাস রচিত হইতেছে। আচার্য রমেশচন্দ্র এইরূপেই তাঁহার বিশাল ঐতিহাসিক সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। মুঘলযুগের স্থাপত্য সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট শিল্পী-সমালোচক বলিয়াছিলেন যে মুঘল স্থাপত্য-শিল্পীরা পরিকল্পনা করিতেন দৈত্যের মতো, কিন্তু কাজ শেষ করিতেন জহুরীর মতো। আচার্য রমেশচন্দ্রের রচনার সংগে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে এই প্রশংসা আচার্যদেবের রচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁহার সম্পাদনায় বহু খণ্ডে প্রকাশিত The History and Culture of the Indian People এই মন্তব্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

আচার্য রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন ও তৎপর অধ্যাপকজীবন একই ছন্দে গ্রথিত। তাঁহার জন্ম হয় ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, ফরিদপুর জেলার খন্দরপাড়া গ্রামে। তিনি বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া সর্বশেষে কটকের র‍্যাভেন্স কলেজিয়েট স্কুল হইতে বৃত্তিসহ এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি ১৯০৭ সালে এফ্-এ পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়া পাশ করেন এবং ইহারই দুই বৎসর

পর ইতিহাসে অনার্সসহ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। তিনি পোস্ট-গ্রাজুয়েট বৃত্তিলাভ করিয়া ১৯১১ সালে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পরের বৎসরই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—'অন্ধ্র-কুষাণযুগ'। সেই যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ থিবো তাঁহার থিসিসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি Corporate Life in Ancient India লিখিয়া পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ্. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে কলিকাতা, যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

আচার্য রমেশচন্দ্রের অধ্যাপক-জীবনের আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালে ঢাকা গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজে কিন্তু তৎকালীন গবেষণার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবার প্রথম সুযোগেই ইতিহাস-বিভাগে যোগদান করিলেন। এখানে তিনি সাত বৎসর ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি সেখানে প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এই যোগদান করার পিছনেও ইতিহাস ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক-অধ্যাপক নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাহিলে স্যর আশুতোষ ডঃ মজুমদারকেই এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনোনীত করেন। স্যর আশুতোষ গুণগ্রাহী ছিলেন; তাঁহার লেখা সেই পত্র ডঃ মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালিয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইবার পর দেখিয়াছিলেন। উহাতে স্যর আশুতোষ ডঃ মজুমদারের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও আতিশয্য ছিল না।

আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (১৯২৭-২৯) তখন ডঃ মজুমদার প্রথম বিদেশযাত্রা করেন; এ-যাত্রা ছিল যেন তাঁর তীর্থদর্শন, তিনি ইংলাণ্ড, হলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইটালী পরিভ্রমণান্তে গেলেন সেই সমস্ত দেশে যাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাণের বন্ধন ছিল। এইভাবে তিনি পরিভ্রমণ করিলেন মিশর, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, আনাম, কাম্বোডিয়া, শ্যামদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশে। পাল-সেন আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শৈলী, যাহাকে আমরা সাধারণভাবে তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথের ভাষায় Eastern School of Art বলিতে পারি, তাহা ব্রহ্মদেশে ও দ্বীপময় ভারতে (Malayo-Indonesian World) এখনো যেন বাঙ্ময় হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার প্রায় অর্ধেকাংশ শব্দই সংস্কৃত হইতে পরিগৃহীত; এতটা বেশী না হইলেও ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, মালয় প্রভৃতি দেশের ভাষাতেও যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আচার্য রমেশচন্দ্রও নিশ্চয়ই বলিতে পারিতেন:

"এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।
মুখের পানে চেয়ে তোমায় আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিল রাখীবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে;
সেই রাখী যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।"

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, জাভা-যাত্রীর পত্র)

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বিদেশী শাসকেরা বহির্ভারতে ভারতীয়গণের কীর্তিকলাপের কাহিনীর উপর সর্বদাই যেন একটা স্থূল হস্তের অবলেপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। স্মরণ করা

যাইতে পারে যে স্মিথ-সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত Early History of India-র একটী বিরাট অংশ জুড়িয়া আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের কাহিনী দিয়া পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন—যাহার প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক মূল্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিতান্তই নগণ্য। র‍্যাপসন সাহেব সম্পাদিত Cambridge History of India নামক প্রামাণিক গ্রন্থটিও একই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অনুরঞ্জিত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষতঃ বাঙালী পণ্ডিতসমাজ ইহা কখনো প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহাদেরই একটি বিশিষ্ট অংশ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পুরোধায় প্রতিষ্ঠা করিলেন বৃহত্তর ভারত পরিষদ বা গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটী। ইহা আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখনকার কথা। সেই যুগের অবিস্মরণীয় উদ্দীপনায় পর পর রচিত হইল আচার্যদেবের স্মরণীয় কতকগুলি ইংরেজী গ্রন্থ, যাহা আজিও ইউরোপীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যথা, Ancient Indian Colonies in the Far East, Vol. I : Champa (1927) ; Vol. II. Suvarnadipa, two parts (1937 & 1938) ; Kambujadesa, 1944 ; Inscriptions of Kambuja, 1953 ; Ancient Indian Colonisation in South-East Asia, 1955 ; Hindu Colonies in the Far East 1963 প্রভৃতি। ত্রিশ শতকের প্রথম দিকের সেই রাজনৈতিক চেতনার বিরাট পটভূমিকায় দক্ষিণপূর্ব এবং মধ্য এশিয়ার ভারতীয়-গণের কীর্তিকাহিনী হঠাৎ যেন এক নূতন সাংস্কৃতিক দিগন্ত খুলিয়া দিয়া গেল। শান্তির পথে সভ্যতার পশরা দেশে-দেশে ও শতাব্দীর ঘাটে-ঘাটে পৌঁছাইয়া দেওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার মূল্যায়নে ও পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথের পরই যাহার অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক তিনিই আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার। এতদ্ব্যতীত ছিলেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিজয়রাজ চট্টোপাধ্যায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় বর্তমান লেখক প্রাচীন যবদ্বীপীয় এবং ক্ল্যাসিক্যাল মালয় ভাষা শিক্ষা করিয়া গ্রন্থাদি রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। সে যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হইত ফরাসী বা ডচ্ ভাষার মাধ্যমে এবং লেখকেরা সবাই ছিলেন বিদেশী। বহুভাষাবিদ আচার্য রমেশচন্দ্র সর্বপ্রথম বৃহত্তর ভারতের গবেষণায় বিদেশীগণের একাধিপত্য খর্ব করিলেন। আমাদের দেশে এ-বিষয়ে যেটুকু গবেষণা হইয়াছে তাহাদের সকলেরই পথিকৃৎ আচার্য রমেশচন্দ্র।

বৃহত্তর ভারতের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার লেখনী অমৃতময় ফল প্রসব করিয়াছে। এই প্রকার গ্রন্থের সবগুলিই বহু আলোচিত এবং ইহার মধ্যে প্রধান হইল (১) Corporate Life in Ancient India (২) Ancient India (৩) History of Ancient and medieval Bengal (৪) Classical Accounts of India (৫) History of Bengal, Vol I (ed), Dacca University (৬) Vakataka-Gupta Age (Jt Author) (৭) Glimpses of Bengal in the 19th Century (৮) Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (৯) History of Freedom Movement (3 Vols) (১০) Advanced History of India (Jt.-Author)। ইহা ব্যতীত আছে অজস্র প্রবন্ধ, সমালোচনা, সভাপতির ভাষণ এবং তাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক এগার খণ্ডে প্রকাশিত History and Culture of the Indian People.

আচার্যদেব একদা অল্পবয়সে গল্প লিখিয়া সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান সুপ্রসন্ন থাকায় তাঁহার ললাটে সাহিত্যের জয়টিকা অঙ্কিত হইল না হইল, ঐতিহাসিকের জলদচর্চিলিখা। তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উহাতে রহিয়াছে প্রায়

৪০টি লিপিতত্ত্ব ও অনুশাসন সম্বন্ধীয় রচনা, নেপালের প্রাচীন রাজবংশের নৃপতিগণের ক্রমিক তালিকা, সাতবাহন-পাল-সেন রাজবংশের রাজন্যবর্গের বংশ-তালিকা, কুষাণ-রাজগণের সময়-সূচী, বাকাটক-রাজগণের বংশতালিকা ও সময়-নির্ঘণ্ট, শেষ গুপ্তরাজগণের বংশধরদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতি। পশ্চিম এশিয়া বা মুসলমান-যুগের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নহে। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল (1) Achaeminian Rule in India (2) Alberuni (3) The Arab invasion of India (4) Early Muslim Settlements in India (5) Impact of Islam on Hinduism (6) Sultan Mahmud and the Sahiya Kings প্রভৃতি।

আচার্য রমেশচন্দ্র চিরজীবন সত্যের পূজারী এবং রাজরোষ সর্বদা উপেক্ষা করিয়া সত্য এবং ন্যায়কে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সর্বদা সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নির্ভীক ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েকটী মূল্যবান নিবন্ধ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে আছে: (১) La Palaeographic des Inscriptions de Champa এবং (২) Les Rois Sailendra de Suvarnadvipa। উভয় প্রবন্ধই ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটী দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রাপ্ত ভারতীয় লিপিতে লিখিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিলালিপি (অবশ্য, অক্ ইয়োতে প্রাপ্ত খণ্ডিত ব্রাহ্মী-লিপিগুলি ব্যতীত) সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধটি অনেককে ঐ সম্বন্ধে নূতন নিবন্ধ রচনার প্রেরণা দিয়াছিল; সম্ভবতঃ প্রশ্নটির আজিও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই, কারণ এই আলোচনায় আজ পর্যন্তও পূর্বভারতে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলির সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনা হয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধটির গুরুত্বও যথেষ্ট ছিল। ইহাতে তিনি প্রথম প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে সুবিখ্যাত লিগোর শিলালিপির দুই পৃষ্ঠে যে অনুশাসন উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহা একটী আর একটীর অনুপূরক নহে এবং শৈলেন্দ্র-রাজগণ প্রথম হইতেই যে সর্বদা শ্রীবিজয়ের সম্রাট ছিলেন তাহাও প্রমাণ করা যায় না। এই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি শৈলেন্দ্র-রাজগণের সঙ্গে কলিঙ্গের শৈলোদ্ভব রাজবংশের সম্পর্কের কথা উপস্থাপিত করিয়াছেন। কেহ কেহ এই রাজবংশের আদি বাসভূমি হিসাবে কম্বুজ, কেহ সুদূর দক্ষিণ ভারত, কেহ আবার সুমাত্রাকেই নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারো মত সর্বজনগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। মনে হয় ডঃ মজুমদারের মত সকলে স্বীকার করিয়া না লইলেও বর্তমান অবস্থায় এই সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিই প্রবলতর। এই মত আরো দৃঢ় হইত যদি সমসাময়িক কলিঙ্গের অনুশাসন লিপিগুলির সহিত শৈলেন্দ্র-অনুশাসন লিপিগুলির তুলনামূলক আলোচনা হইত। যাহা এতাবৎ-কাল পর্যন্ত হইয়াছে তাহা হইল পূর্বভারতীয় প্রাক-নাগরী লিপির সহিত শৈলেন্দ্র-শিলালিপির তুলনামূলক আলোচনা।

শুধু লিপিতত্ত্বে নহে ভারতীয় সম্বৎগুলি সম্বন্ধেও ডঃ মজুমদারের অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ আছে। এই উপমহাদেশে বহু সম্বৎ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহার প্রারম্ভিক তারিখ সম্বন্ধে সর্বদা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয় নাই। এখনো কোনোটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। এই সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পাইয়াছি কয়েকটি প্রবন্ধ, যথা (1) The Epoch of the Ganga Era (2) The Eras of Nepal (3) The Harsa Era (4) Atita Rajya Samvat (5) King Vikramaditya and Vikrama Samvat প্রভৃতি।

বস্তুতঃ ঋগ্বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তিনি

সমস্ত দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সম্পূর্ণ ইতিহাস ও সংস্কৃতির পথ পরিক্রমা করিয়াছেন। তাঁহার এই পরিক্রমা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মধ্যযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অবারিত করিয়াছে। এক কথায় ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের তিনি অনন্য পথিক। বাঙ্গালীরা তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী এইজন্য যে, তিনি তাঁহার সারাজীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বাঙালীর একটী পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কথা বিস্মৃত হন নাই। এই প্রচেষ্টায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের নামও অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ডঃ রায় বাঙালীদের ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অবদানের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে পরিবেশন করিয়াছেন ; প্রকাশ করিয়াছেন অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীও।

গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রাচীন যুগের বাঙালীর ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে আচার্যদেবের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, যাহার মধ্যে আছে (1) Jainism in Ancient Bengal (2) Lama Tar matua's account of Bengal. (3) physical features of Ancient Bengal (4) Sasanka the King of Gauda। বাঙালীর ইতিহাস ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কিছু পুঁথিও নূতন করিয়া সম্পাদনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আছে রামচরিত। মধ্য-যুগের এই সংস্কৃত কাব্যটির রচয়িতা ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। ইহা পাঠ করিলে একাধারে রামায়ণ ও পালরাজ রামপালের ইতিহাস যুগপৎ পাঠ করা হয়। ইহার প্রথম সংস্করণ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটী অফ্ বেঙ্গলের Memoir হিসাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; ইহা পরে আবার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী হইতে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীর পক্ষে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় এবং ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় প্রকাশ করেন। সমসাময়িক যুগ লইয়া রচিত তাঁহার অপর একটা মূল্যবান প্রবন্ধ হইল The Revolt of Divvoka against Mahipala II and other Revolts in Bengal। পরবর্তী যুগের স্মরণীয় ঘটনাবলী গ্রথিত করিয়া রচিত হইয়াছে তাঁহার প্রামাণিক বাঙলা গ্রন্থ : বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)। তিনি নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্মারক-গ্রন্থে (১৯৬৬) Renaissance in Bengal under Hussein Shahi Dynasty লিখিয়া সেই যুগের মুসলমান শাসন-কর্তাদের ঔদার্য ও পরমতসহিষ্ণুতার প্রতি স্বকীয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার অপূর্ব প্রতিভায় ব্রিটিশযুগের অনেক বিস্মৃত বা অর্ধবিস্মৃত অধ্যায় লোকসমক্ষে পুনরায় অবারিত হইয়াছে। তিনি ১৯৪২ সালের অধরচন্দ্র মুখার্জী বক্তৃতামালার মাধ্যমে সমসাময়িক দলিলপত্রের ভিত্তিতে Maharaja Rajaballabh নামক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার Glimpses of Bengal in the 19th Century (১৯৬০) এই সময়ের বাঙালীর ইতিহাসের একটী মূল্যবান সংযোজন। অনুরূপ সম্পদ হইল ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থ : Swami Vivekananda—a historical review। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য তাঁহার সহযোগিতায় প্রকাশিত Great Women of India। জন্মশতবার্ষিকী হিসাবে ইহাতে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা হইয়াছে যুগমাতা সারদামণি দেবীকে : ইহা স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের সহযোগিতায় আলমোড়া অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। সত্য উদ্ঘাটনের স্পৃহা হইতে লিখিত হইয়াছে তাঁহার আরো দুইটী মূল্যবান প্রবন্ধ ; যথা, (১) Bengal as Clive found it,—Introducing India Vol. I, এবং (২) Bengalees as a martial race, উপরোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। তিনি তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার আর একটী পরিচয় রাখিয়াছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের অভিনন্দন গ্রন্থে : Bengali Prose-writing before 1800। এই যুগ সম্বন্ধে তাঁহার আরো কয়েকটী স্মরণীয় রচনার মধ্যে আছে : (১) Christian Missionaries and Renaissance in Bengal। ইহা Bengal : Past and Present-এর হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে

রচিত হইয়াছিল। (২) The Fort William College and the historical and Geographical Studies in Bengal (৩) Rammohan Roy and Bal Gangadhar Tilak on social legislation (৪) Vivekananda and the Indian Renaissance। তাঁহার রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রকাশিত আধুনিক অনেক প্রবন্ধ ও মতামত বহু বিতর্কের অবতারণা করিয়াছে।

বর্তমানের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই মহান ঐতিহাসিকের জীবনালেখ্য উপযুক্তভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব নহে। যেটুকু বলা হইল তাহা হইতেই অন্ততঃ এইটুকু উপলব্ধি হইবে যে আমরা যেন এক সাগর-সঙ্গমে আসিয়া তাঁহার বিপুল রচনায় অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছি। তাঁহার এই সমগ্র জীবনের সাধনা দেশ-বিদেশের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ড. মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁহাকে ছাড়ে নাই। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ অফ্ ইন্দোলজীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কার্যে ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হন, কিন্তু তৎকালীন সরকারের ফরমাস-মাফিক ইতিহাস-তথ্য সঙ্কলন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন এবং ইহার তিন বৎসর পরেই কিছুদিনের জন্য আমেরিকার শিকাগো এবং পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপকপদে বৃত হন। তিনি কলিকাতা, বরোদা, মাদ্রাজ, পাটনা, জব্বলপুর, অন্ধ্র, বিশ্বভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেকগুলি মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস (১৯৩৯), সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন (১৯৪৮) এবং ত্রয়োবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা-বিদ্‌গণের কংগ্রেসে ভারতীয় শাখার সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটী এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের Advisory Board for Archaeology and Historical Records Commission-এর সভ্যও ছিলেন। ইউনেস্কো যখন International Commission for publishing a History of Mankind (Cultural and Scientific Development) নামক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন তখন তিনি উহার সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা ও বম্বের এশিয়াটিক সোসাইটীর এবং গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীর সম্মানিত সদস্য। কংগ্রেসী আমলে ভারতরত্ন উপাধি বহু পাত্রে-অপাত্রে বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ভুবন-বিখ্যাত এই ঐতিহাসিকের সত্যানুসন্ধিৎসা তাহাকে সতত রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাই যেন তাঁহাকে গৌরবের জয়টিকা পরাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র এই সমস্ত প্রলোভনের ঊর্ধ্বে। তিনি মানুষ এবং মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধে ইতিহাসের মতোই নির্মম ও পক্ষপাতহীন কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার মন জননীর মতই স্নেহপ্রবণ। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা গবেষণা তাঁহার সারা জীবনের মৌলিক ছন্দ; তাই তিনি সন্ন্যাসীসুলভ একাগ্রতায় তাঁহার জীবনের কর্মসূচী স্থির করিয়া সেই অনুযায়ী তাঁহার জীবনের তার বাঁধিয়াছেন। এত দীর্ঘকাল একনিষ্ঠভাবে গবেষণা করা স্যর যদুনাথ সরকার ব্যতীত এদেশে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের নিকট আমাদের ঋণের শেষ নাই। সুখের বিষয় নূতন যুগের উষায় তাঁহার অনুরাগীরা বিগত মার্চ মাসে (১৯৭৮) R. C. Majumdar Institute for Historical Research (Govt. regd) নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া জাতীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন। আজিকার এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদকরূপে দেশের সকলের সর্বপ্রকার শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য আবেদন জানাই।

আমার দৃষ্টিতে আচার্য রমেশচন্দ্র

সুখময় মুখোপাধ্যায়

যিনি অনন্যসাধারণ মনীষীরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, জীবদ্দশাতেই যিনি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন, সেই আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে দুঃসাহস মাত্র। তবু আমি আচার্য রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করছি এই কারণে যে, তাঁর যে-পরিচয় আমি পেয়েছি, তা সর্বসাধারণের গোচরে আনা আমার একান্ত কর্তব্য। তাঁর জীবনী যাঁরা লিখবেন, তাঁরাও এ-থেকে কিছু তথ্য পাবেন।

আচার্য রমেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয় পত্রযোগে—প্রায় কুড়ি বছর আগে। ১৯৫৮ সালে 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত হলেও পুরোনো বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যের বিচার ও ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনাই তার মধ্যে মুখ্যস্থান অধিকার করেছিল। এই বইটি তখনকার অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতকে পাঠিয়ে তাঁদের অভিমত প্রার্থনা করেছিলাম। অধিকাংশই নিরুত্তর রইলেন, কয়েকজন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখে পাঠালেন। যে দু'একজনের কাছে বিস্তৃত অভিমত পাওয়া গেল—আচার্য রমেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। যে-ভাবে সযত্নে তিনি বইটি পড়েছেন ও তার বিচার করেছেন এবং একজন নবীন লেখককে যে-ভাবে তিনি উৎসাহিত করেছেন, তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বুঝলাম তিনি শুধু অসামান্য মনীষী নন, হৃদয়বত্তায়ও তিনি অসাধারণ।

এরপর ক'লকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হলাম। আমার 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর'-এর প্রথম সংস্করণ ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তাঁকে এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ইতিপূর্বে (এবং পরেও) কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমার অন্য বইয়ের ভূমিকা লিখতে অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছি। কিন্তু আচার্য রমেশচন্দ্র সম্পর্কে আমার হ'ল ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তিনি ভূমিকা লিখতে রাজী তো হলেনই—যে ভূমিকা লিখলেন, তার প্রতি ছত্রে রয়েছে বিপুল পাণ্ডিত্য, সযত্ন অধ্যয়ন ও অসামান্য সহৃদয়তার স্বাক্ষর। এ-জীবনে আমি যা-কিছু পেয়েছি, তার মধ্যে আচার্য রমেশচন্দ্রের লেখা এই ভূমিকাটিই সর্বোত্তম।

এরপর আচার্য রমেশচন্দ্র আমাকে এক গুরুদায়িত্বের ভার দিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর লেখা 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসের অনুরোধে তিনি ঐ বইয়ের আরও কয়েকটি খণ্ড প্রণয়ন করতে এবং গ্রন্থটিকে সুরু থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থের রূপ দিতে স্বীকৃত হলেন। প্রথমে দ্বিতীয় খণ্ড বা মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার কাজ ধরা হল। এই খণ্ডের এক বৃহদংশ লেখার ভার আচার্য রমেশচন্দ্র ন্যস্ত করলেন আমার মত অখ্যাত ব্যক্তির উপর। এই গুরুদায়িত্ব তাই মাথা পেতে নিলাম।

আমার জন্য নির্দিষ্ট অংশের রচনা শেষ করে যখন আচার্য রমেশচন্দ্রকে দিলাম, তখন ঐতিহাসিক গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে তাঁর নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলাম। আমার লেখাটি

তিনি সযত্নে পড়লেন এবং কোথায় লেখার অদল-বদল করতে হবে, কোথায় বাড়াতে হবে, কোথায় কমাতে হবে—মার্জিনে তার বিস্তৃত নির্দেশ দিয়ে লেখাটি আমায় ফেরৎ দিলেন। তদনুসারে আমি লেখাটি পুনর্লিখন করলাম। গ্রন্থ-সম্পাদনাও যে এক ধরনের তপস্যা—এ সত্য তখনই হৃদয়ঙ্গম করলাম।

'বাংলা দেশের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডেরও কিছু অংশ (ঐ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের ৪০৬-৪১৪. ৪১৭-৪২১, ৪২৪-৪৩১, ৪৪০-৪৪৬, ৪৫২-৪৫৬, ৪৫৯-৪৬০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) আমি রচনা করি আচার্য রমেশচন্দ্রের নির্দেশে। এ-সম্বন্ধে আচার্য রমেশচন্দ্র ঐ খণ্ডের ভূমিকায় লেখেন, "বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের লিখিত কয়েকটি অংশের সংযোজনা করিয়াছি।" এই কয়েকটি অংশ আচার্য রমেশচন্দ্রের হাতে দেওয়ার সময়ে আমি এক নতুন শিক্ষা লাভ করি। আমার এই লেখা কাটাকুটি ও দুরূহপাঠ লেখায় ভরা ছিল। লেখাটি হাতে নিয়ে আচার্য আমায় বললেন, "লেখা প্রেসে দেবার সময় তোমরা একবার ভাবো না প্রেসের লোকেরা কেমন করে এ লেখা ছাপবে? এ লেখাটা কাউকে দিয়ে কপি করিয়ে তবেই আমি ছাপাতে দেব। এতে কাজ যদি দু'মাস পিছিয়ে যায়, তা'ও ভাল।" ছাপাখানার কর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর এই সহানুভূতি ও বিবেচনা সেদিন আমায় অভিভূত করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করি; বাংলা ছাপার ক্ষেত্রে আচার্য রমেশচন্দ্র লাইনো-টাইপ পছন্দ করেন না। প্রকাশকদের,—সে তিনি যতবড় প্রকাশকই হোন না কেন —হ্যান্ড-কম্পোজ টাইপে বই ছাপার নির্দেশই তিনি দিয়ে থাকেন।

শুধু মুদ্রাকররা নন, প্রকাশকরাও তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার লাভ করেন। খুব নগণ্য ও অখ্যাত প্রকাশক একবার মাত্র অনুরোধ করে তাঁর কাছে বই পেয়েছেন—এ-ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। একবার একজন প্রকাশক আমার উপস্থিতিতে আচার্য রমেশচন্দ্রকে তাঁর একটি বইয়ের রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্য দেড় হাজার টাকা দিলেন—পনেরোটি একশো টাকার নোটে। আচার্য রমেশচন্দ্র নোটগুলি নিয়ে না গুণে পকেটে পুরলেন এবং প্রাপ্তি-স্বীকারের রসিদে সই করে দিলেন। অথচ ঐ প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর ইতিপূর্বে কোন লেন-দেন হয়নি। এমনই তাঁর মানুষের উপর বিশ্বাস!

'বাংলাদেশের ইতিহাস' ছাড়া আরও কোনো কোনো বইয়ের ব্যাপারেও তাঁর অধীনে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে। 'ভারতকোষে'র ইতিহাস-সম্বন্ধীয় রচনাগুলির সম্পাদক ছিলেন তিনিই। এ বইয়ের কতকগুলি ইতিহাস-বিষয়ক নিবন্ধ লেখার ভার তিনি আমায় দেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর সম্পাদন-নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হই। তাঁর 'বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র' গ্রন্থটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের 'ভারতবর্ষ' থেকে নকল করিয়ে ছাপাতে আমি তাঁকে অনুরোধ করি। তিনিও সে অনুরোধ রক্ষা করেন। এই বইয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর বিজ্ঞতা ও হৃদয়বত্তার একটি নিদর্শন আমার দেখার সুযোগ হয়। বাংলার কুলজীগ্রন্থ সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য রমেশচন্দ্র সেটিকে 'বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র'র পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত করেন।

পণ্ডিত হিসাবে আচার্য রমেশচন্দ্রের কয়েকটি বিশেষত্ব সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এ-সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথমত, তিনি কখনও কারো উপর নিজের মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয়ত, বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর মতের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির মতের অনৈক্য, সেই ব্যক্তির উপর তাঁর বিরাগ উদ্রেক করে না। আমি অনেকবার ঘরোয়া আলোচনায় তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে তর্ক করেছি, কোন কোন সভায় তিনি বক্তৃতা দেওয়ার পরে তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, ছাপার অক্ষরেও তাঁর কোন কোন মতের প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু এ-জন্যে

তিনি আমার উপর কোনদিন একতিলও অসন্তুষ্ট হননি। তৃতীয়ত, কোন নগণ্য ব্যক্তিও তাঁকে কোন পরামর্শ দিলে তা তিনি ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা গ্রহণ করেন। 'বাংলাদেশের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডের সবগুলি অধ্যায় রচিত হয়ে যখন ছাপতে যাচ্ছে, তখন আমি আচার্য রমেশচন্দ্রের কাছে এই খণ্ডের অধ্যায়গুলির পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাব রাখি। সবগুলি প্রস্তাবই তিনি গ্রহণ করেন। অধ্যায়গুলির নাম কী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধেও আমার পরামর্শ তিনি মেনে নেন।

প্রধানত পড়াশুনা ও বই-লেখার ব্যাপারেই আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। কখনও কখনও মজলিসী গল্পের আসরেও তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কয়েকবার তিনি বক্তৃতা দিতে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনে থাকার দিনগুলিতে অবসরকালীন মুহূর্তগুলিতে রতন কুঠির (এখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল) লাউঞ্জে বা বারান্দায় বসে তিনি আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন এবং সরস ভাষায় নিজের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিবৃত করতেন। পণ্ডিত রমেশচন্দ্রের তুলনায় মজলিসী রমেশচন্দ্র যে কম যান না—এ কথাই তখন আমার বার বার মনে হত।

দুঃখের মুহূর্তেও তাঁকে দেখেছি। তাঁর স্ত্রী এবং একাধিক কন্যা তাঁরই সামনে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যু সংবাদ স্বয়ং আচার্য রমেশচন্দ্রের কাছেই আমি শুনেছি, কিন্তু শোনার সময়ে তাঁর মধ্যে এতটুকু বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিনি। সমুদ্রের মত বিশাল শোককে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন নিতান্ত নির্বিকারভাবে, বাইরে তার কোন অভিব্যক্তি ঘটতে দেননি।

আচার্য রমেশচন্দ্রের মধ্যে মনীষা ও মনুষ্যত্বের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর নাম মনে হলে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার

আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৯২৮ সনে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভর্তি হই, তখন জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র হই, কারণ, তার প্রথম অধ্যক্ষ (প্রভোস্ট) ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সময় থেকেই সেখানে একটি সাহিত্য-চর্চার আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। তখনকার দিনের হিন্দু ছাত্রদের অন্যতম হল ঢাকা হল খেলাধুলোর দিক থেকে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল বলে সেখানে সাধারণতঃ এই বিষয়ে যারা উৎসাহী তারা ঢাকা হলেরই আবাসিক ছাত্র হতেন। জগন্নাথ হলের সাহিত্য বিভাগ, সমাজসেবা বিভাগ, নাট্য-বিভাগ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল; কারণ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যারা যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজন জগন্নাথ হলেরই ছাত্র ছিলেন। সকলেই যে আবাসিক ছাত্র ছিলেন, তা নয়। অনেকে বাইরে থেকেও তার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রক্ষা করে চলতেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়, কবি শ্রী অজিত দত্ত, কবি- ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু এঁরা সকলেই জগন্নাথ হলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই আমারও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল, সেইজন্য আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে জগন্নাথ হলেরই আবাসিক ছাত্র হ'লাম। আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার তখন জগন্নাথ হলের অধ্যক্ষ।

আমি যখন ভর্তি হলাম, তখন আচার্য রমেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন এবং তাঁর স্থলে তখনকার আইন বিভাগের ডীন স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ অস্থায়ীভাবে জগন্নাথ হলের অধ্যক্ষ বা 'প্রভোস্ট' নিযুক্ত হয়েছিলেন। বি. এ-তে ইতিহাস আমার পাঠ্য বিষয় ছিল, আচার্য রমেশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে ইতিহাস বিভাগে সাময়িকভাবে আর একজন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁর নাম ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। আচার্য রমেশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে আমাদের ভারতের ইতিহাস পড়াতেন।

জগন্নাথ হলে প্রতি বৎসর ছাত্র-সমিতি গঠিত হতো, তাতে যে নির্বাচনী তৎপরতা চলত, তা বিধান সভার নির্বাচনী তৎপরতা থেকে কোনো অংশেই কম ছিল না। যাতে এই নির্বাচন-কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে দিকে প্রভোস্ট এবং 'হাউর টিউটার' দুইজন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বর্গত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র গুহ বিশেষ যত্ন নিতেন। কোনদিন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না। সামান্য কোনো কিছু ঘটলে তা তাঁদের স্নেহ-তিরস্কারের মধ্য দিয়েই মীমাংসা হয়ে যেত।

প্রথম বছর থেকেই আমি এই সকল নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করি। ভর্তি হবার প্রথম বছরেই আমি নির্বাচনে প্রার্থী হইনি; তবে যে দলটিকে আমি সমর্থন করেছিলাম, সেই দলটি জয়লাভ করার ফলে আমি একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হই—তা সাহিত্য-শাখার সহকারী সম্পাদক। এর আগের বছর সাহিত্য-শাখার সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু এবং পরের বছর তাঁরই একজন সহপাঠী শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদক হলেন। খগেন্দ্রবাবু মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনায় সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন, তিনি ছাত্র সমিতির কাজে বিশেষ মন দিতে পারতেন না, সেইজন্য তিনি তার সকল দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দেলেন এবং আমি পড়াশোনা একরকম জলাঞ্জলি দিয়ে সাহিত্য-শাখার কাজ নিয়ে মেতে উঠলাম।

জগন্নাথ হল ছাত্র ইউনিয়নের সাহিত্য-শাখার দুটি প্রধান কাজ ছিল—একটি 'বাসন্তিকা' নামে বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা, দ্বিতীয়টি ছিল, বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমা তিথিতে একটি মনোরম সাহিত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হতো, তা বসন্তোৎসব নামে সে-দিন ঢাকাবাসীর নিকট পরম উপভোগ্য ছিল। 'বাসন্তিকা' নামে যে বাৎসরিক সাহিত্য সংকলনটি ছাত্র-পরিষদ থেকে প্রকাশিত হতো, তখন তার সম্পাদক হিসাবে অধ্যক্ষের নাম থাকত, কিন্তু সকল দায়িত্ব সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকের উপরই ন্যস্ত থাকত। সেই বছর যখন 'বাসন্তিকা' প্রকাশিত হয়, তখনও আচার্য রমেশচন্দ্র বিদেশ থেকে ফিরে আসেন নি, সুতরাং অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের নামই সম্পাদক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বিষয়ে একটি বৃত্তান্ত আমার এখনো স্মরণ আছে ; তা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

'বাসন্তিকা' পত্রিকা ছাপা হয়ে এক সংখ্যা যখন প্রথমই তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো, তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না, পত্রিকাটি তাঁর বাড়ীতে রেখে আসা হ'লো।

সেদিন গভীর রাত্রে ঘরে ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ ডাকাডাকির শব্দে জেগে উঠলাম। দরজা খুলে দেখি স্বয়ং অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে ডেকে ঘুম থেকে তুলেছেন, হাতে তাঁর 'বাসন্তিকা'র সংখ্যাটি।

তিনি আমাকে পত্রিকাটি দেখিয়ে বললেন, 'এ কি হয়েছে ?'

আমি আচমকা ঘুম থেকে উঠে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না।

তিনি বল্লেন, এই যে একটা জঘন্য কবিতা ছাপানো হয়েছে, তার কি হবে ?

আমি বুঝতে পারলাম না, কোন্ কবিতাটাকে তিনি জঘন্য বলছেন, তবে তাঁর মতে কোনও কবিতা অশ্লীল থাকা অসম্ভব ছিল না, কারণ বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা তাতে ছিল। তবে তা আমার কাছে খুব আপত্তিজনক মনে হয় নি।

তিনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে পত্রিকাটি খুলে আমার সামনে ধরলেন, তারপর সাহিত্য বিভাগের যিনি সম্পাদক (তখন তিনি ছুটিতে) তার লিখিত একটি কবিতা আমাকে দেখিয়ে বল্লেন, এটা কি ?

তাতে একটু অশ্লীলতার গন্ধ ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা কবিতায় সবে মাত্র তখন অশ্লীলতা প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে।

আমি বল্লাম, ছাপা হয়ে গেছে এখন আর কি করা যায় ?

তিনি বল্লেন, খুব করা যায়, তুমি কবিতা লেখ ; (তখন আমি খুব কবিতা লিখতাম) এইত তোমার একটা কবিতা এখানে ছেপেছ। দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে এই রকম আর একটা কবিতা লিখে তুমি একটা আলাদা পাতায় ছাপিয়ে এখানে জুড়ে দাও, এই পাতাটা ফেলে দাও।

আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম, বললাম, কবিতাটা সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদকের লেখা, তিনি অনুপস্থিত, তাকে না জানিয়ে...

তিনি বল্লেন, তোমার কোন দোষ হবে না ; এ কথা আমি বলছি। অগত্যা তাই করতে হলো। কিন্তু সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক তাঁর সহ-সম্পাদকের এই আচরণের মধ্যে আমাকে পুরোপুরি নির্দোষ মনে করতে পারলেন না।

তারপর আচার্য রমেশচন্দ্র ফিরে এসে জগন্নাথ হলের সকল ভার নিলেন। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ঘোষকে খুব ঘটা করে একদিন বিদায়- সম্বর্ধনা জানানো হলো।

দ্বিতীয় বছরেই আমি সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকের পদ-প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে আবির্ভূত হলাম।

অনেক ভোটে জয়লাভ করলাম। সাহিত্য-শাখার কাজ যথারীতি আরম্ভ হলো, তার সভাপতি আচার্য রমেশচন্দ্র এবং সম্পাদক আমি। সাহিত্য বিভাগের কাজের মধ্যে বিতর্কসভা, বক্তৃতাসভা, বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসন্তোৎসব ইত্যাদির আয়োজন করা হ'তো। প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে সভাপতির পরামর্শ নিতে হ'তো; তিনিও তাঁর ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর বাড়ীতে, প্রভোস্টের আপিস-ঘর কিংবা অন্যত্র যেখানেই হোক সর্বকার্যে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে কখনো বিরক্তি বোধ করতেন না, এই বিষয়ে ক্ষুদ্রতম দায়িত্বটুকুকেও তিনি কদাচ এড়িয়ে যেতেন না।

ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের পরই 'বাজেট অধিবেশন' হতো। তাতে সকল সম্পাদকই নিজের বিভাগের জন্য বেশি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরত। কিন্তু টাকার পরিমাণ কম, তথাপি অধ্যক্ষ সকল বিভাগকেই খুসী রাখবার চেষ্টা করতেন।

কোনো সভার আয়োজন করলেই কার্যসূচীটি অধ্যক্ষকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। একবার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, তাতে একটি বিষয় লেখা ছিল ঃ Dance। অনুষ্ঠান সূচীটি তাঁকে দিয়ে অনুমোদন করাতে নিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ আবার কি? কার নৃত্য?

আমি খুব বিনীতভাবে বললাম, একটি সাত-আট বছরের মেয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের তালে তালে নাচবে, তার মা কাছে বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইবেন।

তিনি গম্ভীরভাবে আর কিছু না বলে Dance কথাটি কেটে সেখানে action song কথা দুটি লিখে দিলেন। প্রকাশ্য মঞ্চে সেদিন ঢাকা সহরে মেয়েদের নৃত্যের তখনও প্রচলন হয়নি।

কর্মজীবনের এত ব্যস্ততার মধ্যেও আচার্য রমেশচন্দ্র ছাত্রদের যে কত খুঁটিনাটি ব্যাপারেও খোঁজ রাখতেন, তার এখানে দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করে পারছি না। ছাত্রজীবনে আমি খুব দুরন্ত ছিলাম, অনেককে অনেক সময় অকারণে বিরক্ত করতাম। এখন তার জন্য মধ্যে মধ্যে অনুতাপ করি।

জগন্নাথ হলের দক্ষিণ বাড়ীতে (South House) আমি আবাসিক ছাত্র ছিলাম। সেখানে এক একজন ছাত্র পালা করে পনরদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হাতে নিত, তাকে 'ম্যানেজার' বলত।

একবার এক ম্যানেজার খুব খারাপ খাওয়া দিতে লাগল। তার দোষই বা কি? ছাত্রেরা মাসে ৮ টাকা খাবারের জন্য দেয়, তাতে পনের দিন পর একটি 'ভোজ'ও (feast) দিতে হয়। তথাপি সব ছাত্রেরাই তাকে টিট্‌কারি দিতে লাগল, কিন্তু তাতে তার কোনো চৈতন্য হ'লো না। একদিন আমার এক সহপাঠী আমাকে এসে তার কিছু প্রতিকার করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার অনুরোধ, আমি একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে নোটিশ বোর্ডে সেঁটে দিই। যাতে আমি সেই কবিতা লিখেছি বলে কেউ বুঝতে না পারে, সে জন্য সে নিজেই কবিতাটির একটি অনুলিপি করবার আশ্বাস দিল।

তথাপি আমি জানতাম, আমি ধরা পড়ব। ম্যানেজার আমাদের অপেক্ষা চার ক্লাস ওপরে পড়ত, সুতরাং তিনি আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তাকে ব্যঙ্গ করলে অপরাধ হবে, সেজন্য তিনি প্রভোস্টের কাছে বিচারপ্রার্থী হবেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতা লিখলাম। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার একটি লালিকা (parody)। কবিতাটি আমার সহপাঠী একটি অনুলিপি করে নোটিশ বোর্ডে রাত্রে গোপনে গিয়ে সেঁটে দিল। এমনভাবে আঁটা দিয়ে দিল যে তা ছেঁড়াও যায় না, তোলাও যায় না। যথা সময়ে অধ্যক্ষের নিকট নালিশ করা হলো, নালিশের প্রথম কথা, অর্বাচীন একজন ছাত্র প্রবীণ ছাত্র ম্যানেজারকে কবিতা লিখে ব্যঙ্গ করেছে, তার শাস্তি চাই। বলা বাহুল্য, অন্যের হস্তাক্ষর থাকলেও

আমার নামটি তাতে গোপন রইলনা, সোজাসুজি আমার নাম করেই লিখিতভাবে নালিশ করা হলো। প্রভোস্ট সে-নালিশ 'সরকারীভাবে' গ্রহণ করে ম্যানেজারকে অবিলম্বে তদন্তের আশ্বাস দিলেন।

তখনকার দিনে ছাত্রজীবন আমাদের কি অবস্থার মধ্য দিয়ে যাপন করতে হয়েছিল, তা একটু বুঝিয়ে বলবার জন্য বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে লিখলাম। আজকের দিনে আবাসিক ছাত্রেরা কল্পনাও করতে পারেন না যে এই রকম একটি তুচ্ছ বিষয়ে একটা নালিশ চলতে পারে এবং সেই নালিশ 'সরকারী'ভাবে গৃহীত হতে পারে।

যাই হোক, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অর্বাচীন ছাত্র হলেও ছাত্র-পরিষদের সাহিত্য-শাখার সম্পাদক, বহু কাজেই অধ্যক্ষের সংস্পর্শে আসতে হয়। সে জন্য আমিও আমার 'অপরাধে'র জন্য শাস্তির আশংকায় চিন্তিত হ'লাম।

যেদিন সকালে কবিতাটি প্রকাশিত হয় সেইদিনই বিলম্ব না করে ম্যানেজার প্রভোস্টের বাড়ীতে গিয়ে নালিশ দায়ের করে এসেছিলেন এবং প্রভোস্ট আচার্য রমেশচন্দ্র আপিশে এসেই তাঁর আপিশের জামাকাপড় পরেই দুপুরবেলা আমাদের রান্নাঘরের সামনে যে নোটিশ বোর্ড ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে অভি-যোগের সত্যতা যাচাই করতে লাগলেন। অর্থাৎ অভিযোগের মধ্যে যে কবিতাটি ম্যানেজার আমার লেখা বলে উদ্ধৃত করেছিলেন, তা সত্য কিনা তা নোটিশ বোর্ডে টাংগানো কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন।

ঘরে বসেই এক সতীর্থের কাছে সংবাদ পেলাম, প্রভোস্ট এসে কবিতাটি পড়ছেন।

আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, একটা এত তুচ্ছ কাজে প্রভোস্ট স্বয়ং হোস্টেলের রান্নাঘরের দরজায় এসে নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়েছেন ?

ছাত্রেরা প্রায় কেউ আশেপাশে নেই, অনেকেই ক্লাসে চলে গেছে, কেউ কেউ তাঁকে দেখতে পেয়ে সেখান থেকে সরে গেছে। ছাত্রাবাস অনেকটা নির্জন। আমি জানালা খুলে দেখলাম, নোটিশ বোর্ডে কবিতাটি পড়ে তিনি আবার তাঁর আপিশের দিকে গম্ভীরভাবে চলে গেলেন। আমি ঘরে বসে প্রমাদ গুণতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আপিশ ঘরে আমার ডাক পড়ল। আচার্য রমেশচন্দ্রের চরিত্রের একটা প্রধান গুণ ছিল, কোনো ব্যাপারই তিনি মুলতুবী রেখে দিতেন না। এই ব্যাপারটাও তিনি সত্বর মীমাংসা করতে চাইলেন।

আমি একা তাঁর সামনে যেতে সাহস পেলাম না। আমাকে এই কাজে যারা প্ররোচিত করেছিল, তাদের জন কয়েককে সংগে নিয়ে অধ্যক্ষের আপিশ ঘরের দিকে চললাম। তারা খুব অনিচ্ছা সত্বে, নবমীর পাঁটাকে যে-ভাবে হাঁড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেইভাবে আমার সংগে চলল। আমার কি শাস্তি হতে পারে, তাই ভাবতে ভাবতে আমি সবাইকে নিয়ে চললাম।

আমার সংগীরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর আপিশ ঘরে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গিয়ে দেখি আমার বিরুদ্ধে যিনি অভিযোগ করেছিলেন, (তিনি ইতিহাসের ছাত্র, আচার্য রমেশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র) তিনি আগে থেকেই সেখানে গিয়ে বসে আছেন। তাঁর সংগে আরও দু'তিনজন প্রবীণ ছাত্রও আছেন।

অধ্যক্ষ আমাকে দেখা মাত্রই উচ্ছ্বসিত হাস্যে আমাকে অভিনন্দিত করে বললেন : 'আশু, তুমি যে এত ভাল কবিতা লেখ, তা ত জানতাম না।' এই বলে আমার লেখা কিছু কিছু অংশ পড়ে কেবলই হাসতে লাগলেন। তাঁর এই হাসি দেখে আমার অভিযোগকারীও তাঁর সংগে সংগে হাসতে লাগলেন। সাহস পেয়ে আমার যে সকল সংগী ছাত্র বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তারাও এসে ভিতরে ঢুকল।

দু' একজন অধ্যক্ষের কথায় সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, স্যার, কবিতায় আশুর বেশ ভাল হাত।

আমি সব ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, অপ্রস্তুতভাবে পুরস্কার গ্রহণ করলাম। আমার চোখে প্রায় জল চলে এলো।

তারপর আচার্য রমেশচন্দ্র আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'দেখ, আমরা যখন হিন্দু হোস্টেলের ছাত্র, তখন একদিন হোস্টেলে পাঁটার মাংস রান্না হলো। মাংস অনেকে খেত, অনেকে খেত না, তাই পরিবেশনকারী বামুনঠাকুর মাংস পরিবেশনের সময় সবাইকে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করত, বাবু আপনি কি পাঁটা? তার অর্থ আপনি পাঁটার মাংস নিবেন কি না। তাতে হাস্যরোল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এই বয়সে যদি এক আধটু হালকা হাসিঠাট্টা না করবে তবে আর কবে করবে?' তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশু, তোমার কাব্যচর্চা বন্ধ করো না, আর অভিযোগকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, ক্লাসে যাও, এখানে সময় নষ্ট করো না। বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে চলে গেলেন।

তার বহুদিন পরও তিনি এই ঘটনাটি স্মরণ করে একদিন ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর এক সভায় প্রসংগটি পরিহাসচ্ছলে উল্লেখ করেছিলেন।

আচার্য রমেশচন্দ্রের নিকট আমার বিরুদ্ধে এমনই আর একটি অভিযোগ প্রায় এমনই ভাবে নিষ্পত্তি হয়েছিল। তাও এখানে উল্লেখ করিতে পারি। সেই অভিযোগটি ছিল একটু গুরুতর। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'লেকচারার' এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; অভিযোগকারী স্বয়ং মোহিতলাল মজুমদার, আমার শিক্ষক এবং পরে সহকর্মী।

যখন থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'লেকচারার'রূপে যোগদান করি, তখন থেকেই প্রায় বিভিন্ন হলের বাৎসরিক মুখপত্রের প্রবন্ধাদি পরীক্ষা করে দেওয়ার ভার আমার উপরে ছিল। দৈবাৎ 'বাসন্তিকা' পত্রিকায় একটি লেখকের নামগোত্রহীন এক ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হলো, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপককেই কমবেশি 'আক্রান্ত' হ'তে হয়েছিলো। সরকারীভাবে তার জন্য অপরাধ আমারই ছিল, তথাপি আমার একটি নিষ্কৃতির পথ ছিল যে আপত্তি-জনক প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না বলে আমি তা বিচার করিনি এবং আমার নাম স্বাক্ষর করে অনুমোদিত কথাটিও লিখে দিইনি, সুতরাং আইনতঃ আমি তার জন্য দায়ী হতে পারি না। তথাপি কবি মোহিতলাল আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। উপাচার্য তা উপেক্ষাও করতে পারেন না। তবে তিনি এই বিষয়ে বিচারের দায়িত্ব নিজের হাতে না নিয়ে জগন্নাথ হলের তখনকার 'প্রভোস্ট' অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করলেন। তিনি অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছিলেন, কারণ, এই বিষয়ে পরে আর কিছুই জানতে পারিনি।

আচার্য রমেশচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গুণ তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা। কর্তব্য যত তুচ্ছই হোক তাকে তিনি কখনও ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বলে মনে করতেন না। ছাত্রদের সমিতি, উপসমিতির সভায় তিনি যোগদান করে প্রত্যেকটি সভা যত তুচ্ছ কারণেই ডাকা হোক না কেন, তাতে অংশ গ্রহণ করতেন। যদিও প্রত্যেক সমিতি এবং উপসমিতির এক কিংবা একাধিক সহসভাপতি থাকতেন, তথাপি এমন কোনও সভা আমি দেখতে পাইনি, যাতে কোনও সহ-সভাপতি তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করবার সুযোগ পেয়েছেন। এই বিষয়টি খুবই অসাধারণ বলতে হবে; কারণ অন্যান্য হলের সহ-সভাপতিগণ সে সুযোগ সর্বদাই পেতেন।

তস্মৈ নমঃ

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৫ সাল। সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। সব কিছুই নতুন। একদিন করাইডার কাঁপিয়ে সুসজ্জিত সুদর্শন পুরুষ সুট্‌বুট্‌ পরে যাচ্ছেন। ইনি কে? জানতে পারলাম ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। ইনি সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক যাঁর ইতিহাস আমরা স্কুলে পড়ে এসেছি। তাঁর দর্শনে নিজেকে ধন্য মনে হল।

ইতিহাস-ক্লাসে ড. মজুমদার পড়াচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীরা নীরব নিস্পন্দ, পিন্‌টি পড়লেও শব্দ শোনা যায়। আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম না। তথাপি এই অধ্যাপক-যাদুকরের অধ্যাপনাপদ্ধতি অনুধাবন করলাম। অনর্গল ইংরেজীভাষায় বক্তৃতা, কণ্ঠস্বর স্পষ্ট।

ড. মজুমদারকে প্রথম দেখি ইতিহাস বিভাগীয় প্রধানরূপে। তারপর তিনি উপাচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। শাসনভার গ্রহণ করলেও একটি দিনও তিনি লেখাপড়া বর্জন করেননি। তাঁর জীবনধারা অনুধাবন করেছি খুব নিকট থেকে। কি করে মানুষ বড় হয় তা লক্ষ্য করা ছিল আমার কাজ। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে তা ছিল অনায়াসসাধ্য। ছোট জায়গা। অধ্যাপক-ছাত্রগণের গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস। অধ্যাপকগণের বাড়ীতে ছাত্রগণের জন্য ছিল অবারিত দ্বার।

ড. মজুমদার ঠিক সময়মতো অফিসে আসতেন। প্রশাসনিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক্লাশও নিতেন। তাছাড়া গবেষণা করতেন এবং করাতেন। বিশিষ্ট অভ্যাগত এলে তাঁর অভ্যর্থনা করতেন। বিভিন্ন হলে (হোস্টেলে) নানা অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি স্বর্গত অধ্যাপক পি. কে. গুহ মহাশয়কে। সদা হাস্যমুখ ও সঞ্চরণশীল গুহ মহাশয়ের আগমনে ছাত্রদের মধ্যে স্পন্দন হত, আর ড. মজুমদারের দর্শনে হত সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়। একদিকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রকট, অপরদিকে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রেরণাদায়ক।

একদিন সাড়া পড়ে গেল। ড. মজুমদারের বক্তৃতা জগন্নাথ হলে, বিষয় ঃ সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ। ইতিহাসের ছাত্র না হলেও বিষয়টি আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হল। শুধু আমার কাছে নয়, নানাবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও। সভাকক্ষ উপচে পড়ল শ্রোতৃবারিধি। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত ড. মজুমদারের আগমন; নিখুঁত বেশভূষা, মাথায় সুবিন্যস্ত রুপালী-রেখা মিশ্রিত কৃষ্ণকেশপাশ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। বক্তৃতা শুনলেন সকলেই নীরবে। আমি ভাবলাম—এত কাজের মধ্যেও কি করে ইনি এত তথ্য সংগ্রহ করলেন, কি করে এত চিন্তা করলেন। প্রেরণা পেলাম যে, ইচ্ছা থাকলে উচ্চচিন্তায় কোন ব্যস্ততাই বাধা জন্মাতে পারে না।

ড. মজুমদারের স্বাধীন চিন্তা শুধু কেতাবেই সীমিত ছিল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অভিনবত্ব প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর একটি কীর্তি Open access system। আগে নিয়ম ছিল যে, লাইব্রেরীর বই পেতে হলে ছাত্রকে কাউন্টারে স্লিপ্‌ দিতে হত। অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পরে হয় বই এল, নয়ত খবর এল বই নেই। ছাত্রদরদী রমেশচন্দ্র বললেন যে, ছাত্র নিজের বই নিজেই খুঁজে নেবে। ফলে একটি বই দেখতে গিয়ে অন্য পাঁচটি বইয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হবে। বেশ চলছিল। কিন্তু, সুযোগের অপপ্রয়োগে আমরা নিপুণ। একদিন দেখা গেল যে, Encyclopedia Britannicaর

তখনকার সর্বশেষ সংস্করণের গুটিকতক পৃষ্ঠা কেউ ব্লেড্ দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে। বইটির উপযোগিতা কমে গেল। ড. মজুমদারের কানে গেল একথা। তাঁর স্বপ্রবর্তিত নিয়মে এমন অপকর্ম হয়েছে শুনে তিনি মর্মাহত হলেন। ভয় দেখালেন যে, ঐ পৃষ্ঠা কয়টি উদ্ধার না হলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে নতুন সেট কিনে নিবেন। ফলে দোষীকে বার করা হল, কিন্তু কর্তিত অংশ পাওয়া গেল না। অন্য প্রতিষ্ঠানের একটি বই থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ টাইপ করে জুড়ে দেওয়া হল ঐ অঙ্গহীন বইটিতে।

ড. মজুমদারের আর একটি ছাত্রহিতকর কাজ ছিল। তিনি অভিযোগ শুনতেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কর্মস্থলে ইংরেজীতে চিঠি মুসাবিদা করতে পারে না, পারলেও চিঠিপত্র লেখার কায়দা এবং ইংরেজী জ্ঞানে তাদের দৈন্য দেখা যায়। এর প্রতিকারকল্পে তিনি একটি পরীক্ষার প্রবর্তন করলেন। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক থাকবে না। চিঠি, প্রেসি, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখার পরীক্ষা। প্রশিক্ষণের জন্য ক্লাশ হত। দু'মাস পর পর পরীক্ষা। আর নিয়ম ছিল যে, বি. এ. পাশ করলেও ততক্ষণ কেউ ডিগ্রী পাবেনা যতক্ষণ সে এই পরীক্ষা পাশ করতে না পারে। এমন দেখা গেছে যে, কোন ছাত্র ইংরেজীতে অনার্স পাশ করেও উক্তপরীক্ষা পাশ করতে না পারায় ডিগ্রী পায়নি।

আচার্য রমেশচন্দ্রের জীবন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। যত ব্যস্ততাই থাক্, নিয়মিত টেনিস্ খেলা ছিল তাঁর অভ্যাস! পড়াশোনা, লেখা প্রভৃতি তো নিয়মিত চলতই। অবসরগ্রহণের পরেও তিনি কখনও বসে থাকেননি। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কন্‌ফারেন্স-এ তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর অগণিত প্রবন্ধ নানাপত্র পত্রিকায় তাঁর মনীষা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মূকসাক্ষী।

গবেষণা-কর্মে তিনি বহু লোককে প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় আমি ব্যক্তিগত-ভাবে উপকৃত হয়েছি। আমার একটি বইয়ের পরিচিতি তিনি দিয়েছিলেন। শুধু দু'কলম লেখা নয়। রীতিমত বইটি পড়ে তার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার লেখা কোন কোন বই সম্বন্ধে তাঁর অভিমত পড়ে মনে হয় যে, তিনি বই খুঁটিয়ে পড়েন এবং নিজের বিষয় না হলেও তিনি বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করেন। সমালোচনায় তিনি একদিকে যেমন সহৃদয় অপরদিকে তেমনই কঠোর। ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করতে তিনি ছাড়েন না।

রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে ও সারস্বত-জীবনে ঋজুতা সবিশেষ লক্ষণীয়। যাকে যা বলার তাকে তা সোজা বলে দেন তিনি। এমন কখনও শুনিনি যে, মুখে একরকম বলে কাজে অন্যরকম করেছেন। ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ। গতানুগতিক মতবাদকে যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে পরীক্ষা করে প্রয়োজন হলে তিনি বর্জন করেন। নিন্দা, প্রশংসা প্রভৃতির ভয়ে বা মোহে তিনি সত্যকে চেপে রাখতে চাননা। আচার্য যদুনাথের যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে তিনি এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করেছেন—সত্যকে জানিব, সত্য বলিব, নিন্দা সহিতে হয় সহিব।

আচার্য রমেশচন্দ্র নব্বই বছর বয়স্ক। আয়ু, বিত্ত, যশ প্রভৃতির অধিকারী হয়েছেন তিনি। বাগদেবীর বরপুত্র এই মনীষী স্থির-অঙ্গসহ দীর্ঘতর দেবহিত আয়ুলাভ করুন—ঈশ্বরচরণে এই প্রার্থনা জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমাপ্ত করছি।

শ্রদ্ধেয় আচার্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

যে দু'জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী তথা ভারতীয় ঐতিহাসিকের অত্যন্ত সান্নিধ্যে আসার আমি সুযোগ পেয়েছি তাঁরা হলেন আচার্য যদুনাথ সরকার এবং আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার।

আচার্য মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯২১ সনে যখন নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হই বি. এ পড়ার জন্য তখন তিনি ওখানে ইতিহাসের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ও মধুর।

আমি আচার্য যদুনাথ সরকারের অধীনে ইতিহাসে গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে আমার থিসিস দাখিল করলাম পি. এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য। আমার ফল জানার জন্য কয়েক মাস আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। ড. মজুমদার একটি সুন্দর চিঠি লিখে আমার সাফল্যের জন্য আমাকে অভিনন্দিত করলেন ; আমি এখনও এই চিঠির কথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। একজন শিক্ষক ছাত্রের প্রতি কতটা সহানুভূতি সম্পন্ন হলে এমন ব্যবহার করতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যদিও স্বাভাবিকভাবে আমার খুবই আকর্ষণ ছিল তথাপি কার্যোপলক্ষে বিভিন্ন যায়গায় থাকার দরুণ পরে তেমন যোগাযোগ হওয়া সম্ভব হত না এবং আচার্য মজুমদারের সঙ্গেও আমার সাক্ষাতের সুযোগ কম হত। অনেকদিন পরেও আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে মোটেই ভোলেননি ; হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম, তিনি আমাকে কিছু লেখার কাজ দিতে চেয়েছেন। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু লেখার ভার তিনি আমাকে দিতে চাইলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বললেন। এখানে বলা দরকার যে, এর অনেক আগে থেকেই তিনি ভারতীয় বিদ্যাভবনের History and Culture of the Ind an People এর General Editor নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এই গ্রন্থের অনেক খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিতও হয়েছিল। তিনি সপ্তম খণ্ডের (The Mughul Empire এর) কতকগুলি অধ্যায়ের লেখার ভার আমাকে পর পর দিয়েছিলেন এবং সেগুলি আমি সময়মত লিখেও দিয়েছিলাম। এই গ্রন্থের সহকারী সম্পাদকের পদও তিনি আমাকে দেন। আমার একটি লেখার কিছু অংশ সপ্তম এবং কিছু অংশ অষ্টম খণ্ডে ছাপান হয়, বাকি সবগুলিই সপ্তম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

এগারটি বড় বড় খণ্ডে প্রকাশিত ভারতের এই বিরাট ইতিহাস—বৈদিক যুগ থেকে ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত—সমস্তই আচার্য মজুমদার একা সম্পাদনা করেছেন, কতিপয় সহকারী সম্পাদকের সহায়তায়। খ্যাতনামা ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাই এইসব খণ্ডের লেখক। সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা রচিত ভারতের এত বড় প্রামাণ্য ও মূল্যবান ইতিহাস এই প্রথম এ-দেশে প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিরাট গ্রন্থের সম্পাদনার ভার ১৯৪৫ সনে যখন কুলপতি কে. এম. মুন্সী আচার্য মজুমদারকে দিয়েছিলেন তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "The Samiti (Bharatiya Itihasa Samiti) was lucky in securing the services of Dr. R.C. Majumdar, formerly Vice-Chancellor of Dacca University and one of India's leading historians, as full-time editor..."

এ-কাজের ওপরে আচার্যদেব কিরকম গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই জানা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ "ইতিহাস চর্চার দিক থেকে এইটিই আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করি।" তিনি দীর্ঘ বত্রিশ বছর যে উদ্যম, অমানুষিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং কর্মে অবিচলিত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কঠিন অসুস্থতার মধ্যেও তিনি এ-কাজ পরিত্যাগ করেননি। এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা এবং উচ্চমানের জন্য চারিদিকে বিশেষ প্রশংসাও লাভ করেছে। ভারতে এর আগেও কয়েকবার এ রকম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা হয়েছে কিন্তু কোনটিই শেষ পর্যন্ত সাফল্য-মণ্ডিত হয়নি।

উপরোক্ত এগারটি খণ্ডের মধ্যে সর্বশেষে প্রকাশিত হয় অষ্টম খণ্ড। গতবছর ২৫শে আগষ্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর সভাপতিত্বে নূতন দিল্লিতে ভারতীয় বিদ্যাভবনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

দেশবরেণ্য নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর বাণীতে লিখেছিলেন, "To write a faithful and unbiased history of a nation like India whose history dates back to thousands of years is no small task. Hence it is no wonder that the project, under the General Editorship of the noted historian, Dr. R. C. Majumdar, captaining a team of 80 distinguished scholars—each a specialist in his chosen field—has taken 32 long years for completion. I am glad to hear the History has already won plaudits from scholars and educationists the world over and is considered one of the high watermarks of the achievements of modern Indian scholarship." প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন, "He (Munshiji) had always a great capacity for finding the right man for the right job. And that is why he selected Dr. Majumdar who has the correct view about history and the duty of a historian..." ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও বলেন, "One may well compare Dr. Majumdar to the celebrated Greek historian Thucydides who wrote his classic history of the Pelopponnesian war and did so as a true historian. Dr. Majumdar set before himself the high ideals of a true historian and stuck to them all these years in seeing through these 11-volumes."

তাঁর এই দীর্ঘ নব্বইবছর বয়সের (জন্ম ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) পেছনের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তিনি কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন ভারতের ইতিহাস-সাধনায় এবং কিরকম অমূল্য গ্রন্থ তিনি একের পর এক প্রকাশ করেছেন। ১৯১১ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করে ১৯১৩ সনে ঢাকায় সরকারী ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়ে যান এবং ১৯১৪ সনের জুলাই মাসে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার-এর পদে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর মন ছিল ভারত-ইতিহাসে গবেষণার দিকে। তিনি নিজেই লিখেছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদেবার অল্প কিছুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আমার প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১৯১৪ সালে)।" তাঁর নিজের লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, এ-ধরনের একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফিথ পুরস্কার পান এবং "সেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু কতকটা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে" তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির থিসিস্ হিসেবে দাখিল করেন এবং এই ডিগ্রি প্রাপ্ত হন (১৯১৯ সাল)। বিষয়বস্তু ছিল "Corporate Life in Ancient India.' গবেষণার কাজে ক্রমেই তিনি আরও বেশী উৎসাহিত হন।

পূর্বেই বলেছি, ১৯২১ সনে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন এবং ১৯২৪ সনে তিনি জগন্নাথ হলের প্রোভাস্টও (Provost) নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সন থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি তাঁর গবেষণার কাজ কখনও পরিত্যাগ করেননি ; এ-কাজের জন্য তাঁর সময় নির্দিষ্ট করা থাকত এবং ঐ সময় যাতে অবহেলায় নষ্ট না হয় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টিও থাকত। গবেষণার প্রতি ছিল তাঁর এমনই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "চম্পা"নামে "হিন্দু উপনিবেশের প্রথম খণ্ড" প্রকাশ করেন। এর পর তাঁর "মনে হল এ-বিষয়ে আরও ভাল করে পড়াশোনা করা দরকার ; কিন্তু তার জন্য ভারতের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন।" ১৯২৮ সনে তিনি যান ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং তার পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, অনাম (এখানে ছিল "প্রাচীন হিন্দু চম্পা রাজ্য," বর্তমান ভিয়েৎনাম), কাম্বোডিয়া, শ্যামদেশ (বর্তমান থাইল্যান্ড) ও মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি দেশে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস আবার লিখতে আরম্ভ" করেন এবং দু' খণ্ডে সুবর্ণদ্বীপ নামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং মলয় উপদ্বীপের ইতিহাস" লেখেন। ১৯৪৩ সনে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার উইলিয়াম মেয়ার বক্তৃতা দেন কাম্বোজ দেশ সম্বন্ধে—ইহা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় "কাম্বোজ দেশ নামে প্রকাশিত" করে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় হনোরেরিয়াম বক্তৃতা-মালা" যে-সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি Greater India নামে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। Hindu Colonies in the Far East নামে একটি ছোট পুস্তকও তিনি লিখেছিলেন।

ঢাকায় থাকতে তিনি বঙ্গদেশের যে একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন এখানে তার উল্লেখ করাও বিশেষ প্রয়োজন। এর প্রথম খণ্ড তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সনে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সনে আচার্য যদুনাথের সম্পাদনায়।

তাঁর ইতিহাস-চর্চা প্রাচীন ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের ইতিহাসের দিকেও তাঁর দৃষ্টি বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর গবেষণামূলক লেখার মধ্যে আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাই তাঁর বৈশ্লেষিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়-বস্তুর ওপরে পূর্ণজ্ঞান ও অধিকার, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, স্বাধীন অথচ যুক্তিপূর্ণ মতামত ও সত্য নির্ণয়ে আন্তরিক প্রয়াস। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁর কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি ছিল তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বেশ বোঝা যায়, তিনি লিখছেন, : "The goal of history.....is nothing more and nothing less than that history must be regarded as an eternal quest for truth. .....A historian must divest his mind of sentiments, prejudices and preconceptions, and all kinds of human emotions which are likely to distort his vision and judgment."

বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন ও নানা প্রকারে সম্মানিতও হয়েছেন। মাদ্রাজ ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা ছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধর মুখার্জি ও কমলা বক্তৃতা, বোম্বের ভারতীয় বিদ্যাভবনে বিড়লা Edowment lectures, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-বক্তৃতা, বিশ্বভারতীতে এক্সটেন্সন্-লেকচার এবং ত্রিবাঙ্কুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯৫৮ সনে তিনি Visiting Professor হয়ে যান

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ও পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির, কলকাতা ও বোম্বের এশিয়াটিক সোসাইটির Honorary Fellow এবং বোম্বের ভারতীয় বিদ্যাভবনের ইতিহাস বিভাগের অবৈতনিক অধিকর্তা। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি এবং এখানকার এশিয়াটিক সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন। তিনি সর্বভারতীয়-ইতিহাস-কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের প্রাক্তন সভাপতি এবং ১৯৬১ সনে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসের ইণ্ডোলজি শাখারও প্রাক্তন সভাপতি। মানব-জাতির সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্পর্কে UNESCO যে একটি ইতিহাস প্রণয়নের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করেছিল তিনি সেই সম্পাদক-মণ্ডলীর সহকারী সভাপতিও ছিলেন। তিনি ইংরেজি ও বাঙলায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

অর্ঘ্য

মন্মথ রায়

পুণ্যশ্লোক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের নব্বই বৎসর পূর্তি বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে একটি ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি। এজন্য শুধু আমরা নই, বিশ্বের যে কোন জ্ঞান-পিপাসু আনন্দিত হবেন এবং কামনা করবেন আচার্যদেব শতায়ু হ'ন।

আমার জীবনে যে কয়েকটি ঘটনা সৌভাগ্য বলে মানি আচার্যদেব রমেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় তার অন্যতম। জীবন দেবতার কি ইচ্ছা ছিল জানিনা, তাঁর দর্শন আমি পাই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে, আমার বাল্যকালে, আমি তখন বালুরঘাট হাইস্কুলের ছাত্র। বালুরঘাটের অতি সন্নিকটে মহীসন্তোষ নামে একটি গ্রামের খুব উঁচু একটি স্তূপ ছিল। আমরা সবিস্ময়ে শুনলাম—ঐ স্তূপের ভেতর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু নিদর্শন থাকা সম্ভব মনে করে ওটা খুঁড়ে দেখতে আসছেন রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ থেকে একদল পণ্ডিতব্যক্তি। যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীঘাপতিহার রাজকুমার শরৎকুমার রায় এবং রাজশাহী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার। খুব কাছে থেকেই তাঁদের দেখার সুযোগ হ'ল আমার। কারণ, আমার পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় ছিলেন প্রাচীন মূর্তি ও নিদর্শন সংগ্রহকারী এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে পরম উৎসাহী, এবং এই জন্যই ছিলেন অক্ষয়কুমারের পরম স্নেহের পাত্র ; গৌড় রাজমালার ভূমিকায় আমার পিতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। মূলতঃ আমার পিতার কাছ থেকে সন্ধান পেয়েই অক্ষয়কুমার সদলবলে মহীসন্তোষ স্তূপ খননে আগ্রহী হ'ন। অক্ষয়কুমার সদলবলে আমাদের বাড়ীতেও শুভ পদার্পণ করেছিলেন। তাঁদের আপ্যায়ন কালেই অতবড় সব পণ্ডিতদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার সুযোগটি পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। কথা বলার কোন সুযোগই হয় নি, অতবড় সব পণ্ডিতদের সঙ্গে আমি কি কথাই বা বলতে পারি। তাঁদের দেখে অবাক হওয়াটাই ছিলো সেদিন আমার পরমপ্রাপ্তি। আমার কথা তাঁদের কারুরই মনে থাকবার কথা নয় কিন্তু তাঁদের কথা সেই থেকে আমার মনে আছে চিরদিন চিরকাল। অনেক পরে অবশ্য ওঁদের তিনজনেরই স্নেহধারায় সিঞ্চিত হ'তে পেরেছিলাম আমি।

১৯২২ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও ল ক্লাশে ভর্তি হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় আমার রচিত একটি একাঙ্ক নাটক "মুক্তির ডাক" জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ড. নরেশ সেনগুপ্তের সহায়তায় ক'লকাতার স্টার থিয়েটারে ১৯২৩ সালের বড়দিনে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এই হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই আমার নাট্যজীবনের ধাত্রীমাতা। ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ক'লকাতা চলে গেলে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হলেন ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। আমি জগন্নাথ হলেরই আবাসিক ছাত্র ছিলাম। ড. মজুমদারের সঙ্গে ঐখানেই হয় আমার নিবিড় যোগাযোগ এবং পরিচয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা-জগতটি গড়ে উঠেছিলো তা তদানীন্তন কালে ছিল একটি পরম বিস্ময়। তার কারণ ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইঁটপাথরে গড়া প্রাসাদোপম নতুন বাড়ী-ঘর নয়, সাজ-সরঞ্জামও নয়, কারণ ছিলো শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক-মণ্ডলীর ও শিক্ষকবর্গের সুনির্বাচিত সমাবেশ। ছাত্র হিসেবে আমরা অধ্যাপক ও শিক্ষকদের

কাছ থেকে যে ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং সাহচর্য পেতাম তা মুগ্ধচিত্তে অবশ্যই স্মরণ ক'রব এইজন্য যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এটাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটা অনন্য বিশেষত্ব ও পরম আকর্ষণ। কার কথা ছেড়ে কার কথা ব'লব? হারটগ সাহেবের মহানুভবতা, ড. নরেশ সেনগুপ্তের সাহিত্যদীপ্ত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, দার্শনিক-প্রতিভা শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্যের অপূর্ব জীবন-দর্শন, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক দীপ্তি—উজ্জ্বল কর্মকুশলতা, রহমন সাহেবের মাধুর্য মণ্ডিত অপূর্ব সৌজন্য। আমাদের জগন্নাথ হল-এর আবাসিক কর্মকর্তা অধ্যাপক ইউ. সি. নাগ এবং অধ্যাপক পি. কে. গুহ-এর শান্ত-স্নিগ্ধ প্রীতি ও শুভেচ্ছামণ্ডিত ছাত্র-বাৎসল্য। কার কথা ছেড়ে কার কথা বলব? ওখানে গিয়ে যাঁরা তখন বিশ্ববিদ্যার হোমানল জ্বেলেছিলেন তার পরশ পেয়ে আমরা সারাজীবন কৃতার্থবোধ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব মণিমুক্তার সমাবেশেও আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রশাসনিক দক্ষতায় ছিলেন সমুজ্জ্বল। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছিলেন তিনি। চরিত্রে যেমন তিনি ছিলেন কোমল তেমনি ছিলেন কঠোর। তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষক এবং শাসক। এই যোগাযোগটি ছিল সত্য সত্যই অনন্য। আজকের শিক্ষাজগতের নৈরাজ্যে মনে হয় রমেশচন্দ্রই সেই উজ্জ্বলতম আদর্শ যিনি অতি অবশ্য স্মরণীয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবন সর্বশেষে যে কারণটিতে অবিস্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে তা হচ্ছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সান্নিধ্যের সুযোগ ও সৌভাগ্যলাভ। তার মূলেও আচার্য রমেশচন্দ্র।

প্রধানতঃ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে এবং আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৬ সাল) বিকাল বেলায় ঢাকা পৌঁছান। সমস্ত ঢাকা মেতে উঠল। অমন আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সত্যই বিরল। ড. মজুমদার রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য-ব্যবস্থা যাতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর এবং ত্রুটিশূন্য হয় সেজন্য আমাদের ছাত্রদের সহযোগিতা কামনা করলেন। এ বিষয়ে ছাত্ররা নিজেরাও কম উৎসুক ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী, প্রতিমাদেবীর পালিতা শিশুকন্যা শ্রীমতী নন্দিনী, রবীন্দ্রসংগীত-ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিকেতনের সম্পাদক কালীমোহন ঘোষ, অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী মিস্টার মরিস, শান্তিনিকেতনের চীনা ভবনের চীনদেশীয় অধ্যাপক লিম্, শান্তিনিকেতনে আগত ইতালীর অধ্যাপক ফর্মিকি ও অধ্যাপক তুচ্চি। রবীন্দ্রনাথ ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন। এবং তিনি আগাগোড়াই ড. মজুমদারের অতিথি হিসাবে ছিলেন। প্রথম দু'তিন দিন তিনি ওয়াইজ ঘাটে বুড়িগঙ্গার বুকে ঢাকার নবাব বাহাদুরের 'তুরাগ' নামক গ্রীণ বোটে বাসকালেও ড. মজুমদারের বাড়ী থেকেই ঐ হাউস-বোটে কবির আহার্য যেত। হাউস-বোটের সামনে জনতাকে সুশৃঙ্খল রাখা, কবির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং ড. মজুমদারের সঙ্গে প্রয়োজন-মাফিক যোগাযোগ রাখার দায়-দায়িত্ব যে-সব ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাদের নেতৃত্বের সম্মান আমিই পেয়েছিলাম। এবং বলতে দ্বিধা নেই, কবি এবং ড. মজুমদার উভয়েই আমাদের কার্যে সবিশেষ প্রীত হয়েছিলেন। আমাদের সেই উদীয়মান জীবনে বিশ্বকবির এই সান্নিধ্য এবং স্নেহাশিস লাভ আমাদের সমস্ত জীবনকে এক অনির্বাণ আলোকে উদ্ভাসিত রেখেছে। আমাদের কয়েকজনের সাহিত্যকর্ম ঐ হাউস-বোটে থাকা কালেই কবি পাঠ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে জগন্নাথ হলের সাহিত্যপত্র ৩য় বার্ষিক 'বাসন্তিকা'-তে 'ঘরের খবর' নিবন্ধে উল্লিখিত রয়েছে :—

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঢাকা প্রবাসকালে ড. শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদারের অতিথি স্বরূপ কয়েকদিন ছিলেন। হলের ছাত্রগণ তখন কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কবির

অসুস্থ অবস্থায় সর্বদাই আমাদের ছাত্রগণ তাঁহার কাছে ছিলেন। কবি মন্মথবাবুকে এবং বাসন্তিকায় প্রকাশিত শ্রীযুত গণেশচরণ বসুর 'মেঘদূত' অনুবাদকে খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

আমার পরবর্তী জীবনেও আচার্য রমেশচন্দ্রের সস্নেহ পরশ থেকে বঞ্চিত হইনি। আমার নাটকগুলির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলাম সেই "অশোক" তাঁকে উৎসর্গ করে আমি ধন্য বোধ করেছি : আমাকে চিঠি লিখে তিনি তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করেছিলেন। একই সঙ্গে প্রথম দেখা প্রত্নতত্ত্ব-গুরু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-কেও আমি আমার মহুয়া নাটকটি উৎসর্গ করে, প্রথম সন্দর্শনের মুগ্ধ বিস্ময়কে রূপায়িত করেছিলাম। তিনিও তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার আজকে নেই। রমেশচন্দ্র আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে আছেন। বাল্যকালে তাঁদের প্রথম দর্শনের শিহরণ আমাকে আজও চঞ্চল করে তোলে—যতদিন বাঁচবো এ চাঞ্চল্য থাকবেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের আশীর্বাদেই আজ আমি—আমি।

আচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

কালীকিঙ্কর দত্ত

আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে গুরুদেব ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। ইতিহাস ও সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর দান প্রগাঢ়। সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক ব্যক্তি হয়ে তিনি নিজে ইতিহাস লিখিয়াছেন এবং অন্য লেখকদের প্রেরণা দিয়াছেন। আমার জীবনে আমি তাঁর কাছে পদে পদে প্রেরণালাভ করিয়াছি। আজ আমার মনে পড়ে সেই দিনগুলি যখন আমরা Advanced History of India লিখিতে আরম্ভ করি ও ওই কাজের জন্য দুই বৎসর গরমের ছুটি ও পূজার ছুটিতে আমি কলিকাতা যাইতাম এবং প্রত্যহ গুরুদেব ৺ড. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিবাসস্থানে (6 Mysore Road) বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত আমরা তিনজনে এই বইখানির প্রত্যেক অধ্যায় আলোচনা করিয়া final করিতাম। আমার ধারণা যে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা ভিন্ন ভারতীয় বিদ্যাভবনের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি সময়ে প্রকাশিত হইত না। ইহা তাঁহার বিশেষ অবদান।

ইতিহাস অধ্যয়ন ও লিখন যে সত্যের-সেবা তাঁহার জীবনই ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। সর্বপ্রথম যখন সরকার History of Freedom Movement in India লিখিবার প্রস্তাব করেন তখন ড. মজুমদার ইহার জন্য গঠিত Board-এর সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি সত্য বিসর্জন দিয়া সরকারের হুকুমমত ইতিহাস লিখিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং Board হইতে সরিয়া যান। তারপর তিনি এ-বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার লিখিত History of Freedom Movement in India Vol. I 1962-তে Firma K. L. Mukhopadhay প্রকাশিত করেন। তাঁহার ৯০ বৎসর বয়স হওয়ায় তাঁহাকে তাঁর জন্মদিবস ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৭ তাঁহাকে Institute of Historical Studies-এর পক্ষ হইতে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয় তাহার নিম্নলিখিত উক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য :—

"Sir, your conception of History as a search for truth, irrespective of national, religious, regional, linguistic and other parochial considerations, and your conception of Historical Methodology based entirely on scientific and logical considerations, should serve as guidelines to the present and future generations of historians. We are passing through a temporary phase of confusion, cowardice, self-seeking and deliberate distortion of history under the influence of political isms and communal pressures. Let us hope and pray that some day atmosphere will be clearer and clearer and that historians will be free to unite according to the principles of truth and dictates of their honest conscience.

Sir, we pray to God that you will live long to enable the present and future generations of historians to go out of the confusion, doubts, distortions and falsehoods of the present and to return to the older path of truth, devotion and courage. We need your blessings for this change."

আমার নিজের জীবনে আমি পদে পদে ড. মজুমদার মহাশয়ের উপদেশমত লেখাপড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁর আশীর্বাদ এখনও আমি পাই। কয়েক মাস পূর্বে পাটনায় K. P. Jaiswal Research Institute-এর পক্ষ হইতে Comprehensive History of Bihar, Vol III (Modern Period) আমি সম্পাদনা করি। উহার একরূপি K. P. Jaiswal Institute হইতে তাঁহার কাছে পাঠান হয়। তিনি এই সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছেন :

"I think it is a good scholarly work and is the best history of Bihar so far written." ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি আরও দীর্ঘজীবী হইয়া ইতিহাসের যথার্থ সেবা করিবেন—এবং ইতিহাস-লেখকদের প্রেরণা দিবেন।

কাছের মানুষ রমেশচন্দ্র মজুমদার

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের তারিখটা আজ আর মনে নেই; ১৯৬৪ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ হওয়াই সম্ভব। নব পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলা গেজেটীয়ারগুলি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ তখন সবে হাতে নিয়েছি। কাজটা যে ঠিক কী প্রকারের সে-ধারণা প্রাঞ্জল হবার আগেই বুঝেছিলাম, সামনের পথ ক্ষুরধার ও দুর্গম কেননা আমার দু'জন প্রখ্যাত পূর্বসূরি ছিলেন মহাপণ্ডিত সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার ও অদ্ভুতকর্মা লিউইস্ সিড্নী স্টিউয়ার্ড্ ও'ম্যালী। গেজেটীয়ার রচনায় তাঁদের স্তরে পৌঁছনো যে সহজ কথা নয় তা তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল। তাছাড়া তাঁদের কাল ও আমার কালের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে বিবিধ বিদ্যার চর্চা এতদূর উন্নতিলাভ করেছে যে, গেজেটীয়ারগুলিতে তাদের সমাহারের কাজটা যে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী অভিনিবেশ ও পরিশ্রমসাধ্য হবে সে-বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম।

সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' নামে সচিত্র লেখাটার সূত্রে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকেই। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ হয়েছেন তাঁরাই জানেন, ভাষাতত্ত্বে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি কাছের মানুষের কাছে তাঁর বহিরঙ্গ পরিচয় মাত্র; তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তি আরও বহুতর বিদ্যার ক্ষেত্রে উচ্চ পারদর্শিতার সঙ্গে প্রসারিত ছিল। কিন্তু অধুনা জ্ঞানচর্চার পরিধি এতই সুপরিসর এবং প্রতিটি বিষয়ের অনুশীলন আবার এতই বিশদ যে, পৃথিবীর কোনো মহাপণ্ডিতের পক্ষেই তার সব ক'টিতে পূর্ণ অধিকার অর্জন করা সম্ভব নয়। আবার, অন্য দিকে, বিদ্যা বিনয় দান করে এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী খাঁটি পণ্ডিতেরা কখনই স্বীকার করবেন না যে, বিবিধ বিষয়ে তো দূরের কথা, যে কোনো একটি বিষয়েও তাঁরা সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানলাভ করেছেন। কেননা, যাবতীয় বিদ্যাই এখন চলিষ্ণু ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল। মানুষের সীমিত জীবনে সেই ক্ষিপ্র এবং অন্তহীন অগ্রগতির সঙ্গে বরাবর সমান তালে পা ফেলে চলা কখনই ঘটে না। এই বাস্তব পরিস্থিতি সুনীতিবাবুর মতো মহতোমহীয়ান্ পণ্ডিতের ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু যেসব বিষয়ে তাঁর অধিকার যথেষ্ট নয় বলে তিনি বিবেচনা করতেন, সেই সব বিষয়ের দিক্‌পালদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনে তিনি সদাতৎপর ছিলেন উত্তম গেজেটীয়ার প্রণীত হবার স্বার্থে। এইভাবেই, সুনীতিবাবুর মহানুভবতায়, বহু জ্ঞানতপস্বীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পাই যাঁদের ধারে কাছে পৌঁছবার কিছুমাত্র যোগ্যতা আমার তখনও ছিল না, এখনও নেই।

ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর ৪ নম্বর বিপিন পাল রোডের বাড়ির দোতলার বসবার ঘরে যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন বুকটা যে একেবারেই দুরদুর করে নি এমন কথা বলতে পারি না। শুনে এসেছিলাম, তিনি ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সুনীতিবাবুর মতো সদা-প্রাণোচ্ছল নন; কথা বলেন কম এবং তাও নিম্নকণ্ঠে, সুনীতিবাবুর মতো আবেগ-উৎসারিত অনর্গল ভাষা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তবে সুনীতিবাবুর মতোই তিনি জিজ্ঞাসুবৎসল, আগন্তুক

কোনো বিষয়ে—বিশেষ করে তাঁর অধ্যয়নের বিষয়ে—যথার্থ আলোকপ্রার্থী, সে-প্রতীতি হওয়ামাত্রই তার জন্য তাঁর গৃহ, তাঁর সময়, তাঁর সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার অবারিত হয় নিমেষে।

তিনি ঘরে ঢুকতেই বুঝলাম, এক বিরাট ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের ধুলো কিছুতেই নিতে দেবেন না। বহু কষ্টে সে-কর্তব্য পালন করলাম একান্ত আংশিকভাবে। আমার দুই কাঁধে হাত রেখে সামনের এক চেয়ারে বসালেন আমাকে। পরনে পাটভাঙা পায়জামা, গায়ে ধবধবে হাফ্-হাতা শার্ট, চোখে পুরু পরকলার চশমা। ছিয়াত্তর বছর বয়সের খুব কম বাঙালীকেই এত স্বাস্থ্যবান, এত সতেজ সটান দেখেছি। মামুলি কুশলসংবাদ বিনিময়ের পর, মুহূর্তকালও অপব্যয় না করে কাজের কথা পাড়লেন সোজাসুজি। আমার সমস্যা কি, জিজ্ঞাস্যই বা কি ধরণের সে-সম্বন্ধে সুনীতিবাবু টেলিফোনে একটু ভূমিকাবিস্তার করে রেখেছিলেন বলে আলোচনা আরম্ভ হল পুরোদমে।

অল্পক্ষণেই বুঝলাম, অপর পক্ষের বক্তব্য তিনি শোনেন একমনে, একবারও মাঝপথে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। তার পরে নিজের কথা বলেন অতি সংক্ষেপে। যখন বললাম, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার লেখা ও'ম্যালী সাহেবের গেজেটীয়ারগুলিতে জেলার ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে মোটামুটি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের জন্য দেওয়ান নিযুক্ত করে ফরমান জারি করেন), আর আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, লভ্য আঞ্চলিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলার ইতিবৃত্ত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে ভারতের স্বাধীনতালাভের বছর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, তখন রীতিমত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। সরকারী এ-সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন— গত অর্ধ-শতকে ইতিবৃত্তের, বিশেষত পুরাবৃত্তের, চর্চা বিশদভাবে হওয়াতে, আমাদের উপাদানের অভাব হবে না কিন্তু সেগুলির সংগ্রহ ও গ্রন্থন যে প্রচুর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাসাপেক্ষ সেকথা আমরা যেন সততই মনে রাখি। আমাদের ঐকান্তিকতায় সেদিন তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস উদ্রেক করতে পেরেছিলাম বলেই মনে হয়। কেননা, গেজেটীয়ার দপ্তরে আমার পাঁচ বছরের স্থিতিকালে, তিনি, পরম বিদ্যোৎসাহিতায়, আমাকে তাঁর পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসতে দিয়েছেন যে কোন প্রয়োজনে, যে কোনো সময়ে। আমার রচিত ও সম্পাদিত বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও দার্জিলিং জেলা-গেজেটীয়ারগুলির স্থলাভিষিক্ত হতে অনুরূপ তার এক গ্রন্থ পঞ্চাশ বছরের আগে প্রকাশিত হবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। (হাণ্টার এবং ও'ম্যালীর সিরিজ দুটির ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে কমবেশি একশ' বছর)। সেজন্য, আমার জীবদ্দশায় বা মরণোত্তর কালে, উল্লিখিত চারটি জেলা-গেজেটীয়ারের ইতিহাস-সম্পর্কিত পরি-চ্ছেদগুলি যদি সুলিখিত বলে চিহ্নিত হয়, তবে একথা এখনই বলে রাখা প্রয়োজন যে, সেই দুরূহ কৃতিত্বের প্রায় সবখানিই শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রাপ্য। এতে কোনো অতিরঞ্জন নেই, বিনয়-বচনও নেই; এ-উক্তি প্রকৃত সত্যের অনলংকৃত বিবরণমাত্র।

কেউ যদি মনে করেন, গেজেটীয়ার রচনাকালে ডক্টর মজুমদার কখনো-সখনো আমাকে দু'চারটি মৌখিক উপদেশ-নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন তাহলে তিনি ভয়ানক ভুল করবেন। জেলার আনু-পূর্বিক ইতিবৃত্ত কোন্ কোন্ প্রধান উপাদানের উপর নির্ভরশীল হবে, কী ভাবে সেগুলি গ্রথিত হবে, কোন্ উপকরণগুলি কতটা প্রাধান্য পাবে বা পাবে না, সর্বোপরি কিরকম সত্যসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সমস্ত রচনাটি নিয়ন্ত্রিত হবে—এসব ব্যাপারের প্রত্যেকটিতেই কখনো তাঁর আগ্রহের অভাব দেখিনি। শুধু ইতিহাসের পরিচ্ছেদই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর সদা-প্রসারিত সাহায্য কতদূর কার্যকর ও সহজলভ্য ছিল তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

হুগলী গেজেটীয়ার রচনাকালে লক্ষ করলাম, সে-জেলায় এত অগণিত কৃতী বাঙালী জন্মগ্রহণ করেছেন যে, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত-সংবলিত একটি পরিশিষ্ট গ্রন্থশেষে সংযোজিত না হলেই নয়। দীর্ঘতর এক নামের তালিকাকে, স্থানাভাবে, ড. মজুমদার ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে, রামমোহন-শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীঅরবিন্দ-আশুতোষ-শরৎচন্দ্র-মহসীন প্রমুখ ন'জনে নামানো গেল। তারপর, তাঁদেরই নির্দেশে, শ্রেষ্ঠ জীবনীকারদের দিয়ে চরিত-কথাগুলি লিখিয়ে আনলাম বিনা পারিশ্রমিকে। বিনা পারিশ্রমিকে এইজন্য যে, লেখকদের সম্মান-দক্ষিণা দেবার আমার প্রস্তাবে দোর্দণ্ড-প্রতাপ অর্থ-দপ্তর কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। রামমোহনের জীবনী লিখেছিলেন শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের—স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের—শ্রীশিশির কুমার ঘোষ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি। হাজী মহম্মদ মহসীনের ভার নিলেন ড. মজুমদার স্বয়ং। বলা বাহুল্য, এই লেখকগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিক্‌পাল, তাঁদের সময়ের যে কিছু মূল্য আছে সেকথা বঙ্গ-সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দপ্তরকে আমি শত চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি। শুধু তাই নয়, দিল্লীতে, এক অবাঙালীর অধীনে যে-অফিসটি বিভিন্ন রাজ্যের গেজেটীয়ার রচনার ওপর ছড়ি ঘোরাতেন (সরকারী চাকুরির গণিকাবৃত্তিতে, হায়! এহেন কত অনাচারই না সহ্য করতে হয়েছে!), তাঁরা আমার কৈফিয়ত তলব করলেন—এই পরিশিষ্টটি আমি সংযোজন করেছি কার হুকুমে; ভূভারতে নাকি এরকম অনাসৃষ্টি আর কোথাও ঘটেনি। এ-বিতর্ক আমি বেশী দীর্ঘায়িত হতে দিইনি। ঠুলি-পরা চোখে, সরকারী বাঁধা রাস্তায় তো অনেককাল হেঁটেছি, এই আস্পর্ধার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সময় হয়েছে মনে হল। সংক্ষিপ্ত উত্তরে ছড়িদারদের জানালাম—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দ'জন বাঙালী মহাপণ্ডিতের উপদেশক্রমে কৃত এই দুষ্কর্মের সমস্ত দায়িত্ব আমার। তাঁদের অভিরুচি হলে, তাঁরা বঙ্গ-সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীকে লিখে আমার বদলির সুপারিশ করতে পারেন। তবে একথা নিশ্চিত যে, পশ্চিমবঙ্গ জেলা-গেজেটীয়ারের সর্বময় কর্তৃত্বে আমি যতদিন আছি ততদিন আলোচ্য পরিশিষ্টটি থাকছে, থাকবে। ব্যাপারটা আর কিছুদূর গড়িয়ে থেমে যায়। কিন্তু সে অন্য কথা।

ড. মজুমদার হাজী মহম্মদ মহসীনের জীবনীটা লিখছেন; আমি নিশ্চিন্ত আছি। হঠাৎ একদিন টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন। গেলাম। কিছুমাত্র ধানাই-পানাই না করে চাঁচাছোলা এক প্রশ্ন রাখলেন—মশায়! মহসীন সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? বললাম—অতি ধার্মিক, দয়ালু, বিদ্যোৎসাহী ও দানবীর ছিলেন বলে শুনেছি। তির্যক একটু হাসি যেন তাঁর দু'ঠোঁট স্পর্শ করে গেল। বললেন—দানবীর? কার টাকায়? উত্তরটা ঠিক জানা ছিল না। বললেন—ধার্মিক ছিলেন ঠিকই কিন্তু বিদ্যোৎসাহী কখনোই ছিলেন না আর দান-খয়রাত যা করে গেছেন তার সবই তাঁর এক মৃত সৎ-বোনের অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে। ক'লকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে আনানো মহসীনের 'ট্রাস্ট্ ডীড্'-এর একটি কপি, তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের 'বোর্ড অফ রেভেনিউ'-এর নানাবিধ হুকুমনামার প্রতিলিপি, মহসীন-সংক্রান্ত আরও হরেকরকম কাগজপত্তরে ড. মজুমদারের লেখার টেবিল ঠাসা। বুঝলাম, আলোচ্য জীবনচরিত তখন তাঁর নখদর্পণে। বললেন—জীবিতকালে তিনি যা-কিছু খরচ করেছেন বা 'ট্রাস্ট্-ডীড্' মারফৎ মৃত্যুর পরে খরচের যে-নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, সে-সবই হুগলী-ইমামবারার রক্ষণাবেক্ষণ, যাবতীয় ইসলামী পরবের ব্যয়-নির্বাহ, স্থানীয় মোসলেম গোরস্থানের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ে। শিক্ষার প্রসার, এমন কি মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসা স্থাপন বা হস্টেল নির্মাণেও তিনি এক কপর্দক ব্যয় তো করেনই নি, কোনো নির্দেশও রেখে যাননি। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে লোকা-

স্তরিত মহসীনের নাম ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়েছে আরও অনেক পরে, সরকারী মধ্যস্থতায়। হাজী সাহেব তাঁর তৌলিয়তনামায় যে-দু'জন ম্যানেজার নিযুক্ত করে যান, তাঁরা যখন বেপরোয়া তছরূপ, জালিয়াতি প্রভৃতি বিবিধ কুকর্মে ন্যাসাধীন সম্পত্তি প্রায় লাটে তোলবার উপক্রম করেন তখন সরকার ম্যানেজারদের তাড়িয়ে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা আনেন নিজ কর্তৃত্বে। হুগলী-ইমামবারা-প্রাঙ্গনে এখন যে-মাদ্রাসা ও সংলগ্ন ছাত্রাবাস দেখা যায় তা-ও সরকারী উদ্যোগের ফল।

পক্ষপাতহীন, দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এসব তথ্য বিবৃত করে ড. মজুমদার বললেন—পরের ধনে পোদ্দারী করবার বেলাতেও হাজী মহম্মদ মহসীন যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আমার নিজের বই হলে এই অপ্রিয় সত্য স্পষ্টভাবে বলতে আমি দ্বিধা করতাম না। কিন্তু আপনাকে স্নেহ করি। যে সরকারী প্রকাশনের দায়িত্ব আপনার, সেখানে, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, কোদালকে বোধ হয় কোদাল বলা ঠিক হবে না। এই কারণেই আপনাকে ডেকে এনেছি পরামর্শের জন্য।

সত্য, এবং প্রয়োজনবোধে অপ্রিয় সত্য, বলবার সৎসাহস যে ড. মজুমদারের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তা ভালভাবেই জানতাম। আদর্শগত মতানৈক্যের জন্য তিনি যে একাধিকবার সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়েছেন সেকথাও অজানা ছিল না। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের শুরুতে নিবন্ধ—"সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু তবু সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব"—এই শাশ্বতবাণীও অবগত ছিলাম। সেজন্য উত্তর দিতে হয়ত একটু বিলম্ব হয়ে থাকবে। বললাম—বাস্তব নথিপত্রের ভিত্তিতে যাবতীয় অকাট্য তথ্যের উল্লেখ তিনি অবশ্যই করবেন। তাতে কারও কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। থাকলে, অনুরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অন্য যে-কেউ তা খণ্ডন করতে পারেন। এবং সেক্ষেত্রে তিনি মূল লেখক কর্তৃক অভিনন্দিতই হবেন। তবে মহসীনকে স্পষ্টাক্ষরে সাম্প্রদায়িক না বললেই বোধ হয় ভাল হয়। কেননা, সরকারী প্রকাশনায় নাগরিকদের প্রতি আচরিত রাষ্ট্রনীতির কিছু বাধ্যবাধকতা সব দেশেই থাকে। এক্ষেত্রে অবিসংবাদিত তথ্যের উপস্থাপনা থেকেই পাঠক প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবেন ; তাঁকে আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন হবে না।

ড. মজুমদার আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। হুগলী জেলা-গেজেটীয়ারের পরিশিষ্টে নিবন্ধ তাঁর লেখাটি মহসীনের 'ট্রাস্ট্ ডীড্' থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসহ অখণ্ডনীয় যুক্তিতে এতই সমৃদ্ধ যে, অদ্যাবধি তার ক্ষীণতম প্রতিবাদের কথা কখনো শুনিনি।

ড. মজুমদার যে মুসলমানবিদ্বেষী, এই বহুলপ্রচারিত মিথ্যা অপবাদের প্রসঙ্গে এবার আসতে পারি। কুৎসা-রটনাকারীদের একজনও যে ভারত-ইতিহাসের মুসলমান-যুগ সম্পর্কে তাঁর তুল্য বিশদ জ্ঞান রাখেন না সেকথা তাঁদের জনে জনে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি। এ পোড়া দেশে অশিক্ষিত সমালোচনা বহু মুখে উচ্চারিত হলেই গ্রহণযোগ্য হয়। ড. মজুমদারের অদৃষ্টেও তা-ই জুটেছে। তাঁর অপরাধ—মুসলমান-আমলের প্রমাণিত কুকীর্তি তিনি বেমালুম চেপে যাননি বা লঘু করে দেখাননি। তা করলে সত্যের অপলাপ হত, যা যেকোনো খাঁটি ঐতিহাসিকের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। শতাব্দীর পরিশ্রমে প্রস্তুত অপরূপ সব হিন্দুমন্দির যখন ধর্মীয় গোঁড়ামির বলি হয়েছে কয়েক ঘন্টায়, অপরাজেয় হিন্দু নৃপতিরা যখন পরাভূত হয়েছেন জঘন্য ছল-চাতুরির প্রতারণায়, রাজশক্তির সক্রিয় সহায়তায় কাতারে কাতারে নিরস্ত্র, অসহায়, দরিদ্র অ-মুসলমান যখন বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়েছে ইসলামের মহিমা বিকাশের জন্য, তখন অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কোদালকে তিনি কোদালই

বলেছেন। রাজনৈতিক চাতুর্যবশতঃ বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সত্যকে বিকৃত করেননি কোনোদিন—এই তাঁর অপরাধ। এই জ্ঞান-তপস্বীর পদপ্রান্তে বসে ইতিহাসচর্চার যেটুকু শিক্ষালাভ করেছি তার দৌলতে জোর গলায় বলতে পারি—আমাদের ঐতিহাসিককুলে এহেন সত্যসন্ধ 'অপরাধী'র সংখ্যা যত বেশী হয় ততই দেশের মঙ্গল।

গেজেটীয়ার-রচনা পর্বের শেষে, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টম্বর মাসে আমি যে-পদে বহাল হই তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের ('ডাইরেক্টোরেট অব আর্কিওলজী') তত্ত্বাবধান করা। সেই সূত্রে আমি বিভাগীয় মন্ত্রী স্বর্গত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, যাবতীয় পুরাকীর্তির বিশদ তথ্যসংকলিত জেলাওয়ারি এক সচিত্র গ্রন্থমালা (ক'লকাতা সমেত মোট ১৬টি) প্রকাশের প্রস্তাব পেশ করি। মন্ত্রী মহোদয়ের সোৎসাহ সমর্থনে পরিকল্পনাটি অবিলম্বে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা যোগান ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। উল্লিখিত গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত, 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'র 'মুখবন্ধ' (প্রকাশন কমিটির সভাপতিরূপে ড. মজুমদারের লেখা) থেকে একাংশ উদ্ধৃত করলেই প্রকল্পটির কাঠামো এবং তাতে তাঁর ভূমিকার কথা প্রাঞ্জল হবে।

"..ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ ইহাদের (পুরাকীর্তিসমূহের) অনেকগুলির সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিলেও, অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি পশ্চিমবাংলার দূরদূরান্তে এখনও অবহেলায় নষ্ট হইতেছে। প্রধানতঃ এগুলির সংরক্ষণের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন প্রণয়ন করেন এবং সে আইনের বিধিগুলি কার্যকর করিবার জন্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ-রাজ্যে এক পূর্ণাঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সৃষ্টি হয়। মূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ ও ভূগর্ভ খননপূর্বক নূতন আবিষ্কার করার দিকেই এই অধিকার প্রধানতঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, পুরাকীর্তি সংরক্ষণকার্যে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। ফলে, গত দশ-এগারো বৎসরের মধ্যে এই অধিকার মাত্র অল্প কয়েকটি পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন; বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত পুরাকীর্তিগুলির একটি তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তাও তাঁহারা অনুভব করেন নাই। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে কর্মপ্রণালী স্থির করিবার জন্য এক উপদেষ্টা পর্ষদ ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রণয়নের জন্য এক কমিটি গঠন করিয়া আমাকে অবৈতনিকভাবে প্রথমটির সভ্য ও দ্বিতীয়টির সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন। আমি সে-প্রস্তাবে সম্মত হই।...পুস্তক প্রণয়ন কমিটির কার্যসূচী হিসাবে স্থির হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার ও কলিকাতার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির বিবরণীসংবলিত পৃথক পৃথক পুস্তকের এক সুলভ গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হইবে এবং সেগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইলেও, সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি বিষয়ক এক আকরগ্রন্থের (Archaeological Encyclopaedia of West Bengal) অভাব পূরণ করিবে।.. সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তিগুলির এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অবিলম্বে সংকলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং যোগ্যতার সহিত এ-কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন।"

১৯৬৯ সালের শেষের দিক থেকে ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি অবধি, প্রায় পৌনে দু'বছর কাল, ড. মজুমদার উল্লিখিত কমিটি দু'টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এবিষয়ে তাঁর সম্মতি সংগ্রহের জন্য আমিই গিয়েছিলাম তাঁর কাছে, তাঁর বাড়িতে। আমাদের প্রস্তাবে তিনি এক কথায় রাজী হয়ে

গেলেন। কিন্তু যখন বললাম—আপনার বয়স এখন প্রায় আশি ; রাইটার্স বিল্ডিংসে যাতায়াতের পরিশ্রম এড়ানোর জন্য মিটিংগুলো আপনার বাড়িতেই হতে পারে—তখন সে-উপরোধ সরাসরি নাকচ করে দিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে। যানবাহনের ব্যবস্থা আমরা করে দিলেও তিনি শারীরিক ক্লেশ হাসিমুখে অস্বীকার করে মহাকরণে অনুষ্ঠিত অসংখ্য মিটিং-এ অংশ নিয়েছেন সাগ্রহে ; একদিনের জন্যও অনুপস্থিত থেকেছেন বলে মনে পড়ে না। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া সমকালীন আর কোন বাঙালী মনীষী এত অগ্রসর বয়সে এহেন শ্রমসাপেক্ষ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এবং তা-ও ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি অবহেলিত দিকে প্রাণসঞ্চারের জন্য।

শুধু সরকারী কাজে নয়, ব্যক্তিগত অধ্যয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও গত চোদ্দ বছর ধরে তাঁর সংস্পর্শে এসেছি বারংবার। তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে কেবল জ্ঞানার্জনই করিনি, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর ছিটেফোঁটা আহরণের জন্যও যে কত প্রয়াস করেছি তার ইয়ত্তা নেই। আমার মতো অভাজনের প্রতি এই মহানুভব, নিরভিমান, বিদ্যোৎসাহী জ্ঞান-তপস্বীর অসীম সহৃদয়তার কথা যখন ভাবি তখন যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাকুলতায় রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষার আশ্রয় নিতে হয়—"তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁর দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে—আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁর গ্রহণের যোগ্য হ'ক।"

রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস-চিন্তা

নিমাইসাধন বসু

বিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন থেকেই দু'জন ভারতীয় ঐতিহাসিকের নামের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। এঁরা হলেন যদুনাথ সরকার ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। যদুনাথের লেখা গ্রন্থ প্রথম পড়ি কলেজ জীবনে। ডঃ মজুমদারের বই পাঠ্যপুস্তকরূপে স্কুলে পড়ি। কলেজে পড়ি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর লেখা বই। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল ঐতিহাসিক রূপেই ড. মজুমদার আমাদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

১৯৫৩ সালের কথা। আমি তখন লন্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড্ আফ্রিকান স্টাডিজ-এ অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশমের অধীনে চন্দেল্ল রাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করছি। ঐ স্কুলে প্রতি সপ্তাহে একটি সেমিনার হত। সেমিনারে গবেষণারত ছাত্রছাত্রীরা প্রবন্ধ পাঠ অথবা পুস্তক সমালোচনা পাঠ ক'রত। তারপর ঐ বিষয়ে আলোচনা হ'ত। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকতেন অধ্যাপক ফিলিপস, ব্যাশম, বলহ্যাচেট, হার্ডি, হ্যারিসন, লুইস প্রমুখ খ্যাতনামা ঐতিহাসিকেরা। এইরকম একটি সাপ্তাহিক সেমিনারে আমার ওপর ভার পড়েছিল ড. মজুমদারের লেখা *Ancient India* গ্রন্থটির সমালোচনা পাঠ করা। নির্দেশ পেয়ে আমার মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল তা প্রকাশ করা দুরূহ। প্রথমতঃ, এত খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের সামনে লেখা পাঠ করা এবং তারপর প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ড. মজুমদারের মত একজন ঐতিহাসিকের গ্রন্থের সমালোচনা করার দুঃসাহস। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পুস্তক সমালোচনা করতে হয়েছিল। ড. মজুমদারের অন্য দু'একটি গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা আমি করেছি। ড. মজুমদারও আমার *Indian Awakeing and Bengal* গ্রন্থটির দীর্ঘ সমালোচনায় আমার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও মন্তব্যকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই পারস্পরিক সমালোচনা ও মতানৈক্য আমাদের সম্পর্ককে নিকটতর করেছে। ড. মজুমদারের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক তখন প্রায়-অখ্যাত এক তরুণ লেখকের রচনা ও বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নিজের ঔদার্য ও সহনশীলতার পরিচয়ে আমার কাছে আরও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাঁর আরও কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে নিজের মত ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অটল থাকলেও অন্যের বিরূপ মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব বা সম্পর্ককে এতটুকু স্পর্শ করে না। কিন্তু কোনও ঐতিহাসিক মত বা সিদ্ধান্তের পিছনে যদি কোনও স্বার্থ বা উদ্দেশ্য তিনি দেখতে পান বা সন্দেহ করেন (সেই উদ্দেশ্য যত মহানই হোক না কেন) তাহলে ড. মজুমদার আপোষহীন অসহিষ্ণু মনোভাব গ্রহণ করেন। কিন্তু ড. মজুমদারের ইতিহাস-রচনা সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ সম্বন্ধে যদি আমরা অবহিত হওয়ার প্রকৃত চেষ্টা করি তাহলে তাঁর এবং তাঁর রচনা সম্বন্ধে মূল্যায়ন করার সুবিধা হবে।

তাঁর *Historiography in Modern India* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ড: মজুমদার ইতিহাস রচনা এবং ঐতিহাসিকের কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য হল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করা। সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক যেন স্বেচ্ছায় বা সুপরিকল্পিত ভাবে কোনও তথ্য উপেক্ষা না করেন, যেহেতু ঐ তথ্য তাঁর পূর্বপরিকল্পিত মতবাদ বা

বিশ্বাসের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিককে বিচারকের দৃষ্টি ও মনোভাব নিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে, আইনজীবীর ভূমিকা নিলে হবে না। তৃতীয়তঃ, ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে যতই বিতর্কের অবকাশ থাকুক না কেন কোন কারণেই বা আদর্শের দোহাই দিয়ে ঘটনার বিকৃতি বা সত্যের অপলাপ করা উচিত নয়। সত্যের অনুসন্ধানই ঐতিহাসিকের একমাত্র লক্ষ্য। ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত গবেষককে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে হবে। ঐতিহাসিককে যথাসাধ্য ভাবপ্রবণতা ও আবেগ-মুক্ত হতে হবে। ড. মজুমদার ইতিহাস রচনার যে লক্ষ্য ও পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী করা সম্ভব কিনা বা সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় কিনা সে নিয়ে দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু নিজের বিশ্বাসে যে তিনি অটল এবং তার জন্য যে কোন সমালোচনা বা নিন্দার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মনোভাব এমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে তার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ড. মজুমদারের *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তার কিছু পূর্বেই আসামে বসবাসকারী বাঙালীদের ওপর নির্যাতন হয়েছিল। উপরোক্ত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ড. মজুমদার এই অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে রকম কঠোর বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তাঁর মনো-বেদনা ও নিন্দা প্রকাশ করেছিলেন তা সকলকে সচকিত করেছিল। অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেন নি। আসাম সরকার সম্ভবত তাঁর গ্রন্থটির প্রচারের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেছিলেন।

প্রসংগতঃ এসে যায় আর একটি বহু-বিতর্কিত অপ্রিয় বিষয়ের কথা, যাকে কেন্দ্র করে ড. মজুমদার বোধহয় সবচেয়ে বেশী সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছেন। প্রসংগটি হল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান সমাজের ভূমিকা। ড. মজুমদারের এই বিষয়ে মতামত এত সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত যে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। ড. মজুমদারের এই বিষয়ে মতামত অনেকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমিও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর মত বা সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী মনে করেছি। কিন্তু এই কারণে তাঁর দৃষ্টিভংগীকে 'সাম্প্রদায়িক' বলা অন্যায় ও অসংগত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি কোন কারণেই (উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন) ড. মজুমদার ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি বা অনৈতিহাসিক ব্যাখ্যার সমর্থক নন। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার স্বার্থেই লালা লাজপৎ রায়, কে. এম. আসরফ্ প্রমুখ লেখকরা হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের এক চিত্র অংকন করেছিলেন যা বাস্তবনিষ্ঠ ও তথ্য-ভিত্তিক নয়। পরবর্তীকালে এবং বর্তমানে অনেকেই ঐ একই কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে মুসলমান শাসন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন। কিন্তু যে কোন 'আদর্শ' এমন কি 'জাতীয়' স্বার্থেও ড মজুমদার এই মত ও দৃষ্টিভংগী সমর্থন করেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ড. মজুমদারের নিজের মতই এ-বিষয়ে তথ্য-নির্ভর কিনা, তিনি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যান্য তথ্য উপেক্ষা করেছেন কিনা, তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী মুসলমান-বিরোধী কিনা। আমার মনে হয় এই সব প্রশ্নের উত্তর ড. মজুমদারের নিজের রচনার মধ্যেই রয়েছে। তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি যে একান্তভাবে কাম্য তা স্বর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বহু-বিতর্কিত গ্রন্থ '*History of the Freedom Movement in India*'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন যে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য এবং সম্প্রীতি সাধিত না হলেও এটি প্রতিটি ভারতীয়ের ঐকান্তিক কামনা হওয়া উচিত ("Every true Indian must ever devoutly wish for such a con-

summation.....")। একই ভূমিকার অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি বর্ধনের সদিচ্ছায় তিনি কারোর থেকে কম নন। তিনি যা কিছু ব্যক্ত করেছেন তার পিছনে কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব নেই। সকলের প্রতিই রয়েছে তাঁর শুভ কামনা। কিন্তু বিকৃত ইতিহাস ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদের চোরাবালির বনিয়াদের ওপর কোনও সম্প্রীতির সৌধ নির্মিত হতে পারে না বলেই তিনি সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন ('...I may assure my readers that I have done so with goodwill to both the Communities and malice to none, being convinced that the solid structure of mutual amity and understanding cannot be built on the quicksands of false history and political expediency.") ড. মজুমদারের এই বক্তব্যের আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ নেই।

ড. মজুমদারের সংবেদনশীল মনের পরিচয় রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। ইতিহাসের পাতায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, শাসকের হাতে নিপীড়ন যে সব সময় যথাযোগ্য স্থান পায় না সে বিষয়ে তিনি সচেতন। ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে যেমন তিনি লিখেছেন তেমনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বৃটিশ শাসনের অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা। তার সম্পাদিত *British Paramountcy and Indian Renaissance (Part II)* গ্রন্থে একটি দীর্ঘ অধ্যায় যোগ করেছেন ইংরাজ শাসনের নগ্নরূপ উদ্ঘাটন করতে। এই অধ্যায় প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "It deals with the state of slavery and semi-slavery to which a large number of Indians were reduced, both at home and abroad, by Englishmen who uprooted the plant of slavery elsewhere in their dominions only to grow and nurture it on Indian soil. The depth of degradation to which these Indians were condemned. and the brutalities to which they were often subjected, with the full knowledge, and sometimes tacit consent, of the British Government, is a sad commentary on the oft-expressed anxiety of the British rulers of India to guard the interests of her common people, who formed the bulk of the population, as against the microscopic minority of the educated middle class." একই গ্রন্থে অন্যত্র তিনি লিখেছেন মানুষের লোভ, নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতাই মানুষের দুঃখ ও কষ্টের কারণ। এর ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে শুধুমাত্র সত্যের খাতিরেই নয়, উত্তরসূরিদের সতর্কীকরণ ও শিক্ষাদানের জন্য। এই ইতিহাস-চিন্তাকে যে কোনও প্রগতিশীল ঐতিহাসিকের ইতিহাস-চিন্তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

সুদীর্ঘ ষাট বছর ড. মজুমদার ইতিহাস রচনায় ব্রতী রয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম চল্লিশ বছর তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অস্বীকার করার কোনও অবকাশ নেই। পরবর্তী কুড়ি বছর তিনি প্রধানতঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতীয় জাগরণ সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে তাঁর সম্পাদিত একাদশ খণ্ডে সমাপ্ত *The History and Culture of the Indian People* এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। প্রাচীন যুগ থেকে সুরু করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের এক প্রামাণিক ইতিহাস ড. মজুমদারের তত্ত্বাবধানে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকেরা রচনা করেছেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত তার *History of the Freedom Movement in India* একটি আকর গ্রন্থ। উনিশ শতকের জাগরণ সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন রচনা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ড. মজুমদারের আর এক কৃতিত্ব তিনি মাতৃভাষায় ইতিহাস-চর্চার প্রায় উপেক্ষিত ঐতিহ্য বিস্মৃত হননি।

সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ড. মজুমদারের দান অসামান্য। বর্তমান বিশেষজ্ঞদের যুগে তিনি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'Specialist' বা বিশেজ্ঞদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলা হয় 'তাঁরা খুব অল্প বিষয় সম্বন্ধে খুব বেশী জানেন এবং অধিকাংশ বিষয় সম্বন্ধে খুব অল্প জানেন'। কথাটা সবটুকু সত্য না হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ড. মজুমদার এমন একজন ঐতিহাসিক যিনি অনেক বিষয় সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। এই রকম ঐতিহাসিকের সংখ্যা বিরল হয়ে আসছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিভিন্ন গ্রন্থ ও তাঁর মতামত সম্বন্ধে বিতর্ক হতে পারে। হওয়া স্বাভাবিকও। তাঁর সঙ্গে তর্ক হতে পারে। তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। তাঁর ইতিহাস-চিন্তা ও আদর্শ সম্বন্ধে মতপার্থক্য হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস-সাধনা ও তার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা কোন দিনই সম্ভব হবে না।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ আমি তাঁকে যে ভাবে জেনেছি

জগদীশনারায়ণ সরকার

ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের নব্বইতম জন্মদিন উপলক্ষে 'জয়শ্রী' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধ দেবার জন্য সম্পাদক শ্রীসুনীল দাস অনুরোধ-পত্র পাঠিয়ে আমাকে সম্মানিত করেন। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্ ও ঐতিহাসিক হিসেবে আচার্য রমেশচন্দ্রের বহুমুখী সাফল্যের বিষয়ে আলোচনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক হবে। তাই সংক্ষেপে কয়েকটি কথা তাঁর সম্পর্কে এখানে আমি বলার চেষ্টা ক'রব।

আচার্য রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের নয়। ছাত্ররূপে তাঁর পদতলে বসবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি যখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন তিনি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তবুও সব সময়ে আমি নিজেকে তাঁর ছাত্ররূপেই মনে করি। আচার্য রমেশচন্দ্র ছিলেন আমার শিক্ষক, পাটনা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, ড. সুবিমলচন্দ্র সরকারের সমসাময়িক। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে পাটনা কলেজে আমার বন্ধু ও সহকর্মী ড. কালীকিঙ্কর দত্তের কাছ থেকে আচার্য রমেশচন্দ্রের চরিত্রের অনেক গুণাবলীর ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর যোগ্যতার কথা শুনেছি। তাঁকে প্রথমে আমি পাটনায় যখন দেখি তখন তিনি সেখানে এম. এ. পরীক্ষার অথবা পি. এইচ. ডি গবেষণা-পত্রের পরীক্ষক অথবা বিহার ও ওড়িষা রিসার্চ-সোসাইটির বাৎসরিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আসেন। পাটনায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পত্রের এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের নিকটে পরীক্ষকরূপে তাঁর নাম আতঙ্কের সৃষ্টি করত, কারণ তিনি অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষকরূপে ছাত্রদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। যাঁরা অন্য বিষয়ে ৫০-৬০ নম্বর পেতেন, তাঁরা আচার্য মজুমদারের কাছে ৩৫-৪৫ নম্বরের বেশী পেতেন না। কিন্তু পাটনা কলেজে অথবা বিহার রিসার্চ-সোসাইটিতে আচার্য রমেশচন্দ্র কখনও কখনও যে-সব ভাষণ দিতেন তা ছিল খুবই তথ্য-সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রত। পাটনা কলেজের ছাত্র ও পরে শিক্ষকরূপে আমাকে আচার্য রমেশচন্দ্র রচিত প্রাচীন ও বৃহত্তর ভারত সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে হয়। তাঁর রচনাসমূহ আমাদের জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করে, ইতিহাসের অনেক ভুল ধারণা সংশোধন করতে সাহায্য করে এবং আমাদের সামনে জ্ঞানের এক অজানা দেশের দৃশ্যপট পরিস্ফুট করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে তাঁরই জন্য আমার পক্ষে বিহার-সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা থেকে কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডারের পদে এবং পরে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়। মনোনয়ন কমিটির সদস্যরূপে আচার্য রমেশচন্দ্র আমার নাম সুপারিশ করেন। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ গত ষোলবছর ধরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। যখনই কোন ব্যক্তিগত কারণে অথবা গবেষণা বিষয়ক সমস্যা সমাধানে তাঁর কাছে আমি যাই তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন ও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কোন বিতর্কিত বিষয় সমাধানের প্রয়োজনে তিনি তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজি থেকে আমার জন্য গ্রন্থ খুঁজে দেন, যত্ন নিয়ে আমার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করে মতামত ব্যক্ত করেন এবং খুব দ্রুত আমার পত্রের উত্তর দেন। গবেষকদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কতটা, তা এই কয়টি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়।

এই স্বল্প পরিসর রচনায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিকযুগের ভারতের ইতিহাস নিয়ে আচার্য রমেশচন্দ্র যে অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন তা নিয়ে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে আমি তাঁর ইতিহাস-রচনার ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করব। স্যার যদুনাথ সরকার আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। আচার্য রমেশচন্দ্র তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। তিনি হলেন স্যার যদুনাথের প্রকৃত ভাবশিষ্য। স্যার যদুনাথের রচনাপঞ্জি, বক্তৃতা, ও আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি ইতিহাসের যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করা, আর তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। আচার্য রমেশচন্দ্রের রচনাপদ্ধতির মধ্যেও একই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। আচার্য রমেশচন্দ্র মনে করেন, উন্নতমানের ঐতিহাসিক রচনার প্রয়োজনে নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি নীতি ও পদ্ধতি মেনে চলা উচিত :

(১) কোনো বিষয়ে লিখতে হলে সম্ভবপর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো তথ্য পরিহার করা গর্হিত অপরাধ। তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞানলাভের পূর্বেই কোন ধারণার বা তত্ত্বের বশবর্তী হয়ে লিখলে তা কখনই ভালো হতে পারে না (দ্রঃ *Freedom Movement* এবং *Outbreak of 1857*)।

(২) তথ্যসমূহ বিচারকের মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, উকিলের মনোভাব নিয়ে নয়। আটশত বছর পূর্বে কাশ্মীরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কলহন্ এই কথাই বলেছিলেন। স্যার যদুনাথও একই মনোভাব ব্যক্ত করেন (দ্রঃ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে. ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকটে লেখা স্যার যদুনাথের পত্র)।

(৩) ইতিহাস-রচনায় স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। র‍্যাঙ্কের ও স্যার যদুনাথের মত, আচার্য রমেশচন্দ্রও ইতিহাস-রচনায় সত্যনিষ্ঠ হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্যার যদুনাথ বলেন, পরিণতির কথা ভেবে বিচলিত না হয়ে ঐতিহাসিকের কর্তব্য হল সত্যকে উদ্ঘাটিত করা। আচার্য রমেশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে স্যার যদুনাথের আদর্শ-বাণী উদ্ধৃত করে ঐতিহাসিকদের সত্যনিষ্ঠ হবার কথা বলেন। আচার্য রমেশচন্দ্র রচিত দুখানি গ্রন্থে স্যার যদুনাথের যে বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়, তা হল : "I donot care whether truth is pleasant or unpleasant and in consonance with or opposed to current views. I wonld not mind in the least whether truth is or is not a blow to the glory of my country. If necessary, I shall bear in patience the ridicule and slander of friends and society for the sake of preaching truth. But still I shall seek truth, understand truth and accept truth. This should be the first resolve of a historian" (দ্রঃ **বাংলার ইতিহাস** এবং *Historiography in Modern India*)।

আচার্য রমেশচন্দ্র নিজেও এই বিষয়ে যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য : "...truth, nothing but truth, and as far as possible the whole truth, should form the steel frame of history, on which you may build a structure according to different plots, rhythms, plans or patterns in which you believe according to your philosophy of history,"

(৪) আচার্য রমেশচন্দ্র মনে করেন, বৈজ্ঞানিকের মত ঐতিহাসিককেও এক বিশুদ্ধ বস্তুগত মনোভাব নিয়ে ইতিহাস রচনা করতে হবে। যদিও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা কষ্টকর, তাহলেও এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি কোনমতেই পরিহার করা যায় না। যাঁরা দলীয় নির্দেশে বা বিশেষ মত অনুযায়ী ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

এই সমস্ত নীতি ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য হলেও তা সবসময়ে মেনে চলা কষ্টকর (দ্রঃ ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে লেখকের সভাপতির ভাষণ *Thoughts on Indian History*)। প্রসঙ্গত আমি আচার্য রমেশচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক এখানে উল্লেখ করতে চাই। তিনি সর্বসময়ে নির্ভীকভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। আমি এক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারি, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের এক অধিবেশনে যখন তাঁর এক উত্তরভারতীয় সহকর্মী তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে ভীতি প্রদর্শন করেন, তখন আচার্য রমেশচন্দ্র তাঁকে বলেন, জীবনে তিনি অনেকবার এই ধরণের ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাঁর নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না।

তাঁর গ্রন্থের কোন কোন মতামত সম্পর্কে হয়তো দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ আছে। তাহলেও আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করার ব্যাপারে ও ইতিহাস-রচনায় তাঁর অসামান্য অবদান সম্পর্কে কোনই বিতর্কের অবকাশ নেই। স্যার যদুনাথের মতই তাঁর গবেষণার ফসল প্রাচুর্যপূর্ণ। যদি 'কেমব্রিজ হিসট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থরাজিকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে একই কারণে আচার্য রমেশচন্দ্র সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল' গ্রন্থরাজিকেও ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এক মূল্যবান অবদান হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

ইতিহাস-রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে আচার্য রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারা এবং আধুনিক ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যায় তাঁর মতামত, তাঁর অসংখ্য রচনাবলী ও ভাষণসমূহ থেকে জানা যায়। তিনি 'ইতিহাস' পত্রিকায় 'স্মৃতিকথা' শিরোনামায় যে স্মৃতিচারণ করেন তাতে এইসব বিষয়ে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি সবাইকে বিস্মিত করে।

স্যার যদুনাথের অবদানের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র খর্ব না করেও এই কথা বলা চলে যে, 'ত্রিকালদর্শী' ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্রের গবেষণার ক্ষেত্র স্যার যদুনাথের চেয়ে অনেক বেশী প্রসারিত। স্যার যদুনাথ রচিত *India Through The Ages* গ্রন্থখানি বাদ দিলে দেখা যাবে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের ১৫০ বছর নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত)। আর অন্যদিকে আচার্য রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারত থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ভারত পর্যন্ত পরিক্রমা করেছেন। অসংখ্য তথ্যের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন, আর একই সঙ্গে মধ্য ও আধুনিকযুগের ইতিহাসের কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোলেন। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস রচনার প্রথম পর্যায়ে স্যার যদুনাথ একই সঙ্গে খননকারী ও স্থপতি ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে। তাঁর 'শিবাজী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি ফার্সি, মারাঠী, রাজস্থানী, ইংরেজি, ডাচ, পর্তুগীজ ও আরও বিভিন্ন তথ্যনির্ভর করে রচিত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কি অক্লান্ত অধ্যবসায় ও মনীষা সহকারে স্যার যদুনাথ আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাত করেন। তাঁকে সেই আমলে অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। বলতে গেলে তখন তো ভারতীয় ইতিহাস রচনার ঊষাকালমাত্র। আর আচার্য রমেশচন্দ্র এমন সময়ে কলম ধরেন যখন ইতিহাস-রচনার অনেক সমৃদ্ধি ঘটেছে। তাই স্যার যদুনাথের চেয়ে অনেক অনুকূল পরিবেশে তিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হন। অবশ্য স্যার যদুনাথ নিজেই এই সম্ভাবনার কথা সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকদের উদ্দেশ্যে তিনি যে-সব কথা বলেন তার গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। আচার্য রমেশচন্দ্র স্যার

যদুনাথের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাই আমরা দেখি, তাঁর রচনায় ও ভাষণে স্যার যদুনাথের অবদানের উল্লেখ।

আর একটি বিষয়েও এই দুইজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের ইংরেজি রচনাশৈলী ও ইতিহাস-রচনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্যার যদুনাথ খুব অল্প কথায় তাঁর বিষয়টি আলোচনা করেন। তিনি ধরে নেন, তাঁর পাঠকেরা অনেক কিছুই জানেন। তিনি মূলতঃ তথ্যনির্ভর যুক্তির অবতারণা করলেও অনেক সময়ে পাঠকদের মনে কিছুটা শূন্যতা থেকে যায়। অন্যদিকে আচার্য রমেশচন্দ্র অনেক তথ্য-যুক্তি দিয়ে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় পাঠকেরা সহজেই তা বুঝতে পারেন।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্যার যদুনাথ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার যদুনাথের রচনাপঞ্জির ও পত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীতে ড. জি. এস. সরদেশাইকে লিখিত স্যার যদুনাথের একটি পত্রও ছিল। এই পত্রে স্যার যদুনাথ রমেশচন্দ্রকে এক বিশেষ কাজের উপযোগী মনে করেন। আচার্য রমেশচন্দ্র এই পত্রখানার বিষয়ে তখনই জানতে পারেন এবং তা পাঠ করে মন্তব্য করেন, এই ছিল স্যার যদুনাথের চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি কখনই রমেশচন্দ্রকে এই বিষয়ে কিছু বলেননি, অথচ তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে পাঠান।

আমাদের দেশে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের ও ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয়েছে। এই তালিকায় বাংলার বিশেষ স্থান রয়েছে। যাঁরা বাংলার মুখোজ্জ্বল করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও আরও অনেকে। আমাদের পরম সৌভাগ্য আচার্য রমেশচন্দ্র এখনও আমাদের অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর আদর্শের ও চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ ঐতিহাসিকরা ও গবেষকরা যদি নিজেদের গবেষণায় নিয়োজিত রাখতে পারেন তাহ'লেই তার প্রতি আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবো।

সত্যার্থী ঐতিহাসিক

সমর গুহ

ধর্মে, দর্শনে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কলায়, স্বাদেশিকতায় এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামে এক শতাব্দীর স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলার মাটিতে যে মনীষীবৃন্দের আবির্ভাব ঘটেছে,—বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাসে অন্য কোন দেশে এমন নিদর্শন খুব বেশি পাওয়া যায় না। এই মানবোত্তম ব্যক্তিরা শুধু সৃজনী-প্রতিভায় নয়,—আত্মিক অভিব্যক্তি এবং চারিত্র-শক্তির যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন তা' শুধু বাঙালীর বা ভারতবাসীর পক্ষেই অমূল্য সম্পদ নয়—মানব-ইতিহাসেরও এক বিস্ময়কর সম্পদ।

যে বাংলার মাটিতে মননা ও চিৎ-শক্তির এমন অপূর্ব আবির্ভাব ঘটেছিল,—আজ সেই পবিত্র-ভূমিতে নেমে এসেছে যেন এক অন্ধকারের যুগ। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নত করার মত মানুষ বাঙালীর সাংস্কৃতিক সত্তায় আজ আর বেশি অবশিষ্ট নেই,। আজ আর তেমন জ্যোতিষ্ক-প্রতিম মনীষারও তেমন নতুন আবির্ভাব নেই। আজ বাঙালীর জীবনে যেন অসাধারণত্বের, সেই মহোত্তম মনীষার অনুর্বরতার এক অভিশাপ নেমে এসেছে। বাঙালী জীবনের এই প্রায়ান্ধকার যুগে সেই বিগত প্রতিভার গঙ্গাধারার দু' একটি ধারা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে,—আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার তারই বিস্ময়কর নিদর্শনের এক মহান অবশেষ।

বাঙালীকে, ভারতবাসীকে তথা বিশ্ব-সংস্কৃতিকে অশীতিবর্ষের এক দশক পার করে দিয়েও যিনি জ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন তিনিই আচার্য মজুমদার। এই একটি নামই আজকের দিনেও বাঙালী গর্বের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে পারে।

ইতিহাস-রচনার প্রতিভায়, ভারতবাসীর বিগত ও বর্তমান জীবনের তথ্যানুসন্ধানে,—আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের কি অবদান—এই পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের সামান্য রচনায় সে-আলোচনার অবকাশ নেই। এই মহান প্রতিভাধর মানুষটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অপূর্ব সত্য নিষ্ঠার, এক অপূর্ব চারিত্র-শক্তির দুর্লভ নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন—এই শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়াসে শুধু সেটুকুরই উল্লেখ করবো।

রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাওয়ার আগে অনেক মনীষীই তাদের প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে—এই সম্মান—যারা গত ত্রিশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন,—তেমনি অনেক ভারতীয় মনীষীই লাভ করেছেন। রাষ্ট্রশক্তির কাছে এই প্রাপ্য মর্যাদার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, উপেক্ষিত হয়েছেন, অবহেলিত হয়েছেন শুধু একজন মনীষী,—তিনি আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর অপরাধ, যে তিনি সত্যকে রাজনীতির কর্তা-ভজা কীর্তনে পরিণত করতে রাজী হন নি। যে অনন্য প্রতিভা কখনও রাষ্ট্রীয় নাম, যশ বা পদলাভের আকাঙ্ক্ষায় কখনও সত্যকে আটপৌরে পরিধিতে ব্যক্ত করে রাষ্ট্র-শক্তিকে খুশি করতে সম্মত হয় না,—এমন চারিত্র-শক্তি সব দেশেই খুবই কম। ড. মজুমদার সেই অনন্য অসাধারণত্বের এক অতুলনীয় নিদর্শন

বর্তমান ভারতের জীবিত ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী,—একথা অস্বীকার করার মত ঔদ্ধত্য বোধ হয় বেশি ব্যক্তির নেই। তাই, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় স্বভাবতই ড. মজুমদারের আহ্বান এসেছিল নেহেরু-সরকারের কাছ থেকে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে নেহেরু-সরকার পঞ্চাশ দশকে যে একটি উচ্চতম কমিটি গঠন করেছিলেন,— ড. মজুমদারের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল সেই কমিটির সভাপতিত্ব করার। তিনি সেই

আহ্বান গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু এই কমিটি বিস্তৃত ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে যে প্রাথমিক খসড়া রচনা করেন,— সেই রিপোর্টে ড. মজুমদার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্বোধন ঘটেছে বাংলাদেশ থেকে, এবং এই সংগ্রামে প্রাথমিক ও অন্তিম পর্যায়ে বিপ্লবীদের অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বিশ ও ত্রিশ দশকে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—কিন্তু ভারত-ভূমি থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিদায় গ্রহণের যে অপ্রতিরোধ্য পরিবেশ রচিত হয়, জাতীয় সংগ্রামের অন্তিম অধ্যায়ে—তার পশ্চাতে রয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ বিপ্লবের প্রধান অবদান। বিপ্লববাদ ও নেতাজীর নেতৃত্বের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে তুলে ধরার ফলে তিনি নেহেরু-সরকারের কাছে অপ্রিয় ও এক অবাঞ্ছিত ঐতিহাসিকরূপে চিহ্নিত হন।

নেহেরু এবং নেহেরুর সমকালীন কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই কথাটিই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে গান্ধীজীর আবির্ভাবের সঙ্গে এবং এই সংগ্রাম চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ও সার্থকতা লাভ করেছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ও অবদানে। এক মাত্র অহিংস-সত্যাগ্রহের পথেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং এইভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত বিশ্বের সামনে এক অপূর্ব নৈতিক-কীর্তির মহান নিদর্শন স্থাপন করেছে—এরূপ উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করে কর্তাভজা ইতিহাস রচনায় সত্যাশ্রয়ী পরম বরেণ্য ঐতিহাসিক সম্মত হন নি। তার পরিণামে, নেহরু-সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার এই সরকারী কমিটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে আকস্মিকভাবে ভেঙে দেন। তার কিছুকাল পরে পন্ডিত নেহেরু নিজের বশংবদ এক বন্ধু ড. তারাচান্দকে সভাপতি করে যে নতুন কমিটি রচনা করেন,—সেই কমিটিই নেহেরু এবং নেহেরুর সমকালীন কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতাকে পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচনা করেন তা' শুধু বিকৃত, অর্ধসত্য এবং কর্তাভজা একটি সরকারী দলিলেই পরিণত হয়নি,— অন্যান্য স্বৈরতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের তোষণে এবং প্রাধান্যদানে যেরূপ ইতিহাস রচিত হয়,—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সরকারী ইতিহাসটিও তারই একটি কলংকিত নিদর্শন স্বরূপ।

কেন নেহেরু এবং নেহেরুর সমকালীন কংগ্রেস-নেতৃত্ব ইতিহাস-বিকৃতির এরূপ অপপ্রয়াসে এমন সংকীর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করেন? তার মূলে কারণ—যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস রচিত হয় তা'হলে এই সত্যটি অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে শুধু শান্তি ও অহিংসার পথেই নয়,— বিপ্লব-বাদেরও সম-অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয়েছে ইংরেজ শক্তিকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে দুই মৌল নেতৃত্ব প্রধান ভূমিকা এবং ভাগ্যনিয়ন্তার তথা 'ম্যান অব ডেস্টিনির' ভূমিকা গ্রহণ করেন তারা হলেন—মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ বা রাজেন্দ্রপ্রসাদাদি সমকালীন কংগ্রেস-নেতৃত্বের ভূমিকা, মৌলিক দৃষ্টিতে, দ্বিতীয় স্তরের। এই নেতৃত্ব গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতিফলন বা উপগ্রহরূপে জাতীয় মর্যাদা বা উচ্চাসনের স্বীকৃতি অর্জন করেন। গান্ধী-নেতৃত্বের এবং গান্ধী-পন্থার ব্যূহ ভেদ করে যে অগ্নিহোত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাগ্য রচনায় শুধু মৌল ভূমিকাই নয়—অন্তিম পর্যায়ে শ্রেষ্ঠতম ভূমিকা গ্রহণ করেন,—তিনি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। বস্তুত, বিশ ও ত্রিশ শতাব্দীর গান্ধীযুগ—চল্লিশ শতাব্দীতে নেতাজীযুগে পর্যায়ান্তরিত হয় এবং গান্ধীজীর অহিংস-পন্থা যে ক্ষেত্র রচনা করে নেতাজীর বিপ্লববাদ তাকে যথার্থ সার্থকতায় পর্যবশিত করে তাঁর আজাদ হিন্দ বিপ্লবের মাধ্যমে। এই সত্যকে স্বীকার করা হলে গান্ধীজী ব্যতীত অন্য সমস্ত গান্ধী-অনুসারীদের ভূমিকার মূল্যায়ন হবে দ্বিতীয়-

স্তরের মর্যাদায়। কিন্তু গান্ধীজীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী নিজের এই গৌণ-ভূমিকা স্বীকারের মত সত্য-নিষ্ঠা ও ঔদার্যের পরিচয় দিতে রাজী হননি। সে জন্যই নেহেরুর রাষ্ট্রীয়কর্তৃত্বের যুগে বা তার কন্যার রাষ্ট্রপরিচালনার যুগে, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় সত্যনিষ্ঠা এবং অতুলনীয় মনন-শক্তির সম্পদে জ্যোতিষ্মান ঐতিহাসিকের পক্ষে কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব হয়নি স্বাধীনতা-উত্তর তিন দশকে।

নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকা এবং বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৈপ্লবিক ভাবমূর্তিকে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অবজ্ঞাত করে ইতিহাসের বিস্মৃতির অন্তরালে নিক্ষেপ করার যে চক্রান্ত চলে নেহেরু-রাজের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবে,—তার বিরুদ্ধে নৈতিক এবং ঐতিহাসিক বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছেন আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি সরকারী ভ্রুকুটি বা সরকারী উপেক্ষার কোন রোষানলের কুটিল দৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করে—নিজের রচিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অগণিত অন্যান্য রচনায় এবং বহু ভাষণে এই সত্যটি নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়েছেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতখানি ঋণী গান্ধী-নেতৃত্বের কাছে তার, চেয়ে কোনক্রমেই কম ঋণী নয় নেতাজীর নেতৃত্বের কাছে।

বস্তুত, এই সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শেষ পর্যায়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক ভূমিকার জন্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তি ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়েছে।

ভারতের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অধ্যায়ের ইতিহাস রচনায় আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'অবদান অনস্বীকার্য মর্যাদা লাভ করেছে—কিন্তু তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে, সমস্ত সরকারী চক্রান্তকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা, দৃঢ়তা ও চারিত্র-শক্তিতে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অকুতোভয়ে ভারতবাসীর সামনে তা তুলে ধরেছেন,—সেজন্য বর্তমান কালে এবং ভাবীকালের অনাগত দিনে আচার্য মজুমদারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রশক্তির কাছে তিনি উপেক্ষিত হলেও,—একালের এবং আগামীকালের ভারতীয় জাতির কাছে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় ও পরম বরেণ্য এক সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক ঐতিহাসিকরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আজ আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের জাতীয় সম্বর্ধনার এই অবসরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, প্রণাম জানিয়ে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই যে তিনি আরও কিছুকাল আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের অনুপ্রেরিত করুন,—নেতাজী সম্বন্ধে তাঁর লেখনী তেমন করেই ক্ষুরধার ও সক্রিয় হয়ে থাকুক। ভরতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপান্তে যে দুর্বার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব বৃটিশ শক্তির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল, আগামী দিনে সেই শক্তি জাতীয় জীবনের অনিবার্য রূপান্তর ঘটিয়ে তুলবে। ভগবানের কাছে আবার প্রার্থনা করি,— ভারতের জাতীয় জীবনে প্রত্যাসন্ন সেই পরম দিনটি যেন আচার্যদেব নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে যান—নিজের হাতে তিনি যেন ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কণ্ঠে জয়মাল্য দিয়ে তাঁকে বরণ করে যেতে পারেন।

আচার্যদেব ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

মাধবচন্দ্র নাথ

ড. মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯২৬ খৃঃ-এর জুলাই মাসে। আমি উক্ত বছর আই. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া যখন কেমিস্ট্রিতে অনার্স সহ বি. এস. সি. ক্লাসে ভর্তি হই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে আমি তদানীন্তন ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া অনুরোধ জানাই যে আমি যেন জগন্নাথ হলে একটি অবৈতনিক আবাসিকের সুযোগ পাই। আই. এস. সি পরীক্ষায় ফল ভাল হওয়ার দরুণ মাসিক ৩২ টাকার একটি বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও আমাকে তখন প্রাইভেট টিউশনি করিতে হইত। কারণ আমার পিতৃদেবের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় প্রতিমাসে তাহাকে ২০।২৫৲ করিয়া পাঠাইতে হইত।

ড. মজুমদার মহাশয় সকল কথা শুনিয়া আমার জন্য জগন্নাথ হল নর্থ হাউসে একটি seat-এর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তদানীন্তন হাউস-টিউটর অধ্যাপক পি. কে. গুহকে বলিয়া আমার বিনাব্যয়ে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে সর্বপ্রথম তাহার মহত্ত্বের পরিচয় পাই।

এরপর বি. এস-সি. ও এম. এস-সি পড়িয়া ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে গবেষণা আরম্ভ করি। অতঃপর তাঁহার এবং আমার অধ্যাপক ড. জে. সি. ঘোষ মহাশয়ের কৃপাগুণে মাসিক ৫০৲ হিসাবে একটি বৃত্তি লাভ করি।

১৯৩৪ খৃঃ-এর জুলাই মাসে বোম্বাই হইতে লেডি টাটা মেমোরিয়াল বৃত্তি পাওয়ায় জগন্নাথ হলের বাসে ছেদ টানিয়া একটি বাড়ীভাড়া করি এবং বাড়ীর সকলকে ঢাকায় লইয়া আসি।

দীর্ঘ ৮ বছর জগন্নাথ হলে থাকা কালে শুধু যে ড. মজুমদার মহাশয়ের ভালবাসাই লাভ করিয়াছিলাম তাহা নহে; নানা বিষয়ে তাহার নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করার সৌভাগ্যও হইয়াছিল।

ড. মজুমদার কেবলমাত্র সুদক্ষ শিক্ষক ও গবেষকই ছিলেন না, যাহাতে ছাত্রগণ নানাবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের কৃতী নাগরিকরূপে পরবর্তী জীবনে দেশের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইতে পারে সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া জগন্নাথ হলের ছাত্রগণ কয়েকটি কমিটি গঠন করেন—যেমন সাহিত্য সোসাইটি, খেলাধুলোর কমিটি, নাট্য প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংঘ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কমিটি। আমাকে একবার Social Service League-এর সহ-সম্পাদক ও একবার Health & Sanitation Society-র সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। সমাজসেবা সংঘ-এর মেম্বরগণ হল হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে একটি মুচিপাড়ায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে, এবং সপ্তাহে ৬দিন আমরা ২জন করিয়া ওখানে যাইয়া শিক্ষকতার কাজ করিতাম। এই কমিটির আর একটি কাজ ছিল নিকটবর্তী গ্রামে গ্রামে যাইয়া কলেরা বসন্ত প্রভৃতি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেই সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন-এর সহায়তায় বক্তৃতা প্রদান। মাঝে মাঝে ধ্রুব-চরিত্র ও প্রহ্লাদ-চরিত্র সম্পর্কিত ছবিও দেখাইতে হইত। উহাতে গ্রামবাসীগণ প্রভূত

আনন্দলাভ করিতেন এবং আমরাও আনন্দ পাইতাম। কোনো কোনোদিন হলে ফিরিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া যাইত।

বাৎসরিক খেলাধূলোর সময় ৩টি হলের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত। জগন্নাথ হ'ল প্রতি-বৎসরেই অধিকাংশ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিত। সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান হইতে 'বাসন্তিকা' নামক একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হইত। উহাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জগন্নাথ হলের নাটকে শিক্ষকগণও যোগদান করিতেন এবং ঐ নাটক বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিত।

একবার ড. মজুমদারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে হলের একটি সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। ছাত্রগণ সভা করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করিল যে "প্রত্যেক হিন্দুরই সরস্বতীদেবীকে পূজা করার অধিকার আছে।" এই প্রস্তাবের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য একদল ছাত্র ঠিক করিল যে আসন্ন সরস্বতী পূজার সময় একজন অ-ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে আহ্বান জানাইবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ড. মজুমদারের শরণাপন্ন হইল। তিনি যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে তাহারা যেন ব্রাহ্মণ পূজককে "হিন্দু"রূপে গ্রহণ করিয়া পূজার ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেন। তিনি বলিলেন যে ব্রাহ্মণও একজন হিন্দু। অতএব তাহারও পূজা করার অধিকার রহিয়াছে। এইভাবে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

তাঁহার যে কিরূপ ছাত্রপ্রীতি ছিল তৎসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। ১৯৪২ খৃঃ-এর পূর্বেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। উক্ত বৎসর রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল হইতে আমার ইলিয়ট পুরস্কার লাভ করার সৌভাগ্য হয়। এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মহাশয়। পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য যখন কলিকাতায় যাই তখন দেখিলাম মঞ্চের উপর ড. মুখার্জীর নিকটই ড. মজুমদার উপবেশন করিয়া আছেন। আমার মনে হইল তিনি আমার সম্বন্ধে ড. মুখার্জীকে কিছু বলিলেন। আমার অনুমান যে সঠিক ছিল তাহা পরে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম, আমার হস্তে পুরস্কারটি অর্পণ করিবার সময় তিনি বলিলেন আমি যখনই কলিকাতায় আসিব তখন যেন তাঁহার (ড. মুখার্জীর) সঙ্গে দেখা করি।

১৯৪২ খৃঃ এর কোন বৈজ্ঞানিক কমিটির meeting উপলক্ষে আমার একবার কলিকাতায় যাইতে হয়। তখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। আমি ড. মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিলেন আমাদের বিক্রমপুর হইতে আজ পর্যন্ত কেহই খাদ্য নেওয়ার জন্য আসেন নাই। তিনি অযাচিতভাবে আমার নামে 'হাঁসারা ইউনিয়নের' জন্য ৪৭৫ মণ খাদ্যশস্য লিখিয়া তাহার Secretaryর নিকট পাঠাইলেন। যেভাবে ৫০০ টাকা যোগাড় করিয়া তাহাকে দিলাম এবং ঐ খাদ্য গ্রামে পৌঁছান সম্ভব হইয়াছিল তাহার কাহিনী বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাইনা। তবে এইকথা সত্য যে ড. মজুমদার আমার সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ না করিলে, ড. মুখার্জীর নিকট হইতে এতটা হৃদ্যতা লাভ করিতে পারিতাম না এবং গ্রামের অনেককেই খাদ্যাভাবে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না। এরপর ১৯৪৬ খৃঃ-এ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Founder Professor and Head of the Department of Biochemistry-র পদলাভ করিয়া কার্যে যোগদান করার পূর্বে একদিন কলিকাতায় থাকিয়া ড. মুখার্জীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর ড. মুখার্জী যখন কেন্দ্রে Minister for Industries ছিলেন তখন ১৯৪৮ খৃঃ-এ তাঁহার (ড. মুখার্জীর) পরামর্শক্রমে তদানীন্তর University Grants Committeeর নিকট Building, equipment এবং recurring grant-এর জন্য দরখাস্ত করিয়া ১৯৪৯-এ লক্ষাধিক টাকা পাইয়া Department-এর Building-এর কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়।

১৯৬০ দশকে ড. মজুমদার নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমন্ত্রিত হইয়া "Founder Professor and Head of the Department of Ancient History" রূপে যোগদান করিয়া প্রায় ২বৎসর নাগপুরে কাটাইয়া আসিয়াছেন। সেইসময় আমি আমার হিতৈষী স্বনামধন্য অধ্যাপককে আমাদের নিকট পাইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

আমি যদিও ড. মজুমদার মহাশয়ের direct student ছিলাম না তথাপি তাহার নিকট হইতে অপত্যস্নেহ লাভ করিয়াছি।

সর্বশেষ আর একটি বিষয়ের অবতারণা না করিয়া পারিতেছিনা—কারণ বোধহয় অনেকেই জানেন না যে তিনি দেশপ্রেমিকদিগকে কতটা ভালবাসিতেন এবং কতভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন।

দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় দেশ ত্যাগ করার পূর্বে তিনি ড. মজুমদার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অর্থ তাহার আরব্ধ কর্মে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

অতএব আচার্যদেব ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেশের জন্য অনেক অবদান রাখিয়াছেন। তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নানাভাবে দেশের উন্নতি বিধান করুন উহাই পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি।

ON Dr. R. C. MAJUMDAR : THE HISTORIAN OF INDIA

S. B. CHAUDHURI

Dr R. C. Majumdar joined the newly founded University of Dacca in 1921 as Professor of History. He served many other Universites in the same capacity and was for a time also a visiting Professor in the States of Chicago and Pennsylvania (U. S. A.). He also delivered endowment lectures in most of the Universites and Institutions of India. In fitting recognition of his eminence as a historian he was invited to preside over many oriental conferences and historical associations including the International Commission for a History of the Scientific and Cultural Development of Mankind (set up by the UNESCO). He has been adorned with prestigious titles and honours and loaded with medals and other such distinctions for his manifold contributions towards the reconstruction of the history of India. The Doyen of Indian historians, Dr R. C. Mujumdar, is the seniormost among the living historians of the country and undoubtedly the unrivalled and the most outstanding historian of India.

Dr Majumdar's contributions to different periods and aspects of Indian history cover a very wide field, widest ever achieved by an Indian historian. From the 'Corporate Life in Ancient India', published in 1918 to the publication of the remaining volumes of the 'History and Culture of the Indian People' in 1976-77, is an age of ceaseless dedication to investigation and research in Indology, behind which lies an enormous spread of profound knowledge and impressive skill. The harvest has been copius, in its totality and variety, somewhat intangible in its immensity and boundless in its range, ageless though, the history of India is. Majumdar has built the bridge between the hoary past of India to the present age as none else did.

When he entered the field of his study, research work in ancient Indian history was mainly confined to literary sources. Studies on political history of ancient India had not progressed much as inscriptional sources were not easily available and scholars like D. R. Bhandarkar and K . P. Jyaswall were not so much interested in epigraphy as in literary antiquarianism Naturally, he was drawn to political history of ancient India as a subject of paramount importance for a study of India's past. But the field was vast and the difficulties were at once apparent involving slogging work. Here the source-materials extended to a variety of scrappy information of diverse kinds, epigraphic, numismatic, iconographic and literary, both foreign and Indian, which have to be assessed and scrutinised in their relevant context for the approximation of an event which otherwise lacked precision and authority for its acceptance in the chain of developments. Lack of chronological impressions proved to be the most disruptive force and absence of chronological fixation of the different phases of ancient Indian history made matters

worse. All these difficulties arising out of the absence of historical literature on ancient India demanded of the historian the mastery of all the tools of his craft, an accurate mind, perfect impartiality, clear insights and skill. If Dr Majumdar became remarkable for his analysis of facts, formidable for rigorous examination of evidence and incisive for his estimate of men and things, it was, obviously enough. to a considerable extent due to his experience of handling epigraphic materials, mixed with other sources of diverse types for the purpose of reconstructing the history of the past.

Majumdar's contributions illuminated many a dark corner of ancient Indian history. A scrutiny of the numerous articles and monographs published by him would show that for nearly three decades he devoted himself to Indological studies as a result of which scholars have now landed in somewhat of a *terra firma* in the political history of the ancient period. He has brought cohesion and order and a measure of approximation in the controversial problems of Indian Antiquities. There was hardly any subject of crucial importance which was not touched by him as the list of select articles given below would show. They are : Antiquity and importance of the Rig veda, the Achaemenian rule in India, Buddhist Councils, the Indica of Megasthenes, Kautilya, North India after the fall of the Mauryas, Observations on Pushyamitra's Empire, Date of Kanishka and Kushana chronology, King Chandra of the Meharauli Iron Pillar Inscription. The successors of Kumaragupta ane Skandagupta, Copper plates of Sasanka, Harsha Era, Gurjara-Pratiharas, The Arab Invasion of Sindh, The Sailendra Empire, Oversea expedition of Rajendra Chola, Inscriptions of Yasovarmadeva and Rashtrakuta king Govinda, Gwalior Prasasti of Gurjara-Pratihara King Bhoja, Chronology of the Pala Kings, Origin of the Sena kings and Sena chronology.

As well as this he took the lead in planning co-operative endeavours for advanced studies in regional and general history of India in one or several volumes. The merits of these volumes edited by him in such projects are conspicuous. Along with Altekar, he edited the sixth volume of the 'New History of the Indian People, entitled the Vakataka-Gupta Age, (1946). A few years after, appeared the first volume of the 'History and Culture of the Indian People' (1951) which dealt with the early period of Indian history from the time of the Indus Valley Civilization. The volume edited by Majumdar and assisted by Pusalker and others opened up a new dimension of the age-old civilization of this country. It was followed by other volumes, all in a series, usually known as Munshi Series, which eventually developed into the most monumental work on Indian History ever planned by any historian, Indian or British. Another very fruitful result of scholarly accommodation was the History of Bengal published by the Dacca University under a scheme jointly sponsored by Sir Jadu Nath Sarkar and Dr R. C. Majumdar. The first volume dealing with the Early History of Bengal was edited by Dr Majumdar who wrote most of the important chapters of the volume. He attracted the interest of other competent scholars in the project who wrote the remaining chapters of the volume. Previous works

in the field were mostly based on legends and fictions and not on scientific deduction of historical facts. The more famous work of Rakhaldas Benerjee was long outdated ; the level of study reached by him was easily crossed. While the historian could not help feeling that historical writings on Ancient India show a tendency to become chronology oriented, the 'History of Bengal' was a work with a difference. Here institutions, economic conditions and social life did not go out of focus and were analysed as well as the recording of events of the vicissitudes of the ruling dynasties. It is a perfect miracle of research. Political history of Bengal based on all authentic sources assumes a distinct shape while chapters on economic condition and social, cultural and religious life based on sources of primary importance created the living interest of a biography of a people who for the first time received a coherent and truthful account of their own past. This distinguishes the book from works on social history of Bengal written in Bengali which mostly contain pedestrian materials and rhetoric frills. The Dacca University History of Bengal was at once the first authentic work on regional history and as such constituted a landmark in Indian historiography.

Majumdar's range of study was increasingly expanding encompassing all other phases of the early period of Indian history. His books on the ancient Hindu kingdoms of South-East Asia formed a brilliant constellation of some invaluable works which explored the vast stretches of Indian cultural influence in the oversea His 'Ancient Indian Colonies in the Far East in Champa Suvarnadvipa' in two volumes came out in the decade between 1927 and 1937. In 1944 he published two works, one on Kambujadesa and another on Hindu colonies in the Far East. This was followed by his last work on the subject, 'Ancient Indian Colonisation in South-east Asia (1955). The French scholars were pioneers in the field and Indian scholars hardly contributed anything to bring to light such a glorious period of dynamic activity of the Hindu colonists Professor Nilkantha Sastri wrote a few monographs on the subject and Dr. Bijanraj Chatterjee attempted a short history of this phase of oversea expansion but Majumdar's works in English have furnished a connected account of sterling scholarship which will preserve from oblivion the achievements of the Hindu Civilization in the past. With his remarkable power of reconstructing history out of a shamble of archaeological pieces he offers a complete account of South-east Asia which nearly equals French contributions in this field of study and leaves all other Indian historians behind.

But the advent of the independence of India had its impact on the scholarly pursuits of the historian. He could no longer keep himself confined to studies of ancient Indian history, so great were the demands made upon him to write the history of Freedom Movement in India. Roughly speaking the year 1947 was the dividing line of the areas of his work. From that time he was getting himself involved in historical works of the modern period of Indian history. His monograph on Maharaja Rajballabh appeared in 1947 and other more important works were in the offing. At the request of the government of India, he became the Director of the project for

writing the history of India's struggle for freedom and as a prelude to it. it was decided that a history of the Revolt of 1857 was to be written and published in the centenary year of the Mutiny. The scheme, however, fell through and Dr. Majumdar had to write on his own, the history of 'The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857' which was published in 1957 as also a 'History of the Freedom Movement in India' in three volumes (1962-3).

Simultaneously. he was working out the scheme of the Bharatiya Vidyabhavan (Munshi series), of writing the 'History and Culture of the Indian People' in ten volumes (one of them in two parts). The monummental work originally planned in 1943-44 took more than thirty years for its completion. As the editor of this series, he planned the entire work, the number of volumes to cover each of the three periods of Indian history as also the subject matter of each of the chapters going under a particular volume, He selected the contributors. co-ordinated their works and edited their writings. It, however, appears that he himself wrote most of the chapters and amazingly enough, even one whole volume of medieval Indian history. Not less so, were the volumes on modern Indian history where he was the author of the major portion of the work. It is an astounding achievement of single-minded endeavour, the whole series of the 'History and Culture of the Indian People' easily replaced. as K. M. Panikkar pointed out, the previous works in the field, the Cambridge History of India in particular. History of India, as attempted by Dr. R. C. Majumdar in the volumes of Vidyabhavan series is a model of arrangement, doing justice to the vast variety of phenomena which make for the civilization of India, while keeping in view the unity of national life and continuity of its culture. After the Cholas the political action of India becomes cramped and degraded, no longer interesting to the reader or operative on the destinies of the world till we come to the age of European enterprise in India No historian has done so much to fill up this void and restore the links and tie them up with the main stream of Indian history of the modern period. These volumes on the 'History and Culture of the Indian People' ; the magnum opus of Dr. R.C. Majumdar. vibrate with his personality and intellectual maturity and constitute the nearest Indian equivalent to Toynbee's continental Surveys.

How many other stray works both in English and Bengali he has written is yet to be Known. He wrote on Vivekananda and Rammonan, completed a four-volume work on the history of Bengal from the earliest to the modern times in addition to a short monograph on 'Glimpses of Bengal in the nineteenth century' (1961) and a separate work on Bangladeser Itihasa which came out in 1946. His latest work which has been well received is the History of the Penal Settlement of the Andaman. But the most sensational and controversial book of the historian was the 'Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857'. According to him there was no authentic basis for the theory that the Revolt was a pre-meditated one or that it was a war of independence. From the standpoint of historiography the book is a narrative of rare merit. The spontaneity of the treatment, the vigour of the style and the unfaltering grasp of the historian over his subject leave a vary engaging impression on the mind of the

reafier. And despite the stubborn nature of the work, it has a succinct charm of its own ; to read Majumdar's 'Sepoy Revolt' is an event in a man's life The investigation of materials, the study of their relations, the reproduction of their form and motive which constitute history was undoubtedly reflected in this work on the Rising of 1857 despite the fact that the author was keen on judgment and not sufficiently discriminating in research. The historian would not admit that though the Revolt came in the flood-tide of military enthuaism, the stream broadened and subsequently brought on its sweep a national sentiment.

Majumdar's study is no doubt based on the basis of facts as he could at all know them The statement he makes in this connection generates such a deep-rooted reverence for the majesty and greatness of history that it alone would make us free from passion fear, and favour. He writes ;

It would be the endeavour of the present writer to follow the three fundamental principles...firstly, that history is no respector of persons or communities ; secondly, that its sole aim is to find out the truth by following the canons commonly accepted as sound by all historians ; and thirdly, to express the truth, without fear, envy, malice, passion or prejudice and irrespective of all extraneous considerations, both political and humane.

Here the accent is on the truth-finding mission of a historian. Which is to say that no one can be a perfect historian with anything short of this attitude But many may not like this security of a 'methodological shelter', for a historian does not go through History as he would go through a picture gallery taking accurate notes. Action alone is not history and no historian can do full justice to his work if he sees actions independently of motives and sentiments Truth should prevail but it all depends on the selection of evidence and their treatment by a particular author. The 'whole truth' being somewhat intangible the respectability of a historian's work can be judged only by measure of his respect for historical truth. The debate continues. However, no historian of our time did more to raise the standard of responsibility in historical works than Dr R C Majumdar. He has completed the most exact and impartial account of any period in the history of our country. He swept the whole heaven with his telescope, 'removing the shell of things to reach the essence'. 'The service of History', they say, 'is a holy work' which purifies the soul.

NONAGENARIAN ACHARYYA : A TRIBUTE

V. V. MIRASHI

I did not come into close contact with Dr. R. C. Majumdar until he was appointed Professor by the Nagpur University to organise the newly started Department of Ancient Indian History and Culture. I used to see him at the sessions of the All-India Oriental Conference and the Indian History Congress. but I could not make bold to talk to him as I was a mere tyro in the field of research. But I remember one occasion. In 1950 at the session of the Indian History Congress held in Nagpur, he strongly defended in a sectional meeting the view that the Vākāṭaka Queen Prabhāvatīgupta lived for a full hundred years as stated in a Vākāṭaka Grant. "You believe a similar statement about the Chandella king Dhaṅga." he said. "Why do you shy at this statement about Prabhāvaguptā ?" he asked. "We must revise Vākāṭaka Chronology on this basis," he observed.

Being a student of Vākāṭaka history, I pondered over his view and as I could not persuade myself to accept it, I wrote a detailed article stating my view on the matter, and sent a copy of it to him for his comments. I had criticised his view in no uncertain manner. I was afraid that he might take it ill. But I was surprised to receive the following reply from him : "I fully appreciate your criticism of my paper on the Vākāṭaka Chronology. I am glad to find in you one who can offer strong criticism without any shade of rancour and bitterness, and, I presume, can also accept criticism in the same spirit. Unhappily, my experience does not show that there is a large number of such free and friendly critics, and I therefore welcome your letter all the more."

This letter reveals a noble trait in the character of the great scholar that he is. My experience is similar to his. I have known eminent scholars who, in stead of appreciating important research of others, take delight in pulling their legs by pointing out imaginary defects in it. Our aim in research should be revelation of truth as declared by Kalhana, the great historian of Kashmir, in the following verse :—

Slāghyah sa eva guṇavān rāga-dvesha-vivarjitā ।
Bhūt-ārtha-kathane yasya stheyasy-eva sarasvatī ॥

[That meritorious man alone deserves praise whose language, being free from bias and prejudice, is determined to recount only what has (actually) occurred].

May the Almighty bless the great Chief Editor of the History and Culture of the Indian People with a healthy life of a full hundred years *(purushāyusha)*.

Dr. R. C. MAJUMDAR : MY REMINISCENCES

P. N. CHOPRA

"You are young men. You have many years to look ahead. I have nothing to look beyond. I would take all the responsibility on my shoulders. You should not therefore worry and write with complete objectivity without fear or favour" was the friendly but stern advice given by the greying old man to a small group of boys in their thirties who had been recruited to assist him in the writing of the History of the Freedom Movement. This was my first encounter with the great historian Dr. R. C Majumdar exactly 25 years ago. He had earlier told me that he had hardly any hand in the selection but he would certainly prefer a trained historian, Though an odd assortment of young men with not much experience had been placed at his disposal, he never grumbled and tried to take the best possible work out of each of them according to his or her capability. He even suggested to one or two of these fresh recruits to read elementary text books to familiarise themselves with the history of the country. His kind-hearted nature was quite clear from the Confidential Report he wrote about one of these officers. "He did all he was capable of".

His method of work was quite novel. He made it clear from the very beginning that he would not like us to stick to our seats as in Government offices. He gave us complete liberty to go to the libraries and record offices or any other place whenever we liked, the only condition was that we must complete the topic entrusted to us within a stipulated time. We met him only on Saturdays to seek his advice or to report to him about the progress of the work.

However, he would himself attend office on every alternate day exactly at 10 A. M. and dictate almost extempore continuously for 3 hours. His loud and thundering voice could be heard at the end of the big room where the Director was seated behind a screen while two of us sat in two corners We learnt a lot from his close scrutiny of our scripts and his observations on the margin which stood us in good stead in later years. Ram Gopal who wrote a number of books including 'Indian Muslims' and 'Lokmanya Tilak' was one of our colleagues So was Dr K. N. S. Murthy who had a doctorate from London University. He had been entrusted to collect material on a certain subject but when asked about the material he was able to collect after about 6 months he remarked to the amusement of us all "nothing Sir". "How is it possible". retorted the Director. "It is not necessary that one would always find the material on a particular subject he is looking for in files", was Dr. Murthy's explanation. Dr. Majumdar would not like to go further. He just smiled and kept quiet In spite of his touching and awe-inspiring personality, we soon felt the humane and affectionate nature of his character. I still remember an incident. I had been taken ill and was bed-ridden for about a month. Quite conscious of the fact that it would delay the completion of the volume if my script could not

reach him in time I was struggling hard to finish it but apprised Dr. Majumdar of the position. "Don't stand on false prestige", he wrote back. "Act according to the advice of your physician". However, it was not destined that we should serve long enough under him and all of a sudden he was served one day with orders in office to quit. He was not even shown the courtesy to be permitted to take away his papers kept in his almirah. He took the slight coolly and remarked "you can certainly deny my legitmate right to take my personal papers but you can't take away what has been stored in the head". His exit augured well for the intellectual world. Long before the Government took up the project again, he had produced his three volumes on the "History of the Freedom Movement" which ran into several editions In his introduction to the first volume he has written an account of the "History of the History of the Freedom Movement", which is of absorbing interest.

To mark the Centenary Celebrations of the Great Revolt of 1857, the Government had commissioned Dr. S. N. Sen, a noted historian to write a book on the subject Dr Majumdar differed from the popular view. which had been supported by Veer Savarkar in his well-known work "The First War of Indian Independence". I still remember the scene when he expounded his views to a gathering of about 300 historians at the Agra Session of the Indian History Congress. He challenged any one to contradict his observations that most of the leaders of the revolt of 1857 were prompted by personal considerations and not for any patriotic motives. There were some murmurings but none was ready to accept the challenge. With great reluctance Dr. K. K Datta who had written a book on '*Kanwar Singh*', leader of the revolt of 1857 in Bihar., tried to defend his hero but Dr. Majumdar quoted extensively from records to prove his contention. Later on, he incorporated his views in his work entitled "The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857" which was published along with Dr. Sen's work "Eighteen Fifty Seven". The Government of India had planned country-wide celebrations of this historic occasion U P. alone had earmarked Rupees one crore for the purpose But the Prime Minister Jawaharlal Nehru, who had a keen insight into historical problems and had read Majumdar's work referred to the difference of views among historians in his famous Ramlila Grounds public meeting and privately advised the Chief Minister of U. P., G. B. Pant to go slow and cut down the expenditure on celebrations

Dr. Majumdar had to pay a heavy price for his principles He was seldom nominated to any Government bodies. It is well known that Shri M C. Chagla, the then Education Minister, had written a personal letter to Dr Majumdar requesting him to accept the Chairmanship of the Text Book Revision Committee But soon there was an organized agitation. Nehru and Chagla had to yield and the latter wrote an extremely apologetic letter to Dr. Majumdar explaining the circumstances Majumdar, of course, did not accept the offer.

However, Majumdar, in spite of his emotional approach in certain cases, would hold steadfastly to truth. As he said recently at the function organised by the Bharatiya Vidya Bhavan in New Delhi on the occasion of the completion of eleven

volumes of History and Culture of the Indian People, he had tried to follow Sir Jadunath Sarkar's dictum : "I would not care whether truth is pleasant or unpleasant, and in consonance with or opposed to current views. I would not mind in the least whether truth is or is not a blow to the glory of my country. If necessary, I shall bear in patience the ridicule and slander of friends and society for the sake of preaching truth. But still I shall seek truth, understand truth and accept truth".

He is, however, not adamant as some people seem to think. He is ready to argue in spite of the fact that he has fixed ideas about certain historical problems. I still remember his initial apprehension about the nature and the extent of the Wahabi Movement. But once he was convinced of the objectivity of the conclusions arrived at, he had no hesitation in declaring it to be the biggest organised movement launched against the British before the Congress period. He would not use his editorial privilege even if he did not agree with the views of the writer. For example, in my account of the Wahabi movement, he strongly felt on a certain point. But he did not interfere with the text. He mentioned his views as a footnote.

Like some other leaders, he has his doubts about Netaji's death in an air crash. He formally handed over a representation to the present Prime Minister during his recent visit to Delhi. The Prime Minister told him frankly that he would say 'no' to it. "Dr. Majumdar you are such a distinguished historian. If Netaji were alive what prevented him from coming ; he might have replaced Jawaharlal". "There is some truth in what you say", Dr. Majumdar admitted. Many years back he had championed the same cause which prompted Panditji to send for him. The then Prime Minister handed over a letter to him to go through which would prove that Subhas was dead. It was written by some American army officers who had seen the body of Subhas and out of respect for an army general they had saluted him. It was sent to Panditji by the British Government. Dr. Majumdar went through it carefully and expressed his doubts to the Prime Minister. It is explicitly mentioned in the letter, he told the Prime Minister, that the American officers saw a body wrapped in a cloth which was reported to be that of Subhas's. "Therefore, this could not be conclusive evidence". "You are a historian, I am not"; the magnanimous Nehru admitted.

Dr. Majumdar is perhaps the only historian who is well known in South East Asia. Wherever I went, the scholars and students were eager to know more about him. In Delhi I had invited a few friends including some representatives of South East Asian countries to meet him. Dr. Majumdar in his usual roaring voice asked the Singapore representative about the meaning of this word. Finding no satisfactory reply, he went on to explain its significance to his complete surprise. In fact, the then Ambassador of Malaysia rang me up to request for an exclusive meeting with the great historian, if possible, for a few minutes as he had read his works as a student and was eager to have the privilege to see him in person. Earlier at a get-together an American Professor had asked Dr. Majumdar "whom will you consider a Hindu", "Any body who does not disown Hinduism", back came the reply.

There was a controversy whether beef was prohibited by the holy scriptures of Hindus. Historical evidence was conclusive that the holy scriptures did not prohibit it. But a venerable Sanskrit scholar was insistent that it was not allowed and recited verses to support his contention. He happened to be politically influential and, therefore, we were in a fix how to convince him. We fixed the meeting in Calcutta and requested Dr. Majumdar to attend it. The scholar had collected a pile of books, the Vedas. the Upanishads and other literature and started reciting verses to prove his point. Dr. Majumdar listened for a while and then burst out : "I have only one hour to spare as I am committed to give a lecture soon afterwards. So let us decide the issue". He asked the Sanskrit scholar not to waste time in reciting the shlokas or interpreting them. "I would simply ask you", he said, "to quote one recognised scholar in India or abroad in support of your theory and I will be convinced." The scholar thought for a while and said "this is my interpretation of original verses". "May be", said Dr. Majumdar, "but it has not been accepted by historians so far. While there are more than a dozen renowned historian who interpret it to mean that Hindus were not debarred from taking beef." "I will advise you", said Dr. Majumdar. "to get your interpretation printed and distributed among scholars and if they accept it we would agree. But for the present we would follow the established facts", he concluded.

He would not like to be interrupted during his talk. Mrs. Chopra still remembers how she was affectionately snubbed at the very meeting after her marriage when we went to see him at the airport when he was on his way to Srinagar to preside over a meeting of the Historical Society. She tried to intervene in our talk. Dr. Majumdar at once interjected : "You do not know. You came into his life much later." Even during interviews at the Union Public Service Commission or elsewhere which he attended as an expert, candidates were happy as Dr. Majumdar would himself reply the question before they would attempt it.

Dr. Majumdar even at this age, does not suffer from any physical disabilities. I would attribute it to his strength of character and complete freedom from malice. He is no doubt reported to have strong likes and dislikes but he so humane that it is so easy to win him over as a friend or a patron after the very first meeting. We have differed often on approach to historical problems but it has never affected our personal relationship.

I have had the privilege to play host to him on many occasions when he visited Delhi. He has a great love and affection for both of us. In fact he treats Mrs. Chopra as a daughter-in-law and in traditional way brings a sari for her whenever he visits Delhi after Puja. In spite of the insistence of the Bharatiya Vidya Bhavan to stay as their guest during his recent visit to Delhi, he emphatically told them "I would be more comfortable with Chopra" and instructed them to issue the invitation for all the functions to both of us wherever he was expected to be present.

I keenly observed his diet and way of living. Even at this age he takes everything though in small quantities. Curds are a must after the actual meal with a little sugar, salt and rice. Perhaps the secret of his long life and good health is the afternoon nap which he must have after lunch. He would instruct Mrs. Chopra that he should not be disturbed for 2 to 3 hours when he would bolt his room and go to sleep. In spite of many tragedies in life, the demise of two daughters and wife, he has been able to put up with it due to his heavy pre-occupations in literary work. Even at this age he is busy revising his earlier works and may perhaps write on 'Lessons of Indian History'.

ACHARYA RAMESH CHANDRA MAJUMDAR
A HUMBLE TRIBUTE

BISHESWAR PROSAD

History is the conscience of society and the function of a historian is to test the events of an age on the touchstone of good or evil, His role is to reveal truth and relate events as they happened, directing attention to how they happened and why. The historian is no mere recorder of happenings, merely chronicling them. His main task is that of interpretation which primarily involves placing facts in those proper setting in the totality of events. Narration and interpretation are thus the two essential elements of a historian's craft. In the present century more and more stress is laid on the latter thereby enriching the content of narration and raising history to the level of philosophy. Acharya Majumdar has been one of the leading architects of the history of India which he has transformed into a sublime art. Brought up in the traditions of Ranke and Acton, he has unceasingly striven to explore facts by meticulous research into the mass of source material, whose magnitude and diversity are truly baffling. But he has not confined himself to narrow limits and restrict his investigation to a limited period of our long history. The range of his studies has been wide enough to comprehend such remote ages as those of the Guptas at one end and the Freedom Movement from British rule at another. He is equally the master of the so-called ancient period as well as the modern period and this wide comprehension and vast coverage gives him a unique distinction among historians of India and even foreign scholars. His contribution to historical knowledge has been immense and he has inspired a host of scholars by his unswerving devotion to truth and fearless criticism of events and their makers. It is our good fortune to be able to celebrate his ninetieth birthday and pray for his long life that he may guide the history of India and its votaries into channels of exactitude and uninhibited and unbiased interpretation.

I have been fortunate in having been the recepient of his affection and intimate association with him for nearly forty years. During my student days at the University I had the privilege to read his book on Corporate Life in Ancient India, and admire his erudition. It was, however, in 1939 on the occasion of the session of the Indian History Congress in Calcutta, over which he presided, that I came into personal contact with him, which has grown into intimate relationship over these decades. As a young unknown scholar I prized meeting him, but the very first contact revealed his largeheartedness and put me at ease. As an Assistant Secretary of the Indian History Congress, who was responsible for its organisational activities, I was brought into closer touch with him and got inspiration and guidance from him. Subsequently, as General Secretary of the Congress and a person closely associated with the scheme of the Comprehensive History of India sponsored by the Indian History Congress, of which Acharya Majumdar has been a valued editor and guide, I had the rare

privilege of benefiting by his advice and direction. He has been generous enough to treat his junior colleagues with respect and affection, and that reveals the magnanimity of his character and his sense of equality and homogeneity among the workers in the same cause, both humble and great.

The span of his fruitful career as a historian has extended over more than three scores of years, during which period he has produced a large number of eminent works of history which have met with universal appreciation, In the first stage of his long career. he stuck to revealing the secrets of ancient history. Apart from his book on corporate life and popular institutions in the remote part, he ventured into the realm of the history of Indian settlements in south-east Asia and the diffusion of Indian culture in those neighbouring lands. This work even if Dr, Majumdar had written nothing else, would have placed him in the rank, of great historians. But he did not cease his activity and pursued his research in the history of the glorious age of the Guptas and Vakatakas, a work which has broken a new field and remains a most valuable contribution to the understanding of the currents and forces which set the tone for future greatness of India in the realms of economic, social and cultural pre-eminence. The sublimity of his contribution in revealing the history of the first millenium of the Vikram era brought no surprise. But when he in his middle age ventured on a new path and produced a multi-volume history of India from ancient to the modern age, almost to the contemporary period, most of us wondered at his courage to delve into new fields and bring to fruition an adventure which has given new dimensions to our knowledge of the entire history of our land and has illuminated diverse dark corners in it. He has not hesitated to denounce the rulers whose reigns brought suffering and misery to the people, while he has exhibited his moderation and balanced judgement in estimating the work of enlightened rulers. His volumes, which are largely his own work, on the period of British imperial domination have marked the middle course between panegyric characteristic of British writers and denunciation by nationalist historians, This balanced account is the peculiar trait of his workmanship. He is fearless and is prepared to defy popular sentiment. This is revealed by his book on the revolt of 1857, which has come in for criticism by many writers. The historian has to be true to himself and interpret events according to his lights and his understanding of facts, howsoever distasteful they might be to the general sentiment which may or may not be based on unprejudiced examination of source material. Acharya Majumdar even at the age of ninety years and occasional indifferent health keeps himself engaged in his search for truth,

I have great pleasure in associating myself as one of his humble admirers in wishing him a long life of fruitful work and pray that he guide us in revealing the secrets of history. He is not only of India but belongs to the world. His association with the history of mankind eterprise of the UNESCO places him in the rank of world historians. I wish and pray for his long life. May he attain the age prayed for in the Vedas and live hundred years and more.

সার্থক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতের ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে পরলোকগত আচার্য যদুনাথ সরকারের পরেই রমেশচন্দ্র মজুমদারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর আচার্য রমেশচন্দ্র তাঁর জীবনের নবতিতম বৎসরে পদার্পণ করেছেন। এর মধ্যে তাঁর ইতিহাসের সাধনা চলেছে প্রায় সত্তর বৎসর, এবং আজও ঐ সাধনায় পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্যণীয়। আচার্য যদুনাথের ঐতিহাসিক গবেষণা প্রধানতঃ ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রমেশচন্দ্রের গবেষণা প্রথমে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসকে অবলম্বন করে আরম্ভ হলেও পরবর্তীকালে ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগকে নিয়েও তিনি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং বহু নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করে নব নব বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন যুগের ভারতীয় ইতিহাসে আচার্য রমেশচন্দ্রের মতো ব্যুৎপত্তি বর্তমান কালের কম ভারতীয় বা বিদেশী ঐতিহাসিকের মধ্যে দেখা যায়।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক রচনাগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে সেগুলি ভারতীয় ইতিহাসের পাঠকমাত্রের কাছেই সুপরিচিত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক রচনা *Corporate Life In Ancient India* বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯১৮) প্রকাশিত হয়, এবং তখনই পণ্ডিতমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। এরপরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু রাজ্যগুলিকে নিয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ [*Ancient Indian Colonies In The Far East* (১৯২৭-৩৮) *Kambujo Desa* (১৯৪৪) ইত্যাদি] রচনা করে ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের দিকে তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফরাসী ও ওলন্দাজ ঐতিহাসিকেরা এই বিষয়ে তাঁদের আপন আপন মাতৃভাষায় যে সব গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করছিলেন রমেশচন্দ্র সেগুলির সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস-পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে। স্বাধীনতা লাভের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের *(History of Bengal—Volume One)* পরিকল্পনা ও সম্পাদনার ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগেও বহু উদীয়মান নবীন ঐতিহাসিককে তিনি এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ রচনার দায়িত্ব দিয়ে বৃহত্তর পাঠক-সমাজের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। এঁদের মধ্যে বর্তমান কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর নাম বিশেষ স্মরণীয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Vakataka-Gupta Age* (১৯৪৬) আল্‌টেকার ও মজুমদারের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে আচার্য রমেশচন্দ্র আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। ইতিহাসের এই ক্ষেত্রে তাঁর রচিত *The Sepoy Mutiny And The Revolt of 1857* (১৯৫৭) এবং *History of Freedom Movement In India* (১৯৬২) ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে। রমেশচন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করতে অস্বীকার করেন, যদিও ভারতের কোনো কোনো স্থানে এই বিদ্রোহের পশ্চাতে জন-সমর্থনের

কথা তিনি অস্বীকার করেননি। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় মহলেই রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের প্রচুর বিরূপ সমালোচনা শোনা যায়, যদিও রমেশচন্দ্রের সমালোচকেরা নতুন তথ্য বিশেষ কিছু উপস্থাপিত করেননি। মনে হয়, 'স্বাধীনতা-সংগ্রাম' কথাটির তাৎপর্য নিয়েই উভয় পক্ষে মৌলিক মত-বিরোধ বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। রমেশচন্দ্র তাঁর তিন খণ্ডে রচিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিস্তারিত ইতিহাসে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজির পরিচালিত কংগ্রেসের অবদানের কথা স্বীকার করেও এই ব্যাপারে বিপ্লবীদের এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে তাঁর দেশবাসীদের স্মরণ করিয়ে দেন। ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষ এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম কোনো একজন নেতা বা একটি বিশেষ গোষ্ঠির অনুপ্রেরণায় ঘটেনি। এর পিছনে প্রাক্-কংগ্রেস যুগের নেতৃবৃন্দের প্রয়াস, কংগ্রেসী নরমপন্থীদের সংবিধান-সম্মত বা আইনানুগ আন্দোলন, গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের কর্মপন্থা এবং বিপ্লবীদের আত্মদান সব কিছুই কাজ করেছে, রমেশচন্দ্রের এই মূল বক্তব্য দেশের কিছু গোঁড়া কংগ্রেসীদের অসন্তুষ্ট করলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবদান কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে, এই ধরণের অভিযোগ কোনো কোনো ঐতিহাসিক মহলে করা হয়ে থাকে। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের চাপেই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ন,—এই বিচিত্র ধারণা একশ্রেণীর আধুনিক ঐতিহাসিক পোষণ করে থাকেন। এটি অবশ্য একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার।

ঐতিহাসিক হিসাবে আচার্য রমেশচন্দ্রের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হ'ল ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত, এগার খণ্ডে সমাপ্ত, *The History And Culture Of The Indian People* গ্রন্থের সম্পাদনা। বইটির পরিকল্পনা ও প্রকাশের কাজে বত্রিশ বৎসর সময় লেগেছিল। রমেশচন্দ্র শুধু যে বইটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনা করেছেন তা নয়, এর বহু অধ্যায়, বিশেষতঃ আধুনিক যুগের ইতিহাসের অধ্যায়গুলির অধিকাংশ, তারই লেখনীনিঃসৃত। এই বিরাট গ্রন্থের শেষ খণ্ডটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন রমেশচন্দ্রের বয়স অষ্টআশি বৎসর। এত অধিক বয়স পর্যন্ত এত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় আমাদের দেশে আর কোনো ঐতিহাসিক আজ পর্যন্ত দিতে পারেন নি, সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। একই সময়ে রমেশচন্দ্রের রচিত বাংলাদেশের ইতিহাস—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ,—তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়, এবং এশিয়াটিক সোসাইটি হ'তে রামমোহন রায়ের উপর লেখা *(On Rammohan Roy)* তাঁর ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটি বাংলাদেশের পণ্ডিত মহলে এক তীব্র বিতর্কের সূচনা করে।

রমেশচন্দ্রের আধুনিক রচনাগুলির অনেকগুলিই যে অত্যন্ত বিতর্কমূলক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা ভারতীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বহু পণ্ডিতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মনে হয় আচার্যের মতামত সকলে সম্পূর্ণ অনুধাবন করেন নি। বর্তমান কালে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে একান্ত কাম্য, এ কথা রমেশচন্দ্র কোথাও অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তার জন্য অতীতের ইতিহাসকে বিকৃত করে চিরকাল আমাদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল বলা, এবং যা কিছু বিভেদ তা সবই ব্রিটিশ রাজশক্তির সৃষ্টি এরকম একটি ধারণা পোষণ করা যে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, রমেশচন্দ্র বারংবার এই কথাই বলেছেন। সাময়িক বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে ইতিহাসকে বিকৃত করে দেখার তিনি ঘোরতর বিরোধী। এ ছাড়া মধ্যযুগের

ভারতে ইসলামিক রাজশক্তি যে সময়ে সময়ে হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছেন রমেশচন্দ্র এই সত্যকেও কোথাও অনুল্লেখিত রাখেন নি। সাম্প্রতিক কালে 'প্রগতিশীল' আখ্যাধারী একশ্রেণীর ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় মুসলিম ধর্মান্ধতাকে নানারকম অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার আবরণে আবৃত রাখার পক্ষপাতী, যদিও হিন্দু-সমাজের ন্যূনতম ত্রুটি-বিচ্যুতি এঁদের ক্ষুরধার লেখনীর আক্রমণ এড়িয়ে যায় না। স্বভাবতই তাঁরা রমেশচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অপাংক্তেয় করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এঁদের বিচারে আচার্য যদুনাথকেও একই দোষে দুষ্ট বলা যায়। আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে মুঘল-সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মান্ধ বললেও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মহলে আর নিজেদের 'প্রগতিশীল' পরিচয় অটুট রাখা যায় না। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত এটি আমাদের তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকারী ইতিহাস রচনার নীতিও ছিল।

রামমোহন সম্বন্ধেও আচার্য রমেশচন্দ্রকে শ্রদ্ধাহীন বলা একেবারেই চলে না। ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে রামমোহনের বিশেষ ভূমিকা তিনি বরাবরই স্বীকার করে এসেছেন। তাঁর চিন্তাশক্তি, যুক্তিবাদ, মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ, সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গী, আন্তর্জাতিকতাবোধ এগুলি সবই রমেশচন্দ্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। কিন্তু তিনি সব ব্যাপারেই রামমোহনকে পথিকৃত-এর সম্মান দেওয়ার বিরোধী, কারণ তাঁর বিচারে সেটা অনৈতিহাসিক। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বা বাংলা গদ্য সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জন্মদানের ব্যাপারে রামমোহনের যে বিশেষ কোনো অবদান ছিল না, এবং সতীদাহের ঘোরতর বিরোধী ও নারীসমাজের উন্নতিকামী হলেও তিনি যে সর্ববিধ সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না, রমেশচন্দ্রের এইটাই মূল বক্তব্য। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মতো রামমোহনের ব্যাপারেও রমেশচন্দ্রের বক্তব্য বিতর্কমূলক, কিন্তু তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে কোনো বিবেকী ঐতিহাসিকই পারবেন না। যে কোনো আলোচনার ব্যাপারে বিতর্কের সৃষ্টি করে তার মধ্য দিয়ে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বাঙালী নৈয়ায়িকেরা বহু শতাব্দী ধরে করে আসছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রকে আধুনিক যুগে নৈয়ায়িকদের চিন্তাধারার অনুগামী বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। রামমোহন রায়ের বিষয়ে লেখা বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনাতেই রমেশচন্দ্র একটি বহুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন : 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ',— অর্থাৎ বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ঘাটন সম্ভব। রমেশচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বলতে হবে। তাঁর বহু মতের বিরোধিতা করলেও যে সব তথ্য তিনি উদ্ঘাটন করেছেন, অন্ততঃ আগামী একশত বৎসর ঐতিহাসিকেরা তার মূল্য অস্বীকার করতে পারবেন না, অবশ্য যদি ততদিন আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের বিষয়ে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। তিনি শুধু গবেষক পণ্ডিতদের জন্যই ইতিহাস রচনা করেন নি, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্যও ভালো ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক লিখে গেছেন। স্কুলের ছাত্রদের জন্য ইংরেজীতে লেখা তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস এক সময়ে সারা ভারতে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য তাঁর লেখা *An Advanced History of India* (১৯৫৮) ও *Ancient India* (১৯৫২) শুধু বহু পরীক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটায় নি, ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু বহু সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিকে তৃপ্তি দিয়েছে। ঐতিহাসিক হিসাবে আচার্য রমেশচন্দ্রের দেশব্যাপী খ্যাতির অন্যতম কারণ তাঁর এই বৃহত্তর পাঠক-সমাজ, যা আজ সারা ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের সারস্বত জীবন সব বিচারেই সার্থক হয়েছে। আচার্য শতায়ু লাভ করুন, এই প্রার্থনা দিয়েই আমার ক্ষুদ্র নিবন্ধটি শেষ করছি।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

কালীচরণ ঘোষ

অনাগত দিন

সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে বাঙালীর এক উচ্চ আসন ছিল ; ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাংবাদিকতা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রের শিখরে বাঙালী দিক্‌পাল স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ আছে মাত্র ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এই কীর্তিমান পুরুষ—যাঁহার দীপ্তি আজও ভাস্বর,—আমাদের ইতিহাস-রত্নাকর ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

ড. মজুমদার মহাশয়ের সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কার্যতালিকার ছক বাঁধা আছে। তাহার সকলগুলিই জ্ঞানাহরণ, পাঠ, গ্রন্থরচনা, প্রুফ দেখা, আর কখনও পণ্ডিতসমাজে বক্তৃতাদানের মধ্যে নিবদ্ধ। তাঁহার দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি অটুট আছে। শরীর নীরোগ। পরের উপর নির্ভরতা তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার কর্মের সঙ্গী কাগজপত্র, কলম, রচনার সংশ্লিষ্ট বই তিনি নিজেই যথাস্থানে রাখিয়া দেন। অযথা সময় নষ্ট করার অভ্যাস তাঁহার নাই। বিদ্যাচর্চাই তাঁহার একমাত্র নেশা। তিনি যে কোনোও মাত্র নবাগত যৌবন জ্ঞানানুসন্ধানী মানুষের মত স্বাস্থ্যবান, কর্মপটু, অনলস ঋষি।

যাঁহার পাণ্ডিত্য আছে, অভিমান নাই—তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী। হাস্য-পরিহাসে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা। তিনি সকল ছোটো-বড়ো রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাঁহার সহিত আলোচনায় ইহাই বুঝা যায় যে যাঁহারাই নিজেদের পরাধীন দেশ শৃঙ্খলমুক্ত করিতে সংগ্রাম করিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রের নাম তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইবার যোগ্য। তাঁহার নিরভিমান প্রকৃতির জন্য তাঁহাকে কাছে পাইলে কেহ আর ছাড়িতে চাহেন না। মানুষের কদর বুঝিয়া আলাপ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অদ্ভুত। এই কারণে তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

পরিচয়ের দিক হইতে যাঁহার যেটুকু প্রাপ্য, তাহা দিতে তাঁহার কার্পণ্য নাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার জয়ের এক বিপ্লবী নেতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, ড. মজুমদার হাফ সার্ট মাথায় গলাইতে গলাইতে দ্রুত পদে সেখানে আসিয়া হাজির হন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই আগন্তুক বিপ্লবী নেতাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরেন, এই অবস্থাতেই ড. মজুমদার অসঙ্কোচে তাঁহাকে বলিলেন ঃ "You are the makers of history, I am a mere writer."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সূর্য সেন বক্তৃতামালায় ডঃ মজুমদারের পঠিত প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এই আপত্তি ভীতি প্রদর্শনের আকারও ধারণ করে। অপর কেহ হইলে হয়তো এত কাণ্ড উপেক্ষা করিতেন। ড. মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা হইতে কপি আনাইয়া নিজ হাতে সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করিয়া দেন। বেনামা আপত্তিকারীদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে তাঁহার লেখার মধ্যে হাজার ক্ষুদ্র হউক, কোনও ভ্রম থাকিলে তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

তাঁহার রচিত পুস্তকে কোনও পাঠক সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া দিলে তিনি কখনও সে-কারণে বিরক্ত হন না। বরং সংশ্লিষ্ট পুস্তকের পরের সংস্করণে ভুল সংশোধন করিয়া ভুল প্রদর্শন-কারীকে অজস্র ধন্যবাদ দেন।

এই সত্যনিষ্ঠ মানুষটি ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার আমন্ত্রণ পাইয়া দিল্লীতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আলোচনার শুরুতেই পণ্ডিতজী বলেন

স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে, তার পূর্বে বিশেষ কিছু ছিল না। ড. মজুমদার বলেন যে বাংগালায় স্বদেশী আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা—কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি (আলিপুর বোমার মামলা) হইয়াছে। পণ্ডিতজীর মস্তকে এ-সকল কথা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইল। তারপর ড. মজুমদার বালেশ্বর যুদ্ধ ও শহীদদের নাম উল্লেখ করিলেন। তখন পণ্ডিতজীর ধৈর্য শেষ সীমায়। যতীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হওয়ায় পণ্ডিতজী বলিয়া উঠিলেন ঃ ''যতীন্দ্রনাথ একজন ডাকাতের নেতা ছিল, স্বাধীনতার ইতিহাসে তার নাম উঠতেই পারে না''। ড. মজুমদার বলিলেন ঐ সকল ঘটনার উল্লেখ না থাকিলে ইতিহাসই হয় না। পণ্ডিতজী দেখিলেন কঠিন ঠাঁই। ''আচ্ছা, নমস্কার'' বলিয়া ডঃ মজুমদার বাহির হইয়া আসিলেন। তার পরই তিন খণ্ডে গ্রন্থ লিখিলেন History of the Freedom Movement in India। দেশ-বিদেশে পরিচিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ্য গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টি

কাহারও মধ্যে অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাইলেই তিনি তাঁহাকে 'আপনার' করিয়া লইয়াছেন। তাহাকে পরামর্শ দান ছাড়া, কোন্ বই, পত্র, পত্রিকায় সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহা বলিয়া দেওয়া, নিজ লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনিয়া বইখানির কোথায় আলোচ্য তথ্যটি রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য লাইব্রেরী ঘর হইতে আসিতে আসিতে সে স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া আসেন। ইহাতে সময়ের সাশ্রয় হয়।

যাঁহারা তাঁহাকে অতি ক্ষুদ্র তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, এবং তিনি নিজ গ্রন্থের কোনো অংশে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, নিজ পুস্তকে সে ঋণ স্বীকার করিয়া অখ্যাত লোকের পরিচয় করাইয়া দিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

তেজস্বিতা

বেশীদিনের কথা নয়। ভারত সরকার মনস্থ করেন আন্দামান সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিবে। ড. মজুমদার এই কাজের ভার নিতে সম্মত হন। এই লেখা এবং মুদ্রণ যখন প্রায় শেষ। বন্দীশালা ভাঙিয়া সেখানে জাতীয় স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপনের যে পরিকল্পনা ড. মজুমদার রচনা করেন কেন্দ্রীয় সরকার তাহা পরিবর্তন করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ড. মজুমদার বলেন পরিবর্তন অসম্ভব, বরং গ্রন্থকাররূপে তাহার নাম বাদ দেওয়া যাইতে পারে। ভারত সরকার নতি স্বীকার করিয়া পুস্তক প্রকাশ করেন ; এবং প্রকাশিত পুস্তকে এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ঐ মত গ্রন্থকারের। প্রকাশকদের মত সামান্য ভিন্ন।

নির্ভীকতা

তাঁহার নির্ভীকতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য তাঁহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহ, নানাফরণভিশ ও বাহাদুর শাহ সম্বন্ধে যে সকল প্রচলিত মত আছে তাহা তিনি তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিনা প্রমাণে কোনো তথ্যই তিনি গ্রহণ করেন নাই। ব্রিটিশ কাউন্সিল, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী হইতে মূল দলিলপত্রের নকল আনাইয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। ছাত্রদের নিকট তাঁহার একটি আদেশ ঃ জ্ঞান মতে যাহা সত্য মনে হইবে তাহা প্রকাশে ভয় পরিত্যাগ করিবে। এই শিক্ষাপদ্ধতি তাহার এক অবিনশ্বর কীর্তি।

ইতিহাস-দার্শনিক আচার্য রমেশচন্দ্র : জয়শ্রীর নিবেদন

সুনীল দাস

ইতিহাসেরও দর্শন আছে। যিনি ইতিহাস-দার্শনিক, ইতিহাস-চেতনার সমগ্রতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘটনা-পরম্পরার বিন্যাসকে তিনি একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। সেই পরিণতির অবিরাম গতি চলেছে অন্তহীন বন্ধনমুক্তির দিকে, যার কোনো বাঁধাধরা ছক্ নাই, অথচ দিক্-নির্দেশ রয়েছে। ইতিহাস যেমন কতকগুলি ঘটনার পঞ্জি নয়, তেমনি ঘটনার অংশগুলিকে কেবলমাত্র পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করলেই তাদের কোনো সমগ্রতাবোধে উত্তরণ সম্ভব নয়। অংশগুলির সমাহার অতিক্রম ক'রে সমগ্রের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে ইতিহাসের অপরূপ গতিভঙ্গি। ব্যক্তি-জীবনে যেমন বুদ্ধির সঙ্গে বৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সমন্বয় সাধন করতে হয়, তেমনি বৃহত্তর সমাজ-জীবনেও মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিরন্তর প্রয়াস চলে। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মনৈতিক, ভৌগোলিক জীবনে সংঘাত নিরসনে সমন্বয়ের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সমাজজীবন এগিয়ে চলে।

ব্যক্তি-জীবনের পূর্ণতালাভের অন্তিম লক্ষ্যরূপে যেমন নির্ধারিত হয়ে রয়েছে তার আত্ম-আবিষ্কারের সচেতনতা, জাতির জীবনেও তেমনি আত্ম-আবিষ্কারের পরিণতির দিকে জাতিকে পূর্ণতার সন্ধানের অভিযাত্রায় অনিবার্যরূপে এগিয়ে যেতে হয়। জাতীয় জীবনে যাঁরা সত্য-সন্ধানী এই পথেই তাদের পরিক্রমা চলে। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাসের মগ্ন-চৈতন্য সত্যসন্ধানী। তাঁর ইতিহাস-দর্শনের রূপরেখা বলিষ্ঠভাবে এঁকে দিয়ে তিনি যেমন সত্য-আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন, পরিণতি-নির্বিশেষে সত্যকে নির্মমভাবে অনুসরণে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তেমনি জাতীয়তাবোধের পূর্ণ বিকাশের সর্তকে তাঁর ইতিহাস-দর্শনের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কার্ল মার্ক্স একদা হেগেলের ইতিহাস-দর্শনকে মাথার ওপর দাঁড় করানো স্থিতি থেকে পায়ের ওপর স্বাভাবিক স্থিতিতে দাঁড় করাবার কৃতিত্ব দাবী করে বলেছিলেন 'এতোকাল দার্শনিকদের কাজ ছিল জাগতিক ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা, কিন্তু আসল কাজ হ'ল সহস্র জাগতিক বন্ধনের পরিবর্তন সাধন।' তারপর দেড়শো বছরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক ভাঙ-চুর হয়েছে। তার ফলে, একদিকে যেমন মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটেছে জীবনের এক পর্যায়ে, তেমনি ভিন্নতর পর্যায়ে নূতন নূতন শৃঙ্খল-বন্ধন সাধারণ মানুষের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ইতিহাস-দার্শনিক আচার্য রমেশচন্দ্র, সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর প্রেক্ষায়, জাতির আত্ম-আবিষ্কারের অন্তহীন সংগ্রামের পথে কেবলমাত্র ইতিহাসের ব্যাখ্যাতাই নন্, নবচেতনায় জাতির ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করবার দুরন্ত স্পর্ধা নিয়ে গত ত্রিশ বছর সরকারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে, সরকারী ইতিহাস-রচয়িতাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, অন্তহীন প্রত্যয় নিয়ে এ-কথাই বলে এসেছেন যে, ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবের নেতৃত্বশক্তির দুর্বার প্রয়াসে ইংরেজ শাসকদের ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত পর্যায় রচিত হয়েছিলো, অহিংস সংগ্রামে নয়। ইতিহাস-দার্শনিক স্বার্থহীনভাবে বুঝিয়ে দিলেন, সুপ্ত জাগতিক শক্তি-সমাবেশকে মূর্ত করবার দায়িত্ব দার্শনিক গ্রহণ করবার স্পর্ধা রাখেন।

ইতিহাস-দার্শনিক আচার্যদেবের সঙ্গে 'জয়শ্রী'র নিবিড় সম্পর্ক, গত ত্রিশ বছরে এই দার্শনিক-স্পর্ধার ক্রম-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নিবিড়তর হয়েছে। 'জয়শ্রী'র সঙ্গে আচার্য মজুমদারের সম্পর্ক

১৯৩১ সালের মে মাসে (১৩৩৮-এর বৈশাখে) গভীর রাজনৈতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে 'জয়শ্রী'র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। জয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা লীলা নাগ (রায়) ১৯২১ সালে ঢাকার প্রথম মহিলা ছাত্রীরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ ক্লাশে অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষকে সম্মত করিয়ে যেদিন ভর্তি হলেন, সেদিন থেকেই আচার্যদেবের শ্রদ্ধা ও স্নেহ তাঁর প্রতি প্রসারিত হয়েছে। বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ও তাঁর বহুবিধ প্রতিভাবলে আচার্যদেবের স্নেহ ও শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াকার দিনগুলি থেকে। বস্তুতঃপক্ষে সেদিনকার বহু স্বনামখ্যাত অধ্যাপক গোপনে তাঁদের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সহায়ক ছিলেন। ১৯২৭-১৯৩১ সালে জগন্নাথ হলের সঙ্গে যুক্ত অনাবাসিক ছাত্ররূপে আচার্য রমেশচন্দ্রের সঙ্গে বর্তমান 'জয়শ্রী' সম্পাদকের পরিচয়ের দিনগুলি সুরু। দেশবিভাগের কিছুকাল পর বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের উদ্যোগে পুনর্গঠিত পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতির (East Bengal Minority Welfare Central Committee) সভাপতিত্বের দায়িত্ব আচার্য রমেশচন্দ্র গ্রহণ করেন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এই কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি, লীলা রায় সাধারণ সম্পাদক, অনিল রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সদস্য এবং 'জয়শ্রী'র বর্তমান সম্পাদক সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত হ'ন। ইতিহাস-দার্শনিক যে শুধু ব্যাখ্যাতা নন, সুপ্ত জনশক্তিকে মূর্ত ক'রে ঘটনাপ্রবাহের ধারা পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতেও এগিয়ে যান, আচার্যদেবের সেই ভূমিকাই সেকথা সপ্রমাণ করলো।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেমন একসময় 'জয়শ্রী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন, পঞ্চাশের দশক থেকে সুরু ক'রে এ-যাবৎ আচার্য রমেশচন্দ্রও দেশের ও জাতির সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে 'জয়শ্রী'র পাতায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তারমধ্যে নেতাজীকে নিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যাই সব চাইতে বেশী। জাতির জীবনে নূতন শক্তির স্পন্দন ও উদ্বোধন সঞ্চারিত করবার অপ্রতিরোধ্য দায়িত্ব নিয়ে ১৯৫৪ সাল থেকে ইতিহাস-দার্শনিক স্বার্থহীনভাবে লিখে চলেছেন, নেতাজী ও তার আজাদ বাহিনী ইংরেজের ভারত-ত্যাগের অন্যতম কারণ। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রাম নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার বোর্ডের পরিচালকরূপে তাঁর রচিত খসড়াতে নেতাজী ও আজাদবাহিনীকে ইংরেজের ভারতত্যাগের অন্যতম কারণরূপে বিবৃত করলেও, যতই দিন গেছে তাঁর ভাবনাতেও নেতাজী ও আই, এন, এ, একমাত্র কারণ থেকে প্রধানতর কারণে উন্নীত হয়েছে এবং শেষ-পর্যন্ত প্রায় একমাত্র কারণে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ১৯৫৫-র 'জয়শ্রী'র নেতাজী সংখ্যার ৭৪৩ পৃষ্ঠায় ইতিহাস-দার্শনিক লিখলেন ঃ ''যেদিন নেতাজী ইংরেজের সৈন্যদল ভাঙিয়া জাতীয় বাহিনী গঠন করিলেন সেই দিনই.....ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি গড়িয়া উঠিল।'' 'জয়শ্রী'র ১৩৭০-এর নেতাজী সংখ্যায় গান্ধীজী ও নেতাজীর তুলনামূলক আলোচনা করে লিখলেন ঃ ''ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে, যে দুইজন নেতা সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী তাহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি ছিল, তাহা একটি গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যা।

ইংরেজের অধীনতা পাশ হইতে ভারতের মুক্তি—এই ছিল নেতাজীর চরম, পরম ও একমাত্র লক্ষ্য, আদর্শ ও সাধনা।... ....কিন্তু মহাত্মাজীর আদর্শ, লক্ষ্য ও সাধনা ছিল অহিংসা ধর্মের প্রচার দ্বারা ভারতবাসীর নৈতিক উন্নতি সাধন।.....''

ভারত সরকারের ভ্রান্ত তিব্বত নীতি সম্পর্কে ১৩৬৬-এর বৈশাখ সংখ্যায় আলোচনা করেছেন, ১৩৫৭-র কার্তিক সংখ্যায় বাস্তুহারা বাঙালীদের দুর্গতির জন্য কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করেছেন। ১৩৭২-এর আশ্বিন সংখ্যায় ও ১৩৭৯-এর আশ্বিন সংখ্যায় কংগ্রেস শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। নেতাজীর ঘোষিত মৃত্যুকে অসত্য প্রমাণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বিপ্লবী দেশনেত্রীর

বৈপ্লবিক অনন্যতা সম্পর্কে দুইবার প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া স্বামীজী ও ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কেও তার লেখা 'জয়শ্রী'তে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৬৯ সালের পৌষ সংখ্যার 'জয়শ্রী'তে স্বামী বিবেকানন্দকে জাতীয়তাবাদের প্রধান পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিয়ে লিখেছেন তাঁর জাতীয়তাবাদ ঃ "বেদান্তের অধ্যাত্মবাদের উপরই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ।"

ইতিহাস-দার্শনিক আচার্য রমেশচন্দ্র পুরাকাল থেকে আরম্ভ করে দেশবিভাগ পর্যন্ত ইতিহাস শুধু পরিক্রমাই করেন নাই, আগামী ভবিষ্যতের দিক্-দর্শন উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। এই দিক্-দর্শনের বৈপ্লবিক প্রকৃতি সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে পরিণতি পাবে। আচার্য রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-দর্শন ভারতের জাতীয় বিপ্লবে নেতাজী-সঞ্চারিত দুর্ধর্ষ গতিবেগের সন্ধান দিয়েছে। ইতিহাসের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখে এই গতিবেগ ক্রমে ক্রমে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। মার্ক্স একদা বলেছিলেন... 'the point is to change it'। অর্থাৎ জাগতিক স্থিতির আমূল পরিবর্তনই আসল কথা। ইতিহাস-দার্শনিক এই আমূল পরিবর্তনের শক্তি কোথায় নিহিত রয়েছে, সে-ইশারা দিয়ে সমস্ত জাতিকে আত্মিক ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। সে জন্য তাঁকে মার্কসবাদের আশ্রয় নিতে হয় নাই।

বর্তমান সংখ্যা 'জয়শ্রী' তাঁর নব্বইতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবেদন করে দেশবিভাগের ফলে অসমাপ্ত জাতীয় বিপ্লবের প্রত্যাসন্ন সমাপ্তির জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়ে 'জয়শ্রী'র পক্ষ থেকে তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছি।

BIOGRAPHICAL NOTES ON R. C. MAJUMDAR

DATE OF BIRTH :

4, December, 1888.

PLACE OF BIRTH :

Village of Khandarpara in the District of Faridpur, now in Bangladesh.

ACADEMIC CAREER :

M. A. in History, First Class ; Premchand Roychand Scholar ; Griffith Prizeman ; Doctor of Philosophy (Calcutta University), Doctor of Literature, Honoris Causa. (Calcutta, Jadavpur, the Rabindra Bharati and Burdwan Universities). Desikottama of Visva-Bharati, Santiniketan (1972), Vidyabaridhi of Nava Nalanda MahaVihara, and Bharatatatva-Bhaskara (Sanskrit College, Calcutta) Lecturer, Calcutta University ; Professor of History, and later Vice-Chancellor, Dacca University ; Principal, College of Indology, Hindu University, Benaras and the University of Nagpur. Visiting Professor of Indian History, Universities of Chicago and Pennsylvania (U. S. A.), Sheriff of Calcutta, 1967-68.

DISTINCTION :

President, All-India History Congress, All India Oriental Conference, and Institute of Historical Studies—Annual Conference 1968. President of the Section of Indology in the XXII International of Orientalists held at Istambul in 1951, and a member of its Executive Committee. A member of the Bureau of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. A Vice-President of the International Commission for publishing a "History of Mankind—Cultural and Scientific Development" sponsored by UNESCO. President Asiatic Society Calcutta and the Ramakrishna Institute of Culture, Calcutta. Honorary Fellow of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland and of the Asiatic Society of Bombay. Honorary Member of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. Awarded Campbell Gold Medal by the Asiatic Society, Bombay, Sir William Jones, B C. Law and Jagattarini Gold Medal by the Asiatic Society Calcutta. Delivered the Maharaja Sayajirao Gaekwad Honorarium Lectures, Adhar Mookerjee Lectures, and Sir William Meyer Lectures at the invitation, respectively, of the Universities of Baroda, Calcutta and Madras. These were published, under the title "Ancient Indian Colonisation in South-East Asia", "Maharaja Rajballabh", and "Kambujadesa". Also delivered the first series of "Birla Endowment Lectures" at the Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay and the "Extension Lectures" at the Visva-Bharati, Bolpur, Published respectively, under the titles "Three

Phases of India's Struggle for Freedom" and "Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century". Appointed Kamala Lecturer by the University of Calcutta and delivered four lectures on the "Culture of Medieval Bengal" which have been published by the University. Delivered three lectures at the Patna University published under the title" "Swami Vivekananda". Delivered Rai Bahadur C. Ghosh and Vidyasagar Lectures in the Calcutta University, respectively, on Indian Religion and Prose Literature in Bengal and Womanhoood in India, Autombapu Lectures at Imphal, Manipur, on "Expansion of Aryan Culture in Eastern India, three lectures at B. J. Research Institute, Ahmedabad and three lectures on Historiography at Heras Institute, Bombay, all of which have been published. Delivered six Rabindranath Tagore Endowment Lectures in the Kerala University on "British Impact on Hindu Culture" (1973). Awarded Rabindra Nath Tagore Birth Centenary plaque by the Asiatic Society, Calcutta.

BIBLIOGRAPHY

Ancient India, Banaras : Motilal Banarsidass, 1952, (rev.ed. of Outline of Acient Indian History and Civilisation, 1927), Fifth Edition, 1968.

Aneient Indian Colonies in the Far East, Vol I : Champa, Lahore : Punjab Sanskrit Book Depot, 1927, Vol II : Suvarnadvipa. Dacca : Asoke Kumar Majumdar. Part I : Political History, 1937, Part II, Cultural History ; 1938.

Ancient Indian Colonisation in South-East Asia (Maharaja Sayajirao Gaekwad Honorarium Lectures, University of Baroda, 1953-54), Baroda : G. H. Bhatt, Director, Oriental Institute, 1955.

Bangladeser Itihasa, Prachin-Yuga (In Bengali ; translation of title is History of Bengal-Ancient Period), Calcutta, General Printers and Publishers, 1st ed. B, S. 1352 (A. D. 1946) ; 2nd. ed. B. S. 1356 (A. D. 1950), 3d. ed. B. S. 1364 (A. D. 1958), 4th ed. B. S. 1373 (A. D. 1966).

Corporate Life in Ancient India (doctoral dissertation), Calcutta, Surendra Nath Sen, 1918, 2d. ed. rev. Calcutta, Calcutta University, 1922 (distributed by the Oriental Book Agency, Poona).

Hindu Colonies in the Far East. Calcutta, General Printers and Publishers, 1944, 2d ed. Firma K. L. Mukhapadhyay, Calcutta (1963).

Inscriptions of Kambuja, Calcutta : Asiatic Society (Publication 290A, Monograph series, Vol, VIII) 1953.

Kambuja-Desa, or an Ancient Hindu Colony in Cambodia (Sir William Meyer Lectures, University of Madras, 1942-43), Madras, University of Madras, 1944.

Maharaja Rajballav : A Critical Study Based on Contemporary Records (Adharchandra Mookerjee Lectures, Calcutta University 1942), Calcutta : Calcutta University, 1944, 1947.

Outline of Ancient Indian History and Civilisation Published by R. C. Majumdar, 1927 (rev. ed. entitled Ancient India).

The Classical Accounts of India, Calcutta, Firma K. L. Mukhapadhyay 1960.

Three Phases of India's Struggle for Freedom, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1961.

Prachin Bharate Vijnacharcha (in Bengali ; translation of title is Scientific Knowledge in Ancient India), Visvavidya Sangraha, Calcutta (1960).

The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, Calcutta, 1st Ed., Srimati S. Chaudhuri, 1957, 2nd ed. Firma K. L. Mukhapadhyay, Calcutta, 1963.

An Advanced History of India (written with H. C. Raychaudhuri and Kalikinkar Datta), London, Macmillan, New York, St. Martin's Press ; 1st ed. 1946, corrected ed. 1948, 2d ed. 1950, corrected ed. 1953, 1956, 1958, 3 parts in 1 Vol. and/or separate vols (Ancient India : Medieval India ; The Delhi Sultanate and the Mughal Empire ; Modern India), 1967.

Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, Srimati S. Chaudhury, 1960, agents : Firma K. L. Mukhapadhyay.

History of the Freedom Movement in India, Vol, I (1962), II (1963), III (1963) Calcutta, Firma K. L. Mukhapadhyay.

Swami Vivekananda—a Historical Review, Calcutta, General Printers and Publishers, 1965.

Kamala Lectures-(Medieval Culture in Bengal) in Bengali, Calcutta University, 1966.

VOLUMES EDITED

(In these volumes, except for the two original sources Raja-vijaya-nataka and Ramacharita, Majumdar has written approximately sixty chapters, several prefaces and forewords, and as editor, small segments in chapters by other authors)

History of Bengal, vol 1 : Hindu Period, Dacca, University of Dacca, 1943.

Great Women of India (The Holy Mother, i.e., the spiritual consort of the nineteenth century Hindu saint Ramakrishna Paramhansa, Birth Centenary Memorial, edited with Swami Madhavananda) Almora (in the Himalayas), Advaita Ashrama (a monastic establishment founded by Swami Vivekananda, renowned disciple of Sri Ramakrishna), 1953.

History and Culture of the Indian People Vol. 1 : The Vedic Age ; London : George Allen & Unwin, 1951 Vol II : The Age of Imperial Unity, 2d. ed. Bombay : Bharatiya Vidya Bhavan, 1953 3rd ed. 1960, Vol. III : Tue Classical Age, Bombay : Bharatiya Vidya Bhavan, 1954, 1962, Vol. IV : The Age of Imperial Kanauj, Bombay : Bharatiya Vidya Bhavan 1955, Vol V : The Struggle for Empire, Bombay : Bharatiya Vidya Bhavan, 1957, Vol. VI : The Delhi Sultanate, Bombay : Bharatiya Vidya Bhavan, 1960. Vols IX and X : The British Paramountcy and Indian Renaissance (1818-1905) (in two parts) Vol XI : Struggle for Freedom 1905-47) Bombay ; Bharatiya Vidya Bhavan, 1968 Vol. VII : The Mughal Empire : Vol. VIII : The Maratha Supremacy

Raja-vijaya-nataka (a sanskrit drama, edited with K. Goswami) Calcutta Indian Research Institute, 1947.

Ramacharita (a history by the medieval poet Sandhyakara Nandi ; edited with R. G. Basak and N. G. Banerji) Rajshahi : Varendra Research Society, 1939 (1st ed of this work was edited by H. P. Sastri and appeared in the Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, V)

Expansion of Indian Culture in Eastern India, Imphal, 1968. Historiography in Modern India, Asia Publishing House, 1970 ; Indian Culture in South-east Asia, Published by B. J. Institute of Learning and Research, Ahmedabad, 1969.

Indian Religion. University of Calcutta, 1969.

Vidyasagar (in Bengali), General Printers and Publishers, Calcutta 1376 (B. S.).

On Rammohan Roy, B. B. Majumdar Lectures, Asiatic Society, 1972.

Ancient India as described by Meghasthenes and Arrian by J. W. Mc Crindle, Revised Second Edition published by Chakeravortty and Chatterjee, Calcutta, 1960.

The Vkataka-Gupta Age (circa 200-550 A. D.) (edited with Anant Sadashiv Altekar) Vol. VI of A New History of the Indian People (only two vols. have appeared and the scheme theoretically has been amalgamated with the 12 vol history to be published under the Indian History Congress), planned by Dr. Rajendra Prasad (ex-President of India) and Sir Jadunath Sarkar (general editor), Lahore : Motilal Banarsidass, 1946 ; reprinted Banaras Motilal Banarsidass, 1954 (for the Bharatiya Itihas Parishad).

Bangladeser Itihasa Madhya-Yuga (in Bengali—History of Bengal-Mediaeval Period) Calcutta, General Printers and Publishers, B. S. 1373 (A. D. 1967).

PAMPHLETS

The Early History of Bengal. Dacca University Bulletin 3, Calcutta Oxford University Press, 1925-27 pages.

Greater India, Sain Dass Foundation Lectures, 1940, Dayanand College Book Depot, Lahore, 1941.

Presidential Address (to the XIV All-India Oriental Conference, 1948, Darbhanga) Darbhanga, Dr Umesh Mishra, Local Secretary, XIV All India Oriental Conference, 1948, 23 pages.

Pressidential Address (to the Indian History Congress, Third Session 1939, Calcutta), Calcutta Calcutta Univeristy Press, 1939, 15 pages. Presidential Address—Dacca District Teachers' Conference, 1929. Presidential Address—Dacca Collegiate School, Centenary, 1935. Presidential Address : Archeological Section : The Tenth All-India Oriental Conference, Tirupati, The Annals of Sri Venkateswara Oriental Institute, I (1940) pp. 25-36. 'Presidental Address, History Section,' Proceedings of the All-India Oriental Conference, IX, 679-86 ; published from Trivandrum (Kerala) IV, 33. Scientific Spirit in Ancient India (Bose Institute, Calcutta). Presidential Address at the Annual Meeting of the Asiatic Society, Calcutta 1966, V. 40, 1967, V 36. And other articles in various Journals.

'জয়শ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ

১।	জয়তু নেতাজী	: পৌষ	(নেতাজী সংখ্যা) ১৩৫৫
২।	ঋষি অরবিন্দ	: আশ্বিন	(শারদীয় সংখ্যা) ১৩৫৬
৩।	বাস্তুহারা বাঙালী	: কার্তিক	(শারদীয় সংখ্যা) ১৩৫৭
৪।	নেতাজী সুভাষচন্দ্র	: পৌষ	(নেতাজী সংখ্যা) ১৩৬২
৫।	নেতাজী সুভাষচন্দ্র	; পৌষ-মাঘ	(নেতাজী সংখ্যা) ১৩৬৩
৬।	তিব্বত	: বৈশাখ	(রবীন্দ্র সংখ্যা) ১৩৬৬
৭।	স্বামী বিবেকানন্দ	: পৌষ	(স্বামীজী ও নেতাজী সংখ্যা) ১৩৬৯
৮।	নেতাজী ও মহাত্মাজী	: পৌষ	(নেতাজী সংখ্যা) ১৩৭০
৯।	সতের বছরের কংগ্রেসী শাসন	: আশ্বিন	(শারদীয় সংখ্যা) ১৩৭১
১০।	নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঃ ঘোষিত মৃত্যুর সত্যাসত্য বিচার	: পৌষ	(নেতাজী সংখ্যা) ১৩৭২
১১।	শ্রীযুক্তা লীলা রায়	: ভাদ্র	(লীলা রায় ৬৯তম জন্মবার্ষিকী সংখ্যা) ১৩৭৫
১২।	লীলা রায়	: আষাঢ়	(লীলা রায় স্মৃতি সংখ্যা) ১৩৭৭
১৩।	স্বাধীনতার পঁচিশ বছর	: আশ্বিন	(শারদীয় সংখ্যা) ১৩৭৯
১৪।	নেতাজী ও জার্মানী	: পৌষ	(নেতাজী সংখ্যা) ১৩৮০
১৫।	খোসলা কমিশনের রিপোর্ট	: পৌষ	(নেতাজী সংখ্যা) ১৩৮১
১৬।	ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অভিমত	: আষাঢ়	১৩৮৩

ABOUT THE WRITERS

Those who are Ex-students of Dacca University have been marked as (Ex) against their names.

1. Sri Kali Prasanna Piplai : Co-student of Acharya Ramesh Chandra. A Retd. Dist. & Session Judge
2. Prof. Amiya Kumar Das Gupta : An Economist of International Reputation (Ex)
3. Shri Haresh Chandra Bhattacharyya : Former Registrar Burdwan University (Ex)
4. Dr. Anil Ch. Bandopadhya : Ex-Professor of History Jadavpur & Calcutta Universities.

4. A. Prof. Amulya Bhusan Sen : Professor of History, Burdwan University (Ex)

5. Prof. B. C. Mukherjee : Former Professor of History Presidency College & Ex-President, Board of Secondary Education (Ex)
6. Shri Nani Coomar Chakravorty : Advocate, Calcutta High Court (Ex)
7. Dr. Amalendu Bose : Former Professor of English Calcutta & other Universities (Ex)
8. Dr. Dinesh Chandra Sarkar : Former Carmichael Prof, Calcutta University ; Visiting Professor, Allahabad University
9. Swami Lokeswarananda : Secretary, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Calcutta.

10. Dr. Sukumar Roy : Former Prof. Dept. of Islamic History & Culture, Calcutta University. (Ex)
11. Dr. Himangshu Bhusan Sarkar : Prof. Siva-Bharati Mahavidyalaya Midnapore (Ex)
12. Prof. Sukhamoy Mukhopadhaya : Prof. Dept. of History, Visva-Bharati, Santiniketan.
13 Dr. Ashutosh Bhattacharyya : Former Tagore Prof. of Bengali, Calcutta University (Ex)
14. Sri Suresh Ch. Bandopadhyaya : Ex-Secretary, Board of Sanskritic Studies, Bengal (Ex)
15 Dr. Jogindra Nath Choudhuri : Ex-Prof. B. Keshab. Ch. College (Ex)
16 Shri Manmatha Roy : Well-known Dramatist (Ex)
17. Dr. Kalikinkar Dutta : Ex-Vice-Chancellor, Patna & Magadha Universities.
18. Amiya Kumar Bandopadhya : Indian Administrative Service.
19 Dr. Nimai Sadhan Bose : Prof. of History, Jadavpur University.
20. Dr Jagadish Narayan Sarkar : Ex-Prof. Jadavpur University, Visiting Prof. of History, Darbhanga University.
21. Prof. Samar Guha : Member, Lok Sabha (Ex)
22. Dr. Madhab Ch. Nath : Founder Prof. & Hd. of the Dept. of Bio-Chemistry, Nagpur University (Ex)
23. Dr. S B Chaudhuri : Ex-Vice-Chancellor & Hd. of the Dept. of History, Burdwan University. (Ex)
24. Dr. V. V. Mirashi : Prof. Nagpur University.
25. Dr. P. N. Chopra : Editor, Indian Gazetteers, New Delhi.
26. Dr. Bisweswar Prasad : Professor, Allahabad University.
27. Dr. Amitava Mukhopadhaya : Prof. of History Jadavpur University.
28. Shri Kalicharan Ghose : Author 'Roll of Honour', 'Famines in Bengal', 'Jagaran O Bisphoran'.
29. Sri Sunil Das : Editor, „JAYASREE" (Ex)

২০৯ বি, বিধান সরণিস্থ কলিকাতা-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, এড্‌ভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিয়ালদহ হয়ে শিলাইদহ

শিয়ালদহ ষ্টেশন ১৮৬৯

শান্তিনিকেতনের বহুর খোয়াই থেকে শিলাইদহের প্রমত্তা পদ্মা অনেক দূর। 'উর্মিল লাল কাঁকরের নিঃস্তব্ধ তোলপাড়' থেকে 'শ্রান্ত রূপসীর মতো প্রসারিত তনু পদ্মার উচ্চ-তটতল'—কবি মনের এই ক্রমঃ পরিবর্তনের বিচিত্র পথ শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত প্রসারিত। বারংবার কবির এই পথ-পরিক্রমার সহস্র স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন শিয়ালদহ।

পূর্ব রেলওয়ে

medium

মজুমদার ব্রাদার্সের

চা

রঙে, গন্ধে, স্বাদে

অতুলনীয়

৯, ক্লাইভ রো

কলিকাতা-৭০০০০১

WITH COMPLIMENTS

FROM :

Indian Tea & Provisions Ltd.

6, MISSION ROW

CALCUTTA-700001

THE G. S. EMPORIUM (AGENCY) LTD.

(THE GREAT SWADESHI EMPORIUM)

EXPORTERS & IMPORTERS

Agents & Distributors for :

Barbier, Benard & Turenne, Paris, France
(B. B. T. Paris)
for all kinds of Navigational Equipments
and Lighthouses, etc.

Indian Minerals & Chemical Industries
Exporters of Indian Minerals
Branch : Katni (Madhya Prodesh)

Marine & Aviation Services of India
Engineers & Consultants

Reinforced Plastics, Calcutta
Manufacturers of Navigational Lights & Bouys, etc
95 Sarat Bose Road, Calcutta-700 020

High Duty & Engineering Industries
Manufacturers of Machine Spares & Parts

Registered Office :
16 India Exchange Place, Calcutta-700 001
(Indian)

Cable :
Energetic, Cal.
Suchakra, Cal.
Suchakra, Katni
Suchakra,
New Delhi

An Indian House
of
43 years' Service

Phone :
22-6367
41-1388

Telex : CA—2189/Emporium

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

M/s. A. Banerjee & Co.

CALCUTTA-700001

পশ্চিম বঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্পপর্ষদ

২নং রিপন ষ্ট্রীট. কলিকাতা-২৬

পর্ষদের উদ্দেশ্য

বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি এবং ব্যক্তিগতভাবে নিম্নলিখিত শিল্পগুলিতে আর্থিক ও কারিগারী সাহায্য দেওয়া হয়।

সুতীখাদি, ধান্যকুটাই, ঘানি, তৈল, অভক্ষ্য তৈল ও সাবান, ইক্ষু ও তাল; মৃৎশিল্প, দড়িশিল্প, চর্মশিল্প, হস্তজাত কাগজ, মৌমাছি পালন, কাষ্ঠ ও লৌহ শিল্প, ফলজাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, বাঁশ ও বেতশিল্প ইত্যাদি।

শিল্পগুলি সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত "খাদি ও গ্রামীণ শিল্প নির্দেশিকা" পাঠ করুন।

JAYASREE

ADVERTISEMENT RATES

RATES EFFECTIVE FROM 1st JANUARY 1978

FULL PAGE	Rs. 350.00
HALF PAGE	Rs. 200.00
QTR PAGE	Rs. 100.00
SECOND COVER	Rs. 450.00
THIRD COVER	Rs. 550.00
FOURTH COVER	Rs. 650.00
SPECIAL POSITION EXTRA	25%
COLOURED ADVT	100% Extra

JAYASREE enjoys an Annual Rate Contract with the Directorate of Advertising and Visual Publicity under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India for a number of years.

JAYASREE Is a Member of the 'INDIAN LANGUAGES NEWSPAPERS ASSOCIATION' BOMBAY.

MECHANICAL DATA : SIZE OF THE JOURNAL 24.13 Cm × 18.41 Cm
ADVERTISING SPACE 20.5 Cm × 15.24 Cm

INDIA TEA
the best gift anywhere...anytime

India tea is a gift of an unforgettable experience– rich, stimulating and exquisite. It's no wonder, that Indian Tea is a way of life for millions of people in over 80 countries around the world and one man's "Cha" is another man's "Cuppa".

Apart from producing some of the finest teas, India to-day leads the world both in production and export of tea. In 1975 India produced approximately 490 m.kgs of tea (one-third of the world production) and earned over Rs. 220 crores in valuable foreign exchange.

There is indeed a fortune in every cup of tea.

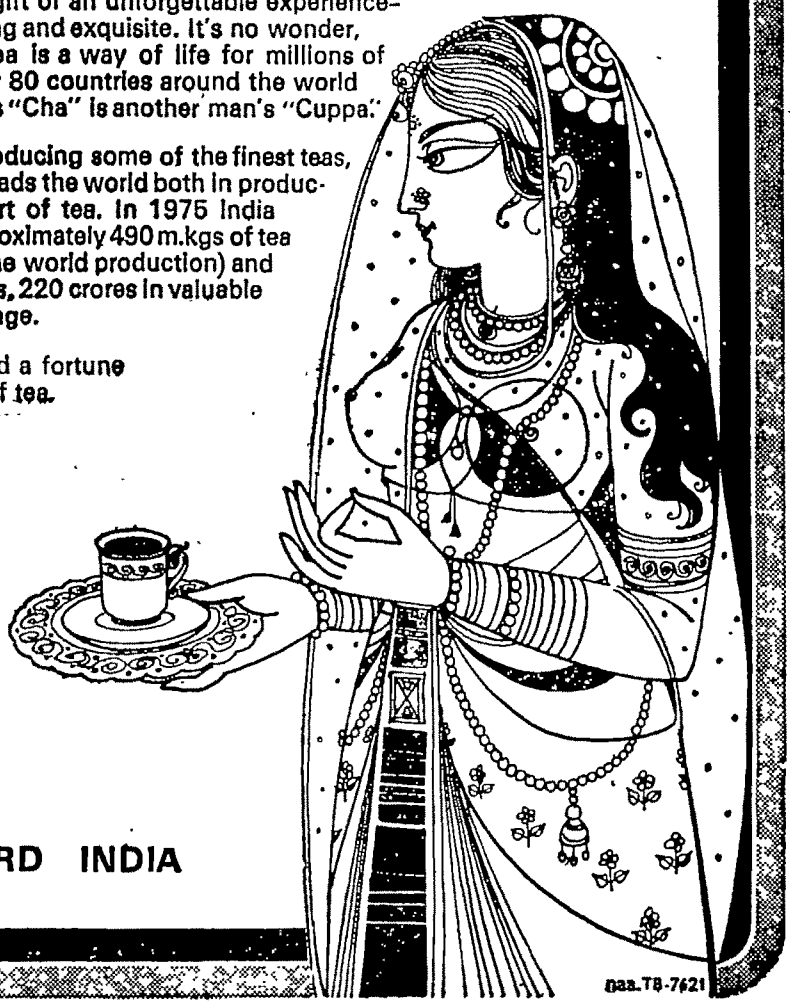

INDIA TEA

TEA BOARD INDIA

naa.TB-7621

WHY PEOPLE PREFER "ADITYA" YARNS & CLOTH ?

IT MAINTAINS :

* **HIGH QUALITY**
* **COMPETITIVE RATES**
* **REGULAR SUPPLIES**
* **CONSUMER PREFERENCE**

WEAVING & HOSIERY INDUSTRIES DEPEND ON ADITYA YARNS ADITYA'S SYNTHETIC AND POLYSTER SUITINGS & SHIRTINGS SATISFY EVERYONE'S TASTE.

Enquiries to :

ADITYA MILLS LIMITED

MADANGANJ–KISHANGARH
RAJASTHAN

Calcutta Office :
4, INDIA EXCHANGE PLACE
CALCUTTA 700 001

Bombay Office :
STADIUM HOUSE, BLOCK NO. II
VEER NARIMAN ROAD,
BOMBAY-20

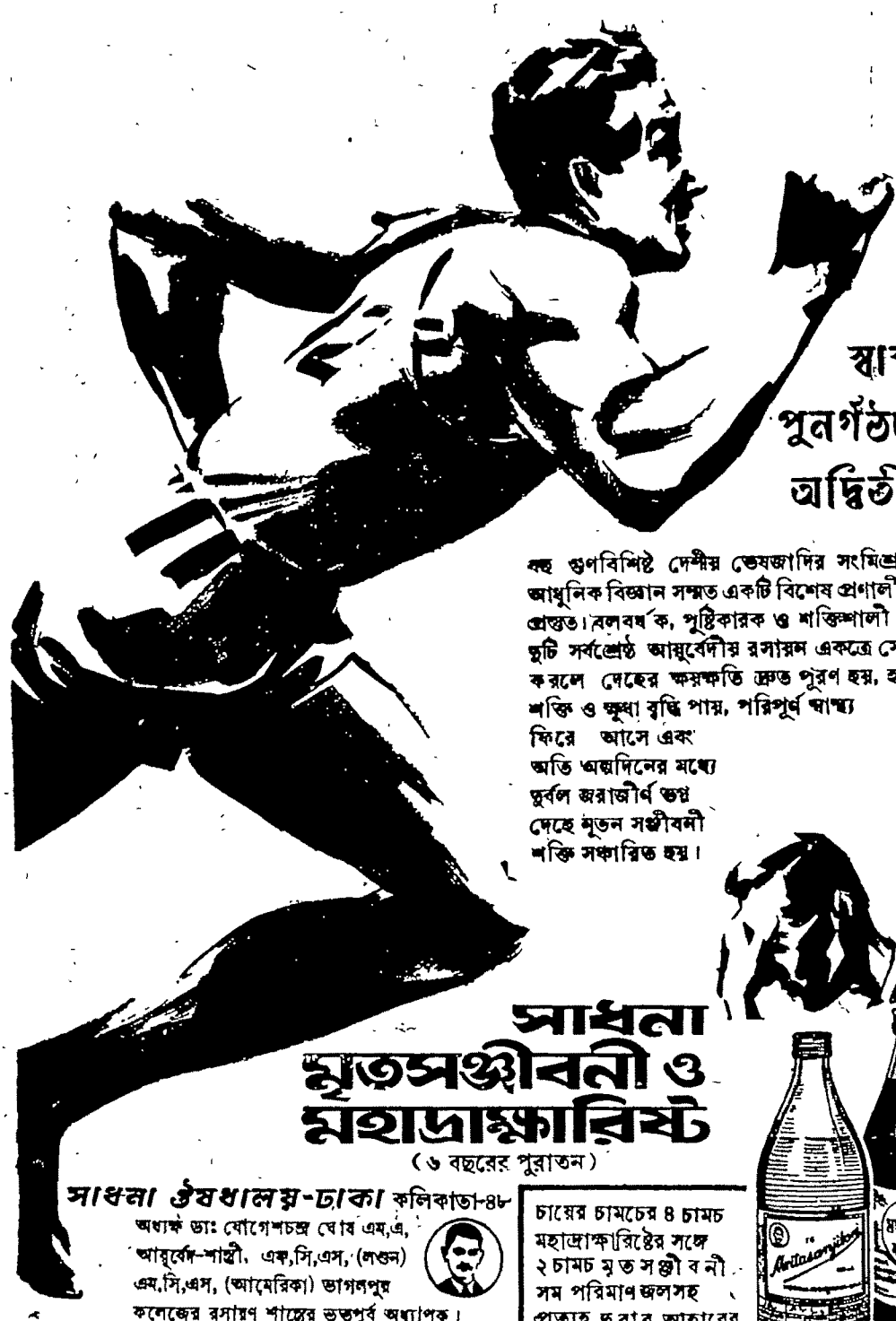

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/69

With Best Compliments of :-

B. R. SARKAR

Engineer & Contractor

"B A S A N T A"

G.T. ROAD (EAST)

ASANSOL

Phone : 3346

The best means of growth come from within

I.T.C. Limited

সূর্যনারায়ণের ভাগ্য দারুণ.....
তবে বাবার বিবেচনাও কম নয়.....

ছুয়াত্তর সালের গ্রীষ্মকাল। সূর্যনারায়ণের সাত বছর পূর্ণ হল, পড়ছিল প্রাইমারী ক্লাসে। বাবা দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের চীফ বুকিং ক্লার্ক, বাস গঞ্জামের বরহমপুরে। বাবা শ্রী পি. সি. মিশ্র ছেলের নামে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কে পাঁচ টাকা দিয়ে একটি জমার খাতা খুলে দিলেন।

নিজের নামে জমার খাতা পেয়ে ছেলের জমাবার নেশা হয়ে গেল। পালাপার্বন বা কোনও উপলক্ষ্যে কেউ কিছু দিতে চাইলে সূর্যনারায়ণ আগেই বলে বসে 'জিনিষ চাই না, পয়সা দাও, জমাব।' সকলে তাই দেনও। সাতাত্তরের জানুয়ারী নাগাদ খাতায় জমার পরিমাণ দাঁড়াল দুশ' একাত্তর টাকা। ঐ বছরের জুলাইএ লখনৌএ সপ্তম 'ড্র'-এর খেলা হল। আর... ..... কী আশ্চর্য! প্রথম পুরস্কার উঠল সূর্যনারায়ণের খাতার নম্বরে।

আনন্দের খবরে ছেলে তো বটেই বাবাও মহা গর্ব বোধ করতে লাগলেন। খাতাটা খুলে দিয়েছিলেন তো তিনিই, নিজের বিবেচনায় তাঁর যথেষ্ট আস্থা। এখন তো বাড়ীর সকলের নামেই খাতা খুলেছেন মোট আটটি খাতা।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

davp 77/630

Works of **Dr. Ramesh Chandra Majumdar :**

1. (A) **HISTORY OF BENGAL SERIES**

VOL I **History of Ancient Bengal** Rs. 52·00
VOL II **History of Mediaeval Bengal** Rs. 35·00
VOL III Part I. **History of Modern Bengal** (in Press)

(B) **RENASCENT INDIA** First Phase Rs. 35·00
(Nineteenth Century)

(B) **HINDU CULTURE & RELATION IN THE FAR EAST SERIES**

VOL I. **Kambuja Desa** (Cambodia)
(in Preparation)

এবছরের জ্ঞানপীঠ বিজয়িনী
আশাপূর্ণাদেবীর
আশাপূর্ণাদেবীর রচনা সম্ভার (গ্রন্থাবলী)
(খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইতেছে)
প্রথম ২০·০০ দ্বিতীয় ২০·০০ তৃতীয় ২২·০০ চতুর্থ ২৫ ০০

জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং
২২/এ, কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

WITH COMPLIMENTS
FROM

A WELL-WISHER

নিরাপদ ভ্রমণের জন্য

অপরাধ নিবারণের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদক্ষেপ হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় গ্রামামান পুলিশ ফাঁড়ির প্রবর্তন করা হয়েছে :—

(১)	৮৭ আপ। ৮৮ ডাউন	টাটানগর-পাটনা এক্সপ্রেস (টাটানগর এবং চাক্তিলের মধ্যে)।
(২)	২ আপ। ১ ডাউন	হাওড়া-বোম্বাই মেল (রাউরকেলা এবং ঝারসুগুডার মধ্যে)।
(৩)	৩০ আপ। ২৯ ডাউন	হাওড়া-বোম্বাই এক্সপ্রেস (রাউরকেলা এবং ঝারসুগুডার মধ্যে)।
(৪)	৮৯ আপ। ৯০ ডাউন	বোকারো সিটল সিটি-মাদ্রাজ এক্সপ্রেস (রাউরকেলা এবং বোলাংগিরের মধ্যে)

বিহার এবং ওড়িশার মধ্যে চলাচলকারী আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে এই সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

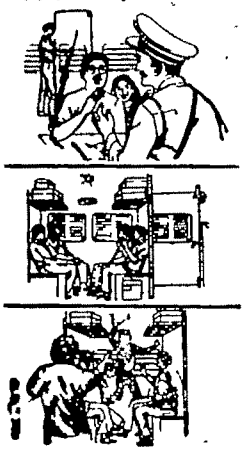

চলন্ত গাড়ীতেই ভারপ্রাপ্ত অফিসার অভিযোগ গ্রহণ করবেন। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করলে এই সব ট্রেণে কর্তব্যরত পুলিশ অথবা রেলরক্ষীবাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আপনার মালপত্রের নিরাপত্তার জন্য রাত্রিবেলায় কামরার দরজা-জানালা ছিটকিনি লাগিয়ে সুরক্ষিত রাখুন।

ট্রেনে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি আপনার নজরে এলে পুলিশকে খবর দিন।

চলন্ত গাড়ীতে অপরাধ অনুসন্ধান এবং অপরাধীকে ধরা—এই উভয় কাজেই পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

সেবায় উৎসর্গীকৃত

দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে

One nation: One people

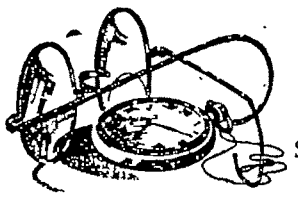

"There is so much in common between people in the same State, under the same flag and owing undivided allegiance to it... that those who believe in India as a nation can have no minority or majority question. All are entitled to equal privileges, equal treatment... The state of our conception must be a secular, democratic state, having perfect harmony between different units."—*Mahatma Gandhi*

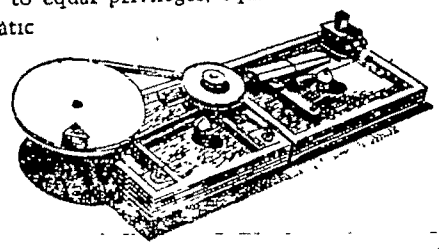

IOL INDIAN OXYGEN LIMITED

WITH BEST COMPLIMENTS

FROM

CENTURY RAYON

(Props : THE CENTURY SPG. & MFG. CO. LTD.)

INDUSTRY HOUSE

159, CHURCHGATE RECLAMATION

BOMBAY-400020

Eveready offers the lowest priced* leakproof battery in India!

New!

SILVER

EVEREADY®

Built with four layers of polyethylene and an anti-corrosive polyester jacket to give leakproof protection as never before.

Maximum Price : Rs. 1.80 plus taxes.

The Silver Eveready Double Action Battery– for your transistors and torches. You can't buy better!

UC 8766A

*As compared to Suggested Consumer Prices of other manufacturers.

সাবধান

জীবন বিপন্ন করবেন না

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন কোন সময় বিজলি তার ঝুলে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ভুলেও ঐ তারের ধারে কাছে যাবেন না। কোন রকমে ছোঁয়া লাগলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে প্রাণহানি ঘটাও বিচিত্র নয়। কিংবা প্রাণে বাঁচলেও সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে পারেন।

নজর রাখবেন যাতে কেউ এ ধরনের তারের কাছাকাছি না যায়—গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারদেরও দূরে রাখবেন। এ ধরনের মাটিতে নুয়ে পড়া তার দেখে বোঝা যায় না তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে কি নেই।

বিদ্যুৎ কর্ম্মীরা সব সময়ই এ ধরনের দুর্বিপাকের জন্যে তৈরি এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেয়, তবুও যদি কখনও এ ধরনের পড়ে থাকা তার চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পর্ষদের নিকটবর্ত্তী অফিসে খবর দিন।

বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-পড়শীদেরও সাবধান করে দেবেন যাতে তাঁরা কেউ এ ধরনের তারের কাছাকাছি না যান—বিশেষ করে শিশুদের সামলে রাখুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

With Compliments From

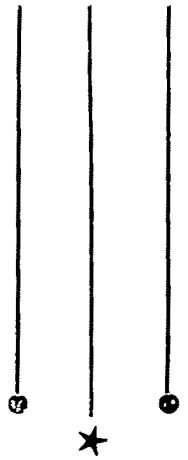

SREE SARASWATY PRESS LTD.

CALCUTTA-700009

নিজেকে রঙীন ও প্রাণবন্ত করে তুলতে—

এন, টি, সি-র

কাপড়

পরুন।

শুধু সস্তা বা টেকসই বলেই নয়, বাহারেও এন, টি, সি-র কাপড়ের জুড়ি নেই।

আমাদের শো-রুম ও নিজস্ব দোকানগুলোতে স্যুটিং, সার্টিং, ধুতি, শাড়ী, মার্কিন, পপ্‌লিন সবই পাবেন। আরও পাবেন মন মাতানো ও ঝলমলে সব পর্দার কাপড় ও বিছানার চাদর।

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন

(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা) লিঃ

৭, জওহরলাল নেহরু রোড,

কলিকাতা—৭০০ ০১৩।

TRUSTED SERVICE IS OUR BUSINESS.

EVEREST

ASBESTOS CEMENT PRODUCTS

Asbestos Cement Corrugated and Semi Corrugated
Roofing Sheets and Accessories. Plain Sheets.
Rain Water Pipes and Fittings. Septic Tanks etc.

Stockists :

Calcutta Engineering Stores Co.

9 Clive Row, Calcutta-700 001.
Gram : PISTON CAL, Phone-: 22-5362, 22-0217.

শহর উন্নয়নের নতুন ভাবনা

পর্যবেক্ষক

শহর ও গ্রামের চিরন্তন বিবাদের মধ্যে যাচ্ছি না।

নতুন সরকার, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উন্নয়নের সমস্যাটাকে খতিয়ে দেখছেন। এই উন্নয়নের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতা ও সি, এম, ডি, এ নামক সংস্থাও পড়ছে।

শহর উন্নয়নের কাজে যদি দরিদ্র জনগণের উন্নতি হয় তাতে নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কিংবা কোন সরকারের আপত্তি থাকবে না। বর্ত্তমান সরকারও তাই শহর উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াতে চাইছেন শহরবাসী দরিদ্র জনগণের কল্যাণ।

একটা সময় ছিল যখন কলকাতার উন্নয়নে বস্তী উন্নয়নও একটা অন্যতম প্রকল্প ছিল মাত্র। তখন বস্তী উন্নয়ন বলতে বোঝাতো বস্তীগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা, নালা-নর্দমা, বিজলীবাতি, পাকা রাস্তা পাকা পায়খানা এই সব করে দেওয়াকে।

কিন্তু তাহলেই কি বস্তীর উন্নতি হল, না হয়? কোন একটা কিছু করার অর্থ সেটাকে দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণও বটে। আর এই কাজে স্থানীয় অধিবাসীদের জড়িত করাও আজ সি, এম, ডি, এ-র কাজ। এ নির্দেশ নতুন সরকারের। উন্নতিমূলক কাজের দৃষ্টিকোণটা গেছে আপাদমস্তক বদলে। ওপরতলা থেকে বস্তীর জন্য, অঞ্চলের জন্য চিন্তাভাবনা নয়। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে তাঁদের অসুবিধে, অভিযোগ জেনে নিয়ে, স্থানীয় মানুষের সহায়তায় তার প্রতিকার। এই যে কাজের নতুন ধারা এটা অনেক বেশী কার্যকরী হতে বাধ্য। "কনট্রাক্টর কাজ ফেলে রেখেছেন? কেন রেখেছেন, অসুবিধেটা কোথায়? রাস্তাটা কেন পীচঢালা হচ্ছে না" এগুলো জানবার অধিকার যেমন স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাবর রয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে রয়েছে কাজগুলো সম্পাদনে সহযোগিতা দেবার ভারও।

এই অধিকার আর দায়িত্ব দুয়ের সমবন্টন নিয়েই নতুন দিনের কলকাতার সার্বিক উন্নয়ন হবে। দূর থেকে, ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে কি নীচের তল পাওয়া যায়?

৬

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেছে। মৌতাতী বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌ছেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা শহর বড়ই গুল্‌জার— গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়। বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বাঙ্গোয়রি পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন।

৭

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় ঘোড়ার খুরে রাস্তা কাঁপানো যে-কলকাতার ছবি, সে-কলকাতা আজ আর নেই। তবুও কালীপ্রসন্ন-র কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতার মিল রয়েছে এক জায়গায়। আজও 'বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা নয়।' তার কারণ ক্রমবর্ধমান

কালীপ্রসন্নর কলকাতা

জনসংখ্যার তুলনায় আজকের কলকাতার পথঘাট সংখ্যায় স্বল্প, পরিধিতে সংকীর্ণ, যানবাহন সীমিত এবং শ্লথ। বর্তমানের এই দুরূহ সমস্যার একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল। জনসাধারণের সহযোগিতার সঙ্গে আমাদের নিপুণ কর্মীদের অক্লান্ত প্রয়াস যুক্ত করে, ভূগর্ভ রেলই কলকাতাকে উপহার দিতে পারে অগ্রগতির এক অভাবনীয় ইতিহাস।

MD

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়
ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

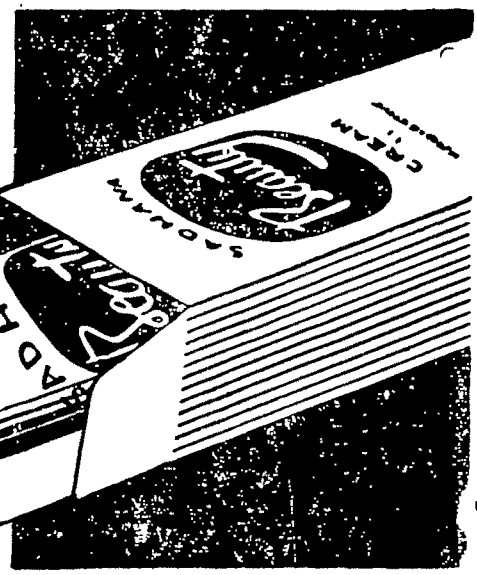

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC 8/71

শিক্ষাজগৎ ও সরকার

পশ্চিমবাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার অরাজকতা দূর করে পড়াশোনা ভালোভাবে চালানোর পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা।

- পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজকেও পঙ্গু করবে—তাই, ছাত্রসমাজের কাছে সরকারের আবেদন, তাঁরা যেন নিজেরাই এই অন্যায় ও অসততার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।
- সর্বপ্রকার সমাজবিরোধী প্রবণতা থেকে ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে দূরে রাখুন, স্কুলে-কলেজে শৃংখলা বজায় রেখে চলুন।
- দেশের সুস্থ ও সুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন,— পচাগলা সংস্কৃতির পংকিল আবর্তে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেবেন না।

নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ,—সেজন্য সরকার জনগণের সহযোগিতায় একটি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে।

শিক্ষাজগৎকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষার সম্প্রসারণে
জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য

প.ব. (তথ্য ও জনসংযোগ)- ৩৫৫৮৭৮

WITH COMPLIMENTS

FROM

THE DELHI CLOTH & GENERAL MILLS CO. LTD.

BARA HINDU RAO

DELHI-110006

জয়শ্রী

গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক : ১২·০০

ষান্মাসিক : ৬·০০

বছরে বিশেষ সংখ্যা : বার্ষিক, শারদীয়া ও নেতাজী। এজন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছুই দিতে হয় না। যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

কর্মাধ্যক্ষ, জয়শ্রী

তিন সঙ্গী

এইচ এম ভি'র তিনটি নতুন এল পি রেকর্ড

রামকৃষ্ণায়ণ (স্টিরিও)
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও কথামৃত অবলম্বনে সঙ্গীত-রূপক
রচনা : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়
কণ্ঠসঙ্গীতে : মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।
সংলাপে : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী ও আরো অনেকে।

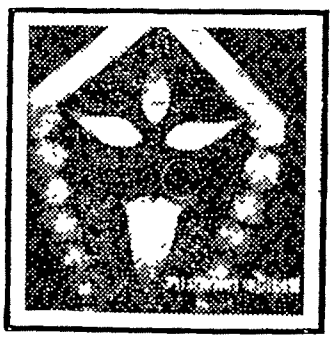

পান্নালাল ভট্টাচার্য
প্রয়াত ভক্তশিল্পীর অবিস্মরণীয় কণ্ঠে গীত বারোটি মর্মস্পর্শী শ্যামাসঙ্গীতের অনবদ্য সংকলন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় (স্টিরিও)
(পালাকীর্তন—ননীচুরি, পূর্বলোট)
সংকলন/সঙ্গীত পরিচালনা :
অধ্যাপক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবোদ্দীপক কণ্ঠে এই লীলাপ্রসঙ্গ দুটির আবেগপূর্ণ পরিবেশনা আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে আকৃষ্ট করবে অনায়াসে। এই লং প্লে রেকর্ডটি একটি রক্ষণীয় সম্পদ হিসাবে সকলের নিকট সমাদৃত হবে।

আপনার নিকটতম এইচ এম ভি ডিলারের কাছে খোঁজ নিন

GC 9537

HMV হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

PHILIPS

Philips introduces sound you can touch

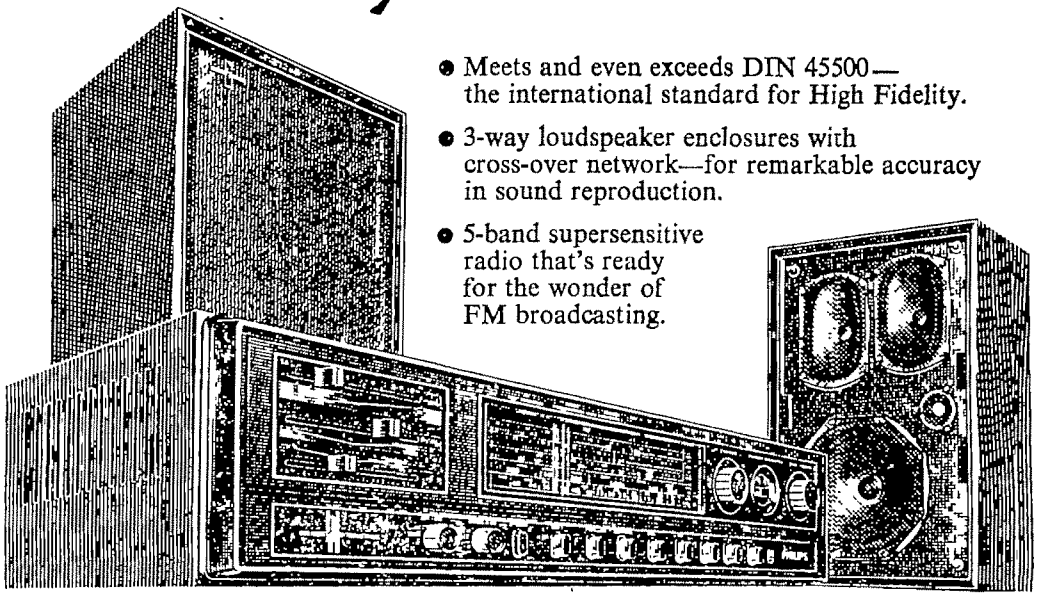

- Meets and even exceeds DIN 45500— the international standard for High Fidelity.
- 3-way loudspeaker enclosures with cross-over network—for remarkable accuracy in sound reproduction.
- 5-band supersensitive radio that's ready for the wonder of FM broadcasting.

OBM/1043

PHILIPS hi fi

Stereo Tuner Amplifier AH 778

জয়শ্রী

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

এই সংখ্যায় থাকবে

পণ্ডিত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় : স্মৃতিচিত্র : বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় : কালীপদ রায় ; ভগবদ্‌গীতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ।

এ-ছাড়া— ধারাবাহিক রচনা :

যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল

ইবনে সৌদ : নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিংশশতাব্দীতে মার্কসবাদ : সুনীল দাস

দাম—এক টাকা

RAD-L

REGULATED POWER SUPPLIES OF COMPREHENSIVE RANGE WITH LATEST DESIGN TECHNIQUE.

WE ALSO UNDERTAKE MANUFACTURE OF POWER SUPPLIES AS PER SPECIAL AND SPECIFIC REQUIREMENTS OF CUSTOMERS.

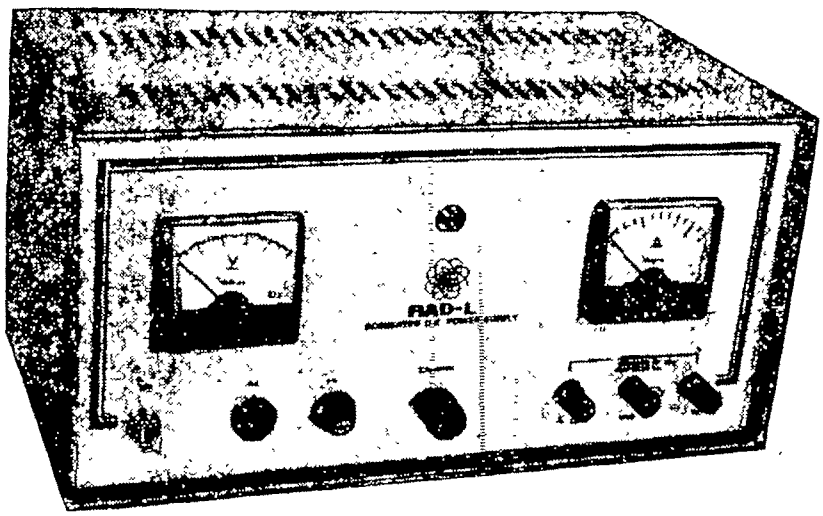

RADIANT ELECTRONICS

MANUFACTURER OF ELECTRONIC EQUIPMENTS AND GENERAL ORDER SUPPLIERS

6A, S. N. BANERJEE ROAD, CALCUTTA-700 013,
PHONE: 24-2323/4, 24-0018

RE - 101/77

So you gave India 28 years of indigenous engineering consultancy?

Yes, we at DCPL

Well, how did DCPL start?

1950—that was the year There they were a group of enterprising young Indian engineers, full of pluck and raring to put talents and training to use for meaningful industrial development in free India Opportunity arrived when the Kuljian Corporation of Philadelphia, USA, offered them its international goodwill to set up in Calcutta. Kuljian's Indian counterpart And with this as their asset, our founder engineers formed India's first engineering consultancy organisation

Fine...but what exactly did you do?

Our maiden assignment was the design and engineering of India's first major thermal power plant at Bokaro for the DVC followed up by a chain of power stations all over the country For the first time engineering designs, no less in standard than that of advanced countries, were being worked out in India—and by us, Indians

By 1960 our ownership was mostly Indianised Meanwhile, with our proven prowess in power engineering, we had moved from strength to strength, developing a growing range of multidisciplinary skills and industry-oriented capabilities Nuclear Power, Cement, Steel, Aluminium, Mining, Bulk Material Handling, Pulp & Paper and Utilities for a variety of industries we took all in our stride

Yes, we had emerged as thoroughbred professionals—the pace-setters among engineering consultants in India

By 1970 our ownership was also fully Indian and we had a new identity: Development Consultants Private Limited.

And then?

Over the years our performance in the country won us international business and global recognition Thus to cater to our growing world-wide clientele we set up in 1974 an international subsidiary in Hong Kong under the name Development Consultants International Limited, DCIL in short By 1976 our American subsidiary AMDC Inc had also been registered in New York Today while DCPL continue to meet national commitments, the DC group with its two overseas subsidiaries caters exclusively to international clients through its offices in Manila, Damascus, Cairo, Baghdad, Tanzania, Nairobi, Puerto Ordaz and London

Mr A K Basu
Chief of Construction Management

Where lies your strength?

In the quality of our engineering experience in India for giant projects such as the nuclear power plants at Tarapur, Madras, Narora; thermal power stations at Dhuvaran, Ennore, Hardugganj and Korba, newsprint project at Kerala, Fertilizer plant at Phulpur, steelmill for Mahindra Ugine, aluminium project at Korba and a cement project at Kashmir All fortified by our rich store of project-proven expertise and goodwill, a third generation computer system and our task force of over 750 top-notch engineers and back-up service staff That's DCPL for you

What does the future hold?

The promise of greater capabilities and a sharpening of skills as we keep acquiring new technologies the world over and adapt them to suit the typical conditions that prevail in India and wherever we are at work

engineering development with total involvement

DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 24-B Park Street, Calcutta-700 016

BBD ASSOCIATES DC

আমাদের বই আমাদের গর্ব

আমরা প্রতি আড়াই দিনে একটি বই প্রকাশ করি। আমরা বলি, আমাদের গর্ব করার মতো বই, আপনার কালেকশনের মান কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবার মতো বই, ভারতের সেরা সেরা লেখকদের বই, আপনার প্রয়োজনের বই, বুদ্ধি চিন্তা জ্ঞান আর গবেষণার বই, কীটসের ভাষায় : নরম ঘাসে ডুবে, শুয়ে পড়ার মত বই আমরা প্রকাশ করি।

আমরা জানি, পাঠকদের চাহিদা কত বিচিত্রমুখী। আপনি হয়ত জানতে চান কেরলের কোন অজ্ঞাত আদিবাসীর কথা, হয়ত জানা প্রয়োজন কোন মসলায় ভালো রান্না হয় অথবা গাভাসকার কী করে ব্যাট করেন। কুলু মানালি ছেড়ে দিলেও বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের উৎপত্তির কথা জানতে চাইতে পারেন। কোন সাপের ছোবলে বিষ নেই, অথবা আজকের দু'টুকরো বেগুনে কতটা ক্যালোরি আছে কিংবা দেয়ালের পাখিটা কেন ভীতু, আপনার জানতে ইচ্ছে করতে পারে। তাছাড়া উৎকলমণি গোপবন্ধু, বাংলার দামাল ছেলে নজরুল কিংবা অলিম্পিক, আর্যভট্ট মহাকাশ, সেতার-সরোদ অথবা কর্ণাটকের বিয়ের আসরের গান যা কিছুই আপনার পাঠ্য বিষয় হ'তে পারে।

বিশিষ্ট বই

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
কে কে মাথুর ৭ টাকা

ভারতের উপজাতি জীবন
নির্মলকুমার বসু ৭ টাকা

ভারতীয় থিয়েটার
আদ্য রঙ্গাচার্য ১৪ টাকা

আপনি ও আপনার খাদ্য
কে টি অচ্চয়া ৬.৫০

পুরনো লখনউ
আবদুল গুলাম 'শরর' ১৩.৫০

প্রেমচন্দ্রের গল্পগুচ্ছ
অনুঃ প্রসুন মিত্র ৮ টাকা

একুশটি বাংলা গল্প
সম্পাদক :
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪ টাকা

মলয়ালম গল্পগুচ্ছ
অনুঃ দিব্যেন্দু পালিত ১০ টাকা

হিন্দি গল্পগুচ্ছ
অনুঃ ইন্দ্রাণী সরকার ৭ টাকা

তামিল কাহিনী
অনুঃ অজিতকুমার দত্ত ৬ টাকা

তেলগু গল্প সংগ্রহ
অনুঃ ইন্দ্রাণী সরকার ১৫.২৫

মির্জা গালিব
মালিক রাম ৫.২৫

পূর্বকাল ও পূর্বধারনা
রমিলা থাপার ৪.৭৫

আমাদের প্রকাশনা তারও বেশি বিস্তৃত বিষয় নিয়ে। ছোটরাও বাদ নেই। ওদের পড়া পড়া খেলার সুন্দর বইগুলো তো আমাদের শত গর্বের উজ্জ্বল মণি।

আমাদের বৃহৎ ক্যাটালগ আমাদের সব বইয়ের সন্ধান দেবে। ইংরেজী ছাড়া ভারতের এগারোটি ভাষায় আমরা বই প্রকাশ করে থাকি। প্রতিটি বই-ই আমাদের গর্বের ধন। আর আপনার অমূল্য সঞ্চয়।

কোথায় পাবেন

সেলস এম্পোরিয়াম
পাব্লিকেশন ডিভিশন
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট
কলকাতা ৭০০ ০০১

লেখক সমবায় সমিতি
ই-৯২ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলকাতা ৭০০ ০১২

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সিনহা বুক এজেন্সী
৭৯/২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী
২২, রাজা উডমান্ট স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১

প্রতিবেশী উপন্যাস

হিন্দী

ভুলে যাওয়া দিনগুলি
ভগবতরচরণ বর্মা
অনুঃ কণিকা তোমর ৮.২৫
ময়লা আঁচল : ফণিশ্বরনাথ 'রেণু'
অনুঃ প্রসুন মিত্র ১৫ টাকা
রাগ দরবারী : শ্রীলাল শুক্লা
অনুঃ রমেন মজুমদার ১৫.২৫
বিন্দু ও সিন্ধু : অমৃতলাল বাগর
অনুঃ শ্রীমতী অর্চন কুমার ২৯.৫০
মানুষের রূপ : যশপাল
অনুঃ আদিত্য সেন ১৫.৭৫

মারাঠী

আমি : হরিনারায়ণ আপটে
অনুঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ৫.৭৫
ব্রাহ্মণ কন্যা : শ্রীধর ভেঙ্কটেশ কেতকর
অনুঃ অজিতকুমার দত্ত ১০ টাকা

অসমীয়া

গাঙ চিলের ডানা : লক্ষীনন্দন বরা
অনুঃ আরতি ঠাকুর
সূর্যমুখীরস্বপ্ন : সৈয়দ আব্দুল মালিক
অনুঃ অনিমা ও অমলেন্দু গুহ ১০.৭৫
কাটলিবাড়ি ঘাট : মহিম বরা
অনুঃ ক্ষিতীশ রায় ২০ টাকা
নীল শৈল (ওড়িয়া) : সুরেন্দ্র মহান্তি
অনুঃ জ্যোতিরিন্দ্র মোহন জোয়ার্দার
বামাচরণ মিত্র ১৮ টাকা
মাটির রঙ কালো (তেলুগু)
অনুঃ বোম্মানা বিশ্বনাথম ৯ টাকা
কল্লোল ধ্বনি : কল্কি রা কৃষ্ণমূর্তি
অনুঃ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৮ টাকা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-৫ গ্রীন পার্ক নয়াদিল্লী ১১০০১৬

সকল প্রকার ছাপার জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি, নেপালী ও বাংলা লাইনো।

ভারতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৫, মহেন্দ্র সরকার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

ফোন : ২৪-৪৫১৫

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮ ০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১ ০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭ ০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫ ০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদ্যপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ, বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

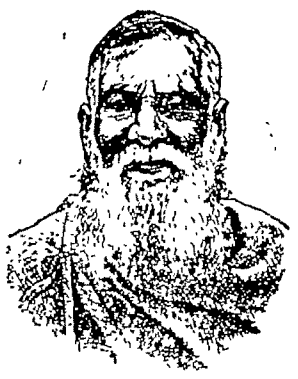

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪ ০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

ACHARYA RAMESH CHANDRA MAJUMDAR NUMBER : 43rd ANNUAL NUMBER
JAYASREE : Estd. 1931 : BAISAKH 1385 : MAY 1978 : Reg. No. WB/SC-18

WALLEM SHIPMANAGEMENT LIMITED

HONGKONG

PART OF THE WALLEM GROUP OF COMPANIES.

Situated at

GAMMON HOUSE
34TH—36TH FLOORS
HARCOURT ROAD
HONGKONG

2 6 JUN 1978

SHIPMANAGERS ● SHIPOWNERS ● AVIATION AND TRAVEL ● OFFSHORE RIGS ● TOWAGE AND SALVAGE

WE SPAN THE GLOBE

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 10·00 with Regd. Postage Rs. 15·00 : 20-A. Prince Golam Md. Road. Calcutta-700026. Phone : 46-4116

৪৩ বর্ষ : ১৩৮৫ : জ্যৈষ্ঠ

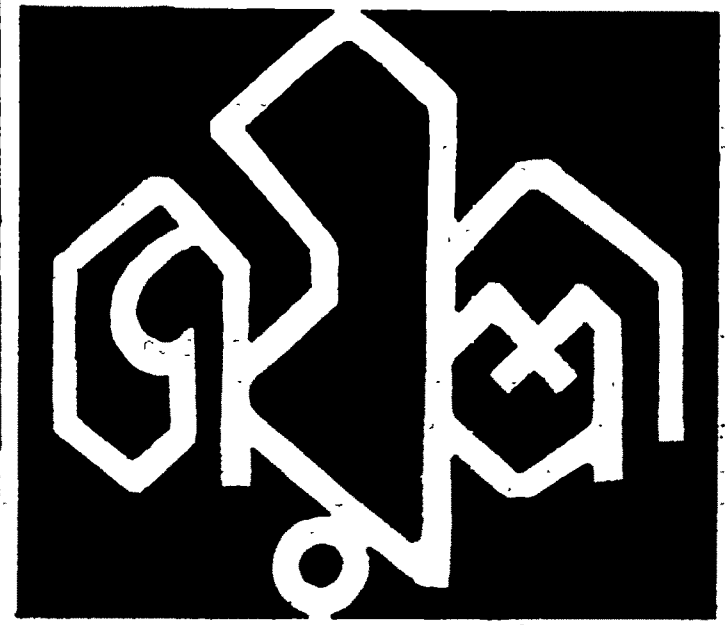

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-১৯২৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

H. V. KAMATH

LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : Rs. 15'-

NANDA MOOKERJEE

NETAJI THROUGH GERMAN LENS : Rs. 20/-

VIVEKANANDAS INFLUENCE ON SUBHAS : Rs. 6/-

NETAJI SPEAKS : VOL. I Rs. 4/-

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় দাম : ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড ৩৪·৫০ এর পরিবর্তে ২৭ টাকায়। বাংলায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় : লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীতার প্রেক্ষায় ৬১টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত। প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের এই বই ভাল লাগবে। দাম : ১০.০০

পুবদেশি উপকথা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পুব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গপ্পো, গণেশ পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম : ৯.০০

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম : ৯.০০

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন : ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম : ২০.০০

রামমোহন : সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দাম : ৬.০০

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ । ১৩৮৫ ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ঘটনার গতি কোন্ দিকে ? ১৩৫

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদ ।। সুনীল দাস ১৪০

স্মরণ

পণ্ডিত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ।।
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৪৩
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ।। কালীপদ রায় ১৪৫

অপ্রকাশিত রচনা

ভগবদ্গীতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ।।
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫১

এশিয়ার রত্নমালা

ইব্ন্ সৌদ (১৮৮০-১৯৫৩) ।।
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৫৯

স্মৃতিকথা : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ।। গোপাল লাল সান্যাল ১৬৭

গল্প

কেরানী দেখবি— ঐ দ্যাখ ।।
লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩
ইচ্ছা-কলম ।। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩

সম্পাদক : সুনীল দাস
প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

With Best Compliments of :

D. C. GHOSE & CO. (Agents) PRIVATE LIMITED

11, GOVERNMENT PLACE EAST
CALCUTTA-700 069

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

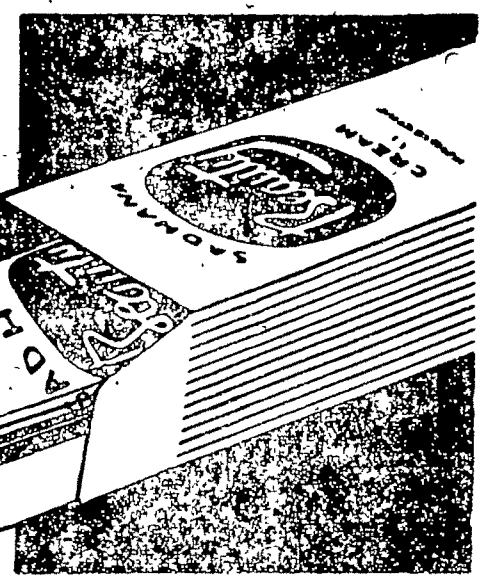

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

জয়ন্তী

৪৩ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪। দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ঘটনার গতি কোন দিকে ?

গত ৪ঠা জুন পশ্চিম বাংলায় তিনস্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেলো। গ্রাম-বাংলার প্রায় আড়াই কোটি মানুষ ৩২৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩২৪টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ও ১৫টি জিলা-পরিষদে যথাক্রমে ৪৬,৯৫৩ জনকে, ৮৪৩০ জনকে ও ৬৪৮ জনকে, অর্থাৎ মোট ৫৬,০০০ জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবার জন্য এই ভোট দিলেন। প্রার্থীর সংখ্যা ১৭০,০০০ জনেরও বেশী। বিশ বছরেরও বেশী পূর্বে, ১৯৫৭ সালে, প্রথম-বার পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিলো। এই তিনস্তরের নির্বাচনেই মার্ক্সবাদীদের জয়-জয়কার। তাদের আশ-পাশেও অন্য কোনো দল পৌঁছাতে পারে নাই, যদিও দলগত সংখ্যার হিসাবে মার্ক্সবাদীদের পরই ইন্দিরা কংগ্রেসের স্থান। অবশ্যি নির্দল প্রতিনিধিদের সংখ্যা ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রায় দ্বিগুণ। তবে এদের মধ্যে যারা দলীয় প্রতীক চাওয়া সত্ত্বেও না পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং যারা দলীয় প্রতীক বর্জন ক'রে 'দলহীন'-এর ছাপ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, এদের পারস্পরিক সংখ্যাই বা কতো, তা বলা মুস্কিল। তবে মার্ক্সবাদীরা যে এই দুই পক্ষের কোনো পক্ষেরই তোয়াক্কা করেন নাই, সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রামীণ উন্নয়নে এই নূতন কাঠামোগুলিকে কীভাবে কাজে লাগানো হবে, সে-ও এক নূতন পরীক্ষা। কোনো জয়ী-দলই হয়তো নির্বাচনে জয়ের-মাদকতা-বিবর্জিত হয়ে উঠতে পারবেন না, কিন্তু জয়ীর দলীয় ঔদ্ধত্য বর্জন, গণতন্ত্রে সিক্ত দলের পক্ষে শুধু সহজ নয়, স্বাভাবিকও বটে। অতঃপর, গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির হাতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার পড়বে, পঞ্চায়েত-সমিতিগুলি তাদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত তৈরী করবে আর জিলা পরিষদের অন্তিম দায়িত্ব হবে প্রকল্প রচনায় ও

পরিচালনার। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের অতঃপর পঞ্চায়েত-সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের জিলা পরিষদের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হবে। পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নগদে এবং শস্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করা আছে। এছাড়া কেন্দ্রে "কাজের পরিবর্তে খাদ্য" এবং বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনাও গ্রাম-পঞ্চায়েতের তদারকীতে থাকবে। কৃষি-ঋণের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের তদারকও তাদের হাতেই বর্তাবে।

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের হাত থেকে অধিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম বঙ্গে ক্ষমতাসীন মার্ক্সবাদীদের অসামান্য জয়ের ফলে এবার গ্রাম-পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত-সমিতি ও জিলা পরিষদের হাতে, পঞ্চায়েত আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে, অধিকতর ক্ষমতা তুলে দেবার সময় এসেছে। এই পরীক্ষায় মার্ক্সবাদীদের দ্রুত উত্তরণ, "রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা" অর্জনের নীতি সম্পর্কে অনেক সংশয়ের নিরসন করবে। দলীয় রাজনীতির উত্তাপ থেকে গ্রামীণ জীবনকে অব্যাহতি দেবার জন্য যাদের উদ্বেগ দেখা গেছে, তারাই আবার দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে পঞ্চায়েতী জীবনে 'দলহীন' ব্যবস্থাপনার পত্তন করতে চেয়েছিলেন। দলের মোড়লদের ডেকে 'দলহীন'-এর আয়োজনে শুধু স্ববিরোধিতা নয়, একটা অনৈতিকতার সুরঙ্গপথও নিহিত রয়েছে। সময় নিয়ে প্রকৃত 'দলহীন' গ্রামীণ জীবন গড়বার প্রচেষ্টা গ্রামীণ মানুষের অভিনন্দন পেতো। গ্রামীণ জীবনে রাজনীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে যদি কখনও তা এক-তান্ত্রিকতার দিকে মোড় নেয় তার পরিণাম মারাত্মক হবে। সুতরাং পঞ্চায়েতী নির্বাচন যেমন গ্রামীণ মানুষের জন্য নূতন দিগন্ত অবারিত করেছে, তেমনি নূতন জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে এই রাজ্যের মানুষের কাছে।

এই রাজ্যের মানুষের কাছে আর একটি সমস্যাও গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিক থেকে অন্তহীন জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে-সময় থেকে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু বসতির উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল থেকে প্রায় ৬০,০০০ উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় ফিরে এসেছেন। তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য : সুন্দরবনে পুনর্বাসন। তারা সকল রকম বাধা অতিক্রম করে দলে দলে এসে হাসনাবাদে সমবেত হন। সেখান থেকে সরকারী প্রতিরোধ সত্ত্বেও নৌকা দখল করে—সে জন্য তারা নৌকার অধিকারীদের ন্যায্যমূল্য দিয়েছেন—নদী পার হয়ে সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকা মরিচঝাঁপিতে পৌঁচেছেন। সুন্দরবনের বর্তমান আয়তন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট ভূভাগের শতকরা ৪৪ ভাগ জমি বনভূমিতে ঢাকা। অর্থাৎ, উদ্বাস্তুদের ধারণা এই বনভূমির শতকরা ৪ ভাগ

যদি তাদের বসবাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা মিটে যায়। পূর্বেই বলা হোলো সুন্দরবনের মোট আয়তন ৯৬২৯'৯ বর্গ কিলোমিটারের শতকরা ৪৪ ভাগ, অর্থাৎ ৪২৬৩.১ বর্গ কিলোমিটার, বনভূমির দ্বারা আবৃত। এদিকে সুন্দরবনের মোট জনসংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। সুতরাং সুন্দরবন অঞ্চলে বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ২০০ জন। দণ্ডকারণ্য প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের ধারণা সুন্দরবনের শতকরা ৪৪ ভাগ সংরক্ষিত বনের শতকরা ৪ ভাগ যদি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, সেক্ষেত্রে বনমুক্ত এলাকায় প্রতি লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের জন্য ২'৬ ভাগ জমিই যথেষ্ট। কারণ সুন্দরবনের মোট আয়তনের বনমুক্ত ৫৬ ভাগ জমিতে ২২ লক্ষ মানুষ বসতি করছেন, সেই হিসাবে প্রতি লক্ষ লোকের বসতির জন্য ২'৬ ভাগ জমিতেই সঙ্কুলান হচ্ছে। শতকরা ৪ ভাগ জমি ছেড়ে দিলে দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য রাজ্যের পুনর্বাসন এলাকা ছেড়ে যারা এসেছেন তেমন দেড়লক্ষ লোকের পুনর্বাসন সেই জমিতে হতে পারবে। এদের বক্তব্যের ও আচরণের দৃঢ়তা দেখে মনে হয় এঁরা বাক্যবিলাসী নন, বহুদিন সবদিক ভেবেচিন্তেই এঁরা ১৩।১৪ বছরের বাড়ী-ঘরের পাটগুটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে রওয়ানা হয়েছেন : তাদের লক্ষ্য সুন্দরবনে নূতন জীবনযাত্রা সুরু করতে হবে এবং সেজন্য সম্ভাব্য সকলপ্রকার বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে হবে।

ঘটনাও তাই। তাঁদের মুখের ধ্বনি : 'মরি তো পশ্চিম বাংলায়ই মরবো'। ইতিমধ্যে অনাহারে, রৌদ্রতপ্ত পথের শ্রান্তিতে, বিনা চিকিৎসায় অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন, কেউ বা আত্মহত্যার পথে নিষ্কৃতি খুঁজেছেন। এরা যে মৃত্যুপণ করে পশ্চিম বাংলায় ফিরে এসেছেন, সুন্দরবন যে এদের চুম্বকের মত হাতছানি দিয়ে দুরন্ত বেগে টেনে এনেছে তার দ্ব্যর্থহীন প্রমাণও পাওয়া গেছে। সকল প্রকার দুর্বার প্রতিরোধ অতিক্রম ক'রে হাসনাবাদ পৌঁছেও যখন নদী পেরিয়ে সুন্দরবনের সীমান্তে সংরক্ষিত অঞ্চলে যাবার পথে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সরকারী নিষেধাজ্ঞার দরুণ হাসনাবাদ থেকে নদী পারাপারের নৌকা পাওয়া যাচ্ছিল না, সেই প্রতিরোধ ডিঙোবার জন্য গত ৭ই এপ্রিল (১৯৭৮) কুমীর-হাঙ্গরসঙ্কুল হাসনাবাদের নদীর নোনাজলে ৫৪ জন উদ্বাস্তু যুবক মরণঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করেন নাই। এই যুবকেরা সেদিন সাঁতার দিয়ে নদীর অপর পার থেকে নৌকাগুলি দখল করে হাসনাবাদে নিয়ে এসে সেই নৌকাগুলির সাহায্যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে অপর পারে পৌঁছে দিয়ে, তাদের পক্ষে সীমান্ত সংরক্ষিত বনভূমির কুমীরমারী, বাগ্‌না, মরিচঝাঁপিতে পৌঁছানো সম্ভব করে তোলে।

এই হাজার হাজার উদ্বাস্তুরা সরকারের চোখে আজ অপরাধীর কাঠগড়ায়। ১৩।১৪ বছর পর সুদূর দণ্ডকারণ্য এলাকা থেকে এতো হাজার হাজার

লাঞ্ছিত নর-নারী-শিশু ভিটে-মাটি ও সর্বস্ব ছেড়ে কেন চলে এলেন? আজ পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধানের চেষ্টা নেই কেন?—না রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, না কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে? এদের প্রতি সরকারী বিরূপতা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় এরা অবাঞ্ছিত, যদিও এদেরই দেশ-বিভাগের শিকার করে সেদিন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলো। আবার এরা যখন সেদিন রিক্ত, নিপীড়িত অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, পশ্চিমবঙ্গেই তাদের পুনর্বাসনের দাবী তুলে সেদিনকার বিরোধী দলনেতারা,—যারা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন,—ভোট কুড়িয়েছেন, বিধানসভা-লোকসভার সদস্য হয়েছেন। আজ অবশ্যি মতটা বদলে গেছে, অথচ সেদিনকার বিশ্বাস নিয়েই হয়তো বর্তমান রাজ্যশাসকদের ভরসায় এই হাজার হাজার উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের সীমান্তে নিরাপদ পুনর্বাসনের আশা নিয়ে পশ্চিম বাংলায় ফিরে এসেছেন!

২৫।২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে এরা পশ্চিম বাংলায় আসতে সুরু করে হাসনাবাদে জড়ো হ'তে থাকেন। তখন থেকেই এদের ঘোষিত সঙ্কল্প: 'সুন্দরবন যাবো, মরতে হলে পশ্চিম বঙ্গে মরবো'—কারও অজানা ছিল না, —রাজ্যসরকারের তো নয়-ই। কি জানি কেন, তখন থেকেই এদের প্রতি সরকারী অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব খুবই প্রকট হয়ে ওঠে। এই অমানবিক আচরণ কেন? ফিরে এসে সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে সমস্যা সৃষ্টি করবার জন্য? দেশবিভাগেই তো পর্বত-প্রমাণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্য অন্ততঃ এরা কেউ দায়ী নন। আর যদি বর্তমান শাসকদের সরকার-বিরোধী পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে এরা এসে থাকেন? তবে? তখন তো বিরোধীদের ভূমিকায় বর্তমান সরকারের মুখপাত্ররা উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসনের দাবীতে আন্দোলন করেছেন, আন্দামানে পুনর্বাসনের বিরোধিতা করেছেন, দণ্ডকারণ্য সম্পর্কেও তাই। সুতরাং, বন্ধুরা, দরদীরা সরকারে এসেছেন, এই ভাবনার আবেগ নিয়ে যদি এরা এসে থাকেন, দণ্ডকারণ্যের প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, সেখানকার প্রতিবেশীদের অমানবিক আচরণ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের আওতায় নিরাপত্তার অভাব বোধ ক'রে যদি মানবিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে থাকেন অপরাধটা কোথায়? কিন্তু পশ্চিম বাংলায় ফিরে আসার মাসাধিক কাল পর ২৮শে ও ২৯শে মার্চ বসিরহাট রেল ষ্টেশনে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের কাছে দুর্ব্যবহার পেয়ে তাদের মনে নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হ'ল। মাস দুই-এর মধ্যেও সরকার হাসনাবাদ বা চর হাসনাবাদে ত্রাণ কিম্বা খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন না; বোধহয় নীতিগতভাবেই। কারণ

তারা চাইছিলেন এরা পশ্চিম বাংলা ছেড়ে চলে যাক্। একমাস পর হাসনাবাদে সরকার থেকে কয়েকটি নলকূপের ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে টিকা, ইনজেকসন ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা হয়। একমাত্র ভারত সেবাশ্রম সংঘ হাসনাবাদে ত্রাণ-সাহায্য দিয়েছেন। কিন্তু গত ৭ই এপ্রিলের পর হাসনাবাদে জমায়েৎ শতকরা ৭৫ ভাগ উদ্বাস্তু চর হাসনাবাদে চলে গেলে ভারত সেবাশ্রম সংঘ সেখানে ত্রাণ-সাহায্য দেবার অনুমতি পান নি—কুমীরমারী, বাগনা, মরিচঝাঁপি—সুন্দরবনের অভ্যন্তরে এ-সব এলাকায় সরকারী ত্রাণ-সাহায্য দেওয়াতো দূরস্থান, এমন কি আশ্রয়-শিবিরও খোলা হয় নাই এবং পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নলকূপ বসানোর উদ্যোগও দেখা যায় নাই। সরকারী আশ্রয়-শিবির তৈরী হয়েছে গোলপুকুরে, হাসনাবাদ ও বসিরহাটের রাস্তার পাশে, হাসনাবাদ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে।

মার্ক্সবাদী পরিচালিত দলের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রায় একছত্র জয়ের পর উদ্বাস্তুদের প্রতি এই দল মানবিক আচরণ করবেন, আশা করা যায়। এবং সেই অবসরে দণ্ডকারণ্য থেকে এতো বছর পর হাজারে হাজারে এদের ফিরে আসবার কারণ কি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে এদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে বলার পূর্বে সেই কারণগুলি দূর করা হবে আশা করা যায়। সে-সম্পর্কে উদ্বাস্তুদের সন্তুষ্টিবিধান সাপেক্ষেই এদের ফিরে যেতে বলার পেছনে নৈতিকতা থাকবে। অন্যথা সেটা হবে জবরদস্তি ক্ষমতার প্রয়োগ, অমানবিক এবং অনৈতিকও বটে।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী জেনারেল জিয়াউর রহমান জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের প্রার্থী জেনারেল ওসমানীকে এককোটি ভোটেরও বেশী ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। জিয়ার জয়ের পেছনে জবরদস্তির অভিযোগ উঠলেও এতো ভোটের ব্যবধানে বোঝা যায় ওসমানীর সপক্ষে কোনো সংগঠনই দানা বাঁধে নাই। মার্শাল ল' প্রত্যাহৃত হোলো না, আর স্বাধীন ও ন্যায্য ভোট হবে—জেনারেল ওসমানীদের এই হিসাবটা একেবারে কাঁচা হয়েছে। এই অবস্থায় ভোটে দাঁড়ানোটাই অন্যায় হয়েছে।

পাকিস্তানে রাওয়ালপিণ্ডির সুপ্রিম কোর্টে, হত্যার দায়ে লাহোর হাইকোর্টে জুলফিকার আলি ভুট্টোর প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল চলছে। আর ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারী মহলে এখনও আলোচনা চলছে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীকে বিশেষ আদালতে বিচার করা হবে, কি হবে না। গত ৫ই জুন ভোরে প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই ব্রুসেলস, ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন, ফিরবেন ১৭ই জুন। শ্রীদেশাই ফেরার পর ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

[শেষাংশ ১৪২ পৃষ্ঠায়]

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

চৈত্র সংখ্যার পর

বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সবাদ

সুনীল দাস

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ডায়ালেকটিক বস্তুটি কী? হেগেলের দৃষ্টিতে ইতিহাস একটি প্রবাহ। এই প্রবাহের মধ্যেই বিমূর্ত সত্তার ক্রম-উন্মোচন চলেছে। আর এই বিমূর্ত সত্তাটিই বা কিসের আধার? সকল ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সংহত রূপ এই বিমূর্ত সত্তা। এই সংহতির একটি সুদৃঢ় বেষ্টনী বা বন্ধন রয়েছে, যে বন্ধনের পরিচয় দিয়ে বলা যায়—সকল ভাবনা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বন্ধনের সূত্রটিকে বলতে হয় ডায়ালেকটিক। হেগেলের দৃষ্টিতে অতীতকে জানা-বোঝাতেই দর্শনের মূল দায়িত্ব নিবদ্ধ ছিল। মার্ক্স বল্লেন 'উহুঁ, তা একেবারেই নয়। দর্শন কেবল বিশ্বের উন্মোচনকে ব্যাখ্যা করবে কেন! এ-যাবৎ দর্শনের দায়িত্ব সেখানেই সীমিত থাকলেও; আর নয়। এবার দর্শনকে নূতন দায়িত্ব নিতে হবে, বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য দর্শনের প্রয়োগ চাই—"...the point is to change it'। দর্শনের প্রয়োগের সীমানা যেমন বর্ধিত হ'ল, তেমনি মার্ক্স ভবিষ্যতকেও ডায়ালেকটিকের প্রয়োগের আওতায় টেনে এনে হেগেলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন।

ডায়ালেকটিক-এর সাদা-মাটা অর্থ হ'লো আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে আলোচকদের যুক্তির বৈপরীত্যগুলি খুলে ধরে একটা মীমাংসায় পৌঁছাবার পদ্ধতিমাত্র। এই পদ্ধতিকে তিনটি স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে—যাকে বলা হয় স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি অথবা thesis, anti-thesis ও synthesis। একটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপনকে স্থিতি বা thesis বলা হয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থিতি বা thesisকে খণ্ডন করে যুক্তি দাঁড়িয়ে গেলে সেটা হবে প্রতিস্থিতি বা anti-thesis। তারপরই এই স্তর মিলিয়ে আর এক স্তরে বিতর্কের উত্তরণ, যা সংস্থিতি বা synthesis রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। পূর্বেকার দুই স্তরে যা বাস্তব বা সত্য, এই সংস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে তা নিহিত থাকে। এই ভাবে এই সংস্থিতি আবার স্থিতির ভূমিকা নিয়ে পর পর পর্যায়গুলি অতিক্রম করে নূতন সংস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়। হেগেলের বিমূর্ত ভাবনার উন্মোচনের এই রঙ্গপথের রেখাঙ্কন চিন্তা-জগতে বৈপ্লবিক পদ্ধতিরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

মার্ক্স হেগেলের কাছ থেকেই ডায়ালেকটিক পদ্ধতির পাঠ নিয়েছেন। সে কথা মার্ক্স অসঙ্কোচে স্বীকারও করেছেন, যদিও মার্ক্সের অব্যবহিত গুরু-রূপে ফয়ারবাক দর্শনের জগতে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত। কিন্তু মার্ক্স হেগেলের এই ডায়ালেকটিক পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে একেবারে হেগেলের বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। মার্ক্সের নিজেরই ভাষায় ইতিপূর্বে সে স্বীকৃতি উদ্ধৃত করা হয়েছে: "আমার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি হেগেলের চাইতে শুধু পৃথকই নয়, একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত।" ডায়ালেকটিকের রূপায়ণে হেগেলের সঙ্গে মার্ক্স যে বৈপরীত্যের ওপর ঝোঁক দিয়েছেন, তা পড়লে মনে হবে, মার্ক্স গোড়া থেকেই হেগেলের পথ বর্জন করে নূতন পথ ধরেছেন। আসলে ঘটনা তা নয়। হেগেল যে পদ্ধতিকে বিমূর্ত ভাবনার ক্রম-উন্মোচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, মার্ক্স তাকে টেনে নিয়ে এসেছেন সমাজের ক্ষেত্রে। যে তিন স্তরের বিরোধ বা contradiction-এর মধ্য দিয়ে বিমূর্ত ভাবনার ক্রম-উন্মোচন হেগেল দেখিয়েছেন, সমাজে, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে সেই বিরোধের ওপর ভর করে মার্ক্স সামাজিক পরিবর্তনের সন্ধান দিয়েছেন। অথচ, বস্তু-সত্তায় এই বিরোধের মধ্যে যে ঐক্য নিহিত রয়েছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। পুঁজিবাদী সমাজের কথাই ধরা যাক। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়াদের পাশাপাশি প্রলিটেরিয়েটদের বাস, যতদিন না পুঁজিবাদী সমাজের ষোলআনা পরিবর্তন সাধিত হয়ে গোটা সমাজটাই প্রলিটেরিয়েটদের বাসভূমি না হয়ে উঠছে; অর্থাৎ, বুর্জোয়াদের শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হয়ে সর্বহারাতে রূপান্তরিত না হচ্ছে। এই ধরণের বিরুদ্ধসত্তার সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজের রূপান্তর মার্ক্সবাদের উপজীব্য। তাই মার্ক্সবাদীদের চিন্তায় বিরুদ্ধসত্তা বা contradiction-এর প্রত্যয়গুলি অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। এই বিরুদ্ধসত্তার প্রত্যয় ছাড়া মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক অচল। আবার বস্তুসত্তার মধ্যে এই বিরুদ্ধসত্তাগুলি একাত্ম হয়ে ঠাঁই পেয়েছে। সুতরাং মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক-এ এই ধরণের বিরুদ্ধসত্তার অনিবার্যতা লক্ষ্য করে লেনিন 'contradiction' বা বিরুদ্ধ-সত্তাকে চিহ্নিত করেছেন: "The Salt of dialecties" রূপে। অর্থাৎ লেনিন বলতে চেয়েছেন: এরাই ডায়ালেকটিকের প্রাণস্বরূপ।

সামন্তবাদ (feudalism), পুঁজিবাদ (capitalism) এবং সমাজবাদ-এর (Socialism) উদ্বর্তনে এই বিরুদ্ধসত্তার যুৎসই ভূমিকা দেখিয়ে মার্ক্স বলছেন ফিউড্যালিজমের অন্তর্নিহিত বিরোধিতায় ক্যাপিট্যালিজমের উদ্ভব হবে এবং ফিউড্যালিজমের যা কিছু ভালো তা পুঁজিবাদে সংহত হবে। তেমনি পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হবে সমাজবাদে এবং পুঁজিবাদের যা কিছু ভালো সমাজবাদে সংহত হবে —যেমন কারিগরী বিজ্ঞানের উন্নত প্রথাসমূহ। ডায়ালেকটিক তত্ত্বে হতাশার কিছু নেই বরং এই তত্ত্ব মানুষের মনে নূতন আশার সঞ্চার করবে। সকল উন্নয়ন চক্রাকারে ঊর্ধ্বগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে,

নূতন স্তরে নূতন ব্যাঞ্জনায়। ডায়ালেকটিকের এই ব্যাখ্যার এক বিশেষ পরিণতির জন্য মার্ক্সবাদীরা নিশ্চয়ই প্রস্তুত নন। এই ব্যাখ্যা টেনে নিয়ে দেখা যেতে পারে ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব কি না? জীবনের বিরুদ্ধধর্মী সত্ত্বা নিঃসন্দেহে মৃত্যু। সুতরাং জীবনের প্রতিস্থিতি যেখানে মৃত্যু, সেখানে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির অর্থাৎ, জীবন ও মৃত্যুর সংস্থিতি কী হবে? নিঃসন্দেহে এক উর্ব্বতর ব্যাঞ্জনায় এই প্রতিস্থিতি প্রকাশিত হবে। সেটি কী? তবে কী অমরত্ব-ই এই প্রতিস্থিতির ব্যাঞ্জনা? না-ই বা কেন?

আরও প্রশ্ন আছে। এই বিরুদ্ধসত্ত্বার contradtction বা opposition-এর স্বরূপ নির্ণীত হবে কি ভাবে? এর সংজ্ঞা কী? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে পুঁজিবাদকে যে সামন্তবাদের বিরুদ্ধসত্ত্বা বা প্রতিস্থিতি বলা হবে কোন্ কোন্ বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিতে? মার্ক্সবাদীরা তাদের তত্ত্বের অনুকূলে কয়েকটি পছন্দসই প্রত্যয় বাছাই করে তাদের বিরুদ্ধ-সত্ত্বার ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে কারুর গায়ে স্থিতি বা থিসিস-এর, কারুর গায়ে প্রতিস্থিতি বা anti-thesis-এর, তক্‌মা এঁটে দিয়ে উর্ধ্বতন স্তরে তাদের বিরোধ-মীমাংসার পর এই বিবর্তিত স্তরের গায়ে সংস্থিতি বা সিন্থেসিস-এর তক্‌মা এঁটে দিয়ে গোটা পদ্ধতির নামকরণ করলো ডায়ালেকটিকরূপে। এই প্রসঙ্গে রুশ-বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত 'যুদ্ধকালীন কম্যুনিজম'-এর ('War Communism') কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা ১৯১৯-২২-এর মধ্যে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করে দিলে লেনিন, "নিউ ইকনমিক পলিসি' ('N. E. P') গ্রহণে বাধ্য হয়ে রাশিয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসা চালু করেন। সেদিন লেনিনের অনুসারীরা এই প্রত্যাবর্তনকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেও—যদিও লেনিন তাকে অনিবার্য ব্যবস্থারূপে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করেছিলেন—পরবর্তীকালের মার্ক্সবাদীরা ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে অজ্ঞতাকেই এই আক্রমণের কারণরূপে ব্যাখ্যা ক'রে 'N. E. P' কে "War Communism"-এর ডায়ালেকটিক-সম্মত প্রতিস্থিতিরূপে বর্ণনা করে এবং ১৯২৪ সালের পর থেকে স্ট্যালিনের নীতিকে সংস্থিতি বা 'সিন্থেসিস'-এর মর্যাদা দেয়। এইভাবে চতুর মার্ক্সবাদীরা 'N. E. P' থেকে পিছু হটে কম্যুনিজম যে পরাজয় বরণ করে নিয়েছিলো, ডায়ালেকটিকের বাক্যচ্ছটা তাকে জয়ের বরণমালা পরিয়ে দিলো। (ক্রমশঃ)

[১৩৯ পৃষ্ঠার পর]

নেওয়া হবে। এদিকে জনতা-পার্টির ওপর তলায় আরও জট পাকাচ্ছে, যদিও উত্তর প্রদেশ এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীরা পরিষদীয় দলের আস্থা ভোট পেয়ে তাদের নেতা চরণ সিং-এর হাত শক্ত করেছেন। রাজনারায়ণ জাতীয় কর্মপরিষদ ও জাতীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের বিলোপ দাবী করে সেই শক্ত হাত আরও শক্ত করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। তাই জনতা দলের ভবিষ্যৎও শ্রীদেশাই দেশে ফিরবার পর স্পষ্টতর হবে।

জনতা দলের পাঁচ শরিকের দ্বন্দ্ব এমন এক পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে, যেখান থেকে আর সংহতি বজায় রেখে এদের ফিরে আসা চলবে কিনা সন্দেহ। জনতা দলের সেই ধরণের পরিণতি দেশব্যাপী দারুণ অস্থৈর্যের সৃষ্টি করবে।

৮, ৬- ৭৮

পণ্ডিত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় : স্মৃতিচিত্র

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

পণ্ডিত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মচরিতে প্রকাশযোগ্য সব কথাই লিখে গেছেন। এর পরে তাঁর সম্বন্ধে নতুন কিছু লিখবার নেই। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘকালের। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররূপে তিনি ও আমি এক ঘরেই ছিলাম। কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। সে সময় অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তায় বোঝা যেত তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা। তারপর তিনি যোগ দিলেন বিদ্যাভবনে সংস্কৃত বিভাগে। সেই থেকে তাঁর জীবন কেটেছে পাণ্ডিত্যের সাধনায়। যদিও সাধারণভাবে সুজিতকুমার পরিচিত ছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে কিন্তু তিনি যে অনেকগুলি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন সে কথা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। কারণ তাঁর গবেষণামূলক পুস্তকগুলি বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সেই জন্য সাধারণ পাঠক, এমন কি তাঁর বন্ধুস্থানীয়েরাও, সে-সব গ্রন্থের পাতা উল্টে দেখবার সাহস করেন নি। তাছাড়া সংস্কৃত, পালি, চীন, তিব্বতী—এতগুলি ভাষা জানেনই বা ক'জন? আসল কথা, পণ্ডিত সুজিতের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বৃদ্ধকালে। যখন সুজিত শ্রীপল্লীতে এসে আমার প্রতিবেশী হলেন (১৯৬৪ পর), আমাদের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। সেই সময় থেকে দু'জনের মধ্যে প্রতিদিন একাধিকবার সাক্ষাৎ হ'ত। দু-জনেরই পুরাতন বন্ধুরা সংসার ত্যাগ করেছেন বা আশ্রম ত্যাগ করেছেন। স্থান পুরাতন হলেও পরিবেশ নতুন। এই জন্যই দু'জনে দু'জনের দিকে আকৃষ্ট হতে সময় লাগেনি। শ্রীপল্লীর সমস্ত ছোট ছেলেমেয়ে তাঁর অনুগত ছিল। ছোট ছেলেদের খেলাধূলা চলাফেরার কি অসুবিধে, কোথায় গর্ত আছে, তার মেরামতের কি ব্যবস্থা হতে পারে—এই সব নিয়ে সুজিতের দিন বেশ ভালই কাটত। সংক্ষেপে বিদ্যাবিশারদ সুজিত ছোটদের সঙ্গে যখন মিশতেন তখন তাঁর পাণ্ডিত্য কোথাও প্রকাশ পেত না। অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের তিনি কখনো চাণক্যের নীতি শেখাতে চেষ্টা করতেন না। এই সময় সুজিতের দ্বিতীয়া কন্যা রুচিরা মুখোপাধ্যায় কিছুকাল আমার লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে আসতেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই তিনি একাজ করেছিলেন।

মহাভারত, পুরাণ, কামসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থপাঠ সকল অভিভাবক পছন্দ করেন না। এই জন্য রুচিরাকে বলেছিলাম বাবার অনুমতি চেয়ে আন আগে। সুজিত কন্যাকে বল্লেন, শাস্ত্রগ্রন্থ কখনো অশ্লীল হতে পারে না। কাজেই নিঃসঙ্কোচে তুমি মহাভারত, পুরাণ বা যা বিনোদের প্রয়োজন তা পড়ে শোনাবে। এইসব গ্রন্থপাঠের সময় আমি বুঝেছিলাম সুজিত কন্যাকে যে কেবল এম, এ পাশ করিয়েছেন তা নয়, তার মনকেও শিক্ষিত করেছেন। এই সময় সম্ভব-অসম্ভবের সীমারক্ষা না করে যে কাহিনী রুচিরার সাহায্যে লিখেছিলাম, সুজিতই ছিলেন সে কাহিনীর প্রথম পাঠক। এই লেখাটি পড়ে তিনি আমায় বলে-

ছিলেন যে, তুমি যে মহাভারত, পুরাণ পড়েছ তা এই লেখা থেকে বোঝা যায়। ব্যক্তিগত এই কথাটি উল্লেখ করার কারণ এই যে রচনাকালে আমি অনেকবার মহাভারত, পুরাণের কথা ভেবেছি। 'মহাভারত' সুজিতের প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। 'যার হৃদয় পবিত্র তার কাছে যাগ, যজ্ঞ, পূজাপাঠের কোন প্রয়োজন নেই'—'শান্তি পর্বে'র এই অংশটি সুজিতের বিশেষ প্রিয় ছিল। এবং তিনি তাঁর জীবনকে এই আদর্শে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই আমি মনে করি। এবং দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি শান্তিনিকেতনে সংস্কার সমিতির কথা—যে কথা তিনি তাঁর আত্মচরিতে পরিষ্কার লিখে গেছেন। কাজেই এখানে সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলবার নেই।

শ্রীপল্লীতে থাকতেই প্রতিবেশী সুজিত ছুটির দিনে এসে তাঁর নতুন লেখা শোনাতেন। ক্রমে পুরানো লেখাও তিনি বের করলেন, এইসব লেখা পুস্তকাকারে ছাপা যায় কিনা সেই নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'ত। জানিনা এইসব লেখা ছাপা হয়েছে কিনা। ছেলেদের জন্য লেখা তাঁর ছোট গল্প কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে যক্ষের গল্প ('বিশ্বাস করো বা নাই করো') ছেলেদের জন্য রচিত বাংলা শিশু-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। 'চিত্র তারকা' সম্বন্ধে সুজিত একটি গল্প লেখেন। গল্পটি পড়ে আমি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। তখন তিনি আমাকে বলেন যে লেখাটি তিনি কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন কিন্তু চিত্রতারকাদের ভর্ৎসনার ভয়ে সম্পাদকমণ্ডলী লেখাটি ছাপেননি। এখন সুজিত ইহলোক ত্যাগ করেছেন, আমিও বৃদ্ধ হয়েছি, সম্পাদকদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই জেনে গল্পটির মূল সূত্রটি পাঠকদের জানিয়ে দিচ্ছি।[১] চিত্রতারকাদের চুলের গুচ্ছ সংগ্রহের জন্য তারকাভক্তদের ভীড় জমেছে আর তাঁর ভৃত্য নানা স্থান থেকে memento সংগ্রহ করে দিতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত দাবী এতই প্রবল হল যে চিত্রতারকার চুল কেটে তিনি অর্থ উপার্জন করতে শুরু করলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা প্রায়ই রহস্যপটু হন। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যে শ্লীল, অশ্লীল নানাপ্রকার রহস্যজনক উক্তির কোন অভাব নেই। সুজিতের রহস্যপ্রিয়তা ছিল যেমন ঘরোয়া, তেমনই স্বচ্ছ। কিন্তু নীতি-বাগীশ সম্পাদকদের দৌরাত্ম্যে সুজিতের এ ধরনের লেখা বেশী প্রকাশ হয়নি।

সুজিত তাঁর জীবন-সাধনায় কি পেয়েছিলেন, তার পরিচয় পেতে হলে তাঁর উইলের কথা অবশ্যই বলতে হয়। কোন রকম পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, শ্রাদ্ধ বা অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান করতে তিনি নিষেধ করে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারের লোকেরাও তাঁর শেষ ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি যে সংস্কার সমিতি করেছিলেন যৌবনকালে, সেটি তাঁর এই শেষ ইচ্ছা থেকে আমরা জানতে পারি।

---

* শিশুসাথী ১৩৬৯ সাল (বার্ষিক সংখ্যা)

১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'জয়শ্রী' পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক পরে এই গল্পটি সানন্দে প্রকাশ করেছিলেন।

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

কালীপদ রায়

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার স্নেহভাজন, মহাপ্রাণ সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আমাকে আপনাদের কাছে আজ প্রকাশ করতে হচ্ছে। তাঁরই কর্মবহুল জীবন-আলেখ্য স্মরণ করবার জন্য আমরা আজ সন্ধ্যায় এই মন্দিরে এসে সমবেত হয়েছি। এই শোকাবহ ঘটনাটি ঘটেছিল গতকাল ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের সময় পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালে। এর কিছুদিন আগে থেকেই তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩। গত ৭ই পৌষের উৎসবে আমরা যখন আশ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে আমাদের আশ্রমের প্রাচীনা গুরুপত্নীদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য একটি মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম তখন আমরা আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রের দল শ্রীমান সুজিতের অভাব খুব গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলাম। আমাদের আয়োজিত সভাগুলির সূচনায় সুজিতকুমার কর্তৃক শাস্ত্রীয় মন্ত্রপাঠের পর বরাবর আমাদের কার্যসূচী আরম্ভ হত। সেদিক দিয়ে সুজিতকুমার ছিলেন আমাদের আশ্রমিক সংঘের যাবতীয় আনন্দানুষ্ঠানগুলির ঋত্বিক। আমরা আশা করেছিলাম যে, তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের অসাধারণ শক্তি পূর্বের ন্যায় অতি সহজেই তাঁকে সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণার কাছে পরাভব স্বীকার করে সুজিতকুমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অপ্রত্যাশিত এই সংবাদে সমস্ত আশ্রম বিস্ময়ে ও মর্মান্তিক আঘাতে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

সম্প্রতি বার্ধক্যজনিত কঠিন রোগের ফলে সুজিতকুমারের স্বাভাবিক দৃঢ় ও সুঠাম দেহে কিছুটা ভাঙন ধরেছিল। উৎসাহে ও উদ্যমে উজ্জ্বল সদা-হাস্যময় মুখখানির মধুর স্মৃতি আজও আমাদের চিত্তপটে আঁকা রয়েছে। তাঁর ছেলেবেলাকার মাধুর্যময় ছবিটির সঙ্গে তাঁর স্বভাবগত সরস-বচন প্রয়োগে-পটু স্বভাবকে ঘিরে এই আশ্রমে প্রচলিত অনেক গল্প আজ আমাদের মনে উদয় হচ্ছে।

সেই গল্পগুলি এবং আশ্রম বিদ্যালয়ে তাঁর সম-বয়সীদের নিয়ে তাঁর নিজের হাতে সৃষ্ট সংস্কার সমিতিকে আমাদের মনে চিরদিন উজ্জ্বল করে রাখবে। আমরা স্মরণ করব সংস্কার বর্জিত তাঁর দৃঢ় চরিত্রকে, স্মরণ করব ১৯২১ খ্রীঃ যে কতিপয় ছাত্রদের নিয়ে বিশ্ব-ভারতীর সূচনা হয়েছিল সুজিতকুমার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম; স্মরণ করব আশ্রমের একাধিক মনীষী-গণের তিরোধানের পর শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে তাঁর আচার্যের ভাষণগুলি। এই বিষয়ে তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। এই মন্দিরে বসেই আচার্য হিসেবে তিনি মৃতের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কত ভাষণ দিয়ে গেছেন। তাঁর অধীত শাস্ত্র এবং

অন্যান্য জটিল বিষয়গুলির সঙ্গে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন এবং আত্মার অমৃতত্ব প্রাপ্তির বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পরলোকগত আত্মার প্রশস্তিতে তাঁর ভাষণগুলি সর্বদাই মুক্তকণ্ঠ থাকত।

আজ থেকে স্বল্পকম প্রায় ৭০ বছর আগে আমি অত্যন্ত শিশু বয়সে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র হয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম, তখন গুরুদেব আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু শ্রী, হ্রী এবং ধী সম্পন্ন তিনজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শিক্ষাগুরুদের পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁদের দেখলেই স্বভাবতই আমার মাথা তাঁদের চরণে নত হয়ে আসত। তাঁরা ছিলেন— আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনই তখন স্বপাক খেতেন। আহারে অত্যন্ত সংযমী, পরিচ্ছদে সহজ। এঁদের তিনজনকেই দেখতাম সব সময় কী যেন লিখতে ব্যস্ত। হরিবাবু তখনকার দিনের লাইব্রেরীর পশ্চিম প্রকোষ্ঠে বসে বাংলা অভিধান রচনায় ব্যস্ত। শাস্ত্রী মহাশয় গাব গাছের সন্নিকটে একটি খড়ের চালের মাটির বাড়ীর একটি কুটীরে বসে সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত ভাষাতত্ত্ব নিয়ে মগ্ন থাকতেন। আর রাজেনবাবু শান্তিনিকেতনের দোতলা বাড়ী, যেটাকে বর্তমানে মহর্ষিভবন বলা হয়, ঐ ভবনের একতলায় পশ্চিমদিকের একটি ঘরে বসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদিত Trust Deed-এর অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় খরচের হিসাব-পত্র সর্বদা লিখেই চলেছেন। তাঁকে তখনকার দিনে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই কাজ করতে হত। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একনাগারে তখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন না। তিনি ঠাকুর বাবুদের এস্টেটের জমিদারী সংক্রান্ত হিসাব-পত্র রাখার ব্যাপারে অপরিহার্য ছিলেন। এইজন্য তাঁকে মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে থাকতে হত। এই যাওয়া-আসার মধ্যেই তাঁর কর্মজীবন অন্তর্নিহিত ছিল। রাজেনবাবু ঠিক কোন সময় শান্তিনিকেতন ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলেন সেটা আমার মনে নেই, কিন্তু তিনি যখন আবার আশ্রমে ফিরে এলেন সেই সময়টা আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। কেননা এই সময় তিনি তাঁর একটি ১২/১৩ বছরের ভাগ্নেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এনে নীচের ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেটা ঘটেছিল ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে, আমি তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি। রাজেনবাবুর এই শিশুভাগ্নেটি হচ্ছেন আমাদের সুজিতকুমার। সুজিতের এখানে প্রথম ভর্তি হবার কথা এই জন্য মনে আছে যে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমবাসী সকলের কৌতূহল আকর্ষণ করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রম বিদ্যালয়ের spiritটি স্পঞ্জের মতো শুষে নিয়েছিলেন। এই সময় মনে পড়ে এখানকার সাহিত্য-সভা তাঁকে টেনে নিয়েছিল, প্রায়ই তিনি কবিতা এবং সরস গল্প লিখে সবাইকে আনন্দ দিতেন। এমনি একদিন অদ্ভুত নাম দিয়ে একটি ব্যঙ্গ নাটক লিখে তাঁর বন্ধু অজিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন এবং মণীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি সমবয়সীদের নিয়ে অভিনয় করেছিলেন। মাধবীলতা সম্বলিত যে লোহার গেটটি আছে—যেখানে জগদানন্দবাবু গণিতের ক্লাস নিতেন— সেখানে কাপড় এবং আলোয়ান খাটিয়ে নিজেরাই একটি স্টেজ করেন এবং সেই স্টেজের উপর সুজিতকুমার তাঁর নাটক পরিবেশন করেছিলেন। তখনকার দিনে তাঁকে একজন অভিনয় পাগলা বললেও অত্যুক্তি

হত না। প্রায়ই তিনি উদ্ভট সব নাম দিয়ে গুরুদেবের হাস্যকৌতুক এবং ব্যঙ্গকৌতুকের মত হাস্যোদ্দীপক সব ছোট ছোট নাটক লিখতেন এবং সেগুলি বন্ধুদের নিয়ে অভিনয়ও করতেন। তখন তো তিনি ছিলেন শিশু; কিন্তু বৃদ্ধবয়সে সেদিনও তাঁকে গুরুদেবের চিরকুমার সভায় রসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, কি উপলক্ষ্যে ঠিক মনে নাই, রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা বৌঠান উদয়নের বারান্দায় একটি ঘরোয়া পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভার একটি অভিনয় করিয়েছিলেন। এই অভিনয়ে সিন-সিনারীর কোন আতিশয্য ছিল না। অভিনয়টি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের সেই সময়কার নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায় সকলেই এই অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা সেদিন অভিনয় করেছিলেন নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল ঃ

পুরুষ ভূমিকায়

রসিকদাদা—সুজিত মুখার্জি
চন্দ্রমাধববাবু—শিবদাস রায়
অক্ষয়—ধীরু দত্ত
শ্রীশ—অজিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিপিন—শোভনলাল গাঙ্গুলী
পূর্ণ—বিমল দত্ত
বনমালী—সন্তোষ মিত্র

স্ত্রী ভূমিকায়

জগত্তারিণী—স্নেহলতা রায়
পুরোবালা—পূর্ণিমা ঠাকুর (বুবুদি)
শৈলবালা—মীরা চ্যাটার্জি
নৃপবালা—বুজু ঠাকুর
নীরবালা—সতী ঠাকুর
নির্মলা—শিউলি দত্ত। ইত্যাদি

এই নাটকে শ্রীমতী সতীদেবীর গানগুলি হয়েছিল দারুণ উপভোগ্য।

সুজিত ছিলেন নিষ্ঠাবান রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। আমাদের আশ্রমে তখন পংক্তি ভোজনের চল ছিল। ব্রাহ্মণ ছেলেরা তখন ব্রাহ্মণেতর বন্ধুদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেত না। রান্নাঘরে তাদের খাবার লাইন ছিল পৃথক। পূর্বেই বলেছি সুজিতকুমার ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সংস্কার মুক্ত। কিছু-দিনের মধ্যেই সুজিত ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট পংক্তি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণেতর পংক্তিতে বসে খেতে লাগলেন। অভিভাবক মাতুল রাজেনবাবু ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভাগ্নের আহার-বিহারেতে হীন অভিরুচি তিনি কখনই সমর্থন করতেন না। তিনি রুষ্ট হতে পারেন সে বিষয়ে সুজিতের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপও ছিল না। শিশুর এই নির্ভীকতা, নিষ্কলুষ সরলতা এবং তার উদার রুচি আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। আমি বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলাম কিন্তু তাঁর এই উদার নীতি এবং নির্ভীকতা আমাদের কাছেও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার বিষয় ছিল। কাজেই সুজিতকুমার সর্বদিক থেকেই সকলের প্রিয় পাত্র হতে পেরেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল উঁচু, আমরা ততদূর পৌঁছতে না পারলেও তাঁকে অনুসরণ করার মধ্যে আনন্দ উপলব্ধি করতাম।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সুজিতকুমার ও আরো কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বর্জন করেন। সুজিতকুমার তখন বিশ্বভারতী কোর্স অবলম্বনে বিদ্যার্থী হয়ে

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন একথা আগেই বলেছি। বিশ্বভারতীর ছাত্রাবস্থা কালে তাঁর সব চাইতে বড় কীর্তি হচ্ছে সংস্কার সমিতি স্থাপন। এই সংস্কার সমিতির তদানীন্তন সভ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ব্রাহ্মনেতর জাতির হস্তে অন্নগ্রহণ তাদের বংশে কেউ তখনও করেন নি। নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ তো সে বংশে কল্পনারও অতীত ছিল। এমনি গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরাও সর্বজাতির হস্তে অন্নগ্রহণ এমন কি মেথরদের হাতেও, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি বহু ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের সংস্কার সমিতি কেবল হিন্দু নয়,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান যে কোন সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই সঙ্গে চলেছিল সুজিতের সাহিত্যচর্চা। ছাত্রাবস্থাতেই নিয়মিত 'প্রবাসী' এবং শিশু-সাহিত্যে তাঁর একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব কারণে সুজিত-কুমারের পক্ষে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ভক্তিভাজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, C. F. Andrews, W. W Pearson প্রভৃতি মনীষীগণের স্নেহধন্য হতে তাঁকে কিছুমাত্র প্রয়াস পেতে হয় নি।

বিশ্বভারতীর শিক্ষা শেষ করে তিনি কিছুদিন কাশীতে গিয়ে টোলে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কাব্যতীর্থ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি বিশ্বভারতীতে ফিরে এলেন বিদ্যাভবনে গবেষক ছাত্র হয়ে।

এমন সময় এলো ১৯৩২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাস। সারা ভারতব্যাপী প্রবল উত্তেজনা। হরিজনদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করার জন্য মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করেছেন। গান্ধীজি যারবেদা জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের কূটসাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতির বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ সম্বন্ধে গুরুদেব গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

"It is worth sacrificing precious life for the sake of India's union."

তদানীন্তন আশ্রমবাসীগণ সকলেই মহাত্মাজীর অনশনের জন্য দুঃখে, উদ্বেগে মুহ্যমান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে এরূপ বিচলিত হতে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। ২১শে সেপ্টেম্বর মহাত্মার প্রায়োপবেশনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হল। সেদিন গুরুদেবের তেজোদীপ্ত বাণী যে শুনেছে সে তার সমস্ত সংস্কার মুছে দিয়ে হারি, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি অন্তজদের হাতে জল গ্রহণ করেছিল। আচার-নিষ্ঠ হিন্দু বিধবাগণও সেদিন চোখের জলের সঙ্গে তাঁদের আজন্ম-সংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন। বহু আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয়েছিল একটি সমিতি গঠন করে গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতা বর্জনের কাজ আরম্ভ করতে হবে। এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রবীণ অধ্যাপক জগদানন্দ রায় এবং সম্পাদক হয়েছিলেন বিদ্যাভবনের গবেষক-ছাত্র সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন থেকেই কাজ শুরু হল। গুরুদেব একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিয়েছিলেন। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল :

"এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্তজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা স্বীকার করিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

এই প্রতিজ্ঞাপত্রে তখনকার আশ্রমবাসীদের মধ্যে

প্রায় সকলেই স্বাক্ষর করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই প্রতিজ্ঞাপত্র এবং স্বাক্ষরকারীদের স্বাক্ষরের প্রতিলিপি সুজিতের সংগ্রহে সেদিনও আমরা দেখেছি। এরপর গুরুদেব সুজিতকে বলেছিলেন যে আমাদের সামাজিক জীবনে যে সমস্ত হীন কুসংস্কারগুলি ঘুণ ধরিয়েছে সেই অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য এবং জাতিভেদ দূর করার জন্য গোটা দেশে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। গবেষণায় রত থেকে কতগুলি পুরণো পুঁথি ঘাটার চাইতে সমাজহিতকর এই কাজটি হবে অনেক বড় এবং সাধু প্রকৃতির। এরপর সুজিত আর্য-সমাজের পক্ষ থেকে অন্তজ হরিজনদের প্রতি অবিচার, অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করার জন্য গোটা বাংলাদেশে ব্যাপক প্রচার আরম্ভ ক'রে পরিব্রাজকের মতো গোটা পূর্ববঙ্গ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ঐই সময় তিনি একদিন হঠাৎ আমাদের গ্রামে মূলঘরে এসে উপস্থিত হন। আমি তখন আমাদের গ্রামের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলাম। সুজিত বলেছিলেন—"ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রচার কার্য চালাতে চালাতে একটি গ্রামে এসে শুনলাম আপনাদের মূলঘর গ্রাম অতি সন্নিকটেই। তাই পদব্রজে চলে এলাম।"

অভুক্ত অবস্থায় পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি আমাদের বাড়ীতে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অবশেষে তাঁকে যথাযথ শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলা হয়। আমাদের গ্রামে থাকাকালে সে পার্শ্বস্থ নমশূদ্রদের গ্রামগুলিতে গিয়ে একাধিক সভা ক'রে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং নিদর্শন স্বরূপ তাদের দেওয়া জল এবং আহার্য খেয়েছিলেন। কী অপরিসীম পরিশ্রম করেছিলেন তিনি এই দেশ ও দশের কাজে! এ আমার নিজের চক্ষে দেখা। গুরুদেবের আগ্রহে পূর্ববঙ্গে এই প্রকার সমাজ সেবার কাজে কয়েক বছর আত্ম-নিয়োগ করার পর তিনি ১৯৩৭ সালে গুরুদেবেরই আহ্বানে চীনাভবনের কাজে ফিরে আসেন। বর্তমানে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে এবং বাংলাদেশের পার্শ্বস্থ প্রদেশ-গুলিতে হরিজনদের প্রতি যে অকথ্য অত্যাচারের কথা শোনা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তার শতাংশও শোনা যায় নি। এখানে অস্পৃশ্যতা তেমন প্রকট নয় তার একমাত্র কারণ যে অনেকদিন থেকে সুজিতের মতো উৎসর্গীকৃত জীবন সম্বলিত যুবকগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তাছাড়া সবার উপর ব্রাহ্মসমাজের অবদান তো আছেই।

১৯৩৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল বিশ্ব-ভারতী চীনাভবনে গবেষণার কাজ একটানা করে যান। তিনি সংস্কৃত, চৈনিক, তিব্বতী, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে তিনি বসুবন্ধু, ত্রিস্বভাব-নির্দেশ, মৈত্রী-সাধনা, শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি বহুগ্রন্থ সম্পাদনা ও রচনা করেন। সেদিনও অবসর গ্রহণের পর 'রবির আলোকে শান্তিনিকেতন' নামক তথ্যবহুল পুস্তকখানি রচনা করে আমাদের চিত্তে অমর হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি শ্রদ্ধানিবেদন, শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। আমাদের মধ্যে একটা মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে দেখা, কানে শোনাটাকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের আড়ালে পড়ে যায় মনে করি সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারি না।

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা

এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই তো আমাদের শ্রাদ্ধার দিন, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি। বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবার দিন—সেদিনকার আনন্দ মন্ত্র হচ্ছে :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন।

আজ সুজিত মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হতে চলেছেন। তিনি ছিলেন সবদিক থেকে সংস্কার মুক্ত। তাঁর তিরোধানে আজ আমরা কোন প্রকার শোক করব না। আনন্দের মধ্যেই চারিদিক মধুময় করে তুলেই তাঁকে আমরা বিদায় সম্বর্ধনা জানাবো। আনন্দ ইহলোকে আনন্দ পরলোকে। আজ পরলোকেও সুজিত যে সব মহাপুরুষদের স্নেহে ধন্য হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই এসে আনন্দোৎসবে মিলিত হয়েছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে অমৃতত্বে অভিষিক্ত করবার জন্য।

বৃদ্ধ হয়েছি। ৮০ বছরের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি। বর্তমানে আমারি বয়সী বৃদ্ধদের মতো আমিও সচরাচর পরলোকের কথা চিন্তা করে থাকি। বাড়ীতে অনেকবার প্রকাশও করেছি যে আমার তিরোধানের পর সুজিতকে আমন্ত্রণ করে অনাড়ম্বরে একটি ছোটখাট উপাসনার ব্যবস্থা করে আমার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করবে। কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র অভিরুচি, আজ আমাকেই সুজিতের মৃত্যু উপলক্ষ্যে স্মরণসভায় আচার্যের কাজ করবার জন্য ডাক পড়ল। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।*

* সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে ৭ এপ্রিল স্মরণার্থে যে উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আচার্যরূপে ১৯৭৮ শুক্রবার শান্তিনিকেতনে মন্দিরে পরলোকগত আত্মার ভাষণ।

ভগবদ্‌গীতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

—সম্প্রতি একটি ঘটনার কথা শুনলাম। ঘটনাটি যেমন বিস্ময়কর তেমনি দুঃখজনক। ১৯১৪-১৫ সালের কাছাকাছি এক বাঙ্গালী খ্রীস্টান মহিলা রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি জানান—উপনিষদ্‌ তাঁর খুবই ভাল লাগে—কিন্তু গীতা তাঁর তেমন ভাল লাগে না।

রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠির উত্তরে ভদ্রমহিলাকে একটি আঠারো পাতার দীর্ঘ পত্র দেন। নানাভাবে গীতার-পক্ষ-সমর্থন-করা ঐ দীর্ঘ পত্রটি একটি অমূল্য দলিল—কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ঐ পত্র এখন আর পাওয়া যায় না। ভদ্রমহিলার অসাবধানতা বশত তা হারায় নি। সম্ভবত কোনো সংকীর্ণচেতা ধর্মব্যবসায়ী তা নষ্ট করে দিয়েছে।

যিনি এই ঘটনার কথা আমায় বলেন, তিনি ঐ মহিলার নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। অশীতি-বর্ষেরও উপর যাঁর বয়স, সেই মহীয়সী নারীর জীবন নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস লেখা যায়।

ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে কবির ঐ রচনা কেমন ছিল—তাতে কী কী বিষয়ের আলোচনা ছিল, তা জানবার কোনো উপায় নাই। কিন্তু আঠারো পাতার পত্রের কথা শুনে স্বভাবতই মনে হয় অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভগবদ্‌গীতার সমস্ত অধ্যায় সম্বন্ধেই মনস্বী কবির কিছু না কিছু সুচিন্তিত আলোচনা ছিল।

এই ঘটনা শোনার পর, আমি রবীন্দ্ররচনাবলীর উপর চোখ বুলাতে থাকি, কোথায় কোথায় তিনি ভগবদ্‌গীতার উপর আলোচনা করেছেন, সেইসব আলোচনার কতক সংগ্রহ করে এখানে দিলাম। সমস্ত আলোচনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবু যা উদ্ধার করেছি—তার থেকে ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না'।

—'সাহিত্যের স্বরূপ,' রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ, পৃ. ৫১৪, (শ্রাবণ, ১৩৪০—১৯৩৩)

"ভারতবর্ষে যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যাগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরস্তু সঃ ॥ [৩।৪২]

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়গণ কেন শ্রেষ্ঠ? না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু, সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ, মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, বোধের দ্বারা যে

চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি, যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব, যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কারখানার দক্ষতা-শিক্ষা নয়; স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা; জ্ঞানের তপস্যা, বোধের তপস্যা নয়।"

—'শিক্ষা,' রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ, পৃষ্ঠা ৬০২-৩
(পৌষ, ১৩১৬, ১৯০৯-১০)

"... মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতসকাঁচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়-যোগ তাহাই সমস্ত ভারতইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহেই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় বা চরমগম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অনেক সময় স্বতন্ত্রভাবে এমন কি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় অহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই **চরম লক্ষ্যের আলোকটি** জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। **তাহাই গীতা।**

এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিকগত অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা।

হইতেও পারে মূল ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারতসংকলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধতা-রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে-গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে, সে-গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হউক, যোগই হউক, বেদান্তই হউক সকল তত্ত্বেরই

কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন। তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের পরমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না; অতএব ভারত চিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের[১] মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা।

তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য, অতএব এক জায়গায় মিল আছেই।

এমন কি, গীতায় যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতার যজ্ঞ-ব্যাপার এমন একটি বড়ো ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ···।

যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখাইয়াছেন। [গীতা, ৪।২৩-৩৩] —"পরিচয়", রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ শ, পৃ. ১৫৭-৮ (১৩১৮, ১৯১১)।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তাহার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে—যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল —অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা; গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়।

—'মানুষের ধর্ম' রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ, পৃ ৫৬৯ (১৩৩৯, ১৯৩২)।

...ভগবদ্‌গীতায় আমরা এই নূতনের আভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা হয়েছে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলে নি।

—'নবযুগ' কালান্তর রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ পৃ. ৩৯৯ (১৩৩৯, ১৯৩২)

··· অনার্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্যদেবতার দলে স্থান পাইলেন ···।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন। তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী গঞ্জিকা ও ভাং-ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ, এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন; অন্যদিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষ-পূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া

সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন।

একদিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্যদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

... এইরূপে আর্য-অনার্যের ধারা গঙ্গাযমুনার মতো একত্র হইল তবু তাহার দুই রং পাশাপাশি রহিয়া গেল।

এইরূপে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা **ভাগবতধর্মপ্রবর্তক** বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর **শ্রীকৃষ্ণের** কথা নহে।

বৈষ্ণবধর্মের একদিকে ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর-একদিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল।

শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য, উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আর্যসভ্যতার অদ্বৈতসূত্র। ইহাই নেতি নেতির দিক—ত্যাগ ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস।

বৈষ্ণবধর্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়-পিনাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি; ভূতপ্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলকধামের চির-ঐশ্বর্য; এখানে আর্যসভ্যতার দ্বৈতসূত্র[২]।

—'পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ, পৃ. ১৬০ (১৩১৮, ১৯১১)

"...ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্ব-প্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার **শ্রীকৃষ্ণ**[৩], তাহার **শ্রীরামচন্দ্র** এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক।" ঐ পৃ. ১৬৩

ভগবদ্গীতার কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' নামে প্রসিদ্ধ কবিতাটি লিখেছিলেন—অন্যত্র তার উল্লেখ পাই:

" 'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটু খানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্য গীতা বলছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

[২।২৮।]

[প্রাণীগণের এ-জন্মের আগের কথা অব্যক্ত, তাদের এই মধ্য অবস্থামাত্র ব্যক্ত। তাদের বিনাশের পরের যে-অবস্থা তাও অব্যক্ত। সেখানে শোক করবার কী আছে!]

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল

বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু, যখন মানুষ বলে 'ওইসঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো' তখন সংসার বলে, 'তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে; সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই-যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনা-স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনো-মতেই জমাবার জিনিস নয়।

.....অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" [কর্মেই তোমার অধিকার, তার ফলে নয়। গীতা, ২।৪৭]

—'তরীবোঝাই', 'স্বভাবকে লাভ' শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ, পৃ. ২৩৫-৩৭, (৪, ৫ চৈত্র, ১৩১৫, ১৯০৯)

রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'দুঃখ', এর প্রকাশকাল, ফাল্গুন ১৩১৪। ঐ ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসেই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। দেখা যাচ্ছে—পুত্রের মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যেই তিনি ঐ প্রবন্ধটি লেখেন। জানি না, জগতের আর কোনো সাহিত্যে এমন আশ্চর্য প্রবন্ধ লেখা হয়েছে কিনা।

এই প্রবন্ধে কবি গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শনের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন: "তুমিই—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্ লোকান্ সমগ্রান্
বদনৈর্ জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভির্ আপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্ তবোগ্রাঃ
প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ [১১/৩০]

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎ-বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ, সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, হে বিষ্ণু, তোমার উগ্র জ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে [১১/৩০]।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মতো সঙ্কুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না।

—তখন দয়াময় বলিয়া তোমার নিকটে দয়া চাহি, তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি, তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি। কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণ-

রূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃদ্‌পিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না ; তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই-যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে, সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে-আবিরাবির্ম এধি। হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ-যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে।...মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্মে, মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই।

—'দুঃখ'—ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ, পৃ-৬৬ (১৯০৭)।

শমীর মৃত্যুর পর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখছেন ঃ

"ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি ; আরো দুঃখ যদি দেন ত তাহাও শিরোধার্য করিয়া লইব—আমি পরাভূত হইব না।" ২৪শে মাঘ, ১৩১৪ ; 'স্মৃতি', পৃ-৬৭।

"মানুষের ধর্মে" কবি বলেছেন ঃ

"মানুষ একযুগে যাকে আশ্রয় করেছে আর এক-যুগে উন্মাদের মতো তার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে পথে। এই যে বারে বারে ঘর ভেঙে দিয়ে চলবার উদ্দামতা, যার জন্যে সে প্রাণপণ করে, এ প্রমাণ করছে কোন্ সত্যকে। সেই সত্য সম্বন্ধেই উপনিষদ্ বলেন ঃ মনসো জবীয়ো নৈনদ্ দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।

তিনি মনকে ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন। ছাড়িয়ে যদি না যেতেন তবে পদে পদে মানুষও আপনাকে ছাড়িয়ে যেত না। অথর্ববেদ বলেছেন, এই আরোর দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ত্ব।

তাই মানবদেবতার সম্বন্ধে এই কথা শুনি—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ ঊর্জিতমেব বা।
তৎ তদ্ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্
[গীতা, ১০/৪১]॥

যা-কিছুতে ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে, সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত।"—

'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ, পৃ-৫৮৫-৬ (১৯৩৩)।

..."যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ বিকৃতিশ্চ যা॥

আত্মা যার পাপ থেকে বিরত, কল্যাণে নিবিষ্ট তিনি সমস্তকে বুঝেছেন। তাই তিনি জানেন কোন্‌টা স্বভাবসিদ্ধ, কোন্‌টা স্বভাববিরুদ্ধ।

মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজনের হিত সাধনা করে। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানে কী করে। তেন সর্বম্ ইদংবুদ্ধম্। স্বচ্ছ মন নিয়ে সমস্তটাকে সে বোঝে। সত্য আছে, শিব আছে সমগ্রের মধ্যে। যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের, তার থেকে বিরত হলে মানুষ আত্মিক সমগ্রকে জানে, তখনই জানে আপনার

প্রকৃতি। তার এই প্রকৃতি কেবল আপনাকে নিয়ে নয়, তাঁকেই নিয়ে যাঁকে গীতা বলেছেন, তিনিই পৌরুষং নৃষু [৭/৮], মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব।

মানুষ এই পৌরুষের প্রতিই লক্ষ্য করে বলতে পারে :

ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।

মৃত্যুতে সেই পৌরুষকে সে প্রমাণ করে যা তার দেবত্বের লক্ষণ, যা মৃত্যুর অতীত।"

—'মানুষের ধর্ম', পৃ-৫৯১।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'যোগাযোগ' (১৯২৯)। এই 'যোগাযোগ'-এ "পাণ্ডবসখা ভাগবতধর্ম প্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা"-র সহিত "বৃন্দাবনের গিরিধর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের" কাহিনীর যোগাযোগ ঘটেছে। কবি ও মনীষীর হৃদয় ও মনীষা এঁদের উভয়কেই কেমনভাবে গ্রহণ করেছেন—তা দেখাবার জন্যে ঐ উপন্যাসের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম :

"একদিন বিপ্রদাস অন্তঃপুরের বাগানে ভিয়েন-ঘরের জন্যে চালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ খিড়কির পুকুরের ঘাটে দেখে, কুমু নিচের পৈঁঠের উপর বসে মাথা হেঁট করে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল। এসেই রুদ্ধস্বরে বললে, "দাদা কিছুই বুঝতে পারছি নে।" বলেই মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল।

...বিপ্রদাস থাকতে পারলে না। মরিয়া হয়ে বললে, "তোর মনে যদি একটুও খটকা থাকে, বিয়ে এখনো ভেঙে দিতে পারি।"

কুমুদিনী সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "ছি-ছি, সে কি হয়?"

...বিপ্রদাসের একেলে মন এতটা নিষ্ঠায় অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে বললে, "দুই পক্ষের সততায় তবেই বিবাহবন্ধন সত্য।***

পুরাণে দেখ্‌না, যেমন সীতা তেমনি রাম, যেমন মহাদেব তেমনি সতী, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠও তেমনি।"

...কুমুকে বলা মিথ্যে। এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ—

[দুঃখে যার মন অনুদ্বিগ্ন, সুখে যার স্পৃহা নাই, যার (অনু) রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই—গীতা, ২।৫৬]

শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ। যে ধর্ম দুঃখসুখের অতীত—তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা আবশ্যকতা কিসের? অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক,...মধুসূদন-ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।"

'যোগাযোগ', রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম, পৃ—৫৭৪-৫

"...আজ ফুলশয্যে, বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। আত্মীয় মেয়েরা সমস্ত দিন কুমুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিছুতে তাকে একলা থাকতে দিলে না। আজ একলা থাকবার বড়ো দরকার ছিল।...কোনো অবকাশে বাক্স থেকে যুগল-রূপের ফ্রেমে-বাঁধানো পটখানি বের করে সামনে মাটিতে বসে নিজের মনে বার বার করে বললে, 'আমি তোমারই, আজ তুমি

আমাকে নাও। সে আর কেউ নয় সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই।

তোমার যুগল-রূপ প্রকাশ হোক আমার জীবনে।'

...কুমুর সাজসজ্জা হল।...মধুসূদন আগে থাকতেই বলে রেখেছিল, বেশি রাত করলে চলবে না, কাল ওর কাজ আছে। নটা বাজবামাত্র হুকুম-মতো নিচের উঠান থেকে সশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। আর একমুহূর্ত না...

আকাশ থেকে বাজপাখীর ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। তার ঠাণ্ডা হাত ঘামছে, তার মুখ বিবর্ণ। ঘর বেরিয়ে এসেই মোতির মার হাত ধরে থেকে বললে, "আমাকে একটুখানির জন্যে কোথাও নিয়ে যাও আড়ালে। দশ মিনিটের জন্যে একলা থাকতে দাও।"

মোতির মা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, "এমন কপালও করেছিলি।"

দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়। লোক এল—বর শোবার ঘরে গেছে, বউ কোথায়?...মোতির মা যতক্ষণ পারে ওকে সময় দিতে চায়। অবশেষে যখন বুঝলে আর চলবে না তখন দরজা খুলে দেখে, বউ মূর্চ্ছিত হয়ে মেজের উপর পড়ে আছে।

গোলমাল পড়ে গেল। ধরাধরি করে বিছানার উপর তুলে দিয়ে কেউ জলের ছিটে দেয়, কেউ বাতাস করে। কিছুক্ষণ পরে যখন চেতনা হল, কুমু বুঝতে পারলে না কোথায় সে আছে—ডেকে উঠল "দাদা"। মোতির মা তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "ভয় নেই দিদি, এই যে আমি আছি।"

...কুমু ধীরে ধীরে উঠল। মনে মনে ঠাকুরের নাম করে প্রণাম করলে।...মোতির মা তাকে শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখনো ভয় করছে দিদি?"

কুমু হাতের মুঠো শক্ত করে একটু হেসে বললে, "না আর কিচ্ছু ভয় করছে না।"

মনে মনে বলছে, 'এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।'

মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোঈ।"

—ঐ, পৃ ৫৯৬-৭।

"...[মধুসূদন] বিছানায় আর টিকতে পারে না; উঠে পড়ল। আলো জ্বালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুললে। দেখলে সেই পুঁতি-গাঁথা থলিটি। প্রথমেই বেরোল বিপ্রদাসের টেলিগ্রামখানি—"ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন"—তারপরে একখানি ফোটোগ্রাফ, ওর দুই দাদার ছবি—আর একখানি কাগজের টুকরো, বিপ্রদাসের হাতে-লেখা গীতার এই শ্লোক—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্ জুহোষি দদাসি যৎ,
যৎ তপস্যসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

[হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু আহার করো, যাহা কিছু আহুতি দাও, যাহা কিছু দান করো, তাহা আমাকে অর্পণ করো—৯।২৭] ঐ, পৃ ৬০৩।

...কিছুদিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে বসেছিল। তার যত পূজা, যত ব্রত, যত পুরাণকাহিনী, সমস্তই এই কল্পমূর্তিকে সজীব করে রেখেছিল। সে ছিল অভিসারিণী তার মানস-বৃন্দাবনে—ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিনীতে—

হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ
শুন মনমোহন প্যারে—

[শেষাংশ ১৭৭ পৃষ্ঠায়]

ইব্‌ন্ সৌদ

(১৮৮০—১৯৫৩)

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

বোগদাদের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পুণ্যতোয়া ফোরাৎ নদীর তীরে পশ্চিম এশিয়ার কুরুক্ষেত্র কারবালা। এই বিশাল মরুপ্রান্তরে হজরৎ মহম্মদের দুই বংশধর হাসান ও হোসেন ভ্রাতৃদ্বয়ের কবর আছে। এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কাছে এই স্থানটী তীর্থক্ষেত্র।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে এমন এক ঘটনা ঘটল যাতে সারা জগৎ চম্‌কে উঠল। সৌদ নামে সৌদী আরবের এক বেদুইন নেতা কয়েক হাজার বেদুইন যোদ্ধা নিয়ে কারবালাতে আবির্ভূত হলেন। সহরের আবালবৃদ্ধবণিতা তাদের তরোয়ালের ঘায়ে নিহত হল; তারপর আক্রমণকারীরা সারা সহরে আগুন জ্বালিয়ে দিলো; আহতরা পুড়ে মরলো। বেদুইনরা তারপর আক্রমণ করলো হজরৎ হোসেনের সমাধি। সমাধি ধূলিসাৎ ক'রে সহরের যাবতীয় সম্পদ লুট ক'রে বেদুইনরা স্বদেশে ফিরলো।

১২৫৮তে মধ্য এশিয়ার হুলাগু খান বোগদাদ আক্রমণ করে। বিরাট নগরী ভস্মস্তূপে পরিণত করে, অধিবাসীদের ও খলিফাকে হত্যা ক'রে যোদ্ধারা সেখানেই রয়ে গেল। এই ধরণের মুসলমান রাজ্যের ওপর মুসলমানের আক্রমণ অতীতে ও সাম্প্রতিককালে হয়েছে কিন্তু তারা পরস্পরের মস্‌জিদ ও সমাধি ভাঙেনি বা অপবিত্র করেনি। আমাদের সম্রাট আওরঙজেব ছত্রপতি শিবাজীকে শিয়া রাজ্য গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর আক্রমণ করতে উৎসাহ দিতেন, এবং স্বয়ং এই দুটো রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু মস্‌জিদ ও সমাধিতে হাত দেন নি।

কারবালা শিয়া মুসলমান জগতের হৃদয়কেন্দ্রে এবং ইউরোপ ও ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক রাজপথের মধ্য পথে। পৃথিবী আতংকে শিউরে উঠল কারবালা আক্রমণকারীরা কারা? এরা—"আল্লা হো আকবর" বলে অথচ শিশু হত্যা করে, নারী হত্যা করে, নগরকে নগর জ্বালিয়ে বহুৎসব করে, লুট করে! এরা কারা? এরা ওয়াহাবী বলে পরিচিত। এদের নামে মরুভূমির বালি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

১৬৯১ খৃষ্টাব্দে রিয়াদের উত্তরে আয়ানা গ্রামে শেখ মহম্মদ ইব্‌ন্ আবদুল ওয়াহাবের জন্ম হয়।

ইনি যথারীতি কোরাণ শরীফ ও হাদিথ্ পাঠ সমাপ্ত করে পরিব্রাজনে বেরুলেন; দামাস্কাস্, বোগদাদ, বস্রা প্রভৃতি নগরী দেখে এলেন মক্কা শরীফে। এই সব অঞ্চলে মুসলমানদের চরিত্রের অধঃপতন দেখে ওয়াহাব ক্ষিপ্ত হলেন। এঁর মতে আল্লা ও মানুষের মধ্যে কোনও মধ্যস্থ থাকবে না। মুসলমানদের জন্যে নৃত্য, গীত, চিত্রাংকন সিগারেট, তামাক, কবরের ওপর ভাস্কর্য, মস্জিদের ওপর গম্বুজ, মিনার, পরণে হীরে জড়োয়া, রেশমী পোষাক, ইত্যাদি নিষিদ্ধ। প্রথম ইসলামের যুগে হজরৎ মহম্মদ যেমন মক্কার অধিবাসীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং শেষ অবধি মদিনায় আশ্রয় নেন তেমনই আবদুল ওয়াহাব আয়ানা থেকে পালিয়ে দার্ইয়াতে আশ্রয় নেন। ১৭৪২-এ স্থানীয় আমীর মহম্মদ ইব্ন্ সৌদ ওয়াহাবের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই প্রথম ওয়াহাবী মতের সংগে মিলিত হল রাষ্ট্রীয় শক্তি।

বিশাল সৌদী আরবের উপকূল অঞ্চলগুলি তখন তুর্কী সুলতানের অধীনে, তখন অভ্যন্তরে জোর যার মুল্লুক তার। মক্কার শরীফ তুর্কীকে নজরানা দেয়। সেখানে ওয়াহাবীদের উৎপাতে তুর্কী সুলতান রেগে গেলেন। মহম্মদ ইব্ন্ সৌদের সশস্ত্র বেদুইনদের যোগাযোগের ফলে উৎপাৎটা দাঁড়ালো হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডে। ওদের উৎসাহে ওয়াহাবীরা তুর্কী সেপাইদের খুন করতে লাগল অর্থাৎ একটা ছোটখাটো জেহাদ আরম্ভ হয়ে গেল—তবে এটা মুসলমানদের ভেতর এবং মুসলমান রাজ্যের ভেতর। আবদুল ওয়াহাব ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ৯৬ বছর বয়সে দার্ইয়াতে দেহরক্ষা করলেন।

বেদুইনরা স্থায়ী বসবাস বোঝে না; লুটতরাজ, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডে এরা সবিশেষ আনন্দ পায়; শিয়া হত্যা করতে পারলে তো কথাই নেই। ১৮০৩-এ ওয়াহাবীরা মক্কানগরী দখল করলো। তারপর যা ঘটার তাই ঘটল। এবার ওয়াহাবীরা কাবা পাথরের ওপর চাদরের ঢাকা ছিঁড়ে ফেলে দিলো; তারপর ওরা চললো জেদ্দা বন্দরে, পরে মদিনা। এইখানের ঐতিহাসিক মস্জিদে ওয়াহাবীদের নেতা নমাজের নেতৃত্ব করছিলেন, এমন সময় একজন আততায়ী ইমামের হৃদপিণ্ডে ছোরা বসিয়ে দেয়—। ইমামের মৃত্যু হয়; আততায়ীকে পুড়িয়ে মারা হয়। এই হতভাগ্য একজন শিয়া, দু' বছর আগে কারবালায় ওয়াহাবীরা এর দুটী শিশু সন্তানকে কাটে। এই সময় লোকটী আল্লার নামে শপথ করে যে এই নেতাকে সে হত্যা করবে। সেজন্যে লোকটী ওয়াহাবী সেজে দু'বছর বেদুইনদের কালা-পাহাড়ী তাণ্ডবে যোগ দেয়; অবশেষে সুযোগ মেলে মদিনায়। এই ধরণের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কার্যসিদ্ধি করার নাম শিয়াদের কাছে তাকিয়া বলে পরিচিত। কারণ এদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াহাবীদের নেতার মৃত্যুতে আন্দোলন চুপ্সে গেল। এই সুযোগে মিশরের তুর্কী লাট মহম্মদ আলী বিভিন্ন বেদুইন উপজাতিকে

ঘুষ দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যেতে বল্লেন। মিশরের সেনাপতি ইব্রাহিম পাশার আক্রমণের দাপটে মরুস্থানের পর মরুস্থান, গ্রামের পর গ্রাম সহরের পর সহর ওয়াহাবীদের হাত ছাড়া হল। ওয়াহাবী নেতা আবদুল্লা শান্তির প্রস্তাব করলেন। ইব্রাহিম পাশা প্রস্তাব আর প্রস্তাবকারী দুইই পাঠালেন ইস্তাম্বুলে তুর্কী সুলতানের দরবারে। সেখানে তাকে কোতল করা হয়।

তারপর এল ওয়াহাবীদের পরাজয় আর ওদের কেন্দ্র রিয়াদ সহরের পতন। ১৮৮০তে রিয়াদ রশীদ বংশের হস্তগত। ঐবছর নভেম্বর মাসে সৌদ পরিবারে আব্দার রহমানের একটী সন্তান হয়। তার নাম রাখা হয় আবদুল আজিজ। এই সময় সারা আরব উপদ্বীপে খালি লুটতরাজ, ডাকাতি, খুন আর বেদুইনদের সংঘর্ষ-এর যুগ। ইউরোপে নেপোলিয়নের পরাজয় হয়েছে, মহাদেশের চতুর্দিকে স্বাধীনতা-স্পৃহা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাড়া। ভারত উপমহাদেশ তখন ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটছে।

আবদুল আজিজ ইব্‌ন সৌদ যখন ৫ বছরের শিশু তখন রিয়াদে খবর এল যে রশীদী পরিবার সসৈন্যে আসছে সৌদ বংশ ধ্বংস করতে। পিতা আবদার রহমান আর কালবিলম্ব না করে সপরিবারে উটের পিঠে চড়ে চল্লেন মরুভূমির অভ্যন্তরে। একটা উটের পাশের থলেতে বালক সৌদ আর অন্য থলেতে তার দিদি বালিকা মুরা।

সৌদের মা দাওয়াশির বংশের মেয়ে। ওরা বেদুইনদের ভেতর খুব দীর্ঘাঙ্গী। সৌদ চেহারা পেয়েছে মা'র বংশের; বয়েসের অনুপাতে ঢ্যাঙা। এরা সবাই আশ্রয় পেলে মুরা বেদুইনদের মধ্যে। সেখানেই তার ঘোড়ায় চড়া, উটের দৌড়, রাইফেল ও তরোয়ালের শিক্ষা সমাপ্ত হল। বছর দশেকের সময় সৌদ বাবা-মার সংগে এলে কুয়েতের শেখ মোবারকের আশ্রয়ে।

কুয়েত তখন পারশ্য উপসাগরের নামজাদা বন্দর। সেখানকার সমুদ্রতীরের কফিখানায় তিনি নাবিক ও মুক্তা ডুবুরীদের সংগে আলাপ করতেন। শেখ মোবারকের দরবারে যোগ দিয়ে বিদেশীদের সংগে তার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আলাপ আলোচনা শুনতেন। কিন্তু তার অন্তরে শুধু এক আকাংখা—কিভাবে রিয়াদ দখল করা যায়। সৌদ তখন শস্ত্র-বিদ্যা ও শাস্ত্র-বিদ্যা দুইই রপ্ত করেছেন। তাঁর উচ্চতা তখন ৬ ফিট চার ইঞ্চি। অমিত-বলশালী। বয়েস একুশ। বছরটা ১৯০১।

হঠাৎ খবর এল রশীদীরা কুয়েৎ আক্রমণ করতে আসছে। কুয়েৎ সৈন্য সমাবেশ করলো। দুপক্ষই মরুভূমির ভেতর এগুতে লাগল। শখানেক উটের নায়ক হিসেবে সৌদ চল্লেন দক্ষিণে—রিয়াদের দিকে। তারপর একদিন অতর্কিত নৈশ আক্রমণে রিয়াদ দখল করলেন। এই কাহিনী আজও সৌদী আরবের ঘরে ঘরে বয়স্করা শিশুদের শোনায়।

১৯০১ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ অবধি ইব্‌ন্ সৌদের জীবন ঘোড়া বা উটের পিঠে

কেটেছে। শুধু যুদ্ধ আর দীর্ঘ মরুযাত্রা, প্রখর সূর্যতাপ, জলাভাব আর মৃত্যু। এত কষ্টে ইবন সৌদের কিন্তু স্বাস্থ্যভংগ হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও ইরাকে তুর্কীর সংগে ইংরেজের তুমুল যুদ্ধ। এহেন সময় ইংরেজ খবর পেলো যে ইবন্ রশীদ বসরা বন্দর দিয়ে বেআইনীভাবে রসদ আমদানী করে তুর্কীকে বিক্রী করছে। এই রশীদীরা সৌদের মরণশত্রু।

হ্যারী ফিল্‌বী * নামক এক আরবীভাষী ইংরেজের মধ্যস্থতায় ব্যবস্থা হল যে ইংরেজ রাইফেল ও উট কেনার জন্যে সৌদকে বিশ হাজার পাউণ্ড দেবে এবং যুদ্ধের তিন মাস প্রতিমাসে ৫০ হাজার পাউণ্ড দেবে। নানা কারণে, পাঁচ-ছ'মাস কেটে গেল। সৌদ অধৈর্য। ফিল্‌বী তাকে আরও কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিয়ে শান্ত করলেন। অবশেষে ১৯১৮র গ্রীষ্মকালে সৌদ হেইল আক্রমণ করলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়ে রিয়াদে ফিরলেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে।

যুদ্ধ থামার পরের বছর ১৯১৯ এ-রিয়াদে এক বীভৎস ঘটনা ঘটল। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে সারা রাজ্যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়েছে। ওষুধ ও টীকের অভাবে শত শত বেদুইন যোদ্ধা ও নগরবাসীর মৃত্যু হল; সৌদের বড় ছেলে তুর্কী ও আরও দুটী ছেলে মারা গেল। আর মারা গেলেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী জওহারা।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও তখন আরব জগতের দুর্দিন। ভার্সাই সন্ধি সম্মেলনে সৌদকে ডাকা হয় নি; প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার শরীফ পাঠিয়েছিলেন তার ছেলে ফৈজলকে (ইনি পরে ইরাকের রাজা হবেন)। সৌদ আর কিছু ভেবে না পেয়ে তার ছেলেকে—এর নামও ফৈজল—পাঠালেন লণ্ডনে ইংরেজের যুদ্ধ জয়ে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। ভার্সাই সন্ধিতে প্যালেষ্টাইন, জর্দান ও ইরাক পড়েছে ইংরেজের ভাগে, সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের ভাগে। এসব প্রতারণা হয়েছে মক্কার শরীফের দলে লরেন্স ও সৌদের শিবিরে ফিলবীর ষড়যন্ত্রে। লরেন্স মক্কার শরীফকে বুঝিয়েছিলেন যে পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইন তার, ফিলবী সৌদকে বুঝিয়েছে যে ওটা সৌদের। সৌদ ইংরেজকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন নি কিন্তু মক্কার শরীফ করেছেন। শেষ অবধি মহাযুদ্ধের শেষে দুজনেই মুখে বুড়ো আঙুল দিয়ে বসে রইলেন। মাঝখান থেকে ৭০ হাজার ইউরোপীয় ইহুদীকে এনে প্যালেষ্টাইনে ঢোকানো হল। তখন অত্র দেশে সাত লক্ষ আরব মুসলমান ও ক্রীশ্চান। জর্দান রাজ্য সৃষ্ট হওয়ার ফলে সৌদী আরবের সংগে প্যালেষ্টাইনের ভৌগোলিক যোগাযোগও রইলনা, ফলে ইবন্ সৌদ প্যালেষ্টাইন সমস্যা ব্যাপারে আগ্রহ হারালেন। তিনি বুঝলেন যে সৌদী আরবকে একরাজ্য না করলে, সেটাও ইউরোপীয় শক্তিরা ভাগাভাগি করে নেবে।

ইংরেজ-রক্ষিত রাজ্য তখন সৌদের চতুর্দিকে।

* রুশ গুপ্তচর বিম্ ফিলবীর বাবা।

উত্তরে প্যালেস্টাইন, জর্দন ও ইরাক, দক্ষিণে এডেন (এখন ইয়েমেন) ও মস্কট, পূর্বে পারশ্য উপসাগরের যতেক আমীর ও কুয়েৎ, পশ্চিমে হেজাজ প্রদেশ যার রাজা মক্কার শরীফ। ইসলাম ধর্মে রাজা, বাদশা বা আমীরে কোন স্থান নেই তবু এরা ইংরেজ শক্তির সহায়তায় যে যার দেশে কায়েম হয়ে আছেন। ইংরেজ বহু আগে সৌদকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছে যে মক্কার শরীফ বা তার হেজাজ প্রদেশ আক্রমণ করা বিধেয় হবে না।

মক্কার পূর্বে খুর্মা মরুস্থান। এখানকার অধিবাসীরা শরীফের শাসনের ঘোর বিরোধী। এরা সৌদের কাছে আবেদন পাঠালো আমাদের রক্ষে কর। আবেদনটা সৌদ পরামর্শ সভায় বিবেচনা করছেন এমন সময় এই সংবাদটা ইখ্‌ওয়ানদের উপনিবেশে পৌঁছে গেল।

ইখ্‌ওয়ান মানে ভ্রাতৃসংঘ। যে সব বেদুইন লুটতরাজ ছেড়ে স্থায়ীভাবে চাষবাস করছে, ওয়াহাবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ তাদের বলা হত ইখ্‌ওয়ান। এরা সৌদের কথায় ও নেতৃত্বে লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ ও আগুন দেওয়ার অভ্যাস ছেড়েছে কিন্তু প্রকৃতিটা বদলায় নি। ধর্মান্ধতা এদের অস্থি-মজ্জায়। কেউ ঠিক না, ওরাই ঠিক এই ধরণের ভাব। খুর্মার খবর তাদের বসতিতে পৌঁছল ফলাও হয়ে। মক্কার শরীফ এক ভুল চাল দিয়ে বসলেন; তার ছেলে আবদুল্লা (যিনি পরে জর্দনের রাজা হন) এক বিরাট সৈন্য দল নিয়ে খুরমার দিকে চল্লেন। সৌদ আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে খুর্মা অধিবাসীরা যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ চায় তাহলে তিনি তাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। লণ্ডনে বসে লর্ড কার্জন ও উপনিবেশ সেক্রেটারী চার্চিল ঠিক করলেন যে খুর্মা মরুস্থান মক্কার শরীফের এবং সে-সম্বন্ধে কিছু ভাবনা নেই। কারণ লরেন্স ওদের বুঝিয়েছিল শরীফের সৈন্যদল অপরাজেয়। লরেন্স জানতেন না যে পশ্চাদপসরণরত তুর্কী সৈন্যের পেছনে ধাওয়া করা আর যুদ্ধ করা এক জিনিষ নয়।

সৌদ একটা খবরে চম্‌কে উঠলেন। ইখ্‌ওয়ান যোদ্ধারা নাকি তাঁর হুকুমের অপেক্ষা না করেই যুদ্ধযাত্রা করতে চায়। এই সব হিংস্র মানুষকে ওয়াহাবী মোল্লারা ইতিমধ্যে ধর্মের নামে বক্তৃতা দিয়ে হিংস্রতর করেছে। সৌদ দেখলেন যে এরা যদি বিনা নেতৃত্বে খুর্মায় ঢোকে তাহলে একটী মানুষেরও মুণ্ড থাকবে না, একটী নারী অধর্ষিতা থাকবে না। তিনি কাল বিলম্ব না করে ক্ষিপ্রতম ঘোড়ায় চর মারফৎ হুকুম পাঠালেন, "খুর্মা আক্রমণ কর।"

এক বেলার যুদ্ধে আবদুল্লার বিপুল সৈন্যবাহিনী নস্যাৎ। আবদুল্লা কোনও ক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে বাপের কাছে মক্কায় পালিয়ে এলেন।

লণ্ডনে কার্জন সঝাঁঝে চার্চিলকে বল্লেন, "তুমি আর তোমার যুদ্ধের প্ল্যান।" চার্চিল রেগে লরেন্সকে বল্লেন, "এই বিপর্যয়ের জন্যে তুমিই দায়ী।" লরেন্স গম্ভীরভাবে বল্লেন, "ন্যালি-পোলির বিপর্যয়ের জন্যে তুমি দায়ী।"

এই জয়ের পর মক্কা জয় করা সৌদের পক্ষে সহজ কাজ। কিন্তু মক্কা ইংরেজের তাঁবে। একটা প্রদেশ ছিল যা ইংরেজের তাঁবে নয়। সেটা ছিল রশীদ বংশের হেইল রাজ্য। এটা রিয়াদ থেকে তিনশো মাইলের মরুপথ। সৌদ চল্লেন; তার সংগে চল্ল কয়েকটা পুরোণো তুর্কী কামান।

হেইল দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত সহর। চতুর্দিকে উন্নত প্রাকার। সৌদের সৈন্য সহর ঘিরে অপেক্ষা করতে লাগল। আক্রমণের কথা উঠলে সৌদ শুধু ভুরু কুঁচ্‌কে বলেন, "পরে।" তিন সপ্তাহ গেল। ইখ্‌ওয়ান যোদ্ধারা অস্থির। প্রতি দুর্গের দুর্গেশকে ঘুষ দেওয়া প্রস্তাব ব্যর্থ হল। ওদিকে সহরবাসীরা দুর্গেশদের ওপর চোটপাট করতে আরম্ভ করলো কারণ তাদের স্বাভাবিক জীবনের গতি রুদ্ধ। শেষে এক দুর্গেশ দরজা খুলে দিলো। রশীদী রাজত্বের শেষ।

এবার সৌদ দেখালেন সুশাসন কাকে বলে। প্রথমেই মসজিদে নমাজের পর তিনি ঘোষণা করলেন যে লুট করলেই কোতল, সে সৈন্য হোক আর নাগরিক হোক। তার সৈন্যদের সমস্ত খাদ্য ক্ষুধার্ত প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করলেন, রশীদ পরিবারকে রাজধানী রিয়াদে পাঠালেন রাজকীয় অতিথি হিসেবে। রশীদী সৈন্যবাহিনীর দু'জন অধিনায়ককে তিনি সৌদী বাহিনীতে নিলেন। যে দুর্গেশরা সৌদের ঘুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পদোন্নতির হুকুম দিলেন। মৃত রশীদের প্রধান বিধবাকে বিবাহ করে তার সবকটী অনাথ সন্তানকে আইনতঃ নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনার পর স্থানীয় বিরোধিতা বলে আর কিছু রইল না। শেখ এবং ওলেমাদের এক সভা ডাকা হল। সেই সভায় বৃদ্ধ পিতার সামনে তাকে "সুলতান আবদুল আজিজ" বলে ঘোষণা করা হল।

এই সময় এক কেলেংকারী হয়ে গেল। ইখ্‌ওয়ানদের ১৫ হাজার যোদ্ধা সৌদের অনুমতি না নিয়ে চল্‌লো জর্দন রাজ্য আক্রমণ করতে। কারণ তারা ওয়াহাবী নয়। রাজধানী আমানের কুড়ি মাইল দক্ষিণে একটা গ্রামে ঢুকে ইখ্‌ওয়ান যোদ্ধারা আবালবৃদ্ধবণিতাকে কাটলো, তারপর তাদের বাসস্থানে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। মুহূর্তে আকাশ অন্ধকার করে এল ইংরেজের যুদ্ধ বিমান; তাদের গুলির আঘাতে ১৫ হাজারের পনেরোজন জীবন্ত ফিরে এলো। জীবন্তরা অনুতাপ দেখালো, প্রাণভিক্ষা চাইলো। সৌদ শুধু বল্লেন, "তোমরা বেঁচে থাকবে ঠিকই, তবে কারাগারে।" ব্রিটীশ সরকার পাঠালেন স্যার পার্সি কক্সকে সৌদের সংগে কূটনৈতিক আলোচনার জন্যে।

১৯২১-এ পূর্বভাগে ওকেয়ার সহরে সৌদ ও কক্স এর সাক্ষাৎ হল। এই আলোচনার সময় একজন নিউজীল্যাণ্ডার ঐ অঞ্চলে শিবির গেড়ে ছিলেন তার নাম মেজর ফ্যাংক্ হোম্‌স্। ইনি বছরে দু' হাজার পাউণ্ডের বদলে সারা সৌদী আরবে পেট্রোল অনুসন্ধানের ইজেরা পেলেন।

মেজর হোম্‌স্ ছিলেন এক আমেরিকার কোম্পানীর প্রতিনিধি। এই হচ্ছে সৌদী আরবের তৈল শক্তির গোড়ার কথা।

১৯২৩-এ ব্রিটিশ বৈদেশিক দপ্তর থেকে ইবন সৌদ ও মক্কার শরীফকে বলা হল যে ব্রিটেন আর ভাতা দিতে পারবে না। শরীফ ভয়ে কুঁচকে গেলেন। সৌদ খুসী কারণ ভাতা না পেলে ব্রিটেনকে জবাব দিহি করতে হবে আর শরীফ ইংরেজের সামরিক সাহায্যও পাবে না। ১৯২৪-এ মহানায়ক কেমাল আতাতুর্ক খলিফার পদ বিলুপ্ত করলেন। মোসায়েবদের উৎসাহে বৃদ্ধ শরীফ নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। ইসলামে এটা সম্ভব নয়; সারা মুসলমান জগতে বিতৃষ্ণার বন্যা বয়ে গেল।

শরীফের শাসনে মক্কার তীর্থ যাত্রীদের দুর্দশার অশেষ হ'ত। তুর্কী শাসনে বেদুইনদের ঘুষ দিয়ে ঠাণ্ডা রাখা হ'ত যাতে তারা তীর্থযাত্রীদের লুট না করে; জেদ্দা বন্দর থেকে মক্কা ও সেখান থেকে মদিনা যাওয়া শরীফের রাজত্বে এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। বাঁচলে বাবার ভাগ্যি, মরলে বেহেস্ত্ এই ভাবনা নিয়ে তীর্থযাত্রীরা হজ করত। রোগভোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। শেষ অবধি জলের ওপর কর ধার্য হল। ইসলাম জগতে শরীফকে ঠগীদের রক্ষক বলে বিবেচনা করা হত।

এই সময় সৌদ মক্কা আক্রমণ করলে তীর্থযাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। কিন্তু সৌদ তখন অসুস্থ। তার মুখ ফুলে ঢোল, একটা চোখ প্রায়ান্ধ, জ্বর প্রচণ্ড। তার হাকিমদের ওষুধে রোগ আর রোগী দুইই নিকেশ হবার দাখিল। শেষে মিশরের এক আধুনিক ডাক্তারকে আনা হল। তাঁর মতে সৌদ ভয়ঙ্কর রকমের ইরিসিপ্লাস্ অর্থাৎ মুখের প্রদাহ রোগে ভুগছেন। চিকিৎসায় রোগের একটু উপশম হলে তিনি রাজ্যের ওলেমা, শেখ, সমর-নায়ক আর মান্যগণ্যদের এক খোলা সভা আহ্বান করে বল্লেন, "শরীফের পাপের ও প্রশাসনিক অক্ষমতার ফিরিস্তি তৈরী করে বিশ্বের সমস্ত মুসলমান রাজ্যগুলোতে পাঠানো হোক তারপর আমরা ওয়াহাবীরা মক্কা অভিযান করব।" আবেদনটায় সই করলেন সৌদের ছেলে ফৈজল (যিনি পরে রাজা হন)। মুসলমান রাজ্যগুলো গা করলো না তবে ইংরেজের তাগিদে ভারতের ৭ কোটী মুসলমানদের নেতারা—সৌদের পরিকল্পনায় সমর্থন জানালেন। ইংরেজ তখন শরীফের বিরুদ্ধে।

ইখ্‌ওয়ান যোদ্ধারা চল্ল মক্কার দিকে হাজারে হাজারে। পনেরো দিন পরে তারা এল তায়েফে। শরীফের সৈন্যদল পালাল। তারপর আরম্ভ হল ইখ্‌ওয়ানদের লুট আর নরহত্যা। ওয়াহাবীদের কাছে যে মুসলমান ওয়াহাবী না সে মালাউন, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ। এমন কি ওলেমা ও মৌলানারাও। মস্‌জিদের ভেতরেই তাদের কাটা হল। মসজিদে বা তার ভেতরে কোনও কবরের ওপর পেয়াজের আকারে গম্বুজ থাকলে সেটা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হল। খবর শুনে বিরাট পুরুষ সৌদ শিশুর মতন

কাঁদতে আরম্ভ করলেন; দ্রুতগামী উটের পিঠে সেনানায়কদের হুকুমনামা পাঠালেন যে লুণ্ঠনকারী বা নরহত্যাকারীদের ধরলেই কোতল করবে। তারপর অসুস্থ অবস্থায় তিনি চল্লেন তার স্থায়ী সৈন্যদল নিয়ে মক্কায়। তিনি জানতেন তায়েফ্ এর পরে মক্কা আক্রান্ত হবে। ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৪ সালে ইবন সৌদ জয় গৌরবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তার পরণে তীর্থযাত্রীর বস্ত্র, (সাদা থান, সাদা চাদর), নগ্ন পদ। হজ যাত্রীদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, "তোমার খেদমতে হাজির—আল্লা—তোমার খেদমতে হাজির।" তারপর আভূমি আনত হয়ে সৌদের রাজাধিরাজ নমাজ পড়তে লাগলেন। বিপুল জনতা ও সৈন্যদল তার সংগে নমাজে যোগ দিলেন। তখন খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সৌদী আরব এক ধর্মরাজ্য পাশে বাঁধা।

[এই রচনার কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য শ্রীহট্টের 'যুগভেরী' প্রতিনিধি জনাব মহম্মদ আজিজুর রহমান স্বয়ং সৌদী আরবে গিয়ে লেখককে প্রচুর সাহায্য করেছেন। জঃ সঃ]

জয়শ্রী প্রকাশন-এর

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০
ও ৩য় খণ্ড ১৩·৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ৩·৫০

Netaji Through German lens :
Nanda Mookerjee Rs 20·00

Vivekananda's influence on
Subhas Nanda Mookjee
Rs 6·00

NETAJI SPEAKS ; Volume One
A collection of speeches & writings
5·00

রামমোহন : ভারতের সাম্যিক চিন্তার সূচনা
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬·০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ
অনিল রায় ৬·০০

বাংলাদেশের বিপ্লব : সুনীল দাস ১·২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান : অনিল রায় ২·০০

২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

স্মৃতিকথন

ধারাবাহিক রচনা

কিস্তি-৫

সে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

১৯২২ সালের মাঝামাঝি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সুভাষচন্দ্র সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে তখন একদিকে অবসাদ, সঙ্গে সঙ্গে দলাদলি। কয়েকটি আগ্রহী যুবককে সঙ্গে নিয়ে সুভাষচন্দ্র গঠন করলেন দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি। এ-সমিতির সঙ্গে রইল একটি পাঠাগার ও লাইব্রেরী, তাঁতশালা, চরকাকাটা শিক্ষাদেবার কেন্দ্র, ঘরে ঘরে চরকা ও তুলো জমা দিয়ে কাটুনীদের কাছ থেকে মূল্য দিয়ে সুতো সংগ্রহের ব্যবস্থাও করা হল।

আর একটি করলেন অনাথ আশ্রম। যে সব ছেলের কেউ নেই, গরীব বাপ-মা যাদের ভরণ-পোষণে অক্ষম—এমন কয়েকটি ছেলে নিয়ে এক আবাসিক আশ্রম গড়ে তোলা হল, এক ভাড়া করা বাড়ীতে। সেখানেই ছেলেদের বাস হল। এদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে। ছেলেদের ব্যায়াম-চর্চা, খেলাধূলো, মানসিক গঠন, হাতের কাজ শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হল।

এ সব সুরু করার পরই সেবার উত্তর বঙ্গে হ'ল প্রবল বন্যা। পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর—সবক'টি জেলাতেই বড় বড় নদীগুলি বন্যার জলে ভাসিয়ে নিল গ্রামের পর গ্রাম, রেল-লাইন দুমড়ে ভেঙ্গে গেল,, শত শত ঘরবাড়ী ভেসে গেল, মানুষ ও জন্তুর ভাসমান মৃতদেহে চারিদিকের জল বিষাক্ত আবহাওয়ার দুর্গন্ধে ত্রাণকার্য করাও হল দুঃসাধ্য।

কলকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গঠন করলেন বন্যাত্রাণসমিতি। অন্ন, বস্ত্র, অর্থের জন্য সারা দেশে আবেদন জানাতেই নানা প্রান্ত থেকে নানারূপ সাহায্য আসতে থাকল।

সহরের পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা দলে দলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাপড়-জামা-শাড়ী-ধুতি, চাল-ডাল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে আচার্যদেবের বিজ্ঞান গবেষণাগারে, সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজে জমা দিতে লাগলেন।

বোম্বাই, আমেদাবাদ থেকে মিল-মালিকরা গাঁট গাঁট নতুন শাড়ী, ধুতি পাঠাতে লাগল, অর্থ সাহায্যও প্রচুর এল দেশের নানা প্রান্ত থেকে।

দু'মাসের মধ্যে সংগৃহীত হল পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা। দানের তবু বিরতি নেই। বস্তুত যেসব দেশবাসী এতদিন নানা কারণে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নি। তাঁরা যেন নিজ নিজ অপরাধ মোচনের জন্যই আর্ত দেশবাসীর ত্রাণে অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন।

এসব খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও অর্থ সুষ্ঠু বিতরণের জন্য চাই বিচক্ষণ অধিনায়ক আর দলে দলে সেবাব্রতী স্বেচ্ছাসেবক। এ ছাড়া চাই বহু চিকিৎসক। ঔষধ, পথ্যাদি। গবাদি গৃহপালিত পশুর জন্যও চাই প্রচুর খাদ্য, ওষুধ ও যোগ্য চিকিৎসক। এছাড়া যে সব গরীব গ্রামবাসীর সর্বস্ব গেছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহনির্মাণের পূর্ণ ব্যবস্থা, নষ্ট শিল্প পুনরায় চালু করবার জন্য শুধু অর্থ দান নয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও বিতরণের সুশৃংখল সংস্থান।

ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের সুব্যবস্থাসাধনে ব্রতী হয়েছেন বেঙ্গল কেমিক্যালের তদানীন্তন পরিচালক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়।

কিন্তু প্লাবিত অঞ্চলের বিপন্নদের সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে কে?

এ কাজে ডাক পড়ল সুভাষচন্দ্রের।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তাঁর পুত্র জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সমাজ-সেবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্ত-দেশবাসীদের ত্রাণকাজ ও সমাজসেবা, দেশসেবারই নামান্তর। এ কাজে সুভাষের চেয়ে যোগ্যব্যক্তি আর কে আছে?

এদিকে সুভাষচন্দ্র ত' জেলে বসেই নিজ কর্তব্য স্থির করে এসেছেন। দেশবন্ধু মুক্তি পেলে তাঁর নির্দেশিত কাজ করা চলবে। আপাততঃ, দলাদলি নয়—গঠনমূলক কাজ, সমাজসেবা, যুব-সংঘ গঠন, ছাত্র-সমিতি গঠনে মন দেবেন তিনি।

আহ্বান করলেন নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মেলন। সভাপতি ডঃ মেঘনাদ সাহা। সারা বাঙ্গলার প্রতি জেলা থেকে প্রতিনিধি পাঠাবার আবেদন জানালেন পত্র-পত্রিকা মারফৎ। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সময়োচিত যুব-সমিতি গঠন করতে হবে, প্রতি জেলায়, মহকুমায়, গঞ্জে, গ্রামে গ্রামে। তার আদর্শ ও কর্মধারা নির্ণয়ের জন্যই সম্মেলন আহ্বান।

অধিবেশন বসল আর্যসমাজ হলে. কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে, বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রাবাসের পাশেই।

ভাষণ দিলেন ডঃ মেঘনাদ। ছাত্র ও যুবকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের প্রয়োজনীয়তা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পল্লীগুলির স্বাস্থ্য-উন্নয়নে যুবকদের সম্মিলিত প্রয়াস, সাধারণ দেশবাসীর অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, ছায়াচিত্র, বক্তৃতা ও আলোচনা—সভার ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ কাজের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানা ইঙ্গিত দিয়ে ডঃ সাহা দেশের যুবক-দলকে নিজ নিজ অঞ্চলে সংঘ গঠনের আহ্বান জানালেন।

প্রস্তাবিত সংঘগুলি গঠিত হলে, সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশনে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় সম্মেলনের আদর্শ, নিয়মাবলী ও কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে, স্থির হল।

এর পরই এল উত্তরবঙ্গের আহ্বান। আর্ত-ত্রাণ সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র সান্তাহারে গেলেন সুভাষচন্দ্র।

বন্যা-প্লাবিত বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মকেন্দ্র স্থাপন, রুগ্নদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও সেবাকেন্দ্র গঠন। এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় স্বেচ্ছাব্রতী নিয়োগ, কর্মের প্রণালী শিক্ষণ ও কেন্দ্রের ভার অর্পণ ও সাহায্য-দ্রব্যাদির সুসম বণ্টন ও বিতরণের ব্যবস্থা সাধনের জন্য।

বগুড়া ও রাজসাহী, উত্তরবঙ্গের দুইজেলার সঙ্গমে সান্তাহার। স্টেসনের এক পাশে রাজসাহী আর একপাশে বগুড়া জেলা। স্টেসনটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত, উন্মুক্ত জমিও অনেক।

ঐ বিস্তৃত উন্নত-জমিতে ত্রাণকেন্দ্রের বিরাট তাঁবু। ঐ তাঁবুতে মূল কার্যালয়। কলকাতা-কেন্দ্র থেকে নিত্য-আগত ওয়াগন ভর্তি বিভিন্নপ্রকার মাল খালাস করে প্রাথমিক পর্যায়ে এইখানে জমা করে। খাতাপত্রে হিসেব মিলিয়ে বিভিন্ন সেবা ও ত্রাণকেন্দ্রের কর্মীদের কাছে প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণ মত পাঠানোই মূল কেন্দ্রের প্রধান কাজ। এ কাজ প্রত্যহ চলে অবিরাম, সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। কলকাতা থেকে যেমন, বিভিন্ন প্রদেশের নানা অঞ্চল থেকেও মিটার গেজ ও ব্রডগেজ—দুলাইনের নানা ট্রেনে সারা দিনে, সারা রাতে—আসচে স্বেচ্ছা কর্মী, বন্যাক্লিষ্ট নরনারী, ব্যাধিগ্রস্তের দল, আসছে নানারূপ ত্রাণসামগ্রী।

এ সবের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করা চাই, নতুবা মাল জমে যায়, কাজ অসমাপ্ত থাকে, নানারূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

কাজ হাতে নিয়ে সুভাষচন্দ্র দেখলেন কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ বড় সহজ নয়। ইতিমধ্যেই ত্রাণকার্যে যোগদানের জন্য দলে দলে যুবক, প্রৌঢ়—বাঙ্গলা-দেশের নানা শহর থেকে ত' বটেই, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রদেশ থেকেও আসা সুরু করেছে।

বন্যা-প্লাবনের পূর্বে যুব-সম্মেলন আহ্বান এবং সেখানে গৃহীত নানা প্রস্তাব, সেবাকার্যে আত্ম-নিয়োগের আকাঙ্খা যুবকদের মধ্যে বৃদ্ধি করেছে; দলে দলে যুবকদের শান্তাহারে আগমনের সেও অন্যতম কারণ হতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ যুবকই কলকাতা ও বড় বড় সহরের অধিবাসী। বন্যা-প্লাবিত গ্রাম সম্বন্ধে এদের কোনও ধারণা নেই; গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও নয়। অথচ প্রথম উৎসাহে যারা এগিয়ে এসেছে, তাদের সম্মুখে নানা বাধা ও অসুবিধের দৃশ্য তুলে ধরে এদের নতুন উৎসাহ নষ্ট করা সঙ্গত মনে না হওয়া, সুভাষচন্দ্র এদের প্রায় প্রত্যেক দলকেই মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেরূপ আশংকা করা গিয়েছিল, ফলও হল তদ্রূপ। দু'তিন দিন পর

পরই ছেলেরা মফঃস্বল থেকে ফিরে আসতে থাকল সান্তাহারে। কেউ হয়ত সত্যিই অসুস্থ, কারো বা খাদ্য মনোমত নয়, কারো বা থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা আপত্তি।

ফলে, এরা স্ব স্ব ইচ্ছায় ও নিজ নিজ আগ্রহেই বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা গোপন রেখে, ফিরে আসবার কৈফিয়ৎ স্বরূপ নানা কল্প-কাহিনী প্রচার করে।

এ ছাড়া ছিল রাজনৈতিক সমস্যা। বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কিশোর-যুবকের দল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিয়ে জেল খেটে ফিরে আসে। তারা মুক্তি পাবার পর পরই আর্ত-ত্রাণের জন্য উত্তর বঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন হয়। ঐ জেলখাটা যুবকেরাও ওদিকে চলে যায়। বিভিন্ন-দলের নায়কগণও সান্তাহার যাতায়াত সুরু করেন এবং তাদের ছেলেরা কোথায়, কেমন আছে এবং তারা কেমন কাজ করছে, তা পর্যবেক্ষণের নামে নানা কেন্দ্রে ঘুরে সহরে ফিরে এসে নিজ নিজ ইচ্ছা ও মতানুযায়ী অভিমত প্রকাশ সুরু করলেন।

এর ফলে একদিকে ত্রাণকার্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও কর্মীদলের মধ্যেও অসন্তোষ বৃদ্ধি অনিবার্য হল।

স্থানীয় যুবককর্মীরা সদ্য-আগত শহুরে 'বাবুদের' আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় ত' বটেই, পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহারের তারতম্য দেখেও বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করতে লাগল :

ক্রমশঃ এ সব অসন্তোষের সংবাদ সুভাষচন্দ্রের কাছেও পৌঁছতে লাগল। এজন্য মাঝে মাঝেই কর্মীদের এক কেন্দ্র থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করাও অনিবার্য হল। তাতে ফল হল বিপরীত—অসন্তোষ কমল না।

এত অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কাজের অগ্রগতি অব্যাহত রইল।

বন্যার জল শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে পানীয়জলের ও খাদ্যের অভাব, অন্যদিকে রোগাক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল।

ত্রাণকার্যের সুরুতেই সান্তাহারে স্থানীয় উচ্চ-বিদ্যালয়-গৃহে হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে আছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রদল। মফঃস্বলের বিভিন্ন ত্রাণকেন্দ্র থেকে আগত রোগীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা সাধনের ভার ঐ সব মেডিকেল ছাত্রদের উপর অর্পিত। স্থায়ী আবাসিক রোগী ছাড়া, নিত্য দু'বেলা বহিরাগত আর্তের সংখ্যাও নিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সব দুঃস্থ, অসহায়, দরিদ্র পল্লীবাসীকে শুধু ওষুধ দিলেই চলে না। পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থাও করতে হয়। এজন্য চাই নানারূপ পথ্য, দুধ, রুটি, ফল, বার্লি, সাবু, বিস্কুট, ভাল ভাল টনিক।

এ সবেরই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হল হাসপাতালে। কলকাতা ও মফঃস্বলের বহুদর্শী, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিত পরিদর্শনে আসেন, ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও উৎসাহদানের জন্য।

এইভাবে সান্তাহার হয়ে উঠলো আর্তত্রাণ,

সমাজ-সেবা তথা দেশ-সেবার এক বিরাট কর্ম-যজ্ঞশালা। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের একান্ত কর্ম-কুশলতায় এই বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠলো। দেশের নানা প্রান্ত থেকে দলে দলে জননায়ক ও সমাজ-সেবীগণ এই নবতম তীর্থদর্শনে প্রত্যহ যাওয়া-আসা করতে থাকলেন—এই রেল স্টেসনের পুণ্য সঙ্গমে।

এইভাবে সেপ্টেম্বর মাস শেষ হল, অক্টোবরও যায় যায়।

ইতিমধ্যে দেশবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন; নানাস্থানে কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতাও দিয়েছেন।

সান্তাহারের কাছাকাছি এক সহরেও জন-সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—জাতীয় আন্দোলনের বর্তমান অবসাদ ও অনিশ্চয়তা অধিকদিন চললে তার ফল হবে ভয়াবহ। যে সব যুবক 'এক বছরে স্বরাজ' লাভের আশ্বাসে নানা অত্যাচার সহ্য করেছে, কারাগমন করেছে, এখন তারা কি করবে, তা সত্বর নির্দ্ধারণ করা দরকার। তা না হলে যুবকদল অসহযোগ আন্দোলন ও নেতৃদলের হাতের বাইরে চলে যাবে—এবং নিজেরাই নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করে নেবে। এর ফল শুভ হবে না।

সুতরাং সত্বর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দেশবাসীর স্তিমিত উৎসাহ পুনরুজ্জীবিত ও নতুন কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

দেশবন্ধুর কারামুক্তির পূর্বেই শ্যামসুন্দরবাবু এবং অন্যান্য অনেকেরই মুক্তি হয়েছে। কংগ্রেসের কর্মধারা পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী তাঁরা। মহাত্মাজীর নির্দেশিত পথ ধরে চললেই দেশের মুক্তি সম্ভব—আর্থিক মুক্তির জন্য চরকা-কাটা, খদ্দর তৈরী ও ব্যবহার, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, মাদক বর্জন, গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ ও সালিশীকেন্দ্র গঠন, চলতি আইন-আদালত বর্জন, স্কুল কলেজ বর্জন ইত্যাদি। এ ছাড়া হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী, অচ্ছুৎ ও অনুন্নতদের জলচল, মন্দির প্রবেশের অধিকার প্রদান ইত্যাদি ত' আছেই।

শ্যামসুন্দরবাবু (দেশবন্ধুর কারাদণ্ডে প্রাদেশিক কংগ্রেসের মনোনীত সভাপতি) সাধারণের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভের জন্য জেলায় জেলায় জনসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করলেন।

এইরূপ এক সভা হল যশোহরে। অন্যান্য জেলায় সদ্যমুক্ত অনেক কর্মী এতে যোগ দিলেন।

উদ্দেশ্য দেশবন্ধু মুক্তি পাবার পূর্বেই জনমত গান্ধীপন্থীদের অনুকূল করা।

তখন দেশবন্ধুর অনুগতদের মধ্যে সুভাষবাবু মুক্তি পেয়েছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন জেলার আরও কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তখনও জনসাধারণের কাছে তেমন পরিচিত ন'ন।

বাধ্য হয়ে সুভাষবাবুকেই পরিবর্তনপন্থীদের পক্ষে এ-সভায় যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল।

রাজনৈতিক সভায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

বক্তৃতা করা সুভাষচন্দ্রের এই যশোহর সম্মেলনেই সর্বপ্রথম।

সহসা অসুস্থতার জন্য শ্যামসুন্দরবাবু যশোহরে উপস্থিত থেকেও সভায় যোগদান করতে পারেন নি। তাঁর পরিবর্তে সভাপতিত্ব করেন বরিশালের শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। বক্তা হিসেবে তখন শরৎবাবু খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে তিনি বরিশালের কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। নানা জেলার অনেকেই আন্দোলনে যোগ দেন।

যশোহর সম্মেলনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন এই শরৎবাবু। গান্ধীজী অনুসৃত আন্দোলনের নানা দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে ভারতের ইহকাল ও পরকালের সর্ববিধ মুক্তিই সম্ভব ঐ এক নির্জলা গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ প্রস্তাব অনুসরণে—অন্য কিছুতেই তা নয়।

বলা বাহুল্য, সুভাষবাবু এই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রতিবাদে জানালেন,—রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক মুক্তিকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না—পন্থার পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর উভয়পক্ষের আরও কয়েকজন বক্তৃতা দিতেই সভার নির্দিষ্ট সময় অতীত হবার উপক্রম হল—উপস্থিত ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল ঝড় ও বৃষ্টি—সভায় আর কোনও কাজ হল না—বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সবাই ট্রেন ধরতে ছুটলেন স্টেসনের দিকে।

বিরোধীদলের এই আন্দোলন প্রতিরোধ করে দেশবন্ধু মৃত্যুর পরই দেশের নতুন পরিস্থিতিতে আন্দোলনের প্রকৃতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন।

ক্রমশঃ উভয়দলের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠলো, কোন কোনও স্থানে (যেমন বরিশালে) এই দলাদলি ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হওয়ায় আন্দোলন পঙ্কিল হয়ে উঠলো। আর কংগ্রেসের পর স্বরাজ্য-দল গঠন, কর্পোরেশনে নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের জয়, দেশবন্ধুর মেয়র নির্বাচন এবং পরবর্তী প্রত্যেক নির্বাচনেই স্বরাজ্যদলের অকুতোভয় সংগ্রাম ও জয়লাভের ফলে বিরোধীদলের কেউ কেউ কংগ্রেস ত্যাগ করলেন (যেমন, শ্যামসুন্দরবাবু) অন্য কেউ সন্ন্যাসী হলেন, (যেমন শরৎ ঘোষ মহাশয়), আর কোন কোনও গোষ্ঠী খাদি উৎপাদন, চরকা প্রচলন ইত্যাদি নিয়েই রইলেন (যেমন অভয় আশ্রম, খাদি মণ্ডল, খাদি কেন্দ্র ইত্যাদি)

কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধ সুরু হয়েছিল ১৯২১ সালের শেষে, চৌরীচৌরা হত্যা ও বার্দোলী সিদ্ধান্তের পর—বিচ্ছেদ হয়ে গেল ১৯২৩ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর—বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন-সভা ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন-শেষে স্বরাজ্য-দলের গরিষ্ঠসংখ্যক প্রতিনিধি জয়ী হবার পর।

(ক্রমশঃ)

ছোটগল্প

"কেরাণী দেখবি—ঐ ছাখ"

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তারের বয়স বেশী নয়। বেশ সুন্দর চেহারা। এই ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি ডাক্তারের চেহারাই বেশ ভাল। বাংলায় যাকে বলে একসাইজ-ফিগার। অনেকক্ষণ ধরে হাত দিয়ে টিপে টিপে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে প্রশ্নের মেলা বসিয়ে দিল। সেই ততক্ষণ ডাক্তারের পেশীবহুল হাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সুকুমার বসে বসে টুকটাক উত্তর দিতে লাগল আর দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট কাগজে ছাপা বাণী পড়তে লাগল। দেশ এগিয়ে চলেছে, কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই, গরীবদের বাঁচান, নেশাভাঙ বন্ধ করুন, নিয়মানুবর্তিতা শুধু রেলেই নয় আপনার জন্যেও ইত্যাদি ইত্যাদি। সুকুমারের একটা লেখা দেখে প্রথম প্রথম খুব মজা লাগত সেটা হচ্ছে "যাদু একটাই" বলে চারটে পয়েন্ট দেওয়া আছে। তাহলে "যাদু চারটিই" বলা না কেন। তারপরে অনেকদিন হয়ে গেছে, সুকুমারের আর মজা লাগে না লেখাটা পড়ে। ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি করেন?" সুকুমার একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে ডাক্তার আবার বুঝিয়ে বলল, "মানে আপনার সোর্স অফ ইনকাম কি? চাকরি না ব্যবসা?" সুকুমার ব্যস্ত হয়ে বলে ফেলল, "চাকরি করি।" ডাক্তার শুনে একটু মুচকি হাসল। বোধ হয় ডাক্তার বুঝতে পেরে গেছে যে সুকুমার বেরাণী। সেই রকম আধা বিদ্রুপের হাসি এক লহমার জন্যে তার মুখে চোখে খেলে গেল। সুকুমারের মনে পড়ল সত্যজিত রায়ের ছবি জন-অরণ্যের কথা, সেই ছবির সুকুমারও এই ডাক্তারের মত একমুখ বিদ্রূপ নিয়ে সোমনাথকে বলেছিল, "এই ক্যারাণী দেখবি, ঐ ছাখ।" ঐ দৃশ্যে সুকুমারের খুব ব্যথা লেগেছিল মনে। মানে ঠিক ব্যথা নয়, যেন অনুচ্চারণীয় বেদনা, ও জানে যে ও কেরাণী ছাড়া আর কিছু হতে পারবে না। কিন্তু ফট্ করে মুখের ওপর একদলা থুথু ছোঁড়ার মত "এই ক্যারাণী দেখবি, ঐ ছাখ" সহ্য করা শক্ত হয়ে ওঠে। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে 'কি-আর করা যাবে' এই মনোভাব নিয়ে থুথু মুছে ফেলা ছাড়া সুকুমাররা আর কিই বা করবে। "ক্লার্কের কাজ করেন না?" ডাক্তারের কথাগুলো খুব সাধারণ-ভাবেই নির্মম হয়ে ওঠে সুকুমারের কাছে। অথচ ওর কিছুই করবার নেই, শুধু ভাবতে থাকে, "আমি ক্লার্ক কি না, জেনে ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ের কি সুবিধে হবে?" ডাক্তারের বোধহয় সুকুমারের

মনোভাব বুঝতে অসুবিধে নেই। বোধহয় এইরকম অনেক পেশেন্ট তার এসেছে। তাই প্রশ্নের কারণ ক্লিয়ার করার জন্যেই বললে, 'ঘাড় গুঁজে দশটা-পাঁচটা করার জন্যেই এটা বেশী হয়। বিশেষতঃ ক্লার্কদের বেশী। আমরা দেখছি তো।" সুকুমার দুর্বলভাবে ঘাড় নাড়ল। বুঝেছে। কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। ডাক্তার এক্সপ্লেন করতে লাগলে: "রোগের নাম হচ্ছে সারভাইক্যাল স্পনডিলোসিস। এই ঘাড়ের কাছে যে হাড়গুলো আছে তাতে হয় কি, মেদ জমে। তাই ব্যথা করে। তারপরে হাড়গুলো বেঁকে গিয়ে মুখটা বাঁকিয়ে দিতে পারে। তাই আগে থাকতেই সাবধান হওয়া উচিত। আপনার সেই ব্যাপারটা ঘটতে চলেছে তাই— আপনাকে এই বেল্ট পরতে হবে এ্যারাউণ্ড ইয়োর নেক।" সুকুমার হাঁ করে কথাগুলো শুনতে লাগল। তার প্রথমেই পোষা কুকুরের কথা মনে পড়ল। নেকব্যাণ্ড লাগানো। ডাক্তার এক নাগাড়ে বলতে লাগল, "আপনার প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে। তা আর কি করা যাবে। আমি দেখেছি ইদানীং রোগটা, ডোণ্ট মাইণ্ড, ক্লার্কদেরই বেশী হচ্ছে। কারণটা কি আমি ঠিক জানি না। বোধহয় দশটা-পাঁচটা ঘাড় গুঁজে কাজ করার জন্যে। অবশ্য অন্য কারণেও হতে পারে। তবে সব সময় ঘাড় গুঁজে থাকবেন না, মাঝে ঘাড় তুলে সোজা করবেন। আপনি অবশ্য বলতে পারেন, দেশে এ্যাতো লক্ষ লক্ষ কেরাণী, সবায়েরই কি আর হচ্ছে; না তা নয়, আমি বলতে চাইছি কি, আমি যতগুলো এই ট্রিটমেণ্ট করলাম, তাদের ভেতরে ক্যারাণীর সংখ্যাই বেশী।"

এরপরে ডাক্তার সুকুমারকে ওষুধপত্তর দিয়ে ছেড়ে দিল। বেল্ট পরার দিন পরের সিটিং এ বলে দেবে বলল। আউটডোর থেকে বেরিয়ে সুকুমার রোদ্দুর, ধুলো, ভীড়, বাসের বিক্ষিপ্ত টিকিট, ট্র্যাফিক-জ্যাম, অব্যবস্থা, সব পেরিয়ে যখন আপিস পৌঁছলো তখন তার বেশ দেরী হয়ে গেছে। অবশ্য কালকে বড়বাবুকে বলে গিয়েছিল যেন লেট মার্ক না করে। বড়বাবু বলেছিল, "আমি না হয় না করলাম, কিন্তু সেনসায়েব যদি এ্যাটেনডেন্স খাতা চায় তাহলে আমার কিছু করার থাকে না কিন্তু।" "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই. তবু দেখবেন"—সুকুমার রিকোয়েষ্ট করেছিল। মানে ব্যাপারটা হয়েছে কি আমি ডাক্তার দেখাতে যাবোতো, আউটডোরে, একটু লেট হতেই পারে। মানে আমাদের তো আর বাইরে ট্রিটমেণ্ট করা সম্ভব নয়। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে টানাটানির সংসার—"সুকুমার একটু করুণ রস উদ্রেক করতে গিয়েছিল। তবে এই করুণ রসগুলো আজকাল আর বেশী উতরায় না। এই ভাবেই সবাই-ই টানাটানির সংসার করছে, আপিস করছে। সেনসায়েবদের কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে রিকোয়েস্ট করছে। সেন সায়েবদের কেরাণী সুকুমার চিনে উঠতে পারে না। সেন সায়েবরা খুব ডিসিপ্লিন মানে। ঝকঝকে গাড়ী কিংবা অফিসের বাসে করে প্রত্যহ ঠিক সময়ে অফিসে

আসে। এরা নিজেরা র‍্যাশন তোলে, কয়লা কেনে অথবা ছেলের বেবিফুডের জন্যে লাইন দেয় কিনা সুকুমার জানে না। এরা দশটা-পাঁচটার পরেও অনেকক্ষণ নিজেদের চেম্বারে বসে কি সব গুরুতর কাজ করে। এদের ছোটখাট কোন পেটি কমপ্লেন নেই। তাই এরা পেটি কমপ্লেন সহ্যও করে না। পেটি কারণে লেট হলে, এ্যাবসেণ্ট হলে খুব রেগে যায়। ঠিক পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত অফিসারদের মতই শো'কজ, মেমোরাণ্ডাম ইস্যু করে। পার্সোন্যাল ফাইলে রিমার্কস্ লেখে। কি লেখে কে জানে! অফিসারদের, সেন সায়েবদের ব্রহ্মাস্ত্র থেকে সুকুমার খুব এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু কি করবে, ঘাড়ে এখন সারভাইক্যাল স্পন্ডিলোসিস। এততেও সুকুমারের হাসি পেল। বেশ কড়া নাম একখানা। চেয়ারে গিয়ে বসতেই কারু নামক সাবস্টাফটি এসে খবর দিল, আপনাকে সেন সায়েব এলেই দেখা করতে বলেছেন।" সুকুমার হক্‌চকিয়ে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে প্রশ্ন করল, "কি আপনি বলেন নি?" বড়বাবু চোখ দিয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ বলেছি।" তারপর ভ্রু কুঁচকে, ঠোঁট উল্টে ইসারায় বলল "কেন ডাকছে কে জানে?" একটু থমকালো সুকুমার। জল খেলো। গেলাসে প্লাষ্টিকের ফুল আঁকা ঢাকনি ঢাকা দিল। তারপর এ্যাটেনডেন্স খাতা খোঁজ করতে গিয়ে দেখল, সেটা নেই। তাহলে বোধ হয় সেন সায়েবের ঘরেই খাতা চলে গেছে। তাহলে কি লেট মার্ক পড়েছে? আজকাল নিয়ম হয়েছে কেরাণীদের সায়েস্তা করার জন্য তিনটে লেটে একটা ছুটি কাটা। সুকুমারের মনে পড়ল না কটা লেট তার এই মাসে হয়েছে। কেরাণীগুলো বড় বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল; এ্যাখন Employer মওকা পেয়েছে শোধ তোলার। এখন নাও ঠেলা সামলাও। সুকুমার ভয় পেয়ে রেগে যেতে লাগল। প্লাইউডের দরজা ঠেলে সেন-সায়েবদের ঘরে ঢুকতে হয়। ঢুকেই দেখতে হয়, সেন-সায়েবরা খুব ব্যস্ত হয়ে টেলিফোনে কথা বলছে, নয়তো ফাইল খুলে পেন্সিল বা বলপয়েন্ট হাতে টিকিং করছে। অর্থাৎ তুমি ঢুকলেই তোমার সঙ্গে কথা বলছে না, বা দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখাচ্ছে না। অথচ সেন-সায়েবদের দেখে সুকুমাররা দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখালে খুব খুশী হয়। ঘাড় দুলিয়ে ছোট্ট 'নড' করে প্লাইউডের ওপাশে মিলিয়ে যায়। সুকুমার দরজা খুলে দেখল সেন-সায়েব মাথা নীচু করে ফাইল খুলে কি যেন করছেন। অফিসারদের ব্যাপার সুকুমার বোঝেও না, বোঝার চেষ্টাও করে না। চোখ দুটো একটু তুলে সুকুমারকে সেন-সায়েব দাঁড়াতে বলল, না বসতে বলল; সুকুমার বুঝতে পারল না।

বিনবিন করে অল্প একটু আওয়াজ আসছে এয়ার কণ্ডিসনের যন্ত্র থেকে। সুকুমার বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই রইল। তখন সেন ফাইল বন্ধ করে বল্ল, "কি হয়েছে আপনার, শুনলাম আউটডোরে দেখাতে গিয়েছিলেন।" এদের আপনি বলার মধ্যে পরিষ্কার তুমি কিংবা তুচ্ছার্থে তুই বলার টেণ্ডেন্সি থাকে, এটা সুকুমার মার্ক করেছে। সুকুমার কি যেন বলতে গেল, কিন্তু গলায় সর্দি জমে রয়েছে বলে কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেল। তাই গলা ঝেড়ে পরিষ্কার নীচু গলায় বলল, ডাক্তারবাবু বললেন সারভাইক্যাল স্পনডিলোসিস। ঘাড়ের হারগুলোতে চর্বি জমে গিয়ে

নাকি এই রোগ হয়।" সেন-সায়েব বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়লেন। "যাই হোক"—সেন বলল—"আপনাকে আজকে আমি লেটমার্ক করলাম না।" যেন অত্যন্ত কৃতার্থ করছেন এমন একটা সুর তার গলা দিয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। "কিন্তু আর লেট করবেন না।" সুকুমার দেখল তার অসুখের জন্যে সেন-সায়েবের কোন সহানুভূতিই নেই। সেন আবার বলল, "যা দিনকাল পড়েছে, ঠিক হয়ে চলুন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা ডিসিপ্লিন আনার চেষ্টা করছি আমরা। তবে অসুখের কথা আলাদা; তবুও জানিয়ে রাখছি, লেট করবেন না। আপনার এই মাসে আরও একদিন লেট ছিল দেখছি কেন?" সুকুমার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেছে। আমতা আমতা করে বলল, "মানে একটা বাসে বড় রিস্ক নিয়ে ঝুলে ঝুলে আসছিলাম, তাই মাঝ পথে নেমে পড়তে বাধ্য হই। নেক্স্ট বাসে আসতে গিয়ে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল।" সুকুমার বুঝতে পারল তার কথাটা সত্য হলেও সেন-সায়েবরা অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাস করে না। তাই শুনে সেন-সায়েব আবার ফাইল খুলে বলল, "এ্যাটেনডেন্স খাতায় সই করে যান, আর এ ধরণের একস্কিউজগুলো দেবেন না। আপনারা যদি তাই করেন তাহলে আমাদের ষ্টেপ নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। আসতে পারেন।" সুকুমার বাইরে এসে তার নির্দিষ্ট সীটে বসল। তারপরে আর এক গ্লাস জল খেয়ে কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে লাগল ঘাড় গুঁজে। ঘাড়ের ব্যথাটা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। তবু সুকুমার ভয়ে ভয়ে ঘাড় তুলল না। ঘাড়ে চেন বেঁধে কুকুরের মত না হয় ঘুরবে। সারভাইক্যাল স্পন্ডিলোসিস। কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। অমরনাথ, লেজার ক্লার্ক, কাকে যেন বলছে সুকুমার কাজ করতে করতে শুনলো, "ব্যাটারা আমাদের খাটিয়ে প্রফিট মারবে ডবল, production বাড়াবে, মাইনে কমাবে, বোনাস চোট্ করবে। ব্যাটারা বাজারে এক তেল আর টেলিভিসন ছাড়া কোন কিছুর দাম নামালো না, এদিকে D. A. কেটে বাদ দিল মাইনে থেকে। কি না, দাম কমেছে। কোথায় কমেছে বলুন দেখি। বাজার-টাজার করেন তো, ও বড়বাবু!" বড়বাবু ধুতির খুঁটে চশমা মুছে ধীর গলায় বলল, "কি আর করবে ভায়া সহ্য করে যাও আর বিশ্বাস করে যাও। না চেঁচিয়ে কাজ কর দিকি।" সুকুমারের খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল অমরনাথের রাগী মুখটা, কিন্তু দেখল না। চোখাচোখি হলেই অমরনাথ তার কথার সমর্থন চাইবে। সুকুমার এতশত বোঝে না, আর বোঝার সাহসও করে না। এখন কিছু পেটি সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন তুলে মালিকরা মুনাফা লুটছে কি লুটছে না এই সব ভাবাও উচিৎ নয়। কম কথা বেশী কাজ। সুকুমার মাথা নীচু করে কাজ করছে। তার ঘাড়ে সারভাইক্যাল স্পনডিলোসিস। ওর গলায় কয়েকদিন পরেই বকলস লাগানো হবে।

[১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

…কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন-কি ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল-আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে।" ঐ, পৃ—৬০৬।

"....তার (কুমুর) এই দিনরাত্রির মন্ত্রটি ছিল—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বাম্
অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হ সি
দেব সোঢ়ুম [গীতা, ১১।৪৪]॥

"হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত করে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন করে সখাকে, প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি করে সইতে পার।

তুমি যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য করতে পার তার প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি। কুমু চোখ বুঁজে মনে মনে তাঁকে ডেকে বলে,—তুমি তো বলেছ 'যে মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে, সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করিনে।' [গীতা, ৬।৩০] এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।"

…মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে, ওকি কাজ করছে, না, ওর আঙুলের গতি আশ্রয় করে ওর মন চলে যাচ্ছে কোন্ এক তীর্থের পথে?…কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চলেছে।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হ সি দেব সোঢ়ুম[৪] ॥"

ঐ, পৃ—৬১৮-১৯।

"ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না।"

কবির যে-বাণী উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের আরম্ভ, কবির ব্যক্তিগত জীবনে যে তা সত্য, ১৮৮৭০ সাল থেকে ১৯৩৪ (৪০), সাল* পর্যন্ত ভগবদ্‌গীতার ভাব, শ্লোক-উদ্ধৃতি ও তার ব্যাখ্যান এবং সুচিন্তিত গভীর মন্তব্য পড়ে—তাতে আর সংশয় থাকে না।

কবির ব্যক্তিগত জীবনে যা সত্য, পৃথিবীর বহু মনীষী ও সাধক-সাধিকার জীবনে আজও তা সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

সর্বংসহা ধরণীর মত আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় সেই অনামা শৌর্যস্থৈর্যধারিণী "যোগাযোগ"-এর কুমুদিনীর মত মহীয়সী, ঐ খৃষ্ট-উপাসিকা নারীর জীবনেও তা সত্য হয়েছে।

তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আমার প্রবন্ধ সমাপ্ত করলাম।

পাদটীকা

১. …সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে—বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন।

—'তপোবন' শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী ১১শ পৃঃ ৬০৫ (১৩১৬-১৯০৯)।

২. ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে কি ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের রসগ্রহীতাদের কাছে বলা বাহুল্য। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠ করিয়া উত্তেজিত হইয়া কনিষ্ঠের কাছে আসিয়া বলেন—"রবি, দেখেছ! দেখেছ! বঙ্কিম বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে উড়িয়ে দিয়েছেন .." ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়া চলিয়াছেন: "একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আভীর-সম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপকভাবে পৃথিবীর নানাস্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্য-বৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেই সমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতা রূপে ছিল, আর্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণ-কথা রূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল।

আর্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতম সংযোগ ঘটিয়াছে।" পৃ: ১৬০-১।

৩. কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি; ভগবদ্গীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য, এই যুদ্ধের ধর্ম, ঘোষিত হয়েছে—সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমানকালে কৃষ্ণা যাঁকে স্মরণ করেছিলেন বলে তাঁর লজ্জা রক্ষা হয়েছিল, যে কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যই পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞ।

—'জাভাযাত্রীর পত্র'—রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম, পৃ-৬২১ (১৯২৭)।

"এই আশ্চর্য দ্বন্দ্বই হচ্ছে মানুষের জীবন। সেইজন্যই গীতা বলেন, কাজ করে যান, লড়াই করে যান, তার পরে ফল যা হয়—তা হবে। বস্তুত উপস্থিত ফলটা কিছুই নয়—কাজের দ্বারা কাজ থেকে মুক্তিলাভটাই হচ্ছে চরম সিদ্ধি। এই তো আমার ফিলজফি।"—'স্মৃতি', (ফাল্গুন, ১৩১৪, ১৯০৮) পৃ-৬৯।

"রবীন্দ্রনাথকে এই সময় আমি জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধ করব আমরা কী দিয়ে? হিংসা দিয়ে, না অহিংসা দিয়ে? তিনি উত্তর দেন: "গীতার অর্জুনের মতো,"—'রবীন্দ্রনাথ'—অন্নদাশংকর রায়, পৃ-৫৩ (১৯৩৯-৪০)।

বহু পূর্বে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রচিত 'রাজর্ষি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।" বিল্বনঠাকুর কহিলেন,

"এ কোনো কাজের কথাই নহে।"—রাজা কহিলেন,

"আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেইজন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য-পরিত্যাগের জন্য এ-সকল ভগবানের আদেশ।" বিল্বন কহিলেন, "এ কখনোই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর তোমার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যতদিন রাজকার্য নিঃসঙ্কট ছিল ততদিন তোমার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছ, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি স্বাধীন হইতে চাহিতেছ এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছ।" কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "মনে করো-না ঠাকুর, আমার পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন, "যদি সত্য তাহাই ঘটে তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, "আপন ভাইয়ের রক্তপাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন, "কর্তব্যের কাছে ভাই-বন্ধু কেহই নাই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন।"

—'রাজর্ষি', রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম, পৃঃ-১৮০।

১৯৩৪ সালের জুনমাসে 'চার অধ্যায়'-এ কবি লিখেছেন: [ইন্দ্রনাথ বলছেন] "শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে।"

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র অতীন বলছেন: "রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও।" 'চার অধ্যায়', রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম, পৃ-৮৮৬, ৯১২।

৪. এখানে লক্ষণীয়: দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ, উভয়েই রবীন্দ্রসাহিত্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য লাভ করেছেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে*, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজর্ষি উপন্যাসে, কবি যৌবনে যা শুরু করেছিলেন, ১৯৩৩ (৪০) সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছেন।

* ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কবি লিখিয়াছেন: "বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল দক্ষিণপবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল, উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহ শোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র;—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল;—বাঁশি কী বলিতেছে—তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না—এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।"*— 'জয়পরাজয়', গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্র রচনাবলী ৭ম, পৃ-১৩০।

কবির মৃত্যুর একমাস আগে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছের আর একটি গল্প থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করি। যাতে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, আর বর্ণনা আছে, স্বদেশীযুগের সেইসব মৃত্যুঞ্জয় বিপ্লবীর যাদের হাতে থাকতো ভগবদ্‌গীতা এবং কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত।

বর্ণনা আছে এমন এক দুঃসাহসী মহীয়সী বাঙালী গৃহস্থ বধূর যিনি পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের গৃহিণী হয়েও সংগোপনে প্রাণপণে বিপ্লবীর সহায়তা করে চলেছেন।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই কিন্তু পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রগাঢ়!

ইন্‌স্পেক্টর বিজয় স্বদেশী ডাকাত অনিলকে গ্রেপ্তার করবার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, আর তাঁর আদরের স্ত্রী 'সন্থ' তাঁর কাছেই সমস্ত খবর সংগ্রহ করে, সেই গুপ্ত খবরই ডাকাত অনিলকে সরবরাহ করছেন। বিজয়ের অবর্তমানে অনিল তাঁরই গৃহে অতিথি।

সন্থ বলছেন:

"সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুঁড়। লোকে বলবে না সতী,

বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সতুর কপালে। আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমর বুঝতে পারবে।"

"তোমার মুখে ওরকম কথা আমি ঢের শুনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনই চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার তাই শুনি আর হাভানা চুরুট টানি।"

"যাই হোক না কেন আমি জানি আমি যা-ই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ পুরুষ মানুষের লক্ষণ, যেন শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। মিথ্যা স্তব করবনা—পুলিসের কাজে তোমার খবরদারীর শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সবসময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এই জন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।"

"সতু, আর কেন, পেটভরে যা বলবার সে তো বলে গেলে, এখন তোমার ঐ কুকুরটাকে খাওয়াতে যাও; বড্ড চেঁচাচ্ছে, ও আমাকে ঘুমোতে দেবেনা। আমি ভাবছি আমাকে এবার ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে।"

...অমাবস্যার রাত, একটা বেজেছে। পায়ের জুতো-খোলা ছুটো একটা লোক অন্ধকারে নিঃশব্দে এদিকে ওদিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবু মন্দিরের দরজার কাছে। একজন চুপিচুপি তাঁকে ইশারা করে ডাকলে, আস্তে আস্তে বললে,

"সেই ঠাকুরুণটি আজ মন্দিরের মধ্যে এসেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারো চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর শুনেছি নটরাজের সঙ্গে তাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। হুজুর আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকরুণের গায়ে হাত দিতে পারব না, এমন কি চোখে দেখতেও পারব না—এ বলে রাখছি। আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।" একে একে তারা সবাই চলে গেল। নিঃশব্দ, বিজয়বাবু যত বড় একেলে লোক হোন না কেন, ...তাঁর বুক দুরদুর করছে তখন। দরজার কাছ থেকে মেয়েলী গলার গুনগুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—

"ধ্যায়েন্ নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং—"

বিজয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন কী করা যায়। একসময়ে সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা, ভাঙা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড়হাত করে বসে, আর অনিল একপাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্ত্রীকে দেখে সাহস হোল মনে, বললেন—"সতু, অবশেষে তোমার এই কাজ!" "হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে, যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেব বলেই আজ এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পুরুষ, দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এইসব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি, তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি।.....প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এরপরে হয়তো আর সময় পাব না।"

সতুর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল,

"বিজয়বাবু আজ আমি ধরা দেব বলেই স্থির করে এসেছিলুম। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।...

...ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে।...আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোন ফাঁক নেই, আছে কেবল্ আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া।

...ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুরঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরুন। আর আমি অন্যদিক থেকে পুলিসের হাতে এখুনি ধরা দিচ্ছি। এই সঙ্গে একটি কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবি ঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ—"আমারে বাঁধিবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?' হঠাৎ গেয়ে উঠল—বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থরথর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে।...

"এই গান অনেকবার গেয়েছি, আবার গাইব, তারপরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে' যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরদিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হই"।

'বদনাম'—গল্পগুচ্ছ, পৃ-৭৪৮-৫০, প্রথম প্রকাশ, প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ়।

With Best Compliments of :

M/s. D. D. Chopra & Co.
Private Limited

ইচ্ছা-কলম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার মাস

গর্মি বাতাস। ফুঁসতে ফুঁসতে অবশ করে দিয়ে যাচ্ছে হলকা বাতাস। পা কামড়ে, গাছবৃক্ষ বেড় দিয়ে, একা ফাঁকা ট্রামের সড়ক ধুইয়ে ধুইয়ে চলেছে—তারাঘর পাতাল রেল মীনাবাজার গোল চক কাছারি বাড়ি—চলেছে তো চলেইছে……থামো এবার! এ পথ ওপথ, ট্রাফিক থাম পেঁচিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল, গর্মি বাতাস। সরিয়ে নিলুম হাত। আর আমার ছায়া নেই কিছুর পরে। জলস্তাকড়া বুলিয়ে নেয়া সার রাস্তা লোহালকড়ি দোকানবাড়ি—সব লেপাপোঁছা, ভেতরবার জনমানুষ কিচ্ছু নেই—শাদা আগুনরঙের মধ্যে ঝমঝম করছে শুধু গাছভর্তি পাতার ধারানি।

পাতা ঢাল হয়ে ছড়িয়ে গেল চাঁদোয়ার মতো। বাড়ির জঙ্গলের নিচে হারিয়ে আছে শুঁয়ো, ডানা-বোজা জলফরিঙ পাখি। সেই যে ভোরের কুঁড়ো মুখে মেখে খুঁসে বসেছিল দু কলি মনপোড়ানি, এখন কানচল বেয়ে ফুটছে তার শব্দআভা—এক মিনিট দু মিনিট…আবার খুইয়ে বসেছে সব।

শাদা আগুন রঙ, শুধু কুয়াশাস্তূপ তাপ। এক-চুলের ভুলে যে হলে ফলসামাছি, কুঁড়ির রসে চুবোন দিয়ে গা মেজে দাঁড়িয়েছে এসে—জামপাতার ফেরি-নৌকো কখন ভেসে আসবে সুখবাতাসে, সেই অপেক্ষায়—এমনি করে ভরা বেলা পুইয়ে গেল, বিকেলের শেষপ্রান্তের পাড় কামড়ে উঠেছে এতবড় কালো তীক্ষ্ণ একটা তারা—বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে শন্‌শন্ করে উঠল দমফাটা নিশ্বাস…

আবার সব ভেসে উঠেছে—মোটা থ্যাবড়া আঙুল-কর, শিরাটানাটানা হাতদুটো, একশো পা নিশ্‌পিশ্ করে চলে উঠল শুঁয়ো, ফড়িঙের ডানা খুলে গেছে—আর টেলিগ্রাফ তার বেয়ে কলকে ডালের ডগায় ঝাঁপিয়ে এসেছে সেই তারা। আরো আসবে? মাথার ঢেউ শান্ত করে, কপালের ছ্যাঁকা দাগের ওপর দিয়ে ঘুরছে তার নরম আঙুল—চোখের মণি মগজ কশেরু বেয়ে ধাপ ধাপ কেবলই নামছে রাত, অঘোর রাত… ঢঙ ঢঙ ঢঙ ঢঙ—আমার নীল শিসের পেন্সিল সচকিতে জেগে উঠল স্বপ্ন ফুরিয়ে।

হল সময়? বেরিয়ে এসে দেখি এপার ওপার ঝাঁক বেঁধে উড়ছে খালি তারা আর তারা, ঘড়িপেটানো নিযুতির শিশির কখন সবজে করে দিয়ে গেছে বেল ফুলের গন্ধ ..

রবীন্দ্র-পুরস্কৃত

শ্রীনেপাল মজুমদার ও শ্রীহুসান জাভিতেল রবীন্দ্র-পুরস্কার পেলেন ১৩৮৪র রবীন্দ্র-পক্ষে। হুসানের গ্রন্থ-বিষয় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, সর্বদেশীয় বিনিময় প্রকল্পের সূত্রে ইউনেস্‌কো-র প্রকাশনা। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বসে এই চেকোস্লোভাক-

বাঙালি ভদ্রলোক বাঙলা লেখার স্মৃতি আস্বাদ করেছেন একান্তে, পৌর্বাপর্যে সাজিয়েছেন তাঁর ব্যাখ্যাবিবরণ, ভাবতে সুখ হয়। দূর থেকে কিছুদিন শুনছি এই বইয়ের কথা, এবার হয়তো হাতে ধরে দেখতে পাব, সেই সুযোগ হল।

আসলে জানেন যাঁরা জানেন তত ব্যবধানের মানুষ নন হুসান, ষাট দশকের গোড়ায় অনেকেই তাঁকে দেখেছেন এখানকার পথে-ঘাটে-পাড়ায়, বাঙালি সংস্কারের মধ্যে। মৈমনসিংহ গীতিকার উপর লেখা তাঁর বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেপে বের করেছিলেন সেই সময়।

হয়তো অনেকের জানা নেই আরো একটু তাঁর ইচ্ছা ছিল। কেবল লোকবৃত্ত নয়, এদেশি কবিতায় তাঁর টান ছিল, বিশেষ চেয়েছিলেন আধুনিক চেকোস্লোভাক কবিদের একটি সংগ্রহ বাঙালি কবিতা পড়ুয়াদের হাতে আসুক। ইচ্ছামাত্র নয়, স্বযত্নে বেছে, মূল থেকে তার সম্ভাব্য ইংরেজি বেঁধে, ভূমিকা লিখে, কবিদের পরিচয় সাজিয়ে তিনি পাঠিয়েছিলেন এদেশি বন্ধুদের কাছে — ভিতেস্লাভ নেস্ভাল, ভ্লাদিমীর হোলান, মিরোস্লাভ হোলুব, য়িরী গ্রুশা — এই রকম একবিংশতি কবি, তখনকার পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর থেকে সাতাশ-আটাশ বছরের নতুন অবধি কবির কবিতা — তখনো তাঁর অনেক কবিই চেক্ ভাষার বাইরে বেরিয়ে ইংরেজির প্রসার-আনুকূল্য পান নি। সেই পাণ্ডুলিপি দেখবার ভাগ্য হয়েছিল একসময়—টাইপ-হরফের ফাঁকে ফাঁকে হুসানের ব্যগ্র বাঙলা হাতের লেখা। বেরোয় নি সে বই।

তাঁর সবচেয়ে অগ্রবর্তী ভিতেস্লাভ নেস্ভালের দুটি লিরিকের পাঠ একটু শোনাই

জ্যৈষ্ঠ '৮৫—৭

দীর্ঘশ্বাস

হলুদ পাতা ঝরে পড়ল তাঁবুর ওপর,
বনঋতুর মধ্যে আমার খোলা কানাত।
শরৎ এসে পা রেখেছে, শূন্য নীড়ে নীড়ে চাপা দুঃখশ্বাস।
বিষাদ যে বই পড়তে চেয়েছিলে তার পাতায় পাতায়।
নীড়, রমণী, দু চোখ ভরা বনলা রঙ।

ঘরখোয়ানি

শিস
বাজিয়ে চলেছে যেন কুঁড়ি খুলে যায় খুলে যায়,
শিস
মিলিয়ে গিয়েছে তুমি আরশি হারিয়ে বসে আছ,
আমি মাটি থেকে তুলে নিলুম আমার ছোটবেলা।

এ লেখা শুধুই নিঃসম্পর্ক কবির, তবু সংগ্রাহকের মনটুকু কি একেবারেই ছিঁড়ে রাখা যায় কবিতা থেকে?

নেপাল মজুমদারের দীর্ঘশ্রমিষ্ঠ গবেষণার বিষয় রবীন্দ্রনাথ, এবং একটু অ-তথাকথিত পরিপ্রেক্ষিত। 'বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক' 'সামগ্রিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে' 'তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে' রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনকালব্যাপী রচনা চিন্তা ও কর্ম-প্রচেষ্টার তাৎপর্য নির্ণয়—এই তাঁর সঙ্কল্প ছিল প্রথমাবধি। সমকালীন এ দেশি ও আন্তর্জাতিক তথ্য-বিবরণের পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন—রাজনীতি নেতার মূর্তিতে অবশ্যই নয়, কিন্তু তাঁর কবিতানাটকাদি শুদ্ধ সাহিত্যের মধ্য থেকেও বাস্তব আভাসপ্রতিভাস আহরণ করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্র-নাথের সারা জীবনের রাজনীতিরও ভূমিকা রয়ে গেছে, 'বর্ষশেষ' কবিতায় 'তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায়

কবির বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থাটি' অথবা 'প্রায়শ্চিত্ত'-'মুক্তধারা'-'অচলায়তনে' , গণবিদ্রোহের ইঙ্গিত বা সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থন যে রকম অ-দ্ব্যর্থ-সহ নেপালবাবু লিখেছিলেন তাতে তাঁর অরন্ধ্র প্রত্যয় ধরা পড়েছিল। আর সে একদিনের হঠাৎ ভাবনাও নয়। 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের পত্তন লেখকের ১৯৫২ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে, ১৯৫৭য় বিশদকৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি বসেছেন বিচার-পর্যালোচনায়, অতঃপর ১৯৬১ জুলাই মাসের মাঝামাঝি বেরোলো প্রথম খণ্ড, আর এই প্রস্তাব : 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। বর্তমান গ্রন্থখানি প্রথম খণ্ড। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন হইতে শুরু করিয়া ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান-কাল পর্যন্ত তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানায়ক-গণের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যাবলীর বিস্তারিত পরিচয় তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।' দীর্ঘ সতর বছর পর দেখা গেল দুই খণ্ড নয়, অন্যূন পাঁচ সুপ্রসর খণ্ডে বিস্তারিত হয়েছে নেপালবাবুর বক্তব্য, আর ভবিষ্য গবেষণাকারীদের প্রত্যাশান্বিত করে পঁচিশ বছরের লিপ্ত চর্চার সম্মান-পুরস্কার লাভ করেছেন।

কবি পলাতক

আর একটি ছোট বইয়ের কথা মনে হল এই সূত্রে, চিন্মোহন সেহানবিশ লেখক। প্রথমে বাঙলা প্রবন্ধ-রূপে, তারপর ইংরেজি পুস্তক আকারে 'Tagore and the World' নামে এই লেখা বেরিয়েছিল রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষেই, সুধীজনের অভিনিবেশও অর্জন করেছিল। বিশ্ব মানে ব্রহ্মাণ্ডবিশ্ব নয়, রবীন্দ্রনাথ এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব—দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে বহি-র্বিশ্বের দ্রুতবদলের প্রত্যেকটি মুখ্য অভিঘাত যে রবীন্দ্র-নাথ নিয়েছিলেন, এবং সেই কারণে লেখার তারিখটি আর সেই তারিখের ইতিহাসতথ্যটুকু বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-রচনার মূল্যায়ন কেবল অসম্পূর্ণ হয় না, ভুল হয়—এইটুকু প্রতিপাদ্য ছিল চিন্মোহনবাবুর। এই লেখায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জাতীয় দৃষ্টির রাজনৈতিক পাশটুকুমাত্রের উপর লক্ষ্য ছিল, নেপালবাবুর ব্যাপকতার সঙ্গে তফাত এর বেশি এর নয়।

দুটি বইয়েরই ঈষৎ পরিচয় পুনর্বিজ্ঞাপিত করলাম, পুরোনো পরিচিত লেখা জেনেও। গত ৯ মে '৭৮-এর স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের রবীন্দ্র-ক্রোড়পত্রে সুলেখা দাশ-গুপ্তার একটি পূর্বলেখ 'If I May Differ' নামে ইংরেজি করে ছাপা হয়েছে তাতে বিস্মরণপ্রবণ বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের ক্ষুব্ধ তীব্র সময়স্ফুলিঙ্গ রবীন্দ্রনাথ শান্ত ব্যঞ্জনীতে সমাপন করে এমন সূক্ষ্মসুন্দর পরমাদর্শের চর্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন যা তখনকার যোগ্য নয়, অপেক্ষা করতে পারত সুখের সময়ের। এই যে বিবরণ, কিংবা যে ভাষাবন্ধে এই বিবৃতি, আগের বই দুখানি দেখার পর দেখতে একটু বিস্ময় লাগে। সে নয় বাদ যাক। কিন্তু সশস্ত্র স্বাদেশিকতার আবেগকে রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ধৈর্য ছিল না বলে তাঁর? 'বিশ্বভারতী' কি 'আনন্দ-মঠে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফতোয়া? লেখিকা কি জেনে বিশ্বাস করে লিখেছেন : শয়ে শয়ে আত্মউৎসর্গ করতে লাগল তরুণ বিপ্লবীরা, আর পত্রল ছায়ার তলায় বসে রবীন্দ্রনাথ পড়ার ক্লাস নিতে লাগলেন? ইংরেজী ধারটুকুই উদ্ধৃত করি : 'While young terror-ists sacrificed their lives by the dozen,

Tagore held classes in the shade of leafy trees.'

এই রকম অভিযোগের একটা লোভনতা আছে। দায়িত্বহীনতাও আছে। সত্যি কি চলে গিয়েছিলেন ঐ ভাবে—জরথুশ্ত্রের প্রব্রজ্যাতেও নয়, কেবল আঁচ বাঁচাতে—শান্তি-নিকেতনে? অনুচিত প্রত্যাশা থেকেও আসে এই অভিযোগ। কবির কাছ থেকে আমরা চাইব দেশনেতার, রাজনীতিক স্বেচ্ছাসেবীর কর্ম? মিলটন বা ইয়েটসের হাতে বন্দুক উঠল না কেন, ব্লেক কেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন না ফরাসী বিপ্লবে—এমনি অভিযোগ অভিযোগ তো বটেই। কিন্তু নৈতিক মূল্য-বোধ বা সামাজিক অবধান, বা সর্বোপরি স্বদেশপ্রীতির শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের কোনোই সুদৃষ্টান্ত নেই এ কথাও চোখ বুজে বলতে ভাবতে হয়।

একেবারে শেষের দিকে সজনীকান্ত দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল, ছন্দোবদ্ধ রূপেই শুধু তা প্রকাশ পায় নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলাম। ... দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। আজ চেষ্টা করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না।' সবটুকু ইতিহাসই যে নষ্ট, তা হয়তো নয়। তবে কখনো কখনো কারো কথায় কারো লেখায় সন্দেহ হয়।

ছন্দোবদ্ধ রূপটুকুই বা অস্বীকার্য কিসে? তখন-কার দিনের যথেষ্ট অ-দক্ষিণবাদী কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, স্বদেশী আন্দোলনের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয় ভেদ করে যে বহু সঙ্গীত নিঃসৃত হতে লাগল তাতেও 'বাংলার শত শত নরনারী স্বদেশের জন্য সর্বত্যাগী হইতে সঙ্কল্প করিলেন।' আরো একটু অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর:

> স্বদেশীর আন্দোলন যখন জমিয়া উঠিয়াছিল তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে কোনো ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সর্বাধিক।

ছন্দ থাক। দেশনেতার জনসন্নিধি বলতে যা বোঝায়, বিরলবাসী কবির জীবন থেকে তারও ঈষৎ তথ্য— বহু জ্ঞাত-আলোচিত হলেও, বলতে ইচ্ছা হয়। যেমন 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতা। ২২ জুলাই ১৯০৪ শুক্রবার মিনার্ভা থিয়েটার-গৃহে অনুষ্ঠিত এই 'সভায় এত ভিড় হয় যে দরজা ভাঙার উপক্রম হইলে ঘোড়-সওয়ার পুলিস ভিড় সামলায় এবং বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত পুলিস সার্জেন্টের সঙ্গে মারামারি করেন।' দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড। 'ইহার পর শত শত বিমুখ ব্যক্তি'র সনির্বন্ধ আগ্রহে ন দিন পর পুনরায় কর্জন-থিয়েটার গৃহে টিকিট করে ঐ বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা করতে হয়। '১২০০ টিকিট ৪ ঘণ্টার মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছিল। বহু-সংখ্যক লোককে এবারও ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।' আর পাঠ শুনে 'শত শত শ্রোতা জাতীয়তার যে আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা সভাগৃহকে মৌন স্বদেশভক্তির উচ্ছ্বাসে অপূর্বভাবে

সঞ্জীব করিয়া তুলিয়াছিল।' দ্র. পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'স্বদেশী সমাজ'।

এ যদি প্রথমার্ধের ঘটনা হয়, দ্বিতীয়ার্ধ থেকেও আর একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করি। হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯৩১ সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলের সভায় রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন সভাপতিরূপে। তারপর সংবাদপত্রের বিবরণ এইরকম ঃ

> সেদিন কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে টাউন হলে যে সভা আহূত হইয়াছিল জনতার আধিক্যবশতঃ স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে অবশেষে ময়দানে দুই ভাগে যে সভা করিতে হইয়াছিল, সেরূপ জনতা সহরে ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তখন ভগ্নস্বাস্থ্য, বয়স সত্তর।

সশস্ত্র বিপ্লবের সন্ত্রাসবাদকে রবীন্দ্রনাথ উচিত আন্দোলন-পন্থা বলে অনুমোদন করেন নি, কেন করেন নি তার শত যুক্তি তিনি শতমুখে বলেছেন। তার কোনটিই কবিআদর্শজনিত নয়, অত্যন্ত বিজ্ঞ দূরদর্শী মানুষের সদ্‌যুক্তি। সেই সঙ্গে জীবনপণকারী তরুণ বিপ্লবীকেও তো তিনি নমস্য বিবেচনা করেছেন। মডারেট রাজনীতিকদের প্রতি পক্ষপাতও তাঁর ছিল না। নেপালবাবুর বই থেকেই কয়েকটি করে পংক্তি উদ্ধৃত করি ঃ

> ১. চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতিকে তিনি সমর্থন না করিলেও তাঁহাদের বলিষ্ঠ সংগ্রামশীলতার প্রতি তাঁহার একটা অন্তরের আকর্ষণ ছিল।
>
> ২. রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করিয়া জনসংযোগ ও পল্লীউন্নয়নমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের সাংগঠনিক প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রায় আজীবনই এই গুরুত্ব তিনি আরোপ করে এসেছেন। কিভাবে, কোন বিশদ পদ্ধতিতে—তার বহু বিবরণের মধ্যে একটি—সজনীকান্ত দাসের রবীন্দ্রালোচনা গ্রন্থের একটি অধ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ' উল্লেখ করি।

মৃত্যুর অল্পদিন মাত্র আগে ত্রিপুরী-প্রত্যাহৃত সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ দেশ-নায়করূপে রাজ-অভিষেক করেছিলেন ঃ 'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি।' এই হল সনাতন আর্যভারতীয় প্রথা—ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রপতির মহাভিষেক করতে হয় ঋষিকে, সেই অভিমন্ত্রণ-বৃত হয়ে রাজা পৃথিবীর অন্ত পর্যন্ত তাঁর জয় প্রসার করে নিয়ে যেতে পারেন।

আর, এই সুভাষচন্দ্র যদি সশস্ত্র বিপ্লবী না হন, তবে কে?

রোমান্টিক স্বদেশী

এবার বলি এক স্তবক রঙিন দেশগতার বৃত্তান্ত। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে যখন বিলিতি বর্জন করে দিশি জিনিস ব্যবহারের প্রবলানুরাগ জেগে উঠেছিল সর্বত্র, রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নিত্যকরধার্য লেখার কলমটি। বিলিতি কলম ছেড়ে গ্রাম্য খাগের কলম। এ বিষয়ে তাঁর কাছে লেখা একখানি চিঠি মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ছাপিয়েছিলেন কৃষ্ণকুমারের সঞ্জীবনী কাগজে, ২৯এ ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ এই তারিখে। নগেন্দ্রকুমার গুহরায় তাঁর 'মুক্তি সাধনায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই মূল্যবান চিঠিখানি পুনর্মুদ্রিত

করেছেন, বইখানি তত সুপ্রাপ্য নয় বিবেচনায় চিঠিখানি আমরা আরেকবার ছাপিয়ে দিচ্ছি ঃ

> যখন সাধ্যমত দেশী জিনিস ব্যবহারের সংকল্প আমার মনকে অধিকার করিল তখন কলম লইয়া মনে খটকা বাধিল। চিরদিন নিবওয়ালা কলমে লেখা অভ্যাস, অথচ নিব এদেশে প্রস্তুত হয় না। মনে করিলাম যদি সংকল্পের খাতিরে লেখা ব্যাপারে আমি অসুবিধা স্বীকার করি তবে সেটা আমার পক্ষে সাধনা স্বরূপ হইবে। এই মনে করিয়া আমি খাগড়ার কলমে লিখিব স্থির করিলাম ঃ খাগড়ার কলম আনাইয়া এক লাইন লিখিতেই দেখিলাম ইহার মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন লেশমাত্র নাই। এই কলম কাগজের উপর এমন মোলায়েমভাবে সরে যে লিখিয়া সুখ হয়। কাহারো ধারণা আছে ইহাতে ইংরাজী লেখা ভাল হয় না, আমি তো তাহার প্রমাণ পাই নাই। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার কলম দর্শন হইতে এই কলমে লিখিয়া এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে কলমটি বাজেয়াপ্ত করিয়া তিনি বাড়ি লইয়া গেলেন। এই কলমের আর একটি গুণ এই যে এরূপ লিপিবৃত্তিতে গৃহস্থ ব্যক্তির বিশেষ ক্লেশের কারণ হয় না—ইহার মূল্য এতই সামান্য। এরূপ কলমের ব্যবহার যে দেশ হইতে প্রায় লোপ পাইল ইহা নিতান্ত অনুকরণের ফলে।

এর পর, মনোরঞ্জন বাবু সংযোজন করেছেন ঃ 'মহাজন যেন গতঃ স পন্থা ভাবিয়া জগদীশচন্দ্রের অনুকরণে আমিও রবীন্দ্রনাথের একটি কলম অপহরণ (অবশ্য বলিয়া কহিয়া) করিলাম। খাগের কলমে লিখিয়া বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠল, বস্তুতঃ এরূপ আরামে অনেক দিন লিখি নাই।'

শুধুই বাল্যস্মৃতি? পুরোনো স্মৃতি, আত্মস্মৃতি নয়? মাটি থেকে তুলে নেওয়া নয় রিক্থ-শেকড়? এমন লঘু লেখার মধ্যে কি দেখতে চাওয়া যায় এতখানি?

প্রাক্তন বিপ্লবীর লোকান্তর

ঢাকা গেণ্ডারিয়া নিবাসী ৺রাধারমণ গুহর পুত্র রাঁচি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক প্রাক্তন বিপ্লবী অধ্যাপক হরিপদ গুহ সম্প্রতি অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন। তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী দল 'শ্রী সঙ্ঘে'র সদস্য ছিলেন। আমরা লোকান্তরিতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরিবার কল্যাণ

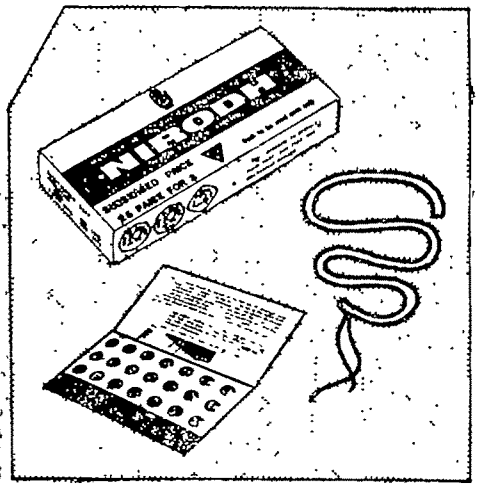

সেটা কী ?

পরিবার কল্যাণ মানে,
পরিবারকে সুখী ও সুস্থ রাখা।

কেন ?

প্রত্যেকটি সন্তান প্রসব করার পর মায়ের দেহ রক্তের পরিমাণ কমে যায়। বারবার সন্তান ধারণের ফলে রক্তের পরিমাণ আরও কমতে থাকে, তারপর একদিন তা মারাত্মক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কখন ?

বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকেই পরিবার কল্যাণের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিচার বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিলে আপনারা ও আপনাদের সন্তানরা সুখী হতে পারেন।

কেমন ক'রে ?

পরিবার কল্যাণের একাধিক পদ্ধতির যে কোনও একটি অবলম্বন ক'রে। বিবাহের পর হয় নিরোধ নয় বড়ী ব্যবহার করুন। একটি সন্তান হয়ে গেলে আই.ইউ ডি. ব্যবহার করুন। আর দুটি হয়ে গেলে নির্বীজকরণের জন্যে এগিয়ে আসুন।

পরিবার কল্যাণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপকরণ প্রভৃতির জন্যে নিকটতম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে খোঁজ নিন।

ছেলেই হ'ক বা মেয়েই হ'ক দুটিই আমার ভাল

davp 77/591

২০৯, বি, বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, এড্‌ভোকেট
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮·০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।
যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ
পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি
গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অষত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।
—অল ইণ্ডিয়া রেডিও
দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃঃ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

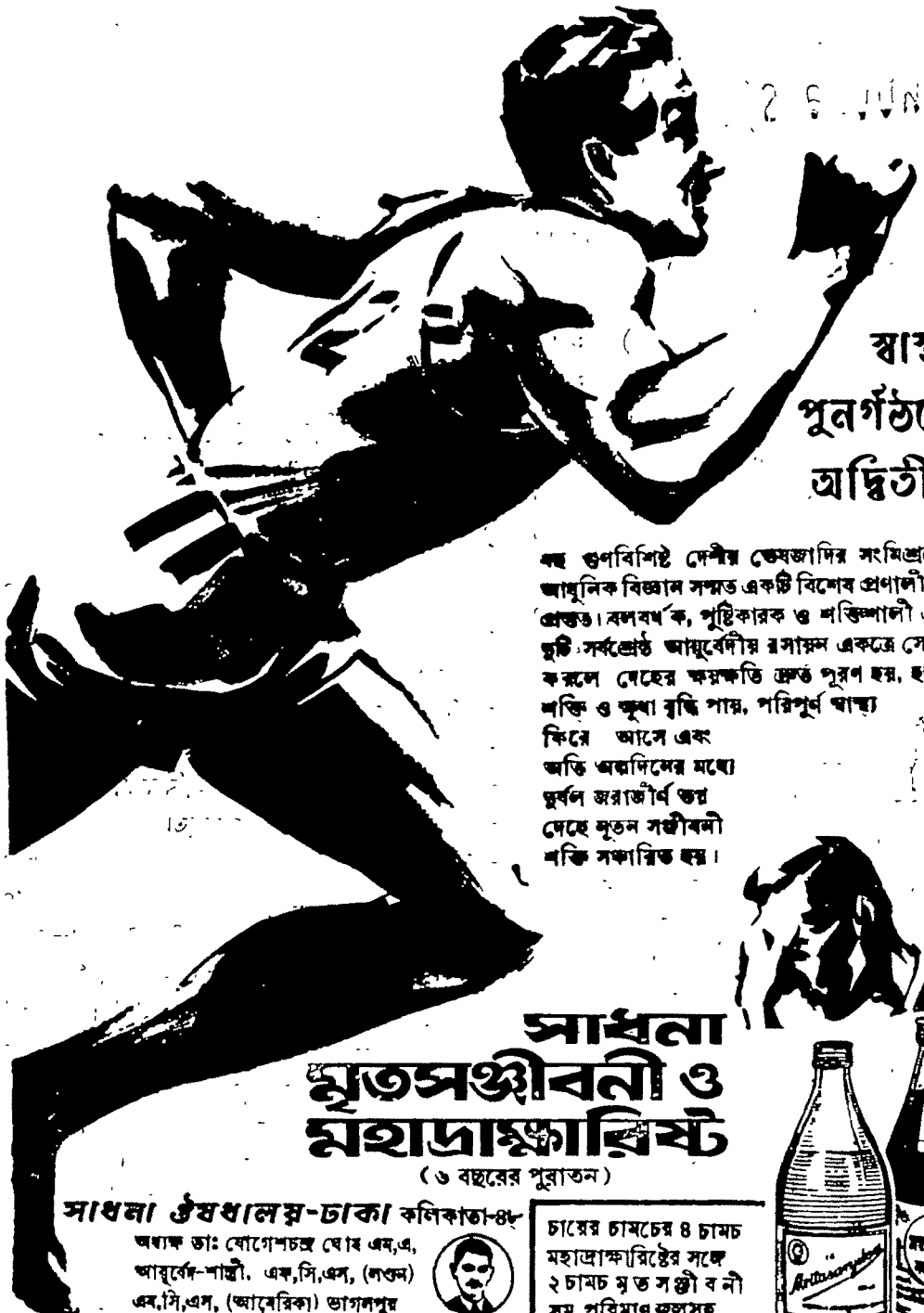

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ জীর্ণ দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/68

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Re. 1·00 with Regd. Postage Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

৪৩ বর্ষ : ১৩৮৫ : আষাঢ়

পুতুল

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা
লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন
(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২·৫০)

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ আষাঢ় । ১৩৮৫ ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ঝড়ের শেষ কোথায় ? ১৮৯

প্রবন্ধ

জাতীয় পর্যায় মজুরী আয় ও মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা ।। অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য ১৯৩

স্মৃতি-কথা : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ।। গোপাললাল সান্যাল ১৯৭

এশিয়ার রত্নমালা : ৫

আবদুল গাফফার খাঁন ।। নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ২০৫

স্মৃতি-চারণ

দিদিকে যেমন দেখেছি ।। সুলতা গুহচৌধুরী ২১৩

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের অষ্টম স্মৃতি-বার্ষিকী ২১৭

সমীক্ষা

ভাষা-বর্জন : নোঙরহীন নৌকা ২১৮

পুরানো-কাহিনী

ঢাকা শহরে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড : দিন-দুপুরে সশস্ত্র অভিযান ।। সুশীল মুখার্জি, অসিত ঘোষ, শান্তি বসু, সুকুমার দত্ত ২২১

ইচ্ছা-কলম ।। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩২

সম্পাদক : সুনীল দাস
প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

জয়শ্রী ॥ বৈশাখ ॥ ১৩৮৫

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা

নবতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিত

ভারতীয় ইতিহাস-চর্চায় অনন্য নাম আচার্য রমেশচন্দ্র । প্রতি ঘরে সঞ্চয়ের যোগ্য একটি অমূল্য সংখ্যা ।

এতে আছে : আচার্য রমেশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভিনসেন্ট স্মিথ, কীথ্, হপকিন্স, টমাস ও আরো অনেকের চিঠি ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, আচার্য রমেশচন্দ্রের সহপাঠি, অনুরাগী ও ইতিহাস-অধ্যাপকদের প্রবন্ধ ।

দাম : দশটাকা

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের এক বছর

অগণিত জনগণের স্বার্থরক্ষায় সরকারের কর্মোদ্যম

২১ জুন, ১৯৭৮—ঐ দিন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের একটি বছর পূর্ণ হয়েছে। এই এক বছরে রাজ্যের বহুবিধ সমস্যার মোকাবিলায় সরকার এক সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো—**গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিসাধন**। তাছাড়া, এই এক বছরে সরকার—

* **বর্গাদারদের স্বার্থ ও অধিকার** সুরক্ষিত করে আইন তৈরী করেছেন, বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করেছেন; গ্রামের দরিদ্র লোকদের বাস্তুজমি দিয়েছেন; ৪ একর পর্যন্ত সেচ-সুবিধাযুক্ত এবং ৬ একর পর্যন্ত সেচ-সুবিধাহীন জমির খাজনা রেহাই দিয়ে দরিদ্র কৃষকদের সহায়তা করেছেন।

* **পঞ্চায়েত নির্বাচন** করে, প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, উন্নয়ন-কর্মসূচীতে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন।

* **'ত্রাণের জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর** মাধ্যমে বহু গ্রামীণ বেকার কৃষকের কর্মসংস্থান ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করেছেন।

* **বেকারভাতা** দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কমপক্ষে দেড় লাখ বেকারকে।

* **শ্রমিকদের ন্যায্য সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এ** মদত দিয়েছেন।

* সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে **শিল্প-বিনিয়োগ** বাড়িয়েছেন; কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে **বন্ধ ও রুগ্ণ শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার** করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছেন; ৩৪.১৫ কোটি টাকার ৩১টি শিল্প-প্রকল্প রূপায়িত করেছেন।

* পরিকল্পনা-প্রকল্পে **গ্রামাঞ্চলে** ৩,২৭০টি **পানীয় জল** সরবরাহ করার নতুন উৎস এবং খরাত্রাণ কর্মসূচীতে ৮৯০টি উৎস তৈরী করিয়েছেন।

* **বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ নিয়মিত** করার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

* **শিক্ষাব্যবস্থাকে** সর্বস্তরে ঢেলে সাজিয়ে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সবরকম নৈরাজ্য দূরীকরণের প্রয়াস চালিয়েছেন।

* সবরকম **অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই** করেছেন এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মদত দিয়েছেন।

আত্মসন্তুষ্টি নয়, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়েই আমরা এগোতে চাই

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই পি আর ৫১৩৩। ৭৮

জয়ন্তী

৪৩ বর্ষ। আষাঢ় ১৩৮৫। তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ঝড়ের শেষ কোথায় ?

জনতা পার্টিতে ঝড় বয়ে গেলো। জনতা পার্টির জন্মলগ্নে এক টুকরো মেঘ দেখা দিয়েছিলো। নূতন দলের নেতা কে হবেন ?—এটাই ছিল সেদিনকার প্রশ্ন। ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন ১৯৭৭-এর ১৮ই জানুয়ারী। তখনও বিরোধী দলগুলি একত্রিত হতে পারে নাই। বড় জোর তারা ১৯৭১-এর মতো গ্র্যাণ্ড-এলায়েন্স করে চলবে, এই ছিল তাদের মনোভাব। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়েও রাজী করাতে পারেন নাই। দলগুলি লোপ করে দিয়ে একত্রিত হবার জন্য কিন্তু নির্বাচন ঘোষিত হবার পর জয়প্রকাশ নারায়ণ, বিরোধী দলগুলির উপর চাপ দিয়ে বল্লেন তারা সকলে মিলে একটা দল তৈরী করতে রাজী না হ'লে, তিনি নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। জয়প্রকাশের এই চরম সর্তের চাপে পাঁচটি দল একত্রিত রূপ পেলো জনতা পার্টিতে। বিরোধী দলগুলির বিলুপ্তির অনিবার্যতা বুঝতে এবং বোঝাতে চরণ সিং-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা ছিল—নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই চরণ সিং-এর আশা ছিল নূতন দলের নেতার আসনে তারই ডাক পড়বে কিন্তু সেখানে মোরারজীর ডাক পড়ায় চরণ সিং আশাহত হয়েছিলেন। চরণ সিংকে ডেপুটি চেয়ারম্যান হ'তে সম্মত করানো গিয়েছিলো একটি সর্তে—উত্তর ভারতে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। ১৯৭৭-এর মার্চের লোকসভায় জনতা পার্টির বিপুল জয়ের পর চরণ সিং-এর মনে আবার আশার সঞ্চার হয়েছিলো পরিষদীয় দলের নেতার আসনে তার নাম প্রস্তাবিত হবে, কারণ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর শোচনীয় পরাজয়ে তার নেতৃত্বের অনস্বীকার্য অবদান পার্টি স্বীকার করে নেবে। কিন্তু সেখানে তার পুরাণো সহকর্মীরাও তার নাম প্রস্তাব করলেন না, এটাই চরণ সিং-এর আফ্‌শোষ। অপরপক্ষে জগজীবন রামের নাম ঐ পদের জন্য যাতে গৃহীত না হয়, সেজন্য মোরারজী দেশাই-এর নাম সুপারিশ ক'রে জয়প্রকাশের কাছে চরণ সিং পত্র লেখেন। জনতা পার্টির সাম্প্রতিক ঝড়ের সময়ও চরণ সিং আপ্‌শোষ করে বলেন : "এটাই আমি প্রথম

সব চাইতে বড়ো ভুল করেছি।" চরণ সিং জনতা দলের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন কর্পূরী ঠাকুরকে। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের নির্দেশ এলে চন্দ্রশেখরকে জনতা পার্টির সভাপতিরূপে স্বীকার করে নিতে হয়। চরণ সিং এখন বলছেন "এটা আমার দ্বিতীয় বড়ো ভুল।"

১৯৭৭-এর জুনে ৯টি রাজ্যের নির্বাচনের প্রস্তুতিকালে উত্তর প্রদেশের বিধান সভার প্রার্থীদের তালিকা থেকে চরণ সিং-মনোনীত ৮৮ জন প্রার্থীর নাম সভাপতির অধিকার বলে চন্দ্রশেখর বাতিল করে দিলে চরণ সিং-চন্দ্রশেখর বিরোধ দানা বেঁধে ওঠে। অপরপক্ষে, কেন্দ্রে চরণ সিং-মোরারজী দেশাই বিরোধও ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। রাজ্য বিধান সভাগুলির নির্বাচনের পর জনতা পার্টির দুই পুরাণো অংশ, জনসঙ্ঘ ও চরণ সিং-এর বি, এল, ডি, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে রাজ্যগুলির শাসন ভাগ করে নেয়। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও হরিয়ানায় চরণ সিং-এর সহকর্মী, তার পুরাণো দল বি, এল ডির সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আর হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ-এ মুখ্যমন্ত্রী হবেন পুরাণো দল জনসঙ্ঘের সদস্য। আর এই পুরাণো দুই দল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এই ছয়টি রাজ্যে সহযোগিতা করে চলবে। অপরপক্ষে, চন্দ্রশেখর-গোষ্ঠি ও জগজীবন রামের সি এফ্ ডি গোষ্ঠি এই ছয়টি রাজ্যে এবত্রিত হয়ে চরণ সিং-এর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে বদ্ধপরিকর হয়। পুরাণো সংগঠন কংগ্রেস সদস্যরা এই চক্রের পেছনে সমবেত হন।

কিন্তু জনসঙ্ঘের ভূমিকা কেন্দ্রে ভিন্নতরভাবে পরিচালিত হয়েছে। জনতা পার্টির এই পুরাতন গোষ্ঠি কেন্দ্রে মোরারজী দেশাই-চরণ-সিং টানাপোড়েনে মোরারজী দেশাই-এর পেছনে সংহত হয়। জনসংঘের এই দ্বৈতভূমিকা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদের অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ দেয়।

আসলে জনতা পার্টির সঙ্কট যেমন তার জন্মকাল থেকেই সুপ্ত ছিল, তেমনি ১৯৭৮-এর মার্চে কর্ণাটক, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র নির্বাচনে চন্দ্রশেখরের উদ্যোগে এবং মধু লিমাই-এর সহযোগে এই তিনটি রাজ্যের কংগ্রেস দলের বহু দুর্নীতি-পরায়ণ, এমার্জেন্সী-সমর্থক সদস্যদের নির্বিচারে জনতা পার্টির প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দানের পর থেকেই দলের সুপ্ত বিরোধ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই তীব্র বিরোধ অল্পকালের মধ্যেই তীব্রতর হয়ে ওঠে উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানায় জনতা দলের পরিষদীয় পরিবেশে। উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় উপনির্বাচনে জনতা দলের জয়ের পাশাপাশি পরাজয়ের গ্লানি, হরিয়ানার কারনালে লোকসভায় উপনির্বাচনে ১৯৭৭-এর মার্চের সাধারণ নির্বাচনের চাইতে অনেক কম ভোটে জনতা প্রার্থীর জয় এবং আজমগড় লোকসভা উপনির্বাচনে জনতা প্রার্থীর পরাজয় ও ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীমতী মহসীনা কিদোওরাই-এর বিপুল ভোটে জয়, জনতার আভ্যন্তরীণ সঙ্কট ঘনীভূত করে তোলে। আজমগড় নির্বাচনের সমসময়ে পশ্চিম উত্তর প্রদেশে—চরণ সিং-এর খাস্-মুলুকে—আখের দর ২৪ টাকা প্রতি কুইন্টাল থেকে ৩ টাকা কুইন্টালে নেমে আখ-চাষীদের সর্বনাশ সাধন করে। না চরণ সিং-এর

কেন্দ্রীয় সরকার, না চরণ সিং-এর আশ্রিত রাম নরেশ যাদব-এর উত্তর প্রদেশ সরকার, চাষীদের সাহায্যের জন্য সহায়ক মূল্যে (Support price) আখ কিনে সরকারী গুদামে তা মজুদ ক'রে রাখে। ফলে চাষীরা বহু আখ আগুনে পুড়িয়ে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনতা দলের অন্তর্বিরোধ উত্তর প্রদেশে এই দলের প্রার্থীদের পরাজয়ের ভূমিকা তৈরী করে রেখেছিলো। তার ওপর চৌধুরী চরণ সিং গোষ্ঠির সঙ্গে জগজীবন রাম—বহুগুণা গোষ্ঠির বিরোধ উপনির্বাচনের আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছিলো। আজমগড়ের উপনির্বাচনে জনতা দলের একটি গোষ্ঠির সদস্যরা হয় দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করেছেন, কিম্বা উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছেন। এই উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের পর জনতাদলের গোষ্ঠিবিরোধ বৃদ্ধি পায় এবং ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশ-এর নাড়োয়ায় জনতাদলের সদস্যদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সর্বাত্মক বিপ্লবের শিবিরে জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখরের উপস্থিতি এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি গঠনের সপক্ষে তাঁর মত প্রকাশে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরোধের গতিবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এর পরই চরণ সিং-এর শিবিরভুক্ত উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানার মুখ্য-মন্ত্রীদ্বয় রামনরেশ যাদব ও দেবীলালের পরিষদীয় বিরোধীরা এদের পদত্যাগ দাবী করলে জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড এই দুই মুখ্যমন্ত্রীকে নিজ নিজ পরিষদীয় দলের আস্থাসূচক ভোট গ্রহণের নির্দেশ দেয়। প্রাক্তন জনসঙ্ঘ গোষ্ঠির নেতারা এই দুই রাজ্যে তাদের প্রাক্তন সহকর্মীদের রাজ্যের প্রাক্তন ভারতীয় লোকদলভুক্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সমর্থনের নির্দেশ দেন। ৮ই মে, ১৯৭৮ দেবীলাল হরিয়ানা পরিষদীয় দলের ৪৫—৩১ ভোটে জয়ী হবার মাসখানেকের মধ্যেই তার বিরোধীদের পক্ষ থেকে তাকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের আসন থেকে পুনরায় অপসারণের দাবী ওঠে। গত ২৮শে এপ্রিল চরণ সিং জনতা পার্টির কর্মপরিষদ এবং পরিষদীয় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দলে শৃঙ্খলাভঙ্গের প্ররোচনা দানের এবং প্রসঙ্গত হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো কোনো কেন্দ্রীয় নেতার প্ররোচনামূলক কাজের অভিযোগ করেন। চরণ সিং সে-সময় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছেন।

খুবই আশ্চর্যের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং জনতা পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা-নেতার মত দায়িত্বশীল ব্যক্তির পদত্যাগের পর দীর্ঘদিন জনতা পার্টির কর্মপরিষদ কিম্বা পরিষদীয় বোর্ড এই পদত্যাগপত্র নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না। অবশ্য জনতা পার্টির মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে চরণ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিরোধ মীমাংসার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন. ৫ই জুন বিদেশে সফরে যাবার পূর্বে প্রধান মন্ত্রী চরণ সিং-এর সঙ্গে হাসপাতালে কথা বলে গেছেন এবং প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করবার প্রসঙ্গ নিয়েই নাকি তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। প্রধানমন্ত্রী বিদেশে পাড়ি

[শেষাংশ ২৩৭ পৃষ্ঠায়]

জাতীয় পর্যায়ে মজুরী, আয় ও মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। কিন্তু কারখানায় কাজ করার ফলে সেখানকার শ্রমিকেরা সংগঠনের সাহায্যে নিজেদের মজুরীকে অন্যান্য শ্রমজীবীর, বিশেষতঃ ক্ষেত-খামারে যাঁরা কাজ করেন সেই সব শ্রমজীবীর, তুলনায় বেশ খানিকটা উপরের স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন। এই উচ্চতর মজুরীর সঙ্গে নিম্নতম মজুরীর পার্থক্য থাকা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? নিম্নতম মজুরীকে জাতীয় উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রমশঃ আরও সন্তোষজনক করার উপায় উদ্‌ভাবন করাও সঙ্গে সঙ্গে দরকার। বর্তমান জাতীয় উৎপাদন-ক্ষমতার বিচার করে নিম্নতম মজুরী কি হওয়া উচিত? এই ধরণের বিভিন্ন প্রশ্নের বিচার করে প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীভুতলিঙ্গমের নেতৃত্বে গঠিত কমিটী যে প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করেছেন, তার কয়েকটি বিশেষ বক্তব্যের আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সমাজে আয়ের বৈষম্য সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে, এই ধারণা বাস্তবানুগ আলোচনার পক্ষে সহায়ক হবে না। তবে আয়ের বৈষম্যকে কর্মক্ষেত্রের যোগ্যতা এবং দক্ষতার বিচারে যাচাই করে নেবার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক চাপে পড়ে যোগ্যতর ব্যক্তি, কিংবা কঠিনতর পরিশ্রমে নিযুক্ত কর্মী স্বল্পতর আয়ের জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই ধরণের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না বলে অনেক কম যোগ্যতা নিয়েও অধিকতর উপার্জনের সুযোগ পেতে বিলম্ব হয় না। সামাজিক অসন্তোষের এই কারণটিকে দূর করতে গেলে বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে শিক্ষাগত মান, কর্মকুশলতা এবং দায়িত্বভার ইত্যাদির তুলনা করে উপার্জনের সঙ্গতি বিধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আপাততঃ সেই ধরণের তুলনামূলক বিচার করে সর্বাত্মক কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না এই কারণে যে, উপার্জনের ক্ষেত্রে যাঁরা এখন অগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাঁদের বর্তমান সুযোগসুবিধার উপর বড়ো রকমের কোনো কাটছাঁট করতে গেলে নিজেদের সংগঠনের সাহায্যে তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। জবরদস্তিমূলক প্রথায় যে-ধরণের ন্যায়সঙ্গত উপার্জন-বিষয়ক নিয়মবিধির প্রবর্তন করা সম্ভব, আমাদের লোকতন্ত্রে তা' নিতান্তই অসম্ভব। এখানে প্রত্যেক শ্রমজীবী-গোষ্ঠীরই নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার জন্য আন্দোলন, কর্মবিরতি এবং অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেবার স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হ'ল যে-সব শ্রমিক ততটা সুসংগঠিত হতে পারেন নি, তাঁদের উপার্জন-বৃদ্ধির পথে বাধাগুলি অপসারিত করা। যাতে দেশের সম্পদ-উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বার সব সুফল শুধু সংগঠিত শ্রমিক-গোষ্ঠীর কুক্ষিগত না হয়, যাতে দুর্বল এবং সংগঠনবিহীন শ্রমজীবীরাও সেই সুফলের ভাগ পেতে পারেন তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই দিক দিয়ে বিচার করে ভূতলিঙ্গম কমিটী মন্তব্য করেছেন যে বর্তমান আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা মনে রেখে কোনো শ্রমিককেই মাসে ১০০ টাকার কম মজুরী দেওয়া অসঙ্গত। দুই-তিন বৎসরের চেষ্টায় ন্যূনতম মজুরীর পরিমাণকে মাসিক দেড় শত টাকা পর্যন্ত তোলাও সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত। এরই সঙ্গে সঙ্গতি থাকা উচিত কৃষিজীবী শ্রেণীর ন্যূনতম উপার্জনের। কৃষির আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থায় এমন উন্নতি বিধান করা সম্ভরপর এবং সঙ্গত যাতে কোনো কৃষিজীবী পরিবারের বার্ষিক আয় ১৮০০ টাকার চেয়ে কম না হতে পারে।

এই ধরণের নিম্নতম আয়ের কথা জোর দিয়ে বললেও কমিটী কিন্তু উচ্চতম আয়ের সীমা নির্ধারণ করার পক্ষপাতী নন। সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকলে যদি সকল স্তরের মানুষই তার সুফল ভোগ করতে পারেন, এবং সেই সঙ্গে যদি নিম্নতর আয়ের মানুষকে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে উচ্চতম আয় নির্দিষ্ট করে দেবার কোনো সুযোগসুবিধা রয়েছে বলে কমিটী মনে করেন না। যারা উচ্চতর আয় ভোগ করবেন তাঁদের উপর ঊর্দ্ধতর হারে কর সংস্থাপন করে তাঁদের ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষমতাকে সীমিত রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই ভবিষ্যতেও থাকবে। এর ফলে কর দেবার পর যতটুকু আয় করদাতাদের হাতে থাকবে তার পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব হবে। কমিটীর এক হিসাবে দেখা যায় যে বেসরকারী ক্ষেত্রে নিম্নতম এবং ঊর্দ্ধতম নীট উপার্জনের পার্থক্য ১ : ১৬, অথচ সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের পরিমাণ ১ : ৯। এর ফলে সরকারী প্রশাসনে যোগ্য লোকের প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কমিটী সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে প্রশাসনে দায়িত্ববান এবং যোগ্যতা-সম্পন্ন কর্মচারীদের বেতন এবং অতিরিক্ত সুবিধা-সমূহ বাড়াতে হবে। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রে ১ : ১৬ পার্থক্য মাত্রাতিরিক্ত কি না এবং এই পার্থক্য ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা যায় কিনা সে সম্বন্ধে কমিটী কতটা চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁদের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের মনে হয় নিম্নতম আয় যদি মাসিক ১৫০ টাকা হয়, তবে কোনো সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারেরই করমুক্ত আয়ের পরিমাণ ১৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয় (বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতেও ১ : ১০ অনুপাতটির উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল)। অবশ্য অনুমোদিত সঞ্চয় প্রকল্পে যোগ দিলে ১৫০০ টাকার বেশী উপার্জনকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার প্রয়োজন দেখা দেবে না।

এই ধরণের বিঘোষিত নীতির প্রধান দুটি

দুর্বলতা কীভাবে দূর করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে কমিটী কোনো সুপারিশ পেশ করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। প্রথম দুর্বলতা হল ন্যূনতম উপার্জনের নিয়মকে রূপায়িত করার চেষ্টায়। অসংগঠিত শ্রমিক যদি আশু প্রয়োজনের তাড়নায় ন্যূনতম মজুরীর চেয়ে কম মজুরী নিয়ে কাজ করতে রাজী হয়, সরকারী প্রচেষ্টা প্রতি ক্ষেত্রেই তাকে প্রতিহত করতে পারবে বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র সেই অবস্থাতেই এর প্রতিবিধান সম্ভব, যখন সরকার নিম্নতম মজুরী দিয়ে সব কর্মপ্রার্থীকেই কাজ দিতে সক্ষম হবেন। মহারাষ্ট্র সরকার এই ধরণের একটি প্রকল্প কার্যকর করেছেন, কিন্তু তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য যে মজুরী দিয়ে থাকেন তা' মাসিক ১০০ টাকার পর্যায়ে পৌঁছায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকারদের জন্য যে সেবামূলক কাজের প্রকল্প সম্প্রতি হাতে নিয়েছেন তাতেও মাথাপ্রতি মাসিক রোজগার ৫০ টাকা। সুতরাং ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে মাসিক রোজগারের আশ্বাস দিলে কিছু কিছু শ্রমিক কাজ নিতে রাজী থাকবে বলেই মনে হয়। এই সব ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরীর আশ্বাসের গুরুত্ব বিশেষ থাকবে না।

অন্য দিকে উচ্চতর আয় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে সাধারণতঃ সেই সব বিধিব্যবস্থার আওতায় আসেন শুধু তাঁরাই যাদের আয়ের উৎস থেকে নির্ধারিত পরিমাণে কর কেটে রাখা যায়। পেশাগত আয়, সম্পত্তি কিংবা ব্যবসায় থেকে উদ্ভূত আয় ইত্যাদিকে যথাসম্ভব কম করে দেখাবার নানা প্রক্রিয়া অনবরত উদ্ভাবিত হবার ফলে এই ধরণের আয় থেকে যথোপযুক্ত কর সংগ্রহ করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। করদানের দায়িত্ব থেকে এইভাবে রক্ষা পাবার উপায় যতদিন খোলা রয়েছে, ততদিন সরকারের সাম্য সংস্থাপনের নীতি পুরোপুরি কার্যকর হতে পারে না। আবার মুনাফাজাত আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে না পারলে মজুরীর ক্রমাগত বৃদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। ভূতলিঙ্গম কমিটীর প্রতিবেদনে এই প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

অনেক শিল্পে শ্রমিকদের মূল বেতনের উপর বোনাস ও মহার্ঘ ভাতা দেবার রীতি দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে প্রচলিত রয়েছে। ভূতলিঙ্গম কমিটি এই দুই রীতির রদ-বদল করার যে সব প্রস্তাব দিয়েছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য শ্রমজীবীর ক্রয়ক্ষমতাকে আপাততঃ খর্বিত করে মুদ্রাস্ফীতির সমাধানে সাহায্য করা। মনে রাখা দরকার যে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার বোনাস প্রদানের নিয়মকে পালটে দিয়েছিলেন এবং মহার্ঘ ভাতা ও বাড়তি বেতন জমা রাখা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ভূতলিঙ্গম কমিটী সেই দৃষ্টান্ত দেখে যদি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে বলতে হবে যে তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেন নি। যদিও মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের চেষ্টা করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর দাবীদাওয়াকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা প্রয়োজন, আমাদের মত দেশে প্রথমেই বিচার করা দরকার শ্রমিকশ্রেণীর দাবীদাওয়ার সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর সুযোগসুবিধার ন্যায়সঙ্গত সামঞ্জস্য বজায়

থাকছে কিনা। মহার্ঘ ভাতার নিয়মে শ্রমিককে শুধু তার স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই সাহায্য করা হচ্ছে—তার আর্থিক অবস্থার অধোগতি রোধ করা হচ্ছে, উন্নতির বিন্দুমাত্র চেষ্টা এতে নেই। বোনাসকে বহু দিন যাবৎ এককালীন জমানো মজুরী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এখন এই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হলে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার অবনতি অনিবার্য। সুতরাং এই ধরণের সুপারিশ-গুলির বিরুদ্ধে সংগঠিত শ্রমিক-গোষ্ঠীগুলি যে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্য বোধ করার কিছু নেই। কমিটীর প্রতিবেদনে যদিও বলা হয়েছে যে সব শ্রেণীর মানুষের আর্থিক অগ্রগতিতে সহায়তা করাই তাঁদের প্রস্তাবিত নীতির উদ্দেশ্য, বোনাস এবং মহার্ঘ ভাতা সম্পর্কে তাঁদের সুপারিশগুলিকে এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করা যায় না।

এ কথা অবশ্যই স্বীকৃত যে অসংগঠিত খেতমজুর কিংবা ছোটখাট শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত অনেক শ্রম-জীবীর তুলনায় বড় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীর ন্যূনতম মজুরী প্রায় দুই-তিনগুণ বেশী। কিন্তু এই স্তরভেদই তো সমাজে একমাত্র স্তরভেদ নয়। যদি অন্যান্য স্তরে আয়ের বৈষম্যকে নানা যুক্তি খাড়া করে সমর্থন জানানো হয়, তবে গ্রামাঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চলের মধ্যে মজুরীর পার্থক্যকেও যুক্তিযুক্ত বলে দেখানো যেতে পারে। যদি নিম্নতম আয়-বিশিষ্ট অসংখ্য মানুষের উপকারের জন্য উচ্চতম আয়ের মানুষকে আরও করভার বহন করতে বলা সম্ভব হয়, তবেই মধ্যবর্তী স্তরের আয়কে নিয়ন্ত্রিত করার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন যেতে পারে, নতুবা নয়। সংগঠিত শ্রমিক-গোষ্ঠীরা নানা রকমের চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের আয়বৃদ্ধির পথ খোলার যে-চেষ্টা করেন, তাতে সাম্যের নীতি নানা রকমে লঙ্ঘিত হয় এবং মজুরী-বৃদ্ধির প্রবণতা অনবরত জোরদার হয়, এই কথাগুলি অযৌক্তিক না হলেও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা অবান্তর। লোকতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই সব শ্রেণীর মানুষের মজুরী বেঁধে দিয়ে সকলকে সেই মজুরীতে তুষ্ট থাকতে বলা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিরোধ এবং সংঘর্ষ এই ধরণের রাষ্ট্রের সজীবতার অন্যতম লক্ষণ। এখানে রাষ্ট্রীয় নীতি সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে শুধু বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যবস্থাকে ক্রমাগত অধিকতর সক্রিয় করে। ভূতলিঙ্গম কমিটী জাতীয় পর্যায়ে আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনার চেষ্টায় কয়েকটি সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন এবং নিয়োগকারী শ্রেণী ও নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় স্তরে একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠন করতে উপদেশ দিয়েছেন। এই ধরণের সংস্থা যদি উপযুক্ত নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং সর্বজনগ্রাহ্য কিছু নির্দেশাত্মক নীতি প্রণয়ন করতে পারে তবে মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখনকার অরাজক অবস্থা কেটে গিয়ে সুষম একটি আয়-বণ্টন ব্যবস্থা দেশে প্রবর্তিত হতে পারে।

সমাজে গোষ্ঠীগত বিরোধের আর একটি প্রধান ক্ষেত্র হল কৃষিজ পণ্য ও শিল্পসামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্যস্তরের নিরূপণে। যদি কৃষিজ পণ্য চড়া দরে বিক্রয় হয় তবে শিল্পনায়কদের

মুনাফায় ঘাটতি দেখা দেয়, আবার শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে কৃষিজীবীর ক্রয়-ক্ষমতা এবং উৎপাদন-ক্ষমতা উভয়ই হ্রাস পায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে এই ধরণের দরাদরির ক্ষেত্রে কৃষিজীবীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনাই বেশী, কেন না শিল্পের উদ্যোক্তাদের তুলনায় তাদের সংগঠনের জোর তেমন-কিছু নেই বললেই চলে। তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী হওয়ার ফলে এবং গণতন্ত্রে তাদের সম্মিলিত শক্তি উপেক্ষণীয় নয় বলে অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশে কৃষিজীবীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা যতটা ছিল আমাদের দেশে ততটা হয়তো নয়। কিন্তু সব ফসলের ক্ষেত্রে একই কথা খাটে না। বিশেষ করে যে-সব ফসলের চাষ দেশের কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, যেমন আখ কিংবা পাট, তাদের দামকে উপযুক্ত স্তরে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। সরকারী বিপণন-ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে, চাষীদের পক্ষে সরকারের নিকট বাঁধা দরে ফসল বিক্রয়ের সহজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, এই সব ফসলের দামের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটানো দরকার। ভূতলিঙ্গম কমিটী প্রত্যেক কৃষিজীবী পরিবারের আয়ের ন্যূনতম সীমা বার্ষিক ১৮০০ টাকায় নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। বৃহত্তর কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃ মধ্যবিত্ত-স্তরের স্বচ্ছলতার সৃষ্টি না হলে শিল্পসামগ্রীর বাজার প্রসার লাভ করবে না, শিল্পে বিস্তারজনিত ব্যয়-সংক্ষেপের সুযোগ থেকে জনসাধারণ বঞ্চিত থাকবে এবং কৃষিজীবীর পক্ষে স্বনির্ভর হয়ে নিজের উদ্যোগকে বিকশিত করে তোলার সুযোগ আসবে না। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের জীবনেও যাতে যুগোপযোগী পরিবর্তন আসে তার ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় আয়-নীতির মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

যে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

যশোহর সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের যেমন প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা, সান্তাহার সেবা-কেন্দ্রে তেমনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিবিধ রাজনৈতিক দল ও উপদলের পরিচালকবর্গের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়। পূর্ব-বৎসরের শেষার্দ্ধে, ১৯২১ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে যে পাঁচমাস তিনি বাইরে ছিলেন, তা কেটেছে সর্ববিন্যায়তনকে সংগঠিত ও পরবর্তী কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে সংঘর্ষের সম্মুখীন করতে।

জেলখানায় তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে একান্তে, ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে। অন্যান্য বন্দী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে মেলামেশার কোনও সুযোগই তাঁর হয়নি।

সান্তাহারের সেবাকেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নায়করা এগিয়ে এসেছিলেন, প্রথমতঃ, নতুন কর্মীদের সেবাকর্মে দীক্ষিত করতে, দ্বিতীয়তঃ উদীয়মান তরুণ সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্য ও প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে। সুভাষচন্দ্রও এই সেবাকেন্দ্রে কাজ করেই কর্মীদের মধ্যে দলাদলির জটিলতা উপলব্ধির চেষ্টা করেছিলেন।

ত্রাণকার্য যখন শেষ হবার পথে তখন গরীব গ্রামবাসীদের পুনর্বাসনই হল প্রধান। তবে এর সমাধানের পথ তখন আর তেমন দুরূহ নয়। বিগত কয়েক সপ্তাহের অক্লান্ত চেষ্টায় বিভিন্ন বিপন্ন এলাকায়ই সেবাকেন্দ্র গঠন করা হয়েছে, কর্মীদলও প্রাথমিক অসুবিধাগুলি আয়ত্বাধীন করে ফেলেছেন। এখন কর্মপ্রণালীর আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

সর্বাগ্রে চাই গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা-সাধন। বন্যার বিষাক্ত জলে পুরাণো কুয়ো, ইন্দারা, পুকুরের জল অব্যবহার্য। ও-গুলির পরিবর্তে অবিলম্বে চাই নতুন কুয়ো, ইন্দারা। পরবর্তী গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে গেলে ও-গুলি ছেঁচে ফেলে শোধন করতে হবে। এ-হল দীর্ঘমেয়াদী কাজ।

এ-ছাড়া, যাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে বা ভেসে গেছে তাদের নতুন ঘরবাড়ী চাই, চাষের গরু চাই, হাল-লাঙ্গল-বীজ-শস্য চাই। গ্রামের ছোট ছোট দোকানদার, ব্যবসাদার, কামার, কুমোর, তাঁতি, নাপিত, কলু, ছুতোর—সকলেরই পুনর্বাসনের জন্য নগদ টাকা, নানা হাতিয়ার, বিবিধ যন্ত্রপাতি। যতদিন না নতুন ফসল কাটা হয়, ততদিন পর্যন্ত তাদের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থানও করা চাই।

এ-সবই দীর্ঘ-মেয়াদী কাজ। মাত্র কয়েক দিনের স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে দিনের পর দিন

এত কাজ করানো সম্ভব নয়। এ-কাজের জন্য কর্মীদের প্রতিমাসে নিজেদের খরচ বাবদ কিছু কিছু অর্থেরও প্রয়োজন। তাদেরও সংসার, পোষ্য ও বিবিধ ব্যয়ের দায়িত্ব আছে। তা মেটাবার ব্যবস্থা না হলে তাদের কাছ থেকে কতদিন কাজের আশা করা যেতে পারে?

—এ সব কথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন সুভাষচন্দ্র। আরও জানালেন, তিনি এসেছিলেন প্রধানতঃ বন্যা-ত্রাণের ব্যবস্থা-সাধনের জন্য—পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য নয়। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি যথাসাধ্য পালন করেছেন —এখন তিনি তাঁর জীবনের মুখ্য কর্তব্য-সাধনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে ফিরে যেতে চান।

অতএব আচার্যদেব যেন সত্বর এই পুনর্বাসন ব্যবস্থার ভার অন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করে তাঁকে নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে সাহায্য করেন – সুভাষচন্দ্রের এই বিনীত অনুরোধ।

* * *

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আকুল আহ্বানে বন্যাত্রাণ সমিতির ভাণ্ডার প্রয়োজনীয় সাহায্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর আগের বছরে খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষে আচার্যদেবই সেবাকার্যে অগ্রণী হয়েছিলেন। সে-বারও দেশবাসী তাঁর সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন।

এবারের বন্যা আরও ব্যাপক ও অধিক বিধ্বংসী। তিনটি জেলার অধিকাংশ অঞ্চলের গরীব গ্রামবাসী তাদের ঘর-বাড়ী, গরু-মহিষ, শস্য, স্বাস্থ্য, আত্মীয়-পরিজন, সর্বোপরি ভবিষ্যতের ভরসা ও মনোবল—সব হারিয়েছে।

এ-সব লোকের পুনর্বাসন সামান্য কিছু অর্থ-সংস্থানে বা সাময়িক সাহায্যদানে সম্ভব নয়।

দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা স্থির করে, যোগ্য, শিক্ষিত ও সহানুভূতি-সম্পন্ন কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় পুনর্বাসনের কল্পনা রূপায়িত করবার ব্যবস্থা না করলে সাময়িক প্রয়াস সফল হলেও যে ভবিষ্যতের বিপদ প্রতিরোধের কোনও স্থায়ী শক্তি অর্জন করা যাবে না; তা সহজেই অনুমেয়।

এই স্থায়ী প্রতিরোধ-শক্তি সঞ্চার করতে হলে প্রথমেই তাদের মনোভাব বদলাতে হবে। 'সাহায্যে'র জন্য নিঃসর্তে দান—ভিক্ষারই নামান্তর। এই ভিক্ষা-গ্রহণে মন সংকুচিত হয়, মনোভাব হীন হয়।

সুতরাং আর ভিক্ষা নয়—দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-দান করা হবে। বিনা সুদে বা অল্পসুদে সহজ-পরিশোধের সর্ত হবে—জমির উৎপাদিত শস্যের একাংশ, তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র, ঘানিওয়ালার তেল, গোয়ালার ঘি, অন্যান্যদের উৎপাদিত বা নির্মিত কিছু কিছু পণ্যের অংশ, চলতি মূল্যে, কিছু পরিমাণ ঋণ শোধবাবদ, কিছু নগদ মূল্যে ত্রাণ-সমিতিকে দেওয়া হবে। সমিতি কলকাতা ও অন্যান্য জেলা-সহরে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে একদিকে বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে সহরবাসীদের নিবিড় যোগাযোগ সৃষ্টি করবে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের নিশ্চিত বিক্রির সহজ ব্যবস্থা হওয়ায় গ্রামবাসীরা অধিক পণ্য উৎপাদনে এবং পণ্যের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ সাধনে নিরন্তর চেষ্টা করতে উৎসাহিত হবে।

এইভাবে কাজ করলে পুনর্বাসনে যে অর্থব্যয় হবে, তা ধীরে ধীরে ফিরে পাওয়া যাবে, একদল

বেতনভুক্ কর্মীর জীবিকার স্থায়ী সংস্থান হবে, গ্রামীণ শিল্পদ্রব্যাদির চাহিদা সহরে সহরে বৃদ্ধি পেলে পণ্যগুলির ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাবে। পণ্যের উৎকর্ষ ও ন্যায্যমূল্য জনসাধারণ উপলব্ধি করলে একদিকে যেমন জিনিষগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গে সঙ্গে দোকানগুলিরও বিস্তার হবে, অধিক সংখ্যক কর্মীর অন্নসংস্থান হবে এবং সমিতির দেওয়া মূল অর্থ, ভাণ্ডার পূর্ণ করে রেখে ভবিষ্যতে গ্রামীণ শিল্পগুলির বিস্তার সাধনে বার বার ঐ টাকা দাদন হিসেবে নিয়োজিত করতেও উদ্বুদ্ধ করবে। যদি ও অঞ্চলে বা অন্যত্র আবার বন্যা বা অন্যবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশবাসী বিপন্ন হয়ে পড়েন, তবে সেখানেও আর্তত্রাণের কাজ সত্বর শুরু করতে কোনও আর্থিক অসুবিধা হবে না। যোগ্য, অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক বা কর্মীরও অভাব হবার কথা নয়।

অনুরূপ একটি পরিকল্পনা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা সম্পাদন করবার পর উত্তর-বঙ্গ ত্রাণ-সমিতির নাম পরিবর্তন করে রাখা হল, 'সংকট-ত্রাণ সমিতি'—যাতে উত্তর-বঙ্গের জন্য সংগৃহীত অর্থ ও জিনিসপত্রাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নানারূপ দুর্দশা-ক্লিষ্টদের ত্রাণের জন্য ব্যবহারে কোনও বাধা না থাকে।

পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে সমিতিকে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন—যেখানে দেওয়ার পরিবর্তে নেওয়ার নীতি স্বীকৃত। বিনা সর্তে দান নয়, পরিবর্তে কিছু পাবার সর্তেই দান—নতুন পরিকল্পনার এই হবে মূল কথা।

এ-নীতি অনুসারে কাজের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। যেখানে দেওয়ার সঙ্গে নেওয়ার নীতি স্বীকৃত, সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের স্থান কোথায়?

বন্যা-ত্রাণের জন্য প্রথম তুমাসে পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা সংগৃহীত হয়। এছাড়া গাঁট গাঁট নতুন কাপড়, ধুতি-শাড়ী, ফ্রক-সার্ট, কম্বল-কোট, মশারী, ওষুধ, তেল, ঘি, চিনি, নুন, রোগীর পথ্য, সাবু, বার্লি, বিস্কুট ইত্যাদি, কিছুই কম নয়।

সুভাষচন্দ্র প্রতি কেন্দ্রে ওসব জিনিষ পর্যাপ্ত বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। হাসপাতালেও পর্যাপ্ত দিয়েছেন—কিন্তু অর্থ তার তেমন কিছুই প্রয়োজন হয়নি, ব্যয়ও বেশী হয়নি।

সপ্তাহান্তে স্বেচ্ছাসেবকদের সাপ্তাহারে আসা, বিতরণের হিসেব দিয়ে পরবর্তী সপ্তাহের প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে যাওয়া বাবদ যাতায়াতের খরচ ব্যতীত নগদ ব্যয় আর কিসে হবে? যদি কিছু হয়েও থাকে তা সামান্য।

স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনে যাতায়াতে বা মালবহনে খরচ নেই, ট্রেন-কর্তৃপক্ষ ওদের ভাড়া রেহাই দিয়েছিলেন। তবে যেখানে নৌকা ছাড়া যাতায়াতের উপায় নেই—বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে সেরূপ স্থানই অধিক—সেখানে গরীব মাঝিকে পয়সা দিতেই হয়।

এ-ছাড়া যে-সব গ্রামে ইতিমধ্যে জল নেমে গেছে, সেখানে দুঃস্থ গ্রামবাসীদের পুনর্বাসনে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু অর্থব্যয় করা হয়েছে—সরাসরি দান হিসেবে—তার সংখ্যা ও পরিমাণ কম হলেও সামান্য নয়।

এ-ভাবে এ-পর্যন্ত যত ব্যয় হয়েছে তা সাকুল্যে পঞ্চাশ হাজারও হবে না। সমিতির হাতে তখনও চার লক্ষেরও অধিক টাকা জমা আছে, আরও টাকা

নিয়ত আসছে। এর সদ্ব্যবহারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তজ্জন্য যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ অবিলম্বে প্রয়োজন।

এজন্য আচার্যদেব নিজেই এলেন সান্তাহারে —সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করতে। সঙ্গে এলেন সতীশবাবু—সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়—যিনি ইতিমধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের দায়িত্বভার ত্যাগ করে সরাসরি নতুন পরিকল্পনা রূপায়িত করবার জন্য উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ সমিতি, তথা সংকট-ত্রাণ সমিতির কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন স্থির করেছেন।

সান্তাহার ষ্টেসনে আচার্য রায়ের কামরা দার্জিলিং মেল থেকে কেটে রাখা হল। একরাত্রি আচার্যদেব ঐ কামরায়ই রইলেন, খেলেন মুড়ি ও সন্দেশ—যা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন।

সতীশবাবুর জন্য কিন্তু পৃথক ও পাকা ব্যবস্থা সেই সন্ধ্যায়ই হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে ছিল নিজস্ব সহকারী বা সরকার; আর স্থায়ী বাসের উপযোগী নানা সাজ-সরঞ্জাম, পৃথক তাঁবু, ক্যাম্প-খাট, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য। স্পষ্টই বোঝা গেল সুভাষবাবু কার্যভার পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সতীশবাবুই হবেন সর্বাধ্যক্ষ—এখন থেকে আর্তত্রাণের সব রকম কাজই পরিচালনা করবেন তিনি।

কিন্তু সতীশবাবুর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য এত ব্যাপক আয়োজন কেন? বিশেষতঃ অনুরূপ (বা প্রাথমিক, তজ্জন্য আরও কষ্টসাধ্য) কার্য পরিচালনে সুভাষচন্দ্র যেখানে একই তাঁবুতে কার্যালয়, মালগুদাম ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন, সেখানে সতীশবাবু কার্যভার নেবার পূর্বেই, তাঁর জন্য সাড়ম্বর পৃথক ব্যবস্থা-সাধন—অবশ্যই ত্রাণ-সমিতির অর্থব্যয়ে—অত্যন্ত দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল।

দীর্ঘ দু'মাস সুভাষচন্দ্র ঐ এক তাঁবুতে, একখানি ক্ষুদ্র তক্তাপোষে, দু'খানি মোটা কম্বল সম্বল করে রাত কাটিয়েছেন। ঐ তাঁবুর আর এক প্রান্তে আর একখানি তক্তাপোষে আর দু'জন স্বেচ্ছাসেবক ও রাত্রিবাস করতেন। সকাল ছটা থেকে বেলা ১১।১২টা, আবার বিকেল চারটে থেকে রাত দশটা/এগারোটা পর্যন্ত মালপত্রের আনা-নেওয়া ও বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরণের হিসেব-নিকেশ করেছেন। রাত্রে সুভাষচন্দ্রের টেবিলের আলো আদৌ নিব্‌তো কি না, প্রত্যূষে কখন বা সে আলো আবার জ্বেলে তা তাঁর টেব্‌লে রাখা হত, কেউ তা জানে না। কোন্ প্রত্যূষে উঠে যে তিনি আবার কাজে নিমগ্ন হতেন, তা কি কেউ দেখেছেন?

তারপর আহার। ভোরবেলার কাজ শেষে ছ'টা নাগাদ একবার উঠে তিনি দাঁড়াতেন গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের 'লাইনে'।

ক্যাপ্‌টেন ধীরেন্দ্রমোহন ঘটক যথারীতি লাইন 'ইন্‌স্‌পেকসন' শেষে 'এক, দুই, তিন, চার' ডেকে দেখতেন সবাই হাজির কি না। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তখনই খবর নেওয়া হত, তিনি কোথায় এবং কেন অনুপস্থিত।

এর পর তাঁদের হাতে হাতে প্রাত্যহিক 'জল-খাবার' দেওয়া হত—আদার কুচি, ভিজে ছোলা ও কিছু চিড়ে-ভেজা।

চিড়ে চিবোতে চিবোতে কেউ কেউ যেতেন ষ্টেসনের চায়ের দোকানে, কেউ বা সরাসরি নিজের কাজের টেবিলে। এ-নিয়ম অন্যান্যদের যেমন,

সুভাষচন্দ্রের বেলায়ও তেমনি বাধ্যতামূলক, এবং তিনি হাসিমুখে এ-নিয়ম পালন করতেন।

বেলা বারোটায় দুপুরের আহার। ষ্টেসনের দক্ষিণে, বাজারের পথে, একখানি দোতালা বাড়ীর নীচের দু'খানি ঘর, রান্না ও খাবার জন্য ব্যবহৃত হত। ঘর দু'খানি ছোট, একবারে একসঙ্গে দশজনের বেশী বসতে পারত না। সেজন্য তিন-চারদলে খাবার ব্যবস্থা হত।

সুভাষচন্দ্র প্রত্যহ খেতেন শেষ দলে। অর্থাৎ বেলা একটারও পর। বারবার খবর দিলে তিনি টেব্‌ল ছেড়ে উঠতেন। যাবার আগে একখানি গামছা কাঁধে নিয়ে, ষ্টেসনের এক পাশের এক ছোট্ট ডোবাতে ঝুপ করে দুটো ডুব দিয়ে উঠে আসতেন। তাঁবুতে ফিরে, কাপড় বদলে, যেতেন রান্নাবাড়ীতে।

খাদ্যের ব্যবস্থা নিত্যই একরকম। ভাত, একটা ডাল, তরকারী—না-মাছ, না-মাংস, না-ডিম। রাত্রেও ঐ একই 'মেনু' তবে ভাতের বদলে রুটি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ল।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন, সকালবেলা বগুড়ার হরিপুরের জমিদার-বাড়ী থেকে বাঁক কাঁধে নিয়ে দু'তিন জন গোয়ালা এল রান্নাবাড়ীতে। বাঁক-ভর্তি দই, ক্ষীর, নানারূপ মিষ্টি, খই, মুড়কী, মোয়া, কলা ইত্যাদি।

ব্যাপার কি?

ও বাড়ীর মেয়েরা ভাই-ফোঁটা উপলক্ষ্যে পাঠিয়েছেন, সুভাষচন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য। তাঁদের অনুরোধ—মিষ্টিগুলি যেন সকলকেই খাওয়ানো হয়।

অন্য সবাই এ অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তিনি কিছুই নিলেন না—শুধু বল্‌লেন, "আমরা এখানে ভোজ খেতে আসি নি।"

* * *

আচার্য রায়ের পৌঁছুবার পর, সেই রাত্রেই সুভাষচন্দ্র গেলেন তাঁর কামরায়। সেখানে সতীশবাবু ও অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে নানা আলোচনার পর ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির হয়ে গেল।

পরদিন থেকেই সতীশবাবু মাঝে মাঝে সুভাষবাবুর সঙ্গে বসেন, নিজে পৃথকভাবে তাঁর তাঁবুতেও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এইভাবে ক'দিন চলবার পর সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ কর্মীই ফিরে এসেছেন—যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন, সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাগমনের পর তাঁদের মধ্যে অতি সামান্যই অবশিষ্ট রইলেন।

তখনও স্বরাজ্যদল গঠিত হয়নি। গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের তখনও তিন মাস দেরী। ইতিমধ্যেই দলাদলি যে পাকাপাকি হয়েছিল, তা সাপ্তাহারে কোন্ কোন্ দলের কর্মীরা সেবাকার্যে যোগ দিয়েছিলেন, কারাই বা দেন নি, তা বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, খৃষ্টীয় মিশনগুলির নার্টোর ও নওগাঁ মহকুমার সেবক-সেবিকাবৃন্দ, ব্রাহ্ম সমাজের যুবক-সমিতি—এরা সকলেই কোন না কোন কেন্দ্রে কাজ করেছেন।

রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছাব্রতীরা ছিলেন, রাজসাহীর ৺বীরেন্দ্রমোহন ঘটক ও সহ-কর্মীদল, বগুড়ার ৺যতীন্দ্রমোহন রায় ও তাঁর ছাত্রদল, কলকাতা ও বাঁকুড়ার ৺বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর অনুগামী দল, ঢাকার ৺প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী ও ৺রবীন্দ্রনাথ সেনের অনুগামী যুবকদল, মৈমনসিংহের ৺সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুদা) ও ৺ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কর্মীদল, বরিশালের ৺নির্মলচন্দ্র সেনের সহকর্মীদল, পাবনার ৺যোগীন্দ্রনাথ রায়ের সহকারিদল, ফরিদপুরের ৺পূর্ণচন্দ্র দাস ও ৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহকর্মিগণ। এছাড়া প্রবর্তক সংঘের চন্দননগর ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মীরাও ছিলেন।

কিন্তু নবাবগঞ্জ (ঢাকা) ও কুমিল্লার অভয় আশ্রম বা অন্যান্য খাদিমণ্ডল বা খাদিকেন্দ্রের কোনও কর্মী সান্তাহারের সেবা কর্মে যোগ দেননি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের (যার সভাপতি তখনও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়) পক্ষ থেকে কোনও স্বেচ্ছাসেবক দল আসেনি।

পূর্বোক্ত বিভিন্ন দলগত কর্মীরা ছাড়াও আরও ছিলেন বগুড়া ও কলকাতার ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ও তাঁর ভ্রাতা (তিনিও ডাক্তার), ডাক্তার জ্যোতির্ময় সরকার, ডাঃ ধীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জামাতা ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (তিনি বন্যা-বিধ্বস্ত পতিসর (রাজসাহী) কেন্দ্রে আর্ত-সেবার ব্যবস্থা করেন এবং রুগ্নদের চিকিৎসার একটি কেন্দ্রও ওখানে স্থাপনা করেন।

সতীশবাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সেবাকেন্দ্র স্থাপনের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সান্তাহারেই ছিলেন—হয়ত বা তাঁর দাদার প্রতিনিধি হিসেবে। কোনও বিশেষ কাজের ভার যে তাঁর উপর অর্পিত ছিল তা মনে হয় না, তবে তিনি কলকাতা ও সান্তাহারে প্রায়ই যাতায়াত করতেন।

আর্তত্রাণের অর্থ নিয়ে কেনা-বেচার কারবার করা সঙ্গত বা আইন সিদ্ধ কি না, তা নিয়ে সংশয়ের শেষ না হওয়ায় স্থির হয়, 'খাদি-প্রতিষ্ঠান' নামে একটি জনহিতকর ও পল্লী-পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গঠন করে পূর্বের স্থিরীকৃত পরিকল্পনানুযায়ী কাজ সুরু করা হবে—পল্লীর বিবিধ পণ্য, প্রধানতঃ খাদিবস্ত্র উৎপাদন, ক্রয় ও সহরের কেন্দ্রগুলি মারফৎ বিক্রয়ের ব্যবস্থাসাধন, এবং জনহিতকর একটি 'ট্রাষ্ট'-এর নিয়মানুযায়ী প্রতি বছরের শেষে প্রতিষ্ঠানের শিল্পোদ্যোগের আয়-ব্যয় বিবরণী জনসাধারণ্যে প্রচার করা হবে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী উত্তর-বঙ্গ বন্যা-ত্রাণ-সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থসহ অন্যান্য বিবিধ দান-সামগ্রী খাদি-প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত করা হয় এবং ভবিষ্যতে উক্ত ত্রাণ-সমিতির সকল কাজের ভার ঐ নব-প্রতিষ্ঠানে বর্তায়।

সুভাষবাবু অবসর গ্রহণের পর থেকে এইভাবেই কাজ চলতে থাকে। সহরবাসীরা খাদি-প্রতিষ্ঠান মারফৎ গ্রামের ঘানির খাঁটি সরষের তেল, চরকায়- কাটা সুতোর বিবিধ রকমের খদ্দর, ঢেঁকি ছাঁটা চাল, গাওয়া ঘি, ছানা, ক্ষীর, মধু, এমন কি বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী দিয়াশলাই পর্যন্ত পেতে থাকেন।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত খাদি-প্রতিষ্ঠানের

ঐ সব দ্রব্য কমবেশী নানা কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হত।

তারপর এল যুদ্ধ, বোমাবর্ষণ, এল দুর্ভিক্ষ, কণ্ট্রোল, চোরা-কারবার, উচ্চ মূল্য, গ্রাম ও সহরের জনজীবন নানাভাবে বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত।

ধীরে ধীরে খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকল।

সর্বোপরি এল দেশ-বিভাগ। তারপর প্রায় সবই শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু, না, তা হল না।

১৯৩০।৩১ সালে, লবণ সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি-পর্বে, মহাত্মাজীর দাণ্ডি-যাত্রার সময় থেকেই, খাদি-প্রতিষ্ঠানের সোদপুর 'আশ্রমে' আসন্ন আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি-কল্পে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকদের বিবিধ প্রকার শ্রমসাধ্য কাজে ও নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। বাঙ্গলাদেশে এ আন্দোলনের সুরুতে লক্ষ্মীকান্তপুরে ও মহিষবাথানে প্রথম যে নুন-তৈরীর প্রয়াস হয়, তার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ঐ সোদপুর আশ্রম থেকেই আসে। অবশ্য, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক যায় কালিকাপুরে এবং লবণ-আইন অমান্যের অপরাধে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়, কারাবাস ঘটে অনেক স্বেচ্ছাসেবকের।

১৯২৩ সালে স্বরাজ্যদল গঠনের পর থেকেই খাদি প্রতিষ্ঠান গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দলের অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তির পর বাঙ্গলা কংগ্রেসে নতুন করে যে দলাদলির সূত্রপাত হয়, তাতে এই খাদি-প্রতিষ্ঠান, তথা সতীশবাবু ও তাঁর নিযুক্ত কর্মিবৃন্দ, সুভাষ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালের কংগ্রেসী আন্দোলনে, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পর, বাঙ্গলাদেশে গান্ধীবাদ প্রচারকার্যে সতীশবাবু, তথা খাদি-প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য, বস্ত্রাত্রাণ সমিতির অর্থ ও কর্মক্ষেত্রের দাক্ষিণ্যে যার সূত্রপাত, তা অনতিকাল মধ্যে শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্রে রূপান্তরিত হয় এবং যে সুভাষচন্দ্র তাঁর অতুলনীয় সংগঠনশক্তি ও সেবাব্রতে অসামান্য আন্তরিকতা বলে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও শক্তিদাতারূপে আবিসম্বাদী পুরোধার আসনে প্রতিষ্ঠিত—সেই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধেই এ-প্রতিষ্ঠানের সব শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করা হয়।

যাহোক্, খাদি-প্রতিষ্ঠান আজও খদ্দর বিক্রি করে—(কে তৈরী করে তা জানা যায় না)। আর সোদপুর থেকে প্রকাশিত গান্ধীজির গ্রন্থাবলীর বাঙ্গালা সংস্করণ ওখান থেকে প্রকাশিত ও বিক্রি হয়।

এখন খাদি প্রতিষ্ঠানের পূর্বের ন্যায় নানাস্থানে শাখা-প্রশাখা নেই। শুধু কলেজ স্কোয়ারে একটি কেন্দ্র আছে, আর সোদপুর আশ্রমে আছে কিছু কর্মী। কাজ এখন কি হয়, অন্য কোথাও হয় কি না, জনসাধারণে তা আর বিজ্ঞাপিত হয় না।

* * *

(ক্রমশঃ)

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

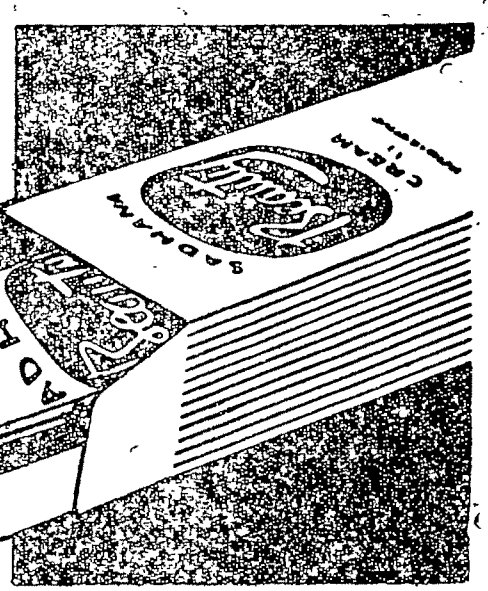

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শোভা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

আব্‌দুল গাফ্‌ফার খাঁন

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

অনেকে বলেন আর্যজাতি উত্তর-মেরু থেকে ভারতে পঞ্চনদের তীরে এসেছেন, কেউ বলেন মধ্য এশিয়া থেকে ; আবার এমন পণ্ডিতও আছেন যাদের ধারণা দুটো মতামতই ভুল ; আর্যরা আর্যাবর্তেরই মানুষ, যে দেশটা ছিল পঞ্চনদ, কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জুড়ে ; এদের প্রভাব ছিল আফ্‌গানিস্তান অবধি। প্রমাণ হিসেবে এঁরা বলেন যে বেদের আর এক নাম শ্রুতি অর্থাৎ শুনে শুনে মুখস্থ রাখার গ্রন্থ। যারা গ্রন্থকে গ্রন্থ স্মরণ রাখতে পারেন তারা আদি বাসভূমির কথা বেদ রচনার সময় বেমালুম ভুলে গেলেন,—এটা সম্ভব নয়। শিক্ষিত আফ্‌গানরা এখনও নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দেয়, এমনকি ওদের সরকারী বিমান লাইনের নাম আরিয়ানা।

এহেন মানচিত্রের ওপর সীমান্ত প্রদেশকে বসালে পাঠানরা হয় আর্যজাতির অন্যতম শাখা। দেশটা পর্বতসংকুল হওয়াতে হাজার বৈদেশিক অভিযানের পরেও ওরা চেহারা বা রক্তের দিক দিয়ে বাঙালীর মতন বর্ণশংকর জাত নয়।

ছোট বয়েস থেকে পাঠান জাত সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা এক পুলিশ সাহিত্যিকের লেখা "পাঠান মুল্লুকে" পড়ে। এটা কত ভুল তা ওদের মধ্যে দু'মাস বাস করে বুঝেছি। দ্বিতীয় প্রমাণ, পাঠানরাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আফ্‌গানিস্থানে যেতে সাহায্য করেন। তৃতীয় এবং সবার বড় প্রমাণ খান আব্‌দুল গাফ্‌ফার খাঁন।

সংখ্যার দিক দিয়ে ইউরোপের জাতগুলো উপজাতি ছাড়া কিছুই না। বিদ্যাবুদ্ধি ও যুদ্ধ করবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ফলে ওরা জাতির পর্যায়ে উঠেছে। ১৮৪৮-এর আগে জার্মানরা ছিল প্রায় শ'খানেক জমিদারীতে বিভক্ত ; সেইজন্যে ওদের জাতীয় সংগীত ঐক্যের বাসনার ভিত্তিতে "ডয়েস্টলাণ্ড্‌, ডয়েস্টলাণ্ড্‌, উবের আলেস্‌।" অর্থাৎ ছোট ছোট জমিদারী ও ডিউক-ডাচেস্‌দের ওপরে জার্মানী। উপমহাদেশে এই ধরণের ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গজায় নি, তার কারণ আমাদের সম্প্রদায় অনেক, ভাষা অনেক, জাতির মধ্যে উপজাতি, তার ওপর বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, বৈদ্য, শূদ্র। আমাদের বিদেশী শাসকরা এই পার্থক্যটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন। তার

ওপর শেষের দিকে ওরা চালু করলো শ্রেণী-সংঘর্ষ। আমরা আজও বিদেশীর সৃষ্ট নির্দয়ায় পরমানন্দে ডুবে আছি। এই কারণে আমি সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি সমস্যার কথা আলোচনা করতে চাইনা। ইতিহাসের কাছে মানুষ, স্বাধীনতা ও দেশটাই বড়। ইতিহাস জানতে চায় না কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে সৈয়দ, কে গুজর, কে শিয়া, কে সুন্নী, কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র। বিদেশী সবাইকে বুটের ঘায়ে শায়েস্তা করেছে। যাদের শায়েস্তা করতে পারেনি তাঁরা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠেছেন, হয়েছেন জনগণমন-অধিনায়ক, যেমন নেতাজী, যেমন মুজিব, যেমন আবদুল গাফ্‌ফার খাঁন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উৎমানজাই গ্রামে আবদুল গাফ্‌ফার খাঁন-এর জন্ম হয়। গ্রামটী নওশেরা ছাউনীর ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আবজাই নামে একটী ছোট্ট নদীর তীরে। বাপের নাম বায়রাম খাঁন, ঠাকুর্দা সৈফুল্লা খাঁন ও প্রপিতামহ ওবেইদুল্লা খাঁন। ওবেইদুল্লা আহামদশা দুরাণীর হাতে মরেছেন সৈফুল্লা ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এদের কাহিনী মা'র কাছে শুনে শৈশবকাল থেকে গাফ্‌ফার খাঁন-এর স্বাধীনতা স্পৃহা জাগে।

তখনকার দিনে মোল্লারা ইংরেজের ধামাধরা ছিল। ওরা আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে; কারণ হিসেবে ওরা বলত আধুনিক শিক্ষা পেলে মুসলমান বিধর্মী হয়ে যাবে। আসলে ওরা মোল্লাদের হুকুম মানবে না। এজন্যে ইংরেজ শাসকরা পাঞ্জাব থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মোল্লা আমদানী করত সীমান্ত প্রদেশে। এদের অনেকে কোরাণ শরীফ মুখস্থ বলতে পারতেন কিন্তু তার অর্থ বুঝতেন না। বালক গাফ্‌ফার এই ধাপ্পাটী ধরতে পেরে তাঁর মা-বাপকে বল্লেন। ছেলের কোরাণ শরীফ পাঠ শেষ হওয়া মাত্র বায়রাম খাঁন ছেলেকে পেশোয়ারে এক আধুনিক ইস্কুলে পাঠালেন। প্রতিবেশিনীরা এসে তার মাকে খবর দিলে মোল্লারা খাঁন পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। মা মৃদু হেসে ওদের বল্লেন, "হজরৎ মহম্মদ বলেছেন জ্ঞানের জন্যে দরকার হলে সুদূর চীনে যাবে, পেশোয়ার তো পাশের গ্রাম। মোল্লারা ঠিক, না আমাদের পয়গম্বর ঠিক।"

এরপর ক্যাম্বেলপুর, তারপর আলীগড়। এখানে থাকার সময়—গাফ্‌ফার খাঁ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পাদিত আল্ হিলাল পত্রিকা পড়েন। এই পত্রিকাখানির প্রবন্ধগুলো' তাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। তরুণ গাফ্‌ফার বুঝলেন ইস্‌লাম ও স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য—যে কথাটা তাঁর স্বদেশী মোল্লারা বলেনি। পাঠ অসমাপ্ত রেখে তিনি চল্লেন সীমান্ত প্রদেশে।

সীমান্ত প্রদেশ নামটা ইংরেজের দেওয়া। ১৯০১-এ এই অঞ্চলটাকে পাঞ্জাব থেকে আলাদা করে একটা নতুন প্রদেশের প্রতিষ্ঠা হল। এর এক বিষময় ফল হল এই যে, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের অধিকার যা বাকী ভারতে চালু হয়েছে তার ছিটে ফোঁটাও সীমান্তবাসীরা পায়নি। এটা গাফ্‌ফার খাঁ বিশদভাবে অবগত হয়েছিলেন

আল্‌ হিলাল পত্রিকার পাণ্ডিত্যভরা প্রবন্ধগুলো পড়ে। তিনি ঠিক করলেন পাঠান জাতিকে শিক্ষার আলো দেখাতে হবে।

১৯১০-এ তিনি স্বগ্রামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তার শিক্ষার মাধ্যম হল পাখ্‌তুন ভাষা, উর্দু নয়, আরবী নয়, ফার্সী নয়—। দেখতে দেখতে এই ধরণের ইস্কুল সীমান্তের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এই বিদ্যালয়গুলোর মান ও পাঠ্যতালিকা দিল্লীর দেওবন্দ্‌ মাদ্রাসার মতন। দেওবন্দের শিক্ষার ভিত্তি স্বাধীন মন, উদারতা ও দেশপ্রেম; যেমন আলীগড়ের শিক্ষার ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা আর পরদেশীর দাসত্ব। তখন দেওবন্দ, আল্‌ হিলাল ও গাফ্‌ফার খাঁন এক সূত্রে গাঁথা।

পিতা বৈরাম খাঁ শিক্ষিত ও উদার ব্যক্তি। তিনিও আল্‌ হিলাল পড়তেন এবং নানা রাজনৈতিক মতবাদ ও ঘটনা নিয়ে ছেলের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ইংরেজ শাসক ও তাদের দালাল মোল্লারা ছেলের বিরুদ্ধে কি বলত তাও তিনি জানতেন। ছেলে হেসে জবাব দিত যে মোল্লারা যদি পাঠানদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিত তাহলে তাঁকে আর এই ঝামেলা পোয়াতে হত না। বায়রাম খাঁ আর দেরী না করে ছেলের বিয়ে দিলেন। গাফ্‌ফার খাঁর বয়স তখন ২২, লম্বায় ছ ফুট তিন ইঞ্চি। সেটা ১৯১২ সাল।

দুটী সন্তানের জন্ম দিয়ে তাঁর স্ত্রী ১৯১৫তে প্রাণত্যাগ করলেন। ভগ্নহৃদয় গাফ্‌ফার আবার কর্মের মধ্যে ডুবলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। তাঁর বহু সংগী-সাথী গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে হয় স্বাধীন এলাকায় আত্মগোপন করলেন না হয় দেশ ছাড়লেন। দেওবন্দের মওলানা হাসান গেলেন মক্কায়। সেখানকার শাসক শরীফ হুসেন তাঁকে ইংরেজের হাতে তুলে দেন।

তখন ইংরেজ সরকার সীমান্তের সমস্ত স্বাধীন বিদ্যালয়গুলো বেআইনী ঘোষণা করেছে। পাঠানরা ক্ষুব্ধ। তবু জাতীয় স্বাধীনতার স্পৃহা তেমন ব্যাপক নয়। ১৯১৮তে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড আইনে বাকী ভারতকে যেটুকু অধিকার দেওয়া হয়েছিল পাঠানরা তাও পেলেন না। এবিষয়ে গাফ্‌ফার খাঁন বহু বক্তৃতা দিলেন। ১৯১৯-এ ব্যক্তি-স্বাধীনতাবিরোধী দুটী আইন ভারত সরকার চালু করলেন; এ দুটী বিল-এর নাম রাওলাট্‌ বিল্‌স্‌। (এর আসল রচয়িতা একজন ভারতীয় আইনজীবী। বাঙালীরা তার নামকরণ করেছিল রাওলাট মিত্তির)। বাকী ভারতে উত্তেজনার ঢেউ তখন সীমান্তের পর্বতে আছড়ে পড়ছে। এদিকে বিদেশীর তাঁবেদার জির্গাগুলো নিষ্ক্রিয়। গাফ্‌ফার খাঁ দেখলেন যে সর্বভারতীয় ধারার সংগে পাঠান জাতিকে যুক্ত করবার এই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি বাবা-মাকে বল্লেন, "তোমরা আমার জন্যে দোয়া কর, আমি রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গ্রামে সভা আহ্বান করছি।" বাপ হেসে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমিও যাচ্ছি গাফ্‌ফারের মিটিংএ, আমার জন্যেও দোয়া কর।" তার পর বাপ-ব্যাটা ঘোড়ায় চড়ে চল্লেন বিরাট

জনতার সমাবেশে। বায়রাম খাঁনের বয়েস তখন নব্বই।

এর পরেই অবশ্য গাফ্‌ফার খাঁনকে গ্রেপ্তার করা হল, তারপর দু' মাসের জেল। ইতিমধ্যেই আর এক অগ্ন্যুৎপাৎ ঘটেছে। ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯, অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

গাফ্‌ফার খাঁনকে আনা হল পেশোয়ার জেলে। সেখানে তিনি দেখেন বাপ বায়রাম খাঁ আর বেশ কয়েকজন আত্মীয় জেলে। ছেলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এখানে কেন?" বাপ হেসে বল্লেন, "জেল না হলে তোর সংগে রোজ দেখা হতনা ভাই; এখন আল্লাকে ধন্যবাদ দে যে আমাদেরও কারাদণ্ড হয়েছে।"

সেই বছরেই কারামুক্তির পর গাফ্‌ফার খাঁন আবার দারপরিগ্রহ করলেন।

সীমান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ, এর পর্বতগুলোর উচ্চতা চিত্তবিহ্বলকারী। এদেশের মানুষ আজন্ম সৈনিক; মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আগে থেকে আজ অবধি যুদ্ধ এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। এই মহান ভূমি এবং তার সক্ষম অধিবাসীরা যেন কোন এক পরশমণির স্পর্শের অপেক্ষায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই পরশমণির ছোঁয়া এল এক বিরাট চরিত্রের মাধ্যমে। সূর্যের মহাতেজ যেমন ক্ষুদ্র আতস কাঁচের মধ্যে দিয়ে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালায়, তেমনি সর্বভারতীয় ধ্যান, ধারণা, কর্মোদ্যম মহাপুরুষ গাফ্‌ফার খাঁর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হল পর্বতস্তনিত পাঠানভূমিতে।

১৯২০ দিল্লীতে খিলাফৎ সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ ও বহু নেতা যোগ দেন। আবদুল গাফ্‌ফার এলেন। গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনকে বলেছিলেন "শতাব্দীর সুযোগ" অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানকে একাত্ম করবার সুযোগ।

খলিফা ছিলেন বিশ্ব-ইসলামের ধর্মগুরু এবং সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তুর্কীর সুলতান। প্রথম মহাযুদ্ধে গান্ধীজী স্বয়ং ব্রিটিশকে সাহায্য করেছেন, হাজার হাজার মুসলমান ব্রিটিশের হয়ে খলিফার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তখন খলিফার সমর্থনে ভারতে একজনও একটা উচ্চবাচ্য করেনি। যুদ্ধ শান্তির পরে যখন মহাবীর কামাল আতাতুর্ক সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তখন ইংরেজ, গ্রীস, ইটালী ও ফরাসী সরকার অপদার্থ তুর্কী সুলতানকে সাহায্য করছে। তখনও কেউ কোনও কথা বলেন নি। হঠাৎ ১৯২০-এর সুরুতে খলিফার পক্ষে কেন আন্দোলন আরম্ভ হল সেটা দুর্বোধ্য। তুর্কী সরকার ১৯২৪ এর ৩রা মার্চ খলিফার পদ বিলুপ্ত করে।

সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাবে খেলাফৎ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। মোল্লাদের প্ররোচনায় আন্দোলনটা দাঁড়ালো দেশত্যাগে। এর নাম দেওয়া হল হিজরৎ। মানুষ, ঘর-বাড়ী, জমি-জিরেৎ, দোকান-পাট বিক্রী করে চল্ল আফগানিস্তানে। হঠাৎ শত সহস্র মানুষ দেশে ঢোকাতে তাদের আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার

ব্যবস্থা করতে মহানুভব বাদশা আমানুল্লা বিব্রত হলেন। রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। বাদশার গুপ্তচররা কিছু লোককে গ্রেপ্তার করলো, কিছু মোল্লা, কিছু গুণ্ডা, কিছু ছিঁচকে চোর। জেরায় বেরিয়ে পড়ল ব্রিটিশের চর। ব্রিটিশের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। ওরা বুঝেছিল যে এই হিজরৎ আন্দোলনে সাহায্য করলে গাফ্‌ফার খাঁনের মতন মহৎ নেতারাও দেশত্যাগ করবেন, ল্যাঠা চুকবে। বাদশার কাছে আগেই খবর গিয়েছিল উৎমানজাইয়ের খাঁন একজন মহান চরিত্রবান ব্যক্তি; তাকে দাওয়াৎ দিয়ে তিনি সসম্মানে কাবুলের রাজপ্রাসাদে এনে ব্যাপারটা বল্লেন। গাফ্‌ফার খাঁর আগে থেকেই সন্দেহ হয়েছিল ব্রিটিশভক্ত মোল্লাদের দেখে। বাদশা আমানুল্লার কথায় সন্দেহটা বিশ্বাসে পরিণত হল। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপারে আমানুল্লার সংগে নানা ব্যবস্থা করে অনুচরদের নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন।

১৯২০-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হ'ল। এটা আমার কাছে একটা হারানো সুযোগের ঘটনা ও দুঃখের ঘটনা। দেশবন্ধু এই অধিবেশনে হাজির, গাফ্‌ফার খাঁন হাজির; দুজনেই অহিংস-পন্থী; দুজন দুই প্রান্তীয় প্রদেশের নেতা; অথচ এঁদের মিলন তো দূরের কথা সাক্ষাৎও হল না। এটা হলে বাংলা ও সীমান্ত একাত্ম হত কারণ বাঙালী কখনও গান্ধী-জহরলালের মতন সীমান্তে গণভোটের পক্ষে মত দিতনা, বীর পাঠানদের নেকড়ের মুখে ফেলে দিত না।

এর পর থেকে গাফ্‌ফার খাঁর জীবন শুধু জেল আর জেল। এঁর কারাজীবনের দৈর্ঘের কাছে উপমহাদেশ কেন পৃথিবীর যে কোনও রাজবন্দীর কারাজীবন তুচ্ছ। গাফ্‌ফার খাঁন ভারতের স্বাধীনতা যোদ্ধা, তার খুদাই খিদ্‌মদগাররা ভারতের স্বাধীনতা-যোদ্ধা অথচ এদের কারাজীবন আজও শেষ হয়নি।

১৯২১-এ আবার কারাবরণ। এটা গান্ধীজী বা নেহেরুর কারাবরণ নয়। অহিংসার ঋষি গাফ্‌ফার খাঁন সীমান্তের কারাগারে কি শারীরিক নির্যাতন ও অপমান সহ্য করেছেন তা ভারতবাসী আজও জানেনা। তার অনুচর খুদাই খিদ্‌মদগাররাও অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত, তারাও জাতীয় কংগ্রেসের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

এই অভাবনীয় পরিবর্তন রণোন্মাদ পাঠানদের ভেতর এল কি করে? ওর উত্তর একটা নাম—আবদুল গাফ্‌ফার খাঁন। ইনি উপলব্ধি করেছিলেন হত্যা করে প্রতিশোধ এমন এক প্রথা যার অন্ত নেই। এই প্রতিশোধের ইচ্ছায় ইন্ধন জুগিয়ে বিদেশীরা সীমান্তকে পদানত রেখেছে। এই বিষের কাটান হচ্ছে আপোষ, ক্ষমা ও প্রেম। এই বিশ্বাসে ইনি আজও অটল। গান্ধীজী বহুবার বদলেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সৈন্য জুগিয়ে বলেছেন "আমি হিমালয় প্রমাণ একটা ভুল করেছি।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্রথমে যুদ্ধ বিরোধী, তার পর বল্লেন, "স্বাধীনতা দিলে যুদ্ধে

সাহায্য করব।" গাফ্‌ফার খাঁ তার অহিংসার শপথ থেকে আজও চ্যুত হননি।

১৯২৬-এ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি স্বগ্রামে ফিরে এলেন। আগেই বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন; মা গত হয়েছিলেন ১৯২৩-এ।

তিনি সস্ত্রীক হজ যাত্রায় চল্লেন। পুণ্যকর্ম ও মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষ হল। দুর্ভাগ্যের বিষয় পুণ্যনগরী জেরুসালেমে মস্‌জিদের সিঁড়িতে পা পিছলে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল। সংসারের সব বন্ধন তাঁর ছিন্ন হল। জাহাজে করাচী বন্দর হয়ে তিনি এলেন উৎমানজাইতে।

১৯২৮-এ মে মাসে পাখ্‌তুন পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই পত্রিকাখানি সারা বিশ্বের পাঠানদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। সুদূর প্রাচ্য ও আমেরিকায় বহু পাঠান কাজ কর্ম করত, আবার অনেকে ছিল নাবিক। এই পত্রিকা মারফৎ তাদের সংগে জন্মভূমির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল।

এই সময় থেকে গাফ্‌ফার খাঁন পুরোদস্তুর কংগ্রেসী। ১৯২৮-এ কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তিনি আসেন যোগ দিতে। কংগ্রেসী ভলান্টিয়ারদের কুচ্‌কাওয়াজ দেখে তিনি খুবই উৎসাহিত হলেন। সীমান্তে ফিরে তিনি খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার অর্থাৎ খোদার সেবক-বাহিনী গঠন করলেন। লাল পোষাকের কারণে এদের নাম হল লাল কোর্তা। এই বছরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাহোর সীমান্ত প্রদেশের কাছে হওয়াতে বহু পাঠান এই অধিবেশনে যোগ দেয়। ১৯৩০-এ সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়; এই আন্দোলনে বহু পাঠানের সংগে আবদুল গাফ্‌ফার খাঁনও গ্রেপ্তার হন। সীমান্তের নানা শহরে গুলি চলে। ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে মুক্তিলাভ, গ্রেপ্তার এবং হাজারীবাগ জেলে আটক। ১৯৩৪-এ তিনি মুক্তি পেলেন বটে তবে তাঁকে সীমান্তে ফিরতে দেওয়া হল না: তিনি গেলেন ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর আশ্রমে। এই সময় তিনি একবার বাংলায় আসেন এবং আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫-এ তিনি মুক্ত হলেন বটে তবে সীমান্তে ফিরতে পারলেন না। দু'বছর পরে পাঠান মুল্লুকে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হল, মুখ্যমন্ত্রী হলেন গাফ্‌ফার খাঁর বড় ভাই ডক্টর খাঁন। এবার তিনি স্বগ্রামে ফিরলেন।

এই সময় থেকে ব্রিটিশ সরকার ও মুসলীম লীগ নির্লজ্জভাবে একযোগে কাজ করতে লাগল। ওদের একমাত্র কাজ ছিল খুদাই খিদ্‌মদগার ও সীমান্ত কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে বাগড়া দেওয়া, মিথ্যা রটনা ও গুণ্ডামী। এই সময় নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে সীমান্ত সফর করেন। পরের বছর গান্ধীজী যান। এটা যুদ্ধ বাধার বৎসর।

১৯৩৯-এর মার্চ মাসে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন হল। সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বল্লেন, "আর ছ'মাস পরে যুদ্ধ বাধবে।" ঘড়ি ঘন্টা ধরে ছ'মাস পরে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জার্মাণীর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ঐদিন বড়লাট লিন্‌লিথগো ভারতের সংগে পরামর্শ না করেই জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই সংগে হিন্দু মহাসভা, মুসলীম লীগ, ক্রিশ্চান কনফারেন্স, লিবারাল ফেডারেশান "জী জনাব সরকার" বলে তাতে সায় দিলো। অন্যান্য কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সংগে সীমান্ত প্রদেশে খাঁন সাহেবের মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করল।

১৯৪১-এর ডিসেম্বর। বারদৌলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক বসল। একাধিক নেতা বল্লেন যে ব্রিটিশ সরকারের দাবী মেনে নিয়েই কংগ্রেস যুদ্ধে সাহায্য করবে। কিছুকাল পরে গান্ধীজী স্বয়ং এই মতে আসেন। গাফ্‌ফার খাঁন অহিংসা নীতিতে অচল। তিনি বল্লেন অহিংসাই পাঠানদের মুক্তির চাবিকাঠি; এবিষয়ে কোনও আপোষ না করে তিনি ওয়ার্কিং কমিটী থেকে পদত্যাগ করলেন। '৪২-এ আবার গ্রেপ্তার, '৪৫-এ মুক্তি।

'৪৬ এর গোড়ায় আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর মুক্তি আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল। অনেক আশা নিয়ে ভারতবাসী অপেক্ষা করতে লাগল। '৪৭ এর আগষ্টে সেই আশার মুখে ছাই দিয়ে আরম্ভ হল সাম্প্রদায়িক দাংগা। এর পরের ইতিহাস হ'ল ভারতীয় নেতাদের সিংহাসনে বসার জন্যে অশোভন ব্যগ্রতা এবং সে কারণে, ভুলের পর ভুল। যে নেহেরু '৪৬এর এপ্রিলেও বলেছিলেন, "ভাগ্যবিধাতা স্বয়ং ভারত-বিভাগ মেনে নিলেও, আমরা তা মানব না," সেই নেহেরু ভারত-বিভাগ মেনে নিলেন। '৪৭ এর ১৬ই জুলাই সীমান্তে ভোটের দিন। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাংলা সর্বত্র আইন-সভার ভোটের ফলে সিদ্ধান্ত হল, আর পাঠানদের বেলায় জুটল গণভোটের কারসাজী। দাংগার পর এক বছর প্রাদেশিক লাট সার ওলাফ্‌ ক্যারোর নেতৃত্বে সীমান্ত সরকার ও মুসলীম লীগ হীন প্রচার কার্যে নেমেছে; স্থানীয় ইংরেজ অফিসারদের মেম সায়েবরাও তাতে সাহায্য করেছে;' তখন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর খাঁন নিঃসহায়। গাফ্‌ফার খাঁন বড়লাটকে বল্লেন, "গণভোট যদি হতেই হয় তাহলে সেটা হোক পাকিস্তান না পাখ্‌তুনিস্তান প্রশ্নের ওপর। ক্ষুদ্রমনা ওয়ার্কিং কমিটীর মাতব্বররা বল্লেন, "খাঁন সায়েবের প্রভাব কমে গেছে সীমান্ত প্রদেশে তাই তিনি গণ-ভোটে নামতে ভয় পাচ্ছেন।" এই শুনে মহাপুরুষ গাফ্‌ফার খাঁর মন ভেঙে গেল। তিনি মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির ওপর মাথায় দুহাত দিয়ে বসে পড়লেন, বল্লেন, "তোবা, তোবা।" ১৬ই জুলাই সীমান্তে গণভোটের জুয়াচুরি হল, পাকিস্তান না ভারত; তাও আবার আইন সভায় ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নয়। সারা প্রদেশে মুসলীম লীগ উন্মত্ত; তার সংগে স্থানীয় ইংরেজ অফিসারবৃন্দ— ওরা চায় শত-সহস্র খুদাই খিদ্‌মদ্‌গারের ওপর প্রতিশোধ। সমস্ত লাল কোর্তা প্রতিষ্ঠান ভোট বর্জন করলো। পাকিস্তানের পক্ষে পড়ল ২,৮৯,২৪৪ ভোট, ভারতের পক্ষে—২,৮৭৪।

ভোটের আগে গাফ্‌ফার খাঁন ওয়ার্কিং কমিটীকে

বলেছিলেন, "সীমান্তে গণভোটে রাজী হয়ে আপনারা আমাকে নেকড়ের মুখে ফেলে দিয়েছেন।"

১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হল। ১৫ই পতাকা উত্তোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর খাঁন সাহেবকে প্রাদেশিক লাট সার জর্জ কানিংহাম ভয় দেখালেন যে তিনি অনুষ্ঠানে থাকলে খুন হতে পারেন। তার পর মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে আবদুল কোয়ায়ুম খানকে দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করালেন।

সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল, তরুণ পাখতুন ও খুদাই খিদমদগার সবাই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেন। তবু লীগপন্থীদের হাতে তাঁরা রোজই লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। গান্ধীজী গাফ্‌ফার খাঁনকে লিখলেন, "ভারতে চলে এস", যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে বীর পাঠান নেতা স্বদেশ ত্যাগ করবেন না।

১৯৪৮ এর ৩০শে জানুয়ারী একজন হিন্দু গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যা করে। ঐ বছর ১২ই আগষ্ট ঘটল পাকিস্তানের জালিয়ানওয়ালাবাগ। চারসাদ্দার মসজিদে বহু পাঠান নারী ও পুরুষ জুম্মার অর্থাৎ শুক্রবারের নমাজে জমা হয়েছিল। ঐ সময় মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কোয়ায়ুম খাঁন সৈন্য দিয়ে মস্‌জিদটী ঘিরে তাদের হত্যা করে। সেপ্টেম্বরে জিন্নার মৃত্যুর পর কোয়ায়ুম খানের অত্যাচার ও দুর্নীতি শতগুণ বৃদ্ধি পেল। জরুরী অবস্থা, ব্যাপক গ্রেপ্তার, গুলি চালনা, এমন কি বিমান থেকে বোমা বর্ষণ চলতে লাগল। এই নির্যাতনের লক্ষ্য হল সাধারণভাবে পাঠান আর বালুচ, বিশেষভাবে লালকোর্তা বা খোদাই খিদমদ্‌গার অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে এরা সবাই আমৃত্যু অহিংসার শপথ নিয়েছে এবং পালন করেছে। ঐ সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভাবধারা ঢুকলে কি হত কে জানে। তবু এই বীর অহিংস যোদ্ধাদের কপালে বাংলার দশগুণ নির্যাতন হল।

পাকিস্তানে মন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট ভুতের মত এল গেল, কিন্তু ক্বচিৎ কখনও ছাড়া গাফ্‌ফার খাঁর বন্দী-জীবন শেষ হল না। হয় কারাগার, না হয় স্বগ্রামে অন্তরীণ, এই হল তার জীবন। তিনি যে ভারতের স্বাধীনতা-যোদ্ধা, পাঠানরাও যে উপমহাদেশের মুক্তি-যোদ্ধা, নেমকহারাম ভারত এটা ভুলে গেলো। সরকারীভাবে আমরা শুধু দুটো নাম উচ্চারণ করতে শিখলুম—গান্ধী ও নেহেরু। সুভাষ বিস্মৃত, মহাপুরুষ গাফ্‌ফার খাঁন অবহেলিত। এরা দুজনই উপমহাদেশকে একরাষ্ট্র না হোক একাত্ম করতে পারতেন। উপমহাদেশের রাজনীতির বর্শা-ফলক বাঙালী এবিষয়ে নীরব, নিশ্চল, নির্লিপ্ত। পাঠানবীরের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, "তোবা, তোবা।"

দিদিকে যেমন দেখেছি

সুলতা গুহ চৌধুরী

বহুদিন থেকেই আমাদের জাতীয় মহিলা সংহতির সম্পাদিকা ও শ্রদ্ধেয় সুনীলদা আমাকে দিদি সম্বন্ধে কিছু বলতে বলছেন কারণ ঢাকাতে আমি দিদির বাড়ীর পাশাপাশি ছিলাম ও দিদির স্নেহভাজন ও অনুগামী ছিলাম। কিন্তু সভায় দাঁড়িয়ে কিছু বলার অক্ষমতায় এবং সীমিত বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য কিছু লিখে পড়তেও সাহসী হই নি। এদিকে আমাদের জীবনও শেষ হয়ে এল। কাজেই দিদির সঙ্গে আমার জীবনের যে সব ছোটখাট ঘটনা জড়িয়ে আছে সে কথা বলতেই আজ দিদির এই স্মরণ-সভায় দাঁড়িয়েছি।

আমাদের দিদির পিতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র নাগের বাড়ীর পাশেই দিদির প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাভবন স্কুল অবস্থিত ছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি শিক্ষাভবনে পড়তাম। দিদি তখন জেলে বন্দী। খুব সম্ভব ১৯৩৫ কি ১৯৩৬ সাল হবে, তখন দিদির পিতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিদিকে সে-সময় ঢাকা জেলে আনা হয়। প্রতিদিন দুপুরে প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে দিদি তাঁর পিতাকে দেখতে আসতেন। সেই সময় দিদির বাড়ীর আশে-পাশে কোনো অপরিচিত লোক যেতে পারত না। আমরা স্কুল থেকে দিদির বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম কখন দিদিকে একটু দেখতে পাব এই আশায়। তারপর একদিন দিদি তাঁর বাড়ীর দোতালার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আমরা প্রাণভরে দিদিকে দেখলাম। দিদি তখন আমাদের কাছে একটি পরম বিস্ময়। সারা দেশে তখন 'লীলা নাগ' একটি তেজোদৃপ্ত উজ্জ্বল নাম। বেশ মনে পড়ে সেই ছোটবেলায় আমরা ছাত্রীরা চাঁদা তুলে এক থালা মিষ্টি দিদির বাড়ী পাঠিয়েছিলাম—কিছুক্ষণ বাদে সেই থালা ফিরে এল মিষ্টি ভর্তিই—বোধহয় একটা কি দুটো নেই—থালাভর্তি মিষ্টির সঙ্গে পাঁচটি টাকা। সেই সময় ঐ টাকাতে আমাদের সকল ছাত্রীদের মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেলো। ঘটনাটি সামান্য কিন্তু ঐ ঘটনার ভিতর দিদির যে আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছিলাম দীর্ঘদিন পরেও তা ভুলতে পারি নি। তারপর স্কুলে উপরের দিকে আর ক্লাস না থাকায় শিক্ষাভবন ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৩৮ সালে শিক্ষাভবনে দিদি অষ্টম ও নবম শ্রেণী খোলেন। আমরা নবম শ্রেণীতে এংস ভর্তি হই। তখন আমাদের পড়াবার জন্য নূতন কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যতদিন পর্যন্ত আসেন নি ততদিন আমরা আট জন মেয়ে দিদির কাছে ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস সবই পড়েছি। দিদির ক্লাসের সময় দিদির পিতা মাঝে মাঝে এসে ডাক দিতেন: "বুড়ি, একটু শুনে যাও তো"? আমরা এই

"বুড়ি" ডাক শুনে মুখ টিপে টিপে হাসতাম। দিদি বলতেন "এই হাসছিস কেন? বাবা তো মেয়েকে নাম ধরে ডাকবেনই।" কিছুদিনের মধ্যেই নূতন শিক্ষক-শিক্ষিকা এলেন কাজেই দিদি আর পড়ান নি। কয়েকদিন মাত্র দিদির কাছে পড়েছিলাম কিন্তু সে কথা আজও ভুলতে পারি না। তারপর দিদির সঙ্গে ছোট-বড় নানা কাজে জড়িয়ে পড়ি।

ঢাকা জেলে দীর্ঘদিন অনশনের পর হরেন্দ্র মুন্সী মারা যান। দিদির সঙ্গে জেল গেটে হরেন্দ্র মুন্সীর মৃতদেহকে শ্রদ্ধা জানাতে যাই এবং বিরাট মৌন মিছিলে আমিই একমাত্র মেয়ে দিদির পাশে থাকি! বিরাট শোভাযাত্রায় দিদিকে সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন—তাঁর পাশে থেকে নিজেকে সেদিন ধন্য মনে করেছি, কৃতার্থ বোধ করেছি।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কংগ্রেস সভাপতির পদ ছেড়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে একবার ঢাকা আসেন। ঢাকার করোনেশন পার্কে বিরাট সভা হয়। দ্বিতীয় দিন ঢাকার টিকাটুলীতে দিদির প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষামন্দির স্কুলের প্রাঙ্গণে মহিলাদের বিরাট সভা হয়। সুভাষচন্দ্র সমবেত সকল মহিলাদের কাছে আবেদন করেন সংগঠনের কাজে সাহায্যের জন্য। সুভাষচন্দ্রের আবেদনে তখন সব মহিলারা অভিভূত হয়ে পড়লেও কি ভাবে তাঁরা সাহায্য করবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। দিদি সেই সময় প্রথমেই তাঁর হাতের চুড়ি খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভায় উপস্থিত মহিলারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বেশ মনে পড়ে আমি অন্যান্যদের সঙ্গে সভায় সাহায্য প্রার্থনায় এগিয়ে যাই এবং বহু মহিলা ও মেয়ে সেদিন অলংকার ও অর্থ দান করেন। তৃতীয় দিন দিদির সঙ্গে সমস্ত সকাল বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করি এবং বিকেলে ঢাকার ঢাকেশ্বরী বাড়ীর মাঠে যে সভা হয় তাতে সুভাষচন্দ্রকে সেই অর্থ দেওয়া হয়। সে-সময় তিন-চার দিন দিদি ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি এবং সুভাষচন্দ্রের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছি।

১৯৪১ সালে দিদি আমাদের নিয়ে ঢাকাতে "1941 Club" গঠন করেন। সেখানে লাঠি-খেলা, ছোড়া-খেলা ইত্যাদি শেখানো আরম্ভ হয়েছিল। স্বর্গীয় স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তখন ঢাকা এসেছিলেন। দিদির অনুরোধে তিনি এই ক্লাবের উদ্বোধন করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার এই Club ban—নিষিদ্ধ—করে দেয়।

দিদি যখনই ঢাকা থেকে কলকাতা আসতেন আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম কবে দিদি ঢাকা ফিরবেন। একবার দিদি ও দাদা—বিপ্লবী নেতা স্বর্গত অনিল রায়,—সুর্মা ভ্যালিতে একটি সভায় যান যোগদানের জন্য। সেখানে দিদি ইংরেজীতে চমৎকার একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণ হুবহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আমার বাবা এই ভাষণ পড়ে বলেছিলেন যে এটা অনিলচন্দ্র রায়ের composition। তাতে আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগে। কিছুদিন পরে দাদা ঢাকা এলে দাদাকে আমি এ-কথা জিজ্ঞাসা করি। দাদা তখন বলেন: "তোদের দিদি আমার চাইতে অনেক ভাল ইংরেজী জানেন। গান্ধীজী পর্যন্ত দিদির ইংরেজী শুনে বলেছিলেন

যে তিনি একজন বাঙালী মেয়ের মুখে এত ভাল ইংরেজী শোনেন নি।"

আজ মেয়েরা একা একা বাড়ী থেকে বাইরে যাচ্ছেন, সর্বত্র যাতায়াত করছেন কিন্তু সে সময় কেউ ঢাকায় একা একা বের হতে সাহস পেতেন না এবং বাড়ী থেকেও অনুমতি দিত না। আমরা যেটুকু কাজ করেছি সবই গোপনে ও বাড়ী পালিয়ে। কোনো জায়গায় যাবার কথা হলে দিদিকে যখন বলতাম বাবা অনুমতি দেবেন না; দিদি বলতেন: "বোকা মেয়ে, বাবাকেও যদি মত করাতে না পারিস তা হলে দেশের কাজ করবি কি করে।" কোনমতেই যাওয়া সম্ভব না হলে দাদাকে এসে ধরতাম: "দাদা আপনি দিদিকে একটু বুঝিয়ে বলুন"। দিদির কাছে বলবার সাহস না পেলেও দাদার কাছে পেতাম।

১৯৪২ সালে দিদি ও দাদা জেলে যাবার পর বহুদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ১৯৪৮ সালে যখন আমি কলকাতায় আসি তখন খুব ইচ্ছে ক'রতো দিদি ও দাদার সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু কিছু কাজ না করার জন্য নিজের মধ্যে একটা অপরাধ-বোধ ছিল, সে-জন্য যেতে পারিনি। '৪৮ সালের বিজয়া দশমীর পর দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন দিদি রাগ করলেন কেন এতদিন দিদির সঙ্গে দেখা করিনি। আমি যখন বললাম: "আমি কিছু কাজ করতে পারি না, বলে আপনার কাছে আসতে পারি নি"। দিদি বললেন: "বোকা মেয়ে সবাই যে সব সময় কাজ করতে পারবে তার কি মানে আছে —তোর যে কাজ করার মন আছে আমি তাতেই খুশী।" সেদিন যে আমার কি ভাল লেগেছিল তা বলতে পারব না। তারপর আস্তে আস্তে "জাতীয় মহিলা সংহতি" ও এটা-সেটার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি।

এন্টালীতে আমাদের একটি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র এবং দুগ্ধ-বিতরণকেন্দ্র ছিল। একবার পূজার সময় সেই কেন্দ্র থেকে বেশ কিছু দুধ চুরি যায়। আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্যা শ্রীযুক্তা শোভা ঘোষ ও আমি এ-সবের দায়িত্বে ছিলাম। দু'জনে পরামর্শ করে পরে দিদিকে জানাই এ দুধ চুরির কথা। দিদি পুলিশে খবর দেবার বন্দোবস্ত করেন এবং Red Cross-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আবার দুধের ব্যবস্থা করেন। তারপর আমি ও শোভাদি যখনই দিদি কাছে গেছি দিদি অমনি বলতেন "দুধ চোররা কি বলে"? গাফিলতির জন্য দিদির কাছে বকুনি খেয়েছি ঠিকই আবার ছোট-খাট বিষয়ে খুবই কৌতুক করে আমাদের আনন্দও যথেষ্ট দিয়েছেন।

দিদি একবার আমাদের কয়েকজনকে নাকতলার বাড়ীতে ডেকেছিলেন। আমি পারিবারিক কারণে যেতে পারব না জানিয়ে দিদিকে একটা চিঠি post করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার গিয়েছিলাম৪। দিদি আমাদের সবাইকে বলেছিলেন "সুলতা আমার রিক্রুট কিনা, সেজন্য ওর এই কর্তব্যবোধটা আছে।" মাঝে মাঝেই দিদি আমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য meet করতেন। কাজে গাফিলতি দেখলেই দিদি বৈঠক ডেকে আমাদের তিরস্কার করতেন ও নানা উপদেশ দিতেন। তাতে আমরা আবার কাজে উৎসাহী হয়ে উঠতাম।

অসুস্থ হবার কিছুদিন আগেই দিদির নাকতলার বাড়ীতে একটা বৈঠক ডেকেছিলেন। সেই বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়—দিদির

আশানুযায়ী আমরা কাজ করতে পারি না, করণীয় কর্তব্য ঠিকমত করতে পারছি না ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সেদিন একদিকে যেমন আমাদের সজাগ ও সচেতন করেছেন অন্যদিকে প্রবল তিরস্কারও করেছেন। সেই তিরস্কারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আমাদের আজকের জাতীয় মহিলা সংহতির সম্পাদিকা। হয়ত তার কাছেই দিদির expectation বেশী ছিল। সবাই প্রবলভাবে তিরস্কৃত হয়ে মাথা নীচু করে আছি। কিন্তু আশ্চর্য, বৈঠক শেষ হবার পর দিদি আমার হাত ধরে বললেন "তুই যাবি না, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। তোর খুব খারাপ লাগছে, না।" আমি বিস্মিত হয়ে বলি: "কেন দিদি"? দিদি বললেন: "তোর বোনকে এত বকাবকি করেছি তোর খারাপ লাগাই স্বাভাবিক"। আমি তো অবাক, কারণ আমার কিছুই মনে হয় নি। কিন্তু দিদি আমার হাত ছাড়ছেন না। আমি দিদিকে বোঝাতে পারছি না যে এটা একেবারেই ঘটনা নয়; কারণ আমি জানি যাদের উপর যত বেশী দাবী ও অধিকার দিদি তাদেরই বকেন বেশী। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে বলে দিদি বললেন: "এখন বাড়ী যা, এর পর তোকে একদিন একা ডেকে পাঠাবো তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে"। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কিছুদিনের মধ্যেই দিদি অসুস্থ হয়ে পড়লেন—সে ডাক আর আসে নি।*

* ১২ই জুন, ১৯৭৮, ১১০ শরৎ বসু রোডস্থিত সাউথ সুবারবান ব্রাঞ্চ স্কুলে জাতীয় মহিলা সংহতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর ৮ম বার্ষিকী স্মরণ-সভায় স্মৃতি-চারণ। জঃ সঃ

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১২·০০। ষাণ্মাসিক ৬·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী

অফিস: ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর

অষ্টম স্মরণ-সভা

১২ই জুন ১৯৭৮ সোমবার জাতীয় মহিলা সংহতির উদ্যোগে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর অষ্টম স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সেদিন সকাল ৬টায় দেশনেত্রীর সহকর্মী ও অনুরাগীবৃন্দ, অন্যান্য বছরের ন্যায়, কেওড়াতলা শ্মশানে আটটি দীপ জ্বালিয়ে ধূপসহ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সমবেত রবীন্দ্র-সঙ্গীত, একক রবীন্দ্র-সঙ্গীত, উপনিষদ, গীতা ও চণ্ডীর শ্লোক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শ্মশান-তর্পণ সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যা ৬॥০ টায় ১১০, শরৎ বসু রোডে অবস্থিত ভবানীপুর সাউথ সুবারবান ব্রাঞ্চ-স্কুলের হল-ঘরে স্মরণ-সভায় পৌরোহিত্য করেন দেশনেত্রীর সহকর্মী, বিশিষ্ট সমাজসেবী, প্রাক্তন রাজবন্দী শ্রীমতী আশা রায়।

সভার উদ্বোধন ক'রে জাতীয় মহিলা সংহতির সম্পাদিকা শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ দেশনেত্রীর তেজোদৃপ্ত বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বলেন রাজনীতি ছিল দিদির কাছে এক জীবন দর্শন। অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী এম, পি বলেন কিশোর বয়স থেকে দেশনেত্রীর কর্মময় বৈপ্লবিক আদর্শের রূপায়ণ বিভিন্ন পর্যায়ে দেখে এসেছেন। দেশনেত্রী লীলা রায়ের পাশাপাশি একমাত্র সরোজিনী নাইডুর কথাই অধ্যাপক চক্রবর্তী স্মরণ করতে পারেন। কোনো কোনো বিষয়ে তার বিচারে দেশনেত্রীই শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। প্রাক্তন বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন বলেন এক সময় দেশনেত্রীর অসাধারণ নেতৃত্বে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে পথ-চলার সুযোগ হয়েছিলো। শ্রীমতী ইরা চ্যাটার্জী বলেন দেশনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ভেতর দিয়েই তিনি তাঁকে দেখেছেন, সে-ও এক অনন্য ব্যক্তিত্বকে দেখা ও জানা।

শ্রীমতী সুলতা গুহ চৌধুরী ছাত্রীজীবনের এবং পরবর্তীকালের স্মৃতি-চারণ করে বলেন 'দিদির নেতৃত্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কাছাকাছি আসবার ও তাঁর আশীর্বাদ লাভের সুযোগ হয়েছিলো। দিদি বলেছিলেন কাজের মনটাই বড়ো কথা, সবাই সব সময় কাজ করতে পারেনা।' শ্রীমতী গীতা বসু মল্লিক বলেন 'বিপ্লব ছিল দিদির জীবন-ধর্ম। এই জীবন-ধর্মের আকর্ষণে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিয়ে গেছেন এবং আত্মিক-শক্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন।'

শ্রীমতী শিপ্রা বসু বলেন 'দিদি সারাজীবন আদর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি করেছেন'। ডঃ ফুলরেণু গুহ বলেন 'তিনি অপূর্ব সংগঠন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।'

সভানেত্রী শ্রীমতী আশা রায় বলেন দিদির মন্ত্র ছিল মানুষকে ভালবাসার। বিপ্লবের কঠোর সাধনায়ও এই মন্ত্রই তাঁকে শক্তিদান করেছিলো।

সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুধা মাইতি, পান্না বসু রায়চৌধুরী। বহু প্রাক্তন বিপ্লবী ও দেশনেত্রীর সহকর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভাষা-বর্জন ঃ নোঙরহীন নৌকা

কথা উঠেছে ভাষা-শিক্ষা স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রমে অপরিহার্য কিনা! কথাটা একেবারেই হাল আমলের, নতুন। এ-যাবৎ এই বিষয় নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিলো না। যারা কলা-বিভাগের ক্লাসের স্নাতক ছাত্র-ছাত্রী, তাদের ইংরেজী ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পাঠক্রম আবশ্যিক ছিল এবং এই দুই বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ন্যূনতম নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ না হ'লে স্নাতক ডিগ্রিলাভে তারা বঞ্চিত হ'তো। ইংরাজী ও বাংলা যে-সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে আবশ্যিক ছিলো, সে-সময়ও পরীক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান পরীক্ষকদের একদিকে যেমন প্রায় সংজ্ঞালুপ্তির সীমানায় হাজির করেছে, অন্যদিকে মুখে বিদ্রূপের স্মিতহাস্য ফুটিয়ে তুলেছে। বিশ দশকের এমনি কয়েকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে—যে সময় ভাষাশিক্ষার বাঁধুনি ছিল, সাধারণভাবে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের ব্যগ্রতা ছিল, পাঠক্রম বিশুদ্ধভাবে অধিগত করবার দুর্বার প্রেরণা ছিল।

বিশ দশকে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার একটি ঘটনা। এই পরীক্ষায় ইংরেজী থেকে বাংলায় তর্জমার জন্য মোটা নম্বরের প্রশ্ন থাকতো। এইরূপ পুনর্তর্জমার (retranslation) একটি প্রশ্নে বলা হয়েছিলো'.....bullets were extracted from his body...', অন্যান্য বাক্য-বিন্যাসের মধ্যে এই বাক্যটির বাংলা তর্জমার জন্য। এক পরীক্ষার্থী নির্বিকারচিত্তে তর্জমা করেছিলেন...'তাহার শরীর হইতে ছোট ছোট ষাঁড়ের বাচ্চা বাহির করা হইয়াছিল'। পরীক্ষক তো উত্তর দেখে একেবারে থ'। তিনি হাসবেন, না কাঁদবেন বুঝতে পারছিলেন না। তারপর তাঁর মনে পড়লো ছাত্রটি নিশ্চয়ই 'bull' মানে ষাঁড়ের, ক্ষুদ্রাকৃতি জীবের ইংরাজীই 'bullet' হবে, এই অর্থবোধ অনুমান করে তর্জমায় 'ছোট ছোট ষাঁড়ের বাচ্চায়' এসে হাজির হয়েছে। সে-সময় স্নাতক-ক্লাসের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের ইংরাজী ও বাংলার পরীক্ষা দিতে না হলেও, তাদের সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ইংরেজীর ক্লাশ করতে হোতো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধানের নিকট থেকে তাদের ইংরাজী জ্ঞানের পরিমাপ সম্পর্কে আবশ্যিক সার্টিফিকেট নিতে হোতো, যে-সার্টিফিকেট না পেলে স্নাতক ডিগ্রি তাদের নাগালের বাইরে থেকে যেতো। এই ধরণের ভাষা-বিভ্রাটের বহু দৃষ্টান্ত সেদিন পাওয়া গেছে, যেদিন যত্ন নিয়ে ভাষা শেখানো হোতো এবং পরিশ্রম ক'রে ছাত্রেরা ভাষা শিখতেন।

বিশ দশকের আর একটি ঘটনাও মনে পড়ে। সে-সময় আই, এ ও আই, এস-সি উভয় পরীক্ষার্থীদেরই ইংরেজী ও বাংলা আবশ্যিক

ছিলো। এবং ইংরেজী প্রশ্নপত্রের একশত নম্বরের মধ্যে পনের নম্বর মৌখিক প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য বরাদ্দ ছিল। ইংরেজীর এই মৌখিক পরীক্ষার জন্য দুই জন বিদগ্ধ ইংরেজ-নবীশ অধ্যাপক নিযুক্ত হ'তেন, তাঁদের একজন থাকতেন ইংরেজ পুরুষ কিম্বা মহিলা শিক্ষাবিদ্। এমনি এক মৌখিক পরীক্ষায় এক পরীক্ষার্থীকে এক ইংরেজ মহিলা-শিক্ষাবিদ্ পরীক্ষক প্রশ্ন ক'রলেন ইংরেজ-সুলভ উচ্চারণে: 'Describe the Himalayas'। পরীক্ষার্থী কেঁপে-ঝেঁপে উত্তর দিয়েছিলেন: 'Green, Sir'!—'সবুজ, স্যার'। শিক্ষাবিদ্ ইংরেজ-মহিলা পরীক্ষার্থীর সামনে দুই হাত নেড়ে হেসে বলে উঠেছিলেন: 'Neither Green, Nor Sir'; 'সবুজও নয়, স্যারও নয়'! যে-সময় ভাষা শেখানোর এবং শিখবার আয়োজন ও উদ্যমের অভাব ছিলো না, তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আর ভাষা শিক্ষাকে যদি ঐচ্ছিক করা যায়, তবে তার পরিণতি কী হতে পারে? ভাবতেও শঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়!

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলের একাডেমিক সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্নাতক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষাকে একেবারে অবান্তর করে দেওয়া হয়েছে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত—এই তিনটি ভাষাকেই স্নাতক পর্যায়ে বর্জন করে মানবিক ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উপসমিতি সুপারিশ করেছেন। যারা এই সুপারিশ করছেন তাদের বক্তব্য হোলো শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার স্থান তো প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নির্দিষ্ট রয়েছেই; এ-ছাড়া মাধ্যমিক পর্যন্ত ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত—মানবিক-চিন্তার অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে নির্দিষ্ট রয়েছে, ইংরাজী ও বাংলা উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত! তারপর স্নাতক পর্যায়ে ভাষা শিক্ষা যদি ঐচ্ছিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাতে কিছু ক্ষতির কারণ নেই। এই পর্যায়েও মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থার ফলে মাতৃভাষার চর্চা অবশ্য পঠনীয় পর্যায়ে নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু এই অনুমান যে কী পরিমাণ ভ্রান্ত স্নাতক-পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরগুলির দিকে তাকালেই সে-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাক্য-বিন্যাস, ব্যাকরণ, শব্দের বানান সব কিছুতেই ভুলের পসরা সাজানো রয়েছে সেখানে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষার আবশ্যিক শিক্ষার পরিণতি যেখানে এতো শোচনীয়রূপে ভয়াবহ, সেখানে ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক স্তর থেকে ঐচ্ছিক স্তরে স্থানান্তরিত হলে স্নাতক-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভাব-ব্যঞ্জনা কী নিদারুণ বিপর্যয়ে আন্দোলিত হবে তা সহজেই অনুমেয়!

সংস্কৃতভাষা বর্জনের ফল দাঁড়াবে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, ভাবগত ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছেদ। ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছাড়া যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মুসলিম অধ্যুষিত অধ্যায় অজানা থেকে যায়, তেমনি সংস্কৃতে যাঁরা অজ্ঞ, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস তাদের নাগালের বাইরে থেকে যাবে। সংস্কৃত বর্জনের বিধান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের অ্যাকাডেমিক উপ-সমিতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ দেশের অতীতকে

ভুলে যাবার পথ সুগম ক'রে দিতে চাইছেন। যে জাতি অতীত-সচেতন নয়, তারা নোঙরহীন নৌকার মত দিক্-ভ্রান্ত হয়ে কেবলই ঘুরপাক্ খাবে।

বাংলাভাষার প্রশিক্ষণ, আবশ্যিক পাঠক্রম থেকে ঐচ্ছিক পাঠক্রমে স্থানান্তরের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে নিবিড় পরিবেশে বাংলাভাষীদের সাংস্কৃতিক সত্তার প্রসারিত হয়ে উদার মানবিকতার মোহানায় তাদের পৌঁছে দিতে পারতো, সে-সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হবে। সাংস্কৃতিক জীবনের মানের অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মানও অবনমিত হবে, যে লাঞ্ছনার সূচনা গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ইংরাজী ভাষার ঐচ্ছিক রূপান্তরের ফলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে শিক্ষাগত, সংস্কৃতিগত ও ভাবগত সম্পর্কের ছেদ পড়বে। ফলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে, ভাষা-বঞ্চনার যারা শিকার হবেন, তারা বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হবেন। মজার কথা এই যে, স্নাতক পরীক্ষার্থীদের ভাষার প্রশ্নোত্তর পত্রে সংখ্যাধিক অনুত্তীর্ণতাই নাকি অ্যাকাডেমিক উপ-সমিতিকে ভাষাবর্জনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাষা-বর্জনের সঙ্কট উত্তরণের জন্য আর একটি পথ ভেবেছেন। তাদের ইচ্ছা ছাত্রদের যে কোনো একটি ভাষাকে 'অতিরিক্ত আবশ্যিক' বিষয়রূপে পড়তে হবে। এই 'অতিরিক্ত আবশ্যিক' বিষয়ে পাশ না করলেও স্নাতক পরীক্ষায় মূল তিনটি বিষয়ে পাশ করলেই চলবে! তবে 'অতিরিক্ত আবশ্যিক' বিষয়ে ত্রিশের বেশী নম্বর পেলে পরীক্ষার্থীর মোট নম্বরে সেই নম্বর যোগ হবে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের ক্ষেত্রেও তাই। আসলে এই মীমাংসা কোনো মীমাংসাই নয়। কলা কিম্বা বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীরা যদি তাদের পরীক্ষার মূল তিনটি বিষয়ে পাশ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকেন, 'অতিরিক্ত আবশ্যিক' ভাষার প্রশ্নপত্র তারা ছোঁবেনই না!

ভাষা-বর্জনের এই পাপচক্র থেকে উদ্ধারের জন্য স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী ও বাংলা আবশ্যিক করা চাই। জাতির ঐতিহ্যগত প্রশ্নে সংস্কৃতের আবশ্যিক শিক্ষাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আর একটি আত্মিক জাগরণ বা রেনেসাঁস গড়ে উঠতে পারে। ভাষার নোঙর কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবেই।

ঢাকা শহরে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ঃ দিন-দুপুরে সশস্ত্র অভিযান

সুশীল মুখার্জি শান্তি বসু
অসিত ঘোষ সুকুমার দত্ত

[অংশ গ্রহণকারী এই চারজন প্রাক্তন বিপ্লবীর বিবরণী থেকে সঙ্কলিত। জঃ সঃ]

সেদিন ঢাকা শহর তোলপাড় হয়ে গেলো। বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের দুর্জয় অভিযান চলেছে। কখন যে কোথায় সে-অভিযান আত্ম-প্রকাশ করে, সেই আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার ও তাদের দেশী গোয়েন্দা-অনুচরবৃন্দ সর্বদাই সন্ত্রস্ত। ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল তারিখে 'মাষ্টারদার' দুর্জয় নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে বৈপ্লবিক সংঘাতের পরই সমগ্র বাংলাদেশে বিপ্লবীদের এই অঘোষিত যুদ্ধ চলেছে। ১৯শে এপ্রিল বাংলার বিভিন্ন দলের বহু নেতা অকস্মাৎ গ্রেপ্তার হয়ে কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হলেন। কেউবা মুহূর্তের ইশারা পেয়ে ত্বরিৎ তৎপরতায় আত্মগোপন করলেন।

ঢাকার প্রখ্যাত বিপ্লবী দল 'শ্রীসংঘ'-এর সুঠাম-দেহী, তীক্ষ্ণমেধা-সম্পন্ন তরুণ বিপ্লবী নেতা, অনিল দাস সেদিন এইভাবেই আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯শে এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। বেলা প্রায় দশটায় বিপ্লবী অনিল দাসের ডিগ্‌বাজারের বাসা হঠাৎ চতুর্দিক থেকে পুলিশ ঘিরে ফেললো। মাত্র কয়েক মিনিট আগে সাক্ষাৎকারী এক বন্ধুকে এগিয়ে দেবার জন্য গায়ে কোনো জামা না দিয়েই তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনিল দাস বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় অনেকটা দূরে এগিয়ে গেছেন। মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে খবর পৌঁছে গেলো বাড়ীতে পুলিশ অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য ব্যাপক তল্লাশ করছে এবং তাঁর খোঁজ করছে। খবর পেয়ে অনিল দাস বাড়ী না ফিরে দ্রুত দলের এক তরুণ কর্মী, লক্ষ্মীবাজারে সুকুমার দত্তর বাড়ীতে চলে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হোলো। কিছুদিনের মধ্যে বিপ্লবী অনিল দাসের সহপাঠি-বন্ধু, দলের অন্যতম আর এক তরুণ বিপ্লবী নেতা, অনিলচন্দ্র ঘোষও আত্মগোপন করলেন। অতঃপর এই দুই আত্ম-গোপনকারী বন্ধু দীর্ঘ দুই বছর প্রায় সকল সময়ই একই গোপন আশ্রয় কেন্দ্রে দিন যাপন করেছেন।

এইভাবে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৩২ সালে তাঁরা পৌঁছালেন। বিপ্লবী দলের সংহতি-সাধন এবং রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামের প্রস্তুতি—এই দ্বৈত-কর্মসূচী আত্মগোপনকারী

তরুণ বিপ্লবী নেতা অনিল দাসের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মোদ্যমকে ঘিরে রেখেছে। 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর পরিধিতে যাঁরা সংহতসংগ্রামী-জীবনকে আপন করে আগামী দিনের বৈপ্লবিক সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ক'লকাতা কংগ্রেসের পর ১৯২৯ সালে তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 'শ্রীসঙ্ঘ' ও 'বি, ভি' নামে বিপ্লবের সংগ্রামতীর্থে পরিচিত হলেও তাদের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা মাঝে মাঝেই প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৯৩২-এর গোড়ায় বিপ্লবী নেতা অনিল দাস এমনি এক মিলন প্রচেষ্টায় ক'লকাতায় এলেন। তাঁর ক'লকাতা আগমনের অব্যবহিত উপলক্ষ্য ছিল, অপর এক আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতা, এক সময় অখণ্ড শ্রীসঙ্ঘের পরিধিতে অনিল দাস-এর প্রীতিসিক্ত, সে-সময় 'বি, ভি'র, বৈপ্লবিক সংগ্রামের পুরোধা, সুপতি রায়-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 'বৈঠক ক'রে পুরাণো সংহতির পুনঃস্থাপনের চেষ্টা। তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো ভবানীপুর মহেশ চৌধুরী লেনের একটি বাড়ীতে। কিন্তু বৈঠকে কোনো ফল হোলো না। যে-বিভেদের প্রাচীর ১৯২৯-এ 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর পরিধি দ্বিধাবিভক্তির পর পুরাতন সহযাত্রীদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো, সে-বিচ্ছিন্নতা ঘুচবার পরিবেশ হয়তো ১৯৩২-এর গোড়ায় তৈরী হয় নাই। তাই জ্যেষ্ঠ অনিল দাসকে দেখা গেলো বেদনার্ত মন নিয়ে ঢাকা ফিরে গেলেন। সেটা ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারী মাস।

ঢাকা ফিরে এসে অনিল দাস দলের শিথিল-সংহতির বাঁধুনি শক্ত করবার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন বন্ধু-সহকর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত, কর্মকৌশলগত কিম্বা তত্ত্বগত বিচ্ছিন্নতা দূর করবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিকতায় বেগবান আত্মিক প্রবাহ সঞ্চার করলেন, তেমনি বৈপ্লবিক কর্মোদ্যমের কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিয়ে দলের তারুণ্যশক্তির প্রাণচাঞ্চল্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টিতে তৎপর হলেন। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে গ্রেপ্তারের পূর্বে নেত্রী লীলা নাগ এই সংহতি সাধনে এবং বৈপ্লবিক কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে সংহতির ভিত্ প্রশস্ততর করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরই আত্মগোপনকারী বিপ্লবী সহকর্মীরা সেই কাজ এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৯৩২-এর গোড়ায় ক'লকাতা থেকে প্রত্যাগত, দলনেত্রীর আত্মগোপনকারী অন্যতম সহকর্মী অনিল দাস নূতন উদ্যমে এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। সে-সময় জেল থেকে নেত্রী লীলা নাগ নির্দেশও পাঠিয়েছিলেন যে দলের মধ্যে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তাদের সকলকে ডেকে একত্রিত ক'রে যেন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। সে-সময় শ্রীসঙ্ঘের অর্থের খুবই অনটন। ঢাকা, ক'লকাতা এবং দলের অন্যান্য 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' সহকর্মীদের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অস্ত্র-শস্ত্রের পুঁজিও বাড়ানো দরকার। তা না হ'লে কোনো বড়ো ধরণের কাজে হাত দেওয়া যাবে না। গোড়ায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেছেন বিপ্লবীরা নিজ নিজ পরিবার থেকে দলেরই নির্দেশ। মূলত পারিবারিক গহনা গোপনে দলের অর্থ ভাণ্ডারে জমা পড়তো। সে-ও বাছাই করা পরিবারের কর্মীদের ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হ'তো। ঢাকায় বক্সীবাজার, বাংলা-বাজার, সঙ্গতটোলা, গেণ্ডারিয়ার কেন্দ্রগুলির কর্মীরা

এ-কাজে অগ্রণী হন। দলীয় সদস্যদের পরিজনদের রিভলবারও কয়েকজন সদস্য সঙ্গোপনে অপসারণে সফল হ'ন। দলের অস্ত্র-ভাণ্ডারে সেগুলি জমা পড়ে। এ-ধরণের সংগ্রহের সংখ্যা কম হলেও, সেদিন এ-ধরণের সংগ্রহ নৈতিক মূল্যে মহার্ঘ ছিল।

'শ্রীসঙ্ঘ'-এর গেণ্ডারিয়া-বাংলাবাজার শাখার সদস্যরা ১৯৩১-এর জানুয়ারীতে ঢাকার ফরাসগঞ্জ-সবজিমহল এলাকায় সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে ডাক-ব্যাগ ছিনিয়ে নেন। সে-বছর আরও এই ধরণের ছোটখাটো অর্থসংগ্রহের চেষ্টা সফল হয়। ১৯৩১-এর অক্টোবরে ঢাকায় বাংলাবাজারের জেনারেল পোষ্ট অফিসের বড়ো অঙ্কের ডাক, দিনের বেলায় ছিনিয়ে নেবার 'অ্যাকসান'-এ 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর দুই জন দুর্ধর্ষ সদস্য বঙ্গেশ্বর রায় ও বিনয় বসুকে পুলিশ অনুসরণ ক'রে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গ্রেপ্তার করে।

বিপ্লবী নেতা অনিল দাস ১৯৩২-এ ঢাকায় ফিরে এসে জেল থেকে দলনেত্রী লীলা নাগের নির্দেশও পেয়ে ঢাকার সকল শাখার সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নূতন উদ্দীপনা সহকারে দলের সংহতির ভিত্ পোক্ত করবার উদ্দেশ্যে এই সংহতিকে বৈপ্লবিক সংঘাতমুখীন—action-oriented—করে তুলতে অনন্যমনা হ'লেন। অনিল দাস যখন যে-কাজে হাত দিতেন, নিজেকে তারই মধ্যে নিঃশেষে ঢেলে দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এমনই আপন-ভোলা, দরদী, আদর্শবাদীরূপে দলের সর্বস্তরে, বন্ধুমহলে, সতীর্থদের মধ্যে এবং কনিষ্ঠদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল যে, অতি সহজেই তাঁকে এঁদের সকলেরই অন্তরের আত্মীয় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। জ্যেষ্ঠদের স্নেহভাজন, সমবয়সী ও সতীর্থদের প্রীতিভাজন এবং কনিষ্ঠদের শ্রদ্ধাভাজন, সেদিন দলের মধ্যে—যারা তখনও গ্রেপ্তার হন নাই, তাঁদের মধ্যে—এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারীরূপে দলের তারুণ্যশক্তির সহজাত নেতৃত্বের আসনে অনিল দাস উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অনিল দাসের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু আত্মগোপনকারী অনিলচন্দ্র ঘোষ সকল কর্মে অনিল দাসের সহায়ক। 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর শাখা-প্রশাখা কলকাতা, ঢাকা ছাড়া বাংলার বিভিন্ন জেলা, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে, শ্রীহট্টে, বিহারের কয়েকটি অঞ্চলে সে-সময় ছড়িয়ে ছিল।

'শ্রীসঙ্ঘ'কে ইংরেজ শাসকদের উচ্চপর্যায়ের গোয়েন্দারা কি চোখে দেখতেন? তদানীন্তন ভারত সরকারের Intelligence Bureau-র এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেকটর মিঃ এইচ, ডব্লু হেইল (H. W, Hale) তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'Political Trouble in India : 1917-37'-এ 'শ্রীসঙ্ঘের' উল্লেখ করে লিখছেন : "There were three groups here (অর্থাৎ ঢাকায়), the most active of which was the Sri Sangha, lead by Anil Roy" (পৃঃ ২৮)। ঐ গ্রন্থেই মিঃ হেইল আবার লিখছেন : "Another prominent-group in Calcutta was that of the Dacca Sri Sangha. As we shall see, the Bengal Volunteer group of Sri Sangha had been responsible for the murder of

Mr Lowman in Dacca in August,....." (পৃঃ ৩৭)। সে-সময় আসাম প্রদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের দায়িত্ব যে বহুলাংশে শ্রীসঙ্ঘের ছিল তার উল্লেখ করে মিঃ হেইল তার উপরোক্ত গ্রন্থে বলছেন: "...that the subversive actions of terrorists in the Province were becoming dangerous, and that connections existed with the dangerous Sri Sangha at Dacca...." (পৃঃ ৮৩)।

১৯৩২-এর মে মাসে এই "ভয়ঙ্কর শ্রীসঙ্ঘ"-এর কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বিপ্লবী অনিল দাস।

সংঘাত-মুখীন কর্মোদ্যমের অর্থ সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান, অথবা সঙ্গতি অনুযায়ী সীমিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান। অনিল দাস বুঝেছিলেন দুই বছর যাবৎ পুলিশের গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলেছেন, খুব বেশী দিন এ-ভাবে থাকার সম্ভাবনা কম। তাই যতশীঘ্র সম্ভব ইংরেজশক্তিকে সমবেতভাবে দুরন্ত আঘাত হানতে হবে। কোনো কোনো কনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে এ-বিষয়ে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করে কর্তব্য স্থির করলেন যে আরও বেশী পরিমাণে অস্ত্র সংগ্রহে মন দিতে হবে এবং সেজন্য প্রচুর অর্থও সংগ্রহ করতে হবে। ক'লকাতায় দলীয় কেন্দ্র বন্দরের গুপ্তপথে অস্ত্রাদি আমদানীর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সে-কাজ বেশীদূর অগ্রসর হোতে পারে নাই। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে গ্রেপ্তারের পূর্বে দলনেত্রী লীলা নাগ এ-কাজ কিছুটা এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ-কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থির হয় যে সরকারী কিম্বা বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থ ছিনিয়ে নেবার আয়োজন দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে।

সুতরাং অর্থের সন্ধান সুরু হ'ল। একটা সূত্রে উড়ো খবর পাওয়া গেলো ভৈরববাজার থেকে নারায়ণগঞ্জে সপ্তাহে একদিন জনৈক পাটের ব্যবসায়ীর প্রচুর টাকা আসে। ঠিক একই সময়ে ঢাকা, সঙ্গতটোলা অঞ্চলের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর সুধীর দত্ত ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ যাবার সময় লক্ষ্য করলেন যে-গাড়ীতে তিনি উঠেছিলেন সেই গাড়ীতেই ১০ ১২ ব্যাগ কাঁচা টাকা, সঙ্গে একটি কালো বাক্স নিয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছেন, আসছেন তারা ভৈরববাজার থেকে। সুধীর দত্ত অবিলম্বে গেণ্ডারিয়া শাখার দলের বিপ্লবী কর্মী শান্তি বসুকে এই খবরটা দিলে শান্তি বসু তাকে এ-বিষয়ে যথোপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে বলেন। শান্তি বসুর পেছনে তখন পুলিশ ঘুরছে। তাই তিনি ক'লকাতায় চলে এলেন, সুধীর দত্তকে বলে গেলেন প্রয়োজন হ'লেই যেন ঢাকায় ফিরে আসবার জন্য তাকে খবর দেওয়া হয়। অর্থের এই সূত্রের সংবাদ তারা বৈপ্লবিক কর্মোদ্যোগী অনিল দাস-এর গোচরেও আনেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

ইতিমধ্যে ক'লকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে জেলখানা থেকে দলনেত্রী লীলা নাগের নির্দেশ পাবার পর অনিল দাস অপর দুই কনিষ্ঠ আত্মগোপনকারী সহকর্মী রাজার দেউড়ীর বিপ্লবী অসিত ঘোষ ও লক্ষ্মীবাজারের বিপ্লবী সুকুমার দত্তকে অবিলম্বে ঢাকা ফিরবার নির্দেশ দিলেন। সুকুমার দত্ত ও অসিত ঘোষ বিহারের মুঙ্গেরে শ্রীসঙ্ঘের

সদস্য গোরা মিত্র পরিচালিত ঘাঁটিতে আত্মগোপন করে আমেরিকান রিভলবারের অনুকরণে স্থানীয় কুশলী মিস্ত্রিদের সাহায্যে দেশী রিভলবার তৈরীর প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত। খবর পেয়ে ক'লকাতায় এসে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে শ্রীসঙ্ঘ-এর সদস্য রণেন ঘোষ-এর মেসে তাঁরা আশ্রয় নেন। অসিত ঘোষ ও সুকুমার দত্ত ঢাকায় ফিরে অনিল দাস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এদিকে শান্তি বসুও জরুরী সংবাদ পেয়ে ক'লকাতা থেকে ঢাকা ফিরে আসেন।

অসিত ঘোষ, শান্তি বসু ও সুকুমার দত্ত ঢাকায় ফিরে আসবার পূর্বে সুধীর দত্ত ভৈরববাজার-নারায়ণগঞ্জ রেল পথে প্রতি সপ্তাহে জনৈক পাট ব্যবসায়ীর প্রচুর অর্থ সরবরাহের সংবাদটি অনিল দাসের কাছে পৌঁছে দেন, পূর্বেই বলা হয়েছে। এই অর্থ সরবরাহের ওপর দলের নজর আছে, এই সংবাদ কোনো প্রকারে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অনিল দাস ঢাকা শহরের বিভিন্ন শাখার কয়েকজন সহকর্মীদের নিয়ে নবকুমার স্কুলে গোপন বৈঠক করে সহরের বুকে ট্রেন থামিয়ে সশস্ত্র অভিযানে টাকা ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা পাকা করেন। এপ্রিল মাসের শেষ শুক্রবার অনিল দাসের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক সংঘাতের দিন ধার্য হয়। অনিল দাস তাঁর দুই জন সঙ্গী নিয়ে ঢাকার আজিমপুরার লেভেল ক্রসিং-এর নিকট মোটর গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করেন কখন ট্রেন থামিয়ে অ্যাক্সানের অপর সঙ্গীরা সশস্ত্র অভিযানে টাকার ব্যাগসমূহ ও মূল সুটকেস ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ীতে এসে ওঠেন। পর পর কুরমিটোলা, টঙ্গি ও তেজগাঁও ষ্টেসনে নির্ধারিত বিপ্লবী-সঙ্গীরা ভৈরববাজার থেকে ঢাকা অভিমুখে ট্রেন এলে তাতে চড়ে বসবেন। বিপ্লবী সুধীর দত্ত ভৈরববাজার থেকে যে কামরায় অর্থের বোঝা নিয়ে ব্যবসায়ীর কর্মচারীরা উঠবেন, সে কামরায় ষ্টেশনের দিকে জানালার ধারে বসে হাতে সাদা রুমাল নিয়ে জানালা দিয়ে রুমালসহ হাত বা'র করে থাকবেন—এই ছিল বিভিন্ন স্টেশনে কর্তব্যরত বিপ্লবীদের সংশ্লিষ্ট কামরায় উঠবার সঙ্কেত। সেদিন বিপ্লবীরা সবাই নিশানা লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট কামরায় চড়ে বসলেন, আর দশজন সাধারণ যাত্রীর মত। কিন্তু শেষ ঘাঁটির কর্তব্যরত বিপ্লবী অপূর্ব রায় (বুলু রায়) তেজগাঁও স্টেশনে গাড়ীতে চড়ে বসা মাত্রই অপর এক যাত্রী তাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করেন: "কি বুলুদা, কোথায় যাচ্ছেন?" 'সর্বনাশ!' 'অ্যাকশান তো বাতিল করে দিতে হবে!' বিপ্লবীদের চোখে চোখে ইশারায় এই সঙ্কেতটা ছড়িয়ে গেলো। সুতরাং, যেখানে শিকল টেনে ট্রেন থামাবার পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিলো, তা বাতিল করতে হোলো। আজিমপুরার লেভেল-ক্রশিং-এ মোটার গাড়ীতে অপেক্ষমান নেতা বিপ্লবী অনিল দাস ও তাঁর সঙ্গীরাও ট্রেন না থেমে সমান গতিতে ঢাকা স্টেশনের দিকে চলে যেতে দেখে খুবই উদ্বেগ নিয়ে মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করে চলে যান। কিছুক্ষণ বাদে গোপন আস্তানায় বসে তাঁরা খবর পেলেন, কেন এমন হোলো এবং ঐ পরিস্থিতিতে 'অ্যাকশান' বাতিলের স্বাংৎ-সিদ্ধান্তের তারিফও করলেন। সেদিন ব্যবসায়ীদের অর্থের পরিমাণ ছিল ৮০,০০০ টাকা।

মুঙ্গের থেকে অসিত ঘোষ ক'লকাতায় ফিরে এলে শ্রীসঙ্ঘ-এর কায়েৎটুলী শাখার সদস্য বিনয় দে রায়ের সঙ্গে দেখা হ'লে বিনয় দে রায় অসিত ঘোষকে খবর দেন: "অনিলদা (দাস) 'কাজ' করার জন্য খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন এবং এই 'কাজে' দলের কায়েৎটুলী শাখার বন্ধুদের যোগ দিতে বলছেন।' বিনয় দে রায়, অসিত ঘোষকে আরও বলেন চলন্ত ট্রেণ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার একটি সংবাদও অনিলদা সংগ্রহ করেছেন। ইতিমধ্যে সুকুমার দত্ত মুঙ্গের কেন্দ্র থেকে কলকাতায় পৌঁছালে বিনয় দে রায়, অসিত ঘোষ ও সুকুমার দত্তকে নিয়ে নানা পথ ঘুরে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঢাকা এলেন। বিপ্লবী নেতা অনিল দাসের সঙ্গে এরা ঢাকার ওয়াড়ী পল্লীর র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীটের একটি দেড়তলা ঘরে মই বেয়ে উঠে মিলিত হলেন। সেখানে 'অ্যাক্সান' সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হ'ল।

এদিকে শান্তি বসুর সঙ্গে সুধীর দত্ত নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। সুধীর দত্তর টেলিগ্রাম পেয়ে ঢাকা ফিরেই শান্তি বসু তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ভৈরববাজার থেকে নারায়ণগঞ্জে প্রতি শুক্রবার ট্রেনে ব্যবসায়ীদের প্রচুর অর্থ স্থানান্তরের সংবাদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সুধীর দত্ত কয়েকবারই ভৈরববাজার থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত এই অর্থবহনকারী দলটিকে অনুসরণ করে তাদের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল খুঁটিনাটি সংগ্রহ করেছেন। সপ্তাহের কোন্ দিন টাকা স্থানান্তরিত হয়, কোন্ ট্রেনে, সেই ট্রেন ঢাকা ফুলবাড়িয়া স্টেশনে কখন পৌঁছায়, ট্রেনে কোন্ কামরায় এই অর্থবহনকারী দল যাতায়াত করে, সচরাচর কামরার কোন্ বেঞ্চে তারা বসে, ক'জন সচরাচর পাহারাদার থাকে, কোনো অস্ত্র-শস্ত্র তাদের সঙ্গে থাকে কি না, টাকা বহন করে কিসে, কয়টি পাত্রে, বহনকারীরা সতর্ক এবং উচাটন থাকে, না সহজ-স্বচ্ছন্দভাবে যাতায়াত করে—এতো খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের কারণ হ'লো শান্তি বসু এলে সুধীর দত্তকে নিয়ে এ-বিষয়ে অনিল দাসের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে হবে। আর অনিল দাস বিস্তৃত তথ্যানুসন্ধানী, তাঁর সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া চাই। অনিল দাসের নির্দেশে অসিত ঘোষও ইতিমধ্যে একবার ভৈরব-বাজার ঘুরে এসেছেন, সুধীর দত্তর পরিপূরক কাজ-হিসেবে।

এরপর নবকুমার স্কুলে সন্ধ্যার পর গোপন সভা বসে দ্বিতীয়বার চলন্ত ট্রেন থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা নিখুঁত করবার জন্য। অ্যাক্সানের চূড়ান্ত দিন ধার্য হয়ে গেছে: শুক্রবার ১৩ই মে ১৯৩২ সাল। এবার 'ZERO HOUR'-এ আঘাত করা চাই। কোনো রকম নড়চড় না হয়। তার আগে অ্যাকসানের বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব-প্রাপ্তদের বাইরে যেন কোনোক্রমেই কোনো রকম তথ্য চুইয়ে না যায়। অথচ, প্ল্যান 'Fool-proof' হওয়া চাই। ত্বরিৎ-বেগে 'অ্যাক্সান' সম্পাদন ক'রে পূর্বনির্দিষ্ট আশ্রয়ে নিরাপদে রিভলবার ও অন্যান্য অস্ত্র, টাকার বাক্স এবং থলি—যদি বহন করে আনা যায়—পৌঁছে দেবার জন্য কে কোন্ রাস্তায়, কখন

দাঁড়িয়ে থাকবে, ঘড়ির কাঁটার মত বিপ্লবী অনিল দাস 'OPERATION'-এর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে সব স্থির করে দেন। সে-যেন এক যুদ্ধাভিযানের প্ল্যানিং! ঢাকা বক্সীবাজার অঞ্চলের নবকুমার স্কুলে রাত্রির আড়ালে সেই গোপন সমাবেশে বৈপ্লবিক কর্মোদ্যমের সর্বাধিনায়ক অনিল দাস-এর শান্ত, সংযত, ধীর, স্থির নির্দেশ ও তাঁর জন্য পনের-ষোল একান্ত সহকর্মীর যে কোনো প্রকার বিপদের মুখে কর্তব্যপালনের নীরব প্রতিশ্রুতি, দুর্জয় সংগ্রামে আত্মশক্তি উদ্বোধনের এক অবিস্মরণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো—যার স্মৃতি আজও সেই গোপন বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মনে এক অনাস্বাদিত আত্মিক সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

এই বৈঠকে সহযোদ্ধাদের হৃদয়-মথিত আবেদন উত্থাপিত হয়েছিলো, সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে সর্বাধিনায়ক অনিল দাস দূরে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। কিন্তু অনিল দাস সহযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে সকল প্রকার সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রতিজ্ঞায় অটল। কনিষ্ঠরা বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে কর্তব্যপালন করবেন আর তিনি জ্যেষ্ঠ হয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সর্বাধিনায়কের ভূমিকা পালন করবেন, সে-জাতীয় মানুষ তিনি ছিলেন না। সুতরাং কনিষ্ঠদের আবেদন নামঞ্জুর হলো।

বৈপ্লবিক সংঘাতের চূড়ান্ত দিন ধার্য হয়েছে ১৩ই মে ১৯৩২ সাল। কয়েকটি কাজ বাকী রয়েছে, সেগুলি দ্রুত সেরে ফেলতে হবে। তাই অধিনায়ক অনিল দাস অন্যান্য বিপ্লবী সহকর্মীদের নিয়ে অভিযানের পরিকল্পনার ফাঁকগুলি পুরণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে স্থির করতে হবে ভৈরববাজার থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ট্রেনটি ঢাকা ফুলবারিয়া স্টেশনের কাছাকাছি, শহরের কোন অঞ্চলে শিকল টেনে থামানো হবে। স্থান নির্বাচনটি জরুরী কারণ অনিল দাস মোটর গাড়ী নিয়ে ড্রাইভার ও দুই একজন সহকর্মীসহ তার খুবই নিকটে অপেক্ষা করবেন, যাতে ট্রেন থেকে সংগৃহীত অর্থের বাক্স ও ব্যাগ নিয়ে ট্রেনে অনুসরণকারী ৭।৮ জন বিপ্লবীর দ্রুত মোটার গাড়ী চেপে বসতে বিঘ্ন না ঘটে। ট্রেন থামাবার পর স্টেশন থেকে দূরের সিগন্যালটি যাতে অকেজো হয়ে যায়, সেজন্য উপযুক্ত স্থানে সিগন্যালের তারটি কেটে ফেলতে হবে। এই দুইটি স্থান বাছাইয়ের জন্য অনিল দাস রাত্রিবেলা সাইকেলযোগে শান্তি বসু, রমণী রায়, সুধীর দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গোটা অঞ্চলটা ঘুরে নীলক্ষেতে রেলের লেভেল ক্রশিং-এর অনতিদূরে শিকল টেনে ট্রেন থামাবার স্থান স্থির করলেন এবং রমনা থেকে খাজে দেওয়ানের দিকে যাবার রাস্তায় লেভেল ক্রসিং পার হয়েই স্টেশনের দূরবর্তী সিগন্যালের তার কেটে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যারা চূড়ান্ত মুহূর্তে আক্‌সানে থাকবেন তাদের কয়েকজনকে নিয়ে যেন একটা মহড়া দেওয়া হয়ে গেলো।

নবকুমার স্কুলে রাত্রির অন্ধকারের গোপন বৈঠকগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাধিনায়কদের সঙ্গে আঞ্চলিক অধিনায়কদের বৈঠকের রূপ নিতো। এই বৈঠকে আর একটি সমস্যা দেখা দিলো: মোটার গাড়ী কোথা থেকে নেওয়া হবে? ড্রাইভারই বা কে হবে? অনিল দাস সমাধান দিয়ে বললেন

ভিক্টোরিয়া পার্কের—ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাক্সি নেওয়া হবে এবং তার চালকের যথাবিহিত ব্যবস্থা করে নিজেদের একজন বিকল্প ড্রাইভার সঙ্গে রাখা হবে। দলের সদস্য জ্যোতির্ময় সেনের সুপরিচিত, অথচ দলের সদস্য নয়, মোটার গাড়ী চালনায় দক্ষ এক যুবককে বিকল্প ড্রাইভাররূপে সঙ্গে রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

অ্যাক্সানের দিন, কে কোন্ রেল স্টেশনে ট্রেনে চাপবেন, কার কাছে কী অস্ত্র থাকবে, সবই স্থির করতে হবে। পনের দিন পূর্বের বর্জিত অ্যাকসনে সুধীর দত্তর যে দায়িত্ব ছিল, ১৩ই মের অ্যাকসনেও তাকে সেই দায়িত্বই দেওয়া হ'ল। ট্রেনের কামরার বাইরে তার হাতের সাদা রুমাল বিপ্লবীদের নিশানা দেবে, কোন্ কামরায় অর্থবহনকারীরা আসছে, যে-কামরায় বিভিন্ন স্টেশনে অপেক্ষারত বিপ্লবীরা পর পর দ্রুত চেপে বসবেন। কে কোন্ স্টেশনে ট্রেনের সংশ্লিষ্ট কামরায় উঠবেন তার ছকটা ছিল এ-রকম: ঢাকা থেকে সব চাইতে দূরের স্টেশন কুমিটোলায় উঠবেন দুই বিপ্লবী শান্তি বসু ও সুকুমার দত্ত; টঙ্গী স্টেশনে উঠবেন বিপ্লবী রমণী রায় ও অসিত ঘোষ; তেজগাঁও স্টেশনে অপর তিন বিপ্লবীরা—বীরেন সেন (টেনু), অপূর্ব রায় (বুলু), বীরেন দে। শান্তি বসু, অসিত ঘোষ, বীরেন দের হেপাজতে আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়। এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি শ্রীসঙ্ঘের গেণ্ডারিয়া শাখার বিপ্লবীদের হেফাজতে মজুদ ছিল। সুকুমার দত্ত, রমণী রায় ও অপূর্ব রায়-এর হেফাজতে থাকে ধারালো ভোজালী। মোটার গাড়ী নিয়ে নীলক্ষেত লেভেল ক্রসিং-এর কাছে থাকবেন অনিল দাস। সঙ্গে থাকবেন হেমেন গুপ্ত ও বিকল্প ড্রাইভার।

সুশীল মুখার্জীর উপর ভার পড়ে সিগন্যালের তার কাটার। এ-কাজের মহড়াও দেওয়া হয়। তার সহায়ক ছিলেন শ্রীসঙ্ঘের অপর এক সদস্য বিপ্লবী সুবোধ ঘোষ। 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর আর এক সদস্য সুনীল দাসকে ক'লকাতা থেকে খবর দিয়ে আনা হয়। সঙ্গতটোলার আর একটি বিপ্লবী সহকর্মীকে নিয়ে সুধীর দত্ত ভৈরববাজার যাবেন, অর্থবহনকারীদের অনুসরণ করবার জন্যে। অনিল দাসের খেয়াল হোলো, যদি কোনো কারণে অর্থবহনকারীরা ১৩ই মে নির্দিষ্ট ট্রেনে না রওয়ানা হয়? তবে? সে-ক্ষেত্রে পর পর সাজানো পরবর্তী আয়োজনগুলিকে তো সময় মত বাতিল করে দিতে হবে? অধিনায়ক স্থির করলেন রওয়ানা হওয়ার এবং না-হওয়ার দুটি সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামের খসড়া সুধীর দত্ত নিয়ে যাবেন। অবস্থা অনুযায়ী এই সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর এক কর্মচারীর নামে পাঠানো হবে। ট্রেন ভৈরববাজার থেকে ঢাকা পৌঁছাতে তিন ঘণ্টা-সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগবে। সুতরা বেলা সাড়ে এগারটা-বারোটার মধ্যেও যদি টেলিগ্রাম যথাস্থানে পৌঁছায়, টেলিগ্রামের বার্তা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে খবর পৌঁছে দেওয়া যাবে, —অ্যাক্সনের উপকরণ যথাসময়ে পৌঁচাচ্ছে কি পৌঁচাচ্ছে না। এই কাজের ভারটি সুনীল দাসকে দেওয়া হয়েছিলো। ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীতে পড়বার অছিলায় সুনীল দাস সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তির কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে এক সময় দেখলেন তার হাতে একটি টেলিগ্রাম। কোনো রকমে উঁকি দিয়ে সুনীল দাস টেলিগ্রামটি পড়ে দেখলেন যে, সেটি প্রত্যাশিত টেলিগ্রাম। সুতরাং শিকার আসছে।

টাকার বাক্স, থলি, রিভলবার, ভোজালী পর পর কোথায় কোথায় নামানো হবে, কে কে সেই সব নির্দিষ্ট স্থানে কোন সময় অপেক্ষা করে যার যার দায়িত্বভার কাঁটায় কাঁটায় পালন করবেন, তা-ও স্থির হয়ে গেলো বৈঠকে। বৈঠকে যে জনা পনেরো-ষোলো সদস্যদের ডাকা হোতো, তাদের মধ্যে দলের সদস্য ভূপাল গুহ একজন।

অ্যাক্সনের দিনে ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে মোটার গাড়ী ভাড়া করা হোলো। অনিল দাস, হেমেন গুপ্ত নির্দিষ্ট জায়গা থেকে গাড়ীতে উঠলেন। বিকল্প ড্রাইভারকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন জ্যোতির্ময় সেন। গাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'ল রমনা ছাড়িয়ে ঢাকার সরকারী কৃষি-ফার্ম পেছনে রেখে বন-জঙ্গলের দিকে। গাড়ীর ড্রাইভারের সন্দেহ হোলো। তাকে বনের মধ্যে গাড়ী থেকে জোর করে নামিয়ে ক্লোরোফরম করে গাছে বেঁধে রেখে, বিকল্প ড্রাইভার মোটার চালিয়ে নীল-ক্ষেতের লেভেল ক্রসিং-এ নিয়ে এলেন।

যথাসময়ে যথাস্থানে শিকল টেনে ট্রেন থামানো হয়েছে। অর্থবহনকারীরা তো নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করছে। গাড়ী থামাবার সঙ্গে সঙ্গেই অসিত ঘোষ বাথরুমে ঢুকে মুহূর্তে রিভলবার বার করে বাইরে এলেন। বিপ্লবীদের সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি 'Hands up'। 'নড়বেন না!'—যাত্রীদের মনে ভীতির শিহরণ বইয়ে দিলো। বীরেন দে কামরা থেকে নেমে রিভলবার খুলে কামরার দরজা পাহাড়ায় নিযুক্ত হলেন। দূরে লেভেল ক্রসিং-এ অনিল দাস গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে সহকর্মীদের অভিযানের তৎপরতা লক্ষ্য করছেন। শান্তি বসু টাকার বাক্সটি নিয়ে ছুটে এসে মোটারে হেমেন গুপ্তর হাতে তুলে দিলেন, তারপরই এলেন অসিত ঘোষ টাকার ব্যাগ হাতে। এদিকে সুকুমার দত্ত, বীরেন (টেনু) সেন আর অন্যান্য সবাই টাকার থলি নামিয়ে দ্রুত অনিল দাসের গাড়ীর দিকে ছুটতে থাকবেন এমন সময় তারা দেখলেন ট্রেনের ফিরিঙ্গি ড্রাইভার এগিয়ে এসে তাদের নাগাল পেলো বলে! বীরেন দে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন গুলি করবার জন্য। আবার গর্জন-ধ্বনি উঠলো: 'ফায়ার'। সঙ্গে সঙ্গে বীরেন দে'র পিস্তলের গুলিতে ট্রেনের ফিরিঙ্গি ড্রাইভার আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সবাই প্রায় মোটার গাড়ীর কাছে এসে পৌঁচেছেন। অনিল দাস লক্ষ্য করছেন, কুরমিটোলা, টঙ্গী, তেজগাঁয় যারা ট্রেনে উঠেছেন তারা সবাই এলেন কি না। অনিল দাস সকলকে মোটারে উঠবার হুকুম দিলেন: 'Get up'। কিন্তু অনেকগুলি ব্যাগ ছিঁড়ে গাড়ীর পাশে কাঁচা টাকা ছড়িয়ে পড়েছে। টেনু সেন তখনও সে-টাকা কুড়াতে ব্যস্ত। অধিনায়ক অনিল দাস তার পিঠে সজোরে একটি চড় বসিয়ে হুঙ্কার দিলেন "Stupid, get up. No time to lose'। তারপর গাড়ী ছেড়ে দিল সবাইকে নিয়ে। পূর্বেই স্থির ছিল

সুধীর দত্ত ঢাকা স্টেশনে গাড়ী থেকে নেমে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাবেন। সিগন্যালের তার কাটা যায় নি। কারণ স্টীলের সে করাতটা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলো। তাই ট্রেন আটকে পড়ে না থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্টেশনের দিকে চলে যায়।

নির্বিঘ্নে সব কাজ হয়ে গেলেও শেষ মুহূর্তে বিঘ্ন দেখা দিল। টাকা, অস্ত্র, অধিনায়ক, অন্যান্য সহযোদ্ধারা যথাস্থানে নেমে গেছেন। গাড়ীতে রয়েছেন শান্তি বসু ও বিকল্প ড্রাইভার। তাই নির্দেশ ছিল অধিনায়কের। কিন্তু ঢাকার বংশাল রাস্তায় গাড়ী ঢুকে কিছুদূর এগোলেই সামনের একটি চাকা ফেটে গাড়ীটিকে বিকল করে দিল। আরোহী দু'জন দ্রুত নেমে গেলেন। শান্তি বসুর বজ্রমুষ্টি থেকে বিকল্প ড্রাইভার সে-সময় সরে পড়বার সুযোগ পেলো।

জ্যোতির্ময় সেন, বীরেন দে গ্রেপ্তার হন। হঠাৎ ৬ই জুন তালতলায় ষ্টীমারে গ্রেপ্তার হন অনিল দাস। দুই বিপ্লবী নেতা অনিল দাস ও অনিলচন্দ্র ঘোষকে বিপ্লবীদের 'পিসিমা' শ্রীযুক্তা শৈবলিনী বসুসহ মাণিকগঞ্জের আটিগ্রাম নামক গ্রামে সুনীল দাস পৌঁছে দিয়ে ২৯শে মে, ১৯৩২-এ সেখান থেকে ক'লকাতায় চলে আসেন। ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ কেন, বাংলা দেশের গোয়েন্দা পুলিশও ঢাকা শহরের বুকে দিনের বেলায় এই দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ভীত-সন্ত্রস্ত-স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ১৩ই মে'র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্য যে গাড়ীর ড্রাইভারকে জঙ্গলে ক্লোরোফরম করে রেখে এসেছিলেন অনিল দাস ও তাঁর সহযোদ্ধারা, সেই ড্রাইভারটি ঢাকার কোতোয়ালী থানায় গ্রেপ্তারের পর, অনিল দাসকে চেনা সত্ত্বেও সনাক্ত না করে, তাঁর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রতি পরোক্ষভাবে সম্মান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকার পুলিশ-শক্তি বিপ্লবীদের মধ্যমণি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন তারুণ্যশক্তির তেজোদৃপ্ত এই প্রতিভূকে ভয়াবহ নির্মমতার সঙ্গে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। প্রায় আড়াই বছর শাসকরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই; সুতরাং ঢাকাগামী ট্রেন থেকে দিনের বেলায় স্পর্ধিত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অধিনায়ককে পৈশাচিক অত্যাচার করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হবে। রাজশক্তির কী দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ ছিলেন বিপ্লবী নেতা অনিল দাস! তার স্বাক্ষর ইতিহাসে রেখে দিয়েছে নরপশুর দল—যারা এগার দিনের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব পাশবিকতার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে হত্যা করলে। যে মানুষটি সুস্থ-বলিষ্ঠদেহে ৬ই জুন ১৯৩২-এ প্রায় আড়াই বছর আত্মগোপন করে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার হলেন, সেই প্রতিভাধর বিপ্লবী এগার দিন পর মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৮ই জুন পুলিশের অকল্পনীয় অত্যাচারে নিহত হলেন।

জীবনে যিনি ছিলেন সহযোদ্ধাদের একান্ত কাছের মানুষ, সকল আনন্দের উৎস, সকল বিপদের সঙ্গী ও কর্মের নেতা, সেই শহীদ তার জীবন দিয়ে ঢাকা ট্রেনে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য অভিযুক্তদের, বিশেষভাবে জ্যোতির্ময় সেন (সিধু), বীরেন দে ও অন্যান্য

যোদ্ধাদের এবং সাধারণভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্তদের, পুলিশের নির্মম অত্যাচারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার পথ কেটে দিয়ে গেলেন।

অনিল দাসের হত্যা, সেদিনকার বাংলাদেশে পুলিশী-সন্ত্রাস উপেক্ষা ক'রে, প্রবল উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। অমৃতবাজার পত্রিকা পর পর তিনদিন 'Anil Kumar Das' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সাজা দাবী করে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে, লণ্ডনের হাউস অফ্ কমন্সে, বাংলার পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার উচ্চারিত হয়। 'শ্রীসঙ্ঘের' বিপ্লবীরাও এই হত্যাকাণ্ডের নেতা ঢাকার ইংরেজ পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট গ্র্যাস্‌বীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হন। ১৯৩২ সালের ২২শে আগষ্ট অফিস থেকে বাড়ী ফিরবার পথে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকেলবেলা ঢাকার জনাকীর্ণ সদর রাস্তা নবাবপুরের এক প্রান্তে হঠাৎ রেলওয়ে লেভেল ক্রশিংএর গেট বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা গ্র্যাস্‌বীর মোটার গাড়ীর গতিরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাসবীর গাড়ীতে আক্রমণকারী এক বিপ্লবী বোমা নিক্ষেপ করেন এবং অপর এক বিপ্লবী বিনয় দে রায় রিভলবার থেকে পর পর তিনবার গুলি ছোঁড়েন। মোটার গাড়ীর কাঁচের জানালা ভেদ করে গুলি গ্র্যাস্‌বীর ঘাড় ঘেঁসে যায়। বোমাটি গাড়ীর মধ্যে পড়ে না ফাটায় গ্র্যাস্‌বী হঠাৎ রক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরক্ষীরা, গাড়ীর ড্রাইভার এবং পাহারাদার সার্জেন্ট গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। প্রায় পাঁচশ গজ দৌড়ে যাবার পর বিনয় দে রায় গ্র্যাস্‌বীর দেহরক্ষীদের গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। বিনয় দে রায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিছু গ্র্যাস্‌বীকেও প্রাণের দায়ে কিছুদিনের জন্য ঢাকা ও বাংলাদেশ ছাড়তে হয়। ইতিমধ্যে সশস্ত্র অভিযানে শহীদ অনিল দাসের অন্যান্য সহকর্মীরা সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে বিনা-বিচারে বন্দীশালায় আটক হয়ে পড়েছেন।

এই অভিযান সম্পর্কে এইচ, ডবলু, হেইল তাঁর গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখেছেন :

"Train dacoity between Tezgaon and Dacca in which three merchants were robbed of Rs 32,000, the culprits shot at and wounded the guard who came to see why the train had stopped." (পৃঃ ১৬৬, Appendix I)।

সন্ত্রাসবাদ, ডাকাতি—এই ধরণের বাক্য প্রয়োগে বিপ্লবীদের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আদর্শ-বাদকে সেদিন ক্ষুণ্ণ করা যায় নাই, কোনো দিন যাবেও না।

দাঁড়াও পথিক-বর

কাগজে পড়লুম। অবকাশআগত বালিকা আত্মীয়ার জন্য এক মহিলা ছোট একখানি মধুসূদন-পরিচায়িকা বই খুঁজছেন, বই হবে ইংরেজি, এবং অজটিল। কলকাতা শহর। সমস্ত মধ্যকলকাতার পুস্তকবিক্রেতাদের একজনই শুধু নামটি জানেন: ওঁর নাম তো জানি—আর্কিটেক্ট একজন, তাই না? কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির সহায়কেরা বলতে পারেন বাঙলা বইয়ের খোঁজ। ধর্মতলায় ভারত সরকারের বৃহৎ পাবলিকেশন্‌স্ ডিভিশন জানেন এ সব বইয়ের খোঁজ রাখতে আছে কলেজ স্ট্রীটের দিশি বইপাড়া।

আটলান্টিকের বিপুল তরঙ্গমালা পার হয়ে অতিদূর অ্যালবিয়ন-তটের দুরাশায় ছটফট করেছিলেন যিনি সতর বছর বয়সে যেন সেই তাঁর আসল স্বদেশ, বেঙ্গল স্পেক্টেটরে ইংরেজি সনেট ছাপিয়ে গোলদিঘির পাড়ে বন্ধুদের নিয়ে উদ্‌যাপন করছেন সেই গৌরব, ক্যাপটিভ লেডির সমালোচকেরা স্কট ও বায়রনের অন্যান শক্তিমান বলে রায় লিখছেন যাঁর, আর সেই অনন্য ক্ষমতা হাতে ধরে আধুনিক বাঙলা কাব্যের পহেলা আঁকটি টানতে বসেছেন সুপ্রত্যয়ে, আর তারপর এই ভাষায় তাঁর সমাদর—

ইচ্ছা-কলম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

> আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি....

তাঁর রচা মধুচক্রে গৌড়জনের নিরবধিকালের অমৃত সঞ্চিত হইল—এমনি যাঁর অমিত বিশ্বাস—রাজনারায়ণ বসু থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ থেকে মোহিতলাল মজুমদার, তারপর ভাটার স্রোতেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অবধি মান দিয়েছেন এই ইতিহাসতথ্যের—জানি না ভারতের সাহিত্য-অকাদেমি প্রকাশিত মেকার্স অফ ইণ্ডিয়ান লিটরেচার-সিরিজের সাহিত্যকর্মীদের মধ্যেও এই মুহূর্তে তাঁর দাবি স্বীকৃত হয়েছে কি না (কিছুদিন আগে অবধি হয় নি দেখেছিলুম), হলেও সেই বইয়ের সুপ্রচার হয়েছে কি না।

মধুসূদন ইংরেজি লেখা লিখেছিলেন, নিজের বাঙলার কিছু তর্জমা করেছিলেন ইংরেজিতে, অন্যেও কিছু করেছিলেন। তাঁর ইংরেজির—কাব্য-নাটকের চিঠিপত্রের নতুন তর্জমা করছেন

কেউ কেউ, চোখে পড়ে। কথায় কথায় সুযুক্তি পেরিয়ে যেতেও নেশা হয়—ইংরেজিতে একখণ্ড সিলেকশন ছাপা যায় না কোনোভাবে? নামমাত্রজানা বাইরের আগ্রহীদের হয়তো কাজে লাগে। মনে হয়, ইংরেজি জানা বাঙালী কাব্যানুরাগী তাঁর লেখায় তত আর স্বতোৎসার স্পৃহা পান না। তা হলে নিছক অ্যাকাডেমিক হেতু বা হেতু নয় কেন। এ সবই অবশ্য যাঁরা পারেন, তাঁরাই পারেন, তাঁদেরই কাছে নিবেদন। ভোলানাথ চন্দ্র মশায় লিখেছিলেন, তখনকার ইয়ংবেঙ্গলের মর্যাদাযোগ্য ঐতিহ্য বলতে কিছু ছিল না, একমাত্র গর্বিত ব্যতিক্রম তার মধু।

যোগীন্দ্রনাথকে দিয়ে মধুসূদনের জীবনচরিত লেখানোর সর্ববিধ প্রযত্ন স্বীকার করার জন্য ভোলানাথ—তখনকার ডাকসাইটে ইংরেজিনবিশ, গৌরদাস বসাককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছিলেন, তাঁর এই বন্ধুকৃত্য দায়বদ্ধ করে তুলেছে বাঙালি সর্বসাধারণকে। আর 'for the getting up of Modhu's biography as a public act, I move for a vote of public thanks to you.' তা হলে কেবল কি সদ্যশিক্ষার্থীর পীড়া আর নব্যগবেষকের আত্মপ্রসাদের ভাগী হয়ে পর্যবসিত হবেন মধুসূদন? এতদিন পর? কেবল সপ্রতিভ মর্যাদা নয়, কেবল কাব্য নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গৌরব তাঁকে দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একত্রযুগ্মিত করে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, এঁরা দুজন আধুনিক বাঙালিকে দিয়ে গেছেন মহত্তম সম্পদ—ভাষা, সাহিত্য, সর্বোপরি দৃপ্ত জাতীয়তাবোধ। বলতে কুণ্ঠা হয়, এতদিনেও এঁদের সবিস্তার একখণ্ড জীবনী গ্রন্থ কেন বেরোলো না? বঙ্কিমের কথা নয় থাক আপাতত, তাঁর বন্দেমাতরম্ নিয়ে কিছুদিন ধরে অনেক কথার আলোড়ন হচ্ছে। কিন্তু মধুসূদন? জীবনীর সব ক-টি কাণ্ডও তাঁর পূরণ হয়নি আজও, শতাধিক বর্ষ ধরে তিনি অতল অতল কবরের তলায় মাটিতে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আছেন—ক্রমেই আবছায়া হয়ে আসছে সেই সব বৃত্তান্ত যা নিয়ে যোগীন্দ্রনাথ কবিকে নায়ক বানিয়েছিলেন একদা। যোগীন্দ্রনাথের জীবনীটি অবশ্য সম্প্রতি বেরিয়েছে। কপিরাইট-আওতার সময়-সরহদ্দ পেরিয়ে যাওয়ার সুফলে কিন্তু লালবিহারী বসাক, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শ্যামমাধব রায় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরিচিতদের তথ্য সংবলিত নগেন্দ্রনাথ সোমের সেই বই? ক বছর আগে পুনর্মুদ্রণের বিজ্ঞাপন পড়ছিলুম তার কী হল? পূর্ণাবয়ব পরিচয় সহায়িকা কতই তো পড়ে আছে বাকি। কেউ করুন না পুরো একখানা মধুসূদন অভিধান। গড় ক বছর মাঝে মধ্যে কাগজে ওঠে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিস্তম্ভের পাশে কবি-সাহিত্যিকেরা মিলেছেন কেউ কেউ, প্রবাসী কবিতা-পত্রিকা একবার সংরক্ষণযোগ্য একটি মধুসূদন-সংখ্যা বের করেছিলেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বের করেছিলেন কবিতর্পণ-জাতীয় একটি কবিতাসংকলন, আরো একটু কিছু হোক না?

কবির মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩, সমাধি ৩০ জুন ১৮৭৩, সমাধিস্তম্ভ উন্মোচন ১ ডিসেম্বর ১৮৮৮। একশ পাঁচ থেকে নব্বই বছর আগের কথা। এখনই জীর্ণ হয়ে যাবার সূত্র?

পূর্বানুবৃত্তি

পূর্ব প্রসঙ্গ আরেকবার। রবীন্দ্রনাথের চিঠির কথায় মনে হল।

আরেকজন দূর বিদেশী সাগরপারের কবি, ব্লেকের লেখার দিশি গ্রাম্য সেই কলমটি। আরো ছিল সঙ্গে, লেখবার রঙানো একটু জল। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ফুসরঙো রস ছেঁচে কবিতার কালি বানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, আর উপহাস করেছিলেন—নিঃসহায় নির্বুদ্ধি বিশ্বাস! ব্লেকের 'টিরিএল' এ কিছু আছে সেই প্রৌঢ় পরার্ধটুকু প্রথম ভাগের মুখোমুখি। আদি সত্তার, অর্থাৎ বালকের—সেই সহজতা, বয়স্ক পৃথিবীর কাছে একডাকে যা বাল্যস্মৃতি—সেই ইনোসেন্সের গানের বইখানির আদ্যোপান্ত নিজের লেখার লেখক যে লেখক—যাঁর ছবিবাঁধানো লেখায় নয় তো গানবসানো ছবিতে ভর্তি ছেলেমানুষী স্বাধীনতা—আধুনিক জটানোজগতের মেধাবী আরেক কবি এলিয়ট ঐ অ-সম্ভব সহজের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—অস্বস্তিকর ভয়ঙ্কর এই সততা—ত্রস্ত আধুনিক জগৎ ওকে মুছে দিতে শলা করছে সব সময়। ব্লেকের রচনাবলীর প্রায়-উপক্রমের এক লেখা—বিনোনো লতার ঝরকায় ঝরকায় দাসী আর বালকের, বাঁশিওলা আর শিশুশ্রোতার, দোলনায় হাত লাগা লোকটির, ফলপত্রপুঞ্জের মধ্যে উড়ে ওঠা পাখির নক্‌শা, আর এই সে লেখা

সঙ্‌স্ অফ ইনোসেন্সের ভূমিকা

যেতে যেতে বাঁশি বাজিয়ে বনের পথে,
সুরে সুরে তুলে আনন্দঝঙ্কার,
দেখি বসে ছোট ছেলেটি মেঘের পরে
হেসে সে আমায় বলল আদেশ তার :

'বাজাও তো দেখি ভেড়ার ছানার গান!'
বাজালাম তাই উল্লাস-উচ্ছল ;
'ও বাঁশিয়া, ফের বাজাও আরেকবার।'
বাজালাম ; তার চোখ ভরে এল জল।

'বাঁশি ফেলে দাও, তোমার সুখের বাঁশি ;
'গাও যা যা জানো রঙিন মধুর বাণী।'
ফের গাইলাম, আর সেই গান শুনে,
আনন্দে কেঁদে ফেলল সে কানাকানি।

'ও বাঁশিয়া, সোসো, বইয়ের পৃষ্ঠা ভরে
'লিখে দাও গান সব্বার পড়বার।'
বলে তখুনি সে মিলিয়ে গেল আমার
চোখ থেকে : আমি শরবন ভেঙে তার

ফাঁপা শরে গড়ে নিলুম গেঁয়ো কলম,
রঙিয়ে নিলুম অমল একটু জল,
লিখলুম যত আমার সুখিয়া গান
শুনে মেতে ওঠে যে গান ছোটর দল।

ছোটদের লেখা সোড়াতে, ছোটদের লেখা পরিণামে, কিন্তু মাঝখানে? অন্তর্বর্তী মাঝখানে বিদ্ধ মানুষের গাঢ় দৃষ্টির ছায়া—তর্জমা কেবল মূলটুকু পড়তে যাওয়ার পথ-নিশানা, তার বেশি না। বিলেতে স্টিলের কলমের চল হল ১৭৮০ সালে, আর ১৭৮৪-৮৫ তে এক নক্‌শা-ছাপার দোকানে কাজ নিয়ে পত্তন হল ব্লেকের এই সব

গানের লেখা। হয়তো সেই আভাস-ঘন ছায়া—কত রকমে জমে উঠেছে আপাতপরতের তলায় তলায়, এখন পড়তে গেলে সোডার ঝাঁঝের মতো উঠে আসে।

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে

সবজে আঁষটে পাতা দূরান্ত জল, একশোহাজির ফিসফিসুনি আঁচল চেপে চিত দিয়ে ভেসে চলেছে জল ঐ আকাশসাগর সীমানাতে—আধবলয় না পুরতে ছড়িয়ে মিলিয়ে যায় শান্ত সবজে ঢেউ··· দেখা যায় না শুধু বৈঠার ঘা পড়ছে ছন্দবাঁধা, দেখা যায় না জল তোলার কল্লোল—শুধু ভাঙাটুকরো বিজরিদানা উড়োপাড় দিয়ে লাফিয়ে ঢুকে আসছে নতুন ঠাণ্ডা জঠরে···সবজে জড়ানো আবছা ঘুমতি আলো—কে জাগে? কেউ না, ওই কেবল জেগে আছে চোখ বড় বড় করে। এক একবার চিক ঠেলে মুখিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভিজে জলরঙের ছবি—শেওলার শঙ্খের জলধোয়া বাতাসের রঙ আষ্টেপৃষ্ঠে। একহাত বাঁ হাত দিয়ে ঝরঝর করে পশলা ঝরিয়ে ··মিনিটে অনেকখানি আগিয়ে নিয়ে গেছে নীল-ঘনানো মেঘের হাজারঝারি ঘুড়িটাকে—বাঁ দিক দিয়ে দিয়ে আভা চলেছে তার—খানিক আমাদের সাথে, খানিক ঘুড়ির লেজের মতো মেঘের পিছ পিছ ···আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে—এত রোগা হয়ে গেছে আমারও হাত দুটো, দৃশ্যস্পর্শওয়া গোটা শরীরটা এত ভয়ানক নির্ভার—চমকে উঠলুম হঠাৎ। আশ্লিস্টসামু মেঘ নয়, কণ্ডরা জানতে চাইছে: নামব ঐ দ্বীপে? দ্বীপে! চমক ভেঙে দেখি দিকবলয়ের প্রান্তরেখাছোঁয়া দুদের মাঝামাঝি ভেসে উঠেছে টানা পাড়, পাড়ের পিছ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে মেঘরঙের চ্যাটা চ্যাটা পাতাওলা এলোমেলো গাছবৃক্ষ—সুপলাশী সুখপলাশীগাছ, রঙ ঝাপটে ওঠে একএকগোছা উল্লাসী পাতায়। স্পষ্ট হয়ে উঠল টিলার ঢাল পটভূমি, আর বনলা পেখম খুলে দাঁড়িয়ে আছে ময়ুর—

তুলছে ফেলছে এক পা আর এক পা, ময়ুর ঘন রঙের পুঞ্জ উড়ছে ফাটা কাপাসের মতন, কোথাও তাড়া নেই, কোনোখানে স্কন্দদেবতাকে ঘুম পাড়িয়ে একা বেরিয়ে এসেছে বননিসর্গের ওই পরমাত্মজ পাখি—শীর্ষ নভস্ অবধি টান করে বাঁধা সেতারের মীড় গুমরে ওঠে—যেন এক তারে মুচড়ে উঠেছে দূরান্ত জল আর মাটির বুক। গ্রাহ্যই করল না আমায়। যে আমার নাগালের বার দিয়ে উড়ে গেছে পশলা ঝরিয়ে, হঠাৎ ওর মাথায় ঢেলে দিতে এসেছে পাতার নীল ঝর, তাও খেয়াল নেই।

গত বছরে বেতলা বনের পথে দেখলুম অজলা সোঁতা পার হয়ে তোড়া-করা দীর্ঘ পালকপুচ্ছের ভার বয়ে অকুতো চলেছে ময়ুর-নেড়া গাছের ওপর উড়ে বসল পত্রল ডালের মতো, ঝটপট করে ঘন উড়াল উড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে—পোড়োপুরোনো পলামু কিলার চারদুয়োর উথোলপাথল করে ছড়িয়ে যাচ্ছে নষ্ট ছন্ন দুপহর বেলা···উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে তলায় ঊর্ধ্বে শুধু গাছ আর গাছ—ভিড় কাতার বাঁধা গাছ আর গাছ—পরস আর ভরুল আর করম, দু দিন আগে বর্ষা হয়ে গেছে মিনিটলহমা ভর্তি সেই ছায়া—শ্রাবণ আসছে। আষাঢ়ের সেই আসন্ন প্রশমের

দিনে সমস্ত কেল্লাপাহাড়ের ভার চাপ হয়ে বসল মাথায়, যেন চোখ চাইলে দু চোখ ভরে যায় কালচে-আরক্ত দৃষ্টিতে···

থমথম দু পহর বেলা—কমলদহ ঝিলের রাস্তায় বসে পড়লুম লাঠি ভর দিয়ে।

বলয়ঘোরানো বন, বনের পিঠে বন, জঙ্গলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এসেছে পথের কিনারাতে। কত ধারার আওয়াজ—গাছপালার, পাখিপতঙ্গের, একশোহাজির অ-শরীর পাখা পুরোণো অতীতের —বেজে ওঠে সমস্ত শরীর বেজে ওঠে। বসে থাকতে থাকতে মন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন আবহাওয়ার আচ্ছন্নতা ঘেরাটোপ দিয়ে পড়ল, গা থেকে ধুয়ে যাচ্ছে মানুষরঙ আস্তে আস্তে, হাতের পায়ের শিরায় যেন আঁকড়ি দিয়ে উঠছে জঙ্গলের লতা, আর তারই মধ্যে টের পাই —আশ্চর্য! পিট্রোল গাড়ির গন্ধ নেই, তীরহাতিয়ার ঝুলোনো নেই কাঁধে, ফুর্তি বাজিয়ে ছুটোছুটি চঞ্চুইভাতি নেই ধারেপাশে —তা হলে?—ডালের প্রান্ত অবধি উজিয়ে এসে কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখছে বেহুদো হনুমান আর লালমুখা, খেয়াল নেই বন বুজে আসছে চার ধার দিয়ে।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থ-পরিচয়ের জন্য নীচের তালিকায় গ্রন্থগুলি আমাদের দপ্তরে প্রবেশ কিছুদিন হ'লো জমা পড়েছে। এ-মাসে স্থান অকুলানের জন্য সে-দায়িত্ব পালন সম্ভব হোলো না। শ্রাবণ সংখ্যা জয়শ্রী'তে অবশ্যই এ-দায়িত্ব পূরণ করা হবে।

গ্রন্থের নাম — লেখক

১। জীবন-স্মৃতির ভূমিকা : ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

২। ব্যক্তি বনাম ব্যক্তিত্ব—গান্ধীজী ও নেতাজী : ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৩। Netaji—Dead or Alive : Samar Guha

৪। গণতন্ত্র, মুখোশ ও মুখশ্রী : কাশীকান্ত মৈত্র

একই কারণে সুনীল দাসের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সবাদ' : এই সংখ্যায় বাদ গেছে। পরবর্তী সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

কর্মাধ্যক্ষ, জয়শ্রী

[১৯১ পৃষ্ঠার পর]

বেরোবার পর থেকেই জনতাদলের বিরোধের আরও সঙ্কটময় অধ্যায়ের সুরু করেন রাজনারায়ণ—দলের সভাপতির, কর্মপরিষদের এবং পার্লামেন্টারী বোর্ডের পরিবর্তনের দাবীতে। ১৯৭৭, ১লা মে একবছরের মেয়াদে সাময়িক ভিত্তিতে দলের সভাপতির নিয়োগ এবং এই সংস্থাগুলি গঠিত হয়েছিলো। সুতরাং এদের বিধি-সঙ্গত অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে—রাজনারায়ণ এই দাবী তোলেন। রাজনারায়ণের অভিযোগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। প্রকাশ্যে জনতা দল ও তার সভাপতিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদগ্র আকাঙ্খায় রাজনারায়ণের মাত্রাহীন উক্তিগুলি প্রতিদিন সংবাদপত্রের উপজীব্য হলেও, চরণ সিংও তাকে আরও প্রশ্রয় দিয়ে নিজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অযৌক্তিক ও জটিল হওয়ার পূর্বেই রাশ টেনে ধরলেন এবং বিশেষ আদালতে ইন্দিরা গান্ধীর বিচারে প্রধান মন্ত্রীর অসম্মতির ফলে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্বে ও মোরারজী দেশাইয়ের পুত্র কান্তি দেশাই-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে অসম্মতির জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করে চরণ সিং বিবৃতি দিয়ে এক অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন: এ-ছাড়া চরণ সিং আরও বললেন, যে দলের নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না। ফল হোলো, ক্যাবিনেটের মিটিং ডেকে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিলেন চরণ সিং ও রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের—'appropriate action'-এর। প্রধানমন্ত্রী তাদের পদত্যাগ দাবী করে চিঠির খসড়া তৈরী করতে বললেন ক্যাবিনেটের সহকর্মীদের। অটলবিহারী বাজপেয়ী, চরণ সিং-এর বিরুদ্ধে নরম ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করছিলেন, তাকে যেন শুধু একটু ধমকে দেওয়া হয়—পদত্যাগ দাবী না করা হয়। এই ছিল বাজপেয়ীর আবেদন। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাজপেয়ীর একটু সংঘাতও হয়ে গেলো। প্রাক্তন জনসঙ্ঘ সদস্যদের দ্বিমুখো-নীতির স্ববিরোধিতার জালে এবার তারা জড়িয়ে পড়েছেন। রাজ্যগুলিতে চরণ সিংকে সমর্থন আর কেন্দ্রে মোরারজীকে—এবার এই নীতির স্ববিরোধিতা ধরা পড়ে গেলো। জনসঙ্ঘের মধ্যেও আবার দুই মত—বাজপেয়ী, আদবানীর মত একই রকম, নানাজী দেশমুখের মত তাদের বিপরীত। অবশ্যি প্রধান মন্ত্রীর চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে চরণ সিং ও রাজনারায়ণ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। রাজস্থানের দুই মন্ত্রী, কেন্দ্রের চার রাষ্ট্রমন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন চরণ সিং-এর প্রতি গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবাদে। তারপর ১৭ই জুলাই দিল্লীতে দশলক্ষ লোকের কিষাণ সমাবেশের পরিকল্পনা করলেন চরণ সিং-এর সমর্থকরা। এদিকে কেন্দ্রীয় পরিষদীয় বোর্ড দেবীলালকে ৮ই জুলাই আবার আস্থাসূচক ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে দেবীলালের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেবার পথ পরিষ্কার করতে চাইলেন। চরণ সিং-এর কাছে যারা শান্তির দৌত্য করে গেলেন, তারা বুঝে এলেন ১৭ই জুলাই কিষাণ সমাবেশ বন্ধ হতে পারে যদি ১০ই জুলাই-এর মধ্যে চরণ সিং, রাজনারায়ণ সম্পর্কে সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু

সে-পথে অন্তরায় হলেন মোরারজী দেশাই। ক্যাবিনেটে এঁদের ফিরিয়ে নেওয়া না নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নিরঙ্কুশ, সেখানে কারো পরামর্শ দ্বারা তিনি পরিচালিত হবেন না। কর্পুরী ঠাকুর জয়প্রকাশ নারায়ণ ও আচার্য কৃপালানীর হাতে বিরোধ মীমাংসার ভার তুলে দিতে চাইলে তাঁদের সম্বন্ধে মোরারজী দেশাই-এর মন্তব্য শোনা গেলো—তাঁরা বাইরের লোক—'Outsiders', অর্থাৎ সরকারের কেউ নন। অথচ মোরারজী দেশাই এদের সুপারিশেই প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন হ'তে পেরেছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে চরণ সিং ১৭ই জুলাইয়ের বিষাণ সমাবেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। দারুণ সংঘাতের সম্ভাবনা থেকে জনতা পার্টি রক্ষা পেলো। উত্তর ভারতের রাজনীতিতে চরণ সিং ও ইন্দিরা গান্ধীই তাঁদের পেছনে জনসংহতি (mass base) দাবী করতে পারেন, আর অনেকটা পারেন জগজীবন রাম। তাছাড়া আর কেউ নন।

জনতা পার্টি এই ষোল মাসের মধ্যে কংগ্রেসেরই আর একটি সংস্করণে পরিণত হয়েছে। বৃহৎ আদর্শনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ গোষ্ঠির সমাবেশ যে আকার নেয়, জনতা পার্টি সেই আকার নিতে চলেছে। বৃহৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্-এর ওপর সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামের জন্য জনতা পার্টিকে সংগঠিত করে তুলতে হবে। চরণ সিংকে বলা হয় মধ্যমানের কৃষকদের প্রতিনিধি, কখনও বা উচ্চমানের কৃষকদের। জমির উচ্চসীমা সারা ভারতবর্ষে আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১৮ একর অর্থাৎ ৫৪ বিঘা। আইনানুগভাবে এর বেশী জমি রাখবার কারুর অধিকার নেই। এই উচ্চসীমাও যদি মনে হয় বিত্তবান ও সম্পদশালী কৃষকদের সৃষ্টি করবে—যার কোনো সম্ভাবনা নেই—তবে জমির উচ্চসীমা আরও কমিয়ে আনা যেতে পারে। এদের সঙ্গে জমিহীনদের, স্বল্পজোতের কৃষকদের ও স্বল্পবিত্তের মানুষদের সংহত করে আগামী সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। এই সমাজ-বিপ্লব হবে ভারতীয় পরিবেশে, ভারতীয় সংগ্রাম-কৌশলের অনুসরণে। সমাজবাদ, গণতন্ত্র, এই প্রত্যয়গুলি কথার কথায় পর্যবসিত হয়েছে, এই শব্দগুলিরও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নূতন অর্থ-বোধের বা আদর্শবাদের সন্ধান চাই। জনতা পার্টির দলাদলির পেছনে এই নূতন আদর্শবাদের ছায়াপাত রয়েছে। তাকে সুস্পষ্ট করে তোলার সংগ্রামে জনতা দলের পরীক্ষা চলছে।

১৪-৭-'৮

২১৯বি বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮·০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

"শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম"—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

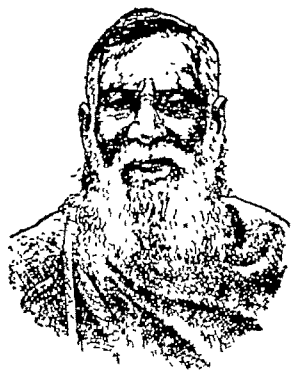

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশাহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইন্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

27 JUL 1978

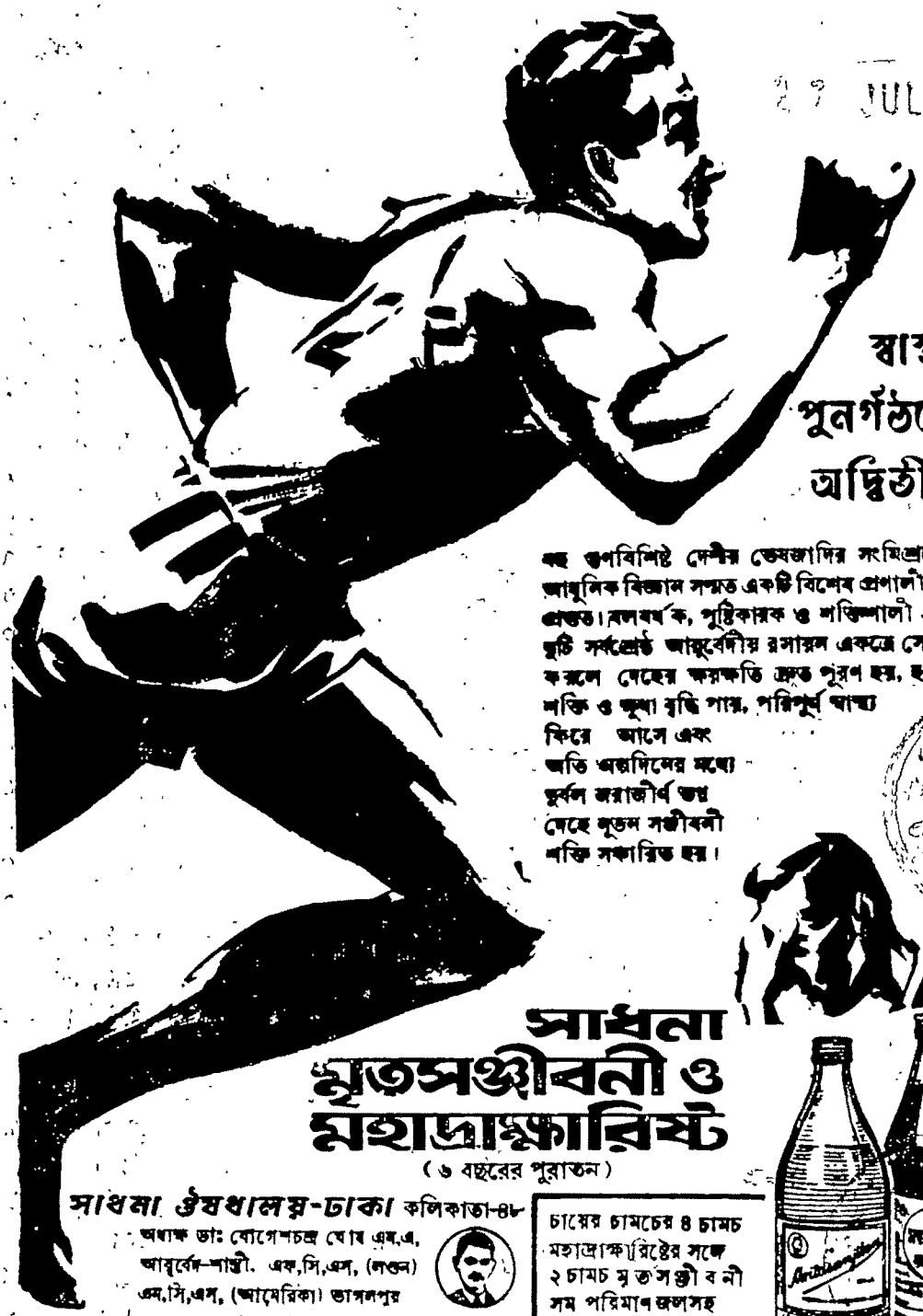

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ জীর্ণ দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/80

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Re. 1·00 with Regd. Postage Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

৪৩ বর্ষ ঃ ১৩৮৫ ঃ শ্রাবণ

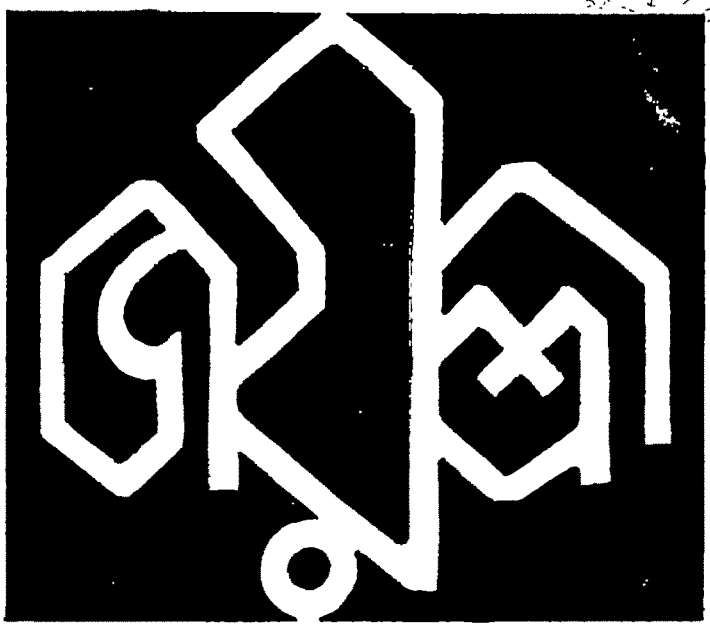

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা
লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ঃ ১৯১৬-১৯২৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

H. V. KAMATH

LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : Rs. 15/-

NANDA MOOKERJEE

NETAJI THROUGH GERMAN LENS : Rs 20/-

VIVEKANANDAS INFLUENCE ON SUBHAS : Rs. 6/-

NETAJI SPEAKS : VOL. I Rs. 4/-

নেতাজীর জীবনবাদ ঃ অনিল রায় দাম ঃ ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ঃ পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড ৩৪·৫০ এর পরিবর্তে ২৭ টাকায়। বাংলায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় ঃ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীতার প্রেক্ষায় ৬১টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত। প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের এই বই ভাল লাগবে। দাম ঃ ১০ ০০

পুবদেশি উপকথা ঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পুব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গপ্পো, গণেশ পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম ঃ ৯.০০

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম ঃ ৯ ০০

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন ঃ ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম ঃ ২০ ০০

রামমোহন ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দাম ঃ ৬.০০

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

15-ই আগষ্ট

দিনটি পরম আনন্দের ঃ মহান মূল্যবোধ ও আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নেবার দিনও বটে।

এই দিন আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি—

—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

—লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আত্মত্যাগ ও কষ্ট ভোগের কাহিনী।

—সুদৃঢ় স্বাধীনতার বুনিয়াদ দৃঢ় করা এবং দেশের সংহতি সাধনের প্রয়াস ও অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা।

আজ আমরা শপথ নিচ্ছি—

—দেশ থেকে বেকারি, রোগ ও নিরক্ষরতা নির্মূল করব;

—দেশের 5 লক্ষ 76 হাজার গ্রামের মানুষের ন্যূনতম চাহিদা—পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সড়ক—মেটাব।

—সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যাব। আমাদের সমান অংশীদার হবে তারা।

স্বাধীনতার 31তম বার্ষিকীতে আসুন আমরা
শপথ নি, গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত আমরা গড়ব;
প্রতিটি অশ্রু-বিন্দু মুছে দেবার চেষ্টা করব।

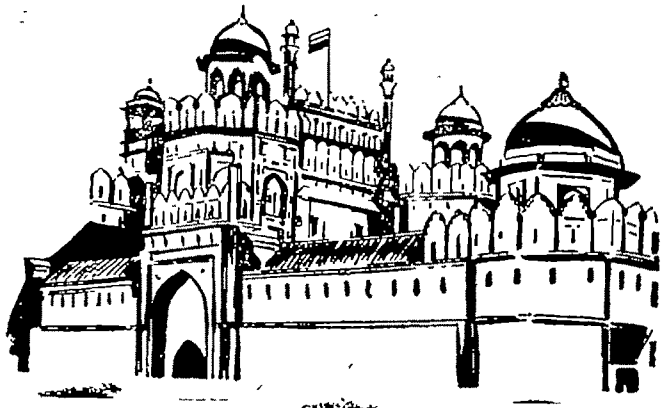

DAVP 98/2018

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

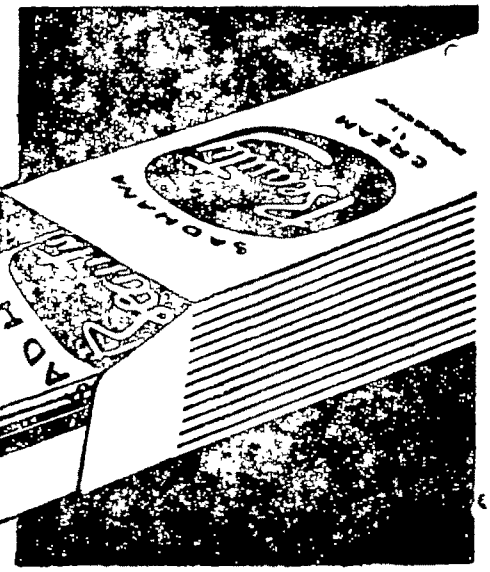

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 8/71

জয়শ্রী

সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ শ্রাবণ। ১৩৮৫ ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বাইশে শ্রাবণ ২৩৯

এ-কেমন স্বাধীনতা ? ২৪০

শ্রদ্ধা-তর্পণ

প্রবীণ জননেতা নিশীথ নাথ কুণ্ডুর লোকান্তর ২৪৪

স্মৃতি-কথন : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ।। গোপাললাল সান্যাল ২৪৭

এশিয়ার রত্নমালা : ৬

চিরঞ্জীব মুজিব ১ ।। নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৫৬

গ্রাম-সমীক্ষা

কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন ২৬৪
বীরেন্দ্রকুমার সাহা

কবিতা

কাছে এবং দূরে ২৬৮
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃখ-সুখ ২৬৮
শংকর ব্রহ্ম

স্বদেশের-ভাবনা

মার্ক্স-কথা ২৬৯
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

পুস্তক-পরিচয়

Netaji Dead or Alive ? ২৭২
Samar Guha

ব্যক্তি বনাম ব্যক্তিত্ব : গান্ধীজী ও নেতাজী ২৭৪
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জীবন-স্মৃতির ভূমিকা ২৭৭
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

গণতন্ত্র মুখোস ও মুখশ্রী ২৭৯
কাশীকান্ত মৈত্র

সাধারণ ব্যবহারোপযোগী শক্তির সহজলভ্য বিকল্প উৎস ২৮২
নির্মাল্য ভূষণ দাশ

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সবাদ ২৮৪
সুনীল দাস

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়শ্রী

আশ্বিন ।। ১৩৮৫

একটি আকর্ষণীয় আলোচনা

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষানীতি

আলোচনা করবেন : ত্রিপুরা শংকর সেন, ডঃ অমলেন্দু বসু, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

অপ্রকাশিত রচনা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

এছাড়া একগুচ্ছ গল্প ও কবিতা বিস্তারিত বিজ্ঞাপন ভাদ্র সংখ্যায় থাকবে

তাৎক্ষনিক মূল্যায়ন কার্যসূচী

সহজে ও দ্রুত

আপনার আয়করের মূল্যায়ন করে

- আয়কর অফিসে আপনার উপস্থিতির জন্য কোনোরকম নোটিশের প্রয়োজন নেই।
- আয়কর অফিসে আপনার হিসেবের খাতা পেশ করার জন্য কোনো সমন জারী করা হবে না !!
- নেহাৎ কোনো গাণিতিক ভুল সংশোধন করা বা আবশ্যিক বিধিসম্মত ছাড়া আপনার রিটার্নে ঘোষিত আয়ের সঙ্গে আর কিছু যোগ করা হবে না !!!

এই ভাবে আপনার আয়ের মূল্যায়ন
আপনি নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন।

আপনাকে শুধু যা করতে হবে তা হলো ঃ

★ আপনার পক্ষে যেমনটি প্রযোজ্য তেমনি উপযুক্ত নির্দ্ধারিত ফর্মে রিটার্ন দাখিল করুন।

★ রিটার্নের বিভিন্ন অংশ এবং পরিশিষ্টে আপনার আয় এবং অন্যান্য বিবরণ সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে লিখুন।

★ আপনার রিটার্নে হিসেবপত্র সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিবৃতি, যেমন, ট্রেডিং / ম্যানুফ্যাকচারিং এ্যাকাউন্ট, লাভ ও ক্ষতির হিসাব, ব্যালান্সশীট প্রভৃতি যদি থাকে জুড়ে দিন।

★ আপনার রিটার্নের সঙ্গে আগে থেকে কেটে নেওয়া কর সংক্রান্ত সার্টিফিকেট, অগ্রিম কর ও নিজের হিসাব অনুযায়ী দেওয়া করের চালানের বাকী অর্দ্ধেক অংশ, বাধ্যতামূলক জমা এবং জীবনবীমার প্রিমিয়াম প্রভৃতির রসিদও পাঠান।

কর সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার বিরুদ্ধে সব থেকে ভালো নিরাপত্তা হলো সঠিক ও সম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিল করা।

ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাণ্ড পাবলিকেশান)
ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী ঃ ১১০০০১

davp 1/78/157

জয়ন্তী

৪৩ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৮৫। চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বাইশে শ্রাবণ

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবিগুরুর ভাষণ শুনেছিলাম ঢাকার জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রাঙ্গণে। ছাত্রদের সযত্ন-নির্মিত মঞ্চে বসে কবিগুরু সেদিন সমবেত শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বলছিলেন: "আপনাদের রবি এবার পশ্চিমেই অস্ত যাবে।" ঢাকার সেই সফরের পরই কবিগুরুর ইউরোপ ভ্রমণ ধার্য ছিলো।

কবিগুরু পশ্চিমযাত্রা-সমাপ্তির পর দেশে ফিরে এসে দীর্ঘকাল ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে গেছেন, বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ও ফ্যাসিবাদের প্রাদুর্ভাবে সভ্যতার ওপর যে ভয়ঙ্কর সঙ্কট নেমে এসেছিলো, বিশ্বচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করলেন সেই সঙ্কট উত্তরণের জন্য। আসন্ন মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ঝড়ের আবর্ত সুভাষচন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে, তিনি সুভাষচন্দ্রের সপক্ষে গান্ধীজীর কাছে পত্র লেখেন আর সে-সময়ই নিভৃতে একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে 'দেশ-নায়ক'রূপে বরণ করে নিলেন: "...দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছো সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চারিত্র্য-শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর"। এই বরণমালা প্রকাশিত হয় ৮ই মে ১৯৪৬ সালে। ইতিমধ্যে কবিগুরু ১৩৪৮-এর ২২শে শ্রাবণ মহাপ্রস্থানে চলে গেছেন। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের ৩৭তম বর্ষে জয়শ্রীতে প্রকাশিত কবিগুরুর শেষ কবিতাটি নিবেদন করে অনন্তপথযাত্রীকে স্মরণ করছি:

"রূপ-নারায়নের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনার বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিয়ে।

শান্তিনিকেতন
রাত্রি। ১৩ই মে ১৯৪১।

এ-কেমন স্বাধীনতা ?

মহারাষ্ট্রে চ্যবন-রেড্ডি কংগ্রেস ও ইন্দিরা-কংগ্রেসের রাখী-বন্ধনের চার মাস দশদিনও অতিক্রান্ত হোলো না। বসন্তদাদা পাতিল দুই কংগ্রেসে মিলনের জন্য জোঁকের মত লেগে ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিদর্ভ এলাকার ভি, পি, নায়েক। এদের স্বপ্ন চূর্ণ ক'রে দিয়ে চ্যবন-শিষ্য ৪২ বছর বয়স্ক শরদ পাওয়ার চুপিসারে জনতা পার্টির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে গত ১২ই জুলাই দুপুর ১২টা ৪৫মিঃ বসন্তদাদা পাতিলের হাতে তার পদত্যাগ পেশ করবার পরই দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটে গেলো। শরদ পাওয়ার ৩৮ জন কংগ্রেস বিধায়কদের নিয়ে জনতার ৯৮ জনের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন। তাদের সঙ্গে পেজেন্টস এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি, মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা একযোগে প্রগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গঠন করেছেন। মহারাষ্ট্র বিধান সভার ২৮৮ জন সদস্যদের মধ্যে ১৮১ জনকে এই ফ্রন্টে জুটিয়ে মহারাষ্ট্রে ইন্দিরা গান্ধীর প্রভুত্ব খর্ব করবার কৃতিত্ব নিয়েছেন শরদ পাওয়ার। তার পেছনে চ্যবনের অস্ফুট সমর্থন রয়েছে, বলাই বাহুল্য। শরদ পাওয়ারকে কংগ্রেস ভাঙবার এবং তার সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠনের উদ্যোগের আড়ালে দলছুটদের প্রতি জনতা পার্টি কার্যত নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে দলত্যাগ-বিরোধী (Anti-defection) বিলকে খর্ব করেছেন কিনা সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন।

শরদ পাওয়ার যেমন ইন্দিরা গান্ধীর উত্থানের পথ অবরোধ করেছেন, তেমনি শরদ পাওয়ারের ক্ষমতা দখলের পর মারঠাওয়াড়া এলাকায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে আম্বেদকারে বিশ্ব-বিদ্যালয় নামকরণের পর পর 'দলিত' নামীয় হরিজনদের উপর দারুণ অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা নিয়ে গোটা মারাঠাওয়াড়ায় দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে গেছে, নাগপুরেও পুলিশের গুলি চলেছে। কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের বিপর্যয় না হলে শরদ-পাওয়ারের সরকার স্থায়িত্ব পাবে। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জনতা দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে প্রশ্ন উঠেছে, জনতা দলের গোষ্ঠিগুলির পুন-র্বিন্যাসের ভবিষ্যত রূপ কী মহারাষ্ট্র সরকারের গঠনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ? অর্থাৎ ইন্দিরা-বর্জিত কংগ্রেস আর জনতার জোট—এটাই কী ভবিষ্যতের রাখীবন্ধন ? তারই মধ্যে জনতার অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন কংগ্রেস গোষ্ঠিগুলি সংহত হলে, জনতার অ-কংগ্রেসী গোষ্ঠিগুলি কী কোণঠাসা হয়ে পড়বে ?

ইন্দিরা-কংগ্রেস ধর্মীয়, ভাষাগত, সাম্প্রদায়িক বিরোধে প্ররোচনা জুগিয়ে কিছুকালের জন্য প্রবল সংগঠনের মোহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন থাকতে পারে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুত্রকে আইনের

বেড়াজালে ক্রমশঃ দ্রুত জড়িয়ে পড়ে বন্দীজীবনের আসন্নতার শঙ্কাজনক চক্রব্যূহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকতে হবে। শাহ কমিশন ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের বিরুদ্ধে তিন দফা রিপোর্ট দিয়েছেন ভারত সরকারের কাছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে শাহ কমিশন বলেছেন: দেশে জরুরী অবস্থা ইতিপূর্বে জারী থাকা সত্ত্বেও 'আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা' আরোপ করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবার বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী যখন মনস্থির করেন তখন তিনি তাঁর সহকর্মী ও পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ তো করেনই নি বরং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মন্ত্রী-সভাকে এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের এ-বিষয়ে অন্ধকারে রাখেন।'.....জরুরী অবস্থা জারী করবার কারণরূপে, কমিশন বলছেন, 'কোনও সরকারী সূত্র থেকে আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গের অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটার আশঙ্কা পর্যন্ত প্রকাশ করা হয় নি।'

ইন্দিরা গান্ধী অনুষ্ঠিত এই অপরাধগুলির বিচার সাধারণ আদালতে হবে, না বিশেষ আদালতে হবে—এ নিয়ে জনতার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভায় মতভেদ দেখা গেছে। শেষ পর্যন্ত চরণ সিং-এর বিবৃতির চাপেই মনে হয়, মন্ত্রী-সভা সংবিধানের ১৪৩ (১) ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা জারী থাকাকালীন উচ্চ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধগুলি বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন সংক্রান্ত একটি খসড়া বিলের বৈধানিক উপযোগিতা বিচারের জন্য রাষ্ট্রপতি মারফৎ প্রেরিত বিষয়টির শুনানী ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ-এ সুরু হবে। ইতিমধ্যে গত ২২শে জুলাই সি, বি, আই দিল্লীর স্পেশ্যাল জজের কোর্টে ইন্দিরা গান্ধী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি, সি, শেঠি, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর অতিরিক্ত একান্ত সচিব আর, কে ধাওয়ান, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের স্টেনোগ্রাফার এম, ডি, মানছানদা এবং সুরেশ বাসুদেব এবং জিত্ পাল নামক দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের জন্য চার্জ সিট দাখিল করেছেন;—টাকার অঙ্কে এই অপরাধের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা। চার্জ সীটে বলা হয়েছে ১৯৭৭-এর জানুয়ারীতে সে-বছরের মার্চের নির্বাচনের জন্য সরকারী প্রভাব খাটিয়ে ১৩৯টি নূতন জিপ সংগ্রহ করে তার মধ্যে ৩৫টি ইন্দিরা গান্ধীর রায় বেরিলী ও সঞ্জয় গান্ধীর আমেথি নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় এবং লক্ষ্ণৌ এবং উত্তর প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় ৯৫টি জিপ ব্যবহৃত হয়।

শা'হ কমিশনের দুইটি অন্তবর্তীকালীন রিপোর্টের ওপর গত ৩রা আগষ্ট লোক সভার বিতর্কে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীকে: (১) লোকসভার আদালতে বিচার করে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার (impeach) দাবী ওঠে (২) সংবিধান ধ্বংস করবার এবং রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এবং জরুরী অবস্থাকালীন অপরাধের জন্য বিশেষ আদালতে তার বিচারের দাবী হয়। কেউ কেউ দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধের জন্য ন্যুরেমবার্গে নাৎসীদের যে

পদ্ধতিতে বিচার হয়েছিলো, ইন্দিরা গান্ধী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের বিচারে সেই পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ও তার পারিষদবর্গকে সুযোগ দিয়েছে মোরারজী দেশাই ও চরণ সিংয়ের সংঘাত। দেশাই-চরণ সিং-এর মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার দূতেদের চেষ্টায় এদের মধ্যে দুইবার ব্যর্থ-বৈঠক হয়েছে। দেশাই-এর দাবী তার পুত্র কান্তিভাই দেশাই-এর বিরুদ্ধে চরণ সিং-এর পত্রে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ চরণ সিংকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। চরণ সিং-এর পরিবারের বিরুদ্ধে একই ধরণের অভিযোগ প্রত্যাহারে চরণ সিং কিন্তু ব্যস্ত নন। চরণ সিং-এর মতে দুই পক্ষের অভিযোগ-গুলিরই উপযুক্ত তদন্তের মধ্য দিয়ে অভিযুক্তদের নির্দোষিতা সপ্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু এই বিষয়ে দেশাই ক্রমশঃ অনমনীয় হয়ে উঠে পুত্রকে নির্দোষ প্রমাণের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে মারুতি ও সঞ্জয় গান্ধী সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী যে মনোভাবের ফলে তার পতন অনিবার্য ক'রে তোলেন, মোরারজী দেশাই-এর পুত্র-বাৎসল্য সে-পথ ধরে চলেছে।

জনতা দলে মোরারজী-চরণ সিং বিরোধকে কেন্দ্র করে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে ও এই দুই নেতার পারস্পরিক পত্রাঘাতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় টানা-পোড়েনের পরিবেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে ইন্দিরা-কংগ্রেস ঐতিহাসিক 'ভারত-ছাড়ো' দিবসের অনুকরণে 'ভারত বাঁচাও'-এর বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে ব্যর্থ হয়েছে। এই 'ভারত বাঁচাও' আসলে 'শাহ' কমিশনের সুপারিশের পরিণতিতে সম্ভাব্য আইনের সাজা-প্রাপ্ত ইন্দিরা গান্ধীকে বাঁচাবার পদ্ধতি-বিশেষ। ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে এই কর্মসূচীর আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু দেশাই-চরণ সিং পত্রবিনিময়ের মূল বক্তব্য কার্যত বহু বিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে পত্রালাপের গোপনীয়তার ঠুনকো মর্যাদার দায় পালনের ধনুর্ভঙ্গ পণ নিয়ে দেশাই নিজের, দলের ও সরকারের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। দেশাই-এর এ-বিষয়ে অনমনীয়তা রাজ্যসভায় কার্যত পরাজিত হয়েছে। রাজ্যসভায় চেয়ারম্যানের চেম্বারে বিরোধীদলের নেতাদের পত্রগুলি দেখানো হয়েছে। লোকসভা অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। এ-ছাড়া ১০ই আগষ্ট তারিখে গৃহীত রাজ্যসভার এক প্রস্তাব অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক গঠিত ১৫-জন সদস্যের একটি হাউস কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী দেশাই-এর এবং চরণ সিং-এর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বিচারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়। মোরারজী দেশাই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে, বার বার এক কথাই বলেছেন: 'কান্তি নির্দোষ, আমি ক্ষমতায় এলেই এই ধরণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়।'

ইন্দিরা-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কান্তি দেশাই-এর বিরুদ্ধে ৩২ দফা অভিযোগ আনা হয়েছে, রাজনারায়ণেরও অভিযোগ রয়েছে। আর মধু লিমাই প্রমুখদের জনতা পার্টির আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বোঝাপড়া ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাকে

প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ থেকে একেবারে খর্ব করে দেওয়ায় মধু লিমাই জনতা পার্টির অন্যতম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ এবং মোরারজী দেশাইকে লেখা পত্রে কান্তি দেশাই-এর কঠোর সমালোচনা, তার সংসর্গ ত্যাগে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ, তার বৈষয়িক আয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি এবং বিধান সভার নির্বাচনের সময় কান্তি কর্তৃক ৮০ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহের অভিযোগ উত্থাপন করে লিমাই দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। ফলে জনতা পার্টির দেশাই-গোষ্ঠি এবং দেশাই-বর্জিত গোষ্ঠির মধ্যে কাঠিন্য বৃদ্ধি পাবে এবং পরিণতিতে এই দুই গোষ্ঠি জনতার বিধায়ক শাখা ও সাংগঠনিক শাখার মধ্যে চূড়ান্ত বিভক্তির দিকে অগ্রসর হবে। এই বিরোধে যদি ছেদ না পড়ে, এমন ঘটা অসম্ভব নয় যে জনতা সরকার রূপান্তরিত হয়ে তথাকথিত 'জাতীয় সরকারে' পরিণতি পেতে পারে। যে সরকারে ইন্দিরা গান্ধী ও কট্টর ইন্দিরা-পন্থীরা ছাড়া অন্যান্য কংগ্রেসীরা সমবেত হবে এবং 'বাম' নামে পরিচিত কোনো কোনো দলও তার শরিক হতে পারে। জনতা দলের অন্যান্য গোষ্ঠিরা হয়তো 'জনতা' নাম নিয়েই আবার শক্তির পুনর্বিন্যাসে মন দেবে।

পশ্চিম বঙ্গের শাসকবর্গ ভূমি-সংস্কারের নামে ভূমি-সংকটকে তীব্রতর করে তুলছেন। ১৯৬৭-এর যুক্তফ্রন্টের আমলে জমিদখলের লড়াই, ধানকাটার লড়াইয়ে যেভাবে শরিকদলগুলি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, এবারও তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। এবারও বড়ো শরিকের পদ্ধতি কোনো পরিবর্তন হয় নাই। বর্গাদারের অধিকার বিস্তারে এবারও লড়াই ঘনীভূত হচ্ছে, কিন্তু সে বর্গাদারকে দলীয় পতাকার রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও দলীয় মাপকাঠিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। পাঠক্রমেও দলীয় মতবাদের ছোপ প্রবলভাবে আরোপের চেষ্টাই শিক্ষার ভবিষ্যতের জন্য যারা শাসকদের চাইতে ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে সংবিধানের যৌথ-তালিকা থেকে রাজ্য-তালিকায় স্থানান্তরের প্রশ্নটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে।

বর্ধমানে কাশীপুর শিবিরে পুলিশের গুলিতে ২১শে জুলাই রাত্রে দণ্ডকারণ্য-আগত ৯ জন উদ্বাস্তু নিহত হন, আর উদ্বাস্তুদের টাঙ্গির ঘায়ে একজন পুলিশ নিহত হন। দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ওপর পশ্চিম বাংলা সরকারের অমানুষিক আচরণ, ইংরেজ আমলের অমানবিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বোপরি রয়েছে সামাজিক বন্ধন-মুক্তি, অর্থ নৈতিক বন্ধন-মুক্তির প্রশ্ন। সমাজে যারা অনুন্নত, যারা দুর্বল—তাদের অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ নির্মম হয়ে উঠেছে। হরিজনদের উপর অমানুষিক অত্যাচার, নারীদের উপর অশালীন পথে নির্মম অত্যাচার; অন্তহীন আর্থিক বৈষম্য তাই ইংরেজ বিদায়ের একত্রিশ বছর পরও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছে—আমরা কি সত্যিই স্বাধীন হয়েছি, না আর একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বন্ধন-মুক্তির অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে সমাজ-পরিবর্তনে পরিণতি দিতে হবে? সমাজ-বিপ্লব কতদূর?—আজকের এটাই আর্ত-জিজ্ঞাসা। ১৬-৮-৭৮

প্রবীণ জননেতা নিশীথনাথ কুণ্ডুর লোকান্তর

আমাদের পরম সুহৃদ, বাংলার প্রবীণতম জননেতা, চিরসংগ্রামী নিশীথনাথ কুণ্ডু ৮৫ বছর বয়সে, গত বুধবার ৯ই আগষ্ট রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিটে রায়গঞ্জ সদর হাসপাতালে লোকান্তরিত হয়েছেন। ৭ই আগষ্ট সোমবার রাত্রিবেলা রায়গঞ্জে তাঁর নিজ বাসভবনে হৃদরোগের অকস্মাৎ আক্রমণের পর তাঁকে রায়গঞ্জ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর ক'রে অবিলম্বে অক্সিজেন প্রয়োগে শ্বাসকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা করা হয়। রায়গঞ্জ হাসপাতালে ইলেকেট্রো-কার্ডিওগ্রাফ্ যন্ত্র না থাকায় তাঁর হৃদযন্ত্রের প্রকৃত অবস্থাটা চিকিৎসকদের অগোচরে রয়ে গেলেও, কঠিন হৃদরোগের আক্রমণ এই প্রবীণ সংগ্রামী নেতাকে আচ্ছন্ন করেছে, সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তাই পরদিন ৮ই সকালবেলা, ট্রাঙ্ক টেলিফোনযোগে কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের এই উদ্বেগপূর্ণ সংবাদটি জানিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর একমাত্র কন্যা এবং দুই দৌহিত্রীদের অনতি-বিলম্বে রায়গঞ্জে পৌঁছাবার জন্য খবর পাঠানো হয়। ৯ই আগষ্ট ভোরবেলা এরা রায়গঞ্জে পৌঁছে হাসপাতালে তাঁকে দেখে আসেন। দুপুর থেকেই রোগীর অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং রাত্রিবেলা দেশ-বিভাগের পর তাঁর দীর্ঘ তিন দশকের সংগ্রাম-ভূমি রায়গঞ্জের মাটিতেই জননেতা নিশীথনাথ কুণ্ডু মহাপ্রস্থান করেন।

একটা সময় ছিল যখন নিশীথনাথ কুণ্ডু ও উত্তরবঙ্গ সমার্থক ছিল। এই সমীকরণের উৎপত্তি অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল থেকেই। সেদিন নিশীথনাথ কুণ্ডু বিভাগ-পূর্ব দিনাজপুর শহরে সার্থক আইনজীবীর প্রতিষ্ঠা নিয়ে শুধু দিনাজপুর জেলায় নয়, গোটা উত্তরবঙ্গেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। দিনাজপুরের যে কয়জন প্রথম সারির আইনজীবী তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিভা বলে ব্রিটিশদের জেলা প্রশাসনের তৎকালীন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছিলেন, নিশীথনাথ তাঁদের অন্যতম। তারপরই অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার এলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাংলায় এই সংগ্রামের নেতা। সুতরাং, গোটা বাংলাদেশের তীক্ষ্ণধী আইনজীবীরা দেশবন্ধুর ডাকে তাঁদের আইন-ব্যবসায় ছেড়ে এই সংগ্রামে যোগ দিলেন। উত্তরবঙ্গের জনজীবনে নিশীথনাথ কুণ্ডুর প্রতিষ্ঠার দিনগুলির সুরু সেখান থেকে। দিনাজপুরের যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নিশীথনাথ কুণ্ডু, রাজশাহীর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, জলপাইগুড়ির চারুচন্দ্র সান্যাল, বগুড়ার যতীন্দ্রনাথ রায়, সুরেশ দাশগুপ্ত—এক একজন দিক্‌পাল নেতারূপে সেদিন থেকেই স্বীকৃত হয়ে এসেছেন। নিশীথবাবুর লোকান্তরে সেই ধ্রুপদী জননেতৃত্বের প্রথম সারিটি প্রায় শূন্য হয়ে পড়লো।

অসহযোগ আন্দোলনে যে-সময় নিশীথনাথ জনজীবনে প্রবেশ করলেন, সে-সময় বাংলায় দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র আই, সি, এস চাকুরী বর্জন করে দেশবন্ধুকেই নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছেন। গান্ধীজী চৌরি-চৌরায় পুলিশের ওপর জনসাধারণের হিংস্রতার পর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে সংগ্রামীদের শিবির বিভক্ত হয়ে একটি শিবির রইলো গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন অসহযোগীদের নিয়ে যারা গঠনমূলক কাজে আপাততঃ আত্মনিয়োগ

করবেন, আর একটি শিবিরের নেতৃত্বে রইলেন দেশবন্ধু ও তাঁর পাশে মতিলাল নেহেরু, যাঁরা কাউন্সিলে প্রবেশ করে ভেতর থেকে বৃটিশরাজকে পর্যুদস্ত করবার পথ বেছে নিলেন। সেদিন নিশীথনাথ কুণ্ডু গান্ধীজীর শিবিরকেই বেছে নিয়েছিলেন—সে-সময়কার পরিভাষায় যে শিবিরের নামকরণ ছিল: 'নো-চেঞ্জার' অর্থাৎ পরিবর্তনবিরোধী, আর দেশবন্ধুর শিবির নামাঙ্কিত ছিল 'প্রো-চেঞ্জাররূপে,' অর্থাৎ পরিবর্তনপন্থী। কিন্তু এই বিরোধের যতই রূপান্তর ঘটে বাম ও দক্ষিণের বিরোধরূপে চিহ্নিত হতে থাকে, জননেতা নিশীথনাথও বামপন্থার শরিক হয়ে ওঠেন। 'নো-চেঞ্জার' ও 'প্রো-চেঞ্জার'-এর শিবিরে আপসের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি গ্রহণ করবার পরই নিশীথনাথও এই বিরোধের সীমানা থেকে বেরিয়ে দেশবন্ধুর নেতৃত্বেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করে নেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতার সুরুও সেখান থেকে। উত্তরবঙ্গের বন্যায় আর্তত্রাণের সেবাকার্যে নিশীথনাথ তাঁর ভবিষ্যৎ নেতার কাজে সহযোগিতার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নিশীথনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে সূত্রটি তাঁর জনজীবনের গোড়া থেকেই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটির রূপরেখা ছিল 'নন্-কনফরমিজম' (Non-Conformism)—কোনো রকম গতানুগতিকতায় গা ঢেলে দেওয়া ছিল তার প্রকৃতি-বিরোধী। এই 'নন-কনফরমিজম'ই তাঁকে সকল কাজে শক্তি দিয়েছে, মাঝে মাঝে তাঁকে অদমনীয় ক'রে তুলেছে। এই নন্-কনফরমিজম-এর প্রবল স্বাক্ষর প্রথম দেখা গেলো ১৯৩৭ সালে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন-সূত্রে বিধানসভার নির্বাচনে। ১৯৩৭-এর শাসন-সংস্কারে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন স্বীকৃত হয়েছে, কেন্দ্রে ফেডারেশনের কাঠামোকে স্থান দেওয়া হয়েছে—যে ফেডারেশনের কাঠামো নিয়ে ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একদিকে এবং অপরদিকে কংগ্রেসে তাঁর দক্ষিণপন্থী সহযোগীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রবল বিরোধ বেধে ওঠে ত্রিপুরী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। জননেতা নিশীথনাথ ১৯৩৭ সালের এই নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হলেন—হয়তো তাঁর 'নন্-কনফরমিজমের' জন্যই। ফলে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁকে নামতে হয় এবং প্রবল বিরোধিতার মুখে জয়ী হয়ে সেদিন তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ফজলুল হক সাহেব তাঁকে কৃষক-প্রজা পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র প্রথম সুযোগেই তাঁকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনে যোগ্য মর্যাদা দেন। অতঃপর, ত্রিপুরী কংগ্রেস, রামগড়ের আপস-বিরোধী সম্মেলন, ফরওয়ার্ড ব্লক, দক্ষিণ-পন্থীদের দ্বারা বাতিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি—সর্বত্রই নিশীথনাথ সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহযোগী। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পর নিশীথনাথ ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়, বিপ্লবী নেতা অনিল রায়, আসরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সাহেব, হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, হেমন্ত কুমার বসু, ফণীভূষণ মজুমদার, হরিবিষ্ণু কামাথ, আর, এস, রুইকর, বসন্তকুমার

ঘোষ প্রভৃতি বন্ধুদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় দিনাজপুর জেলে বন্দী ছিলেন। সে-সময় জেলে হঠাৎ জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলে, গোয়েন্দা-বিভাগ জেল তোলপাড় ক'রে তোলে। নিশীথনাথ বাইরে থেকে জেলের ভেতর যোগাযোগ রেখে বিপ্লবী দেশনেত্রী ও জেলে তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের খবরাখবর সংগ্রহ করেন। এই জেলেই বিপ্লবী দেশনেত্রী গুরুতর অসুখে প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী হ'লে নিশীনাথের নেতৃত্বে বাংলার বিধানসভায় প্রবল আন্দোলনের ফলে নাজিমুদ্দীন সরকার তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরে বাধ্য হয়। সুচিকিৎসায় এবং অস্ত্রোপচারের পর বিপ্লবী দেশনেত্রীর জীবন রক্ষা পায়।

১৯৪৬-এ নিশীথনাথ সারা ভারতবর্ষে গরিষ্ঠতম ভোট পেয়ে বিধান সভায় নির্বাচিত হন এবং কংগ্রেস দলের চীফ হুইপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জননায়ক শরৎচন্দ্র বসু, সত্যরঞ্জন বক্সী, অনিল রায়, লীলা রায় —এঁদের সহযোগে নিশীথনাথ দেশ-বিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন এবং দেশবিভাগের যারা বলি হয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সেই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন তার সহকর্মীদের নিয়ে। দেশবিভাগের পর পুনরায় কংগ্রেস ত্যাগের পর ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠিত করে সমাজ-পরিবর্তনের রাজনৈতিক সংগ্রামে অবিচলিত থাকেন।

১৯৫৩ সালে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের সঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণের আলোচনার পর নিশীথ নাথ কুণ্ডু, হরিবিষ্ণু কামাথ, আর, এস, রুইকর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ লীলা রায়ের সঙ্গে একমত হয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির মিলন সর্বসম্মত করে তোলেন। ১৯৬৬ সালে নিশীথনাথ প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ত্রাণ ও সমবায় মন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করে দক্ষ প্রশাসকরূপে স্বীকৃত হন। ১৯৭১ সালে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে অন্যান্য সমাজবাদী দলের মিলনে সোস্যালিষ্ট পার্টির উদ্ভব হলে, নিশীথবাবু তার অন্যতম নেতার মর্যাদা পান। ১৯৭৭-এ সোস্যালিষ্ট পার্টিসহ অন্যান্য ৪টি পার্টির মিলনের পর জনতা পার্টির পত্তনেও নিশীথনাথ অগ্রণী।

নিশীথনাথের স্ত্রী বিয়োগ হয় বহু বছর পূর্বে। তারপর থেকে তিনি নিরামিষাসী ছিলেন। তাঁর প্রকৃতির অমায়িক মাধুর্য এবং মানবিকতাবোধ তাঁকে অনুপম বৈশিষ্ট্য দান করেছিলো।

নেতা নিশীথনাথ, সৈনিক নিশীথনাথও বটে, তেমনি দলের অন্তর্ভুক্ত থেকে দলের উর্ধ্বে তিনি জননেতাও ছিলেন। প্রায় ষাট বছর কাল তিনি স্বাধীনতার জন্য এবং পরবর্তীকালে সমাজ-বিপ্লবের জন্য অন্তহীন সংগ্রাম করে গেছেন। নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষ ছুটে গেছে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য, আশ্রয়ের জন্য। দুর্জয় শক্তির সম্মুখেও, তিনি সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শাসকদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভয়লেশহীন সংগ্রাম করেছেন। সেই মানুষটি আজ নেই। আমাদের এই পরম সুহৃদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গ ও সহকর্মীদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্মৃতিকথা

ধারাবাহিক রচনা

কিস্তি-৭

যে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

কলকাতায় ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র আসন্ন অধিবেশনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের-কার্যপন্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ করলেন এক ক্ষুদ্রাকার বাঙ্গলা দৈনিক। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার ও সুভাষচন্দ্র তখন ছিলেন এ-দৈনিকের প্রধান প্রধান লেখক ও পরিচালক। গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কাল পর্যন্ত এ-পত্রিকা চলেছিল। পরে বৃহদাকারে প্রকাশের সংকল্প নিয়ে এবং তার প্রাথমিক প্রস্তুতি-পর্ব সমাধা করে তিনি গয়া রওনা হন।

কিন্তু ওখানে সারা-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে আপাততঃ বাঙ্গলা দৈনিক প্রকাশের পরিকল্পনা স্থগিত রেখে প্রথমে, এবং যথাসম্ভব সত্বর, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর জন্য ইংরেজী দৈনিক প্রকাশ করাই স্থির হয়।

অবশ্য, এ পরিকল্পনা হয়, পূর্বেই, কারাবাস-কালে। পত্রিকার কি নাম হবে, কে হবেন পরিচালক, কেই বা সম্পাদক, কারাই হবেন কোম্পানীর ডিরেক্টর—তার খসড়া হয় ঐ জেলখানাতেই।

বাইরে আসবার পর, বিশেষতঃ ক'লকাতা কর্পোরেশনে জয়লাভের ফলে, দলের অবস্থার যেমন উন্নতি হল, নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তির তেমনি মনোভাবেরও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল।

ক'লকাতা কর্পোরেশন আয়তনে যেমন, আয়েও তেমনি, ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। এর বার্ষিক আয় তখন ছিল দু'কোটি টাকারও বেশী—তখনকার অনেক প্রাদেশিক সরকারের চেয়েও কম নয়। নতুন আইনানুসারে এ-অর্থ ব্যয় করবার পূর্ণ অধিকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর অর্পিত। প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিভাগ সুপরিচালনের জন্য কমিটি গঠন করবেন এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মাধ্যক্ষদের উপরে যিনি থাকবেন সর্বপ্রধান—তিনিও হবেন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারাই নির্বাচিত। এইভাবে নির্বাচিত সদস্যদের ভোটাধিক্যেই কর্পোরেশনের সর্বময় অধিকর্তা নিযুক্ত হবেন।

কে হবেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভাগ্য-

বিধাতা—তা নিয়ে প্রথমেই সুরু হল গুঞ্জন। ধীরে ধীরে তা কলগুঞ্জন থেকে কলহে রূপান্তরিত হতে দেরী হল না।

প্রথমে মেয়র ও তৎপরে প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদ —এ ছাড়া বিভাগীয়, বড়, মেজ, ছোট কর্তা নিয়োগের প্রচুর সুযোগ এসে গেল। এতদিন কর্পোরেশন ছিল সরকারের ঝানু ইংরেজ সিভিলিয়ানদের কুক্ষিগত। বড় বড় সাহেব সিভিলিয়ান অবসর নেবার পূর্বে, শেষের তিন চার বছর, কর্পোরেশনের 'কমিশনার' রূপে লাট সাহেবের পাশেই বিভিন্ন সভা-সমিতি ও রাজকীয় অনুষ্ঠানে আসন গ্রহণ করবেন, এই ছিল রীতি এবং সিভিলিয়ানদের শেষ বয়সের সুখ-স্বপ্ন।

নতুন আইনে সে-ব্যবস্থা লোপ পেয়েছে। স্থির হয়েছে, প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত হবেন মিউনিসিপ্যাল "কাউনসিলর"দের সভায় এবং তিন বছরের জন্য তিনি ঐ পদে নিযুক্ত থাকবেন। প্রতি সপ্তাহের মিউনিসিপ্যাল সভায় উপস্থিত থেকে, সভ্যদের সংশয় মোচন করে তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করবেন।

এ পদাধিকারীর প্রাথমিক বেতন ধার্য হয় দেড়-হাজার টাকা মাসিক। এছাড়া বাসস্থান, যাতায়াতের জন্য গাড়ী ইত্যাদির ব্যবস্থাও হল।

অন্যান্য বিভাগীয় কর্তাদের নিয়োগের অধিকার মূল কর্পোরেশনের, তবে বিভাগীয় কমিটিগুলির অনুমোদন সাপেক্ষ। এছাড়া এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতনভুক্ কর্মচারী নিয়োগের অধিকার এবং মিউনিসিপ্যালিটির অনুমোদন-সাপেক্ষে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি ও কর্মী নিয়োগের অধিকারও প্রধান কর্মাধ্যক্ষের থাকবে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদ যেমন দায়িত্বপূর্ণ তেমনি লোভনীয়ও বটে। যা এতদিন ছিল বিলেতী সিভিলিয়ানদের শেষ-জীবনের পরম আকাংখিত, তা আজ স্বরাজ্যদলের সভ্যদের হাতের মুঠোয়। অবশ্য, সিভিলিয়ান কমিশনার তাঁর চাকুরীর মেয়াদ ও বয়স অনুযায়ী যে বেতন পেতেন, তা-ছিল স্বরাজ্যদল নির্ধারিত বেতনের হার অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক।

এখন কে এ-পদ পাবেন, তা নিয়ে গোপন আলাপ-আলোচনা, মন-কষাকষি এবং অবশেষে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি সুরু হল।

কারাগমনের প্রাক্কালে দেশবন্ধু ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। দেশবন্ধুর আহ্বানে নাগপুর কংগ্রেসের পর যে সব আইনজীবী নিজ নিজ ব্যবসায় স্থগিত রেখে স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর নিজ জেলা মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় চৌকিদারী খাজনার বিরুদ্ধে সাফল্য সহকারে আন্দোলন চালিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি জনমানসে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করেছিলেন।

জেলখানায় প্রস্তাবিত দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা ছিল, তাতে বীরেন্দ্রনাথই হবেন উক্ত সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ম্যানেজার হবেন প্রাক্তন রাজবন্দী মনোমোহন ভট্টাচার্য্য—এরূপ কথা ছিল। হেমন্ত-কুমার সরকারও একটি বিশিষ্ট পদ গ্রহণ করবেন

স্থির হয়েছিল। অবশ্য তখন স্বরাজ্যদল গঠন বা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সাকুল্য জয়লাভের ফলে মিউনিসিপ্যাল শাসনভার পাবার কথা কারও মনে আসেনি।

গয়া কংগ্রেসের পর স্বরাজ্যদল গঠন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকার অর্জনে, অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। এ-সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন :

"পরে যখন (জয়ের পর) সেই বাড়ীর পূর্ব গৌরব ফিরে এল এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল,—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ভাণ্ডারের অর্থ সঞ্চিত হল, নিজেদের খবরের কাগজ প্রকাশিত হল, তা বাহিরের লোক জানে না—বোধ হয় কোনও দিনই জানবে না।" (তরুণের স্বপ্ন ; পৃঃ ৬৬)

এ অবস্থায় দলের অনেকেই ঝুঁকে পড়লেন কর্পোরেশনের চাকরীর দিকে।

নতুন শাসন-ব্যবস্থায় অনেক পুরাণো চাকুরিয়ার অবসর গ্রহণ করতে হবে, নতুন ছোট-বড় অনেক পদের সৃষ্টি হবে—এতো-জানা কথা। কে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত হবেন, তা নিয়ে শুধু জল্পনা-কল্পনা নয়, চেষ্টা-চরিত্রও সুরু হয়ে গেল—বিশেষ বিশেষ পদের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দেশবন্ধু মেয়র পদে নির্বাচিত হবার পরই স্থির করলেন নতুন শাসন-ব্যবস্থায় মিউনিসিপ্যাল কার্য-কলাপ সম্বন্ধে শহরবাসীদের নিয়মিত অবহিত করবার জন্য অনতিবিলম্বে তিনি একখানি "মিউনিসিপ্যাল গেজেট"—সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণের জন্য অনেকের তদ্বির সুরু হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদে কাকে নির্বাচিত করা হবে, স্বরাজ্যদলের ওপর-মহলে তা নিয়ে খুবই ব্যস্ততা দেখা গেল। জানা গেল, শাসমল মহাশয় এখন আর প্রস্তাবিত দৈনিক পত্রিকা প্রকাশন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর পদের জন্য আগ্রহী নন—তিনি কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হতে চান। এই ভাবে অনেকেই অনেক কিছু লোভনীয়ের জন্য ব্যগ্র। এরূপ নানাগুজবের ফলে রাজনীতির জগৎ পঙ্কিল হয়ে উঠলো।

এ সব ব্যাপারের আবর্তে দেশবন্ধুর জীবন কিরূপ দুঃসহ হতে সুরু করল, তা সহজেই অনুমেয়। কোথায় স্বরাজ-সংগ্রাম, আর কোথায় চাকরী নিয়ে কাড়াকাড়ি। মানুষের মনোজগতের এক বিচিত্র ও বিকৃত রূপ দেখে তরুণ দেশসেবকগণ যেমন নেতৃবর্গের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধুর মনেও নানা সংশয় উপস্থিত হতে থাকলো—এত হৈ চৈ, হাততালি, বক্তৃতা, আন্দোলন, অত্যাচার, স্বার্থত্যাগ, কারাবরণ—কিন্তু কি লাভ হল, আমরা কতদূর এগোলাম, স্বরাজের পথে?

যতই তিনি এই চিন্তায় মগ্ন হলেন, ততই সব কিছু ত্যাগ করে, আরও একাগ্র হয়ে মুক্তি-সংগ্রামে আত্মনিয়োগের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

এই সময়েই দেশবন্ধু ঘোষণা করলেন, গঠন-মূলক কাজের আদর্শ রূপায়ণের জন্য পল্লীসংস্কার সমিতি গঠন এবং সমিতির কাজের সুবিধার্থে তাঁর বাসগৃহটিও দানের সিদ্ধান্ত।

এতো গেল স্বরাজ্যদল ও কর্পোরেশনের কাহিনী। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তখন আর এক নাটকের সূত্রপাত হয়েছে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে স্বরাজ্যদল সর্বপ্রধান। কিন্তু নতুন আইনে, ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী, সমিতি ইত্যাদি অনুযায়ী বিভিন্ন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এমনভাবে পৃথক্ করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে যে, তাদের বিভিন্ন ও বিরোধী স্বার্থবোধকে সংযত ও মহান জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ করে ডায়ার্কির ধ্বংস-সাধক কাজে-নিয়োজিত করা প্রায় দুঃসাধ্য মনে হয়েছিল।

তাছাড়া, সরকারপক্ষীয়দের সঙ্গে ভোট দিলে হাতে-হাতে ফললাভের আশাও ছিল প্রচুর। কোনও সদস্যের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেও চাকরী পাচ্ছে না। কারও জামাতা বাবাজী সরকারী চাকরীতে আছেন বটে, কিন্তু মফঃস্বলের দূর-দূরান্তের সহরগুলিতেই তাঁর নিয়ত বদলা-বদলি চলছে, কারও বা ওপরওয়ালার অবসর-গ্রহণের কাল আসন্ন। সে স্থলে নিজের পুত্রটিকে কোনরকম যোগসাজসের সাহায্যে ঐ পদে বসানো যায় ইত্যাদি নানারূপ স্বার্থক্লিষ্ট ব্যক্তি সরকারী দলে থাকাই লাভজনক মনে করেন। সমগ্র দেশের স্বরাজ যে কি বস্তু, তা আহরণ করতে একটি ভোটের মূল্যই বা কত, তা উপলব্ধি করবার আগ্রহ অপেক্ষা ছেলে বা জামাতার চাকরী বা পদোন্নতি হাতে হাতে অর্জন করা—কোনটা লোভনীয়?

এ সব বাধা সত্ত্বেও দেশবন্ধু কতকগুলি জাতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে যে সব প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যবস্থা করলেন, তা নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

কর্পোরেশনের ডেপুটি-মেয়র পদে তিনি যুবক ব্যারিষ্টার সহীদ সুরাওয়ার্দি সাহেবের নির্বাচন অনুমোদন করলেন। এ ছাড়া, শুধু কলকাতা কর্পোরেশন নয়, সমগ্র বাঙ্গলাদেশের শাসন-ব্যবস্থায় জন-সংখ্যার ভিত্তিতে যাতে সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের পাকা ব্যবস্থা হয়, তার জন্য হিন্দু-মুস্লিম প্যাক্ট নামে সাম্প্রদায়িক মিলন প্রস্তাব দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপন করলেন।

বিদেশী সরকার কর্তৃক যখন সাম্প্রদায়িক ও ধর্মগত পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে ভেদনীতি সম্প্রসারিত করবার চেষ্টাদ্বারা স্বরাজ্যদলের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার চেষ্টা ব্যাহত করা হচ্ছিল, তখন দেশবন্ধুর ঐ প্রস্তাব 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' —নীতিরই নবতম প্রয়োগরূপে একদিকে যেমন অনেকের অভিনন্দন লাভ করল, সঙ্গে সঙ্গে আর একদল এ-পরিকল্পনাকে সাম্প্রদায়িকতার জয় মনে করে, এর তীব্র বিরোধিতা সুরু করল।

এ-প্যাক্টের প্রারম্ভেই আশ্বাস দেওয়া হয়, এর সর্তাবলী বর্তমান বা ভবিষ্যৎ—কোনকালের জন্যই স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় হবে না—কালস্রোতের পরিবর্তনশীল গতির সঙ্গে, অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় এ-মিলনসর্তাবলীরও সংশোধন বা পরিবর্তন

নিশ্চয়ই করা যাবে। দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ যেখানে এক ধর্মাবলম্বী ও এক সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং যখন তাঁরা অপর গরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির সম্মিলিত শক্তিদ্বারা নিপীড়িত বা নিষ্পিষ্ট হবার আশঙ্কায় দ্বিধাগ্রস্ত, তখন গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কি উচিত নয়, সকল অমূলক সন্দেহের অবসানকল্পে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া, এবং যে-যে বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস, সেগুলির সুষ্ঠু মীমাংসাদ্বারা প্রমাণ করা যে সকল সন্দেহ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ?

তাছাড়া, এ বিরাট বিশ্বের বিভিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক, অপরিচিত, অজ্ঞাত, নানা ভাষাভাষীর মধ্যেও নিয়ত ঐরূপ প্যাক্ট, চুক্তি, কন্ট্রাক্ট বা এগ্রিমেন্ট-এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেন-দেন চলছে, আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এত দূর-দূরান্তের অপরিচিত অধিবাসীদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা যদি নানা কাজ চলতে পারে, তবে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রদেশে, এক ভাষাভাষী, পৃথক ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনুরূপ চুক্তিদ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে জাতির সেবায় অগ্রসর হওয়ার বাধা-কোথায়, দোষই বা কি হতে পারে ?

বস্তুতঃ, দেশবন্ধুর এই প্যাক্টের প্রস্তাবনার সুযোগ পেয়ে নির্বাচনে পরাজিত বিভিন্নদল ও দলপতি আর একবার জনমানসে প্রাধান্য অর্জনের প্রয়াস পেল। হিন্দু মহাসভা, স্যার সুরেন্দ্রনাথের 'উদারনৈতিক' দল, অসহযোগ-বিরোধী জাতীয়দল, এমন কি গান্ধীবাদী নো-চেঞ্জার দলের অনেকেই এই প্যাক্টের বিরোধিতায় নানাস্থানে সভা-সমিতি সুরু করলেন। গান্ধী-পন্থী দল আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে এ-প্যাক্টের বিরোধী-প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন হুমকী দিলেন। দেশবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, প্যাক্টের প্রস্তাবগুলি সমগ্রদেশের বিভিন্ন প্রদেশে প্রযোজ্য নয় ; বাঙ্গলাদেশের ন্যায় যেখানে গরিষ্ঠদলের সঙ্গে অপরাপর দলের পার্থক্যের পরিমাণ খুব কম, মাত্র সেই প্রদেশেই এ-প্যাক্ট প্রযোজ্য। ফলে, পূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের কর্মপন্থার নিন্দাবাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এ-অঙ্কের শেষ কিন্তু এখানেই হল না। গান্ধীবাদীদের মধ্যে অনেকে এবং স্বরাজ্যদলেরও 'অসন্তুষ্ট'-সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এই প্যাক্ট-বিরোধীদের দলে যোগ দিয়ে এক নতুন 'জাতীয় দল' গঠন করেন। দেশবন্ধুর তিরোধানের পর এই দলই প্রকারান্তরে স্বরাজ্যদলের বিরোধিতা করতে থাকেন। আসন্ন ১৯২৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস থেকে কাউন্সিল-প্রবেশনীতি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় এবং স্থির হয় ভবিষ্যতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক স্বরাজ্যদল পার্লামেন্টারী শাখারূপে গণ্য হবে এবং তাদের অনুমোদনেই বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভা ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনীত হবেন।

এ হ'ল ১৯২৪ সালের শেষ সপ্তাহে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে গান্ধীজী কারামুক্ত হয়েছেন এবং তিনিও উপরোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। বস্তুতঃ এই সময়ই মহাত্মাজী ঘোষণা করেন এখন থেকে স্বরাজ্যদলই হবে তাঁর

রাজনীতিক কার্যকলাপের অধিকারী গোষ্ঠী। তিনি কাটুনী সংঘ ও হরিজন সহায়ক সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করবেন?

* * *

একদিকে কর্পোরেশন ও ব্যবস্থাপক-সভার চাকরী ও সভ্যপদ ও কর্মপন্থা নিয়ে কলহ ও কাড়াকাড়ি, অন্যদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে নীতিগত বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা—এ-দুয়ের সঙ্গে যুবকদলের কোনও সম্পর্ক নেই। কিছু কিছু যুবকের অবশ্য প্রয়োজন সামান্য জীবিকার ব্যবস্থা, যার সাহায্যে তারা ভালভাবে গঠনমূলক কাজে মন দিতে পারে। এ-জন্য দেশবন্ধু-ঘোষিত আদর্শ অনুযায়ী সহরের দরিদ্র অধিবাসীদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে সাধনের জন্য প্রধান কর্মাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশন থেকে নানা অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষালয় স্থাপন এবং জেল ফেরৎ কংগ্রেস-কর্মীদের সেখানে শিক্ষক, শিক্ষিকা-নিয়োগে অগ্রাধিকার দেবার ব্যবস্থা করেন।

এ-ছাড়া যারা খদ্দর ও অন্যান্য স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহী, তাদেরও নানা সুবিধাদান এবং কর্পোরেশনের বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঐ সব ভূতপূর্ব রাজবন্দী প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত নানা প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে যুবকদের শিল্পকার্যে এবং স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করবার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এ-ছাড়াও আর একদল ছেলে রইল—তাদের সংখ্যাও কম নয়—যারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই কংগ্রেসের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—যারা ভবিষ্যৎ জীবন বা জীবিকার কথা চিন্তা করেনি, চেয়েছিল যুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিতে—যাক্ প্রাণ, থাক মান:—এই সংকল্প নিয়ে যারা স্থির করেছিল, তাদের ঘর-বাড়ী, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আশা, উন্নতি সব—মিথ্যা, সব ব্যর্থ, যদিনা দেশ স্বাধীন হয়।

এ-যুবকের দল দেশের মুক্তি চায়, এবং মুক্তি সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতেই তারা তৎপর।

কিন্তু কোথায় সংগ্রাম? হিংসা বা অহিংসার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাদের মন ভোলাতে পারে না। 'দীর্ঘ মেয়াদী' পরিকল্পনা তাদের নিরস্ত করতে পারে না, তারা ফলাফল চায়, এখনই। প্রত্যাশায় থাকার জন্য তারা এই দুর্বহ জীবন নিয়ে টানাটানি করতে রাজী নয়।

এই রকমই একটি ছেলে ছিল, নাম তার গোপীমোহন, কেউ কেউ বলেন গোপীনাথ সাহা। হুগলী শ্রীরামপুরের বিখ্যাত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার। এখনও প্রতিবছর ওখানে যে স্বাস্থ্য ও শিল্প-প্রদর্শনী হয় তার উদ্যোক্তা ঐ সাহা পরিবার।

গোপীমোহন ঘর-বাড়ী ছেড়ে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিল, জেলে গেল। তখন তার বয়স হবে ষোল কি সতেরো।

জেল থেকে বেরিয়ে আর সে বাড়ী ফিরলো না।

জেলেই সে দেখেছিল নেতাদের মতবিরোধ, ব্যক্তি-পূজা; দেশ-মাতৃকার মুক্তি নয়, নিজ নিজ প্রবৃত্তির চালনায় অভীষ্ট লাভই তাদের আসল উদ্দেশ্য। সে উপলব্ধি করেছিল তাদের ঈর্ষাকাতর অন্তরের ছোট ছোট আকাংখা অক্ষমের লোভ ও ব্যর্থতার চরম অভিব্যক্তি।

না, এদের দিয়ে স্বরাজ-লাভ কখনই সম্ভব নয়। এ-সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। চাই নতুন সঙ্গ, নতুন নতুন সংঘ, যেখানে জীবন-মৃত্যুর হিসেবের চেয়ে লক্ষ্য-সাধনের তাগিদ বড়, যাদের কাছে প্রত্যেক মুহূর্ত মূল্যবান, জীবন যাদের কাছে তুচ্ছ, উদ্দেশ্য-সাধনই প্রধান।

"আমি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। দেশ স্বাধীন না হলে আর বাড়ী ফিরবো না। তবে একবার মা'র সঙ্গে দেখা করে, প্রণাম করে আসবো। জেল থেকে বেরিয়েও মা'র কাছে যাই নি, কারণ ভবিষ্যৎ তখনও ঠিক হয় নি। এখন হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে আমি যাহোক কিছু করে ফেলবো। তার আগে একবার শ্রীরামপুর যাবো, মাকে প্রণাম করে আসবো।"

—এই সংকল্প গোপীমোহনের। সে বিপ্লব-বাদীদের দলে যোগ দিয়েছে।

দু-বন্ধু মিলে কলকাতার এক বিচ্ছি পাড়ায়, সরু গলিতে, এক ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছে। বাড়ী-ওয়ালাকে বলেছে, তারা এসেছে মফঃস্বল থেকে, চাকরীর চেষ্টায়। সম্প্রতি দু'জন দু'টো টিউশনী পেয়েছে ও-পাড়ায়, সে-জন্যই ওদের ঘর-ভাড়া নেওয়া। কাজ পেলেই এঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। এ সব মিথ্যে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। নইলে ঐ ডামাডোলের বাজারে, অপরিচিত দুই যুবককে কে ঘর ভাড়া দিয়ে পুলিশের কুনজরে পড়বে?

আসলে, কাজ-টাজ কিছু নেই, কাজ করার মেজাজও নেই ওদের। যে কাজে ওরা ব্যস্ত, তার সঙ্গে অন্ন-বস্ত্রের কোনও সম্পর্ক নেই। দু'জন রাত্রে শুয়ে থাকে, এই পর্যন্ত। ভোরবেলা উঠে, স্নানাদি সেরে, দু'জন দুদিকে বেড়িয়ে যায়, কে কোথায় যায় অপরে তা জানে না—জানবার বা জানাবার অধিকার তাদের নেই! তাদের আসল নাম যে কি, তাও তারা জানে না, জিজ্ঞাসা করার অধিকার তাদের নেই। দল-নায়কের নির্দেশে তারা দুজনই সব ছেড়ে পথে নেমেছে। ঘর-ভাড়া করে এক সঙ্গে আছে, এই পর্যন্ত। আবার যখন নির্দেশ আসবে, ঘর ছেড়ে দু'জন দুদিকে চলে যাবে। উদ্দেশ্য, কার্য-সাধন, সখ্যতা স্থাপন নয়। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্ব—তাদের জন্য নয়।

কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে গোপীমোহন মনের কথা খানিকটা প্রকাশ করে ফেলেছিল। জানিয়েছিল, সে শ্রীরামপুরের সাহা-পরিবারের ছেলে, তার মা আছেন বাড়ীতে।

এই সূত্র ধরে অনেক কিছুই জানা যেতে পারত। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেশের লোক কেউ কি তা জানতে চেষ্টা করেছেন?

সাতদিনের মধ্যে কিছু একটা করবে বলে সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর ফিরলো না।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিশ্চয়ই দল-নায়কের নির্দেশে কোনও বিশেষ কাজে তাকে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে।

হ্যাঁ, একদিন দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। বৌবাজার কলেজ ষ্ট্রীট-এর মোড়ে, ছোট্ট একটি জামা-কাপড়ের দোকানে দেখা গেল গোপীমোহন একটি নতুন রঙীন সার্ট কিনছে, সঙ্গে আছেন দলনায়ক। তার তীক্ষ্ণ ইশারায় গোপীমোহনের প্রাক্তন সঙ্গী চট্-পট্ ওখান থেকে সরে গেল।

সেই শেষ দেখা। পরদিনই জানা গেল, সকালে পার্ক ষ্ট্রীট—চৌরঙ্গীর মোড়ে গোপীমোহন ভুল করে টেগার্টের পরিবর্তে আর একজন সাহেবকে গুলি করে মেরেছে। কিছুদূর যেতে না যেতে সে ধরাও পড়েছে। নিজের জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ, নিরাপরাধ মিঃ দে'র জন্য, যাকে সে মেরেছে ভুল করে। এই হচ্ছে বাঙলার মরণ-জয়ী বিপ্লবী। এক, দুই বা দশজন নয়, এরকম শত শত যুবক ঐ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তারা এখন কি করবে? তারা কি চুপ করে বসে থাকবে।

না। তারা বসে থাকেনি। সন্ত্রাসবাদের ইন্ধন জুগিয়েছেন তারাই। তাদের কাছে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির কথা নিরর্থক। যতদিন দেশ স্বাধীন না হয় ততদিন সব মিথ্যা। যে-উপায়েই হোক দেশের স্বাধীনতা আগে অর্জন করতে হবে, সমাজ-সেবা, শিক্ষা-বিস্তার, শিল্পোন্নতি—স্বাধীনতার পর ও-সব সহজ ও সার্থক হবে।

দেশবন্ধু যুবকদের এ-মনোভাব জানতেন। ছেলেদের তিনি ভালোবাসতেন, তাদের আদর্শপ্রিয়তা তাঁকে মুগ্ধ করত। তিনি তাই গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের পর দলনায়কদের সঙ্গে নানা বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁর নতুন প্রয়াসকে সার্থক রূপায়ণে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। জানালেন, অন্ততঃ তিন বছরের জন্য তাঁরা ভিন্ন পন্থা অবলম্বনে বিরত থাকুন। তিনি কাউন্সিল ও অন্যান্য নির্বাচনী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন, যাতে বৃটীশ সরকার তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হবে এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন (Diminion Status) অর্জন সহজেই সম্ভব হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা ত' তার পরের ধাপ মাত্র। সে ঠেকাবে কে?

দলপতিগণ দেশবন্ধুকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁর ত্যাগে দেশবাসী মুগ্ধ, তাঁর আন্তরিকতায় কারও অবিশ্বাস নেই।

তাঁরা রাজী হলেন। কিন্তু ঐ তিন বছরের জন্য। তিন বছর যুবকগণকে নিজ নিজ 'প্রোগ্রাম' অনুযায়ী কাজ থেকে বিরত রাখা খুবই কষ্টকর হবে।

তবু তারা চেষ্টা করবেন, যথাসাধ্য সাহায্য করবেন দেশবন্ধুকে তাঁর পন্থানুযায়ী কাজ করতে। তবে ঐ তিন বছর, তার বেশী একটি দিনও নয়।

দেশবন্ধু কি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন ঐ তিন বছরের পূর্বেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে যাবে?

কিন্তু তিন বছরের পূর্বেই ১৯২৩ সালের প্রথমার্দ্ধেই, বিপর্যয় সুরু হল।

নেতৃবৃন্দের মধ্যে কলহ ও বিরোধ যত তীব্র হয়, যুবকদের চঞ্চলতা তত বৃদ্ধি পায়। এখানে ওখানে রাজনৈতিক ডাকাতি, খুন, টাকা-লুটের চেষ্টা হয়।

হাওড়া-কোনায়, বেলেঘাটা পোষ্টাপিসে, গড়পাড়ে।

দেশবন্ধু উদ্বিগ্ন হয়ে দলনায়কদের ডাকেন, বৈঠক হয়, ঐ চেরীপ্রেসে, আত্মশক্তি কার্যালয়েই।

সেদিনই শাঁখারিটোলা পোষ্টাপিসে ডাকাতি হয়েছে, পোষ্টমাষ্টার খুন হয়েছে। তার মৃতদেহ পুষ্পমাল্যে সাজিয়ে দলবদ্ধ পুলিশ সঙ্গীন কাঁধে নিয়ে বৌবাজারের প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে নিয়ে চলেছে লালবাজার থানার দিকে। হয়ত সেখান থেকে

আরও মাল্যদান করা হবে—তারপর আরও পুলিশ সঙ্গে নিয়ে মিছিল যাবে নিমতলা ঘাটে।

দেশবন্ধু তখন বৌবাজারে তেতলার ঘরে বসে আছেন। সব কথা শুনলেন তিনি। আততায়ী বারীন ঘোষ ধরা পড়েছে। একথা শুনে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

—"ওর গায় বা জামা-কাপড়ে কি রক্তের দাগ পাওয়া গেছে?"

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ঐরূপ রক্ত-মাখা গায়ের চাদর সহ এক যুবক কিভাবে ধরা পড়েছিল, এবং তিনি তাকে কেমন করে মুক্ত করেছিলেন, তার কাহিনী বললেন।

ভাগ্যক্রমে যুবকের গায়ের চাদরের রং ছিল লাল। ব্যারিষ্টার দাশসাহেব বিচারককে বলেছিলেন, পুলিশ যা রক্তের দাগ বলে সনাক্ত করেছে, আসলে তা রক্ত নয়, ঐ চাদরের কাঁচা রঙের অধিক্য কোনও কারণে জমাট বেঁধে আছে। এ কথা সত্য কি না, পরীক্ষার জন্য চাদরটি সুদক্ষ "কেমিক্যাল" পরীক্ষকের নিকট পাঠানো হোক্।

কোর্টের নির্দেশানুযায়ী—তা করা হলে, পরীক্ষক দাশসাহেবের সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন। যুবকটি খালাস পেল।

সুভাষবাবু তখনো 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার পরিচালক, 'আত্মশক্তি' কার্যালয়ে তাঁর আর বেশী আশা-যাওয়ার সময় হয় না। যাঁকে তিনি এখানকার কাজের ভার দিয়েছেন, তাঁকে প্রায়ই ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ফরওয়ার্ড কার্যালয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে হয়।

সেদিন সকালেই গোপীমোহনের টেগার্ট-হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, নিজেও ধরা পড়েছে।

বিকেলে ধর্মতলা ষ্ট্রীটের আপিসে গিয়ে সুভাষবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই তিনি ঘরের এককোণে জানালার পাশে ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের কাজ সেরে দেশবন্ধু 'ফরওয়ার্ড' অপিসে এসেছেন। এখানে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে হলে সুভাষবাবুর ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। দেশবন্ধু ঘরের একপাশ দিয়ে ঢুকে সামনেই তাঁর ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

সুভাষবাবু জানালার পাশে গিয়ে তাঁর আত্মশক্তির কর্মীর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লেন:

—গোপীমোহনকে ত' আপনি চেনেন?

—হ্যাঁ, ক'দিন আগে পর্যন্ত সে ত' আমার ওখানেই ছিল।

—সে কেমন ছেলে?

—খুব ভালো, খুব 'সিনসিয়ার'।

—কোনও কথা বলে ফেলবে না ত'?

—না, না, কিছু বল্‌বে না।

—ইতিমধ্যে দেশবন্ধুর ঘরের বেয়ারা এসে জানাল, সুভাষবাবুকে তিনি সেলাম দিয়েছেন।

সুভাষবাবু চলে গেলেন; আর কিছু বলা হল না। ইনি দেশবন্ধুর ঘরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিলেন।

সুভাষবাবুর সব কথা কি পুরো বলা হয়নি? তিনি আর কী বা বলতেন? যা বলার ছিল, জানার ছিল তা ত' বলা হয়েছে, জানাও হয়েছে। উনি কি করে জানলেন গোপীমোহন আমার পরিচিত? কেন বললেন, 'কিছু বলে ফেলবে না ত? তবে কি, তবে কি সুভাষবাবুও ঐ দলেরই আর একজন?

* * *

(ক্রমশঃ)

চিরঞ্জীব মুজিব

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

যুগে যুগে বাংলা মায়ের কোলে আবির্ভূত হয়েছে এমন সন্তান যারা সারা উপ-মহাদেশের জনগণমন-অধিনায়ক। নেতাদের সংগে এঁদের তফাৎ হল এই যে, নেতারা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মাতব্বর আর অধিনায়করা হলেন সর্ব-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে। এঁরা আতসকাঁচের মতন, আকৃতিতে ছোট হলেও মহাতেজশালী সূর্যের তেজকে ধারণ করে দাবাগ্নি সৃষ্টি করেন। বংগবন্ধু মুজিব হলেন আমাদের ঐতিহ্যের ইতিহাসে সেই ধরণের জনগণ-মন অধিনায়ক। এদের মধ্যে একটা অদৃশ্য স্বর্ণ-সূত্রের বন্ধন আছে যেটা হল বাংলাভাষার অমিত ক্ষমতায় বিশ্বাস। রামমোহন, অরবিন্দ, দেশবন্ধু, সুভাষ, সূর্যসেন ও মুজিব সেই সোনার তারে গাঁথা মাণিক।

১৯২০-এর মার্চে, ফরিদপুর জেলার টুংগীপাড়া গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে এই মহানায়কের জন্ম। এঁর জীবন বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস। ১৯৫৪-র আগে মুজিবের নাম ফরিদপুর ও ঢাকার বাইরে বড় একটা কেউ জানতো না।

১৯৩৭ এ-শহীদ সোহরাওর্দির সংগে সাক্ষাতের পর তার মনে আরম্ভ হল রাজনৈতিক বিপ্লব। তিনি তখন গোপালগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্র। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব তার কিশোর মনে বিহ্বলতা আনেনি, এনেছে অসীম অনুসন্ধিৎসা। এর পর ফণী মজুমদার নামে এক বিপ্লবীর সংগে তার পরিচয় হয়। দু'জনেই ফরিদপুরের মানুষ, দুজনেই সাধারণ বাঙালীর তুলনায় দীর্ঘাংগ। একজন তরুণ, অন্যজন প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে। মুজিব তখন কি একটা রাজনৈতিক গোলযোগের ব্যাপারে সাত দিন জেল খেটেছেন। তিনি হতভম্ব হলেন যে তার সংগে বসে রাজনীতির গল্প করছেন এমন একজন লোক, যিনি রাজস্থানের মরুকারা দেউলীতে সাত বছর বিনা বিচারে আটক ছিলেন। এঁরই কাছে তরুণ মুজিব শোনেন বাঙালী বিপ্লবীদের কাহিনী, সূর্য সেনের অপূর্ব আত্মত্যাগের অমর-গাঁথা। এই সময় তিনি বুঝলেন যে জিন্না ও গান্ধী ছাড়াও একটা বলিষ্ঠ রাজনীতি আছে যা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে।

১৯৪২-এ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক'লকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে আসেন। এটা ছিল গরীব বাঙালী মুসলমানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। ধনী মুসলমান ছেলেরা যেত খরচ-সাপেক্ষ কলেজে যেমন প্রেসিডেন্সী, সেন্ট জেভিয়ার, স্কটিশ চার্চ।

ইতিমধ্যে যে কটা ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁর মনকে ঝড়ের মতন নাড়া দিয়েছে তার ভেতর প্রথম হল ১৯৪০-এর ২৩শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলীম লীগের অধিবেশনে বাঙালী নেতা ফজলুল হক সাহেবের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে পাকিস্তান হবে আলাদা রাষ্ট্র এবং তার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হবে স্বাধীন। এই প্রস্তাবটা মুজিবের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বটগাছের শেকড়ের মতন স্থান করে নিলো। পরে এই ভাবনার শেকড় মহীরুহে পরিণত হবে।

দ্বিতীয় ঘটনা হল ঢাকা রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষের ঘোষণা, হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের জন্য আন্দোলন। এতে নানা সম্প্রদায়ের বাঙালী জড়িয়ে পড়ল। ইংরেজ দেখলো মুসলমান যুবকরা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এরপর ওরা হয়ত বিপ্লবীদের পাল্লায় পড়বে। রাতারাতি ইংরেজের তৈরী কুখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ ইংরেজ সরকারই সরালো। মুজিব লক্ষ্য করলেন সুভাষের নেতৃত্বের সাফল্য, মৌলিকতা ও অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতি। এই সময় থেকে তিনি বোঝেন দুটী জিনিষের গুরুত্ব। এক হল মন্ত্রগুপ্তি, আর দ্বিতীয়টী হল বাঙালীত্ব। প্রথম গুণটির ফলে ইনি কোনওদিন লক্ষ্যচ্যুত হন নি; আন্দোলনে ভাসেন নি, আন্দোলনের স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় গুণটীর ফলে ইনি পেয়েছেন সার্বজনীন ভাব, বাঙালীর অখণ্ড, মহান, আলোঝলমল ঐতিহ্য। পূর্ব জার্মাণী, পশ্চিম জার্মাণী, অস্ট্রিয়া ও অধিকাংশ সুইটসারল্যাণ্ড যেমন রাজ্য হিসেবে ভিন্ন হলেও, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অখণ্ড, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিম বংগও ভিন্ন হলেও এক। অর্থাৎ পৃথক শিবির, হৃদয় এক।

১৯৪৬-এর আগষ্টের আগেই মুজিব বুঝেছিলেন যে ভারত বিভক্ত হবে। সুতরাং ১৯৪৭-র অগষ্টে তিনি হতাশ বা বিহ্বল হন নি। তিনি সত্বর ঢাকায় গিয়ে ছাত্র হলেন।

১৯৪৮-এর ২৪শে মার্চ ঢাকার কার্জন হলে সমাবর্তন উৎসবে জিন্না গোমর করে বলেন:

"উর্দু, একমাত্র উর্দু ভাষাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। হলভর্তি ছাত্রের দল চীৎকার করে উঠল, "No! No।" মুজিব তখন হলের বাইরে দাঁড়িয়ে; কোনও এক রোয়েদাদে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সদ্যজাত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতা বুঝলেন পাকিস্তানের ভাঙন আরম্ভ হয়েছে; তবে তিনি জানলেন না আর এক ভাবী রাষ্ট্রনেতা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে এবং এই ভাষা-বিষয়ক প্রতিবাদ সেই ভাবী নেতার দ্বারা সংগঠিত।

শাইলক কোনও দিন সক্রেটিস হতে পারে না। পাকিস্তানী কোনওদিন বাঙালী-প্রিয় হতে পারে না। ফলে দেখা গেল বাঙালীরা লুংগি পরে—ঢাকা সহরের বুকে উর্দু কাগজ খুলে বারান্দায় বসে থাকত যাতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা দেখত যে তাদের প্রজারা উর্দু ভক্ত। তখন উর্দুভক্ত আর পাকিস্তান-ভক্ত ওদের কাছে এক। কিন্তু বাঙালীদের কাছে নয়। সে-সময় ওদের হাতের উর্দু কাগজের ভেতরে থাকত বাংলা সংবাদপত্র। বাইরে উর্দু, অন্তরে বাঙালী। ব্যাপারটা মুজিব লক্ষ্য করলেন এবং তাঁর সহকর্মীদের বল্লেন। এই সময় মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের ভেতর একটা অলিখিত চুক্তি

হয়ে গেল—বাংলা ভাষাই বাঙালী পাকিস্তানীদের ভাষা।

সে-সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আজাদ হিন্দবাহিনী, সুভাষের পুণ্যনাম ও জয়হিন্দ ধ্বনিতে সারা উপমহাদেশ মুখরিত। মুজিব মনে মনে ভাবলেন "গ্রেয় বাংলা" রণহুংকারের কথা। কিন্তু মনের কথা মনে চেপে রেখেছিলেন। মন্ত্রগুপ্তি!

১৯৪৭-এ মুজিব ইস্‌লামিয়া কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হলেন, তার বিষয় ছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান। অনেকের ধারণা ক'লকাতার এক বিশেষ কলেজ থেকে পাশ না করলে আই, সি, এস বা রাষ্ট্রনেতা কোনওটাই হওয়া যায় না। কিন্তু দেখা যায় যে বিবেকানন্দ, সুভাষ, সূর্য সেন ও মুজিব কেউই সেই কলেজ থেকে পাশ করে নি।

ছাত্রাবস্থায় হোষ্টেলে থাকার সময় মুজিব দেশ-বিদেশের বহু লেখকের বই পড়তেন কিন্তু তাঁর অন্তর সাড়া দিত প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনায়; তার প্রবন্ধগুলো ছিল রত্নগুহার চাবিকাঠি, কবিতাবলী চিত্ত-উদ্বেলকারী,—সংগীতে ছিল প্রশান্তির প্রলেপ। তখন থেকে মুজিবের মনে বাংলা সম্বন্ধে আশা-আকাংখার মহা সমারোহ।

ভারত বিভাগ মানে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ: এর ভুক্তভোগী ছিল প্রধানতঃ বাংলাভাষী মানুষ। মুজিব যখন গ্র্যাজুয়েট হলেন তখন তাঁর সামনে বিরাট সম্ভাবনা। বি, এ, পাশ না করলে বাংলার রাজনীতিতে পাত্ত পাওয়া যায় না, চাকরীর জগতেও মানুষ অস্পৃশ্য। পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর দেখা গেল যে, আমলাতন্ত্রে বাংলাভাষী মুসলমানদের কোনও সুরাহা হল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একই অবস্থা, উত্তর আর পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের পমের আনার মালিক। ভাগাভাগির পর হিন্দু আমলা, জমিদার ও ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ ভারতে চলে গেছে আর তাদের জায়গা দখল করে বসেছে অবাঙালী মুসলমানরা। পূর্ব বাংলার চাষী ও গ্র্যাজুয়েট উভয়ের উন্নতির পথে কাঁটা পড়েছে।

পূর্ববংগ থেকে হিন্দু জমিদাররা চলে যাওয়ার পর রাতারাতি জমিদারী প্রথার অবসান হল। ১৯৫০-এর আইনে হল তার সরকারী স্বীকৃতি।

ঢাকায় ফেরবার আগে একটা ঘটনা ঘটে যাতে মুজিবের দূরদর্শিতা ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৪৭-এর ৩রা জুন ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে ভারত ভাগ হবে। ঐদিন ইস্‌লামিয়া কলেজে কয়েকটী বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে মুজিব একটী সভা করেন। তাতে তিনি বলেন যে পশ্চিমা নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং করবে এবং সেই ধূম্রজালের আড়ালে ওরা নিজেদের পকেট ভর্তি করবে। সংক্ষেপে পূর্ববাংলার অধিবাসীরা টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসা বেঁধেছে। দুর্দমনীয় আশায় বুক বেঁধে মুজিব ও তার ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চল্লেন ঢাকায়।

প্রথমে হল ভাষা-আন্দোলন। পাকিস্তানে লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাভাষীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। সেখানে উর্দু ভাষা চাপানো সম্ভব নয়। পাঠান ও মোগল যুগে বাঙালীর রাষ্ট্রভাষা ছিল

পার্শী; ১৮৩৫ এর ৭ই মার্চ, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক-এর এক ঘোষণায় সেটা হল ইংরিজী। দুটোর কোনওটাই বাঙালী মুসলমানের ঘরের ভাষা ছিল না। ১৯৪৭-এ এল উর্দু যা পার্শীভাষার কন্যা। একজন লেখক লিখলেন যে যদি উর্দুভাষাকে জোর করে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানের ওপর চাপানো হয় তাহলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতর ছাড়াছাড়ি হবে। পাকিস্তানের শাসক ও তাদের পোষা বাঙালী সাপগুলো এই সব লেখা পড়ে আঁৎকে উঠেছিল। এই সময় মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র মুসলিম লীগের নাম বদলে রাখা হল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ। এই হল বাংলার মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ রাখার প্রথম স্তর। ৪৭-এর শেষ ভাগ থেকে যে ভাষা-আন্দোলন আরম্ভ হয় তার পরিণতি হল ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী। এর মধ্যে পুলিশী নির্যাতন ও গ্রেপ্তার চলতে থাকে; মুজিবকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

মুসলিম লীগে প্রথম ফাটল ধরে ১৯৪৯-এর ৩রা জুন। ঢাকায় এক সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়: তার সভাপতি মৌলানা ভাসানী, টাংগাইলের শামসুল হক সম্পাদক, মুজিব সহ-সম্পাদক, যদিও তিনি তখন কারাগারে। সোহরাওয়ার্দি করাচীতে, ঢাকার শাসন-কর্তা খাজা নাজিমুদ্দিন।

১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী চতুর্দিকে থমথমে ভাব, ঢাকা নগরীর অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ, চতুর্দিকে পুলিশ। আরম্ভ হল ছাত্রদের শোভাযাত্রা। চল্ল পুলিশের লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস এবং গুলি। প্রথমে শহীদ হল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র জব্বর, তারপর শেষ নিঃশ্বাস ফেলে রফিক ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্র বরকৎ। ছাত্রদের রণধ্বনি, পুলিশের লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, বুলেট, রক্তস্নাত জনপথ, অংগন —এযেন বিগতশংকা বাঙালী জাতির মহরৎ! কবি বেঁচে থাকলে আবার লিখতেন, "দেখি নাই, কভু দেখি নাই, এমন তরুণী বাওয়া।"

পরিষদ ভবনে খবর গেল। সদস্য মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দ বাঁড়ুজ্যে লাফিয়ে উঠলেন, "ছাত্র হত্যার জবাব চাই।" সদস্যরা কেউ বিচলিত, কেউ উত্তেজিত। সরকার পক্ষের মুরুল আমিন বল্লেন: "এসব মিথ্যে কথা, বানাওট।" তারপর বল্লেন: "পুলিশের গুলি চালানো ঠিক হয়েছে"। বহু সদস্য পরিষদ ভবন ছেড়ে চল্লেন মেডিকেল কলেজের দিকে যেটা তখন পাঁচকোটী বাঙালীর তীর্থস্থানে পরিণত।

পরদিন শবযাত্রা। সরকার বলে শহীদের শবদেহ তারা ছাড়বে না। শবদেহহীন শবযাত্রা বেরুল যার শেষ নেই। নীরব, শোকমগ্ন, লক্ষ মানুষের মৌন-মিছিল; এতে হাঁটছেন স্বয়ং ফজলুল হক। হঠাৎ তার ওপর হল লাঠি চার্জ। শোভাযাত্রার অন্য অংশে তখন গুলি চলছে। আইনের ছাত্র শফিকুর রহমান-এর মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে রইল। জনতা উন্মত্তের মতন ছুটে গেল পরিষদ ভবনের দিকে। আধ ঘণ্টার ভেতর পরিষদ অবরুদ্ধ। বিরোধীদল থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রস্তাব দেওয়া হল। কিছু বিলম্বের পর লীগ সরকার তা মেনে নিলো এবং প্রস্তাবটি করাচীর গণপরিষদে পাঠানো হল। উর্দুভাষীরা

ক্রুদ্ধ; বাঙালীরা তো চিরকাল তাদেরই অধীনস্থ প্রজা, ওদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

মুজিব তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ছাত্রনেতাদের কাছে দৈনিক পৌঁছত। এর জন্যে ইতিহাস একটী পুলিশ ইনস্পেকটরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। দুঃখের বিষয় আমরা শুধু এর কোড নাম জানি,—মাণিক। মাণিকই বটে; সকল নির্যাতন ও চাকরীর ভয় ত্যাগ করে ইনি জাতীয় আন্দোলনের সেবা করেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী শবযাত্রার মিছিল দিয়ে পরিষদভবন অবরোধের নির্দেশ এই মাণিকই নিয়ে আসেন।

মৃতদেহ না দেওয়ার ব্যাপারে সারা বাংলা মুরুল আমিন সরকার-এর ওপর ক্ষেপে গেল। এতে ইসলামের অনুশাসন অপমানিত হয়েছে। শহীদ মিনার কারা তৈরী করবে? মুজিবের গোপন নির্দেশ এল, "তোমরা নিজেরা।" ছাত্রছাত্রীরা লেগে গেল রাজমিস্ত্রীর কাজে।

সাম্প্রদায়িকতার সর্পকুল, ফণা দুলিয়ে ঝাঁপি থেকে বেরুল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চাটুজ্যে—এঁরা কাফের সাহিত্যিক; এদের সাহিত্যে মুসলমানের স্থান নেই, ইসলাম অগ্রাহ্য, অবহেলিত। মুজিব জেল থেকে লিখে পাঠালেন, "সাপগুলো ইসলামের উপযুক্ত সাহিত্য ২০০ বছরে রচনা করেনি কেন?" পশ্চিমাদের প্ররোচনায় বলা হল যে, যে সূর্যসেনের নামে বাঙালী মুসলমান উত্তেজিত হয় সেই মহানায়ক মুসলমানদের দলে নিতে অস্বীকার করেছে। মুজিবের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তিনি লিখে পাঠালেন, "বিপ্লবের জন্যে প্রাণ যদি এতই আকুলি বিকুলি, তাহলে সাপগুলো নিজেরা বোমা পিস্তল জোগাড় করে সূর্যসেনের মতন বিদ্রোহ করেনি কেন?" তার কোনও জবাব সাপগুলো দিতে পারেনি।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁ সাহেব গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দিন হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, পাঞ্জাবের গোলাম মহম্মদ হলেন রাষ্ট্র-প্রধান। মুসলিম লীগ ভেঙে চৌচির। পূর্ব পাকিস্তানেও তার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। দূরদর্শী মুজিব দেখলেন এই হল বাঙালীকে একাত্ম করার, এক আধারে একত্র করবার মাহেন্দ্রক্ষণ।

১৯৫২-র ২৭শে ফেব্রুয়ারী অসুস্থ মুজিবকে স্ট্রেচারে করে কারাগারের বাইরে রাখা হল। বলা হল তিনি মুক্ত। আত্মীয় বন্ধুরা তাকে নিয়ে গেলেন তার গ্রামে টুংগীপাড়ায়।

১৯৫৩-র শেষে বাংলায় ফজলুল হক সাহেব অবলুপ্ত কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। স্মরণ রাখা দরকার যে এই দল '৩৬-এর নির্বাচনে সারা বাংলায় সমস্ত দল এমনকি মুসলিম লীগকেও গোহারাণ হারায়। বিভক্ত বাংলায় এই প্রবীণ নেতার প্রভাব বিপুল। ৫৪'র নির্বাচন আসছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়েছে আওয়ামী লীগ। এই প্রতিষ্ঠানটীর ছত্রছায়া তলে সমবেত হল হিন্দু-মুসলমান, ক্রীশ্চান বৌদ্ধ সবাই। বাংলার মরা গাঙে আবার বান ডাকল। হক সাহেবের বিপুল জনপ্রিয়তা ও দেশ-সেবার ইতিহাস অগ্রাহ্য করা যায় না। মুজিব কৃষক-প্রজা পার্টির সংগে যুক্ত করলেন আওয়ামী লীগকে। ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন

যে মুসলিম লীগ মাত্র নয়টী আসন পাবে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছে ২২৮টী আসন, মুসলিম লীগ ৯টী আসন। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ এলাকায় মুসলিম লীগের লক্ষপতি প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩০০০ ভোটে পরাজিত করেছে এক ছাত্র; তার নাম শেখ মুজিবর রহমান। যুক্ত ফ্রন্টের ২২৮টী আসনের ভেতর আওয়ামী লীগ ১৪৩টী আসন, কৃষক প্রজা পার্টি ৮৫টী। কিন্তু হক সাহেবের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে যুক্তফ্রন্ট সিদ্ধান্ত করলো যে দলের নেতা হবেন শেরে বাংলার ফজলুল হক।

যুক্তফ্রন্টের জয় হয়েছিল তার ২১ দফা দাবীর জন্যে। সেই দাবীগুলো হল :—

১। বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা।

২। ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে যে কোন প্রকারের জমিদারি বিলুপ্তিকরণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন। করের পরিমাণ হ্রাস।

৩। পাটশিল্পকে জাতীয়করণ, পাট উৎপাদকদের জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ। মুসলিম লীগ আমলের পাটশিল্পের দালালদের অনুসন্ধান ক'রে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

৪। সমবায় শিল্পপ্রথা প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুটিরশিল্প ও শ্রমশিল্পের উন্নতি।

৫। লবণশিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের স্বনির্ভরতার জন্য এই শিল্পের পত্তন এবং পাট-দালালদের মত লবণশিল্পের দালালদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। সর্বপ্রকার উদ্বাস্তু—বিশেষতঃ কারিগর ও শিল্প-শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ-পরিকল্পনা।

৮। পূর্ববঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্প-শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান।

৯। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতা ব্যবস্থা।

১০। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা বিলোপের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১। ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কালাকানুন বাতিল করে তাদের স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণ।

১২। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনে সমতা আনয়ন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা ১,০০০ টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩। সর্বপ্রকার দুর্নীতি, আত্মীয়-পোষণ, উৎকোচের অবসান এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের পরের সময়ের প্রত্যেক সরকারী অফিসার ও বাণিজ্যপতিদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ।

১৪। বিভিন্ন জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি এবং সভা-সমিতি, প্রেস ও বাক্-স্বাধীনতা দান।

১৫। বিচার-ব্যবস্থা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা পৃথকীকরণ।

১৬। বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস

এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে পরিণতকরণ।

১৭। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে একটি শহীদস্তম্ভ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারী 'শহীদ দিবস' এবং ছুটির দিন ঘোষণা।

১৯। ঐতিহাসিক লাহোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। প্রতিরক্ষা বিষয়েও কেন্দ্র যেমন থাকবে 'নেভি হেড কোয়ার্টার্স' এবং পূর্ববঙ্গকে অস্ত্র ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য তেমনি পূর্ববঙ্গে হবে 'অস্ত্রকারখানা' প্রতিষ্ঠা। আনসারদের পুরোপুরি সৈনিক-রূপে স্বীকৃতি।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন কারণেই আইনসভা বা মন্ত্রিসভা কার্যকাল বৃদ্ধি করবেন না এবং যাতে নির্বাচনী কমিশনারের মাধ্যমে স্বাধীন পক্ষপাতহীন নির্বাচন হতে পারে তার জন্য তাঁরা নির্বাচনের ছ'মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন।

২১। প্রত্যেকটি আইনসভা সদস্যদের পদ শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করা হবে এবং যদি যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পর পর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হয় তবে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

মুজিব দেখলেন নির্বাচনে জয়-পরাজয় দুটোই আছে; সেজন্যে প্রথমে দরকার—আওয়ামী লীগ দলের প্রতিষ্ঠা বাংলার সবকটী জেলায়, সবকটী গ্রামে। আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা সোহরাওয়ার্দী দেখলেন যে মুজিব তার পাশে না থাকলে শুধু যুক্তফ্রন্ট নয়, আওয়ামী লীগের সভ্যদের সামলানো সম্ভব হবে না। এই যুবকটী মানুষের সংগে তর্কে জিততে চান না, মানুষটীকে জয় করতে চান।

সোহরাওয়ার্দির সংগে ফজলুল হকের বিবাদ ৩৬ সাল থেকে, আর তিনি মওলানা ভাসানীকে বিশ্বাস করতেন না। এই তিন ব্যক্তিত্বকে ভক্তি দিয়ে একত্র রাখতে পারে একমাত্র মুজিব। তাকে রাজধানী ঢাকায় রাখতে হবে। দিলেন তাকে সমবায়, কৃষি ও বনবিভাগের মন্ত্রীত্ব; বল্লেন যখন ইচ্ছে এই তিন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে গ্রামে যাবে। মুজিব মন্ত্রী হতে রাজী হলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর লাঠিচার্জে হক সাহেব প্রায় পংগু হয়ে যান। নির্বাচনের জয়ের পর তিনি চিকিৎসার জন্যে তার পুরোণো বন্ধু ডক্টর বিধান রায়-এর সংগে দেখা করতে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এক মার্কিণ সাংবাদিক হক সাহেবের সংগে সাক্ষাতকারের পর খবর পাঠালেন যে তিনি পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক মতামত দিয়েছেন। সেটা আইসেনহাওয়ার-ফস্টার ডালেসের যুগ, ভারত-বিদ্বেষের যুগ। ভারত-ঘেঁষা যেকোনও মত মার্কিণ বিরোধিতা। পাকিস্তান তখন মার্কিণের তাঁবে। হকসাহেব হলেন ঘরবন্দী, মুজিবের কপালে আবার ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। ৩১শে মে বড়লাট গোলাম মহম্মদ যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দিলেন। প্রাদেশিক লাট চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে বরখাস্ত করে—করাচী পাঠালো ইস্কান্দার মির্জাকে।

ইনি বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের বংশধর এবং বাংলায় কোটায় পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন। লাট সাহেবের পদ পেয়েই ইনি বিবৃতি দিলেন, "যদি দরকার হয় তাহলে দশ হাজার বাঙালীকে খুন করব।" পরিহাসের বিষয় ১৯৫৮ সালে সেনাপতি আয়ুব খাঁ ইস্কান্দার মির্জাকে বিতাড়িত করেন।

১৯৫৪তে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের জন্য নির্বাচন হল। কারামুক্ত মুজিব নির্বাচিত হলেন; আওয়ামী লীগ এবারেও একক দল হিসেবে সংখ্যা-গরিষ্ঠ। কিন্তু বড়লাট গোলাম মহম্মদের কারসাজিতে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিয়ে ফজলুল হক সাহেবকে নেওয়া হল। এই প্রথম মুজিব ব্যক্তিগত ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখালেন; তার উদ্যোগে হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হল, এবং যুক্তফ্রন্টের সংগে চুক্তির অবসান করা হল। বাঙালীর আন্দোলন এক নতুন স্তরে এল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১২·০০। ষাণ্মাসিক ৬·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী

অফিস: ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬

কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন

বীরেন্দ্রকুমার সাহা

ভারতবর্ষ আজ যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পরে ৩০ বৎসর কংগ্রেস-শাসন চলেছে। যদিও এই ৩০ বৎসরে দেশের কিছু উন্নতি হয়েছে তবুও আমাদের আশা-আকাঙ্খার পূরণ কিছুই হয়নি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়ন হয়নি। দেশের শতকরা ৬০ জন লোক আজও দারিদ্র-সীমার নীচে জীবন-যাপন করছে। তারা অতি কষ্টে এক বেলার আহার জোগাড় করছে।

দেশের শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামই ভারতবর্ষের প্রাণ। কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের উপর গ্রামের উন্নতি নির্ভর করে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে, এক প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যতীত অন্য কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রে বর্তমান জনতা সরকার চিন্তা করছেন গ্রামের উন্নতির বিষয়ে। তারা কৃষির উন্নতির উপরই জোর দিয়েছেন বেশী।

কৃষির উন্নতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। 'Indian Agriculture is a vagary in the hand of Monsoon': ভাল বৃষ্টি হলে ভাল চাষ হয়। সরকারের সবুজ-বিপ্লবের জয়গান হয়। বৃষ্টি না হলে দেশের সর্বক্ষেত্রে দুর্দশা দেখা দেয়। সবুজ-বিপ্লবের জয়গান বন্ধ থাকে।

চাষের উন্নতির জন্য চাই প্রয়োজনীয় জল, সার, কীটনাশক ঔষধ ও কৃষি-ঋণ। এই সকল কাজ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শিল্পের বিকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, শ্রম, অর্থ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ বিভাগের সমন্বয় করে একটি কমিটি গঠন করেছেন। অনুরূপ একটি কমিটি কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এই কমিটিতে কৃষি, বিদ্যুৎ, সেচ, পশুপালন, মৎস্য-চাষ, সমবায় ও অর্থ দপ্তরের মন্ত্রীদের থাকা বিশেষ দরকার।

সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন গ্রামোন্নয়নের প্রশাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। এই ব্যবস্থাকে

[বিশটি গ্রাম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।]

সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। কেন এই ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে তা বুঝাবার জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে একটী ঘটনার উল্লেখ করছি।

দুর্গাপুর একটী বড় শিল্পনগরী। এই সহরের ১ লক্ষ কর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য প্রচুর পরিমাণ শাকসব্জি, তরকারী, ডিম, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজন। বর্তমানে এই প্রয়োজনীয় মাছ, ডিম, শাকসব্জি,—রাজস্থান, পাঞ্জাব, যুক্ত-প্রদেশ ও বিহার অঞ্চল থেকে আসে। এই সব পচনশীল দ্রব্য রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে বিনষ্ট হয়। ফলে যা বাজারে পাওয়া যায় তার মূল্য সুউচ্চ ও গুণের দিক থেকেও খুব নিম্নমানের। যদি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে চাষের জন্য, কৃষিঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনায় এই সব জিনিষ উৎপাদন করে দুর্গাপুর সহরের বাজারগুলিতে যোগান দেওয়া যায়, তবে গ্রামগুলির সামগ্রিক উন্নতির পথে একটী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গ্রামের যুবকদেরও কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এই ব্যবস্থায় সহরের লোকেরাও বিশেষভাবে উপকৃত হবে। কারণ তারা টাট্‌কা শাকসব্জি, মাছ, ডিম প্রভৃতি ন্যায্য-মূল্যে পাবেন।

এই গঠনমূলক চিন্তাধারা নিয়ে ১৯৭৬ ৩১শে অক্টোবর তারিখে ইস্পাত নগরীতে বহু গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধুনা বিলুপ্ত পরিকল্পনা বোর্ডের অন্যতম সদস্যকে নিয়ে একটী আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ দুর্গাপুরে ৩০শে নভেম্বর পরিকল্পনা দপ্তরের বিভিন্ন সদস্যরা, মহকুমা শাসক, বি, ডি, ও-রা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ-দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারেন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, দুর্গাপুরের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষগণ মিলিত হয়েছিলেন।

এই সভায় দুর্গাপুর মহকুমার কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের উন্নতির বিষয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে পাঁচটী কমিটী গঠন করা হয়। কৃষি, সেচ, ডেয়ারী, পোল্ট্রি ও কৃষিঋণ—এই পাঁচটী বিষয়ের উপর কমিটী হয়। কমিটীতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

এই সবগুলি কমিটীরই অহ্বায়ক করা হয় দুর্গাপুরের মহকুমা শাসককে। এক মাসের মধ্যে সমস্ত পরিকল্পনা তৈরির কথা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো মহকুমা শাসকের সাধারণ প্রশাসনের কাজের চাপ এত বেশী যে তার পক্ষে এই সকল বিষয়ে সময় দেওয়া খুবই কঠিন। এই সময়ে রাজ্যপাল ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দুর্গাপুর পরিদর্শনে এলেন। মহকুমা শাসক তাদের পরিদর্শন নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথম দিকে মহকুমা শাসক প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মহকুমা শাসক আর সময় করে উঠতে পারলেন না। তৎকালীন পরিকল্পনা বোর্ডের অন্যতম সদস্যকে আমরা বিষয়টা পুনরায় জানালাম। তিনিও

ডিসেম্বরের শেষে এসে আমাদের নিয়ে সরেজমিনে গ্রামগুলি পরিদর্শন করলেন। কাঁকসার-এর বি, ডি, ও সঙ্গে ছিলেন। মহকুমা-শাসক গ্রাম পরিদর্শনের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

এই সময় দেখা গেলো কাঁকসার-এর বি, ডি, ও গ্রামউন্নয়নের কাজে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন ও নিজেও বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই অঞ্চলে জঙ্গল-মহল অবস্থিত এবং যা একটী নকশালবেল্ট। চাষীরা, বিশেষ করে সাঁওতাল ও আদিবাসীরা, খুবই গরীব। পরিদর্শকরা সাঁওতাল চাষীদের ঘরের ভিতর ঢুকে তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবস্থা স্বচক্ষে দেখলেন। এই অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার কোনও সুযোগ নাই। ছোট ছোট নদীগুলোকে বাঁধ দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে আর দরকার deep tubewell, shallow tubewell, অজয়-দামোদরের জল lift Irrigation-এ নেওয়া যেতে পারে। এই সকল কাজের জন্য এই গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিশেষ প্রয়োজন।

এই সকল কাজের জন্য সরকারের মন্ত্রী ও উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের বিশেষ প্রচেষ্টা দরকার। আবার নীচের দিকেও অভিজ্ঞ ও উৎসাহী অফিসার নিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা শুনতে পেলাম কাঁকসার অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বি, ডি, ওকে মোটর ভেহিকলস্ বিভাগে বদলী করা হচ্ছে।

এই ঘটনা উল্লেখ করার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে মহকুমা-শাসক, জেলা-শাসকরা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে খুবই ব্যস্ত, তাদের পক্ষে সাধারণ-প্রশাসনের কাজ দেখে আর উন্নয়ন-এর কাজ দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং ব্লক পর্যায়ে ডেভলপমেণ্ট অফিস থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাদের কাজ হবে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ পশুপালন মৎস্য চাষ ও সমবায় বিভাগের অফিসারদের সমন্বয় সাধন ক'রে মহকুমা ও জেলায় সামগ্রিক উন্নতি সাধন। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য এই সকল ডেভলপমেণ্ট অফিসারদের উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া থাকবে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি গ্রামের উন্নতির ব্যাপারে ডেভেলপমেণ্ট অফিসরদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। গ্রামের উন্নতি সবাই চায় কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত প্রশাসন-ব্যবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে কৃষির উন্নতি অনেক অনিশ্চিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ জনসাধারণের উন্নতি নির্ভর করে চাষের উন্নতির উপরে। এই চাষীরা বেশীর ভাগই অশিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত। এই সকল চাষীকে সঠিক পথে চালিয়ে দেশের উন্নতি সাধন করতে হলে এই কাজকে উপযুক্ত মর্যাদা ও দায়িত্ব দিতে হবে।

দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। শিল্পপতিরা তাদের ফেডারেশন ও চেম্বার অফ কমার্সের মাধ্যমে সংগঠিত। কিন্তু গরীব চাষীদের উন্নতি করতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কাজের জন্য আরও উপযুক্ত সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। চাষীদের প্রয়োজনীয় Input যোগান দিতে হবে। এই Inputগুলির

তালিকায় থাকবে উপযুক্ত সেচের জল, সার, ভাল বীজ, ভাল জাতের গরু-মহিষ, মুরগী প্রভৃতির যোগান।

পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পরিবর্তন ক'রে কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের প্রতি সরকার যেন যথোপযুক্ত নজর দেন এই আমাদের অনুরোধ। কিন্তু সেচের জল, সার, উপযুক্ত বীজ প্রভৃতি যোগানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ব্যাপারে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করার সময় নাই।

সেচ: সেচের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। চাষীদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং নিজেরা গ্রামগুলি ঘুরে দেখেছি যে, উপযুক্ত সময়ে চাষের জলের অভাবে চাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাষের জলের যোগান যদি সময় মত দেওয়া যায় তবে চাষের শতকরা ৮০ ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বড় নদী প্রকল্প, যা সম্ভব তার, অনেকগুলিই কার্যকর করা হয়েছে। এখন deep tubewell, shallow tubewell, lift Irrigation প্রভৃতি দ্বারা সেচ ব্যবস্থা করে Sub-soil water এবং প্রবাহমান নদীর জলের ব্যবহার করতে হবে। এই কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে deep tubewell স্থাপন ও কিছুতে shallow tubewell এর পাম্প যোগান দেওয়া দরকার। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুত-সরবরাহ। বিদ্যুতের সাহায্যে পাম্প চালানোর খরচ বেশী পড়ে। বিশেষ করে বর্তমান ডিজেল তেলের অভাবের দিনে গ্রামের কৃষকদের পক্ষে দূরবর্তী ডিজেল পাম্প থেকে ডিজেল তেল সংগ্রহ করে কাজ চালান অত্যন্ত কঠিন।

কৃষিভিত্তিক শিল্প: কৃষি-ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্যও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন। বিদ্যুৎ সরবরাহ পেলে গ্রামে গমের কল, ঘানি মেসিন, চাউল কল, সিল্ক ও সুতীকাপড়ের পাওয়ার লুম, হোসিয়ারী মিলের কাজ বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কম খরচে চালান সম্ভব হবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে হাস, মুরগী, শুকর, গরু-মহিষের প্রতিপালন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার থেকে উপযুক্ত উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে গ্রামের যুবকদিগকে এই সকল কাজে নিয়োগ করতে হবে।

বীজ সরবরাহ: প্রতি ব্লকে একটী করে বীজের খামার তৈরি করতে হবে। এই খামারগুলি সরকারের নিজস্ব পরিচালনায় অথবা সরকারের সাহায্যে গ্রামের কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের দ্বারা পরিচালনা করা যেতে পারে। এই সকল খামারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভাল বীজের উৎপাদন ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সার: সার বিক্রীর কাজ গ্রামের যুবকদের সমবায়গুলির মাধ্যমে চালান হবে।

এই ভাবে গ্রামের যুবকদের জীবিকা অর্জনের নব নব পন্থার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু আমাদের ভাবের ঘরেই চুরি। বিদ্যুৎ গ্রামে নেওয়া হবে কোথা থেকে? সহর ও তার শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎই পাওয়া যাচ্ছে না। —লোড-শেডিং দৈনন্দিন ব্যাপার। বিদ্যুতের অভাবে শিল্পগুলি অচল। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে রপ্তানী দ্রব্যের সময়োপযোগী উৎপাদন ব্যাহত

হওয়াতে বিদেশের বাজারে মাল রপ্তানী বন্ধ থাকছে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে সর্বাগ্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে। এই সময় আমাদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারের অবস্থা ভাল। ঐ টাকা অবিলম্বে কাজে লাগাতে হবে। দেশের অগ্রগতির জন্য পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ ঐ টাকা নিয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নের জন্য ইনফ্রা-স্ট্রাকচার বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলে সেই বিশেষ প্রয়োজনীয় ইনফ্রা-স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যাবে।

বিদ্যুতের পরেই সারের প্রয়োজন। এখনও শতকরা ৫০ ভাগ সার বিদেশের বাজার থেকে আমদানী করতে হয়। ফলে বিদেশী মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। সেই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে সারের কারখানা স্থাপন করার ব্যবস্থা অতি সত্বর করতে হবে।

সেচের জল : বিদ্যুৎ আর সার যদি পাওয়া যায় গ্রামের সকল জমিতে বছরে ২।৩ ফসল চাষ হবে। ফলে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকরা সারা বৎসর কাজ পাবে। বৎসরে একই জমিতে ২।৩ ফসল ফলানোর দরুণ খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি পাবে এবং মূল্য সুলভ হবে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে। ফসলবৃদ্ধি ও সুলভ মূল্যের জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণও উপকৃত হবে। দেশ ধন-ধান্যে ভরে উঠবে।

কাছে এবং দূরে : সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়ায় ডুবে যাই,
বিকেলবেলার বেলার রেলের ইস্টিশন,
দেখতে তাকে চাই,
জ্বলেনা লণ্ঠন।

আছি বোধহয় ভীষণ কাছাকাছি,
শুনতে পাচ্ছি নৌকো ভেসে যায়,
তবুও যেন এমন পিপাসায়
সারাটা দিন জড়িয়ে যেন আছি।

মোম তো গলে যায়,
নৌকো চলে যায়,
এমন পিপাসায়
কাছে আছি এবং দূরেও আছি।

দুঃখ-সুখ : শংকর ব্রহ্ম

যে স্থির করেছে সে বাঁচবে
সে অবশ্যই জানে কোন রাত শেষ রাত হবে

সে নিশ্চয়ই জানে
আজ কোন পথ ধরে হেঁটে চলে যাবে
কাল কেন ঘর তার রং-করা হবে

সেটা কি সুখের খুব
সেটা কি দুঃখের খুব
নাকি তাতে দুঃখ-সুখ এক হয়ে যাবে।

মার্ক্স-কথা

প্রথমেই বলে রাখি আমি ঘোর মার্ক্সবাদী। ১৯৫০-এ গ্রাউচো মার্ক্স-এর "মাংকি বিজনেস্" চলচ্চিত্রটী দেখার পর আমি রসরাজ গ্রাউচোর ভক্ত। কার্ল অন্য ব্যক্তি। যে-সব মানুষ বহু বৎসর তত্ত্ব-তালাস করে কার্ল-এর হাল ছেড়েছে অধীন তাদের অন্যতম।

জার্মানীর রাইনল্যাণ্ড তালুকে দুটী জগৎ বিখ্যাত পুরুষের জন্ম হয়। একজন পাশ্চাত্য সংগীতের বাদশা বিটোফেন। জন্ম বনে। এঁর সৃষ্ট সুরের সুরধনীতে পাশ্চাত্য নিরবধি সুধাস্নান করবে। অন্যজন বেহুদ্দো বিদ্বেষের ব্যাপারী, নাম কার্ল মার্ক্স, জন্ম রাইনল্যাণ্ডের ট্রিয়ের সহরে।

আয়ারল্যাণ্ড-এর ড্রাম্‌ক্লিফ গ্রামে কবি ইয়েট্‌স্‌র কবর থেকে গ্রীসে মিসোলোংগিতে কবি বায়রণের কবর অবধি দর্শন করেছি। সেক্সপীয়ার-এর সনেট থেকে সুকান্তর ছাড়পত্র অবধি পড়েছি। কিন্তু কেন জানিনা, একবার বড়দাদাকে বলেছিলুম, "কবিতা লিখব।" দাদা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন "গুরুজনের সংগে ফক্কুড়ি কোরোনা।" কবিতা লেখার আশা বিসর্জন দিয়ে সংবাদপত্র সেবা— আরম্ভ করি। সিকি শতাব্দী উধাও হল। এবার ঘরে ফেরার পালা। ইউরোপের ল্যাঠা চুকবে। সেইজন্যে ট্রিয়ের সহরে। যে মার্ক্সকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় এত হুলুস্থুল, ভাবলুম তার জন্মস্থানটা দেখে যাই।

গত শতাব্দীতে ইউরোপে তিনটে মানুষের লেখায় বিশ্বে ঢি ঢি পড়ে যায়। প্রথম জন হলেন চার্লস্ ডারউইন। এঁর মহাসূত্র হল, শক্তিমানই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবে, দুর্বলরা চিংড়ী অথবা ইলিশ। তিমিরাই হবে শাসক। হঠাৎ দেখা গেল বিরাট তিমি মাছের শত্রু এক ক্ষুদ্র জীব, নাম মানুষ, বুদ্ধিতে দড়, সংগঠন শক্তিতে অতুলনীয়। শক্তির মৃত্যু হল অধিকতর শক্তিমানের হাতে; এক্ষেত্রে শক্তিটা হল মস্তিষ্কের আর সংগঠনের। গীতায় বলেছে বটে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। বিবেকানন্দ বলেছেন শক্তিমান হও। কিন্তু তিমিমাছের ক্ষেত্রে দেখা গেল বুদ্ধির যোগাযোগ না ঘটলে শক্তির দাম কানাকড়িও না এবং ভাইস্-ভার্সা।

ডারউইনের পর এলেন কার্ল মার্ক্স। আর্য-সভ্যতাকে বিনষ্ট করবার জন্যে যেমন চার্বাক দর্শন লেখা হয়েছিল, তেমনই বিশ্বসভ্যতাকে বরবাদ করবার জন্যে রচিত হল মার্ক্সবাদ। এঁর মতঃ নিবুর্জোয়া করিব বিশ্ব! মানব-সমাজের তামাম ইতিহাস ধনী-দরিদ্রের সংঘর্ষের ইতিহাস। এই মারমুখো ভাবধারাকে দর্শন বলতে আমার আপত্তি আছে কারণ

দর্শন শব্দটা শুনেছি গ্রীক যার অর্থ জ্ঞানের প্রতি প্রেম। অথচ মার্ক্সবাদীদের হাতে রাজত্ব গেলে জ্ঞান ও প্রেম দুটোই "দানবপদ দলনে হয় গুড়া" এবং ওরা শাসকের আসন থেকে অর্দ্ধশতাব্দী পরও নড়তে চায়না। এঁরা যে-কোনও পদস্খলন ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম-এর দোহাই দিয়ে সাফাই গান। এই বিশেষ সূত্রটা অবশ্য মার্ক্সের অন্তরংগ বন্ধু এংগেল্‌সের দান, কারণ বিজ্ঞান বিষয়ে মার্ক্স-এর জ্ঞান ছিল অষ্টরম্ভা।

ত্রিকোণ-এর তৃতীয় কোনটীতে অধিষ্ঠিত সগ্‌মুণ্ড-ফ্রয়েড্‌। এই মহামুনির মতে মানব জগতের যাবতীয় সম্পর্ক যৌন-ভিত্তিক,—সম্পাদক ও লেখকের, বাপ ও ছেলের, ভাই ও বোনের, মাতা ও সন্তানের, প্রবন্ধকার ও পাঠকের।

এই তিন ব্যক্তির রচনা বছরের পর বছর পড়ে আমি জীবন-সন্ধ্যায় হাল্লাক হয়ে পড়েছি। ট্রিয়ের নেবেছি এই জন্যে এখানে কার্ল মার্ক্সের জন্ম হয়েছিল ১৮১৮ শতাব্দীতে। জার্মানী হয়ে যাচ্ছি, দেখে নি।

১৮৪৮-এ জার্মানী বলে কিছু ছিল না; ছিল শ' দুই ছোট-বড় জমিদারী। লুথারের পর থেকে জার্মানরা আবিষ্কার করলো যে, যে-ভাষায় লুথার বাইবেলের অনুবাদ করেছেন সে-ভাষায় বহু কোটী মানুষ কথা বলে। কবিতা বেরুল বহু। তার মোদ্দা কথা "এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।" যারা জার্মানীর ঐক্যের কথা বলত, ক্ষুদে নবাবরা তাদের কয়েদ করত বা হেল্‌গোল্যাণ্ড্‌ দ্বীপে কালাপানিতে পাঠাত। এই ধরণের এক নির্বাসিত বুদ্ধিজীবী ছিলেন হুগো ফন্‌ হফমান-স্লেবেন। তিনি এক কবিতা লিখলেন যার প্রথম লাইন হল, "ডয়েট্‌শ্‌ল্যাণ্ড্‌, ডয়েট্‌শ্‌ল্যাণ্ড্‌, উবের আলেস্‌।" অর্থাৎ কিনা জার্মানী এই সব ক্ষুদে নবাবদের ওপরে। সুরকার হেডেন এতে সুর দেওয়ার পর দেখা গেল শুধু প্রাকৃত জন নয়—সৈন্যরাও মার্চ করার সময় গানটা গায়। ইস্কুলের পড়ুয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কারখানা ও খনির শ্রমিক সবাই গায়। গান ও রাজনৈতিক চেতনা জার্মানীতে এল আইনের আগে। হঠাৎ জমিদার ও ক্ষুদে নবাবদের সেপাইদের সংগে জনসাধারণের হাতাহাতি, পরে ব্যারিকেড যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই ব্যারিকেড যুদ্ধে যোগ দেন এক যুবক, নাম রিচার্ড্‌ হ্বাগ্‌নের,—পরে মহাসংগীতকার।

সংবাদটা লণ্ডনে পৌঁছল। টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় মার্ক্স ও এংগেল্‌স স্বদেশের খবর পড়ে চমকে গেলেন। বিশেষ করে মার্ক্স ক্ষুব্ধ হলেন; তাঁকে বাদ দিয়ে বিপ্লব! 'একি মূর্খতা' মার্ক্স ও এংগেল্‌স্‌ ছুটে গেলেন রাইনল্যাণ্ডে। তখন সারা জার্মানীতে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে। নিত্য খবর আসছে, দিকে দিকে ব্যারিকেড, সহরে সহরে খণ্ড যুদ্ধ। এক জার্মানী চাই! ক্ষুদে নবাবদের বিদেয় কর! পার্লামেণ্ট চাই! জার্মান পতাকা চাই! মার্ক্স ও এংগেলস্‌ "নয় রাইনিশেৎসাইটুং" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। কেউ ভ্রুক্ষেপ করলো না। তবু সরকার থেকে কাগজটা বন্ধ করে দেওয়া হল। মার্ক্স ও এংগেল্‌স্‌ ফিরে গেলেন লণ্ডনে।

ফেরার পথে দুজনে অনেক পরামর্শ হ'ল। দুটো

সিদ্ধান্তে পৌছুলেন তাঁরা! প্রথম: জার্মানী মহা-শক্তিশালী জাতি হবে এবং জার্মান শ্রমিক দল হবে সারা ইউরোপের আদর্শ। দ্বিতীয়: এটা ফ্রান্স ও রাশিয়া বরদাস্ত করবে না কারণ ওরা দায়িত্বজ্ঞান-হীন এবং অগোছাল, জার্মানদের মতন পরিপাটী নয়, তৎপর নয়; যাচ্ছি যাবো, খাচ্ছি খাবো গোছের। ঐ দুই জাত একযোগে জার্মানী আক্রমণ করবে—আজ না হয় কাল।

লণ্ডনে ফিরেই মার্ক্স আরম্ভ করলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ। ১৮৭০-এ তিনি বিস্‌মার্কের ফ্রান্স আক্রমণ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে লিখলেন যে জার্মানী আত্মরক্ষার যুদ্ধ করছে। যুদ্ধের জন্য ফ্রান্স দায়ী। বিশবছর পরে এংগেল্‌স্ লিখলেন, যদি ফ্রান্স ও রাশিয়া একত্রে জার্মানী আক্রমণ করে তাহলে জার্মান সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিকরা কাঁধে কাঁধ দিয়ে স্বদেশকে রক্ষা করবে। এংগেল্‌স্ এতেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি জার্মান রাইখ্‌স্টাগের সোশালিষ্ট সভ্যদের খোলা চিঠিতে বল্লেন, দোহাই তোমাদের, এবারের সামরিক খরচ খাতে যাবতীয় প্রস্তাব সমর্থন ক'রো। কারণ বসন্তে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে।

১৮৭০-এ ফ্রান্স-জার্মানীর যুদ্ধের পরেই হল '৭১-এর বিখ্যাত প্যারী কমিউন। মার্ক্স তখন লণ্ডনে। আবার সেই ক্ষোভ। আমাকে ছাড়া বিপ্লব! ভদ্দরলোকের ধারণা ছিল না যে বিপ্লব আর ইতিহাস মার্ক্স বা মার্ক্সবাদীদের জন্যে বসে থাকেনা; উদাহরণ বাংলাদেশ। যাই হোক, কমিউন পরাজিত হল। বীর বিদ্রোহীরা কাতারে কাতারে জান দিলেন। মার্ক্স একটী চটি বই লিখলেন; নাম দিলেন প্যারী-কমিউন। কমিউনার্ডরা তাঁর নামও শোনেনি।

ডা্স্ ক্যাপিটাল ছাড়া মার্ক্সের আর সমস্ত বই-প্যারী কমিউনের মতন নেতিবাচক; অন্যে কি পাপ করেছে তার ওপর বিষোদ্গার। যেমন প্রুধোঁ লিখেছিলেন দারিদ্র্যের দর্শন যেটা ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা আজও পড়ে। মার্ক্স লিখলেন দর্শনের দারিদ্র্য। মার্ক্সের সাকরেদরা মার্ক্স পড়ে কিন্তু প্রুধোঁ পড়ে না। অধিক কি, মার্ক্সীয় রাজত্বে সোশালিস্ট রচনা ও সোশালিস্ট দলও নিষিদ্ধ। প্রতিবাদ করলে সাইবেরিয়ার রিফ্রিজেরেটার। তবু মানুষ এখনও মার্ক্সবাদীদের গা ঘেঁষে বসে বাম বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আসলে ওদের আত্ম-বিশ্বাসের অভাব; দুদিন পরে ওরাই মার্ক্সবাদীদের ফলার হয় যেমন হয়েছে সারা পূর্ব ইউরোপে; একদা শক্তিশালী (অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যা-গরিষ্ঠ) সমাজতন্ত্রীরা দৈহিকভাবে নিশ্চিহ্ন। সবাই দুবেলা ভাত পায় যেটা ভারতে দুষ্প্রাপ্য। একদা যে ইউরোপ ছিল আলোর উৎস তার অর্দ্ধেক ভাগে নতুন প্রদীপের তলায় নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। কেউ কেউ প্রতিবাদ করলে কাশীরাজ বলেন, "আমি তো আছি, তবু কিসের লাগি, কাঁদিয়া মরে যত লোক।" বেশী ট্যাঁ, ফোঁ করলে ট্যাংক্। অন্তর্নিহিত বাণীটা হল, "আলীপুরের স্বাচ্ছন্দ্য মেনে নাও, নচেৎ মেরুবৃত্ত।"

মার্ক্সীয় রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রসমর্থিত একাধিক মিথ্যা প্রচারিত এবং গ্রাহ্য। যেমন লুই ব্লাঁ বলেছিলেন;

"To everyone according to his needs, from everyone according to his abilities" এঁ পল মারা বলেছিলেন, "The proletariat have nothing to lose but their chains. Workers have no country of their own।" কার্ল শ্যাপার বলেছিলেন, "Workers of the world Unite।" বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবী অগুস্তর্ঁাকি বলেছিলেন, "Dictatorship of the Proletariat।" মার্ক্সবাদী সমাজে এই সব উক্তিগুলো মার্ক্সের বলে চালানো হয়। ফলে,

"মিঠাই মণ্ডা তেতো সেথা
ওষুধ লাগে ভাল,
অন্ধকারটা সাদা দেখায়,
সাদা জিনিষ কালো।

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

ট্রিয়ের। ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮

পুস্তক-পরিচয়

Netaji—Dead or Alive? Samar Guha : S. Chand & Co. New Delhi : 1978 : Rs 40.00

নেতাজী জীবিত না মৃত?—এই জিজ্ঞাসা, সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বহু ভারতবাসীর মনে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। নেহেরুর আমলের ভারত সরকার, ১৯৫৬ সালে শানওয়াজ খাঁনের নেতৃত্বে তিন সদস্য-বিশিষ্ট যে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিলেন, তাদের মধ্যে শাহনওয়াজ ও কমিটির আই, সি, এস সদস্য নেহেরুর ইশারায় তাইহোকু বিমান বন্দরে ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫-এ বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে নেতাজীর 'মৃত্যু'র সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যদিও তৃতীয় সদস্য, নেতাজীর অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু, এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদী রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। নেহেরুর ইশারা এসেছিলো, শাহনওয়াজ কমিটির অনুসন্ধানকালীন লোকসভায় নেহেরুর এক বক্তৃতায় : "I have no doubt in my mind (now)—I did not have it then (5.3.52)—and I have no doubt today of the fact of Netaji Subhas Chandra Bose's death, is I think settled beyond doubt." (p. 34) নেতাজীকে 'মৃত' ঘোষণার জন্য শানওয়াজ কমিটি তাইহোকুতে গিয়ে সরেজমিনে তদন্তেরও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তার ১৮ বছর পর বিচারপতি

খোসলার নেতৃত্বে (১৯৭০-৭৪) এক সদস্য-বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও তাইহোকু বিমান বন্দরে ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫-এ বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে আহত নেতাজীর 'মৃত্যু' ঘোষণা করে বলা হয়: "Two days later (August 20, 1945), Bose's body was cremated and his ashes were carried to Tokyo in the begining of September 1945 where they were deposited in the Renkoji Temple."। এছাড়া খোসলা, নেহেরুর সাফাই গেয়ে বলেছেন যে, বসু সম্পর্কে সত্য গোপনের জন্য নেহেরুর দিক থেকে কোনো প্রচেষ্টার বিন্দুমাত্র সাক্ষ্য নাই, অথবা তাইহোকুতে তাঁর 'মৃত্যু' সম্বন্ধে নেহেরু কোনো অসত্য বিবৃতিও কোনো সময়ই করেন নাই।

গ্রন্থকার কঠোর পরিশ্রম সহকারে শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সেই পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্যগুলি থেকে কোনো অপক্ষপাত তদন্ত-কমিটির পক্ষে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনা বা নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুতে পৌঁছানো অসত্য-ভাষণ বা তথ্যবিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৭৬-এ প্রকাশিত যুদ্ধকালীন বৃটিশ ক্যাবিনেটের গোপন আলোচনা, প্রস্তাব, নির্দেশনামা রিপোর্ট ইত্যাদি "The Transfer of Power, 1942-47" শীর্ষক কয়েক খণ্ডে বিধৃত দলিলের ষষ্ঠ খণ্ডে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলির আমলে ক্ষমতা-হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে নেতাজী সম্পর্কে ভারত সরকারের ও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের যে গোপন তথ্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে 'তাইহোকু' বিমান দুর্ঘটনা ও তার ফলে নেতাজীর 'মৃত্যু'—সবটাই যে সাজানো ব্যাপার ছিল, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত সরকার তা জানতেন। এই দলিলগুলি বিমান দুর্ঘটনায় 'মৃত্যুর' মিথ্যা সাক্ষ্যের জালগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। জনতা সরকারের দায়িত্ব রয়েছে এই মিথ্যার মুখোস খুলে ফেলে ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫-এ নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর অসত্য ইতিহাস চিরকালের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলবার। এই 'মিথ্যা' মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে গ্রন্থকারের প্রয়াস সার্থক হয়েছে এবং নেতাজীকে জাপানীদের হাতে খর্ব করতে খোসলার অপপ্রয়াসও ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু পরিশিষ্টগুলি কেন বাতিল করা হ'ল এবং গ্রন্থকারের উক্তি যে, তার হাতে এমন সব সংবাদ আছে যা নেতাজীর জীবিত থাকা সম্বন্ধে তার বিশ্বাসের সমর্থন করবে—এ-ধরণের অস্পষ্টতার আবরণ সৃষ্টি করলে গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যের ঘাটতি পরে, এ-কথা নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের অজানা নয়। ইতিহাস কখনও তথ্যের আঙ্গিনা ছেড়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। সুতরাং গ্রন্থকারের হাতে যদি নেতাজী জীবিত আছেন, এ-ধরণের তথ্য থেকেই থাকে, তবে সে-তথ্য প্রকাশের পথে বাধা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত তার অনুল্লেখই অমোঘ কর্তব্য ছিল।

ব্যক্তি বনাম ব্যক্তিত্ব ঃ গান্ধীজী ও নেতাজী ঃ

ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৯৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ ঃ ষোল টাকা ঃ ১৯৭৮

ভারতবর্ষের দুই যুগনায়কের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশ ও বিস্তারের ইতিহাস সংক্ষেপে প্রায় দু'শ সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থকার প্রস্তাবনায় স্বীকার করেছেন প্রমথ তাঁর কৈশোরে 'সুভাষচন্দ্র ছিলেন আমার জীবনের পরমাদর্শ। মহাত্মা গান্ধীও ছিলেন পরম শ্রদ্ধার মানুষ।' সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ দানা বেঁধে উঠলে তার মন গান্ধী-বিরোধী হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু বিয়াল্লিশের আন্দোলনের ডাক দেবার পর তিনি গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন এবং অতঃপর গান্ধীজীর মত ও পথের অনুসারীরূপে নিজের স্থান নির্দেশ করে নেন। এর পরও, দেখা যায় তার মন সুভাষচন্দ্রের প্রতি প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়েছে। তাই এই দুই মহাপুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়ে অসত্য ও বিকৃত আলোচনার বেদনাবোধ থেকেই গান্ধী-সুভাষের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ইতিহাস-সম্মত আলোচনার জন্য তার এই গ্রন্থ-রচনার প্রয়াস।

গান্ধী-সুভাষের চরিত্রে যেমন মূলগত ঐক্য রয়েছে, তেমনি মৌলিক দ্বন্দ্বও রয়েছে। আদর্শগত ঐক্যের সীমানা অতিক্রম করে, দুই প্রবল ব্যক্তিত্ব যখন আদর্শগত দ্বন্দ্বের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন, সে-দ্বন্দ্বের প্রখরতা সীমাহীন হয়ে উঠতে পারে। গান্ধী-সুভাষের দ্বন্দ্বের এই প্রখরতায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। এই ধরণের আদর্শগত বিরোধে ব্যক্তি-মানুষের নিরাসক্ত ও সংযত আচরণ তাঁকে মহাপুরুষের আসনে প্রতিষ্ঠা দান করে। কিন্তু যারা তাঁদের শিবিরের সাধারণ অনুসারী, তাদের মানসিক উদ্বেলতা ও চাঞ্চল্য, সংঘাত ডেকে এনে পরস্পরকে নির্মম প্রতিপক্ষ ক'রে তোলে। গান্ধী-সুভাষের বিরোধ, দুই আদর্শগত শিবিরের বিরোধ এবং যে-বিরোধ কখনও বা বিদ্বেষে পরিণতি পেয়েছে। দুই শিবিরের সাধারণ অনুসারীদের মধ্যে এই দুর্লক্ষণ দেখা গেছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় জ প্রকাশ নারায়ণ লিখেছেন: "বিংশ শতাব্দীতে সাম্রা্য-বিরোধী সংগ্রামে নিযুক্ত দুটি নাম চিরকাল লোকেদের অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। এই নামগুলি হোল মহাত্মা গান্ধীজী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।.....এই দুই মহাপুরুষ আমাদের দুটি জিনিষ শিখিয়েছেন—দেশের নিস্বার্থ সেবা করা এবং নিজের মতের জন্য আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত থাকা। এঁরা দু'জনে আপন সিদ্ধান্তে সব সময় দৃঢ় থাকতেন। তাঁদের সেখান থেকে বিচলিত করা যেত না।"

জীবনের যতো গভীরে আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা হবে, দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের আদর্শগত বৈপরীত্যের বিরোধ ও সংঘাত ততো তীব্র হবে, আদর্শ-সচেতন মানুষের মনে এই উপলব্ধি সহজেই ধরা দেয়। পরাধীন দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম দেশপ্রেমিকদের এক অনিবার্য কর্তব্যরূপে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। এই সংগ্রাম সশস্ত্র হবে না

অহিংস হবে, তার মীমাংসা নির্ভর করবে স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্বন্ধে কার কি ভাবনা, তার উপর যেমন, তেমনি স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সম্ভাব্য প্রস্তুতির উপর। সুভাষচন্দ্র অহিংসাকে গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অপরূপ পদ্ধতিরূপে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কতটা সীমাবদ্ধ, তা সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই আই, সি, এস চাকুরী বর্জন করে ভারতের মাটিতে পা দিয়েই—বোম্বাই-এ গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ব্যর্থতাবোধ থেকে। গান্ধীজীর কাছে অহিংসা জীবনের একটি মৌলিক নীতিরূপে ততোদিনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, যার প্রয়োগ ও ব্যবহার তিনি সুরু করেছিলেন তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসের দিনগুলিতে, ১৮৯৩ সালের পর থেকে। আর সুভাষচন্দ্র শান্তিপূর্ণ অহিংসা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন দেশের পরিস্থিতি বিচারে, সীমাবদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে। এ-সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছিলো বহুপূর্বে। ১৯১৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র অবস্থায় গুরু-সন্ধানে ব্যর্থ সুভাষ যখন টাইফয়েড রোগের আক্রমণ থেকে রোগমুক্তির পর শয্যাশায়ী অবস্থায় তার সকল পূর্বধারণার পুনর্মূল্যায়নে ব্যাপৃত ছিলেন। সুভাষ সেই ছাত্রজীবনেই উপলব্ধি করেছিলেন দেশের সামরিক এবং অসামরিক প্রশাসনের মধ্যে কোনো ভাগ করা চলে না। এই দুই বিভাগের প্রশাসনিক ভারই দেশের মানুষকেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ, 'স্বাধীনতা অবিভাজ্য' এবং স্বাধীনতার অর্থই হোলো বৈদেশিক শাসন থেকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে সুভাষচন্দ্র শিক্ষা নিয়েছিলেন, যে-জাতি সামরিক শক্তিবিহীন, সে-জাতির পক্ষে তার স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। ১৯২৮ সালে সামরিক কায়দায় কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়বার মধ্য দিয়ে তার সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১৯১৪ সালে অর্জিত চিন্তাধারা অবয়ব গ্রহণ করে। এবং তা চূড়ান্তভাবে রূপ পেলো ১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর জন্মলগ্নে। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই মৌল আদর্শগত বিরোধ সত্ত্বেও আজাদ-হিন্দ বাহিনীর অভিযান সুরু হবার প্রাক্কালে মহাত্মাজীর আশীর্বাদ চেয়ে 'জাতির পিতা'র আসনে সুভাষচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন: "Father of our Nation! In this holy war of India's liberation, we ask for your blessings and good wishes." এই বেতার ভাষণে গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আরও বলেন: "বহির্ভারত থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা ছাড়াই স্বাধীনতা আমার করায়ত্ত হবার সামান্যতম আশাও যদি আমাদের মনে ধরা দিতো, দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতাম না। যদি আমি বুঝতাম বর্তমান যুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেমন আমাদের সম্মুখে এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে আমাদের জীবনে আর একবার সে-রকম সুযোগ আমরা পাবো, ঘর ছেড়ে হয়তো বাইরে যেতাম না।".....

সেবা, ত্যাগ ও মানবতাবাদে অন্তহীন প্রত্যয়ে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর অনুগামী ছিলেন,—বলা যেতে পারে ভারতীয়ত্ববোধে, এই দুই মহাপুরুষের সুদৃঢ় প্রত্যয়, তাদের পরস্পরকে যেমন নিকটে এনেছে তেমনি তাদের আদর্শগত সংঘাত তাঁদের পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। গান্ধীজী সেবাধর্মের সঙ্গে অহিংসার সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আর সুভাষের জীবনে সেবাধর্ম যোগাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিবেকানন্দ থেকে সঞ্চারিত হয়েছিলো। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে ধর্মের প্রতীক অহিংসার সঙ্গে সেবা যুক্ত হয়ে যে রূপ নেবে, যাঁরা হিংসাকে অন্যায় মানবিক বৃত্তিরূপে বিচার করে সেবায় প্রবৃত্ত হবেন তাদের কাছে সেবার প্রকৃতি হবে তার চাইতে ভিন্নতর। সেবার আহ্বান মানবতাবাদের আহ্বান। সেবাধর্ম মানুষের মনকে মনুষ্যত্বের উদার ক্ষেত্রে পৌঁছে দেবে। কিন্তু শক্তি-সাধনার পটভূমিকায় সেবাধর্ম যে মানস সৃষ্টি করবে, ভক্তিসাধনার পটভূমিকায়, সে-ধরণের মানস সৃষ্টি অবশ্যই করবে না। শক্তি-সাধক সেবক যেমন মনুষ্যত্বের পূজারী হবেন, তেমনি মনুষ্যত্বের ছলনার আড়ালে, সেবার ছলনার আড়ালে যদি শোষণ চলে, সেবাকে অবলম্বন ক'রে যদি লুণ্ঠন, পীড়ন, দমন চলে শক্তি-সাধক সেবককে তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। অন্যায়, অবিচার, লাঞ্ছনা, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের দরবারে উৎপীড়িতকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। শক্তি-সাধকের দৃষ্টিতে সেবা সমাজে দুর্বলের প্রতি করুণা প্রদর্শন নয়। বিনম্রচিত্তে তাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবানদের দায়িত্বের প্রসন্ন স্বীকৃতি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শক্তি-সাধক সেবকের ভূমিকা বিপ্লবীর ভূমিকা। তাই অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় সেবাধর্মে দীক্ষা নিয়ে বিপ্লবীরা বিপ্লব-সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন। সুভাষচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নন। আর সমাজসেবার সঙ্গে জাতীয় পুনর্গঠনের অন্তরঙ্গ যোগটাও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো সেই গোড়ার দিনগুলিতে। অধ্যাত্ম-বাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সমন্বয় সাধনও গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের মৌল-উপাদানরূপে দেখা গেছে।

আলোচ্য গ্রন্থে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে স্বাজাত্য ও বিরোধ পাশাপাশি রেখে গ্রন্থকার নিপুণভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুইমহাপুরুষের কর্মজীবন আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্যায় পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের রূপরেখা অনাবৃত হয়েছে। কিন্তু গান্ধী-সুভাষের আদর্শগত স্বাজাত্য ও বিভেদের মৌল-আলোচনার অপ্রতুলতার জন্য এই দুই ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের পূর্ণ-পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেশ-বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। গান্ধীজী দেশ-বিভাগের বিরোধিতা করেও তা সমর্থন করলেন, ; সুভাষের বিরোধিতা এ-বিষয়ে অনমনীয়। তবুও বলতে হবে গান্ধীবাদী হয়েও গ্রন্থকার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সেজন্য পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু বাক্য গঠনে, বানানে এবং ছাপায় মাত্রাতিরিক্ত ভুলে হোঁচট খেয়ে পাঠকদের ক্লান্তি আসবে।

জীবন-স্মৃতির ভূমিকা : ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড : ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩ : আট টাকা : ১৯৭৬

খ্যাতনামা বর্ষীয়ান গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর জীবন-আলেখ্য দেড়শ পৃষ্ঠার পরিধিতে এই গ্রন্থে রেখাঙ্কিত করেছেন। ১৮৯১ সালের ২৪ ডিসেম্বর তাঁর জন্মকালের পর থেকে শৈশব, কৈশোর, ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনে যে সকল ঘটনা তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা পড়েছে, সেগুলির ধারাবাহিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই বিবরণীতে ছেদ পড়েছে ১৯৭৬ সালের গোড়ায় পৌঁছে, ১৯৭৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর গ্রন্থকারের ৮৪-তম জন্মদিবস উদ্‌যাপনের অব্যবহিত পরেই।

এই দেড়শ' পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো ছেদ নাই, কোনো পর্যায়-বিভাগ বা অধ্যায়-বিভাগ নাই। এরই মধ্যে গ্রন্থকারের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে তাদের পারস্পর্য গেঁথে, এই জীবন-আলেখ্যের পরিপূর্ণতাকে পাঠকেরই বুঝে নিতে হবে। তা-ছাড়া আর একটি প্রশ্নও গ্রন্থপাঠে পাঠকের মনে উদ্ভূত হওয়া স্বাভাবিক। জীবন-স্মৃতির শুধু ভূমিকাই বা গ্রন্থকার দেড়শ পৃষ্ঠায় বিবৃত না করে, একটি পূর্ণাবয়ব জীবন-স্মৃতি রচনা করলেন না কেন? অবশ্য নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন একেবারে গ্রন্থের গোড়ায়। ১৯৬৪ সালে তিনি এই ভূমিকা একটি মাসিক পত্রিকায় তের সংখ্যা লেখার পর নিজেই বুঝতে পারেন একদিকে যেমন ভূমিকা বড়ো হয়ে যাচ্ছে, তেমনি জীবনের বহু ঘটনা বিস্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে বাদ পড়ে গেছে। তাই নিজেই স্থির করলেন "নূতন করে লিখতে হবে" আর "যেটুকু না লিখলে সত্যের অপলাপ হবে বা ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তা লিখতেই হবে এবং লিখবোও নিঃসঙ্কোচে।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রন্থকারের রচনা 'জীবন-স্মৃতির ভূমিকা'তেই সীমিত রয়ে গেছে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইতিহাসের যে সমকালীন উপাদানগুলি তাঁর কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে রেখাঙ্কিত করে গেছেন এই জীবন-স্মৃতিতে তার অনুল্লেখ রয়ে গেছে। তবুও গ্রন্থকার যেটুকু পরিবেশন করেছেন, তাঁর এই গ্রন্থে, তারই মধ্যে অকপট সরলতা নিয়ে নিজের মনের অন্তর্লোকের ভাবনাও প্রকাশ করেছেন। মনের অন্তর্লোকের সে-ভাবনাগুলি প্রকাশিত হলে নিজের মর্যাদার হানি হবে, সে-ধরণের আত্মগরিমা থেকে গ্রন্থকার যে মনকে মুক্ত করতে পেরেছেন, তার প্রবল স্বাক্ষর এই গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থের গোড়ায়ই তিনি বলছেন : "আজ জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত। ভুলতে পারিনা যে, জীবনের দুই প্রধান আকাঙ্খা :— (১) সমদৃষ্টি ও (২) আত্মোপলব্ধি এখনও পূর্ণ হয়নি। বহু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও নিজেকেই এখনো সবার চেয়ে বেশী ভালবাসি। প্রাণের ইচ্ছা সকলকে নিজের মত ভালবাসা। তা এখনো পারিনি।" জীবনচর্যার এই মনোভাবে স্বার্থপরতার রেশ থাকলেও, গ্রন্থকার তা গোপন করবার চেষ্টা করেননি।

গান্ধীজী তাঁর নিজের চরিত্রের সবলতা ও

দুর্বলতার দিকটা অনাবৃত করে তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'My Experiments with Truth' গ্রন্থে। গান্ধীজীর পক্ষেই তার মনের গহনের সেই অন্ধকার সুরঙ্গগুলি বিশ্বের সামনে তুলে ধরবার সত্যনিষ্ঠা দেখানো সম্ভব হয়েছে। গান্ধীশিষ্য গ্রন্থকারের জীবন-স্মৃতিতেও অনেকটা সে-ধরণের আত্মপরিচয়ের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। সে-সময় রেওয়াজ ছিল কেউ বাড়ীতে এলে তামাক দিয়ে অভ্যর্থনার। এই দেশে বড়দের মত ছোটরাও তামাক ধরতেন। গ্রন্থকারের সে-ধরণের অভ্যাস না হলেও তিনি স্বীকার করছেন: "সারাজীবনে ১০।১২ টা সিগারেট খেয়েছি। জীবনে পানও খেয়েছি ১২।১৪ টা। জীবনে চা-ও খেয়েছি মাত্র মাস তিনেক।" (পৃঃ ৫) গ্রন্থকারের মত সাত্ত্বিক (puritan) মানুষেরও এই আসক্তির সংবাদ কিছুটা বিস্ময় সৃষ্টি করে বৈকি। আর একটি ঘটনার বিবরণ পড়ে পাঠকদের মুখে বিস্ময়-মিশ্রিত হাসি ফুটে উঠবে। ১৯১৩ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি, এ পাশ করবার পর গ্রন্থকারের মা তাঁর পছন্দমত একটি মেয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারের বিবাহের প্রস্তাব করলে মা'র কান্নাকাটি সত্ত্বেও তাঁকে নিরস্ত করে বলেন: "বিয়ে না করেই আমি সুখী হবো।' গ্রন্থকার অতঃপর লিখছেন: ১৯১৬ সালে দ্বিতীয়বার আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে এক ইংরেজ মহিলার তরফ হতে মহাত্মাজীর মারফতে। বিয়ে না করে যেন পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারি সেই আশীর্বাদ চাই মহাত্মাজীর কাছে। .....সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যানধারণা, তীর্থদর্শন, মহাপুরুষের আশীর্বাদ সত্ত্বেও এরপর দুইবার আমার বিয়ের কথা মনে আসে। বুঝলাম এ-পথ সহজ নয়।" এ-ও মনের গহনের ভাবনার স্বীকৃতি যা সচরাচর মানুষের পক্ষে প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়।

গ্রন্থকার ১৯২০ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পূর্বে কলিকাতা টাঁকশালে ডেপুটি অ্যাসে-মাষ্টার পদে নিযুক্ত প্রথম ভারতবাসী। এই কাজ ছেড়েই ১৯২১-এর জানুয়ারীতে গ্রন্থকার অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯০৯ সালে গ্রন্থকার সশস্ত্র বিপ্লবের পথ স্বীকার করে চাকা অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন আর ১৯১৩ সালে সে-পথ ছেড়ে দেন। এই বছরই কলকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'অনামী ক্লাব' গড়ে তোলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও এই বছরই অনামী সংঘের সদস্যরূপে গ্রন্থকারের পরিচয় হয়। ১৯১৫ সালে অনামী সংঘ-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। গ্রন্থকার গান্ধীজীকে প্রথম দেখেন ১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে, তারপর স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব গ্রন্থকারের জীবনে সর্বাধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে, সে-কথা গ্রন্থকার স্বীকার করেন। এই তিন মহাপুরুষের জীবনী রচনা করে গ্রন্থকার দুরূহ ব্রতসাধনের তৃপ্তি বোধ করেছেন।

১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে। আর ১৯২১-এর ওরা জানুয়ারী অনামী সংঘের সকল সদস্য একযোগে গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে

যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। এরাই আবার একটি আশ্রম স্থাপন করে কাজ করতে চান, যে আশ্রমের নামকরণ মহাত্মা গান্ধী করলেন 'অভয় আশ্রম'। বাংলার রাজনীতিতে 'অভয় আশ্রম'-এর অংশগ্রহণের প্রচুর স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

'অভয় আশ্রমের' কাজ ঢাকায় বাড়ী ভাড়া করে সুরু হয়। গ্রন্থকার লিখছেন ১৯২১ সাল থেকে জনসেবার কাজে টাকা সংগ্রহ সুরু করেন এবং পঞ্চাশ বছরের ওপর এজন্য টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রথম বছর কলকাতা ও ঢাকার বন্ধুদের কাছে মুখ্যতঃ টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। 'এর মধ্যে ঢাকার রসায়নের অধ্যাপক ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দিতেন মাসে ১০০ টাকা—তার মাইনের এক দশমাংশ।'

গ্রন্থকার সকল শ্রেণীর কয়েদীরূপেই জেলে বন্দী ছিলেন। কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল সুশীল সিং-এর কোর্টে ১৯৩৩ বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের কর্মকর্তা হবার জন্য গ্রন্থকার দণ্ডিত হন—ছয় মাসের জেল। তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করা হয় এবং টিকিটে লেখা থাকে "নিরক্ষর"। ইংরেজ আমলে বিচারের প্রহসনের একটি সামান্য নমুনা মাত্র এই ঘটনা।

গ্রন্থটির ৫২ পৃষ্ঠায় একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ে ১৯২২-এর সেপ্টেম্বরের শেষে এবং অক্টোবরের গোড়ায় উত্তর বঙ্গে প্রবল বন্যা হয় এবং এই বন্যায় ত্রাণকার্যের ভার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আহ্বানে সুভাষচন্দ্রই গোড়ায় এসে হাল ধরেন এবং কঠোর পরিশ্রম করে সেবা ও ত্রাণকার্যের সংগঠন তৈরী করেন। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এলেন সুভাষচন্দ্রের স্থলবর্তী হয়ে, পুনর্বাসনের কাজ পরিচালনার জন্য। এই গ্রন্থে উত্তর বঙ্গের এই বন্যার বিশদ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সে-সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অনুল্লেখ স্বভাবতই পাঠকদের মনে প্রশ্ন তুলবে।

গ্রন্থটির শেষের দিকে দ্রুত ঘটনার সমাবেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই গ্রন্থকারের চোখ এড়িয়ে গেছে। তারমধ্যে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান অন্যতম। এ-ছাড়া দেশবিভাগ আসছে গ্রন্থকার ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসেই বুঝতে পারছেন। অথচ, এই গ্রন্থে গান্ধীজীর দিক থেকে এই বিভাগ প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার কোনো উল্লেখ নেই। যেন বিধাতার বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে অপেক্ষা করছেন, মায় গান্ধীজীও। তার প্রতিবাদও যেন অন্তঃসারশূন্য, কোনো আত্মিক বল এই প্রতিবাদের পেছনে সংহত হ'তে দেখা গেলো না। গ্রন্থটির শেষের দিকে ঘটনার ভাসা ভাসা বিবরণ, গ্রন্থের এই অংশটিকে বড় বেশী সাবজেকটিভ করে তুলেছে।

গণতন্ত্র মুখোশ ও মুখশ্রী। কাশীকান্ত মৈত্র। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। ২৫.০০। ১৩৮৫

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ৩৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নানা তথ্য ও তত্ত্বের উল্লেখ, আলোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। ইতিপূর্বেও গ্রন্থকার এই ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব সমাবেশে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং রাজনৈতিক তত্ত্বগত বিতর্কে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। পরিষদীয় রাজনীতিতে গ্রন্থকারের দখল এবং আইনজ্ঞরূপে তার স্বীকৃতি তার চিন্তাধারাকে গণতন্ত্রের সংগ্রামী প্রহরায় নিয়োজিত করেছে। বর্তমান গ্রন্থটি তার এই দায়িত্ববোধের মানসিকতার ফলশ্রুতি।

'গণতন্ত্র', 'সামাজিক ন্যায় বিচার,' 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র,' 'সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি প্রত্যয়গুলির আলোচনা, সমগ্র গ্রন্থের পাতায় পাতায় আকীর্ণ হয়ে আছে। 'গণতন্ত্রের'ও রকমফের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ-এ গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন, তাই 'গণতন্ত্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদের পাশাপাশি 'সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্র', 'সর্বহারার গণতন্ত্র' শীর্ষক উপ-পরিচ্ছেদগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। এ-ছাড়া 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র,' 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ,' 'সমাজের বহুবাদী তত্ত্ব,' সমাজে বহুদলীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। 'দল ও নেতা'র পারস্পরিক সম্পর্ক, দলীয় গণতন্ত্র, পরিষদীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি রাজ্যরূপগুলিরও আলোচনা এবং বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকার একদলীয় শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন, বারটি অধ্যায়ে এবং পাঁচটি উপ-অধ্যায়ে এই বহুবিধ আলোচনার বিস্তারে, গ্রন্থটিতে আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে বহু তথ্যের সমাবেশ করেছেন।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সমন্বয়ের সন্ধান দিয়েছেন, যে-সমন্বয় বাস্তব পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়নের পথ দেখাবে, ব্যক্তির প্রেক্ষাকে একদেশদর্শিতার ভ্রান্তি-মুক্ত করবে, ভবিষ্যতের রূপরেখার পরিমাপ দেবে। গ্রন্থের ভূমিকায়, গ্রন্থকার এই সমন্বয়ের সন্ধান দিয়ে বলছেন, যা ইতিপূর্বেও ১৯৭৩ সালে আর একটি গ্রন্থে বিবৃত করেছেন: "সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে পরিহার করে, তাকে পঙ্গু রেখে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আবার রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বর্জন করে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে ইতিহাসের রায় নির্মম এবং সুস্পষ্ট। চীন ও রাশিয়ায় বৈষয়িক উন্নয়ন যথেষ্ট হয়েছে নিঃসন্দেহে—কিন্তু সে-সব দেশের নাগরিকরা, বুদ্ধিজীবীরা আবার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ....

...রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সাধনা ও প্রয়াস নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে হবে যুগপৎ। একটি অপরটির অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল। ভারতকে সেই নূতন পথে সাহসের সঙ্গে এগুতে হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই বলিষ্ঠ পথের সন্ধান দিয়েছেন ভারতবাসীকে... ভারতের জাতীয়তা-বাদী ও প্রগতিশীলদের এই সমন্বয়ের নূতন পথেই এগুতে হবে।" (পৃঃ-৭)

গ্রন্থকার এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এই মৌলিক সমস্যাটির নানা দিক নিয়ে আলোচনা

করেছেন। দেশে এবং বিদেশে গণতন্ত্রবর্জিত সমাজ-তন্ত্রের পরিণতি যে একতান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয় বিভিন্ন সূত্রে সে আলোচনায় এসে পৌঁচেছেন। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালে নাগপুরের ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে জনতার হাতে সর্বময় ক্ষমতা দেবার, যে দাবী তুলেছিলেন—'All Power to the Indian People'—গ্রন্থকার তারও উল্লেখ করে বলছেন: 'জনতাই ক্ষমতার উৎস—কারাগার নয়, আমলাতন্ত্র নয়—উদ্যত রাইফেলের নল নয়' (পৃঃ ২৭)। 'জনতার হাতে সকল ক্ষমতা' দেবার সংগ্রামই আসলে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সংগ্রাম। রাজনৈতিক গণতন্ত্র যেখানে সুনিশ্চিত সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রান সেই ভিত্তিভূমিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠবে। সমাজ-বিপ্লবের পূর্বসর্ত রাজনৈতিক গণতন্ত্র। কিন্তু এই গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করে গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে সমাজ-বিপ্লবে পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে? গ্রন্থকার নিপুনভাবে তারই রেখাঙ্কন এই গ্রন্থে ছড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থকার স্বভাবতই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার দিকে চেয়ে বলছেন: 'সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মিথ্যা সন্দেহের বশে, কল্পিত অভিযোগের ভিত্তিতে কারারুদ্ধ করা হয়েছে—বাধ্যতামূলক দাস-শিবিরে নির্বাসিত করা হয়েছে' (পৃঃ ৩৯)। এই এক-নায়কত্বকেই সর্বহারাশ্রেণীর গণতন্ত্ররূপে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন করে বর্ণনা গেছেন। এই চিন্তাধারাই পল্লবিত হয়ে এক-পার্টি শাসন, শ্রেণী শাসন, সর্বহারার একনায়কত্ব, লাল ফৌজের গড়ন এবং বিপ্লবী দলের নর্মময় অভ্যুত্থান-এ রূপ পেয়েছে। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে লেনিনের বিখ্যাতটি উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন: "The question of power is the fundamental question of every revolution—"রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করা ও রাখার প্রশ্নটিই—প্রত্যেক বিপ্লবের মূল প্রশ্ন।' এই ভাবনা থেকেই সর্বশক্তিমান সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্ভব হয়েছে। এই সুবাদে রুশ-বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিপ্লবের পথান্তরের বিশ্লেষণে গ্রন্থকার ব্রতী হয়েছেন। এই পথান্তর সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি পড়লে ফরাসী বিপ্লবের রূপকার কার্লাইলের জমকালো ভাষায় ফরাসী বিপ্লবের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কার্লাইল সেদিন বলেছিলেন: "Revolution devours its own children"—'বিপ্লব নিজের সন্ততিদের গ্রাস করে ফেলে'। রুশ-বিপ্লবেরও সেই পরিণতি ঘটেছিলো, লেনিনের অন্তিম দিনগুলিতে যাঁর সুরু এবং স্টালিনের বজ্রকঠোর নির্মম পেষণে যার পূর্ণ পরিণতি। স্টালিনের নির্যাতনের অন্যতম শিকার এবং ইতিহাসে লেনিনের সহযোদ্ধারূপে যাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেই ট্রট্স্কি বলছেন: "The Caucus substitutes ilself for the party; then the Central Committee for the Caucus, and finally a dictator substitutes himself in the Central Committee." (পৃঃ ৭৭) অনিবার্যভাবে একনায়কত্ব আবির্ভূত হন। বহু পরিচ্ছেদ ও উপ-উরিচ্ছেদে নানা নজীর দিয়ে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ও সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির নানা ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা করে গ্রন্থকার গণতন্ত্রের পক্ষে মার্ক্সবাদের

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA UNIVERSITY

তাত্ত্বিক পরিণতির ভয়াবহতা সপ্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

গ্রন্থটির গোড়ায় এবং শেষের দিকে ভারতবর্ষের সংবিধান এবং দেশের রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। নেতাজীর আদর্শবাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণের নৈতিক সংগ্রাম, কংগ্রেসের আদর্শচ্যুতি, কম্যুনিষ্ট পার্টির দুমুখো-নীতি, এ-সব প্রসঙ্গই গ্রন্থের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস করে সর্বনাশা দেশ-বিভাগ—তারও আলোচনা আছে। পরিশেষে গ্রন্থকার মূল সমস্যায় পৌঁছে বলছেন: "... 'অসমাপ্ত' 'জাতীয় বিপ্লবকে' সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা (জাতীয়তাবাদীরও) ভুলে গেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব-বাদীদের ঐতিহ্য—নেতাজী-ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে রইলেন এঁরা। ফলে বিপ্লবীয়ানার একচেটিয়া অধিকার বাম দলগুলির হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছেন। তাঁরা গণতন্ত্রকে নিছক নির্বাচন ও ভোট-সর্বস্ব বলে ধরে নিয়েছেন।' এইখানেই গ্রন্থের নির্যাস পরিবেষিত হয়েছে বলা চলে।

অসমাপ্ত জাতীয় বিপ্লবকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যাওয়াও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের অমোঘ কর্তব্য। তবেই গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সমন্বয় গড়ে উঠবে। গ্রন্থের বিষয়-বিন্যাসে গ্রন্থকার আরও মনোযোগী হয়ে পুনরুক্তির ছাঁট-কাট করবেন আশা করছি।

রাজনৈতিক বিতর্কমূলক রচনায় গ্রন্থকারের মত সাহিত্যিক প্রসাদগুণ আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না। সমদর্শী

সাধারণ ব্যবহারোপযোগী শক্তির সহজলভ্য বিকল্প উৎস

নির্মাল্যভূষণ দাশ

ভারতে বার্ষিক মোটামুটি ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হয়। আমাদের কয়লা সম্পদ ৮৩ বিলিয়ন টনের মত। তাই এ-সম্পর্কে আমাদের আশু দুশ্চিন্তার কারণ না থাকিলেও শক্তির বিকল্প উৎস সন্ধানে সময়ক্ষেপণ যুক্তিযুক্ত মনে করার কোন হেতু নাই। বিকল্প উৎস হিসাবে সৌর-শক্তি, জোয়ার-ভাটারশক্তি, ভূ-তাপ-শক্তি, আণবিক-শক্তি, বায়ুপ্রবাহ-শক্তি ও জল-শক্তির নাম করা যাইতে পারে।

কার্য-নির্গমক মেশিনে উচ্চতাপ ও নিম্নতাপ—এই দুইটী প্রান্তিক অবস্থান ও কিছুটা অপচিত তাপ অবশ্যম্ভাবী। 'কারিগরীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপচিত তাপ একটী রক্ষণসম্ভব-শক্তি। পৃথিবীর সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতে ৫০% শক্তি অপচিত তাপ হিসাবে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। ইহার অল্পত অংশ-বিশেষও কাজে লাগাইলে ব্যবহৃত শক্তি উৎপাদনের বিকল্প উৎস সন্ধানের পরিধি অনেকাংশে হ্রাস পায়। কলিত-বিজ্ঞান ও উচ্চ কারিগরী গবেষণাধীন এ-প্রকল্পের উপায় উদ্ভাবন তেমন দুঃসাধ্য প্রতীয়মান হওয়ার কারণ নাই।

শক্তির সম্ভাব্য বিভিন্ন বিকল্প প্রাকৃতিক উৎস সমূহের মধ্যে সৌর-শক্তিই সর্বপ্রথম আমাদের স্বভাবতই মনে আসে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান

দেশের সর্বত্র সহজলভ্য এই উৎস দেশের প্রায় সর্বত্র অযাচিতভাবে ছড়ানো এবং ইহা দরকার মত কুড়াইয়া নেওয়াই একমাত্র আমাদের কাজ। বিশেষ ক্ষেত্রে জোয়ারভাটার-শক্তি, বায়ুপ্রবাহ-শক্তি, ভূতাপ-শক্তি ও জল-শক্তির ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জল-শক্তি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ পরিচিত এবং জলবিদ্যুত উৎপাদন সম্পর্কিত কারিগরী-বিদ্যা আর এখন আমাদের কাছে কিছু মাত্র নূতন নহে। বায়ুপ্রবাহ তাড়িত ১.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুত টারবাইন আমেরিকায় শক্তি-গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা এবং জাতীয় বিমান চালনা-বিদ্যা ও মহাকাশ-সংস্থার যুগ্ম-পরিচালনায় শীঘ্র আমেরিকায় স্থাপিত হইবে। ২৫-৩৫ কিলোমিটার/ঘণ্টা গড় বায়ুর বেগ হয় এমন জায়গায় ইহা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জোয়ারভাটার-শক্তি কাজে লাগাইয়া ইংলণ্ডে বিভিন্ন জেনারেটার মডেলে এখন নানা পরীক্ষা চলিতেছে। ভূ-তাপ শক্তি কাজে লাগাইয়া উষর বিস্তীর্ণ অঞ্চল সহজ বাসোপযোগী করার নানা প্রচেষ্টার কথাও আমরা শুনিতেছি।

এই সব বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস সমূহের মধ্যে সৌরশক্তিই প্রধান ও সর্বত্র সহজলভ্য। সূর্যের এ অযাচিত করুণা কুড়াইয়া নিলেই হইল। বৎসরের প্রায় সর্বক্ষণে অনায়াস-লভ্য এ-শক্তি উৎপাদনের উৎসের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সূর্যকিরণ মেঘলা দিন ব্যতিরেকে আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র অনায়াসলভ্য, কিন্তু ইহার ব্যবহারোপযোগী রূপান্তরে কিছু ফলিত-বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী কলাকুশলাদির প্রয়োগ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সৌরশক্তি তাড়িত বিদ্যুত জেনারেটার ৬,৭,৯,১২ বা ১৪ ভোল্ট, ০,১২৫ হইতে ২ এম্পিয়ার কারেণ্ট এবং ১.৫ হইতে ১৪ ওয়াট শক্তি-সম্পন্ন তৈয়ার হইয়াছে। দিনের বেলা ইহা ব্যাটারী চার্জ করিয়া রাখে যাহাতে রাত্রে সে-শক্তি কাজে আসে। এইভাবে দিবারাত্র সূর্যকিরণ হইতে শক্তি-আহরণের উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বিপ্লবী নেতা মণীন্দ্র কিশোর রায়ের লোকান্তর

গত ১লা আগষ্ট রাঁচী শহরে প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা মণীন্দ্র কিশোর রায় ৭৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। ছাত্রজীবন থেকে ঢাকা শহরে মণীন্দ্রকিশোর রায়ের বৈপ্লবিক জীবন সুরু হয়। ঢাকায় অনুশীলন দলের পাশাপাশি যে বৈপ্লবিক দল শৌর্যে, বীর্যে, মেধায়, ত্যাগে ও সঙ্কল্প-সাধনায় দুর্জয় বেগে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে ১৯২০ সালের মধ্যেই বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের অসামান্য সংগঠন-প্রতিভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, বিপ্লবী মণীন্দ্র কিশোর সেই দলের সদস্যভুক্ত হন। সেদিন বিপ্লবী-নেতা অনিল রায়ের অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী মণীন্দ্রকিশোরের সতীর্থ ছিলেন বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, সত্যভূষণ গুপ্ত, ভবেশ নন্দী প্রমুখরা। এই বিপ্লবী দলই 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর পরিচয়ে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে এবং ১৯২৯ সালে এই 'শ্রীসঙ্ঘ-এর দ্বিধাবিভক্তির পর যাঁরা 'বি ভির' সদস্যরূপে পরিচিত হন, বিপ্লবী নেতা মণীন্দ্রকিশোর তাঁদের অন্যতম।

মণীন্দ্রকিশোর ঢাকার অন্যতম শরীর-চর্চা সংস্থা 'শান্তি সংঘ-'এর সংগঠকরূপে ঢাকা শহরের কয়েকটি অঞ্চলের যুবশক্তির ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

বিপ্লবী নেতা মণীন্দ্রকিশোর সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন এবং ত্রিশ দশকে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুইবার দীর্ঘকাল রাজবন্দী ছিলেন। তিনি দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন, দেশবিভাগের পর রাঁচি শহরে তাঁর পরিজনদের সঙ্গে বসবাস করে জীবনের শেষ বছরগুলি সেখানেই সমাজ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পর

বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সবাদ

সুনীল দাস

অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকদের বিরুদ্ধে হেগেলের মূল অভিযোগ ছিল, তাঁরা পরিবর্তনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছেন; কারণ তাঁরা গ্রীক-দার্শনিক এরিস্টট্‌ল-প্রবর্তিত তর্কশাস্ত্রের গতিবেগহীন পদ্ধতির প্রয়োগে পরিবর্তনের স্বরূপ পরিমাপের উদ্যোগ করেছিলেন। হেগেল এসে এই পদ্ধতিতে ছেদ টানলেন। দার্শনিক প্লেটো বিধান দিয়েছিলেন যে 'ভাবনা' বা 'আইডিয়া সমূহের' (Ideas) বাস্তব সত্তা রয়েছে। হেগেল এই বিধানকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে 'ভাবনা'-র স্বরূপ সম্বন্ধে একটি সর্ত জুড়ে দিয়ে বললেন যে, 'ভাবনা' বা 'আইডিয়া'গুলি তো স্থানু নয়, অনবরত তারা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এরিস্টট্‌ল-এর 'বাঁধা-পথের' লজিকে (Formal Logic) একটি বস্তুর পরিচয় বর্ণিত হয় তার মর্মগত গুণাবলীর পরিচয় দ্বারা। এই লজিক অনুযায়ী একটি টেবিলকে টেবিল বলা হয় এই জন্য যে, টেবিল বলতে যে মর্মগত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেগুলি তার মধ্যে পাওয়া যায়। একটি বস্তু হয় তার বস্তুসত্তা দিয়েই পরিচিত হবে, নয়তো তার বিপরীত বস্তুসত্তার পরিচয় বহন করবে। একই বস্তু 'সেই বস্তু' এবং 'সেই বস্তু নয়ও' —এই দুই ধরণের সত্তার অধিকারী হতে পারে না। গরু, 'গরুও বটে,' 'গরু নয়ও বটে'—এ-ধরণের যুক্তি দিয়ে-চিন্তা-ভাবনার কাজ চলে না। গরু গরুই, ঘোড়া নয়,—এই যুক্তি দিয়ে একটি বস্তুর পরিচয় সীমিত করা চলে, বস্তুটিকে চেনা যায়। আবার 'বাঁধা-পথের' লজিক বা যুক্তি দিয়ে সকল প্রকার বস্তুর পরিচয় বুঝে ওঠা যায় না; কারণ যে-চিন্তা-ভাবনা দিয়ে বস্তুকে অনুসরণ করা যায়, পরিবর্তনশীল বস্তুর অনুসরণকারী সেই চিন্তা-ভাবনারও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠবে। গণতন্ত্রের চিন্তা-ভাবনা মাথায় এলে আমাদের তখনই মনে হবে যে নেতিবাচক তুলনা দিয়ে গণতন্ত্রের প্রত্যয়কে বুঝাবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমরা যদি বলি 'গণতন্ত্র' 'রাজতন্ত্র' নয়, অথবা 'অভিজাততন্ত্র'ও নয়,—এই নেতিবাচক বর্ণনা দিয়ে 'গণতন্ত্র'-র প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করা যাবে না, মোটামুটি রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলির বিভিন্নতা বোঝানো ছাড়া।

ডায়লেকটিক পদ্ধতির প্রবলতম আকর্ষণ এই যে, এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত গতিবেগ অন্তহীনভাবে 'নূতন নূতন হওয়ার' সন্ধান দেয়। সত্তা কোথাও থেমে নেই, সত্তার ক্রম-রূপান্তরে নূতন সত্তার আবির্ভাব হচ্ছে, ডায়ালেকটিক পদ্ধতির দৌলতে। সুতরাং, চির-নূতনের আবির্ভাব ডায়ালেটিকের

আশীর্বাদরূপে বস্তুসত্তার উপর বর্ষিত হয়ে বস্তুসত্তাকে নূতন রঙে রাঙিয়ে তুলছে। তাই যারা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিশারী, ডায়ালেকটিক তো তাদের কাছে বিপ্লবের রথচক্র বৈ কি! আর এরিস্টট্‌ল-এর 'বাঁধাপথের লজিক' তো বস্তুসত্তার স্থানুত্ব-ব্যাঞ্জক, বস্তুর অনড়তা, চিন্তার অনড়তার দ্যোতক। সুতরাং সমাজে পরিবর্তন-বিরোধী, অনড়ত্ব, জড়ত্ব, স্থানুত্বের প্রতিনিধি সেই প্রতিক্রিয়াশীলরা বিপ্লবের রথচক্র, ডায়ালেকটিকের বিরোধিতা করে এরিস্টটলের 'বাঁধা সড়কে'র যুক্তিবাদীরূপে' নিজেদের জাহির করে। তাই ডায়ালেকটিকের অভিজাত-পদ্ধতির কাছে এরিস্টটলের 'বাঁধাসড়ক' অস্ত্যজ হয়েই রয়েছে, চিরদিন থাকবেও! এটাই বিশ্ববিধানে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এঙ্গেলস বলছেন 'আটপৌরে কাজেকর্মে'—'for every day purpose'—এরিস্টলের 'বাঁধাসড়কই' যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্ব-বিধানের সম্যক্ পরিস্থিতি-বিচারে—'an exact representation of the universe'—এই পদ্ধতি একেবারেই ব্যর্থ।

'বাঁধা-সড়কে'র লজিকের সঙ্গে ডায়ালেকটিক যুক্তিবাদের সম্পর্ক নিয়ে ট্রটস্কিও আলোচনা করেছেন। ১৯৪০ সালের মার্চ সংখ্যার 'নিউ ইণ্টারন্যাসন্যাল' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে 'বাঁধা-সড়কের' লজিকের সঙ্গে ডায়ালেকটিক লজিকের তুলনামূলক আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন উচ্চতর অঙ্ক-শাস্ত্রের সঙ্গে নিম্নতর অঙ্কশাস্ত্রের যে সম্পর্ক কিম্বা চলমান সিনেমার ছবির সঙ্গে ফটোগ্রাফের যে সম্পর্ক, ডায়ালেকটিক লজিকের সঙ্গে 'বাঁধা-সড়কে'র লজিকেরও সেই রকম সম্পর্ক। ট্রটস্কি বলছেন বিবর্তন সম্পর্কে যখন আদৌ কোনো ধারণা ছিল না, এরিস্টটল সে-সময়কার লোক। 'বাঁধা-সড়কে'র যুক্তি' বা 'ফরমাল লজিক'-এর উৎস অভেদনীতি থেকে; যে নীতি বলছে ক, ক-এরই সমান। যখনই বলা হয় ক=ক বুঝতে হবে ক'র কোনো পরিবর্তন না হলেই ক=ক। কিন্তু সত্তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, একমাত্র যা সত্তাহীন অর্থাৎ যা অস্তিত্বহীন, তারই কোনো পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু ট্রটস্কির এই চিন্তাধারার গোড়ায় গলদ রয়েছে। গ্রীক্ পণ্ডিতরা বিবর্তনবাদের সঙ্গে খুবই সুপরিচিত ছিলেন। 'সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল'—হেরাক্লিটাস-এর এই বিখ্যাত আবিষ্কারের একশ বছর পূর্বে সোলোনকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় সব চাইতে উৎকৃষ্ট ধাঁচের গভর্ণমেণ্ট কি হতে পারে, তিনি উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন: 'কার জন্য এবং কোনকালের জন্য'?—'for whom and at what time?' অর্থাৎ স্থান-কালের নিরিখে তা বিচার করতে হবে। এরিস্টটলের উক্তি ক=ক অথবা সকল বস্তুই হয় ক, না-হয় না-ক—এই দুই-এর একটা—তাঁর বলবার উদ্দেশ্য হ'ল, চিন্তার পারম্পর্য রক্ষিত হচ্ছে কি না সেটাই বড়ো কথা। বস্তুর সত্তাটা তখন তার কাছে বড়ো কথা নয়।

মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিতে স্ববিরোধিতা কি বস্তু একটু বিচার করে দেখা যেতে পারে। ডায়ালেকটিক লজিক গতিবেগসম্পন্ন; আর অপরপক্ষে পুরাণো 'বাঁধা-সড়কে'র লজিক (Formal logic) গতিবেগ-হীন, অনড় ও স্থানু। বস্তু গতিশীল হলেই

স্ববিরোধী হয়। চলমান বস্তুটির স্থান-নির্দেশ কি ভাবে হবে? একটি বিশেষ মুহূর্তে, সেই চলমান বস্তু একটি বিশেষ বিন্দুকে অধিষ্ঠান করছে কি না? এই প্রশ্নটি সহজ মনে হলেও, উত্তরটি অতো সহজ নয়। বস্তুটি একটি বিশেষ বিন্দুতে 'আছে' কিম্বা 'নাই'—এই ধরণের উত্তরে সবটা বলা হবে না। এই প্রশ্নের উত্তর হবে মার্ক্সীয়দের ভাষায় 'আছে' এবং 'নাই' দুই-ই।

বিনাশ আর বিরোধ, বিরুদ্ধতা ও পৃথকত্ব—এই প্রত্যয়গুলি কি একই বস্তুর বিভিন্ন দিক না বিভিন্ন বস্তু-সত্তার পরিচয় বহন করছে—সে-সম্বন্ধে একটু বোঝাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে। ডায়ালেকটিক তত্ত্ব অনুযায়ী মার্ক্সবাদীদের নজরে ঘটনার যে-কোনো পরম্পরা পরস্পর-বিরোধীরূপে ধরা দিলেও এই বিরোধের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মিলন ঘটিয়ে তোলা সম্ভব। ডায়ালেকটিকের এই মাহাত্ম্যের দিকটাই মার্ক্সবাদীদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা হয়। কিন্তু পুরাণো 'বাঁধা-সড়কে'র ফর্ম্যাল লজিক যতো নষ্টের গোড়া! তাদের যুক্তিতে বিরোধ বিরোধই। বিরোধের মধ্যে মিলনের সূচনার সন্ধান একেবারে অবাস্তব—অবান্তরই বটে। মনীষী অনিল রায় তাঁর "হেগেল প্রসঙ্গে" রচনায় বলছেন: "জগৎকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে হ'লে এই দু'রকম সম্পর্কের পার্থক্যকে ('otherness ও opposition — 'বিভিন্নতা ও বিরুদ্ধতা') সর্বদা মনে রাখতে হবে। এদের অর্থের তফাৎ যদি চোখের সামনে না থাকবে তবে বিশ্বগতির অর্থনির্ণয়ে নির্ঘাৎ ভুল হলেই হবে। কারণ এই otherness ও opposition-এর মানের পার্থক্য দার্শনিক বিচারের গোড়ার কথা।

...তিনি (হেগেল) ফর্ম্যাল লজিক-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলতে গিয়ে "contradiction" বা "opposition"কেই বলে বসলেন বিশ্বজগতের সার্বভৌমিক ও চিরন্তন নীতি এবং নির্দেশ করলেন যে বিশ্বের সকল বস্তুই সকল বস্তুকে 'oppose' করছে, বিরুদ্ধতা করছে।.....সূত্র যেমন করে মালার সকল ফুলকে একত্র গেঁথে রাখে, হেগেলের মতে এই 'contradiction' তেমনি বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনাকে ধারণ করে আছে।...যেখানে সব খণ্ড বস্তুগুলোই পরস্পর continuous বা অবিচ্ছেদ্য সহযোগিতায় বর্তে রয়েছে, সেখানেও contradiction-এর হাত এড়াবার উপায় নেই।....যেখানে মৈত্রী সেখানে হেগেল দেখতে পেয়েছেন বৈরী; যেখানে আছে সহযোগিতা, সেখানে তিনি কল্পনা করেছেন প্রতিযোগিতা.....ফলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে একটিমাত্র ছাঁচে বাঁধতে গিয়ে তিনি contradiction কে পূজাবেদীতে বসিয়ে অন্ধভক্তির কাছে যুক্তিকে বলি দিয়েছেন।"

(ক্রমশঃ)

২-৯ঠ বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮·০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষন ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভাবতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃঃ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

2 9 AUG 1978

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ জরু দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

৪৩ বর্ষ ঃ ১৩৮৫ ঃ ভাদ্র

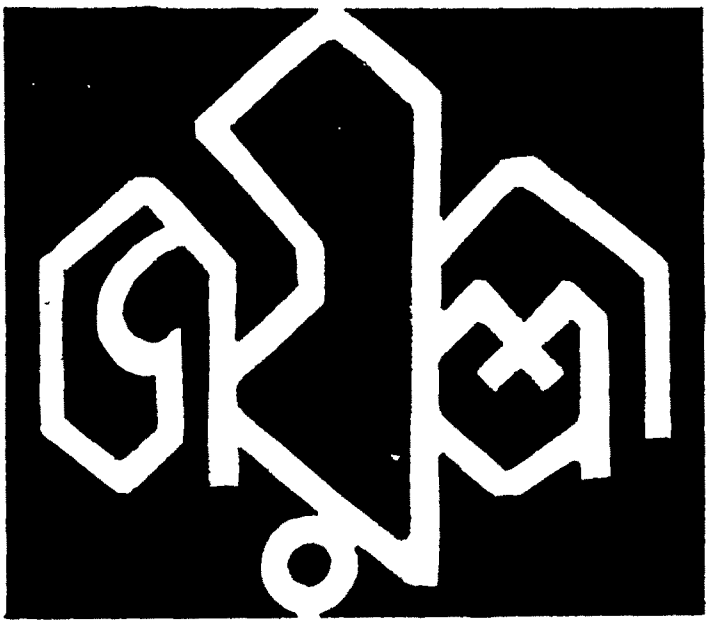

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ঃ ১৯১৬-১৯২৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

H. V. KAMATH

LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : Rs. 15/-

NANDA MOOKERJEE

NETAJI THROUGH GERMAN LENS : Rs. 20/-

VIVEKANANDAS INFLUENCE ON SUBHAS : Rs. 6/-

NETAJI SPEAKS : VOL. I Rs. 4/-

নেতাজীর জীবনবাদ ঃ অনিল রায় দাম ঃ ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ঃ পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড ৩৪·৫০ এর পরিবর্তে ২৭ টাকায়। বাংলায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় ঃ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীতার প্রেক্ষায় ৬১টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত। প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের এই বই ভাল লাগবে। দাম ঃ ১০.০০

পুবদেশি উপকথা ঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পুব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গপ্পো, গণেশ-পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম ঃ ৯.০০

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম ঃ ৯.০০

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন ঃ ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম ঃ ২০.০০

রামমোহন ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দাম ঃ ৬.০০

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ ভাদ্র। ১৩৮৫ ৫র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পটপরিবর্তন ২৮৭

স্মৃতি-কথন : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ২৯৫
গোপাললাল সান্যাল

এশিয়ার রত্নমালা : ৬

চিরঞ্জীব মুজিব ২ ৩০৭
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রবন্ধ

সূর্যের জীবন-প্রগতি ৩১৯
অচিন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সবাদ ৩২৯
সুনীল দাস

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

জয়শ্রী শারদীয়া ॥ ১৩৮৫

শিক্ষানীতি ও ভাষা : একটি সেমিনার

আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন

ড. অমলেন্দু বসু, ড. ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

একটি অপ্রকাশিত রচনা

ভারত অন্বেষণে আরব মনীষী : ক্ষিতিমোহন সেন, শাস্ত্রী

অন্যান্য রচনা

আইনষ্টাইন ও মহাবিশ্ব : ড. বিমলেন্দু মিত্র
বারাজী মহারাজ : তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়
ইচ্ছাকলম : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণধর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়কুমার দত্ত, সামসুল হক, পবিমল চক্রবর্তী, সুমনা দাস, শিবদাস চক্রবর্তী, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, সন্তোষ চক্রবর্তী প্রবীর সরকার ও আরো অনেকে।

এ ছাড়া থাকবে

চারণিক-এর কলমে **মহাকাল কথন**

দাম : তিন টাকা

দেখতে ভালো, চলতে আরাম, মজবুত এবং
দামেও সুবিধাজনক—এমন **জুতো** কিনতে চান ?
তাহ'লে বাড়ির ছোটোবড়ো সবাইকে নিয়ে
চলে আসুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
তপশীলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের
কলকাতার কেন্দ্রীয় বিপণিতে,
২৪৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের দোতলায়
অথবা

আপনার সুবিধামতো নিচের যে-কোনো জায়গার বিক্রয়-কেন্দ্রে ঃ
আমিনবাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ; বসিরহাট (২৪-পরগণা) ; ডোমজুড় (হাওড়া) ; মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, আসানসোল (বর্ধমান) ; বড় মসজিদ, সিউড়ি (বীরভূম) ; মাচানতলা, বাঁকুড়া ; বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং) ; মালদা। এছাড়া, আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) ; বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) ; কোচবিহার ও খড়গ্‌পুর (মেদিনীপুর) শহরে শিগ্‌গিরই আরও বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

জুতো ছাড়াও এই সব বিক্রয়-কেন্দ্রে পাবেন তপশীলী জাতি ও আদিবাসী ভাইবোনদের তৈরী চামড়ার ও কাঠের রকমারি জিনিস ; মাদুর ; বুরুশ ; আর সুতী, পশম, রেশম, এণ্ডি ও তসরজাত নানা দ্রব্য।
এগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ
বাজারের তুলনায় দাম কম * গুণে সেরা * মনোরম ডিজাইন * টেঁকসই * দেখতে ভালো।

তপশীলী জাতি ও আদিবাসী ভাইবোনদের তৈরী
জিনিস কিনুন। এঁদের কল্যাণকর্মে সহায়তা করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই পি আর ৬৪৯৪।৭৮

সকল প্রকার ছাপার জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি, নেপালী ও বাংলা লাইনো।

ভারতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৫, মহেন্দ্র সরকার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

ফোন : ২৬-৫৯২৯

ঠিকাদার এবং সাব-কনট্রাকটরদের অর্থ প্রদানের সময় কর কেটে নিতে ভুলবেন না

আয়কর আইন অনুযায়ী

● কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্যসরকার, কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আইনানুগভাবে গঠিত কোনো কর্পোরেশন, কোনো কোম্পানী কিম্বা কোনো সমবায় সমিতির সঙ্গে ৫ হাজারের বেশি টাকা মূল্যের কোন চুক্তি অনুযায়ী কৃত কোনো কাজের জন্য, ঠিকাদারকে দেয় অর্থের থেকে ২ শতাংশ হারে আয়কর কেটে রাখতে হয়।

● যে ঠিকাদার কোনো ব্যক্তি-বিশেষ বা হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত নন, সেইরকম কোনো ঠিকাদারের সঙ্গে কোনো উপ-চুক্তি অনুযায়ী ৫ হাজারের বেশি টাকা মূল্যের কোনো কাজের জন্য সাব-কনট্রাকটরকে টাকা দেবার সময় ১ শতাংশ হারে আয়কর কেটে রাখতে হয়।

● ঠিকাদার/সাব-কনট্রাকটরের আমানতে, বা নগদে কিম্বা চেক/ড্রাফ্‌টে (যেটাতে তাড়াতাড়ি হয়) টাকা দেবার সময়েই উপরিলিখিত হারে আয়কর কেটে রাখতে হয়।

● আয়কর এই ভাবে কেটে রাখার পর, আয়কর আইন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতে জমা করুন।

নিয়মিত ভাবে আয়কর কাটা ও তা জমা দেবার বিধিবদ্ধ শর্ত লঙ্ঘন করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্‌স অ্যাণ্ড পাবলিককেশান)
ইনকামট্যাক্‌স ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

·78/155/Bengali

৪৩ বর্ষ। ভাদ্র ১৩৮৫। পঞ্চম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গট-পরিবর্তন

প্রবল বৃষ্টিপাতের পর বন্যা। ফলে মানুষের প্রাণ-হানি, গবাদি পশুর বিনষ্টি, শস্যহানি, ঘর-বাড়ির ভগ্ন-স্তূপ, রাস্তা-ঘাট, রেল-সড়ক, গ্রাম-সহরে প্লাবন। দিনের পর রাত্রির মত বছরের পর বছর ক্লান্তিহীন বন্যাচক্র দেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিপন্নদের উদ্ধারকার্য, ত্রাণ-সাহায্যের হুটোপুটি পড়ে যায়। নৌকা চাই, স্পীড্ বোট চাই, আকাশ-পথে জলবন্দী মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেবার জন্য বিমান চাই, হেলিকপ্টার চাই। বন্যার ব্যাপকতা যত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তার সঙ্গে তাল রেখে বিপন্ন জলবন্দী মানুষদের উদ্ধারের কাজে সেনাবাহিনীর সাহায্য অনিবার্য হয়ে পড়ে, বিমান বাহিনীরও। এবারকার বন্যার তাণ্ডব সেই মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সুরু হয়েছে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পাঁচটি বন্যার ঢেউ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দিয়ে বয়ে যাবার ফলে ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা-প্রশাখাগুলিতে উনিশটি ভাঙনে আসামের উচ্চভূমি এলাকার রাস্তাঘাট যাতায়াতের পথ প্লাবিত করে দেয়। বন্যার পঞ্চম ঢেউটি গড়িয়ে আসে ২৮শে জুলাই এবং এই ঢেউয়ে দুইজনের প্রাণহানি হয়।

জুলাই-এর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বন্যার ব্যাপকতা গঙ্গার অববাহিকা অনুসরণ করে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাংলায় বন্যার প্রকোপ বিধ্বংসী রূপ নিয়েছে। এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র, বন্যার আবর্তে বন্দী হয়েছে। দিল্লীর চতুষ্পার্শে বন্যার পীড়ন সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে। সরকারী হিসাবে সাতটি রাজ্যে বন্যার ব্যাপক বিস্তার প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে। ৭৬ লক্ষ হেক্টর জলমগ্ন জমির ৪১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল নষ্ট হয়েছে। ফসল, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাটের মোট ক্ষতির পরিমাণ ৯২.৯৩ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক বন্যায় প্রাণহানির হিসাব পাওয়া যায় (৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ঃ ১১টি রাজ্য ও দিল্লীতে মোট ১০২৩ জন। উত্তর প্রদেশে ৬৪০ জন, বিহারে ২৬৬ জন, হিমাচল প্রদেশে ১৪১ জন, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্রে ২২ জন। উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখায় প্লাবনের ফলে বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, পুরী ও কটকে বন্যার প্রকোপে সেনাবাহিনীর নৌকাযোগে উদ্ধারকার্য চলেছে। বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ বিচ্ছিন্ন হবার ফলে বিমান থেকে সেখানকার জলবন্দী মানুষদের খাবার প্যাকেট সরবরাহ করতে হয়েছে। ১২ জনের প্রাণহানি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে গঙ্গার নিম্নবর্তী অঞ্চলে প্লাবনের প্রকোপ সুরু হয়। ২৭শে জুলাই থেকে আবার জলস্ফীতি সুরু হয়ে ২০শে আগস্ট

১৯৪৮ সালের সর্বোচ্চ জলস্ফীতি পরিমাপের মাত্র ১ মিটার নীচু পর্যন্ত ফারাক্কায় জলের উচ্চতা এসে দাঁড়ায়। তারপর থেকে জলের মাত্রা আবার নিম্নগামী হতে থাকলেও বিপদসীমা ছাড়িয়েই জলের স্ফীতি অব্যাহত রয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় বন্যার প্রকোপে ক্ষতির পরিমাণ রাজ্যসরকার ৩০-৪০ কোটি টাকার মত এবং ফারাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল বাঁধের জন্য ১৪২ কোটি টাকার সবে-মাত্র হিসাব করে উঠেছেন এবং সবটাই কেন্দ্রের কাছে চাইবেন ঠিক করেছেন এমন সময় ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলা বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরে প্রবল বন্যার জোয়ারে দশ লক্ষ মানুষের বিপর্যয়-সংবাদ পাওয়া গেল। বাঁকুড়ায় ১৩ জনের প্রাণহানির সংবাদও এলো। আশঙ্কা করা যাচ্ছে মেদিনীপুরে ১৫,০০০ মানুষ বন্যার জলে ভেসে গেছে। কংসাবতী, শিলাবতী নদীর জলস্ফীত স্রোতে কয়েক শ' মানুষের মৃতদেহ ভেসে যাবার সংবাদ পুলিশ-সূত্রে জানা যায়। মেদিনীপুর সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, কেশপুরে বহুগ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মানুষরা নিখোঁজ। ঘাটাল, ঝাড়গ্রামও বিপর্যস্ত। এই অঞ্চলগুলিতে ২০০০ গ্রামের প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ বিপন্ন। পাঁশকুড়া মহকুমার অবস্থাও তথৈবচ।

হুগলীর আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল জলমগ্ন। আরামবাগের নিকটবর্তী দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধের চারটি ভাঙন দিয়ে জল ঢুকে আরামবাগ শহরকে জলমগ্ন করেছে। আরামবাগ মহকুমায় ৫০,০০০ পরিবার বিপন্ন।

বাঁকুড়া জেলার . বাঁকুড়া, ওন্দা, তালডাংরা, সিমলাপাল, রায়পুর, সোনামুখী, পাত্রসায়র, ইন্দাস, বিষ্ণুপুর থানাগুলি বন্যাক্রান্ত।

জুলাই-এর বন্যার ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান হচ্ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষাদলের উদ্যোগে। তাদের নেতা কে. কে. শ্রীবাস্তব। শ্রীবাস্তবের কাছে রাজ্য-সরকারের দাবী ১৮.২৭ কোটি টাকার সাহায্য। যার ৮.৭৯ কোটি টাকা দিয়ে সড়ক ও বাঁধ মেরামতের কাজ নিষ্পন্ন হবে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়হুড় করে হাজির হ'লো মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-হুগলীর ১লা সেপ্টেম্বরের বিধ্বংসী বন্যা। কংসাবতী ও দামোদর বাঁধের জমা জলের চাপ কমাবার জন্য এই দুই বাঁধেই জল ছাড়তে হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বাঁধের জলের প্লাবন—এই দুইয়ে মিলিয়ে এদিককার বন্যার বেগ বাড়িয়েছে। কংসাবতী বাঁধ থেকে ছাড়া হয় ১ লক্ষ ৮০ হাজার কিউসেক জল আর দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের পাঞ্চেত ও মাইথন বাঁধ থেকে ছাড়া হয় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার কিউসেক জল। বাঁধগুলির উভয় সঙ্কট। খবার সময় জমানো জল ছেড়ে যেমন সেচের কাজে সহায়তা হয়, তেমনি অতিবর্ষণের ফলে বাঁধ-উপচে জল জমলে, বাঁধ বাঁচাবার জন্য জল ছাড়লে অতিবর্ষণ ও বাঁধের জল—এই দুইয়ে মিলে প্লাবন সৃষ্টি করে।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রী সুরজিৎ সিং বারনালা ৩১ আগস্ট লোকসভায় ঘোষণা করলেন গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঙ্গার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০৪৩ কোটি টাকার পরিকল্পনা রচনা করেছেন। বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর আসন্ন নেপাল পরিভ্রমণের সময় নেপালের সর্বোচ্চ মহলের সঙ্গে এ-সম্পর্কে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেন, কারণ নেপালই বন্যার উৎপত্তি-স্থল। আর তার অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার বন্যার সরেজমিনে খতিয়ানের সমীক্ষকদলের উপস্থিতিতেই প্রবলতর বন্যার প্রকোপ

দেখা দিল। মুস্কিল এই যে বিপদ ঘাড়ে চেপে বসলে পার্লামেন্টে হৈ চৈ পড়ে যায়। সরকারী মহল তৎপর হয়ে ওঠেন এবং তারপর সবই থিতিয়ে যায়।

আগামী পাঁচ বছরে বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য পরিকল্পনা খাতে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গত ২৭ বছরে এ-বাবদ ব্যয় করেছেন ৬৩০ কোটি টাকা। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রলয়ঙ্কর যাত্রাপথে পরিকল্পনা-সম্মত অবরোধ সৃষ্টি করে বন্যার নিষ্ঠুর বার্ষিক পরিণতি থেকে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহলে জাতীয় কল্যাণের একটি প্রকাণ্ড পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এবার ৮টি রাজ্যে ৩৪৫ লক্ষ মানুষ বন্যাক্রান্ত হয়েছেন।

কিন্তু এই বিধ্বংসী বন্যায় আর্ত মানুষের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থাপনায় দলীয় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। রাজনীতির রঙ দিয়ে আর্ত মানুষকেও রাঙিয়ে তুলবার মানসিকতা, মানুষকে সেই আদিম ট্রাইব্যালিজমের অন্ধকার যুগে টেনে নিয়ে যায়। পশ্চিম বাংলার সরকারী দলের প্রবলতম শরিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন আপর এক শরিকের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিটি মন্ত্রীও বটে! আর, এস, পি-র সদস্য পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জি মালদা ও মুর্শিদাবাদের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিভ্রমণ করে শনিবার ২৬শে আগস্ট ক'লকাতায় ফিরে বলেন যে, মালদায় কুম্ভীরার এবং মুর্শিদাবাদের সুতী ও ফারাক্কার বন্যাপীড়িতদের কাছ থেকে ত্রাণ-বণ্টনে 'পক্ষপাতিত্বের' অভিযোগ পেয়েছেন। মালদা থেকে জনতা পার্টির বিধানসভার সদস্য বীরেন মৈত্রও এই ধরনের অভিযোগ করেছেন। শাসকদলের বাহিনীদের নিজেদের কোলে ঝোল টানবার রেওয়াজ কোনো নূতন ঘটনা নয়। অতীতেও যারাই শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা কম-বেশী সেই ক্ষমতার ব্যবহার করে দলতুষ্টির জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আজকাল এই চেষ্টাকে প্রায়ই জোর-জবরদস্তির পর্যায়ে উন্নীত করা হয়ে থাকে। যেন এটা তাদের জন্মগত অধিকার—'বার্থ-রাইট'।

মানুষের নিরাপত্তা বোধ ক্রমশঃ বিপর্যস্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অনেক ঘটনা এই পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বা কেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যেই নানা ঘটনা এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি টেনে নিয়ে যাবে। দিল্লীতে নৌবাহিনীর অফিসার চোপরার ১৯ বছর বয়স্কা কন্যা গীতা ও ১৭ বছর বয়স্ক পুত্র সঞ্জয়ের শোচনীয় হত্যা নিরাপত্তাবোধের অভাবের চরম অভিব্যক্তি। তেমনি ক'লকাতা ও আশপাশের সাম্প্রতিক অনেক খুনের ঘটনা মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কি পরিমাণে বিপর্যস্ত হয়েছে তারই সাক্ষ্য বহন করে। পশ্চিম বাংলায় নিরাপত্তাবোধের আলোচনায় শাসকদের কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে বলেন অন্যান্য সকল রাজ্যের চাইতে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভাল। এই তুলনাটা অনেক মানুষেরই বুদ্ধির অগম্য। বেলঘরিয়ার মাটি খুঁড়ে সম্প্রতি কয়েকটি মৃতদেহ আবিষ্কারের সঙ্গে যে নৃশংস হত্যার কাহিনী জানা গেছে, সে ঘটনা সত্যঘটা না হ'লেও তার নৃশংসতার কোনো ঘাটতি নেই। আবার দিল্লীর চাইতে কলকাতার পরিস্থিতি ভালো—এই যুক্তিও অন্তঃসারশূন্য। হরিজন পীড়ন-নিধনের তুলনা-মূলক সংখ্যা দিয়ে চরণ সিং তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীত্বের আমলে হরিজনদের উপর অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচারের সাফাই দিতে গিয়ে লোকসভার সদস্যদের ধিক্কার কুড়িয়েছিলেন। আসলে তুলনাটা হয় মানবিকতার সঙ্গে পাশবিকতার।

পাশবিক আচরণের পরিমাণ কম হলেও সে আচরণ পাশবিকতার অপরাধ থেকে মুক্ত হয় না, মানবিক আচরণে উন্নীত হওয়া তো দূরস্থান। তেমনি হিংস্রতার এক ফোঁটা, কিম্বা দুই ফোঁটা যদি ঘাটতিও পড়ে, আখেরে তার পরিচয় হিংস্রতার স্তরকে অতিক্রম করতে পারবে না। তা হিংস্রতার রকমফেরই রয়ে যাবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের বৃথা এই স্পর্শকাতরতা। এ-ও এক ধরণের দুর্বলতা, যাকে আত্মপ্রবঞ্চনাও বলা যেতে পারে। নিঠুরকে নিঠুর না বলে মধুর বললেই কী আর তার স্বাদ মিষ্টি হবে? বিপদ যে পথে-ঘাটে আত্মগোপন করে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের যিনি প্রমুখ সেই মুখ্যমন্ত্রীকেই গত ২৬ শে আগস্ট শনিবার নিখিল ভারত মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেসের পূর্বাঞ্চলীয় সড়ক পরিবহন কনভেনশনের উদ্বোধনী ভাষণে বলতে শোনা গেছে ঃ "it was no good arresting highway robbers and murderers after they had committed the crime",—'খুন ও মারধর করবার পর সড়ক-দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করে ফল পাওয়া যায় না, ট্রাক-চালকদের নিরাপত্তার জন্য সড়কের পুলিশ-প্রহরা তীব্রতর করতে হবে।' এই আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে বিধানসভায় ১লা সেপ্টেম্বর বিরোধী সদস্যদের মুলতুবী প্রস্তাব গ্রাহ্য না হওয়ায় তাদের সভাকক্ষ ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানাতে হয়। শাসকদলের প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, বিরোধীদলকে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ দিলে, সেই প্রস্তাব আলোচিত হবার পর শাসকদল বিপুল ভোটাধিক্যে তাকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন—তাতে গণতন্ত্রের সম্মানই বজায় থাকতো, আকাশ ভেঙে পড়তো না।

হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী ডি কে বিশ্বাস হুগলীর খানাকুল থেকে রেডিওগ্রাম করে ৪ঠা সেপ্টেম্বর জেলার সদর দপ্তর চুঁচুড়ার জানিয়েছেন 'এ-বন্যা নয় মহা-প্লাবন' ঃ 'a deluge, not a flood'। কারণ খানাকুল তখন পাঁচ থেকে দশ ফুট জলের তলায়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সিভিল ডিফেন্স-এর ডিরেক্টর শ্রীগোলক মজুমদার হেলিকপ্টারে ঘাটাল পৌঁছে দেখলেন একতলা দালানগুলি সব জলের তলায়। ঘাটালের হাসপাতালের রোগীরা দোতলার ছাদে আশ্রয় নিয়েছে। ঘাটাল তখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ঘাটাল মহকুমার ৬ লক্ষ মানুষের অবস্থা কি তা কেউ বলতে পারে না। বিমানবাহিনীর সেনারা ঘাটালের ছাদের এবং গাছের ওপর বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় নিতে দেখেছেন। ১৯৭৭ সালে বন্যায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণনাশ এবং ১,১২০ কোটি টাকার ধনসম্পদের বিনষ্টির অনেকটা অন্ধ্র এবং তামিল নাড়ুতে ঝড়ের জন্য ঘটেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে দামোদর এবং কংসাবতীর বাঁধ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে এবারকার প্রলয়ঙ্কর প্লাবন ঘটে গেল। পশ্চিম বঙ্গের সেচমন্ত্রী বলেছেন বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সময় মত সতর্ক করে বলা হয়েছিলো —'timely warning'—কংসাবতীর বাঁধ থেকে অনতবিলম্বে জল ছাড়া হবে, সংশ্লিষ্ট সকলকে যেন সাবধান করেদেওয়া হয়। বাঁধের জল ছাড়বার এই আসন্নতার সংকেত মহকুমা-স্তরের অফিসারদের জানানো হয়েছিলো কি না সেচ-মন্ত্রীর তা জানা নেই।

তবে কী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলীর প্লাবন মনুষ্যসৃষ্ট? কংসাবতী ও দামোদরের বাঁধে অতিরিক্ত বর্ষণের জমা জলের চাপ থেকে বাঁধ-রক্ষার তাগিদে অপরিমিত বাঁধের জল ছেড়েই কি এই প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে? আর সেচমন্ত্রী আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সময়মত সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তা কী কেউ গ্রাহ্যও করলো

না। সুতরাং এ নিয়ে অনিবার্যভাবে ঝড় উঠবেই। প্রশাসনিক স্তরগুলিতে পারস্পরিক সহযোগিতাই বা কতটুকু—এ প্রশ্নও উঠবে। বিধানসভায় এই প্রলয়ংকর ঘটনা নিয়ে আলোচনারও দাবী উঠবে। এটা কোনো দলীয় প্রসঙ্গ নয়, রাজ্যের সকল মানুষের আর্ত-জিজ্ঞাসা জড়িয়ে আছে এই ঘটনার সঙ্গে। তাই সরকারকে, প্রশাসনকে, খোলামন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ সকলের গোচরে আনবার জন্য। আর ত্রাণ, পুনর্বাসনের কাজে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের সংহতির প্রতীকী সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। দলীয় সংগঠন নয়, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতার মূল্যে এই ধ্বংসের উপর নূতন ক'রে গড়বার কাজে উদ্যোগী হতে হবে।

কিন্তু দণ্ডকারণ্য প্রত্যাগত হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের যারা সকল প্রকার সহায়তা বন্ধ ও পুলিশের গুলিতে মৃত্যুপথযাত্রী করে এবং সর্বোপরি জবরদস্তি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়নের জন্য বলপ্রয়োগের সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা যারা নির্মম হস্তে পাকা করতে পারেন, তাদের কাছ থেকে 'মানবিকতার মূল্যে ধ্বংসের উপর নূতন ক'রে গড়বার কাজ' আশা করা যেতে পারে কী? সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকা মরিচঝাঁপি থেকে বিশ হাজার দণ্ডক উদ্বাস্তুদের জোর করে হাসনাবাদে তুলে আনবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯শে আগস্ট বিশটি লঞ্চ; বন্দুক, কাঁদুনে গ্যাস ও বক্ষস্ত্রাণ সমেত বিরাট পুলিশবাহিনী ও জেলা হাকিম, জেলা পুলিশের কর্তা, মহকুমা হাকিম ও অন্যান্য পদস্থ অফিসারদের পাঠিয়ে যুদ্ধকালীন অবরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই ভীতি-প্রদর্শনে কাজ হয় নাই। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা সাফ বলে দিয়েছেন, "আমরা যাবো না, যাবো না"। কিন্তু না ভারত সরকার, না পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ পর্যন্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করলেন না, ১৩।১৪ বছর দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ভিটে-মাটি ছেড়ে প্রায় এক লক্ষ বাস্তুহারা গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনে বসতির জন্য চলে এলো কেন? বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রভাবশালী শরিকদের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে প্ররোচনার যে অভিযোগ মাঝে মাঝেই প্রবলভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তারই বা কিনারা হবে কি ভাবে?

কোন্ সমস্যারই বা কিনারা হবে? গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো দলীয়-শাসনের দিকে বাঁক নিলে পরিণতিতে একতান্ত্রিক কাঠামো আত্মপ্রকাশ করবেই। যার অপর নাম স্বৈরশাসন।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সমস্যার কথাই ধরা যাক না কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিনীতিটার স্বরূপ কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি-নীতির অন্তিম লক্ষ্য কী ভূমি-জাতীয়করণ, না কৃষকদের ভূমির মালিকানা অর্থাৎ—nationalisation of land অথবা peasant proprietorship। এ নিয়ে তাদের মনকে চোখ ঠারবার প্রয়োজন নেই, তারা সরাসরিই কবুল করতে পারেন। অথবা তাঁরা এ কথাও বলতে পারেন তাঁরা আপাতত কৃষকদের মালিকানা বরদাস্ত করবেন কিন্তু অন্তিম লক্ষ্য ভূমির জাতীয়করণ। কিন্তু তাঁদের নীতিটা ধোঁয়াটে, মনে হয় তাঁরা বলতে চান: 'দুধও খাবো, তামাকও খাবো'। ১৫ই আগস্টের সংবাদপত্রে দেখা যায় শাসকদলের প্রমুখ নেতা বলছেন জমিচাষ নিয়ে যেখানে জমির মালিকের সঙ্গে বর্গাদারের বিরোধ বাধবে সেখানে শাসকদলের বড় শরিক বর্গাদারের পক্ষ নেবেন। সেই একই দিনে শাসকদলের প্রমুখ সরকারী মুখপাত্র মুখ্যমন্ত্রী বলছেন: 'জোর

করে জমি দখল তাঁর সরকার বরদাস্ত করবে না। আইনের শাসন মেনে চলাই তাঁর সরকারের নীতি।' আসলে বড় শরিকের মুখ্য নেতা যখন বলেন 'জমির মালিকের সঙ্গে বর্গাদারের বিরোধ বাধলে তাঁদের পার্টি বর্গাদারের পক্ষে থাকবেন' তখন বুঝতে হবে তাঁদের ভূমি-নীতির অন্তিম লক্ষ্য বর্গাদারকে জমির মালিকে রূপান্তরিত করা। কিন্তু এই নীতি যে আসলে 'রামেরটা কেড়ে নিয়ে শ্যামকে দেওয়া' তা বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। আখেরে 'এক দরিদ্র মানুষেরটা কেড়ে নিয়ে আর এক দরিদ্র মানুষকে দেওয়া'য় বাহাদুরী কিছু নেই, দারিদ্র্যের বিতরণ ছাড়া—'distribution of poverty'-তেই এই নীতি পৌঁছাবে। আর একটু তলিয়ে দেখলেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ১৯৬১র সেন্সাস অনুযায়ী কৃষকদের শতকরা ৩৪ ভাগ হয় একেবারে নিছক বর্গাদার, না হয় তাদের মধ্যে কিছু জমির মালিকও বটে এবং তারাই আবার বর্গাদারও বটে। এই শতকরা ৩৪ ভাগের মধ্যে যারা নিছক বর্গাদার, তাদের সংখ্যা এদের শতকরা ১৩·৪ ভাগ। আর যারা এদের মধ্যে জমির মালিকও বটে, বর্গাদারও বটে তাদের সংখ্যা মোট শতকরা ৩৪ ভাগ কৃষকদের মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৭ সালে যে ভূমি সংস্কার সংশোধন আইন পাশ করেছেন তার লক্ষ্য কৃষকদের জমিতে (১) দিনমজুরকে বর্গাদারের স্বীকৃতি দেওয়া এবং (২) পরোক্ষভাবে জমির উচ্চসীমা কমিয়ে দেওয়া। কারণ আইনটির বয়ানে রয়েছে : "A person lawfully cultivating any land belonging to another person shall be presumed to be a Bargadar." সে যে বর্গাদার নয়, তার প্রমাণের দায় জোতদারদের। প্রশ্ন ওঠে, যে-চাষী একই সঙ্গে কৃষক-মালিক ও বর্গাদার, তার মালিকানায় যে জমি রয়েছে, সেজন্য 'জোতদার'-এর অপবাদে অপরাধী হবে এবং সে-জমি চাষের জন্য কোনো কৃষি-মজুরের সাহায্য নিলে, সেই কৃষি-মজুরকে 'বর্গাদার'-এর স্বীকৃতি দিতে হবে। সুতরাং, এই সরকারের ভূমি-নীতিতে শুধু যে স্বল্পজমির কৃষকের সঙ্গে বর্গাদারের বিরোধ বাধবে তা নয়, বর্গাদারের সঙ্গেও বর্গাদারের বিরোধ বাধবে। বর্গাদারের সঙ্গে বর্গাদারের বিরোধে শাসকদল কোন্ বর্গাদারের পক্ষ নেবেন তারও পরীক্ষা হয়ে গেছে পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট শাসনের আমলে। যে-বর্গাদারেরা দলীয় পতাকা বহন করেন, তাদের পক্ষই শাসকদল গ্রহণ করবেন—বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে এই নীতির অন্তঃসলিলা সংঘাত ব্যাপক বিস্ফোরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনবে কিনা সেটাই আজকের ভয়ঙ্কর সমস্যা। সম্প্রতি বীরভূম জেলার নানুর থানার কড়েয়া গ্রামে শাসকদলের এই ভূমি-নীতির প্রয়োগের ফলে ৪০০০ গ্রামবাসী ৪০০ বিঘা জমিতে চাষ করতে পারে নাই। এই নীতির প্রয়োগ ভূমি-সংস্কারের পরিবর্তে ভূমি-সংকটের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। দলীয় নীতি অপ্রতিহতভাবে ভূমিতে প্রসারিত করবার সুবর্ণ সুযোগ দেখা দেবে, ভূমির মালিকানা যদি রাষ্ট্র গ্রহণ করে—রাষ্ট্রের নামে দল ভূমির একচ্ছত্র অধিকার ভোগের সুযোগ পাবে।

ভূমি-সংক্রান্ত আর একটি প্রশ্নও ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। কলে-কারখানায় যে কাজ করে, তার বৃত্তির নিরাপত্তা, মজুরীর সুনিশ্চিতির জন্য আইনের বিধান রয়েছে। জমির চাষী যে, তার পরিশ্রমের ফসল অপরে কেড়ে কিম্বা কেটে নিয়ে গেলো, তার জমি বেহাত হয়ে রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে

গেলো, সে-ক্ষেত্রে তার শ্রমের, ফসলের, জমির, বৃত্তির নিরাপত্তার সুনিশ্চিতি থাকবে না কেন ? আইন করে তাকে এই নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হবে না কেন, এই প্রশ্ন আজ প্রবল হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ছয় বছর পূর্বে জমির উচ্চ-সীমার চূড়ান্ত সুপারিশ করলেও এখনও সে সম্পর্কে কোনো কোনো রাজ্যসরকারের ঢিলে-ঢালা ভাব কাটেনি। ১৯৭৭ সালে ২ নভেম্বর প্রায় ৭ বছর পর কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী এস, এস, বারনালার নেতৃত্বে সেন্ট্রাল ল্যাণ্ড রিফর্মস কমিটির বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে স্থির হয় পাঁচ বছর পূর্বে জাতীয় পর্যায়ে জমির যে চূড়ান্ত উচ্চসীমা স্থির করা হয়েছে তাকে আর বাড়ানো হবে না। এছাড়া দেশে ৫৩ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি উদ্বৃত্ত থাকলেও, রাজ্যসরকারগুলি মাত্র ৪০ লক্ষ একর জমি উদ্বৃত্ত ঘোষণা করেন এবং তার মধ্যে ২১ লক্ষ একর গভর্ণমেণ্টগুলির দখলে গেলেও ষষ্ঠ পরিকল্পনার দলিলে দেখা যায় মাত্র ১২ লক্ষ একর জমি শেষ পর্যন্ত বিলি হয়েছে। যে উদ্বৃত্ত জমি বিলি করা হবে তার পরিমাপ অর্থপ্রসূ হওয়া চাই। কারণ কোনো কোনো রাজ্যে অর্ধ একর জমি বিলি হয়েছে যা চাষ করা যাবে না। কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কমিটির সেই সভায় জানা যায় কোনো কোনো রাজ্যে তখনও বেনামী জমি হস্তান্তর অবাধে চলছিল যা অবিলম্বে রোধ করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ভূমি সংস্কার আইনের আওতায় চাইতে পূর্বেকার জমিদারী বিলোপ আইনের আওতায় অনেক বেশী বেনামী জমি উদ্ধার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট বেনামী জমি উদ্ধার হয়েছে (জুন, ১৯৭৮) ৯ লক্ষ একর তার মধ্যে ৭ লক্ষ একরই জমিদারী বিলোপ আইন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক ভূমি সংস্কার আইনে ২ লক্ষ একর।

পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যুতের সঙ্কট সারা দেশের সঙ্কটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও রাজ্য সরকারের ত্রুটী কোথায়, সে-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রী পি রামচন্দ্রন গত ২১শে আগষ্ট ১১টি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের শক্তি মন্ত্রীদের সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার গ্যাস টারবাইন ক্রয় নিয়ে প্রায় এক বছর যাবৎ আলোচনা করছেন কিন্তু কোন্ প্রস্তুতকারক থেকে কিনবেন তা এখনও ঠিক করতে পারেন নাই। তাই কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রী সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রকে বলেন : "Within a week of your deciding on the manufacturer from whom you wish to buy"—আমদানী লাইসেন্স দেওয়া হবে। ৫টি টারবাইনে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৫,৮০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধির তুলনায় পূর্বাঞ্চলের বরাদ্ধ রয়েছে মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র পূর্বাঞ্চলের বিহার ও পশ্চিম বাংলার প্রতি অধিকতর সুব্যবস্থার আশা প্রকাশ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামচন্দ্রন বলেন পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল : I do not think West Bengal has adequate transmission lines to reach the remote corners of the State." মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! শক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলুল রহমান গত ২৫শে অগাস্ট কলকাতায় বলেছেন ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১৮,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন। ফলে, দেশের মোট বিদ্যুতের যোগান দাঁড়াবে ৪৪,৫০০ মেগাওয়াট। ১৯৮২ সালের মধ্যে এই কর্মসূচী সম্পূর্ণ হলে বিদ্যুতের

ঘাটতি সম্পূর্ণ মেটানো যাবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ঘাটতি মিটতে আরও ৪ বছর চাতকের মত চেয়ে থাকতে হবে।

এদিকে জনতার জট খোলা তো দূরস্থান, সাময়িক বিরতি ঘটেছে মাত্র। রাজ্যসভায় ১০ই আগস্টে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী চেয়ারম্যান জাস্তি ২৯শে আগস্ট দেশাই ও চরণ সিং-এর পরিবারভুক্তদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য ১৫-সদস্য বিশিষ্ট কমিটী গঠন করতে অস্বীকার করেন, কারণ সরকার সেদিনকার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। এ-নিয়ে রাজ্যসভায় ঝড় উঠেছে। ২৩শে আগস্ট তারিখে ৩৫৫-০ ভোটে ৪৫তম সংবিধান সংশোধন বিল, নূতনভাবে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন আইন নামাঙ্কিত হয়ে লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু রাজ্যসভায় বিলের পাঁচটী ধারা—ধারা নং ৮,৩৫,৪৪,৪৫, এবং ৪৭—বাতিল করে সংশোধিত বিলটী ১৮২—১ ভোটে ৩১শে আগষ্ট গৃহীত হয়ে লোকসভায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। রাজ্যসভার সংশোধনে (১) শিক্ষা ও বন যৌথ তালিকায় রয়ে গেলো (২) সংবিধানের মৌল-কাঠামে পরিবর্তনের জন্য গণভোট বাতিল (৩) 'সেকুলারিজম' ও 'সোস্যালিজম' ব্যাখ্যার চেষ্টা বাতিল (৪) ৪২-তম সংশোধনে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা বজায় রইলো (৫) ৪২তম সংশোধনে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ওপর ডিরেকিটভ প্রিন্সিপ্যালস-এর প্রাধান্য বজায় রইলো। জনতা সরকার, এর মাত্র তিন দিন আগে ২৮শে আগস্ট তারিখ দলত্যাগ বন্ধের উদ্দেশ্যে লোকসভায় ৪৮-তম সংবিধান সংশোধন বিল এনে নিজের দলের প্রমুখদের এবং বিরোধীদের সমবেত প্রবল বিরোধিতার মুখে বিলটি উত্থাপন করতেই ব্যর্থ হন। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র বিলটি উত্থাপন করতে গিয়ে বিরোধিতার তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে বিলটী প্রত্যাহার করে নেন। নিজের দলের সাধারণ পরিষদে বিলটী আলোচনার পর সদস্যদের সম্মতি সাপক্ষে কেন উত্থাপিত হ'লো না, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অগণিত "সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও শাসকদলের এই শোচনীয় পশ্চাদপসরণ" বোধহয় নজীরহীনভাবে লজ্জাজনক।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পদ বিতরণের সীমানা নিয়ে গত নভেম্বর মাস থেকে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিতর্ক তুলেছেন, যে পথে তিনি অনেকটা সফল হয়েছেন বলা যায়, যদিও সংবিধান সংশোধন করে কেন্দ্র কর্তৃক আহরিত সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ রাজ্যগুলির ভাগে তুলে দেবার দাবী গ্রাহ্য হওয়া এখনও অনেক দূরের পথ। এ-দাবী গ্রাহ্য হবেনা ধরে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু ইতিমধ্যে রাজ্যের ভাগে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী প্রায় সব কয়টী রাজ্যই উত্থাপন করেছেন। অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ, যিনি পরিকল্পনা কমিশন এবং সপ্তম অর্থ কমিশনের সদস্য, তো বলেই দিয়েছেন মোট সংগৃহীত সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিত। তাছাড়া গ্যাড্‌গিল ফর্মুলারও পরিবর্তনের জন্য তিনি বলেছেন। গত ২১শে আগস্ট ন্যাশন্যাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য গত মার্চে গঠিত কমিটির বৈঠক সুরু হয়েছে। এই কমিটীর তিনটী বৈঠকের পর কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের এবং রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণের সুপারিশ করবে। মার্চ মাসের বৈঠকে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্ক, ঝড় তুলেছিলো। এবার পরিস্থিতি ভিন্নতর।

[শেষাংশ ৩২৭ পৃষ্ঠায়]

স্মৃতিকথন
ধারাবাহিক রচনা
কিস্তি—৮

যে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

সার চার্লস টেগার্ট তখন পুলিশ কমিশনার—ক'লকাতায় বৃটিশ-রাজের অধিকর্তা। সুভাষবাবু তখন স্বরাজ্য-সরকারে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। সার চার্লস বুঝতে পেরেছেন সুভাষবাবুর সঙ্গে গোপীমোহনের গোপন সম্পর্ক ছিল, যে গোপীমোহন তাঁকে হত্যা করতে গিয়ে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ করেছে।

এ-সম্বন্ধে টেগার্টের ধারণা বদ্ধমূল হতে বিলম্ব হয়নি। মামলার শেষে, ফাঁসীর হুকুম। ফাঁসীর পর গোপীমোহনের শবদেহ জেল থেকে কাঁধে বয়ে নিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। দাহ করবার সব ব্যবস্থা করলেন কেওড়াতলায়—সে কি আনুষ্ঠানিক কর্তব্য হিসেবে, না অন্য কোনোও টানে ?

টেগার্ট, এর পর আর স্থির থাকতে পারলেন না। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। যে করেই হোক সুভাষচন্দ্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ক'লকাতার শাসন কার হাতে, তা তিনি বুঝিয়ে দেবেন, কংগ্রেসের ঐ চুনোপুঁটী কর্মকর্তাকে।

সুযোগ জুটে গেল কয়েক মাসের মধ্যেই। সেই বছরই, পুজোর ছুটির পর। একটু একটু শীত পড়ছে, কুয়াশাও মাঝে মাঝে দেখা যায় ভোরবেলায়।

তখনো কলকাতার পথে পথে ভোরবেলা জল দেওয়ার রীতি ছিল। কর্পোরেশনের লোকেরা ভোরবেলা মোটা হোস-পাইপ কাঁধে নিয়ে, রাস্তার জলের কল খোলার 'চাবি' হাতে করে ছুটতো সহরের পথে পথে। চট্‌পট্ পাইপের মুখে জুড়ে দিত ক্যানভাসের 'হোস', তারপরই চাবি ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দিত জলের ফোয়ারা, রাস্তার এদিক-ওদিক। রাস্তার ধুলো ধুয়ে যেতো, আবহাওয়া স্নিগ্ধ হত, চলাচলে কত আরাম বোধ হত।

এমনি এক প্রত্যুষে, এক বিরাট ত্রিতল অট্টালিকার উত্তরে, পার্ক ষ্ট্রীটের এক ফুটপাথের পাইপ খুলে জল ছড়ানো সুরু হয়েছে। রাস্তায় তখন তৃতীয় ব্যক্তি নেই, গাড়ী-ঘোড়ার চলাচলও তেমন সুরু হয়নি।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনের জল-দেওয়া কর্মীর হাত থেকে পাইপ পড়ে গেল, সে ধরাশায়ী, জলের রং হল লাল—রক্তগঙ্গা বয়ে গেল।

সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছুটতে ছুটতে চলে গেল আপিসে খবর দিতে। সেখান থেকে লোকজন এল অকুস্থলে, এল এমবুলেন্স—নানারূপ কর্মতৎপরতা সুরু হল।

প্রধান কর্মকর্তা সব শুনলেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁর নিজের কিছু করবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। পুলিশে খবর দিলেন। তাদের জানালেন, যতদূর জানা যায়, রাস্তার অপর দিকের বড় বাড়ীর তেতলা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। সুতরাং অবিলম্বে ঐ বাড়ীর যার যার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে তা জেমে সব জমা হোক্। কোন যন্ত্র থেকে গুলি করা হয়েছে তা বিশেষজ্ঞ দিয়ে নির্ণয় করে, হত্যাকারীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক্ ইত্যাদি।

কার্যতঃ কিছুই করা হল না। আলোচ্য গৃহের বাসিন্দা প্রতি তলাতেই বৃটিশ বা ইউরোপীয়। তাদের

প্রায় প্রত্যেকেরই বন্দুক বা রিভলবার রাখা ও ব্যবহারের অধিকার আছে। কোন্ তলা থেকে গুলি করা হয়েছে, তার নিশ্চিত প্রমাণ কোথায়? এত দেরীতে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়াও সহজ নয়—ইত্যাদি নানা অজুহাতে পুলিশের কোনও তদন্তেই আগ্রহ দেখা গেল না।

সুভাষচন্দ্র ছাড়বার পাত্র নন। সম্পূর্ণ বিনা দোষে, অতর্কিতে, কর্তব্যরত অবস্থায় যে কর্মী প্রাণ হারালো, সে দরিদ্র, নিরক্ষর সামান্য ব্যক্তি, কালা আদমী। তার জীবনের মূল্য? ঐ অট্টালিকাবাসী বিদেশীদের কাছে কাণাকড়িও নয়। সেজন্য খেলাচ্ছলে বন্দুক চালিয়ে কর্তব্যরত ব্যক্তিকে হত্যা করায়ও পুলিশের তৎপরতার প্রয়োজন বোধ হল না।

কিন্তু কর্পোরেশনের দায়িত্ব আছে। কর্তব্যরত অবস্থায় অতর্কিত হত্যার প্রতিবিধান করার ব্যবস্থা-সাধন পুলিশের অন্যতম কর্তব্য। তারা যদি এ-বিষয়ে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হন, তবে তাদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার দায়ে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সত্বর অভিযোগ আনা হবে। তা ছাড়া মৃত-ব্যক্তির অসহায় আত্মীয়-পরিজনের আর্থিক সাহায্যদানের দায়িত্বও ঐ অক্ষম, অনিচ্ছুক পুলিশ-বিভাগের উপরই বর্তাবে।

অতএব পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মৃত-ব্যক্তির পোষ্যদের কল্যাণে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ যথোচিত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি সত্বর এ-ব্যবস্থা না করা হয়, তবে পুলিশ তথা বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে কল্‌কাতা কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় আইন-সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

সুভাষচন্দ্রের এই অনমনীয় দৃঢ় সংকল্পে টেগার্ট সাহেবও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন; এবং এরই অন্যতম প্রতিশোধ হিসেবেই যে 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' প্রণয়ন এবং ১৯২৪ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখেই সুভাষচন্দ্র প্রমুখ ৭২ জন প্রাক্তন রাজবন্দীকে পুনরায় গ্রেপ্তার ও অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবাসের ব্যবস্থা, তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

অবশ্য, অন্য কারণও ছিল। সে কারণ সরাসরি গোপীমোহন সংক্রান্ত।

গোপীমোহনের ফাঁসীর পরই সহরময় গুজব রটানো হল, ওর কার্যকলাপের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। সুভাষচন্দ্রের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মীর নামের সঙ্গে এই গুজব ছড়ানো হল—অর্থাৎ ঐ অন্তরঙ্গ বন্ধুই যখন সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গোপীমোহন সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করছেন, তখন ও কথা অবিশ্বাসের আর কারণ কোথায়?

এ ছাড়া আরও এক ব্যাপার।

ফাঁসীর পর গোপীমোহন রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গলার যুব-মানসে এক নতুন পথের দিশারীরূপে অভিনন্দিত হলেন। কংগ্রেসের চল্‌তি নেতার দল তখন নিজেদের কলহ নিয়ে মত্ত। যে-স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে শত শত আদর্শবাদী যুবককে ঘরছাড়া করানো হল, তাদের কথা এখন কেউ বলে না, ভাবে না। স্বভাবতই তারা নিজেরাই নিজ নিজ পথ স্থির করে নিল। পথ ভাল কি মন্দ, সঙ্গত কি অসঙ্গত, সে কথা অবান্তর। কারণ যে-সব নেতার আকুল আহ্বানে, তাঁদেরই নির্দেশিত পথে যুবকরা নেমেছিল, তাঁরাই ত' আজ সে-পথ ত্যাগ করেছেন, অন্যপথ, অন্য মত নিয়ে মাতামাতি করছেন। যুবকরা যদি অনন্যোপায় হয়ে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তবে দোষ কাদের, যুবকদের না নেতাদের?

একদল যুবককর্মী দাবী করল, গোপীমোহনের এই আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিতে হবে, দেশবাসীর পক্ষ থেকে, স্বাধীনতাকামীদের পক্ষ থেকে। তার পথ যাই

হোক্, আদর্শ সম্বন্ধে ত' কোনও মতভেদ নেই, আন্তরিকতা সম্বন্ধেও নয়।

সেইভাবেই গোপীমোহনের আদর্শপ্রিয়তা, আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা জানাতে দোষ কি?

ক'লকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অনুরূপ ভাব-জ্ঞাপক এক প্রস্তাব স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হ'ল এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

এর কিছুদিন পরই সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন। নির্বাচিত সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ। প্রধান আলোচ্য বিষয় দেশবন্ধু প্রস্তাবিত হিন্দু-মুস্লিম প্যাক্ট, তারপরই গোপীমোহনের আত্মত্যাগ সংক্রান্ত প্রস্তাব।

ক'লকাতা কর্পোরেশনে প্রস্তাব গ্রহণের পরই সর্বত্র নানা আলোচনার সূত্রপাত। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংসাবাদ হয়েছে কংগ্রেসের মূলনীতি। এ-নীতির পরিপন্থী কোনও প্রস্তাব সমর্থন করা কংগ্রেস সভ্যের পক্ষে সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়।

পক্ষান্তরে অপর দলের মত, গোপীমোহনের আদর্শবাদ, আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগের মহিমা হিংসা-অহিংসার চুলচেরা তর্কের বহু ঊর্ধ্বে। তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, আর হিংসা বা অহিংস-নীতির সমর্থন এক নয়।

এ নিয়ে যখন নানা দ্বন্দ্ব ও তর্ক চল্‌ছে তখন সিরাজগঞ্জ সম্মেলন আসন্ন। ইয়োরোপীয় মহলেও উত্তেজনা ও আশংকা কম নয়। এই সম্মেলনে গোপীমোহন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। সে প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, তবে বুঝতে হবে বাঙ্গলাদেশে অহিংস আন্দোলন অচল, গান্ধীবাদ আর চলবে না, যুবকদের হিংসাশ্রয়ী হতে উৎসাহ দেওয়া হবে, দেশে শান্তিকামীদের আর স্থান থাকবে না, ইয়োরোপীয়দের সতত জীবন-সংশয় ইত্যাদি। অন্যদিকে গান্ধীবাদীদের বিদেশী-বর্জন, মাদক-বর্জন, চরকা-প্রচলন, বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব ত' আছেই।

অরাজকতার আর বাকী রইল কি?

—এখন সিরাজগঞ্জে মাত্র ঐ গোপীমোহন-প্রস্তাবটি গ্রহণের অপেক্ষামাত্র!

সংবাদপত্র মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। রয়টার, এ. পি ত' বটেই, কল্‌কাতার স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান-ও তাদের নিজস্ব সংবাদদাতা পাঠালেন সিরাজগঞ্জে। গোপীমোহন সংক্রান্ত প্রস্তাবের গতি-প্রকৃতি নিরীক্ষণ করে সংবাদ পাঠাতে হবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কে কোনদিকে, কিরূপ মত কে প্রকাশ করে—সব জানাতে হবে। অতি সঙ্গোপনে জেনে নেবে "বিশেষ খবর", ভোটাভুটি হলে কে কোন্‌দিকে ভোট দেয়,—সব জেনে খবর পাঠাবে। সংবাদ সকলের আগে চাই, ভাল খবরে ভাল পুরস্কার, ভবিষ্যৎ উন্নতি নিশ্চিত। এ-প্রস্তাবের উপরই নির্ভর করছে ভারতে ইয়োরোপীয়দের জীবন-মরণ।

যদি বাঙ্গলার যুবকদের হিংসাবাদে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, গোপীমোহনের প্রশস্তি-সূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে মিঃ ডে'র মত বহু ইয়োরোপীয়কে কলকাতার পথে-ঘাটে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হতে হবে। কত যে প্রাণ হারাবে কে জানে?

তাই তো গোপীমোহনের প্রস্তাব নিয়ে ইংরেজ মহলে এত আতঙ্ক!

সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক সম্মেলন সুরু হল। জনসাধারণ জানে এ-সম্মেলনের মূল আলোচ্যবিষয় হল হিন্দু-মুস্লিম প্যাক্ট। সে-জন্যই সভাপতি নির্বাচিত

হয়েছেন, মৌলানা আক্রাম খাঁ। স্থির হয়েছে, তিনি মূল প্রস্তাব উত্থাপন করবেন, সমর্থন করবেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিরোধিতা করবেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—এ-সব হবে দ্বিতীয় দিনের মূল অধিবেশনে। এবং ওর পরই সম্মেলনের সমাপ্তি। আরম্ভ শনিবার সায়াহ্নে, রবিবার সকালে বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন, বৈকালে মূল অধিবেশন।

শনিবার আনুষ্ঠানিক সভারম্ভ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, মূল সভাপতির অভিভাষণ, দ্বিতীয় দিনের কার্যবিধি ও সময়-নির্দ্ধারণ।

প্রস্তাবিত প্যাক্ট নিয়ে তখন দেশবন্ধু-বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। একদিকে হিন্দু মহাসভা, মডারেট দল, ও গান্ধীবাদী কংগ্রেস দল। সকলেরই উদ্দেশ্য প্যাক্টের বিরোধিতা উপলক্ষ্য করে স্বরাজ্যদলকে হেয় ও দেশের স্বার্থবিরোধী প্রতিপন্ন করা। একদিকে ইয়োরোপীয়দের আতঙ্ক, অন্যদিকে বিরোধীদলগুলির সংগ্রামী-উৎসাহ।

ক্ষুদ্র সিরাজগঞ্জ সহর। কলকাতা ও বিভিন্ন জেলাবাসী প্রতিনিধিদের দলে দলে ও অতর্কিত আগমনে অভ্যর্থনা সমিতির সব ব্যবস্থা বানচাল হবার উপক্রম। স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটি তাঁরা নিয়েছিলেন, অভ্যাগতদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু কার্যকালে তাতে স্থান সংকুলান হল না। অকস্মাৎ বহু অভ্যাগতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করা সহজ নয়। অভ্যর্থনা সমিতি ত্রুটি করেন নি। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে. বিভিন্ন কেন্দ্রে, ছোট ছোট দলে প্রতিনিধিদের রাখতে বাধ্য হওয়ায় কাজকর্মের ব্যবস্থায়ও গোলমাল হয়ে যায়—নানা বিরক্তি ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। আসল কথা, কে, কেন, কোথা থেকে এল, কেউ জানে না। রাজনৈতিক দল এবং সেগুলির প্রতিনিধি ছাড়া পুলিশের প্রতিনিধি, চর. অনুচর, গুপ্তচরে সহর ছেয়ে গেল। তাদের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিশে যাওয়া। কে কি আলোচনা করে, সে অনুসারে তার দর নির্ণয় করা এবং সেই দর অনুযায়ী নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধন। পুলিশের মূল লক্ষ্য, রাজনীতিক মতবাদ অনুযায়ী 'প্রতিনিধির' ওজন যাচাই করা এবং ভবিষ্যতে তার বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

এ-সব ১৯২৩ সালের জুন-জুলাই মাসের কাহিনী। সুভাষচন্দ্র মাত্র কয়েক মাস পূর্বে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর এখন ক'লকাতা ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। তিনি ছাড়া প্রায় সব ছোট-বড় কংগ্রেস নেতা, উপনেতা, দল-নায়ক, উপদল-নায়ক ত' বটেই হিন্দু-সভা ও অন্যান্য বিরোধী দলের নায়ক ও কর্মীরাও উপস্থিত হয়েছেন সিরাজগঞ্জে। কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলে নাম লেখানো হিন্দু-সভার অনেক প্রতিনিধিও আছেন এই সিরাজগঞ্জে। তারা ঠিকমত কাজ করেন কিনা, অর্থাৎ দেশবন্ধুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন কিনা, তা দেখবার জন্য হিন্দু-সভার উর্দ্ধতন নেতারাও উপস্থিত হয়েছেন। এখানে "বিরোধিতা" করা অর্থে শুধু বিপক্ষে ভোট দেওয়া নয়! ভোটে পরাজয়ের সম্ভাবনায় ভোট ভণ্ডুল করবার জন্য চীৎকার, গণ্ডগোল, টেবিল-চেয়ার ভাঙ্গা, এমন কি মারামারি করাও বিরোধিতার অঙ্গরূপে গণ্য। এইসব 'প্রতিনিধি' যোগাড় করতে অনেক অর্থব্যয় হয়েছে। কার্যকালে যাতে তারা কলা দেখিয়ে অন্যদলে ভিড়ে না যান—তার ব্যবস্থা করার জন্যই বিভিন্ন 'দলীয়' নেতাদের শুভাগমন।

প্রথম দিনের অধিবেশন। শনিবার সায়াহ্ন। বিরাট সভামণ্ডপে তিলধারণের স্থান নেই। ভিতরে প্রচণ্ড গরম। ও-সহরে ইলেকট্রিকের প্রবর্তন তখনো হয়নি। সভামণ্ডপের চারদিকের বেষ্টনী খুলে দিয়েও বিশেষ সুরাহা হল না। সভার বাইরেও প্রচুর জন-সমাবেশ।

আগামীকাল রবিবার মূল অধিবেশন। ক'লকাতা ও মফঃস্বলের অন্যান্য সহর থেকে আরও অনেকে আসবেন—অনেকেই সভাশেষে রাত্রের ট্রেনেই ফিরে যাবেন।

প্রথম দিনের মামুলী অধিবেশন শেষ হতেই বেশ রাত হয়ে গেল।

যে একতলা বিস্তীর্ণ ছাত্রাবাসে প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সভাশেষে ফিরে এসে দেখা গেল, বিরাট গৃহটি একরকম বাজারে পরিণত। ঘর-গুলির ভিতরে ভীষণ গরম; সবাই বাইরের চওড়া বারান্দা ও খোলা বাঁধানো প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিয়েছেন। জলের ইঁদারার চারপাশে মানুষ, সবাই স্নানাদির জন্য ব্যগ্র। কোথায় বাল্‌তি, কোথায় দড়ি, কে কার কাছে কোন্ খবর পাবে—কিছুই জানবার উপায় নেই। অভ্যর্থনা সমিতির কর্মীদল বিব্রত, বিচ্ছিন্ন হয়ে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছেন। এক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা যখন বহু-কেন্দ্রিক হয়, তখন সুব্যবস্থা কি করে সম্ভব?

তখনো প্রতিনিধিদের আগমনের বিরতি নেই।

খাদ্য-প্রস্তুত ও বিতরণ-ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে। প্রথম দিনেই এই। আগামীকালের কথা আর ভাবা যায় না। যে ক'জন বামুন-ঠাকুর নিয়োগ করা হয়েছিল, তা দিয়ে এত লোকের আহার্য তৈরী করা সম্ভব নয়। লোক কতজন? তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। কে প্রতিনিধি, কে অভ্যাগত, কে অনাহূত, কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

ক'লকাতা থেকে সাংবাদিক যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা একসঙ্গে একটি ঘর দখল করেছিলেন। কিন্তু সম্মেলন থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সে ঘরে এত লোক রাখা হয়েছে যে ঐ গরমে গাদাগাদি করে থাকা সম্ভব নয়।

ঠিক হ'ল যার যার মালপত্র যথাসম্ভব সাবধানে ঘরে রেখে, বাইরের বারান্দায়, ডেক-যাত্রীর মত শোবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। সকালে অবশ্য এক-বার চেষ্টা করতে হবে, অন্যত্র থাকা যায় কি না দেখতে। কিন্তু এখানে অসুবিধা যেমন, সুবিধাও কম নয়। নানা কেন্দ্রের বহু অতিথি ও প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা—সাংবাদিকের পক্ষে কম লোভনীয় নয়।

রাত বারোটা বাজে। আহারের ব্যবস্থা তখনো শেষ হয়নি।

অগত্যা নবাগত ভিন্ন ভিন্ন সহরের প্রতিনিধিগণই কাজে হাত লাগালেন।

রান্নার কেন্দ্রে দেখা গেল, ভাতের পাহাড় তৈরী। ডাল চড়েছে তিন উনুনে, এরপর তরকারী হলেই উঠোন খালি করে সবাইকে বসানো হবে।

প্রতিনিধিরা ঠিক্ করলেন, এ-রাত্রে আর তরকারীর স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। ভাত আর ডাল দিয়েই কোন-রকমে রাতটা কাটানো যাক; আগামীকাল যা হয় অন্য কিছুর চেষ্টা করা যাবে। তখন খাওয়ার ব্যবস্থা সুরু করলেও রাত একটার পূর্বে তা শেষ হবার সম্ভাবনা কম। তরকারীর প্রতীক্ষায় থাকলে, সূর্যোদয় সুনিশ্চিত।

অতএব, ভাত-ডালই সই।

কোনও রকমে বিরাট চত্বর খালি করে, ঠাণ্ডা ভাতের সঙ্গে গরম ডাল মিশিয়ে গলাধঃকরণ শেষে, যে যেখানে যেভাবে সম্ভব শুয়ে পড়লেন।

প্রেস প্রতিনিধিদের কয়েকজনের কাজ কিন্তু ঐ রাত্রেই সুরু হয়ে গেল। তাঁরা গেলেন টেলিগ্রাফ অফিসে, নিজ নিজ পত্রিকায় সংবাদ পাঠাতে। প্রথম দিনের সংবাদ মামুলি, কত লোক কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে এল, কিরূপ অভ্যর্থনা হ'ল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, মূল সভাপতির ভাষণ ইত্যাদি।

আসল সংবাদ ত' হবে আগামীকাল রবিবার, বিষয় নির্বাচনী সভায় ও পরে প্রকাশ্য সম্মেলনে।

জানা গেল, দেশবন্ধুকে একখানি ছোট একতলা বাড়ীতে একক ভাবেই রাখা হয়েছে। অন্যান্য নেতা-দেরও ঐভাবে কোন-না-কোন স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্র-লোকের বাড়ীতে 'মাননীয় অতিথি' হিসেবে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেকের পরিচর্যার জন্য অন্ততঃ দুজন করে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের সংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে একটির পরিবর্তে তিনটি কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সেজন্য কিছুটা প্রাথমিক বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী। আশা এই, আগামীকাল আর কোনও অসুবিধা হবে না।

এ-সব সত্ত্বেও রাত পোহাল, সকাল হল। অনেকে ছুটলেন দেশবন্ধু কোথায় আছেন দেখতে।

ছাত্রাবাস থেকে কিছু দূরে দীর্ঘ রাজপথের পার্শ্বে ছোট্ট একখানি নতুন একতলা দু-ঘরের বাড়ী। সামনেই বিস্তীর্ণ ঘাসের চত্বর।

সেই খোলা চত্বরে একটি ক্যাম্পখাটে, মশারী-ঢাকা অবস্থায়, চাদর জড়িয়ে বাঁদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছেন দেশবন্ধু। নিদ্রিত নিশ্চয়ই। জানা গেল সভার শেষে, অনেক অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ আলোচনান্তে শুয়েছেন রাত দুটোয়, ঘরে নয়; ঐ খোলা মাঠে, খেয়েছেন শুধু একবাটী দুধ-খৈ, আর কিছু নয়। প্রেস প্রতিনিধিদের দলে, অন্যান্যদের সঙ্গে আছেন মিঃ চারি, মাদ্রাজ-তনয়, কলকাতার দৈনিক ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, ঈষৎ তাম্রবর্ণ, গাট্টা-গোট্টা সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। বেশ বাঙ্গলা বলেন, বোঝেনও সব কথা। বস্তুতঃ কি চেহারায়, কি কথা-বার্তায়, তিনি যে অ-বাঙ্গালী, তা বোঝবার উপায় নেই।

প্রত্যুষেই মিঃ চারি কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। সোমবার প্রাতে একমাত্র দৈনিক 'ইংলিশম্যান'ই প্রকাশিত হয়, অন্যান্য দৈনিকগুলির সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারে—সোমবার প্রাতে তখন কোনও পত্রিকা নেই —এক ইংলিশম্যান ছাড়া। সে জন্য মিঃ চারির কর্ম-তৎপরতা স্বাভাবিক। আজকের অধিবেশনের সব সংবাদ তাকেই বার বার টেলিগ্রাম করে পাঠাতে হবে, যাতে পরদিনের একমাত্র পত্রিকায় সব খবর ভালভাবে প্রকাশিত হয়।

মিঃ চারি একাই চলে গেলেন ছাত্রাবাসের অপর প্রান্তে, যেখানে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাপন্ন ক'লকাতার প্রতিনিধিগণ একসঙ্গে আছেন। নানা বিষয়ের আলোচনা অনেকেই করছেন সেখানে। এদের মধ্যে আছেন সুভাষচন্দ্রের সেই প্রাক্তন 'বন্ধু'—ইতিপূর্বে গোপীমোহন সংক্রান্ত সংবাদের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িত হয়েছিল।

'বন্ধু'টি চারিকে দেখেই বাইরে গেলেন—উভয়ে ছাত্রাবাস ছেড়ে সহরের বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন, বোধ হয় কোনও চা-এর দোকানের সন্ধানে।

অনেকক্ষণ বাদে 'বন্ধু'টি নিজ আস্তানায় ফিরলেন একাকী। মিঃ চারি বোধ হয় নিজের কাজ কিছুটা উদ্ধার করে চলে গেছেন টেলিগ্রাফ আপিসে। কিছু 'খোরাক' তার জুটেছে নিশ্চয়ই। আগামীকাল সকালে একমাত্র তাঁদের দৈনিকই প্রকাশিত হবে। সে জন্য মিঃ চারির দায়িত্ব যেমন, কাজও তেমনি বেশী।

একদল প্রতিনিধি বেরোলেন, দেশবন্ধু কোথায় আছেন দেখতে। ছাত্রাবাস থেকে কিছু দূরে, চওড়া রাস্তার পাশে, সামনে খানিকটা খোলা জমি। তার সম্মুখে একখানা নতুন দু' ঘরের একতলা বাড়ী; সেখানেই থাকবার কথা দেশবন্ধুর। সম্মুখের খোলা জমিতে একখানা ক্যাম্প-খাট, মশারী-ঢাকা; তার মাঝে খোলা মাঠেই গায়ে একখানা সাদা চাদর জড়িয়ে, বাঁ দিকে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন দেশবন্ধু। ঘর দুটোই খোলা, দু'জন স্বেচ্ছাসেবক দু দরজায় চুপ করে বসে আছে।

তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ঘরে অত্যন্ত গরম, সেজন্য দেশবন্ধুর নির্দেশেই ঐ ক্যাম্পখাট জোগাড় করে খোলা জায়গায় শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্মেলন থেকে ফিবে রাত দুটো পর্যন্ত নানা প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শেষে দুধ-খৈ খেয়েছেন রাত্রে। আর কিছু নয়।

* * *

দেশবন্ধুর এরূপ পরিমিত আহারে অবাক হবার কিছু নেই। একে রাত গভীর, তাছাড়া সামান্য আহারের নতুন নিয়মে তিনি ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

এককালে ভোজন-বিলাসী বলে দাশ সাহেবের খ্যাতি ছিল। প্রতি সপ্তাহের শেষে তাঁর আবাসে কীর্তন বা সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা-সভার অধিবেশন হত। এবং সবশেষে ভোজন-পর্ব।

এই পর্বে প্রতি সপ্তাহে কিছু না কিছু নতুনত্ব থাকতো। শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবীর রান্নার খ্যাতি বহু-দিনের। নানারূপ 'ঢাকাই' রান্নার প্রবর্তনে ও অভ্যাগতদের পরিবেশনে তিনি তৃপ্তি পেতেন। এই-ভাবে দেশবন্ধুর রাত্রের আহারও ভূরিভোজনে পরিণত হত।

কারাবাসের সময় তাঁর এতদিনের অনেক অভ্যাস ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে রাখা হয়েছিল 'ইয়োরো-পীয়ান ওয়ার্ড'-এ। সেখানকার আহারাদির ব্যবস্থা উচ্চাঙ্গের, সাধারণ কয়েদিদের কল্পনারও অতীত। কিন্তু দেশবন্ধু সে-সব প্রত্যাখ্যান করলেন। স্থির করলেন, নিজের রান্নার ব্যবস্থা তিনি নিজের কামরাতেই করবেন—শুধু একটি ষ্টোভ আর কিছু বাসন-কোসন ও একজন সাহায্যকারী 'মেট'-এর ব্যবস্থা চাই।

সে সবই দিলেন জেল-কর্তৃপক্ষ। কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্রই রান্নার ভার স্বহস্তে নিলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একই 'সেল'-এ থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এই সময় থেকেই দেশবন্ধুর খাদ্য-প্রণালীর পরিবর্তন সুরু। স্বভাবতঃই খাদ্য হ'তে থাকলো সহজ-পাচ্য ও সহজসাধ্য। মাঝে মাঝে মাংস হত, তবে সে অনেকটা পরীক্ষামূলক ভাবেই। রাতের খাদ্যও ক্রমশঃ সহজ, আরও সহজ, সংক্ষিপ্ত, আরও সংক্ষিপ্ত হতে থাকে।

এইভাবেই হয় তাঁর নতুন অভ্যাসের অনুশীলন।

খাদ্য তৈরীর এই 'সহজিয়া' গতি, কিছুদিনের মধ্যেই যে কি পরিণতি লাভ করে, তার একটি দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য।

১৯২৩ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ দেশবন্ধু তাঁর পৈত্রিক আবাস দানের সংকল্প ঘোষণা করেন এবং পল্লীসংস্কার সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

সমিতির উদ্বোধনী সভা এক রবিবারের দুপুরবেলা দুটোয় দেশবন্ধুর গৃহ-সংলগ্ন চত্বরে।

অল্প কয়েক ব্যক্তি সমবেত হয়েছেন সভায়। তাঁদের মধ্যে আছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

বেলা দুটো বেজে গেল। কিন্তু দেশবন্ধুর দেখা নেই, অথচ তিনি গৃহেই আছেন। একটি ছেলেকে পাঠানো হল উপরে, দেশবন্ধুকে খবর দিতে। ছেলেটি ফিরে এসে জানালো, দেশবন্ধু খেতে বসেছেন, খাওয়া শেষে এখুনি আসবেন।

কি ব্যাপার, এত বেলায় খেতে বসেছেন! তাছাড়া উনিই সভা ডেকেছেন, ওঁরই এত বিলম্ব, এরকম ত' কখনো হয় না।

একটু পরই দেশবন্ধু এসে বসলেন সভায়। কোনও চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা নেই। খোলা ফরাসে সবাকার সমান আসন। দেশবন্ধু বসলেন, শরৎ-বাবুর পাশেই।

—কি ব্যাপার, এত বেলায় খেতে বসেছিলেন, কোনও অসুখ করেনি তো?

—আরে না না। এমনি দেরী হয়ে গেল।

তারপর, নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করে বল্‌লেন, 'আজ খাবার কিছুই ছিল না, শুধু ডাল আর ভাত, ছোলার ডাল; তাই এত দেরী।'

যেন স্বগতোক্তি। শরৎবাবু শুনেছেন কথাটা। যাঁরা পাশাপাশি বসেছিলেন, তাঁরাও।

শরৎবাবু মুখ নীচু করলেন। তাঁর চোখে কি জল? সে জল গোপন করবার জন্যই কি তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন?

* * *

মিঃ চারি ফিরতেই বন্ধুর দল ছেঁকে ধরলেন তাঁকে। চারি শুনে এসেছেন নির্বাচনী সভার অধিবেশন বসবে বেলা দুটোয়। বিকেল চারটেয় চা পানের বিরতি, ছটায় প্রকাশ্য অধিবেশন সুরু; শেষ হবে রাত দশটা নাগাদ। তারপর ছুটি—যে যার বাড়ী চলে যাও।

তার মানে সারাদিনই ছুটি। অন্য সকলের, কিন্তু চারির নয়। তবে চল হে, একবার সহরটা ঘুরে আসা যাক্, নদীতে চান করা যায় কিনা তাও দেখা যাক্। তারপর দুপুরের খানা খেয়ে টানা ঘুম। এই গরমে আবার রাতের পালা আছে।

নানারূপ গল্পগুজবে সময় কাটতে লাগল।

রান্নার ব্যবস্থায় খুব তোড়-জোড় সুরু হয়েছে সকাল থেকেই। নানা লোকের যাতায়াত ঐ রান্না-বাড়ীর অঞ্চলে যত শীগ্‌গীর সম্ভব আজ দুপুরে খেতে দিতে হবে। ভাল খাবার। শীগ্‌গীর হলেও বারো-টার আগে নয় নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যে 'চা-টা'-এর জন্য কেউ একা, কেউ কেউ দল বেঁধে ছুটলেন দোকানে, বাজারে বা বন্ধু-বান্ধবের সন্ধানে।

বিষয়-নির্বাচনী সভার অধিবেশন হবে মূল সভা-মণ্ডপ থেকে কিছু দূরে—হাই স্কুলের ভিতরের উঠোনের আর এক মণ্ডপে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সদস্য ছাড়া অন্য কাউকে মণ্ডপে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সেজন্য ওখানে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে। হিন্দু মহাসভা ও পুলিশের দিক্ থেকে বহু 'প্রতিনিধি' আমদানী করা হয়েছে; তারা সভার কাজ ভণ্ডুল করবার জন্য যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেজন্যই এত কড়াকড়ি। নতুবা অন্যান্য বছরের মত মামুলি বার্ষিক সম্মেলনে এত সাবধানতার প্রয়োজন কি?

দুটো বাজার আগে থেকেই প্রতিনিধিগণ একে একে আসতে সুরু করলেন, সুভাষচন্দ্রের 'বন্ধু'টিও। তাঁর সঙ্গে মিঃ চারি সভার দ্বার পর্যন্ত এসে, নানা কথা বলে, ধীরে ধীরে ফিরে গেল। অন্যান্য যে-সব প্রতিনিধি এলেন তাদের কারো মুখ চেনা, কেউ বা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঐ 'বন্ধু'টিই চারি'র ভরসা। ওর সাহায্যে যদি কিছু 'স্কুপ' সংবাদ পাওয়া যায়, তবেই এখানে আসা সার্থক। বিশেষ কিছু হলেই 'বন্ধু' বাইরে এসে জানাবেন। সে জন্য চারিকে সারাক্ষণ ঐ মণ্ডপের আশেপাশেই থাকতে হবে। বিশেষতঃ ঐ গোপীমোহনের ব্যাপারে, যার জন্য এখানে আসা।

ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে সব খবর চাই। প্রস্তাবের খসড়া কে লিখলো, কে উত্থাপন ক'রল, কারা কি কি বললো, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে। ফলাফল কি হল—সব চাই। ইয়োরোপীয় সমাজ, বাঙ্গলা কংগ্রেসের স্পষ্ট মনোভাব জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। বাঙ্গলা সরকার, ভারত সরকারও তাই। আর টেগার্ট? তার ত' তখন নিদ্রা নেই। গোপীমোহনকে সমর্থন মানে টেগার্টকে হত্যা করতে যুবকদের আরও উৎসাহ দেওয়া।

দেখা যাক্ কি হয়?

নির্দিষ্ট সময়ে বিষয়-নির্বাচনী সভা সুরু হল। কিন্তু পাঁচটার পর ছ'টা বেজে গেল, তবু সভা শেষ হবার কোনও লক্ষণ নেই। কি হচ্ছে এত দীর্ঘ আলোচনায়, তর্কাতর্কির মাধ্যমে? প্রস্তাবগুলির খসড়া ত' আগেই করা ছিল, এ সভায় ত' সেগুলির আকার-ইকার পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু হবার কথা নয়। তবু এত বিলম্ব কেন?

কারণ আর কিছুই নয়, স্বরাজ্যদল ও দেশবন্ধু-বিরোধীদের দৃঢ় সংকল্প, কিছুতেই প্যাক্ট-সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। তার জন্য যত-রকমে সম্ভব বাধাপ্রদান ও সময়ক্ষেপের নীতি অবলম্বন করে তারা প্রত্যেকটি বাক্যের পরিবর্তে নতুন বাক্য সংযোজন বা অন্য কোনও ফন্দি করছেন, তর্কাতর্কিতে সময়ক্ষেপণে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

এ ছাড়া আছে গোপীমোহন সংক্রান্ত প্রস্তাব। এখানেও ঐ একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রস্তাবের প্রতিটি কথার বিরুদ্ধে বাধাদানের নীতি অহিংসপন্থীরা দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করেছেন। অনেকের সন্দেহ শুধু হিংসাবাদের বিরোধিতা নয়, আরও কিছু। হয়ত বা অভিসন্ধিমূলক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সরকারী পুলিশ বিভাগের নেপথ্যলীলাও ঐ আচরণের পশ্চাতে রয়েছে।

প্রধানতঃ ঐ দুটি প্রস্তাবের আলোচনাতেই বিষয়-নির্বাচনী সভার অধিবেশন বিলম্বিত হচ্ছে—সভার বাইরের জনতা মাত্র এইটুকু জানতে পারলেন। ওদিকে মূল সভামণ্ডপে উপস্থিত দর্শকগণ নেতৃবর্গের অনুপস্থিতিতে ক্রমশঃ উত্তেজিত ও অস্থির হয়ে উঠ্‌ছেন। একে গরমে সবাই উত্যক্ত, তার উপর মূল অধিবেশন সুরু হওয়ার অনিশ্চয়তা—উভয় কারণেই এক বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অচিরে সভার অধিবেশন সুরু না হলে নানা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে।

অবশেষে সভা সত্যই সুরু হল। রাত তখন ন'টা বেজে গেছে।

নেতৃবৃন্দ একে একে বিষয়-নির্বাচনী ছেড়ে মূল সভায় প্রবেশ করছেন। প্রত্যেকেই ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত। দীর্ঘ আলোচনার পর এ-সভায় যোগ দিয়ে তাঁরা যে বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

সভাপতি মৌলানা সাহেব এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমা চেয়ে জানালেন, যেহেতু রাত অধিক হয়ে গেছে, অথচ অধিবেশন ঐ রাত্রেই শেষ করতে হবে, সেজন্য তিনি স্থির করেছেন, সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রস্তাব—হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট সভায় সর্বাগ্রে উত্থাপন করা হবে। অন্যান্য প্রস্তাবের আলোচনা হবে ঐ মূল প্রস্তাবের পর। সময়ের অল্পতায় অন্যান্য প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনা যদি সম্ভব না হয়, তবে তিনি সভাপতির আসন থেকেই ঐ প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করবেন।

এই নিবেদনের পর মূল প্রস্তাব সভাপতি উত্থাপন করলেন, আর জানালেন প্রস্তাবটি প্রণয়ন করেছেন প্রস্তাবের সমর্থক দেশবন্ধু স্বয়ং। সেজন্য সমর্থনকালে দেশবন্ধুই প্রস্তাবটির বিশদ ব্যাখ্যা করবেন। তারপর বিরোধীদলের পক্ষ থেকে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাষণের পর প্রস্তাব-উত্থাপক হিসেবে তিনি তাঁর নিজ বক্তব্য পেশ করে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। সময়ের অল্পতার জন্য একাধিক প্রতিনিধিকে কোনও পক্ষেই বক্তৃতা দেওয়ার সম্ভাবনা হবে না।

এই নির্দেশানুযায়ী কাজ সুরু হল। সভাপতি উঠে প্রস্তাবটি পাঠ করলেন এবং দেশবন্ধুকে বললেন প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করতে।

তুমুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে সভার কাজ পূর্ণোদ্যমে সুরু হ'ল। তখন রাত প্রায় দশটা বাজে।

এদিকে সাংবাদিকের দল চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কোন্ প্রস্তাব কিভাবে শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হয় তা জানা প্রয়োজন। বিশেষতঃ ঐ গোপীমোহন প্রস্তাব।

কিন্তু চারি কোথায়? তাকে ত' সভামণ্ডপে দেখা যাচ্ছে না। অথচ আজকের প্রধান কাজের দায়িত্ব ত' তারই।

মিঃ চারি তখন তাঁর বন্ধুর অন্বেষণে ব্যস্ত।

অবশেষে বন্ধুকে পাওয়া গেল, জানাও গেল কিছু সংবাদ। গোপীমোহনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কিন্তু বলা চলে, খোল-নলচে বাদ দিয়েই। কর্পোরেশনের সভায় যেভাবে প্রস্তাবের খস্‌ড়া করা হয়েছিল, অনেকটা সেভাবেই। সংশোধিত প্রস্তাবে গোপীমোহনের আদর্শবাদ ও আত্মাহুতিকে 'গভীরভাবে অনুভব' করার উল্লেখ করা হয়েছে।

মিঃ চারি এ সংবাদ পেয়েই ছুটলেন টেলিগ্রাফ আপিসে। এখন রাত দশটা বাজে। আর দেরী নয়। তাহলে সোমবার সকালের কাগজে এ-সংবাদ ছাপা সম্ভব হবে না—সব প্রযাস ব্যর্থ হবে।

তিনি টেলিগ্রাম করলেন। "সম্মেলনে গোপীমোহনকে প্রশংসা করে এবং তার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।"

মিঃ চারি ধরে নিয়েছিলেন, বিষয়-নির্বাচনী সভায় প্রস্তাবটি যখন নানা আলোচনার পর গৃহীত হয়েছে, তখন সেটি যে প্রকাশ্য সভায়ও আলোচিত ও গৃহীত হবে তা অবধারিত। শুধু ঐ প্রস্তাব গ্রহণের আনুষ্ঠানিক পর্বের প্রতীক্ষায় থেকে আগামী প্রত্যুষে সংবাদটি প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করা কেন? তাহলে ওর নিজের কর্তব্য পালনেই বাধা সৃষ্টি হবে মাত্র।

'ইংলিশম্যান'-এর আপিসে চারির সহকর্মীরা যে টেলিগ্রামের প্রতীক্ষায় দীর্ঘ রজনী জেগে বসে আছেন—অবশেষে তা এসে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে 'সাজ সাজ' রব। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লম্বা হেডিং গেল, 'সিরাজগঞ্জে গোপীমোহনের প্রশংসা'—তারপর সংক্ষিপ্ত সংবাদটির সঙ্গে এদিক-ওদিক আরও কয়েকটি বিশেষণ জুড়ে দিয়ে এক ভীষণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করে—বিদেশী পাঠক ও

সরকারী পুলিশ মহলে নতুন সন্ত্রাস ও বে-পরোয়া কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করা হল।

কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্য সভাপতি যে-ব্যবস্থা করেছিলেন, দেশবন্ধুর যুক্তিপূর্ণ ও আবেগময়ী ভাষণ এবং তার উত্তরে শ্যামসুন্দর বাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রতিবেদন এবং দেশবন্ধুর যুক্তিজাল ছিন্ন করবার নানা প্রয়াস শ্রোতৃবর্গ যেমন সম্মোহিত ও নিশ্চল হয়ে অনুসরণ করছিলেন, সভাপতি মহাশয়ও তেমনি দীর্ঘ সময়ক্ষেপে বার বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন।

কিন্তু আলোচনা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেচে যে তাতে বাধা দেওয়ার সাধ্য সভাপতিরও ছিল না। শ্রোতৃবর্গের ও সময়ের দিকে লক্ষ্য করবার অবসর নেই, ইচ্ছাও নেই। তাঁদের কানে প্রতিটি যুক্তি অনুরণিত, দৃষ্টি বক্তা ও তাঁর পার্শ্ববর্তীদের উপর নিবদ্ধ—বিরাট সভাস্থল নিস্তব্ধ। এ অবস্থায় সভাপতি আর কি করতে পারেন ?

অবশেষে পণ্ডিত শ্যামসুন্দরবাবুর ভাষণ শেষ হল, সভাপতি মহাশয় দাঁড়ালেন তাঁর বক্তব্য পেশ করতে। তিনিই প্রস্তাবের উত্থাপক, সুতরাং বিরোধী-পক্ষের বক্তব্যের যুক্তিজাল ভেদ করবার দায়িত্ব তাঁরই।

এ-কাজ সময় সাপেক্ষ। কিন্তু উপায় নেই। যথাসম্ভব অল্প কথায় তিনি শ্যামবাবুর বক্তব্যের জবাব দেবেন।

তিনি তাই দিলেন। সূচনায় তিনি জানালেন, শ্যামবাবু সুপণ্ডিত। হিন্দু শাস্ত্রে, সংস্কৃত-সাহিত্যে এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি সুবিদিত। তিনি, বেদ, উপনিষদ, শ্রুতি-স্মৃতি, মনু-যাজ্ঞবল্ক থেকে সুরু করে পুরাণাদির নির্দেশ দেখিয়ে, জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর আপত্তির যৌক্তিকতা, সমাজ-শাসনে ধর্মের নির্দেশ ইত্যাদি।

এ কথা বলেই তিনি তাঁর ডান হাতখানি শ্রোতৃ-মণ্ডলীর দিকে প্রসারিত করে বলে উঠ্‌লেন, "আমার ধমনীতেও ব্রাহ্মণের রক্ত প্রবাহিত। কিন্তু সে কথা যাক....."

কতকটা যেন আত্ম-বিস্মৃত হয়েই তিনি কথা ক'টি বলে ফেলেছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার তাঁর প্রতিবেদন সুরু করলেন। একথা সত্য, এক সময় এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল। একথাও কি সত্য নয় যে সেই সময়েই জাতিভেদ প্রথা অত্যুগ্র রূপ ধারণ করে অ-ব্রাহ্মণদের উপর, বিশেষতঃ অন্ত্যজ জাতিগুলির উপর অত্যাচার, অনাচার ও উচ্চতর বর্ণগুলির কঠোরতা বৃদ্ধি পায়—যার ফলে দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারিত সামাজিক সাম্যবাদের প্রসার এবং বর্ণ-বৈষম্যের প্রভাব শিথিল হয় এবং নিগৃহীত নিম্নবর্ণের লোকেরা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ?

কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মে ও সমাজে যখন জরার চিহ্ন দেখা যায়, তখন মুস্লিম ধর্মের সাম্যনীতি প্রচারিত হয়। নিগৃহীত জাতিগুলি নতুন আশ্রয় খুঁজে পায়। তারপর আসেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমে হিন্দু-সমাজে সমতা ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন, কিছুটা সফলও হন।

কিন্তু এ-সাফল্যও হয় সাময়িক। মুস্লিম সমাজেও ধীরে ধীরে বৈষম্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরস্পর হিংসা, রেষারেষি বৃদ্ধি পায়। দলে তৃতীয় পক্ষ কুশলী বিদেশী বণিক, এক সমাজকে আর এক সমাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে' নিজ স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা করে। এবং সফলও হয়।

আজ আমরা সব বুঝে, সব জেনেও ক্ষুদ্র স্বার্থ—আঁকড়ে থাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় নানা কলহে প্রবৃত্ত রয়েছি।

দেশবন্ধু এর প্রতিকারের এক উপায় উদ্ভাবন করে তা আপনাদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেছেন। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা শুনেছেন। রাত এখন অনেক হয়েছে। আপনারা এখন নিজ নিজ কর্তব্য বুঝে ভোট দিন—এই অনুরোধ।

তুমুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে সভাপতি আসন গ্রহণ করলেন। রাত তখন একটা বেজে গেছে। এর পর ভোট গ্রহণ।

হাত তুলে ভোট নেওয়া হল। এক দিকে নানা-রূপ জয়ধ্বনি, অপরদিকে বিদ্রূপ, টিট্‌কারী ও হট্টগোলের মাঝে সভাপতি ঘোষণা করলেন, মূল প্রস্তাবটি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হল।

এর পর হট্টগোল, গোলমাল, চীৎকার, কোলাহল, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকল। শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই আসন ছেড়ে উঠেছেন, সভার অবশিষ্ট কাজটুকু আর শেষ করা গেল না।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করলে আরও বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, এই আশংকায় সভাপতি অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। গোপীমোহন সংক্রান্ত প্রস্তাব মূল সভায় উত্থাপন করাই সম্ভব হল না, গৃহীত হওয়া ত' নয়ই।

রাত তখন দুটো বাজে। (ক্রমশঃ)

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

মুজিব

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

দেশ-বিভাগের আগে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক তফাৎটা হয়েছিল সবচেয়ে বড় কথা। ১৯৫৪তে পূর্ব পাকিস্তানের সংগে পশ্চিম পাকিস্তানের পার্থক্যটা হল বড় কথা। ভাষা, দূরত্বের ব্যবধান, ভূগোল, রাজনৈতিক চেতনা ও সংস্কৃতির কথা প্রাধান্য পেল। এইসব বিষয় নিয়ে মুজিবের একটি ছোট্ট রচনা প্রকাশিত হল :—কেন পূর্ববংগের স্বায়ত্বশাসন চাই। বাঙালীর জাতীয় চেতনার গংগোত্রী একটি নির্দিষ্ট নদীতে পরিণত হল।

আমি এখন থেকে বাঙালী বলতে বাংলাদেশের নাগরিককেই বোঝাবো। পশ্চিম বংগের মানুষ বাংলা-ভাষী কিন্তু নাগরিকত্বে ভারতীয়। ভাষা ও নাগরিকত্বে বাঙালী, আজ একমাত্র বাংলাদেশের মানুষ ; অষ্ট্রিয়া, পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী ও অধিকাংশভাবে সুইটসারল্যাণ্ড যেমন ভাষায় এক হলেও পৃথক রাজ্য। মুজিব বুঝলেন যে, ভারতের বাংলাভাষী মানুষ ভারতীয়ত্বে সান্ত্বনা লাভ করেছে কারণ ঐটেই ছিল ওদের স্বপ্ন ও সাধনা। ওরাই ভারতমাতাকে আবিষ্কার করেন (হেমচন্দ্রের ভারত সংগীত ১৮৫৭), স্বাধীনতা শব্দটা ভারতে প্রথম ওরাই ব্যবহার করেন (রংগলাল—১৮৫৮), কংগ্রেস ওরাই গঠন করেন (১৮৮৫), জাতীয় সংগীত ওরাই লেখেন (১৯১১)। অপর পক্ষে পাকিস্তান বলে যে শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে সেটা পানজাবের পা, আফগানিস্তানের আ, কাশ্মীরে কা, সিন্ধুর স এবং বেলুচিস্তানের স্তান নিয়ে। এর ভেতর আফগানিস্তান স্বাধীন রাজ্য, বাংলাদেশের নামগন্ধ নেই। মুজিবের ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর গ্রামে গ্রামে মানুষেব মনে এইসব রাজনৈতিক ভাবনা ও যুক্তি ছড়িয়ে পড়ল। এর ভেতর মুজিব আনলেন সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার স্বর্ণসূত্র। বাঙালী হল আশ্বস্ত, ধর্মান্ধবা শংকিত। আমি "ধর্ম-নিরপেক্ষতা" শব্দটার বিরোধী কারণ এতে ধর্মান্ধরা জো পায়। সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা তার চেয়ে অনেক নিরাপদ শব্দ।

১৯৫৬-র ফেব্রুয়ারীতে এল আর এক আহ্বান। পাকিস্তানের আইন সভায় এক শাসনতন্ত্র পাশ হল যার ফলে পাকিস্তানের নাম হল ইস্‌লামিক রিপাবলিক অব্‌ পাকিস্তান আর পূর্ববাংলা নামটা বদলে রাখা হল পূর্ব পাকিস্তান। আর একটি ধারায় ঠিক করা হল যে কোনও হিন্দু রাষ্ট্রপ্রধানের পদ পাবে না। এর এক বছর আগেই মুজিব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বলেছিলেন বালুচ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের নাম পরিবর্তিত করা হয়নি অথচ বাংলা নামটা পাল্টে করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান।

পরিষদের এই বক্তৃতায় কোনও ফল হল না। তখন মুজিব এলেন ঢাকায়। ৪ঠা আগস্ট তাঁর নেতৃত্বে আরম্ভ হল ভুখ্‌-মিছিল। মিছিলের ৩ জন, পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। মুজিব তাদের একজনের

রক্তাক্ত শব কোলে নিয়ে শোভাযাত্রার সংগে নগর পরিক্রমা করলেন ; দাবী করলেন যে আইন-সভায় ব্যাপারটা আলোচিত হোক। আইন-সভায় ব্যর্থ হলে জনসাধারণ, জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হলে তাদের মুখপাত্র হিসেবে আইন-সভায় আবির্ভাব। এই হল মুজিববাদ।

ফজলুল হক তখন পূর্ব পাকিস্তানের লাট বাহাদুর। আইন সভার অধিবেশন আরম্ভ হল। কিন্তু লাট সাহেবের নির্দেশক্রমে বিরোধী দলের সদস্যদের কোনও কথা বলতে দেওয়া হল না। মুজিব ক্ষিপ্ত। তিনি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন যেটা ২০০ বনাম ৯৭ ভোটে পাশ হল। তবু সরকার অনড়। গণতন্ত্রের স্তম্ভ হক সাহেব বদলে গেছেন।

এর পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫৭-র ৭ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার টাংগাইল মহকুমার কাগমারী গ্রামে এক সম্মেলন। সোহরাওয়ার্দি তখন যুক্তজোটের পক্ষে কারণ তিনি তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। মৌলানা ভাসানী যুক্তজোটের বিরুদ্ধে, মুজিবও বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে মুজিব চীন, রাশিয়া ও ক্যানাডা ভ্রমণ করে এসেছেন। চীন-পাকিস্তান আঁতাত মুজিবেরই দান। এই চীনই বাংলার সংকটময় মুহূর্তে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়াবে। মুজিব গণৎকার নন সুতরাং তার পক্ষে ভবিষ্যতটা জানবার কথা নয়। তবে একটা কথা তিনি জানতেন যে ভক্তির সম্পর্ক থাকলেও ভাসানীর সংগে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে। কারণ ২১ দফার প্রতি মৌলানার প্রকাশ্য আনুগত্য থাকলেও অন্তরে ছিল না ; তিনি সারাজীবন ধর্মকর্ম নিয়ে কাটিয়েছেন, এখনও সাম্প্রদায়িকতা তার মনে উঁকিঝুঁকি মারে, তার ওপর বয়েসে বৃদ্ধ। অন্যপক্ষে মুজিব তরুণ, সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে, বাংলার দাবী তার কাছে বড় কথা, আদর্শের প্রতি ঢালা আনুগত্যই তার একমাত্র মানদণ্ড ; এ যেন দ্বিতীয় দেশবন্ধু। মরহুম নেতা আবুল মনসুর আহমেদের মতে এই সময় মৌলানা সাহেব তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার সংগে যোগসাজস করেন। মীর্জা নাকি মীরজাফরের বংশধর।

মুজিবের কাছে মৌলানা সাহেবের কেতা দুরস্ত চিঠি এল যে তিনি ১৯৫৭-র ২৫শে জুলাই থেকে আওয়ামী লীগের সংগে কোনও সংস্রব রাখবেন না। ঐদিন ঢাকার সদরঘাটে এক চলচ্চিত্র গৃহে এক সম্মেলনে নতুন দল তৈরী হ'ল; নাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ভাসানী ন্যাপ। পরে আর একটি পার্টি তৈরী হবে, তার নাম, মুজফ্‌ফর ন্যাপ। এটা রুশ-পন্থী কমিউনিস্টদের। মুজিব পরিষদীয় রাজনীতি ও মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চল্লেন গ্রামে আওয়ামী লীগ সংগঠনে। গ্রামেই বাঙালীর ভবিষ্যৎ। এই হল মুজিববাদ।

এই সময় দুটি ব্যাপার ঘটে যাতে মুজিব বাংলার দাবী সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হলেন। প্রথম, প্রেসিডেন্ট মীর্জার ঘোষণা যে গণতন্ত্র পাকিস্তানের লোক বোঝে না, সুতরাং সে কাঠামো ওদেশে অচল। মুজিবের কাছে এর অর্থ হল বাংলার দাবীর পেছনে যতই ভোট পড়ুক সেটা পশ্চিমাদের কাছে হবে অর্থহীন, হয়ত নির্বাচন-প্রথাই উঠে যাবে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হল তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথের বার্তাসম্মেলন। তিনি বল্লেন, "কমিউনিস্ট আক্রমণ ছাড়া, আমেরিকা সিয়াটো চুক্তির কোনও সভ্যকে সাহায্য করবে না। মুজিবের কাছে এর অর্থ হল পশ্চিম পাকিস্তান কমিউনিস্ট (মানে রাশিয়া) দেশের সংগে যুদ্ধ সম্ভাবনার নাম করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সৈন্যসংখ্যা বাড়াবে আর সে সৈন্য বাংলাকে দাবিয়ে রাখার জন্যে ব্যবহার করবে। এই

সময় মুজিব বুঝলেন যে কাশ্মীর জয় করতে পারলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালীর মর্যাদা ম্লান হবে। কাশ্মীরের পাকিস্তান-ভুক্তির সমর্থন মানে বাঙালীর আত্মহত্যা।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে লাট বদল ও প্রধান-মন্ত্রী বদলের পালা অষ্টপ্রহর কীর্তনের মতন চলতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তানেও তার প্রতিক্রিয়া হল যার পরিণতি ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীকে পরিষদ ভবনেই পিটিয়ে হত্যা (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)।

৭ই অক্টোবর, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারী করলেন আর সেনাপতি আয়ুব খাঁ হলেন জংগী লাট। ৮ই ভোরে মুজিবের বিমান করাচী থেকে ঢাকায় পৌঁছল। খবর পড়েই তিনি বুঝলেন যে আবার জেল। ১০ই অক্টোবর আওয়ামী লীগের সব নেতাই জেলে। ২৭শে অক্টোবর মীর্জাকে সরিয়ে সেনাপতি আয়ুব খাঁনই প্রেসিডেন্ট হলেন। তাঁর প্রচলিত এব্‌ডো (Electoral Bodies disqualification Act) দ্বারা অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে নামা বন্ধ করা হল। চালু হল "মৌলিক গণতন্ত্র"। ১৯৬০ সালের ১১ই জানুয়ারী সেই ভিত্তিতে হ'ল নির্বাচন। ৮০ হাজার "মৌলিক গণতন্ত্রী" নির্বাচিত হল। এরাই ১৪ই ফেব্রুয়ারী আইয়ুবকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলেন।

১৯৬০ থেকে ১৯৬২ অবধি পূর্ববাংলার লাট ছিলেন লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল আজম খাঁন। বাঙালীরা বলে ইনি দৈত্যকূলের প্রহ্লাদ এবং পশ্চিমা হলেও বাঙালীর জন্যে অনেক হিতকর কার্য করেছেন, অবশ্য বাঙালীর টাকায়। রিপোর্ট পেয়ে আইয়ুব চমকে উঠলেন; আজম যদি বাঙালী নেতাদের সংগে হাত মিলিয়ে হঠাৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে! এটা বাঙালীর ধারা, বখ্‌তিয়ারের যুগ থেকে। অতএব হঠাও আজমকে। '৬২'র ১১ই মে আজম বিদায় নিলেন। এই সময়ের ভেতর শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আনা হয় এবং প্রতিটি মামলায় সরকার পরাজিত হন। কেউ বলে এটা আইয়ুবের নির্দেশে, কেউ বলে আজমের নির্দেশে।

১৯৬২-র ৩০শে জানুয়ারী জনাব সোহরাওয়ার্দী করাচী গেলেন এবং গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগ হল যে তিনি দেশের শত্রুদের সংগে ষড়যন্ত্র করছেন। ঢাকায় বিক্ষোভ, হরতাল, আইয়ুবের ছবির বহ্ন্যুৎসব ও ব্যাপক গ্রেপ্তার হল। আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতা আবার জেলে।

১৯৬২-র ২৬শে এপ্রিল শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবের মৃত্যু। তখন এই প্রবীণ নেতার বয়স ৮৮। ৮ই জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হল কিন্তু অন্য আইন বলে দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করা হল।

১৮ই জুন শেখ মুজিব অন্যান্য নেতাদের সংগে মুক্তি পেলেন। ২৫শে জুন মুজিব সহ ৮ জন নেতার এক বিবৃতি প্রকাশিত হল। তার মর্মার্থ হল নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার আর কারও নেই। সুতরাং আইয়ুবের প্রচলিত শাসনতন্ত্র অচল। পশ্চিমাদের পত্র-পত্রিকায় এই বিবৃতির যথেষ্ট নিন্দে করা হল। সোহরাবর্দি ও ভাসানী তখন জেলে।

১৯শে আগস্ট সোহরাওয়ার্দির কারামুক্তি এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। এই সময় তিনি যে অভ্যর্থনা পান তা ঢাকার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জেনারেল আইয়ুব তখন ঢাকায়। ১৭ই সেপ্টেম্বর জেনারেল সাহেব কার্জন হলে বক্তৃতা দিতে গেলেন।

আরম্ভ হল ছাত্রদের প্রতিবাদ যেটা পরে পুলিশের গুলি চালনায় পর্যবসিত হল। তিনজন নিহত, দুশো জন আহত। মুজিব ও সোহরাওয়ার্দি চল্লেন জেলা সফরে। এই সময় কুখ্যাত মোনেম খাঁ বাংলায় লাট নিযুক্ত হলেন। (২৮শে অক্টোবর)।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে ভাসানী প্রথমে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে সমর্থন করলেন। এই সংযুক্ত ফ্রন্টটী সংগঠিত হয় যখন কার্জন হলে গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস চলে। ফ্রন্টের উদ্দেশ্য দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনা। এই সংস্থাটি মুজিবের সংগঠনের ফলে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করলো। ভাসানী দেখলেন যে তার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ম্লান ও হৃতগৌরব। তিনি আরও দেখলেন যে সোহরাওয়ার্দি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেরুটে। মুজিব একা। এই সময় তিনি N. D. F.কে প্রকাশ্যে Nothing Doing Front বলে অভিহিত করলেন। এই সময় মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক বিবৃতি দিলেন, "বাংলা হয়েছে পিণ্ডির উপনিবেশ।"

১৯৬৩'র ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দি বেরুটের হোটেলে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। মুজিব নিঃসঙ্গ, যেমন সুভাষ বোধ করেছিলেন দেশবন্ধুর অকাল তিরোধানে ১৯২৫এর ১৬ই জুন। শোকসন্তপ্ত বাংলাদেশে সবকিছু বদ.ল গেল নববর্ষে একমাস পরে। কাশ্মীরে অবতার হজরৎ মহম্মদের চুল নিখোঁজ হল। পাকিস্তান সরকারের প্রচারে দাঁড়ালো ওটা হিন্দুদের কাজ। সারা পূর্বপাকিস্তানে আরম্ভ হয়ে গেল হিন্দু-হত্যা আর হিন্দুনারী ধর্ষণ। এই সময় শেখ মুজিব নিজের জীবন তুচ্ছ করে হত্যা ও নারীধর্ষণ থামাবার চেষ্টা করেন। এই দাংগা, লুট ও নারীধর্ষণ করেছে বিহারীরা, মুস্‌লিম লীগের প্ররোচনায় ও পাকিস্তান সরকারের সমর্থনে। বাঙালী ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে তাদের হত্যা করা হত।

১৬ই জানুয়ারী মুজিবের নেতৃত্বে দাংগা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হল। এর পরে সরকার মুজিব ও তাজুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করলেন।

১৯৬৪-র ২৭শে মে নেহেরুর মৃত্যু হল। এই সময় আয়ুবের বাসনা হল মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। তিনি জানতেন যে মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাঁর পোষা কুকুর।

তখন বাংলার কৃষককূল ঋণে ডুবছে। তাদের মোট ঋণের পরিমাণ ৯৩ কোটী টাকা। আওয়ামী লীগ দাবী করেছিল যে সব কৃষকের জমি ২৫ বিঘের কম তাদের সমস্ত ঋণ ঢালা মকুব করা হোক। তা অবশ্যই হয়নি।

নির্বাচনের প্রচার আরম্ভ হল। কুমারী ফতেমা জিন্না আইয়ুবের বিরোধিতা করবেন; তিনি বাংলায় এলেন। লাট মোনেম খাঁ ও ধর্মান্ধ মোল্লার দল তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারে নামল; গুণ্ডারা তাঁর সভায় ঢিল ছুঁড়লো। মোল্লারা ফতোয়া দিলেন যে, নারী রাষ্ট্রপ্রধান হলে ইসলাম নষ্ট হবে। মুজিবকে ৭ই নভেম্বর গ্রেপ্তার করে জামিনে মুক্তি দেওয়া হল। আইন-আদালতও আইয়ুবের পোষা কুকুর।

২২শে নভেম্বর মুজিব করাচীতে এসে পাঠান, বেলুচ ও সিন্ধিদের সংগে কথা বলে বুঝলেন তারা বাঙালীর মূল দাবীর সমর্থক এবং আইয়ুবের কংসশাসনের বিরুদ্ধে। আইয়ুব সরকার প্রচার করলো মুজিব ও গাফ্‌ফার খাঁ (সীমান্ত) দেশের শত্রু। কুমারী ফতেমাকে ভোট দেওয়ার মানে এদের ভোট দেওয়া।

১৯৬৫র ২রা জানুয়ারীর আইয়ুব পেলেন ৪৯,৯৫১ ভোট এবং কুমারী জিন্না পেলেন ২৮, ১৯১ ভোট। আইয়ুব আরও পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হলেন। ইনি '৫৮ সনের ক্যু'র পর বিলেতে এসে রূপবাণীতে বলেছিলেন, "যেদিন রাজনীতিজ্ঞরা সরকারের ভার নেবেন তার পরদিনই আমি সৈন্যদলে ফিরে যাবো।" রাষ্ট্রপতি হিসেবে এর দুটী কাজ উল্লেখযোগ্য। প্রথম, জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বৈদেশিক মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করা। দ্বিতীয়, ভারত আক্রমণ।

১৯৬৫'র জানুয়ারী থেকে এপ্রিল রাণ্ অব্ কাছ-এর খণ্ডযুদ্ধে পাকিস্তান ভারতের সৈন্যবাহিনীকে চেখে দেখলো। এই যুদ্ধ চলবার সময় আইয়ুব মার্চ মাসে পিকিং সফরে গেলেন। তার আগের বছর ১৬ই অক্টোবর (৬৪) চীন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কাছ-এর যুদ্ধের পর পাকিস্তান স্থির করল যে এই ভারত আক্রমণের উপযুক্ত সময়। এখানে পাকিস্তান বলতে বুঝতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান কারণ ওরা পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাঙালীকে পরামর্শ করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না। এটা মুজিব লক্ষ্য করলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বল্লেন না। ৫ই আগষ্ট (৬৫) কাশ্মীরে পাকিস্তানী গেরিলা সৈন্যদের অনুপ্রবেশ এবং ৬, ৭, ৮ ও ৯ তারিখে বিক্ষিপ্ত হামলা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজী লোকসভায় পাকিস্তানকে দায়ী করলেন। যে সব অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় সৈন্যের হাতে ধরা পড়েছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্রে ও এজাহারে পাকিস্তানের যোগসাজস সুস্পষ্ট। এও জানা গেল যে জেনারল আখতার হসেন মালিক ওদের কমাণ্ডার এবং ওরা গেরিলা যুদ্ধের তালিম পেয়েছে মুভিতে। মোট গেরিলা যোদ্ধার সংখ্যা ৩০,০০০। প্রথমে পাকিস্তান সবকিছু অস্বীকার করলো পরে বল্লো, "আক্রমণ করেছি, বেশ করেছি।" যুদ্ধ বাধল। এই সময় শাস্ত্রী বল্লেন, পূর্ববাংলার সঙ্গে ভারতের কোনও বিবাদ নেই। মুজিব লক্ষ্য করলেন যে পূর্ব-বাংলায় পাকিস্তানী সৈন্য বলে বিশেষ কিছু নেই। তার অর্থ সমস্ত পাকিস্তানী সৈন্য কাশ্মীর দখলের কাজে নিযুক্ত, পূর্ববাংলার কি হয় তাতে পাকিস্তানের কিছু আসে যায় না। মুজিব ঠিক করলেন যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তার বাস্তব রূপ হবে আওয়ামী লীগের ৬ দফা।

এর ভেতর রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বেতার থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। তবু দেখা গেল বাঙালীরা কবির কাব্য ও সংগীতকে আঁকড়ে ধরে আছে। পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালীকে যত উর্দুছাঁচে গড়বার চেষ্টা করতে লাগল বাঙালী তত বেশী বাঙালী হতে লাগল। আইয়ুব মুজিবের ছ' দফাকে জঘন্য বলে অভিহিত করলেন; ভুট্টো মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করলেন, "আমার সংগে প্রকাশ্য জনসভায় বিতর্কে নামো।" বীরচিত্ত মুজিব বল্লেন, "কবুল"। তারিখ ঠিক হল ১৭ই এপ্রিল। ভুট্টো এলেন না। বাঙালী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে যে ৬-দফার নিন্দাবাদ এল মৌলানা ভাসানীর পক্ষ থেকে! এতে বাংলার বিশেষ ক্ষতি হল হল না কারণ পথের জীব-বিশেষ চীৎকার করলেও ক্যারাভান বাজারে পৌঁছোয়। ৬ দফার আন্দোলন বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসের মতন। আইয়ুব মুজিবের গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন। ২১শে এপ্রিল (৬৬) মুজিবকে গ্রেপ্তার করে শিলেটে চালান করা হল। অভিযোগ রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা। কয়েকদিন পরে তাঁকে বিশেষ ট্রেণে চালান করা হয় ময়মনসিংহ জেলে। মুজিব ধীর স্থির, নীরব। প্রতি

সহরে বন্দী বীরকে অভ্যর্থনা করার জন্য জনসমুদ্র হাজির। ৮ মে আবার গ্রেপ্তার। তারপর আরম্ভ হল নেতার মুক্তির দাবীতে শ্রমিক বিক্ষোভ যা ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলার কলকারখানায়; সংগে যোগ দিলো ছাত্র আর কৃষক সম্প্রদায়। ৭ই জুন সারা দেশে হরতাল। পুলিশ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে ১০ জনকে হত্যা করলো। ৮০০ মানুষ গ্রেপ্তার হল। দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ, তার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন গ্রেপ্তার। তারপর এক অবাক কাণ্ড! পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা থেকে ভুট্টোর বিদায়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে মুজিব স্মিতহাস্যে তার সহবন্দীদের বল্লেন; "চোরদের চৌকাতে কোন্দল বেধেছে।" আর একটী লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে মৌলানা ভাসানী ৭ই জুনের হত্যা ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের কোনওরকম প্রতিবাদ করলেন না। এই সময় বিলেত-প্রবাসী ভাসানীপন্থীরা লেখককে বলেন যে তারাও আওয়ামী লীগারদের আইয়ুবের মতন কঠোরভাবে দমন করতেন। এটা কি ভাসানীর নির্দেশে প্রচার। ভাসানীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ মুজিব করেছিলেন কিন্তু মুজিবের বেলায় ভাসানী নীরব। কারণ আইয়ুব নারাজ হবেন।

মুজিবের ওপর মামলার পর মামলা জারী হতে লাগল যাতে তিনি আর কারাগারের বাইরে না আসতে পারেন। তবু তিনি সংগীদের বল্লেন, সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা কর যাতে আমরা একটা সমান্তরাল সরকার হয়ে উঠতে পারি। তাঁর সংগীরাও উপযুক্ত কর্মী; যে কথা সেই কাজ। সংগঠনের মূলমন্ত্র হল ১৯৪০এর লাহোর প্রস্তাব যাতে বলা হয়েছে যে পাকিস্তান হবে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমষ্টি। বাঙালী মনে ঢুকল স্বাধীনতার স্রোত। এ জলতরংগ রুধিবে কে। পশ্চিমের নিরেট মিলিটারীদের সাধ্য নেই।

হয়রাণি মামলা ছাড়া আরম্ভ হল বাংলা ভাষার ওপর হামলা। ১৯৩৭এ মাধ্যমিক শিক্ষাবিল মারফৎ অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব বাংলা ভাষাকে উর্দুঘেঁষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি" নামক শিশু-কবিতাটা "ফজরে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি" করবার জন্যে ধর্মান্ধরা প্রয়াস পায় কিন্তু ব্যর্থ হন। ৩০ বছর পরে আবার বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ। আক্রমণকারীরা বুঝলেন না যে বাঙালীর ভাষাটা বাঙালী জাতের চেয়ে বড়। সেই ভাষার জন্যেই বাঙালী বাঙালী, বাঙালীর সৃজনী শক্তি আর বিশ্বের দরবারে তার সম্মান। সেই ভাষাকে সবুর খাঁ ও ও মোনেম খাঁ বাংলায় বিবৃতি দিয়ে জব্দ করতে চাইলেন। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা খুসী হল কিন্তু বাঙালী বিক্ষুব্ধ। একদিন বাঙালীর বিক্ষোভের বন্যায় আইয়ুব, ইহাইয়া, নাগাদ পাকিস্তান ভেসে যাবে। সেই স্রোতের ভগীরথ হলেন মুজিব।

১৯৬৮ এল। জানুয়ারীর ১৮ তারিখ। ভোর রাত্রে মুজিবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল, তারপর মিলিটারী জেল গেটে গ্রেপ্তার করলো। মুজিব একমুঠো মাটি তুলে মাথায় ঠেকালেন, তারপর তা পকেটে রাখলেন। এবার তাকে রাখা হল কুর্মি-টোলায় সেনা-নিবাসে। তিনি দেখলেন আরও অনেক বন্দী সেখানে আছেন। তাদের ভেতর আছেন—বিল্লাদার থেকে ক্যাপ্টেন, মেজর অবধি। মোট ৪৬ জন পদাতিক, নৌ ও বিমান-বাহিনীর সৈনিক। ঐ দিন সরকার আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা

ঘোষণা করলেন। নির্যাতনের ফলে ১১ জন রাজসাক্ষী হল।

১৯৬৯এর ২২শে ফেব্রুয়ারী মুজিব ও অন্যান্য বন্দীরা মুক্ত হলেন। এর জন্যে অধিকাংশ গৌরব বাংলার ছাত্রদের প্রাপ্য। মুজিব টহল দিতে লাগলেন সারা পূর্বভাগ। এর পর হ'ল পিণ্ডির গোলটেবিল বৈঠক। সারা দেশে আশার বন্যা বইছে। এক বছর রাজনৈতিক হট্টগোলে কাটল, তবে আওয়ামী গঠিত হল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইউনিয়নে। তখন আওয়ামী লীগ কার্যতঃ পূর্বভাগের সমান্তরাল সরকার।

১৯৭০, ৫ই নভেম্বর। মার্কিনের আবহাওয়া দফতর থেকে সতর্কবাণী এল যে মহা দুর্যোগ আসছে। তৈরী হও। ১২ই নভেম্বর সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলার উপর আছড়ে পড়ল। একদিনে দশ লক্ষ বাঙালী ডুবে মরল। ১০ দিন কোনও সরকারী সাহায্য নেই। মুজিব তখন গ্রামে সংগঠন কাজে ব্যস্ত। তিনি ছুটে গেলেন দুর্গত এলাকায়। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বল্লেন দীর্ঘ ২৩ বছর বন্যা নিবারণের কোনও ব্যবস্থা হয়নি, বাংলা মা উপেক্ষিতা।

এই মহাবিপর্যয়ের পরেই বিদেশভক্ত উগ্রপন্থীরা আওয়াজ তুল্লেন, "কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন করো।" "পদ্মা যদি মেকং নয়, এসো, পদ্মা মেকং করি, এইখানেতে ভিয়েৎনাম গড়ি।" এরাই আওয়ামী লীগকে, মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলেছে।

আইয়ুব ক্ষমতাচ্যুত, সিংহাসনে সেনাপতি ইহাইয়া খাঁন। তিনি ঘোষণা করলেন ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচন হবে।

যারা বাংলাদেশের স্বধীনতার বিরোধী ছিল তারা বলত, "রোজ কেয়ামতের দিন অবধি পাকিস্তানের সংহতির জন্য সংগ্রাম করব।" ১৯৭০এর কালবৈশাখীর পর তারা বল্লে, "আগে ভাত, পরে ভোট; তা না হলে ব্যালট বাক্স জ্বালিয়ে দেবো।"

৭ই ডিসেম্বর নির্বাচন হল। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে মোট ৩১৩ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেলে ১৬৭টি আসন, ভুট্টোর দল পিপ্‌ল্‌স্ পার্টি ৮৮। বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেল ২৯৮, বাকী ২/১টা। আওয়ামী লীগ ও ছয় দফার জয় হল। এটা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতার জয়, নির্বাচনী গণতন্ত্রের জয়, বাঙালীর ন্যায্য জ্যাত্যাভিমানের জয়। পশ্চিমাদের পরানো মানসিক শৃংখল মাকড়সার জালের মতন ফুৎফারে উড়ে গেল। পশ্চিমারা তখন দ্বিতীয়বার বিচ্ছিনতাবাদের ধুয়া তুল্লো। মুজিব তার জবাবে বল্লেন, বাঙালী পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি, সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে দেশত্যাগের প্রশ্ন ওঠেনা। তখন মৌলানা বলে বসলেন, "আমার এক দফা—স্বাধীনতা।" এতে পশ্চিমারা আস্কারা পেলে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের মাঝরাতে ভুট্টো আর রাষ্ট্রপতির উৎসাহে পাকিস্তানী সৈন্যদের তাইমুরী তাণ্ডব।

এই ব্যাপক নরহত্যার ও নারীধর্ষণের প্রাক্কালে বাঙালী নেতারা মুজিবকে ধরাধরি করেছিলেন, "পালিয়ে যান, আত্মগোপন করুন।" মুজিব বল্লেন "না"। এ অনেকটা সূর্য সেনের মতন ঘটনা। শরৎ বোস গোপনে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, যে কোনও দেশে পালিয়ে যান, আমরা ব্যবস্থা করব। সূর্য সেন বলেছিলেন, "না"। মুজিব গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বন্দীশালায়। মৌলানা ভাসানী গেলেন ভারতে। বাঙলা নেতাশূন্য। বাঙালী সৈন্যবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে নামল। টাংগাইলে তরুণ

কাদের সিদ্দিকী গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করলো। (এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্যে জনাব মোহম্মদ মোদাব্বেরের লিখিত মুক্তি সংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী দ্রষ্টব্য)।

এই মহান যুদ্ধ চলার সময় মৌলানার দলই বলত, "বাংলাকে স্বাধীন করবার জনসমর্থন মুজিবের পেছনে ছিল না। যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে সুরু হলে পর ওরাই বল্লে, "উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি হয়নি।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা ঠিক কিন্তু তোড়জোড় না করার জন্যে মুজিব ও আওয়ামী লীগ দোষী। এরা যুদ্ধের জন্যে, নারী নির্যাতনের জন্যে মুজিবকে দায়ী করলেন, পাকিস্তানকে নয়, ভুট্টো-ইহাইয়াকে নয়। মুজিব তখন পাকিস্তানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে। তিনি যদি ভারতের সংগে ষড়যন্ত্র করে প্রস্তুত হতেন তাহলে পাকিস্তানের অভিযোগটাই সত্য প্রমাণিত হত। বাঙালী বিপ্লবে জয়ী হলে পর ঐ মৌলানার দলই বল্লে, "ন মাসে যুদ্ধ জয় ঠিক হয়নি। আরো কিছুদিন যুদ্ধ চল্লে ভাল হোতো।" কার ভাল হোতো সেটা এরা বলেনি।

প্রথমতঃ হাজার বছর যুদ্ধ চালাবার মুচেলকা বাঙালী দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ, আরও দীর্ঘদিন যুদ্ধ চল্লে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা আরও মা বোন ধর্ষিতা হতেন, আরও গ্রাম, বিদ্যায়তন ও পোল ধ্বংস হত, আরও ধান ক্ষেতে আগুন লাগত।

যাই হোক, ১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালী জয়ী, পাকিস্তানীরা পরাজিত। সেই সংগে সাম্প্রদায়িকতাও পরাজিত, তবে মৃত নয়।

বাঙালীর ইতিহাসে প্রথম সামরিক জয়ের গৌরবে —শরিক একাধিক; মুজিব, আওয়ামী লীগ, গেরিলা যোদ্ধা, নিয়মিত সৈনিক, শহীদবৃন্দ ও বাংলার নারী! মুক্তি যুদ্ধের সময় বাঙালী মা-বোনেরা যে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সেটা বাঙালী সন্তানমাত্রেই ভক্তিভরে স্মরণ করবে। তাঁদের অশেষ দানের কথা ভেবে বহু আগে নজরুল লিখে গেছেন ঃ

"জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হয়েছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে
ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার
পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল
সেবা,
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা।
কোনোকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

১৯৪৫-এ সমবেত মিত্রশক্তির হাতে জার্মানীর ও জাপানের পরাজয় ঘটে। জাপানের পরাজয়ের চার বছর পর চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চীন সরকারকে পরাজিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে। এই কারণে আজ ফ্রান্স ও চীন স্বাধীন। এইভাবে মুক্তি আসার ফলে ফ্রান্স বা চীন কেউই আফশোষ করে না; বাঙালী সৈন্যবাহিনী, বাঙালী গেরিলা-বাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যুক্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলে কারও আফশোস নেই। মানুষের কোন হাতটা বেশী কাজ করেছে তা নিয়ে তর্ক চলে না।

ফ্রান্সের বাইরে নির্বাসিত দ্যে গ'ল সরকার-এর ফরাসী বাহিনী (Free French forces) ও দেশের অভ্যন্তরে গুপ্ত বাহিনী Maquis (মাকি) ও চীনেতে যদি চ্যাংকাইশেকের নিয়মিত বাহিনী মিশ্র শক্তিগুলোর

সংগে সহযোগিতা না ক'রত তাহলে ফ্রান্সে বা চীনে মিত্রশক্তির সৈন্য নামানো সামরিকভাবে সম্ভব হত না এবং রাজনীতির দিক দিয়ে অভিযান দু'টি হত সাম্রাজ্য-বাদী অভিযান। বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকার, বাঙালী সৈন্যবাহিনী ও বাঙালী গেরিলাবাহিনীর সহযোগিতা না থাকলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকাটা হোতো একই।

বাঙালী বিপ্লবের ফলে একাধিক বিশ্বশক্তি রাজ-নৈতিকভাবে অপদস্থ হয়েছে। চীন জাতীয় মুক্তি বিষয়ে বহু কথা বলেছে এবং বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের টাকা, সামরিক শিক্ষা, অস্ত্র ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। সেই চীন বাঙালী বিপ্লবে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনাম ৭১-এর জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর অবধি বাঙালী বিপ্লব সম্বন্ধে কিছুই বলেনি, করাতো দূরের কথা। অক্টোবরে দিল্লীতে ওদের প্রতিনিধি পানসে সমর্থন জানিয়েছে; সেটা মস্কোর চাপে, না ভারতের রাজনৈতিক সমর্থন হারাবার ভয়ে, না বাঙালী বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তা নিয়ে গবেষণা করবার উপকরণ আজও দুর্লভ। রাশিয়া ট্যাংক দিয়ে পূর্ব জার্মানী (১৯৫৩), পোল্যাণ্ড (১৯৫৬), হাংগারী (১৯৫৬) এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার (১৯৬৮) জাতীয় অভ্যুত্থান দমন করেছে; অধিক কি ১৯৭১-এর অক্টোবরেও রাশিয়া লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদাফীর সাগে যুক্ত ইস্তাহারে বলেছে যে লিবিয়া ও রাশিয়া পাকিস্তানের অখণ্ডতা সমর্থন করে। ভারত বাঙালী বিপ্লবে জড়িয়ে পড়ার পর রাশিয়া বাংলাদেশের সমর্থনে নামে।

রিচার্ড নিক্সন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। মার্কিন সরকার যদিও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তবু সে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের নির্বাচিত নেতা সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নি উপরন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের নৈতিক সমর্থন দিয়েছে।

যারা চীন, আমেরিকা, রাশিয়া ও উত্তর ভিয়েৎ-নামের মোসাহেবী করত, যারা বরাবর বাংলাদেশ শব্দটারও বিরোধিতা করত তারা পরে বিদেশী প্রভুদের নামে দেশপ্রেম জাহির করেছে। এর বিপজ্জনক দিক হল যে এরা বিদেশের কারণেই বাংলার বিরোধিতা করতে পারে। যাই হোক, এইসব শক্তিবর্গের কাজ ও কথার ভেতর অসংলগ্নতা প্রকট হয়েছে বাঙালী অভ্যুদয়ে। মুজিবের নেতৃত্বে।

বাঙালী জাতির অভ্যুদয়ের আগে অবধি সারা এশিয়া মহাদেশে মাত্র কয়েকটি গণতন্ত্র ছিল। চতুর্দিকে শুধু সামরিক, আমিরী ও বর্ণচোরা স্বৈরতন্ত্র; সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নির্বাচনী গণতন্ত্র ছিল তাচ্ছিল্যের বস্তু। বাংলার জয়ে এশিয়া মহাদেশ বুঝেছে যে এক নবীন গণতন্ত্র জয়ী হয়েছে; এই গণতন্ত্র প্রোলেটারিয়ান, গাইডেড, বেসিক, করপোরেট বা পিপ্‌ল্‌স্‌ ডেমোক্রেসী নয় যা কংস-শাসনের নামান্তর।

এশিয়াতে যে সব দেশে আজও ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং কয়েক বছর অন্তর মুক্ত নির্বাচন নেই সেই সব রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ '৭১ এ বাঙালী গণতন্ত্রের জয়ে আশান্বিত।

এশিয়া মহাদেশে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে সৈন্যরা নির্বাচনী গণতন্ত্র মারফৎ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বৈপ্লবিক যুদ্ধে নেমেছে এবং যুদ্ধজয়ের পর গণতন্ত্রী সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে মুজিবের ব্যক্তিত্বে। অনেকে বলেন বাংলা মুক্ত হয়েছে ১৬ই ডিসেম্বর। আবার অনেকের ধারণা বাংলা মুক্ত হয়েছে ২৬শে মার্চ, রাত্রি ১২টা ৫ মিনিটে যখন মুজিব চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের জনাব জহুর

আহমেদ চৌধুরীর কাছে বিশেষ বেতার বার্তায় বলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন, বাঙালী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ আরম্ভ করুক।" ১২টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানীরা মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। ঐদিন, ঐ মুহূর্তে বাঙালী জাতি পলাশীর কলংক থেকে মুক্তি পেলো ; অতীত ইতিহাসের কাছে তার ঋণ এক অমিতদানে শোধ হয়ে গেল।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর এক দুরন্ত আশা নিয়ে লিখেছিলুম (সাপ্তাহিক যুগবাণী, ২৪শে মে ঃ— "ফিরবে সকলেই, কেউ আগে, কেউ পরে ; গৌরভূমি আবার গৌরজনের তীর্থে পরিণত হবে। এখন রাত্রি। অগণিত বংগ সন্তানের অভিন্ন আশা-আকাংখা মূর্ত হয়ে উঠবে নবপ্রভাতের সূচনায়, যেমন লক্ষ তারকার বক্ষ-শোণিত দিয়ে অরুণোদয়ের সৃষ্টি হয়। সেই মহা সন্ধিক্ষণ প্রাচীর যুগসন্ধিক্ষণ। সেই পরমক্ষণের বোধনের আয়োজন হোক। রাখীপূর্ণিমার দিন ভাই ভায়ের হাতে রাখী পড়িয়ে বলুক, "বয়ং পঞ্চাধিকং শতম।"

পূণ্যশ্লোক সান ইয়াট সেন ছাড়া চীন বিপ্লব (১৯১১), মহাবীর কেমাল আতাতুর্ক ছাড়া তুর্কী বিপ্লব যেমন সম্ভব হত না তেমনি মহানায়ক মুজিব ছাড়া মহান বাঙালী বিপ্লব সম্ভব হত না। সারা এশিয়াতে বাংলাভাষীরাই একমাত্র গোষ্ঠী যাদের ভেতর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে একের পর এক —রামমোহন, অরবিন্দ, সূর্য্য সেন, সুভাষ ও মুজিব। বংগবন্ধু হয়ত স্বভাবসুলভ বিনয় বশতঃ বলেছেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের সমকক্ষ নন কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার ফলে তিনি অবশ্যই তাঁদের সমকক্ষ। এইসব বিরাট পুরুষদের চরিত্রে কয়েকটি স্বর্ণসূত্রের যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় ; সেটা হল স্বাধীনচিত্ততা অর্থাৎ কারও সুপারিশ না নিয়ে রাজনীতি করা। দ্বিতীয় গুণ হল ত্যাগ। তাঁর নিজের কবর খোঁড়া হচ্ছে দেখেও তিনি জাতির কাছে দেওয়া শপথ ভংগ করেন নি। মুজিবকে হত্যা না করার জন্যে ভুট্টো বাহাদুরী চান। এই ব্যাপারে আমি বিলেতের কাগজে লিখেছিলুম, "He wants credit for not doing something which in the first place he is not supposed to do." এছাড়া ভুট্টোর আর একটা ভয় ছিল ; পশ্চিমা শক্তি-গুলো দানাপানি বন্ধ করবে। কারণ মুজিব হত্যার কলংক শেষ অবধি ওদের ওপর বর্ত্তাবে।

বাঙালী যখন ত্যাগ করেছে তখন সে রাজা, যেমন অরবিন্দ, দেশবন্ধু, সূর্য্য সেন, সুভাষ ও বংগবন্ধু। বাঙালী যখন ভোগ করেছে তখন সে বিদেশীর ক্রীত-দাস। এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বাঙালীকে যুগ যুগ ধরে মহত্ব থেকে বঞ্চিত রেখেছে। মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালী জাতি ১৯৭১-এ ত্যাগ বেছে নিয়েছিল। তারই ফল স্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করার দিন বহু রাজাকার হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধা সাজেন, বহু দালাল দেশপ্রেমিক সাজেন। ক্ষমাপ্রবণ মুজিব ভেবেছিলেন যে এই বদমায়েসের দলকে ভাল-বাসা দিয়ে জয় করবেন। তার উল্টোটাই সম্ভব হয়েছে। এরা বছরের পর বছর আওয়ামী লীগের ছত্রছায়াতলে থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেছে। একবার বিরক্ত হয়ে মুজিব জনসভায় বলেন, "যারে কাজের ভার দি সেই চুরি করে"।

গণতন্ত্রে আইনানুবর্তিতা অগণতান্ত্রিক নয়, দোষীর শাস্তিবিধান পাপ নয়। উপরন্তু দোষীদের তৎপরতার সংগে সাজা না দেওয়া হল দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক-দের বঞ্চনা করা, সংবিধানকে অবজ্ঞা করা। ক্ষমাপ্রবণ

মুজিব শুধু দোষীদের ক্ষমা করলেন তা নয়, অধিকন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ হত্যাকারীদের স্থান দিলেন রাজনীতিতে, ব্যবসায়ে, কূটনীতিতে ও সৈন্যবাহিনীতে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট, মধ্যরাত্রে এই খুনেরা মুজিব ও তার পরিবারবর্গকে নিকেশ করলো।

মহানায়কের মৃত্যুতে ঝাঁপি থেকে সাম্প্রদায়িকতার সর্পকুল আবার ফণা তুলিয়ে বেরিয়ে এল। মুজিব বাঙালীর মনকে পশ্চিম এশিয়ার বীভৎস "দাদা ও গদা"র রাজনীতি থেকে বাংলার শ্যামল গণতান্ত্রিক সমতলভূমিতে এনেছিলেন। মুষ্টিমেয় খুনেরার এক মুহূর্তের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় বাঙালীর মন আবার ফিরে গেল পশ্চিম এশিয়ার অনুর্বর মরুতে, সাম্প্রতিক ইতিহাসে যার অধিবাসীদের কোনও দান নেই। নজরুলের ভাষায় "তুরগ ভাবিয়া মোরগে চরিনু।" জগৎ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। বাঙালী জাতি ভাবলে, "খুনই কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ!" বাংলা মা ভয়ে শিউরে উঠে চোখে আঁচল দিলেন। খুনেরা বড়াই করলো যে মুজিব হত্যার প্রতিবাদ হয়নি। যে দেশে গর্ভবতী নারী ও শিশুকে রাজনীতির নামে হত্যা করা হয় সে দেশে প্রতিবাদ করবে কে? করবে, তবে পরে। সে প্রতিবাদের আভাস কোনও গুপ্তচর বিভাগ দেবে না।

মহানায়ককে হত্যা করে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে তার খেসারৎ নেই। সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর দেশ যে শোকতাপ ভোগ করবে তার সান্ত্বনা নেই। পাপীদের যে শাস্তি ভোগ করতে হবে তার তুলনায় খাণ্ডবদাহন মনে হবে চড়ুইভাতি। কারণ ৭১-এর পর বাঙালী জাতি ১৭৫৭-র বাঙালী নয়।

সিরাজ হত্যাকারীদের পরিণামটাও চমকপ্রদ: লর্ড ক্লাইভ—আত্মহত্যা, মীরজাফর—দুরারোগ্য ব্যাধিতে, জগৎ শেঠকে মুংগেরের দুর্গপ্রাকার থেকে আছড়ে মেরে ফেলা হয়, মীরজাফর পুত্র মীরণ—বজ্রাঘাতে, উমিচাঁদ (বা আমীর চান্দ্) উন্মাদরোগে এবং মহম্মদী বেগকে (জনশ্রুতি) তাঁর স্ত্রী বিষপ্রয়োগে হত্যা করে।

সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল (ইংরেজের ইতিহাসে) যে ইনি অতি নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন। অধীনের ধারণা সিরাজ যদি আর একটু নিষ্ঠুর হতেন তাহলে বাংলা পলাশীর কলংক থেকে রক্ষে পেত। মুজিবের বিরুদ্ধে লেখকের অভিযোগ একই; ইনি যদি দালালদের ওপর একটু নিষ্ঠুর হতেন তাহলে বাংলাদেশ পিতৃহত্যার কলংক থেকে বঁচত, জাতির পিতাও বাঁচতেন।

পলাশীর পাপের বোঝা নামাতে বাঙালীর ২১৫ বছর লেগেছে। '৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পাপের বোঝা নামাতে বাঙালীর কতদিন লাগবে কে জানে।

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

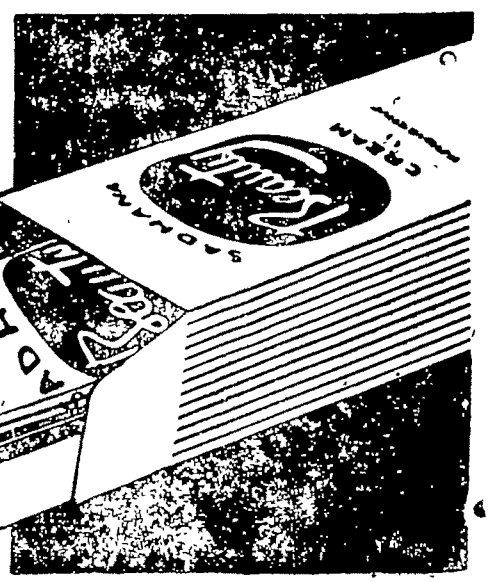

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

সূর্যের জীবন-প্রগতি

অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য হোল আকাশে ভাসমান অতীব উজ্জ্বল একটা বস্তু যার সাথে একেবারে শৈশব থেকেই আমরা পরিচিত। সূর্যকে আমরা কতটা জেনেছি বা বুঝেছি সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু একথা ঠিক যে এই বস্তুটি সমাজের সব রকম মানুষের মনেই গভীর-ভাবে রেখাপাত করেছে, ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে। একটা শিশুর কথাই ধরা যাক। শিশু যা কিছু দেখে তাকে নিয়ে নানা রকম আবোল-তাবোল রচনা করে। চাঁদ-মামা, সূর্য-মামা—এ সব হোল তার দৈনন্দিন মুখের বুলি। কাজেই শিশুর কাছে সূর্য হোল মামা, অর্থাৎ মস্ত এক আবদারের জিনিষ। যে কবি, সে সূর্যকে নিয়ে কবিতা লেখে। যে লেখক, সে সূর্যকে নিয়ে নানা রকম সুন্দর সুন্দর আজগুবি বা রূপকথার গল্প রচনা করে। যে পূজারী সে তাকে উপাসনা করে। যে বৈজ্ঞানিক তার কাছে সূর্য হোল কঠিন এক গবেষণার বস্তু। আর আমাদের মত সাধারণ মানুষের কি অভিজ্ঞতা? আমরা দেখি ভোর ছ'টা নাগাদ পুব দিগন্তটাকে রক্তিম বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে সূর্য-মামা ধীরে ধীরে আকাশে ওঠে। এর পর সারাদিন ধরে আমরা তার কাছ থেকে তাপ ও আলোক-শক্তি পাই। তার পর বিকেল ছ'টা নাগাদ পশ্চিম দিগন্তটাকে রক্তের মত লাল করে ধীরে ধীরে সূর্য-মামা ডুবে যায়। তার পর ঘনিয়ে আসে নিশা। নিশাকাল শেষ হলে দেখা যায় যে পুব দিগন্তটা রক্তের মত লাল করে সূর্য-মামা আবার আবির্ভূত হচ্ছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, আমরা এই একই ঘটনা দেখে আসছি। আমরা সাধারণ মানুষ; আমরা কবিতা লিখতে পারি না, গল্পও রচনা করতে পরি না। কিন্তু একটা সাধারণ প্রশ্ন আমাদের সকলের মনেই জাগে। সেটা হোল—সূর্য এইভাবে আর কতদিন এই ধরাধামকে তাপ ও আলোক-শক্তি প্রদান করবে? সব মামাই তো একদিন মারা যায়। এই মামা কি কোনদিন মরবে না? না কি চিরকালই বেঁচে থাকবে? আমাদের কাছে এটা সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মহলে এ এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিন্তু জটিল প্রশ্ন। বহু যুক্তি ও গাণিতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা আজ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে হ্যাঁ, অন্যান্য মামার মত সূর্য-মামাকেও একদিন মরতে হবে। কিভাবে তার মরণ হবে সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক।

সবচেয়ে আমরা প্রথমে প্রশ্ন করি—সূর্য জিনিষটা কি? সূর্যকে আমরা দু'ভাবে সংজ্ঞা দিতে পারি। একটা হোল সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা, আর একটা হোল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা। সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা হল এই যে—সূর্য অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন বিশাল একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। এর ব্যাস প্রায় ৯ লক্ষ মাইল এবং আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ। অর্থাৎ, ১৩ লক্ষ পৃথিবী অনায়াসেই তার মধ্যে স্থান পেতে পারে। সূর্যের ভর প্রায় $১০^{৩৪}$ গ্রাম অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় সে প্রায় ৩ লক্ষ ৩২

হাজার গুণ ভারী। সূর্য-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হোল প্রায় ৬ হাজার ডিগ্রী কেলভিন ; কেন্দ্রের তাপমাত্রা যে কত তা এখনও বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে জানেন না। তবে তা আনুমানিক ২ কোটি ডিগ্রী কেলভিনেরও অধিক। কাজেই সূর্যের কেন্দ্র ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত। পৃথিবী যেমন তার নিজস্ব অক্ষের চতুর্দিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছে, সূর্যও তেমনি প্রায় ২৬ দিনে নিজস্ব অক্ষের চতুর্দিকে একবার করে পাক খায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা হোল—"Sun is a G type star" অর্থাৎ সূর্য হোল G শ্রেণীর একটি নক্ষত্র। আকাশে দৃশ্য যে সব বস্তুর নিজস্ব আলো আছে তাদেরই আমরা বলি নক্ষত্র। আর যাদের নিজেদের কোন আলো নেই, অপরের আলো প্রতিফলিত করে মাত্র, তারা হোল গ্রহ বা উপগ্রহ। যেহেতু সূর্য স্বপ্রভ বস্তু কাজেই সূর্য হোল একটি নক্ষত্র এবং তাকে বলা হচ্ছে G শ্রেণীর নক্ষত্র। "G শ্রেণী" কথাটার ঠিক অর্থটা কি তাই দেখা যাক। আকাশে আমরা হাজার হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, এদের সকলের রঙ এক রকম নয়। কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ আবার নীলাভ সাদা ইত্যাদি। নক্ষত্রদের রঙ এবং তাদের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা বিচার করে তাদের মোট দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ

শ্রেণী	রঙ	পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা (ডিগ্রী কেলভিন)
O	নীল	২৫,০০০ বা ততোধিক
B	নীলাভ-সাদা	১১,০০০—২৫,০০০ পর্যন্ত
A	সাদা	৭,৫০০—১১,০০০ পর্যন্ত
F	হলদেটে-সাদা	৬,২০০—৭,৫০০ পর্যন্ত
G	হলুদ	৫,০০০—৬,২০০ পর্যন্ত
K	কমলা	৩,৬০০—৫,০০০ পর্যন্ত
M, R, N, S	মোটামুটি ভাবে লাল	২,৫০০—৩,৬০০ পর্যন্ত

সূর্যের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা প্রায় ৬ হাজার ডিগ্রী কেলভিন। সুতরাং উপরের এই ছক থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে সূর্য হোল G শ্রেণীর নক্ষত্র। কোন তারার রঙ দেখে আমরা এই ছক থেকে তার পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ধারণা করতে পারি। যেমন লুব্ধক তারার নাম আমরা সবাই শুনেছি। সারা বছরে যত তারা দেখা যায় তার মধ্যে এটাই হোল আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল। শীতকালে কালপুরুষ নক্ষত্র-মণ্ডলের কিছুটা বাঁ পাশে একে দেখা যায়। রঙ সাদা। উপরের ছক থেকে বোঝা যাচ্ছে সে A শ্রেণীর নক্ষত্র যার পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা খুবই উচ্চ।

সূর্যের সংজ্ঞা আমরা পেলাম। এবার আমরা আসছি সূর্যের structure অর্থাৎ তার দেহের গঠন-প্রকৃতিতে। খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারছি যে সূর্যের যা তাপমাত্রা তাতে ওখানে কোন কঠিন বা তরল পদার্থের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কাজেই ওখানে সব কিছুই রয়েছে গ্যাসীয় অবস্থায়। তবে সূক্ষ্মরূপে বিচার করলে গ্যাসীয় অবস্থা বললেও ভুল হবে। সাধারণভাবে দেখলে পদার্থের তিন অবস্থা ঃ

(১) (২) (৩)
কঠিন →তরল→গ্যাসীয়
তাপ তাপ

এর পরেও যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করে যাই তাহলে এক সময় এমন এক অবস্থা আসবে যখন পরমাণুর দেহ থেকে তার ইলেকট্রন কণিকাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পরমাণুর দেহে ইলেকট্রন কণাগুলো অবিরাম নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে চলেছে। ইলেকট্রন কণাগুলো পালিয়ে যেতে পারছে না, তার কারণ হোল তাকে বেঁধে রেখেছে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণজনিত বল। গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় যে, যত

আমরা তাপ প্রয়োগ করতে থাকব, ইলেকট্রন কণা-গুলো তত দূরে সরে যেতে থাকবে, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের সাথে তার আকর্ষণজনিত বন্ধন তত শিথিল হতে থাকবে। শেষে এমন এক অবস্থা আসবে যখন ইলেকট্রন এতই দূরে চলে যাবে যে নিউক্লিয়াস তাকে আর বেঁধে রাখতে পারবে না। ইলেকট্রন একেবারেই পালিয়ে যাবে। ফলে পরমাণুর দেহ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক অংশ হবে পজিটিভ-চার্জ নিউ-ক্লিয়াস এবং অপর অংশ হবে নেগেটিভ-চার্জ ইলেক-ট্রন। এটাই হোল পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। একে বলা হয় আয়নিত অবস্থা বা প্লাজ্‌মা অবস্থা। কাজেই প্লাজ্‌মা বলতে আমরা বুঝি বেশ কিছু পজিটিভ ও নেগেটিভ-চার্জবিশিষ্ট কণিকার সমষ্টি। যেমন হাই-ড্রোজেন গ্যাস যে তাপমাত্রায় প্লাজ্‌মা অবস্থায় পরিণত হয়, তা হোল প্রায় ১ লক্ষ ডিগ্রী কেলভিন। কাজেই পদার্থকে চতুর্থ অবস্থায় নিয়ে যেতে গেলে চাই প্রভূত পরিমাণ তাপ। সূর্যের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা প্রায় ৬ হাজার ডিগ্রী কেলভিন ও কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ২ কোটি ডিগ্রী। কাজেই সূর্যের কেন্দ্রের দিকে পদার্থ থাকে প্লাজ্‌মা অবস্থায় ও পৃষ্ঠের কাছাকাছি স্থানে থাকে গ্যাসীয় অবস্থায়। কাজেই সূক্ষ্মরূপে সূর্যকে গ্যাসীয় পিণ্ড না বলে বলা উচিৎ আংশিক গ্যাসীয় ও আংশিক প্লাজ্‌মা পিণ্ড। সূর্যের সমগ্র দেহকে মোটামুটি ভাবে চারটি অংশে ভাগ করা যায়। যেমন (১) নিউক্লিয়াস (২) আলোক-মণ্ডল (৩) বর্ণ-মণ্ডল ও (৪) ছটা-মণ্ডল। নিউক্লিয়াস নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এ হোল সূর্যের একেবারে কেন্দ্রের দিকের অঞ্চল যা ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত। এই অঞ্চলের তাপমাত্রাই হোল অনুমানিক ২ কোটি ডিগ্রী কেলভিন এবং এখানেই পদার্থ থাকে প্লাজ্‌মা অবস্থায়। নিউক্লিয়াসকে বলা যেতে পারে সূর্যের রান্নাঘর; কেননা রান্নাঘরে যেমন খাবারদাবার তৈরী হয় এখানেও ঠিক এক ধরণের বিক্রিয়া অবিরাম ঘটে চলেছে যারই ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অফুরন্ত শক্তি। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আছে যে স্তর তাকে বলা হয় আলোক-মণ্ডল। আলোক-মণ্ডল গোলকটির ব্যাস প্রায় ৭½ লক্ষ মাইল। সূর্যের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা ৬ হাজার ডিগ্রী কেলভিন বলতে বোঝায় এই আলোক-মণ্ডল গোলকটিরই পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা। নিউক্লিয়াসে সৃষ্টি হচ্ছে শক্তি আর সেই শক্তিই চতুর্দিকে বিকিরণ হচ্ছে আলোক-মণ্ডলের সমগ্র পৃষ্ঠদেশ থেকে। এই জন্যই আলোক-মণ্ডল অতীব উজ্জ্বল। আলোক-মণ্ডলের ঠিক পরে যে স্তরটি রয়েছে তার নাম বর্ণ-মণ্ডল। এই বর্ণ-মণ্ডলের বেধ ৫ থেকে ৭ হাজার মাইলের মত। আলোক-মণ্ডলের অত্যধিক ঔজ্জ্বল্যের জন্য এই বর্ণ-মণ্ডলকে সাধারণ অবস্থায় দেখা যায় না। তাকে দেখা যায় শুধু একটি বিশেষ মুহূর্তে। তা হোল পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময়। যখন পূর্ণ সূর্য-গ্রহণ হয় তখন চাঁদ এসে অতীব উজ্জ্বল আলোক-মণ্ডলকে একেবারে ঢেকে ফেলে। ফলে আমাদের চোখে তা একটা কালো রঙের চাকৃতির মত দেখায়। কৃষ্ণকায় এই চাকৃতির চতুর্দিকে তখন গোলাপী বা ঈষৎ রক্তিম আভায় একটি বলয়রূপে এই বর্ণ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই সুন্দর রঙের জন্যই তাকে বলা হয় বর্ণ-মণ্ডল। বর্ণ-মণ্ডলের পরে যে স্তরটি রয়েছে তার নাম ছটা-মণ্ডল। এটাই হোল সর্বশেষ স্তর। এর বেধ ৫০ হাজার মাইলের কিছু বেশী। আলোক-মণ্ডলের ভয়ঙ্কর তীব্রতার দরুণ এই স্তরটিকে সাধারণ অবস্থায় দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময়। সূর্যের আবহ-মণ্ডলের গড় ঘনত্ব ১·৪ গ্রাম, প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে।

গ্যাসীয় আবহ-মণ্ডলের কথা চিন্তা করলে এই ঘনত্ব খুবই বেশী। তাহলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে সূর্যদেহে পদার্থ রয়েছে ভীষণ ঘনীভূত অবস্থায়। অতটা ঘনীভবনের কারণ হোল সূর্যের প্রবল অভিকর্ষজ বল। সূর্যে অভিকর্ষের মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩০ গুণ বেশী।

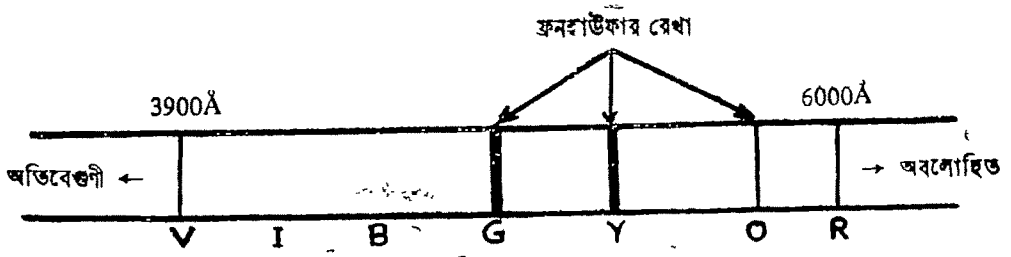

চিত্র—১

এবারে প্রশ্ন করা যাক, সূর্য দেহ কি কি উপাদানে গঠিত? সৌর-বর্ণালীর কথা আমরা সবাই জানি। এ হোল এক দীর্ঘ বর্ণালী, যার বিস্তৃতি অবলোহিত থেকে অতিবেগুণী রশ্মি পর্যন্ত। এরই মধ্যখানে রয়েছে আমাদের অতি পরিচিত VIBGYOR বর্ণালী যার নিজস্ব বিস্তৃতি হোল ৩৯০০ থেকে প্রায় ৮০০০ Å পর্যন্ত। এই VIBGYOR বর্ণালীর একটা বৈশিষ্ট হোল এই যে, এর মধ্যে এখানে-ওখানে নানা স্থানে কতকগুলি কালো কালো রেখা দেখতে পাওয়া যায়। এদেরকে সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন ১৮১৪ সনে জার্মানীর বিজ্ঞানী ফ্রনহাউফার এবং তাই জন্য এদেরকে বলা হয় ফ্রনহাউফার রেখা। এই ফ্রনহাউফার রেখা-গুলির উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের কাছে একটা খুবই সৌভাগ্যজনক ব্যাপার, কেন না এদের সাহায্য নিয়েই বিজ্ঞানীরা বলতে পেরেছেন যে সূর্য-দেহে কি কি মৌলিক পদার্থ রয়েছে। কি ভাবে তাঁরা বলতে পেরেছেন তা বুঝবার আগে আমরা আলোক-রশ্মির উৎস সম্পর্কে দু-একটা কথা জেনে নিই। আলোক-রশ্মি আসে কি ভাবে? কোয়ান্টাম-তত্ত্ব বলে যে, পরমাণু-দেহের একটা ইলেকট্রন কণা যখন কোন উচ্চতর শক্তির অবস্থা থেকে নিম্নতর শক্তির অবস্থায় অবতরণ করে, তখন অতিরিক্ত শক্তিটুকু সে আলোক-রশ্মি রূপে বিকিরণ করে দেয়। বিকিরিত এই শক্তিটুকুই আমাদের চোখে 'λ'-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটা আলোক রশ্মি হিসাবে ধরা দেয় (চিত্র ২-ক)। এখন মনে করা যাক্, সাধারণ অবস্থায় ইলেকট্রন কণা যখন নিম্নতর শক্তির অবস্থায় রয়েছে, তখন আমরা 'λ'-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক-রশ্মি দিয়ে আঘাত করলাম। তাহলে কি হবে? এক্ষেত্রে ইলেকট্রন কণাটি এমন পরিমাণ শক্তি পেল যা তাকে নিম্নতর থেকে ঠিক উচ্চতর শক্তির অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং ইলেকট্রন কণাটি উচ্চতর শক্তির অবস্থায় আরোহণ করবে

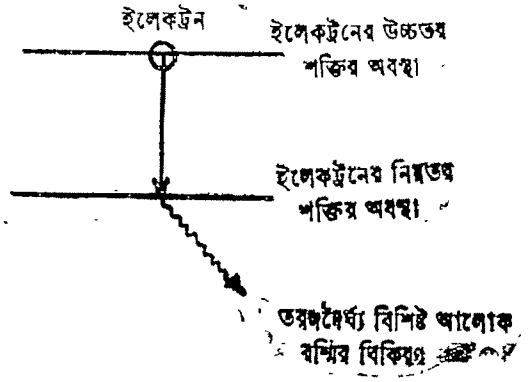

চিত্র ২ক

এবং আলোক-রশ্মিটুকু সম্পূর্ণ রূপে শোষিত হবে (চিত্র ২-খ)। তাহলে আমরা খুব সহজেই

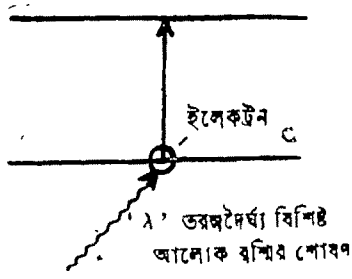

চিত্র—২খ

বুঝতে পারছি যে কোন পদার্থ যদি 'λ'-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক-রশ্মি বিকিরণ করতে পারে তবে সেই পদার্থ নিশ্চয় 'λ'-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক রশ্মি শোষণও করতে পারবে। যেমন পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে হাইড্রোজেন গ্যাস ৬৫৬২ Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট লাল রঙের আলোক-রশ্মি বিকিরণ করে। তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস ঐ লাল রঙের আলোক-রশ্মিটি শোষণও করতে পারবে। এই সহজ উদাহারণটি আমরা এবারে সূর্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব। আমরা জানি, যে যা কিছু আলোক-রশ্মি—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সব কিছুই বিকিরিত হচ্ছে আলোক-মণ্ডল গোলকটির পৃষ্ঠ থেকে। এই সব আলোক-রশ্মিগুলি যখন বর্ণ-মণ্ডলকে ভেদ করে আসে তখন কিছু কিছু আলোক-রশ্মিকে বর্ণ-মণ্ডল শোষণ করে নেয়। কোন্ কোন্ আলোক-রশ্মি শোষিত হবে তা নির্ভর করবে বর্ণ-মণ্ডলে কি কি উপাদান আছে। যারা যারা শোষিত হয়ে গেল তারা আর আমাদের চোখে ধরা দেবে না। VIBGYOR বর্ণালীতে এরা নিখোঁজ রশ্মি হিসাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এই নিখোঁজ রশ্মিগুলো আর কিছুই নয়—এরাই হোল সেই ফ্রনহাউফার রেখা। সৌর-বর্ণালীতে এরূপ একটি নিখোঁজ রশ্মির স্থানাঙ্ক হোল ৬৫৬২ Å। এ-থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সূর্যে হাইড্রোজেন বিদ্যমান, তা নাহলে ৬৫৬২ Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক-রশ্মিটি শোষিত হোত না। আমাদের কাছে এটা খুব গৌরবের বিষয় যে আমাদের দেশেরই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মনীষী ডঃ মেঘনাদ সাহা সৌর-বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে সূর্যের মোট ভরের প্রায় ৮১ শতাংশ হোল হাইড্রোজেন, ১৮ শতাংশ হিলিয়াম ও বাকী ১ শতাংশ কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা, তামা ইত্যাদির সংমিশ্রণ।

এবারে আসা যাক্ সৌর-শক্তিতে। সূর্য-পৃষ্ঠ থেকে যে পরিমাণ শক্তি বহির্বিশ্বে বিকীর্ণ হচ্ছে তার হার হোল প্রায় $১০^{৩৩}$ আর্গ প্রতি সেকেণ্ডে, এই সংখ্যাটি যে কত বড় তা হয়ত চট্ করে আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। জিনিষটাকে একটু অন্যভাবে দেখা যাক্। আমরা তো জানি পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণ জল আছে। জলের বড় বড় আধারগুলো হোল প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরও কিছু সাগর ও উপসাগর। এদের সমস্ত জলকে যদি একত্রিত করা যায় তবে মোট জলের পরিমাণ দাড়াবে আনুমানিক $১০^{২১}$ কিলোগ্রাম। সূর্য থেকে এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে তা যদি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান যায় তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠের এই বিশাল জলরাশিকে বাষ্পীভূত করতে সময় নেবে ১ থেকে ১½ সেকেণ্ডের মত। কাজেই সূর্য যে কি প্রভূত শক্তির অধিকারী তা সহজেই অনুমেয়। এত শক্তির উৎসটা কি? বিজ্ঞানীদের মহলে এ এক অনেক দিনের প্রশ্ন। ১৯৩৯ সনে মার্কিন বিজ্ঞানী বেথে এবং ক্রিচ্‌ফেল্ড সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের জবাব দেন। এই বিজ্ঞানীদ্বয় বলেন যে সূর্যদেহের ঐ উচ্চ

তাপমাত্রায় এক ধরণের বিক্রিয়া অবিরাম ঘটে চলেছে এবং তারই ফলে সৃষ্টি হচ্ছে প্রভূত শক্তি। প্রভূত শক্তি সৃষ্টিকারী এই বিক্রিয়ার নাম ফিউসন্ বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার মূল কথাটা হোল এই রূপ—দুটো হাল্কা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কথা চিন্তা করা যাক্, যেমন হাইড্রোজেন, ডিউটেরন ইত্যাদি। এই দুটি পজিটিভ চার্জ-বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস সর্বদা পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু যদি এরা পরস্পরের খুব কাছে আসতে পারে (দূরত্ব $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি) তখন এদের মধ্যে প্রচণ্ড এক আকর্ষণ-জনিত বল ক্রিয়া করে। এই আকর্ষণজনিত বল তাদের পারস্পরিক বিকর্ষণ বল অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী। এই প্রবল আকর্ষণ বলকে বলা হয় নিউক্লিয়ার বল। ভীষণ শক্তিশালী এই নিউক্লিয়ার বলের দরুণ ঐ দুটো হাল্কা নিউক্লিয়াস, বিকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় নতুন এক নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। একেই বলা হয় ফিউসন বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হোল এই যে নবজাত অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াসটার ভর, দুটো হাল্কা নিউক্লিয়াসের সংযুক্ত ভরের থেকে সামান্য কম। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

$$_1H^2 + _1H^2 \rightarrow _2He^4$$

এখানে দুটো ডিউটেরন নিউক্লিয়াস ফিউসন বিক্রিয়ার ফলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়েছে। দুটো ডিউটেরন নিউক্লিয়াসের মোট ভর $২ \times ২{\cdot}০১৪৭ = ৪{\cdot}০২৯৪$ পারমাণবিক ভরের একক। আর নবজাত হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর ৪·০০৩৮ পারমাণবিক ভরের একক। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে এই ফিউসন বিক্রিয়ার ফলে $(৪{\cdot}০২৯৪ - ৪{\cdot}০০৩৮) = {\cdot}০২৫৬$ একক ভর উধাও হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্য উধাও হয়ে যায় নি। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সমীকরণ অনুযায়ী বলা যায় যে ·০২৫৬ একক ভর আর পদার্থ রূপে বিদ্যমান নেই—তা সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সেই শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট। প্রচুর পরিমাণ শক্তি। এখন এই ফিউসন বিক্রিয়াতে প্রচুর পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় এটা ঠিক কিন্তু বিক্রিয়াটি ঘটান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেন দুরূহ তা বোঝা অবশ্য খুবই সহজ। পজিটিভ চার্জ-বিশিষ্ট হাল্কা নিউক্লিয়াস দুটো সর্বদাই পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। এদের অন্তর্বর্তী দূরত্ব যত কমতে থাকবে, পারস্পরিক বিকর্ষণের মাত্রা তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই প্রবল বিকর্ষণজনিত বাধাকে অতিক্রম করে যদি ঐ দুটো নিউক্লিয়াসকে $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার দূরত্বের মধ্যে আনতে হয় তবে চাই প্রচণ্ড গতিশক্তি। সাধারণ অবস্থায় এতটা গতিশক্তি অর্জন করা ঐ নিউক্লিয়াস দুটোর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সূর্যের ঐ উচ্চ তাপমাত্রায় প্রতিটি বস্তুকণাই প্রচণ্ড গতিশক্তির অধিকারী হয় এবং তারা ফিউসন্ বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হয়। বিজ্ঞানী বেথে ও ক্রিচ্‌ফেল্ড্ বলেন যে এই বিক্রিয়ায় মূল অংশ গ্রহণকারী পদার্থটি হোল হাইড্রোজেন। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :—

কার্বন^{১২} + হাইড্রোজেন^{১} → নাইট্রোজেন^{১৩}

নাইট্রোজেন^{১৩} $\xrightarrow[\text{রূপান্তর}]{\text{তেজস্ক্রিয়}}$ কার্বন^{১৩} + পজিট্রন

কার্বন^{১৩} + হাইড্রোজেন^{১} → নাইট্রোজেন^{১৪}

নাইট্রোজেন^{১৪} + হাইড্রোজেন^{১} → অক্সিজেন^{১৫}

$$\text{অক্সিজেন}^{১৫} \xrightarrow[\text{রূপান্তর}]{\text{তেজস্ক্রিয়}} \text{নাইট্রোজেন}^{১৫} + \text{পজিট্রন্}$$

$$\text{নাইট্রোজেন}^{১৫} + \text{হাইড্রোজেন}^{১} \rightarrow \text{কার্বন}^{১২} + \text{হিলিয়াম}^{৪}$$

$$\text{(মোট) কার্বন}^{১২} + \text{চারটি হাইড্রোজেন}^{১} \rightarrow \text{কার্বন}^{১২} + \text{হিলিয়াম}^{৪} + \text{দুইটি পজিট্রন}$$

উপরোক্ত এই বিক্রিয়ায় যে জিনিষটা লক্ষ্যণীয় তা হোল এই যে বিক্রিয়াটি শুরু হোল কার্বন দিয়ে, শেষও হোল কার্বন দিয়ে। কাজেই কার্বন নিজে অক্ষত থেকে যায় এবং একই বিক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হতে সাহায্য করে। এই জন্য এই বিক্রিয়া-চক্রটিকে বলা হয় কার্বন-চক্র। বিক্রিয়াটি যদি কার্বনের পরিবর্তে নাইট্রোজেন দিয়ে শুরু হয় তাহলেও ঠিক একই ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন নিজে অক্ষত থেকে গিয়ে একই বিক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হতে সহায়তা করে। একে বলা হয় নাইট্রোজেন-চক্র। দুটো বিক্রিয়া-চক্রকে একত্রে বলা হয় কার্বন-নাইট্রোজেন-চক্র। কাজেই এই কার্বন-নাইট্রোজেন-চক্রের প্রকৃত ফল হোল এই যে এতে ৪টি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস থেকে সৃষ্টি হয় একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ও ২টি পজিট্রন্।

$$৪\text{টি হাইড্রোজেন}^{১} \rightarrow ১\text{টি হিলিয়াম}^{৪} + ২\text{টি পজিট্রন্}।$$

এই ফিউসন্ বিক্রিয়া থেকে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় তা হোল ২৭০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট। সূর্য-দেহে প্রতি মুহূর্তে এই রকম হাজারে হাজারে, লাখে লাখে কার্বন-নাইট্রোজেন বিক্রিয়া-চক্র সম্পাদিত হচ্ছে, আর শক্তিও সৃষ্টি হয়ে চলেছে অবিরাম। এই ভাবে সূর্য-দেহে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫৩ কোটি টন হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে প্রায় ৫২½ কোটি টন হিলিয়াম। বাকী ½ কোটি টন পদার্থ আইনস্টাইনের সমীকরণ অনুযায়ী সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এই শক্তিই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহির্বিশ্বে বিকীর্ণ হয়ে চলেছে।

তাহলে আমরা দেখছি যে প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের ভর প্রায় ½ কোটি টন করে কমে আসছে বা প্রতিদিনে কমছে ৪৩ হাজার কোটি টন। কাজেই সূর্যের দেহ দিনে দিনে হাল্কা হয়ে আসছে। এর ফল কি দাঁড়াবে? উপরোক্ত ফিউসন্ বিক্রিয়াটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিক্রিয়ার আগে বস্তু-কণিকার সংখ্যা ৪ এবং বিক্রিয়ার পরে বস্তু-কণার মোট সংখ্যা ৩। কাজেই একটি বিক্রিয়ার চক্র সম্পাদন হওয়া মানে দাঁড়াল পদার্থ-কণিকার সংখ্যা হ্রাস পেল ১। এইভাবে যতদিন যাবে, সূর্য-দেহে মোট পদার্থ-কণিকার সংখ্যা তত হ্রাস পেতে থাকবে। পদার্থ-কণিকার সংখ্যা যত হ্রাস পেতে থাকবে, তাদের গড় গতিশক্তি আবার তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। গতিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফল হোল এই যে কণিকাগুলির দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে। কাজেই এর ফলে সূর্য আয়তনে প্রসারিত হতে থাকবে। কিন্তু কণিকাগুলি যখন দূরে সরে যেতে চাইবে তখন তাদের সূর্যের প্রবল অভিকর্ষ-টানের বিরুদ্ধে বেশ কিছুটা কাজ করতে হবে। ফলে দূরে সরে গিয়ে তাদের গতিশক্তি কমে যাবে। কণাগুলির গতিশক্তি যদি কমে যায় তবে সূর্যের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা কমে যাবে। আবার পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা যদি হ্রাস পায় তবে সূর্যের রঙেরও পরিবর্তন হবে। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে যত দিন যাবে, সূর্য ধীরে ধীরে আয়তনে প্রসারিত হতে থাকবে, তার পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকবে এবং তার রঙ ক্রমশঃ লালের দিকে সরতে থাকবে। এইভাবে শেষে এমন একদিন আসবে যখন সূর্যের সমগ্র হাইড্রোজেনের মজুত একেবারেই ফুরিয়ে যাবে। সেদিন

আর কোন ফিউসন্ বিক্রিয়া হবে না, অর্থাৎ শক্তি আর সৃষ্টি হবে না। সেদিনই সূর্যের এই প্রসারণ বন্ধ হবে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে সমগ্র হাইড্রোজেনের মজুত ফুরিয়ে যেতে মোট সময় লাগবে ১৫০০ কোটি বছর। তার মধ্যে এযাবৎ অতিবাহিত হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি বছর। কাজেই সূর্যের প্রসারণ এখনও প্রায় ১০০০ কোটি বছর ধরে চলতে থাকবে। এইভাবে প্রসারিত হতে হতে হাজার কোটি বছর পরে সূর্য এক বিরাট অবয়ব ধারণ করবে এবং তার রঙ হবে টক্‌টকে লাল। লাল রঙের এই বিরাট সূর্যকে তখন বলা হবে লাল দানব।

তাহলে আমরা দেখছি যে ১ হাজার কোটি বছর বছর পরে সূর্য এমন এক অবস্থা প্রাপ্ত হবে যখন তার দেহে শক্তি আর নতুন করে সৃষ্টি হবে না কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশঃ শক্তি বিকীর্ণ হতে থাকবে। যে সব কণিকারা দূরে পালিয়ে গিয়েছিল সূর্যের প্রবল অভিকর্ষজ টানের ফলে তারা এখন হুড়মুড়িয়ে কেন্দ্রের দিকে নেমে আসতে থাকবে। ফলে সূর্যের সঙ্কোচন হতে থাকবে। এই ধরনের সঙ্কোচনকে বলা হয় অভিকর্ষীয় সঙ্কোচন। এই অভিকর্ষীয় সঙ্কোচনের ফলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হবে এবং সূর্যের আবর্তন বেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। তাপ উদ্ভব হওয়ার দরুণ সূর্যের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকবে এবং রঙেরও পরিবর্তন হতে থাকবে। লাল থেকে হবে কমলা, অতঃপর হলুদ, তারপর হলদেটে সাদা এবং শেষে গিয়ে দাঁড়াবে ধব্‌ধবে সাদা। এই সময় সূর্যের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে ১০ হাজার ডিগ্রীর কাছাকাছি এবং তার তেজ ও ঔজ্জ্বল্য এতই প্রবল হবে যে পৃথিবী পৃষ্ঠের খাল, বিল, নদী, সমুদ্রের জল একেবারে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকবে; মানুষ, পশু, পাখী, গাছপালা সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। সুজলা সুফলা এই পৃথিবী তার সমস্ত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়ে একটা ভয়াল মহাশ্মশানে পরিণত হবে। এই সময় সূর্য অতীব ক্ষুদ্র এক অবয়ব ধারণ করে প্রবল বেগে আবর্তিত হতে থাকবে। ধব্‌ধবে সাদা এই ক্ষুদ্র সূর্যকে তখন বলা হবে শ্বেত বামন। প্রবল আবর্তন বেগের দরুণ এই সময় সূর্য-দেহে ভীষণ এক অপকেন্দ্রিক বল বা বহির্মুখী চাপের সৃষ্টি হবে যার ফলে সূর্যের আর অভিকর্ষীয় সঙ্কোচন হতে পারবে না। কিন্তু অতি উচ্চ তাপমাত্রায় থাকার দরুণ তার দেহ থেকে অবিরাম শক্তি বিকীর্ণ হতে থাকবে। ফলে সূর্য ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকবে, তার তেজ ও ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ কমে আসবে এবং শেষে একদিন একেবারেই নিভে যাবে। সেই দিনই হবে সূর্যের মৃত্যু।

পট-পরিবর্তন

[২৯৪ পৃষ্ঠার পর]

মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি বিভিন্ন রাজ্যসরকারের মুখ্য ও অর্থ-মন্ত্রীদের মতের কাছাকাছি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তান অস্ত্রসজ্জার গতিবেগ বিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে। কাবুলে দাউদ সরকারের বিরুদ্ধে এপ্রিলের বিদ্রোহের নায়ক এবং বর্তমান তারাকী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল খাদের এবং চীফ অফ আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল সাপুর, তারাকী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তারাকী সরকারের পরামর্শদাতা-রূপে সোভিয়েত রুশের বহু অফিসার কাবুলে রয়েছেন।

চীনের সঙ্গে জাপানের শান্তিচুক্তি এবং এই চুক্তিতে 'হেজিমনীর' ('Hegemony') ধারার সংযোজনে সোভিয়েত রুশের বহু বাধা সত্ত্বেও চীনের জেদ বজায় থাকল এবং সোভিয়েত রুশের পক্ষে চরম কূটনৈতিক পরাজয়ের স্মারক হয়ে রইলো। এছাড়া চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হুয়া-কুয়ো ফেংএর দশদিন ব্যাপী পূর্ব ইউরোপ এবং যুগোশ্লাভিরা সফর করে সোভিয়েত রুশের পার্শ্বদেশে 'hegemony'র ধ্বনি তুলে তাকে দুর্বল ও চঞ্চল করে দিয়েও চীনা কম্যুনিস্টরা কূট-নৈতিক সাফল্য লাভ করেছে। এ-ছাড়া কিছুদিন পূর্বে বেলগ্রেডে নন-এলাইনড সম্মেলনে অনুপস্থিত থেকেও চীনা কম্যুনিস্টরা সম্মেলনে সোভিয়েত রুশের মুখপাত্র কিউবাকে যুগোশ্লাভিয়ার হাতে নাজেহাল করিয়েছে—এখানেও সেই 'hegemony'র ধ্বনিই কিউবাকে কুপোকাত করেছে, যদিও ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রী বাজপেয়ী তার মধুর ব্যবহার ও বাক্যস্ফূর্তি দিয়ে সম্মেলনের পূর্ণ পরিণতি টেনে দিতে পেরেছিলেন।

আর একটী গুরুতর বৈঠক বসছে আমেরিকার 'ক্যাম্প ডেভিডে' যেখানে প্রেসিডেন্ট কার্টার, মিশর ও ইসরাইলের সাদাত ও বেগিনের সঙ্গে বৈঠক ও আপসের শেষ চেষ্টা করবেন। কিন্তু দুই-পক্ষই কার্টারের মুরুব্বীয়ানায় খুশী নয়, পুরোটা মানতেও রাজী নয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

ধারাবাহিক প্রবন্ধ
শ্রাবণ সংখ্যার পর
কিস্তি : ১০

বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদ

সুনীল দাস

বিরুদ্ধতা ও পৃথকত্ব নিয়ে আরও বিচার করে পরিষ্কার বুঝতে হবে এই দুই প্রত্যয় একই বস্তুসত্তার বিভিন্ন দিককে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, না এদের প্রয়োগে বস্তু-সত্তার পারস্পরিক মৌলিক বৈষম্য বোঝানো হয়ে থাকে। ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় কতকগুলি বিরুদ্ধতার মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়। আর কতকগুলি বিরুদ্ধতার মধ্যে কোনো আপস চলে না। তার অর্থই হোলো এই যে, কতকগুলি বিরুদ্ধতা আপেক্ষিক আর কতকগুলি মূলগত। যেখানে বিরুদ্ধতার মধ্যে আপস চলে, অর্থাৎ সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব সেখানে বিরুদ্ধতাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আপেক্ষিক বুঝতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ পূর্বে উদ্ধৃত সোলোন-এর (Solon) উক্তিটি বিবেচনা করা যেতে পারে। সোলোনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কোন্ ধাঁচের প্রশাসন সর্বোত্তম? এই প্রশ্নটি করা হয়েছিলো : 'সকল বস্তুই পরিবর্তন-শীল' গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস-এর (Heraclitus) এই বিখ্যাত আবিষ্কারের এক'শ বছর পূর্বে। সোলোন সেই প্রশ্ন শুনে সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছিলেন : সর্বোত্তম প্রশাসনিক গড়ন 'কাদের জন্যই বা এবং কোন্ সময়ের পৃষ্ঠভূমিকাই বা'? হেরাক্লিটাসের এই উত্তরে তিনি বলতে চাইছেন এক এক কালে এক এক যুগে এক এক ধরণের প্রশাসনিক কাঠামো সব চাইতে উপযোগী বলে প্রতিষ্ঠা পায়। এর কোনো সর্বজনীন ও সর্বকালীন গড়ন নেই। যেমন ইতিহাসে কোনো সময় রাজতন্ত্র কালের সঙ্গে খাপ খেয়েছে, মানিয়েছে সে-কালের কোনো দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠাভূমির সঙ্গে। গ্রীক্‌দের নগরভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (city-state) সমকালীন অন্য কোনো মানবগোষ্ঠির সমাজগত জীবনে আত্মপ্রকাশ করে নি। তেমনি রাজতন্ত্রও (monarchy) কোনো সর্বকালীন ও সর্বজনীন রাষ্ট্রিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা পায় নাই। যেমন পায় নাই অভিজাততন্ত্র। গণতন্ত্র ব্যাপক দেশ-কাল জুড়ে প্রতিষ্ঠা পেলেও গণতন্ত্র কোনো কোনো দেশে, কোনো সময়ে রূপান্তরিত হয়েছে স্বৈরতন্ত্রে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরিষদীয় গণতন্ত্রের এই রূপান্তর মাত্র সেদিনের কথা, সমকাল তার সাক্ষী। আবার গণতন্ত্রের তক্‌মার আবেদন যত বেশী ব্যাপক ও গভীর হয়েছে, গণতন্ত্রের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রত্যয়টিকে বজায় রাখবার অনিবার্যতা স্বীকার করে, সেই রূপান্তরিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোকেও গণতন্ত্রের তক্‌মা এঁটে সর্বজনীন করে তুলবার অন্তহীন প্রয়াস চলেছে। 'জনতান্ত্রিক গণতন্ত্র' বা 'পিপ্‌লস ডেমোক্র্যাসী' এমনি একটি রূপান্তরিত রাষ্ট্র কাঠামোর নামকরণ,

পরিষদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে যার সম্পর্ক আসমান-জমিন প্রভেদের সীমানা ছাড়িয়ে প্রায় বিরুদ্ধতার সীমানায় প্রবেশ করে। কিন্তু যখন এই 'পিপল্‌স ডেমোক্র্যাসী' বা 'জনতান্ত্রিক গণতন্ত্র', 'সামরিক স্বৈরশাসনে' পরিণতি পায় তখন এই দুই-এর পৃথকত্ব বা 'otherness' বিরুদ্ধতায় বা 'contradiction'-এ পরিণতি পায়। সুতরাং সার্থক পরিবর্তন কেবলমাত্র বিরুদ্ধতার সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, হেগেলের এই যুক্তি সকল অবস্থাতেই গ্রহণীয় নয়।

সুতরাং আপেক্ষিক বিরুদ্ধতাও একসময় মূলগত বিরুদ্ধতায় পৌঁছে যায়। অর্থাৎ প্রত্যয়ের পৃথকতা বা 'otherness' কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা বা 'contradiction' রূপে উপস্থিত হবে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা, বিরুদ্ধতাই থেকে যাবে। 'সকল মানুষই মরণশীল'—All men are mortal' এই উক্তিটির পাশে অপর একটি বিরুদ্ধ উক্তি 'কতিপয় মানুষ অমর'—'Some men are immortal'—দাঁড় করালে প্রথম উক্তিটি অর্থবহ হবে। এই দুইটি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হলেও দ্বিতীয় উক্তিটি প্রথম উক্তিটির পরিপূরক। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে যে কোনো ঘটনার পারম্পর্য পরস্পর বিরুদ্ধতার সম্পর্কে সম্পর্কিত হলেও তাদের সামঞ্জস্য বিধানের সূত্রও নিহিত রয়েছে এবং তাদের যুক্তিকে পুরানো লজিকের 'বাঁধা-সড়কই'—এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধচারণ করে। হেগেলের ডায়ালেকটিক যুক্তিপদ্ধতি অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে বস্তুসত্তা এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উন্নীত হলে এক বিরুদ্ধসত্তার মধ্য দিয়ে এই রূপান্তরের পথে বস্তুসত্তা অগ্রসর হয়। কারণ ডায়ালেকটিক পদ্ধতিকে কেবলই পথে পথে বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। তার ফলে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উন্নীত হয়ে ডায়ালেকটিকের প্রয়োগ পূর্বস্তরের সত্তার ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে নিয়ে যায়। ডায়ালেকটিকের পদ্ধতির এই পাঠ গুরুতর ভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকে। ডায়ালেকটিক যুক্তি-পদ্ধতি 'বাঁধা সড়কের' যুক্তি-পদ্ধতি থেকেই উৎসারিত এবং ডায়ালেকটিক পদ্ধতি বাঁধা-সড়কের পদ্ধতির বিরোধী এই ধারণাটাই ভ্রান্ত। যুক্তির ক্ষেত্রে একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে আর একটি সূত্রের উদ্ভব হয় এবং তারপর আর একটির, যুক্তির এটাই চিরন্তন পথ। 'বাঁধা-সড়ক' এবং ডায়ালেকটিক এই পথ বর্জন করে কোনো নূতন পথ গ্রহণ করে নাই। কারণ, এ-ছাড়া বিকল্প পথও নাই। তবে ডায়ালেকটিকের পথে যেমন একটি সত্তার বর্জন, বিসর্জন বা বিনশনের পর, অর্থাৎ সেই সত্তার পূর্ণচ্ছেদের পর ডায়ালেকটিক পূর্বসত্তা থেকে উদ্ভূত নূতন সত্তা নিয়ে যাত্রা সুরু করে থাকে—এই বিচার পদ্ধতিটা ভ্রান্ত। 'বাঁধা-সড়ক' বলছে কোনো বস্তু-সত্তার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করতে হলে, সেই বস্তুসত্তাটি কোন্ কোন্ বস্তু নয় তার উল্লেখ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোনো বস্তু-সত্তাই অন্য-নিরপেক্ষ নয়। প্রত্যেক বস্তুকেই অন্য সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখতে হবে। কেউ হয়তো পুত্রের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার বড় ছেলেটি লেখা-পড়ায় কেমন'—জবাব হবে হয়তো 'ভালই' এবং পরমুহূর্তে সেটি সংশোধন হয়ে জবাব হবে 'অমুকের চাইতে ভালো'। এই পরের জবাবটি প্রথমটির চাইতে অনেক বেশী অর্থজ্ঞাপক। তেমনি আমাদের বস্তুজ্ঞানের বেলায় কোনো বস্তুর বিশিষ্ট পরিচয় দিতে হলে, সেই বস্তুটিকে আশে-পাশের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে তবে সেই বস্তুর পূর্ণ পরিচয়ের কাছাকাছি পৌঁছানো যেতে পারে।

'সাইকেল' বললে বুঝতে হবে সেটা 'স্কুটার' নয়, 'মোটর' নয়, 'রিক্সা' নয়, 'ঠেলা গাড়ী' নয়, 'বাস' নয়, 'মিনি' বাস নয়—এই যুক্তির পরম্পরা দিয়ে যে ব্যক্তি কখনও সাইকেল দেখে নাই, অথচ অন্যান্য যানবাহন দেখেছে, তার কাছে বস্তু বিশেষের পরিচয় বিন্যস্ত করতে হবে। এই যুক্তি-পরম্পরার মূল কথাই হোলো বিশ্বের সকল বস্তুই একটি আর একটির সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত যে কোনো একটি বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলবে না। ডায়ালেক-টিক পদ্ধতির 'বিরুদ্ধতা', 'বর্জন', 'বিসর্জন' বা 'বিনশন' অবাস্তব তত্ত্ব। 'পৃথকত্ব', 'বিভিন্নতা' এই তত্ত্বগুলি বস্তুর পরিচয়ে অনিবার্য প্রত্যয়। ডায়ালেক-টিক পদ্ধতি যে 'বিনশন' বা 'বর্জন'-এর কথা বলে, আসলে তা সময়াতিক্রমণের সঙ্গে পরিবর্তন। একই সময়ে কোনো বস্তু যেমন 'সেই বস্তু' এবং 'সেই বস্তু-নয়' হতে পারে না তেমনি কোনো বস্তুর সম্পূর্ণ বিনশনের পর সেই বস্তুর বিনষ্টি থেকে আর একটি বস্তুর আবির্ভাব ঘটলো, সেটাও হতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্যে দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন
(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২·৫০)

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮·০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।
যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ
পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি
গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।
—অল ইণ্ডিয়া রেডিও
দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃঃ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

25 SEP 197

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ জন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/78

Central Registration No. 2870/57. Per Copy Re. 1·00 with Regd. Postage Rs.3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

শারদীয় সংখ্যা ॥ ১৩৮৫

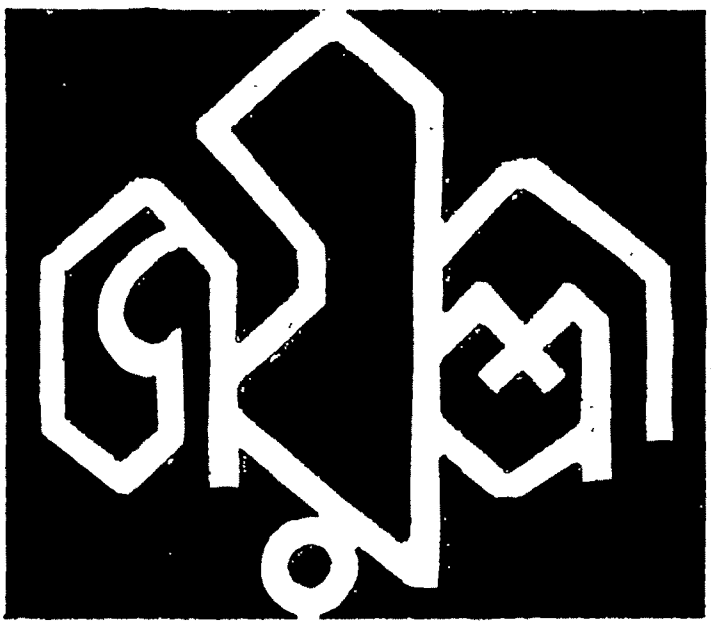

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-১৯২৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

H. V. KAMATH

LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : Rs. 15/-

NANDA MOOKERJEE

NETAJI THROUGH GERMAN LENS : Rs. 20/-

VIVEKANANDAS INFLUENCE ON SUBHAS : Rs. 6/-

NETAJI SPEAKS : VOL. I Rs. 4/-

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় দাম : ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড ৩৪·৫০ এর পরিবর্তে ২৭ টাকায়। বাংলায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় : লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীতার প্রেক্ষায় ৬১টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত। প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের এই বই ভাল লাগবে। দাম : ১০.০০

পূবদেশি উপকথা : দেবাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পূব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গল্প, গণেশ পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম : ৯.০০

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম : ৯.০০

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন : ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম : ২০.০০

রামমোহন : সুরেজিৎ দাশগুপ্ত। দাম : ৬.০০

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

With the best Compliments of :-

S A E (INDIA) LIMITED

30-21, COMMUNITY COMMERCIAL CENTRE

BASANT LOK

VASANT VIHAR

NEW DELHI-110057

PHONE : 67-5425, 67-5427, 67-6026

Gram : SAELINES

Telex : 31-3876 SAE IN

PIONEER IN THE FIELD OF
RAILWAY ELECTRIFICATION & POWER TRANSMISSION
LINES

With best Compliments from :-

The Peerless General Finance & Investment Company Ltd.

ESTD : 1932

Registered Office : **"PEERLESS BHAVAN"**
3, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-69

MORE THAN 100% OF THE COMPANY'S LIABILITY TO ITS CERTIFICATE-HOLDERS ARE KEPT INVESTED IN TRUSTEE AND GOVERNMENT SECURITIES.

With Compliments

From

SREE SARASWATY PRESS LTD.

CALCUTTA-700009

যাত্রা,
নতুন দেশ,
নতুন মানুষের সান্নিধ্য
নয়তো বা ঘরে ফেরা
আনন্দময় দিন খুশীতে উজ্জ্বল হোক
যাত্রা হোক শুভ।

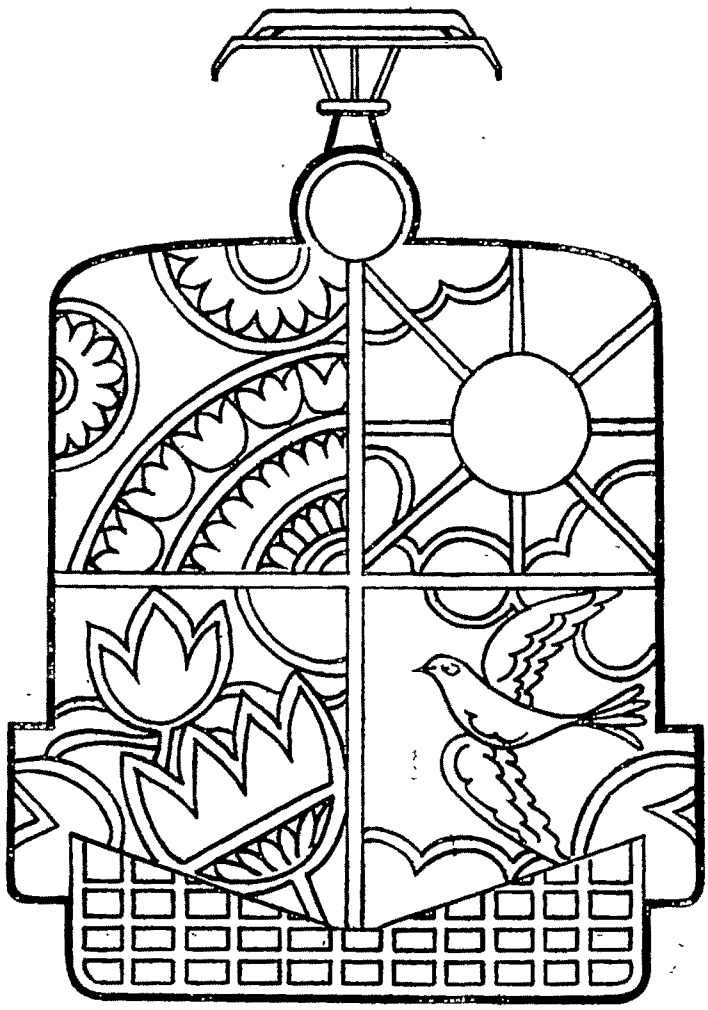

পূর্ব রেলওয়ে

With Best Compliments Of :

PAPER CONVERSION COMPANY

PAPER & BOARD MERCHANTS AND SPECIALIST
IN PAPER CONVERSION

DISTRIBUTOR :

The Titaghur Paper Mill Co. Ltd.

The Bengal Paper Mill Co. Ltd.

Factory :
P-67, C.I.T. Scheme VI M
Calcutta-700054
Phone : 35-1902

Selling Centre :
14/1/1A, Jackson Lane
Calcutta-700001
Phone : 26-3493

With best Compliments from :-

MESSRS. M. M. APPARELS LIMITED

4, SYNAGOGUE STREET

CALCUTTA-700001

Phones :

Office : 26-5901

26-5902

26-9008

Factory : 618-634

Gram : EMEMAPP, CALCUTTA.

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

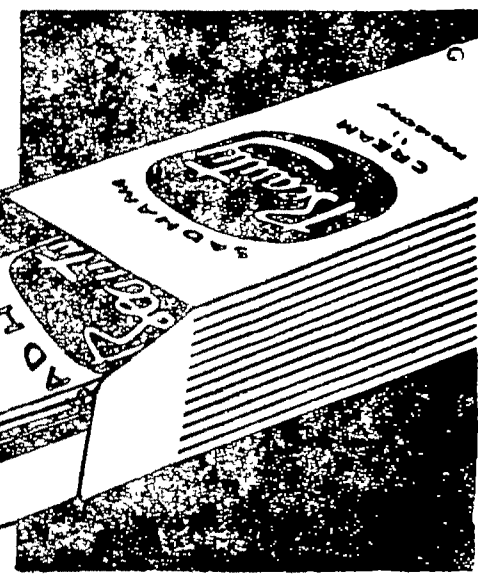

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

এ সুখটানের জবাব নেই!

সর্বাধিক দাম
১ টাকা ১০ পয়সায়
১০টি
স্থানীয় কর সাপেক্ষ

উইলস ভার্জিনিয়া

যার স্বাদ সবার মুখে মুখে

হ্যাঁ, উইলসের তো বটেই!

WVF 3244-1B

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

WALLEM SHIPMANAGEMENT LIMITED

HONGKONG

PART OF THE WALLEM
GROUP OF COMPANIES

SITUATED AT

GAMMON HOUSE
34th—36th FLOORS
HARCOURT ROAD

HONGKONG

SHIPMANAGERS ● SHIPOWNERS ● AVIATION AND TRAVEL ●
OFFSHORE RIGS ● TOWAGE AND SALVAGE

WE SPAN THE GLOBE

জয়শ্রী

সামাজিক সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ আশ্বিন । ১৩৮৫ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

শারদীয়া ৩৩৫

'অস্তিত্বহীন অজানাকে' : ৩৩৯
তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়

আঁখি মোর ঘুম না জানে : চারণিক ৩৪৫

অপ্রকাশিত রচনা

ভারত অন্বেষণে আরব মনীষী : ৩৫১
ক্ষিতিমোহন সেন, শাস্ত্রী

শিক্ষা-ক্ষেত্রে ভাষানীতি ।। আলোচনা ৩৫৭

শিক্ষা-নীতি প্রসঙ্গে : অমলেন্দু বসু ৩৫৯

উচ্চশিক্ষায় ভাষা-পাঠের ভাবনা : ৩৬৬
ভূদেব চৌধুরী

স্বাধীন ভারতের শিক্ষায় ভাষা-সমস্যা : ৩৭০
ত্রিপুরাশংকর সেন

শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

আইনস্টাইন ও মহাবিশ্ব : বিমলেন্দু মিত্র ৩৭৫

এশিয়ার রত্নমালা : ৭

সূর্যসেন : নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৩৮৩

ছোটগল্প

বাহার একটি গরুর নাম : ৩৯৩
আশাদামোহন বাগচী

কাছে-দূরে : বিজনকুমার ঘোষ ৪০০

কবন্ধের মুখ : রুচিরা মুখোপাধ্যায় ৪০৩

আলোচনা

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুসাহিত্য ৪০৭
সুকোমল বসু

বিশ্বরাজনীতি

'হেজিমনি'র তোলপাড় : অভয়শংকর শর্মা ৪১৫

কাহিনী

লোকাল ট্রেনের ছায়ায় : আর্যদেব ৪১৯

স্টেট ব্যাঙ্ক পেশ করছেন টাকা বাড়িয়ে তোলার নানান যোজনা—

যে বয়সে আপনি অপরের ওপর নির্ভরশীল সেই বয়সে নিজের স্বাধীন রোজগারের টাকায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার এক সহজ সুন্দর পন্থা...

আপনি যদি আপনার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অথবা গ্র্যাচুইটি থেকে একটা থোক টাকা পেয়ে থাকেন, তাহলে অবিলম্বে সেই টাকা স্টেট ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট স্কীমে ৫ বছরের বেশী মেয়াদকালের জন্য লগ্নী করে ৯% হারে মোটা রকম সুদ আয় করতে থাকুন। প্রতি ৩ মাস অন্তর বা এমনকি প্রতি মাসে মাসেও, যেটি আপনার প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিকল্পনাই হবে, সেইভাবে সুদ দেওয়া হবে।

আপনি স্বল্প মেয়াদকালের জন্যেও ফিক্সড ডিপোজিটস্ করতে পারেন। সুদের নানান হার আপনার নিকটতম ব্যাঙ্কের শাখাগুলি থেকে পেতে পারেন।

আপনার জমা আমানত থেকে মাসে মাসে যে সুদ আয় করবেন, সেই টাকা আপনি কত ভাবেই না কাজে লাগাতে পারেন। আরও কি, আপনার আসল টাকায় তো মোটেই হাত পড়ছেনা, একদম সুরক্ষিত থাকছে। আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে নামমাত্র সুদে আপনার জমা আমানত থেকে ঋণও পেতে পারেন। এবং আপনি যদি কোথাও স্থান পরিবর্তনের বাসনা করেন, তাহলে অনায়াসে সেই স্থানে আপনার অ্যাকাউন্ট নিয়ে যেতে পারেন। তার কারণ স্টেট ব্যাঙ্ক তো সারা দেশ-জুড়েই তাঁদের ৪৮০০ টিরও বেশী অফিসের বিশাল জাল বিছিয়ে রেখেছেন। আপনি আমাদের যেকোনও অফিস থেকেই অবিলম্বে চটপট সার্ভিসের সকল সুবিধা পাবেন।

মনে রাখবেন, ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমা আমানত এবং অন্যান্য বিশেষ নির্দিষ্ট লগ্নীর ওপর কোনও সম্পদ-কর দিতে হবে না। এবং জমা আমানত ও অনুমোদিত লগ্নীর ওপর অর্জিত ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদ, সম্পূর্ণ আয়কর-মুক্ত।

স্টেট ব্যাঙ্ক
দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক
দেশের ক্ষুদ্রতম লোকের
সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব

স্টেট ব্যাঙ্ক-এর ফিক্সড ডিপোজিটস্

CHAITRA-SBI-381 BEN

কবিতা ৪২৫-৪৩০
শিকড়ের দিকে ঃ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
জীবনকে নিয়ে যায়া ঃ শিবদাস চক্রবর্তী
কেন বলি ঃ শান্তশীল দাশ
যদিও লক্ষ মানুষ ঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
ঘর ঃ বাসুদেব দেব
স্মৃতিচিহ্ন ঃ বিজয়কুমার দত্ত
পুরাতনী ঃ হৃদয় হৃদয়। সামসুল হক
সারারাত ধরে ঘুমের আগুনে ঃ
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিনামাইট ঃ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
গঙ্গা-যাণী ঃ পরিমল চক্রবর্তী
মহাযান্ত্রিক ঃ সুমনা দাস
দুঃখ পেলে ঃ প্রবীর সরকার
মন্দিরা ঃ শংকর দে
অনারূপ ঃ গৌতমকুমার হাজরা
যাওয়া ঃ রথীন্দ্রনাথ রায়
ছেলেটা ঃ শ্যামলকুমার দাশ
আশ্চর্য মাতাল ঃ সন্তোষ চক্রবর্তী
চাঁপা আগুনের ধোঁয়া ঃ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
ইচ্ছা-কলম ঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩১

With best Compliments
from :

General Bearing & Engg. Co.

CALCUTTA - I

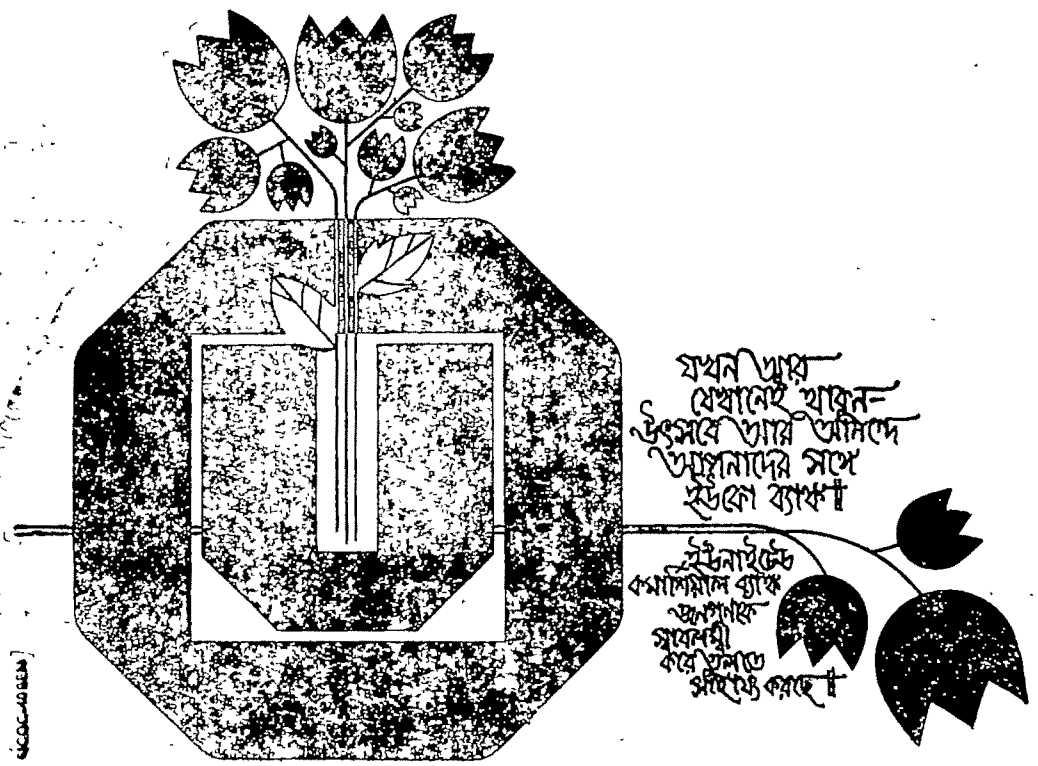

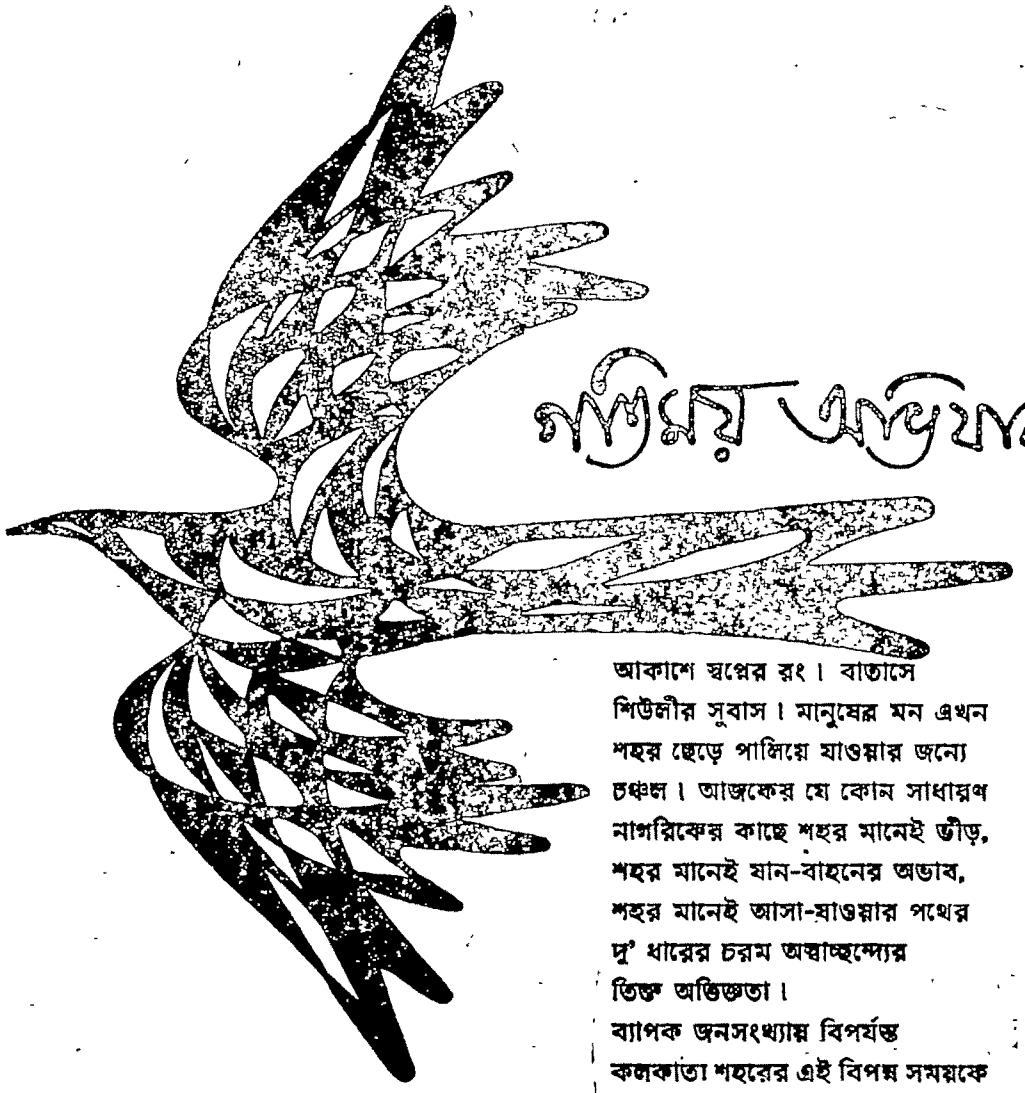

গতিময় অভিযান

আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়, শহর মানেই যান-বাহনের অভাব, শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের দু' ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ রেলের ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক গতিময় অভিযান।

MP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

আপনার আয়কর

কি করে পরিমাপ করবেন ?

আপনি যদি হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত বা কোনো ব্যক্তি বিশেষ হন তবে নীচের তালিকাটি আপনার কাজে লাগতে পারে।*

১৯৭৮-৭৯ সালের আয়কর এবং ১৯৭৮-৭৯-র আর্থিক বছরে প্রদেয় অগ্রিম করের হার

মোট আয়	ব্যক্তি বিশেষ বা হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রদেয় কর (৩নং কলমের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া)		হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের মোট আয় ১০,০০০ টাকার বেশি হলে প্রদেয় কর।	
১	২		৩	
থেকে পর্যন্ত	নির্ধারিত পরিমাণ	এবং নিম্নোক্ত অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য পরিমাণ	নির্ধারিত পরিমাণ	এবং নিম্নোক্ত অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য পরিমাণ
	×		×	
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত				
১০,০০১ ১৫,০০০	×	এবং ৮,০০০ টাকার বেশি হলে ১৫% *	×	এবং ৮,০০০** টাকার বেশি হলে ১৮%
১৫,০০১ ২০,০০০	১,০৫০	এবং ১৫,০০০ টাকার বেশি হলে ১৮%	১,২৬০	এবং ১৫,০০০ টাকার বেশি হলে ২৫%
২০,০০১ ২৫,০০০	১,৯৫০	এবং ২০,০০০ টাকার বেশি হলে ২৫%	২,৫১০	এবং ২০,০০০ টাকার বেশি হলে ৩০%
২৫,০০১ ৩০,০০০	৩,২০০	এবং ২৫,০০০ টাকার বেশি হলে ৩০%	৪,০১০	এবং ২৫,০১০ টাকার বেশি হলে ৪০%
৩০,০০১ ৫০,০০০	৪,৭০০	এবং ৩০,০০০ টাকার বেশি হলে ৪০%	৬,০১০	এবং ৩০,০০০ টাকার বেশি হলে ৫০%
৫০,০০১ ৭০,০০০	১২,৭০০	এবং ৫০,০০০ টাকার বেশি হলে ৫০%	১৬,০১০	এবং ৫০,০০০ টাকার বেশি হলে ৫৫%
৭০,০০০ ১,০০,০০০	২২,৭০০	এবং ৭০,০০০ টাকার বেশি হলে ৫৫%	২৭,০১০	এবং ৭০,০০০ টাকার বেশি হলে ৬০%
১০০,০০১ এবং অধিক	৩৯,২০০	এবং ১,০০,০০০ টাকার বেশি হলে ৬০%		

সারচার্জ উপরিলিখিত হার অনুযায়ী আয়কর দেওয়া ছাড়াও আয়করের ১৫%-এর সমান একটি অতিরিক্ত সারচার্জও দিতে হয়।

* যে ক্ষেত্রে মোট আয় ১০,৫৪০ টাকার বেশি নয়, সে ক্ষেত্রে প্রদেয় আয়করও ১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত মোট আয়ের ৭০%-এর বেশি হবে না।

** যে ক্ষেত্রে মোট আয় ১০,৬৯০ টাকার বেশি নয় সে ক্ষেত্রে প্রদেয় আয়করও ১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত মোট আয়ের ৭০% বেশি হবে না।

* অবিভক্ত হিন্দু পরিবার।

যথাযথ ভাবে কর নিরূপণ করুন—তাড়াতাড়ি কর জমা দিন

ডিরেক্টর অফ ইনস্পেকশান
(গবেষণা, পরিসংখ্যায়ণ ও প্রকাশনা)
আয়কর বিভাগ
নতুন দিল্লী-১১০০০১ davp 78/182/ Bengali

জয়শ্রী

৪৩ বর্ষ। আশ্বিন ১৩৮৫। ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

শারদীয়া

সময় বয়ে চলেছে। আবার শারদীয় পূজা আসছে। জাতীয় জীবনে শক্তি-সাধনার প্রয়োজন কোন দিনই ফুরোবে না। এক অবরোধ ডিঙিয়ে সমতলভূমিতে পৌঁছাবার জন্য যে-সময় মনটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে, দেখা গেলো সেই সবে-পৌঁছানো উপত্যকার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে নূতনতর এক অবরোধের পাহাড়। সুতরাং, আবার চড়াই। চড়াই-এর পর উৎরাই। চক্রবৎ এই পরিবর্তনের অপর নাম-ই জীবন; যাকে এক্ প্রখ্যাত দার্শনিক-ঐতিহাসিক রূপ দিয়েছেন 'Ceaseless quest'—বিরামহীন যাত্রা, এই দুইটি শব্দের ব্যঞ্জনায়। এই অন্তহীন যাত্রায় হারাবার বেদনা আছে, জয়েরও আনন্দ আছে। আনন্দ বেদনা-মথিত এই পরিক্রমা আমাদের প্রতি বছরই দেশ-কালোত্তীর্ণ স্পন্দনের শিহরণ দিয়ে যায়। জীবনের এই স্পন্দন ধ্রুব সত্য, সকল আনন্দ-বেদনার অতিক্রান্ত-পরিক্রমায়, যা আমাদের প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

জয়শ্রীর 'শারদীয় সংখ্যা' সময়ের অতিক্রমণে এমনি একটি স্পন্দনের প্রগাঢ় অভিব্যক্তি। একথা অবশ্যই নিগূঢ়ভাবে সত্য যে প্রতিদিনই আমাদের জীবনের একটি স্পন্দন অবসিত হয়ে আমরা নবতর জীবন-স্পন্দনের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। বিশ্ব-সাহিত্যিক আঁতোল ফ্রাঁস সেই কারণেই বিশ্বমানবের এই সর্ব-জনীন অভিব্যক্তিকে তার অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছেন: ".. we must die to one life before we can enter into another!" এই সামান্য অভিব্যক্তিটুকুও মানুষের জীবনে এক পরম সম্পদ, যা একইকালে তার মনে পুলকের সঞ্চার করে এবং তাকে অশ্রুজলেও সিক্ত ক'রে তোলে।

শারদীয় সংখ্যা জয়শ্রী এমনই একটি অবকাশ। জয়শ্রীর যাঁরা একান্ত আপনার জন ছিলেন, যাঁদের নিষ্ঠায়, পরিশ্রমে, সেবায়, সাহিত্য-প্রতিভায়, সম্পাদনা-সৌকর্যে জয়শ্রী তিল তিল করে বেড়ে উঠে অর্ধ-শতাব্দীকালের জীবনপ্রান্তে পৌঁছালো-প্রায়, তাঁদের অনেকেই আজ মরলোক ত্যাগ ক'রে ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থান করেছেন। প্রতিটি শারদীয়া তাঁদের স্মৃতি আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়, নবতর দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বোধিত ক'রে—শক্তি দান ক'রে।

তাঁদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি 'জয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশনেত্রী

লীলা রায়কে যিনি প্রতিভার দীপ্তি, মমতার আশ্রয় ও পরিশ্রমের নিষ্ঠা দিয়ে জীবনের শেষ কর্মময় দিনগুলি অপটু শরীর নিয়েও জয়শ্রীকে ঘিরে রেখেছিলেন। আরও স্মরণ করছি জয়শ্রীর সর্বোত্তম শুভানুধ্যায়ী দিক্‌পাল সাহিত্যস্রষ্টা আদর্শবাদী বিপ্লবী নেতা অনিল রায়কে, যিনি অকালে মহাপ্রয়াণের পূর্বে 'জয়শ্রী'র পাতায় নেতাজীর জীবনাদর্শকে সর্বপ্রথম রেখাঙ্কিত করে গেছেন।

নূতন যুগের নূতন ভাবধারাকে আত্মস্থ ক'রে জয়শ্রীও কালাতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নবতর যুগকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এই সমন্বয়সাধনই 'জয়শ্রী'র বৈশিষ্ট্য, যা ভারতীয় জীবনবোধের ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠার জন্য 'জয়শ্রী'র নিরন্তর প্রয়াস চলেছে। 'জয়শ্রী'র এই মূল সুরটি অদূর ভবিষ্যতে সর্বব্যাপক হবে এই বিশ্বাস নিয়ে 'জয়শ্রী'র ৪৩-তম শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হ'ল। আসন্ন ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনার আনন্দপ্রবাহ, 'জয়শ্রী' তার লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল সকল প্রকার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে 'জয়শ্রী' প্রকাশে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

এবার পরিব্যাপ্ত নিরানন্দের মধ্যে বাঙালীর শক্তি-সাধনার ডাক এসেছে। মানুষ আর প্রকৃতি মিলে পশ্চিমবঙ্গের এগারোটি জেলায় বন্যার তাণ্ডবে ১০৬ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। প্রায় ১৮ হাজার গবাদি পশু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ১৫১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। আর অবিলম্বে ষাট লাখ বন্যাক্লিষ্ট মানুষের খাদ্য, পরিধেয় এবং মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে হবে। প্রায় চার লক্ষ মাটির ঘর সাম্প্রতিক বন্যায় ধ্বসে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের কাছে বন্যার ক্ষতি-স্বরূপ ১০১ কোটি টাকার সাহায্য চেয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার চাইছেন বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মেটাতে কেন্দ্রীয় অর্থ, পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাত থেকে দিতে হবে। কিন্তু সমীক্ষক দল এ-সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার মালিক নন। তারা পকিকল্পনা খাতে আগাম সাহায্যরূপে এই সাহায্য দিয়ে যাবেন এবং অক্টোবরের শেষে সপ্তম ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট পেলে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

নূতন পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের দেওয়াল ও এ্যাসবেস্টসের ছাদ-ওয়ালা দুই-ঘর বিশিষ্ট একলক্ষ গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ নিয়েছেন। এক বছরে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহনির্মাণ হবে। সেজন্য পূর্তমন্ত্রী হাউসিং এণ্ড ডেভলেপমেন্ট করপো-রেশনের কাছে ৫০ কোটি টাকার ঋণ চেয়েছেন। যার বাৎসরিক সুদের পরিমাণটাই হবে আড়াই লক্ষ টাকা। পূর্তমন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন এই ঋণের দায় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করুক।

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে গঙ্গার উপকূলে বন্যা-নিরোধের জন্য এই রাজ্যে 'ক্র্যাস্' পরিকল্পনা তৈরী করবার পরামর্শ দিয়েছেন। আবার এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র জলাধারের বন্যা নিয়ন্ত্রণে অন্তত আরও ১৫ থেকে ২০ বছর অতিক্রান্ত হবে। তা-ও নেপালের সহযোগিতা-সাপেক্ষ। কৃষিমন্ত্রক যে পাঁচ বছরের মধ্যেই এই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যানিয়ন্ত্রণের ভরসা দিয়েছেন সেটা এই বিশেষজ্ঞদের মতে একেবারেই অবাস্তব। এই উদ্দেশ্যে আরও বাঁধ তৈরী করে

জলপ্রবাহের বেগ অনিবার্যভাবে স্তিমিত করতে হবে। তিন ধরণের বাঁধের প্রস্তাব রয়েছে ; (১) যেগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় এলাকার মধ্যে (২) যেগুলি নেপালের মধ্যে এবং নেপাল সরকারের সঙ্গে সহমতে পৌঁছানো গেছে (৩) যেগুলি নেপাল অথবা বাংলাদেশ সরকারের অথবা উভয় সরকারের সম্মতি-সাপেক্ষ। দুঃখের বিষয় গত একত্রিশ বছরেও বন্যানিয়ন্ত্রণের এই দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাগুলির দিকে নজর দেওয়া হয় নাই।

আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নটি কেবলমাত্র পুলিশ-প্রশাসনের সমস্যায় সীমাবদ্ধ নেই। বৃহত্তর সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে এই প্রশ্নটি ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে গেছে। তাই এটা কেবল রাজ্যগুলির সমস্যা নয়। কেন্দ্রের বটে। ২৩শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুই দিনের মুখ্যমন্ত্রীসম্মেলনে আলোচনাসূত্রে এই মতামত-গুলি ব্যক্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলির কর্মপদ্ধতির মধ্যে যে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নটি নিহিত রয়েছে, সে মতও প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়। কারণ, দেখা গেছে যারাই ক্ষমতায় এলেন একদল সমাজবিরোধী তাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে আইন-শৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটায়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা চলে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস কত বেড়ে গেছে তা বোঝাই যাবে ১৯৭৭-এর জানুয়ারী থেকে আগষ্টের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ১২১ থেকে ১৩৭ এ-বৃদ্ধিতে। হরিজনের বিরুদ্ধে অপরাধের মাত্রাও বিপজ্জনক। এ-বছর জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১০,৮৭৯। ভূমি সংক্রান্ত সংঘাতও উপেক্ষণীয় নয়।

এদিকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার দেশবিভাগের শিকার হয়ে যারা দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেখান-কার প্রাকৃতিক ও মানবিক প্রতিকূল পরিবেশের ফলে ১৩।১৪ বছর পর সুন্দরবনে আশ্রয় নেবার সঙ্কল্প নিয়ে পশ্চিম বঙ্গে ফিরে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে যারা গুলি, অনাহার, নিপীড়ন, অত্যাচারের মুখেও সেই প্রতিকূল পরিবেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করে সুন্দরবনের বাগনা-মরিচঝাঁপি অঞ্চলে নিজেদের পুনর্বাসনের ও উপার্জনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাদের বলপ্রয়োগ করে উৎ-সাদনের শেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ৬ সেপ্টেম্বর থেকে পুলিশ মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের নৌকাগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর মরিচঝাঁপিতে পুলিশ ও বনবিভাগের কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে উদ্বাস্তুদের সংঘাতে ২০০ উদ্বাস্তু-নৌকা খাদ্য ও কাঠ-সমেত বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। উদ্বাস্তুদের চেষ্টায় তৈরী দুইটি মেছো-ভেড়ি পুলিশ বিনষ্ট করে তাদের প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ টাকার ক্ষতি-সাধন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে কী মানবতা-বাদীরা বহিষ্কৃত হয়েছেন ? সব দেখে শুনে এ প্রশ্নই সব চাইতে আগে মনে ওঠে। অথবা এ-ও হয়তো সম্ভব বামপন্থীর সঙ্গে মানবতাবাদের বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে—এই বাংলায় নিজেদের বামপন্থীরূপে জাহির করেন না, আজ নিঃসন্দেহে যারা মানবতাবাদী, সময় এসেছে তাদের উচ্চকণ্ঠ ধিক্কারে অত্যাচারীদের নৈতিক পরাজয়-সাধনের।

কেন্দ্রে জনতা সরকারে রদ-বদল আসন্ন হয়ে উঠেছে। জনতা পার্লামেন্টারী পার্টির ২১শে সেপ্টেম্বরের সভায় বহুদিন বাদে চরণ সিং-এর যোগদান একটি উল্লেখ্য ঘটনা। চরণ সিং বহুদিন বাদে দলীয় সভায় যোগ দেওয়ায় জনতা দলের আভ্যন্তরীণ ঠাণ্ডা লড়াই

আবার বেগবান হওয়ার আঁচ করা যায়। পার্লামেন্টারী পার্টি'র বৈঠকে দেখা যায় জনতার কর্মপরিষদ এবং ক্যাবিনেটে 'বাম' ও 'দক্ষিণ'—দুই গোষ্ঠীর প্রাচীর উঠেছে এবং প্রধানমন্ত্রীকে লেখা কান্তি দেশাই-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়ে মধু লিমাই-এর চিঠি পার্লামেন্টারী পার্টি'র সভায় আলোচিত হবে কি হবে না, এ নিয়েই বাম-দক্ষিণের দ্বন্দ্ব এবং চন্দ্রশেখরের স্থান বাম-গোষ্ঠীতে দেখা গেলো। এরা চায় অবিলম্বে সরকার দরিদ্র ও স্বল্পবিত্তদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আয় ও ব্যয়ের উচ্চসীমা বেঁধে দিক, সামান্য সুদে দরিদ্র কারিগরদের, স্বনির্ভর ইঞ্জিনিয়ারদের, কৃষকদের, উপজাতিদের এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিক।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কি হবে তা নিয়েও জনতা দলে প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মাও-উত্তর চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রুশের বিরোধ আগের চাইতে আরও গভীর ও তীব্র হয়েছে এবং চীন ভারতবর্ষসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে সোভিয়েত রুশের সংঙ্গে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে চায়। সে-সংঘাত হবে, চীনের আধুনিকীরণের উদ্যোগ বেগবান হলে। সাম্প্রতিক জাপান-চীন মৈত্রীচুক্তি তারই স্বাক্ষর বহন করছে সুতরং ভারতবর্ষ এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে মাও-উত্তব চীনের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর না হলে মারাত্মক ভুল হবে। সীমান্ত বিরোধ, তিব্বতের সমস্যা এই পথেই মীমাংসার সম্ভাবনা রয়েছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের বিরোধিতা করে যারা ভারতবর্ষকে সোভিয়েত রুশের সুনজরে রাখতে চান, তাদের সোভিয়েত রুশের আশুতায় দেশগুলির দিকে মুক্তদৃষ্টি নিয়ে তাকানো উচিত। ভারতবর্ষ রুশ অথবা চীন কারুরই তাঁবেদার নয়—এই দুই প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মৈত্রীই ভারতবর্ষের কাম্য।

মনে রাখা দরকার ভারতের জনসাধারণের প্রতি প্রাথমিক কাজগুলি এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। ৫১৫,০০০ গ্রামের মধ্যে ১,৫০,০০০ গ্রামে এখনও পানীয় জলেরই সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। তাই সরকার ১৯৮১ সালের মার্চের মধ্যে ১০০০ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকে প্রায়-পূর্ণ কর্মসংস্থানের এবং একলক্ষ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন।

১৩ দিন মিশরের সাদাত এবং ইসরায়েলের মেনাহেম বেগিনের সঙ্গে 'ক্যাম্প ডেভিডে' কার্টারের নিভৃত-আলোচনার পর ১৭ই সেপ্টেম্বর আরব-ইসরায়েলের বিরোধের স্থায়ী মীমাংসার চুক্তি রচিত হয়েছে। অন্যান্য আরব দেশ ও প্যালেস্টেনীয়েরা এই চুক্তির বিরোধিতা করলেও সাদাত তার বিশ্বাসে অটল রয়েছেন। পাঁচ বছরের মধ্যে তো বটেই, পশ্চিম এশিয়ার আরব-ইসরাইল রণক্ষেত্রে শান্তি নেমে আসবে অনিবার্যভাবে।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

'অন্তবিহীন অজানাকে'

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সর্বব্যাপী কলরোল চলেছে। এই কলরোল যদি শান্ত না হয়, অধ্যাত্মচেতনার দরজা তো খোলা পাওয়া যাবে না। যোগসাধনা অবলম্বন করে এই কলরোল শান্ত করতে হবে। তবেই মানুষ বিশ্বের অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে উত্তরোত্তর একীভূত হবার পথ করে নিতে পারবে। এই একীভূত হওয়ার সাধনাও এক ধরণের যোগ। আরও বিশেষ-ভাবে বললে বলতে হয়, এই যোগসাধন পদ্ধতি যোগশাস্ত্রে চিহ্নিত হয়ে আছে 'ক্রিয়াযোগ'রূপে। যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশায় এই 'ক্রিয়াযোগে' বহু মানুষকে দীক্ষিত করে গেছেন এবং পরবর্তীকালে এই যোগপদ্ধতি ভারতবর্ষ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই 'যোগক্রিয়ার' আদি গুরু যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরু 'বাবাজী মহারাজ',—যিনি এক পরমবিস্ময়কর মহাপুরুষ।

স্কুলের ছাত্রজীবন থেকেই এক তরুণ যোগপিপাসু আদ্যাশক্তির কাছে আশীর্বাদপ্রার্থী। এই তরুণ যোগীর বাড়ী উত্তর ক'লকাতার গড়পাড়ে। ভবিষ্যৎ-জীবনে বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান যোগীরূপে তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিত হবেন। তিনি হিন্দু হাইস্কুলের ছাত্র, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আসছে। সে-দিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। শ্মশানে ধ্যান-যোগ, কোথাও নিভৃত স্থানে ধ্যানাসনে বসে পড়া, অধ্যাত্মসাধনার পথে গুরুর সন্ধান—এই ছিল তাঁর সারাদিনের পরিক্রমা। তিনি, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের শিষ্য, যাঁর নামের আদ্য-অক্ষর 'ম' লিখেই তিনি তাঁর রচনা-সমূহের লেখক-পরিচয় দিতেন, তাঁর কাছে খুব যাতায়াত করতেন। ৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এই সদানন্দ যোগী বাস করতেন এবং একটি আড়ম্বর-হীন উচ্চ-বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। উচ্চ গণিত আর অধ্যাত্মচর্চা, এই ছিল সেই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। তাঁকে দেখলেই মনে হ'তো 'ম' সর্বদাই মাতৃশক্তির আরাধনায় ভরপুর হয়ে রয়েছেন। 'ম' মানে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তরুণ যোগী একদিন তাঁকে অনুরোধ জানালেন আদ্যাশক্তির কাছে তার জন্য যেন একটু অনুকূল অনুরোধ করেন। সদানন্দ যোগী সম্মতি জানিয়ে বললেন যে জগন্মাতার কাছে তার হয়ে বলবেন।

তরুণ যোগীটি তাঁদের গড়পাড়ের বাড়ীতে দ্রুত ফিরে এসে তাঁর অপরিসর ঘরের নিভৃতে রাত দশটা পর্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন। অকস্মাৎ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ঘরময় আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে পড়লো। তরুণ যোগীর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দেখা গেলো শক্তিরূপিণী বিশ্বমাতা জ্যোতির্ময়ীরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মমতা-মেশানো মৃদুহাসি ছড়িয়ে সেই জ্যোতির্ময়ী কায়া তরুণ যোগীকে বললেন: "তোমাকে সর্বদাই স্নেহ করি। চিরজীবনই তাই আঝোরে পাবে।" এই বলেই সেই মূর্তি অন্তর্ধান হলেন।

তরুণ যোগী বারানসী গেছেন। একদিন ধ্যানমগ্ন এই যোগী শক্তিরূপিণী মাতার কাছে অধ্যাত্ম-শিক্ষা প্রার্থনা করছিলেন। সেই অবস্থায় শক্তিরূপিণী নারীকণ্ঠের আশ্বাসবাণী এলো তাঁর কাছে : "আজ তোমার গুরু আসবেন"। সে দিনই বারানসীর বাঙালীবাজারে চলার পথে একটি অখ্যাত অজ্ঞাত গলির শেষ প্রান্তে তিনি এক সন্ন্যাসীকে দেখে চমকে উঠলেন, ভাবলেন কত পরিচিত মুখ! বহু ধ্যানমগ্ন নির্জন নিশীথে যেন এই মুখই বার বার তার মনশ্চক্ষুতে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তরুণ যোগীর মন অস্ফুট-ভাবনায় বলে উঠলো : 'ভুল, ভুল ভুল, স্বপ্নাবিলাসী এগিয়ে চলো।' কিন্তু বেশীদূর এগোনো গেলো না। তার পা পাথরের মত অনড় হয়ে গতিরোধ করে দিলো। তিনি পিছু হেঁটে চুম্বকের মত অদৃশ্য আকর্ষণে ধীরে ধীরে সেই গলিতে দাঁড়ানো সাধুর কাছে পৌঁছে তাঁর পায়ে পড়ে বলে উঠলেন : "গুরুদেব!" আনন্দের আবেগে আপ্লুত সেই দীর্ঘদেহী ঋজু যুবকের মত কর্মোচ্ছল পঞ্চাশোর্ধ সন্ন্যাসীটি বললেন : "ওরে আমার প্রিয়, তুই আমার কাছে এসেছিস! কত বছর ধরে তোর অপেক্ষায় রয়েছি।" তরুণ যোগীটি বললেন : "আপনার ঈশ্বরানুভূতি ও জ্ঞান নেবার জন্য এসেছি; সেগুলিই আপনার অমূল্য সম্পদ"।

: 'তোমাকে সর্ত-নিরপেক্ষ ভালোবাসা দেবো, তুমি কি আমাকে তাই দেবে?'

: 'অনন্তকাল ধরে আমি আপনাকে ভালোবাসবো, গুরুদেব!'

: 'সাধারণ প্রেম-ভালোবাসা স্বার্থযুক্ত, কামনার তৃপ্তিতে তার উৎস। কিন্তু স্বর্গীয় প্রেম নিঃসর্ত, সীমাহীন, অচঞ্চল। মানব-হৃদয়ের উদ্বেলতা, বিশুদ্ধ প্রেমের স্পর্শে চিরকালের জন্য বিদায় নেয়।'

এই তরুণ যোগীটিই ভাবীকালের যোগসিদ্ধ পুরুষ, দেশ-বিদেশে-খ্যাত স্বামী যোগানন্দ পরমহংস; ক'লকাতার ৪নং গড়পাড় রোডের বাড়ীতে পারিবারিক পরিবেশে যাঁর কৈশোর কেটেছে। পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশায়ের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। আর তরুণ যোগীর সন্ন্যাসী গুরুদেব, স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজও লাহিড়ী মশায়ের শিষ্য।

প্রথম পরিচয়ের প্রগাঢ়তার পরই যুক্তেশ্বর মহারাজ তাঁর নবীন শিষ্যটিকে কলকাতায় ফিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শিষ্যটি সেই পরামর্শ মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর অশান্ত মন আরও কিছু চাইছে, হয়তো বা কোনো ত্বরিৎ-সিদ্ধি। হিমালয়ের নিভৃতে সাধনার প্রবল ইচ্ছাও তরুণ যোগীর মনকে সে-সময় থেকেই আলোড়িত করছে।

গুরুদেবের বুঝতে অসুবিধা হোলো না শিষ্যের মনের এই অস্থির তরঙ্গাঘাত। যে-আঘাতে শিষ্যের সঙ্কল্প বারবার টলোমলো হয়ে যাচ্ছে। তাই গুরুকে কঠোর হতে হলো। কঠিন স্বরে তিনি শিষ্যকে আদেশ করলেন—

: 'চার সপ্তাহের মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি তোমাকে সহজে শিষ্যরূপে গ্রহণ করবো না, আমার শিক্ষার প্রতি আনুগত্য দিয়ে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

শিষ্য গুম হয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—

: 'আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো না।'

: 'ত্রিশ দিনের মধ্যে তোমাকে আসতেই হবে।'

: 'কখনই না'।

তরুণ যোগী ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে

বিদায় নিলেন। বারানসীর সেই রাতদুপুরের অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে তার সংশয়াচ্ছন্ন মনের কেবলই ভাবনা, এই অলৌকিক সাক্ষাতের এমন তিক্ত পরিপরিণতি কেন? এ-কি মায়ার খেলা? এ-কি অবিমিশ্র আনন্দের সঙ্গে দুঃখবোধের পীড়ন দিয়ে পরীক্ষা?

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তরুণ যোগী ফিরে এসে গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন।

মাত্র ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, শিষ্য নূতন আর্জি পেশ করে বললেন—

'আমাকে হিমালয়ে যাবার অনুমতি দিন'।

গুরুর উত্তর সহজ এবং সংক্ষিপ্ত—

ঃ হিমালয়ে তো অনেক পাহাড়িয়া বাস করেন। তাদের তো কোনো ঈশ্বরানুভূতি নেই। যাঁর আত্মোপলব্ধি হয়েছে, এমন মানুষের কাছ থেকে পরাজ্ঞান লাভ করা যায়, জড় পাহাড় থেকে নয়।'

গুরুর কথা শিষ্যের মনে ধরলো না। হিমালয়ে সাধনা তাঁর মনে গেঁথে গেছে। তাই তিনি যোগীবর লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকটবর্তী রানজীবপুরের 'বিনিদ্র সাধু' নামে পরিচিত রামগোপাল মজুমদারের পরামর্শের জন্য সেখানে যান। পথে একরাত কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা হাঁটাপথে তরুণ যোগীর সঙ্গে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। তিনি হঠাৎ তরুণ যোগীর কাছে এসে থেমে গেলেন—

ঃ 'রানজীবপুর থেকে অন্যত্র চলে যেতাম শুধু তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।...তুমি ভাবছো খুব চালাক তুমি, না জানিয়ে আমাকে এসে ধরবে।'

তরুণ যোগীর তাঁকে প্রশ্ন—

ঃ 'ঈশ্বর কোথায় আছেন আমাকে বলুন না'।

ঃ কেন, তিনি আমার মধ্যে আছেন, সর্বত্রই আছেন, সর্বত্রগামী বলা চলে। কি বল? তবে তুমি মশায় কাল তারকেশ্বরের মন্দিরে অনন্তের প্রতীক সেই পাথরের কাছে মাথা নোয়ালে না কেন? তোমার ঔদ্ধত্যের শাস্তি পেয়েছো'...।

রামগোপাল আবার বললেন—

ঃ 'তরুণ যোগী, গুরুর কাছ থেকে তুমি পালিয়ে যাচ্ছো। তুমি যা চাও তিনিও তো সব দিতে পারেন, তোমার তাঁর কাছে ফিবে যাওয়া উচিত। পর্বত তো আর তোমার গুরু হতে পারে না।

আবার বললেন—

ঃ 'তোমার একটি ছোট নিরালা ঘর আছে। তোমার বাড়িতে। সেখানে দরজা বন্ধ করলেই তুমি নিঃসঙ্গ, নির্জন হতে পাববে।

সেটাই তোমার গুহা, তোমার পবিত্র পর্বতমালা, যেখানে কিন্তু বিধাতার রাজ্য খুঁজে পাবে...।'

রামগোপালের আত্মিক শক্তিতে অভিভূত তরুণ যোগী হঠাৎ সমাধির দীক্ষা চাইলেন।

ঃ 'তুমি আমার কাছে আলো চাইছো, আর আমি ভাবছি, আমার পরিব্রজ্যায়, আমার সামান্য ধ্যানে আমি কি পরমাত্মার আশীর্বাদ পেয়েছি? শেষের দিন তাঁর কাছে আমার কি মূল্যই বা হবে!

রামগোপাল আবার বলছেন—

ঃ 'বিশ বছর আমি এক নিভৃত গুহায় ১৮ ঘণ্টা ধ্যান করেছি। তারপর আরও দুর্গম গুহায় ২৫ বছর দিনে ২০ ঘণ্টা ধ্যান করেছি। আমার ঘুমোবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ সব-সময়ই আমি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে ছিলাম। ঊর্ধ্ব-চেতনার প্রশান্তিতে যে বিশ্রাম আমার শরীর ভোগ করেছে, অবচেতনের অপূর্ব শান্তি তা' দিতে পারতো না।'

তরুণ যোগী বিহ্বল হয়ে বলেন ঃ—'আশ্চর্য! আপনি এতো দীর্ঘকাল ধ্যানের পরও নিঃসংশয় নন যে, আপনি পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করেছেন?'

ঃ '.....বাবাজী আমাদের এই বলে নিশ্চিন্ত করেছিলেন স্বল্পকালীন ধ্যানও আমাদের অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষা দেয় এবং মৃত্যুর পরের নানা অবস্থান্তর থেকে মুক্তি দেয়। পাহাড়ের দিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, ঈশ্বরানুভূতির দিকে অখণ্ড মনোযোগ দাও। কঠোর পরিশ্রম করলে সেখানে পৌঁছাতে পারবে।''

রামগোপালের মুখে যোগীবর লাহিড়ী মশায়ের গুরু বাবাজী মহারাজ-এর উল্লেখ শোনা গেলো। তাঁর সঙ্গে বাবাজী মহারাজের প্রথম সাক্ষাতের অলৌকিক বিবরণ রোমাঞ্চকরই বটে।

কিন্তু কে এই বাবাজী মহারাজ? এই বিস্ময়কর মহাপুরুষ? বাবাজীর ধ্যানক্ষেত্ররূপে বদ্রীনারায়ণের সন্নিকটবর্তী উত্তর হিমালয়ের গুহাঞ্চল আজও ধন্য হয়ে আছে। নিভৃতবাসী এই মহাগুরু শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী তাঁর মরদেহ ধারণ করে রয়েছেন, সহস্র সহস্র বৎসারিধকালও হতে পারে। বাবাজী মৃত্যুহীন, তাই তিনি 'অবতার' বই আর কিছু নন। 'অবতারের' ব্যাপ্তি পরিমাপের চেষ্টা বৃথা। তা ধারণাতীত' —বলেছিলেন যোগীবর লাহিড়ী মশায়ের শিষ্য এবং আমাদের তরুণ যোগী, পরবর্তীকালের স্বামী যোগানন্দ পরমহংস-এর গুরু স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ।

বাবাজী মহারাজ একজন মহাবতার। যাঁরা সিদ্ধপুরুষদের নির্ধারিত বিশেষ কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করেন, তাঁরাই মহাবতাররূপে পরিচিত হন। বাবাজী মহারাজ আচার্য শঙ্করকে যোগশাস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, যে-শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসাশ্রমের পুনর্বিন্যাস করে গেছেন। মধ্যযুগের প্রখ্যাত গুরু কবীরেরও তিনি দীক্ষা-দাতা। আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য লাহিড়ী মশায় 'ক্রিয়াযোগে'র পুনরুদ্ভাবক।

বাবাজী মহারাজ সকল সময়েই যিশুখৃষ্টের সঙ্গে অন্তরে আত্মায় মিলিত হয়ে যৌথভাবে আত্মিক মুক্তির তরঙ্গ প্রবাহ সঞ্চার করেন। এই দুই মুক্ত-পুরুষের কাজ হলো, যুদ্ধ, জাতি-বৈরিতা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বর্জনে এবং জড়বাদের কুফলের প্রতিক্রিয়া থেকে জাতিসমূহকে উদ্দীপিত করা। বাবাজী মহারাজ পাশ্চাত্য-সভ্যতার জটিল কুপ্রভাবের বর্তমান ধারা সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং যোগের দ্বারা পূবে ও পশ্চিমে আত্মোপলব্ধির অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা বিস্তারে সমভাবে অবহিত।

ইতিহাসে বাবাজী মহারাজের অনুল্লেখ অনেকের কাছেই বাবাজী-চরিত্রকে কাল্পনিক করে তুলবে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। এই মহাগুরু কোনো শতাব্দীতেই প্রকাশ্যে দেখা দেন নাই। শঙ্করের গুরু গোবিন্দ জাটির ইতিহাসে দেখা যায় বাবাজী মহারাজ এই মহাঅদ্বৈতবাদীকে বারানসীতে 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষা দেন! বাবাজী মহারাজ ও শঙ্করের সাক্ষাতের চমকপ্রদ ঘটনা লাহিড়ী মশায় বিবৃত করে গেছেন। ১৯৪৬ সালে স্বামী যোগানন্দ পরমহংস-এর আত্মজীবনীতে বাবাজীর অস্তিত্বের ইতিবৃত্ত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। বাবাজী মহারাজ লোকচক্ষুর অনাড়ম্বর অন্তরালে কাজ করে চলেছেন। তাঁর মত অবতারেরা শতাব্দীব্যাপী, মানুষের ধীর-উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে থেকে এঁরা ইচ্ছামত অদৃশ্য হবার শক্তিরও অধিকারী হ'ন। এই কারণে এবং তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শিষ্যদের প্রচার

করতে নিষেধ করে দেবার ফলে এঁরা বিশ্ব-অজ্ঞাত থেকে যান।

বাবাজী মহারাজের জন্মস্থান, তারিখ কিম্বা তাঁর পরিবার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। তিনি কথা বলেন সাধারণ হিন্দিতে, কিন্তু দখল রয়েছে যে কোনো ভাষায়। 'বাবাজী'—এই সাধারণ চল্‌তি নামটি তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। লাহিড়ী মশায়ের শিষ্য-সম্প্রদায় তাঁকে বলেন মহামুনি বাবাজী মহারাজ, মহাযোগী, ত্র্যম্বক-বাবা এবং শিব-বাবা। লাহিড়ী মশায় বলতেন "কেউ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বাবাজীর' নাম উচ্চারণ করলেই সেই ভক্ত অব্যবহিত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ পেয়ে থাকে।"

এই মহাপুরুষের অবয়বে বয়সের কোনো ছাপ নেই। দেখলে মনে হবে পঁচিশ বছরের যুবক মাত্র। গাত্র-রং ফর্সা, মাঝারী গড়নের, দীর্ঘদেহী। বাবাজীর সুঠাম দেহ, দৃশ্যমান জ্যোতি বিকীরণ করে। চোখের কালো মণিটি স্নিগ্ধ ও কোমল! তার দীর্ঘ দ্যুতিময় চুলের রং তামাটে। কখনও কখনও বাবাজীর মুখশ্রী লাহিড়ী মশায়ের মত মনে হয়।

এই অতুলনীয় মহাযোগী তাঁর দলবল নিয়ে পর্বতের এক স্থান থেকে দ্রুত অন্যত্র স্থান পরিবর্তন করে চলে যান। স্থান-পরিবর্তনের সময় হলেই সঙ্গীশিষ্যদের হাঁক দেন: "ডেরা-ডাণ্ডা উঠাও"। যেমন বলা তেমনি কাজ। দলবলসহ বাবাজী চল্লেন নূতন ডেরায়। বাবাজীর জীবনের দুইটি আশ্চর্যজনক ঘটনার বিবরণ রামজীবনবাবুর মুখে জানা যায়। একদিন রাত্রিবেলা বৈদিক ক্রিয়ার জন্য প্রজ্জ্বলিত এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড ঘিরে তিনি শিষ্যবর্গসহ বসে আছেন। হঠাৎ মহাগুরু একটি জ্বলন্ত চেলাকাঠ দিয়ে আগুনের পাশে বসা এক চেলার অনাবৃত কাঁধে মৃদু আঘাত করলেন। শিষ্যদের মধ্যে উপস্থিত লাহিড়ী মশায় বাবাজীর এই আচরণের প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন: 'গুরুদেব আপনি কি নির্দয়!' উত্তর এলো: 'তুমি কি চাও অতীত কর্মফলের বিধান অনুযায়ী তোমাদের চোখের সামনে এই শিষ্যটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।' অতঃপর বাবাজী তার পোড়া কাঁধে হাত বুলিয়ে বললেন: 'আজ তোমাকে শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলাম।'

আর একবার একটি আগন্তুকের আকস্মিক উপস্থিতিতে বাবাজীর এই ধরণের শিষ্য-চক্র বিঘ্নিত হলে মহাযোগী তাঁর ডেরার নিকটবর্তী এক দুর্গম পর্বতস্তরে তরতর বেগে চড়ে বসেছিলেন। আগন্তুক বাবাজী মহারাজের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে বিনীত অনুরোধ করলেন। মহাযোগীর কোনো সাড়া না পেয়ে সেই আগন্তুক নীচে, পর্বতের অন্তহীন গহ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে উঠলেন: আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ না করলে, আমি নীচে পর্বতের গহ্বরে ঝাঁপ দেবো। যদি অনন্তের দিশারীরূপে আপনাকে গুরুর আসনে না পাই, আমার জীবনের আর কীই বা মূল্য থাকবে?

বাবাজী মহারাজ নিরাসক্ত, নির্লিপ্তচিত্তে বললেন: 'তবে ঝাঁপ দাও। তোমার বর্তমান স্তরে তোমাকে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।'

আগন্তুকের যেই কথা সেই কাজ। বাবাজী বিস্ময়-স্তম্ভিত ভক্তদের নির্দেশ দিলেন, আগন্তুকের হাড়গোড়-ভাঙ্গা দলা-পাকানো শবদেহ পর্বতের চূড়ায় বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত করতে। বাবাজী সেই শবদেহের উপর হাত রাখলেই আগন্তুক চোখ খুলে উঠে বসে বাবাজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ

প্রণাম করলেন। পুনর্জন্মপ্রাপ্ত আগন্তুকটিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করে বাবাজী বললেন : 'তুমি দুর্জয় সাহসের সঙ্গে একটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো। মৃত্যু আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার স্থান এখন অমরদের সারিতে।'

তারপরই নিমেষে স্থান-পরিবর্তনের সঙ্কেতধ্বনি দিয়ে বল্লেন : 'ডেরা-ডাণ্ডা-উঠাও'। আর নিমেষে সেই পর্বতের চূড়া থেকে গোটা দল অদৃশ্য হ'লো।

অবতারেরা সর্বব্যাপী আত্মার স্বরূপ ধারণ করেন। বাবাজীর, শতাব্দীর পর শতাব্দী শরীরধারণ করে অবস্থানের কারণ একটিই। মানুষকে তাঁর অনন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। যদি রক্তমাংসের মানুষ দেবত্বে পৌঁছবার সম্ভাবনা, রক্তমাংসের মানুষের মধ্যেই চাক্ষুষ না করতে পারতো, তবে এটাই সপ্রমাণ হোতো যে মরণশীলতাকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তার নেই। মায়ার কঠোর বন্ধন কাটিয়ে সে ঊর্ধ্বে উঠতে পারতো না। মানুষের পক্ষে দৈহিক অমরত্বে উত্তরণ যে সম্ভব তা সপ্রমাণের জন্যই বাবাজী মহারাজের অতলান্ত সময়াতিক্রমণের পরও স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহধারণ—দেহের এই দুই অবস্থান্তরের সহবাস; —বাবাজী মহারাজ তাঁর মূর্ত প্রকাশ। 'অন্তবিহীন অজানা'—মানুষের জীবনের চিরসাথী, সে কথা তো ভুলবার নয়।

Telegram : 'TWINKLE' Faridabad
Telephone : 81-2231
Telex : 0343-243 AB : EICM IN

EAST INDIA COTTON MANUFACTURING CO. LTD.

NEW INDUSTRIAL TOWNSHIP
FARIDABAD, HARYANA

Manufacturers of Cotton and Synthetic Fabrics,
Lawns, Cambrics, Poplins, Voiles, Rubia, etc.
Dyed, Bleached, Mercerised, Shrunk-proof and Printed.
Full range of Sarees, Dress materials and Shirtings.
Makers of the famous Ajanta, Urvashi and Chitralekha Brands.
Exporters of High Quality Printed Fabrics to USSR and the Middle East.
Selling Agents and Authorised Dealers all over India.

Registered Office : **38 NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1**
Telegram : 'COTFIB', Calcutta.
Telephone : 22-0737/8.
Telex : 021-7023 AB : EIC CA.

'আঁখি মোর ঘুম না জানে'

চারণিক

চারণ নীরবতার সাধনা নিয়েছিল। যে মহাসাধক অন্তিম সাধনায় নিমগ্ন সেই গভীর নিমগ্নতার স্পন্দন, তড়িৎ প্রবাহ অনুভব করবে বলে চারণ নীরবতায় ডুবে ছিল। ১৮ অগস্ট ১৯৪৫ সাল থেকে যে ইতিহাস রচনার চেষ্টা চলেছিল, যে ইতিহাস রচনায় দেশের বহু তথাকথিত জ্ঞানীগুণী যুক্ত হয়েছিলেন হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটল যাতে দেশের শাসক-নেতা সেই সৃষ্ট ইতিহাসকে বাতিল করে দিলেন, এসংবাদ পত্রিকায়। অনেক ঘটনা এমন ঘটে যায়, অথবা দৃশ্যত ঘটে, স্থূল চোখে বাইরে থেকে সাধারণ মানুষ সেটুকু দেখে। দৃশ্যপটের অন্তরালে কত ঘটনা ঘটছে তার পশ্চাতের আনাগোনা চালাচালির কতটুকু খবর সাধারণের কাছে পৌঁছায়! সাধারণ বাইরেরটুকু নিয়েই কখনো তৃপ্ত, কখনো অতৃপ্ত। সাম্প্রতিক একটি তৈরী করা ইতিহাসকে বাতিল করে waste paper basket ফেলার যে ঘটনা তাতে চারণ তৃপ্ত নয়। চারণের কোনো ব্যক্তিগত মতামতের স্থান নেই। মহাকাল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—"Air crash-এ death concoction—এটা বলা দরকার। তিনি আছেন কি নেই—এটা redundant—air crash সেদিন সেখানে হয় নাই, এটা বানানো কথা।" এই বানানো কথা কি সাম্প্রতিক শাসক-নেতার ঘোষণার পরও রয়ে গেল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর চারণ পায় নি। পুনরায় এই concoction প্রসঙ্গে মহাকাল; আরেকদিনের আরেকটু কথা—

'Plane crashটা concoction—এই পর্যন্তই থাকবে। concoction পর্যন্তই থাকবে এই concoction টা undo করবার জন্য Govt কে বলতে হবে, যেমন capsuleটা তুলে ফেলে Govt ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃত করবার অপচেষ্টার প্রতিকার করেছেন।'

কিছুদিন পূর্বের আরেকটি ঘটনায় সংবাদপত্রের কিছু সংবাদে মহাকালের প্রতিক্রিয়া, ঠিক প্রতিক্রিয়া বলা উচিত নয়, মহাকাল এই সকল ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নন, কিন্তু তাকে ঘিরে চারণ ও সাথীদের নানা প্রশ্নের জবাবে—

'সারা জীবন প্রতিজ্ঞা করে ব্রহ্মচারী থাকবো বলে তারপর মরণের দিকে ঝাঁপ দেবার মুখে শেষে ডোবায় পড়ে শামুকে পা কাটলো।

চারদিকে S-S চব্বিশ ঘণ্টা পাহাড়া দিচ্ছে, চারদিকে কাজের ব্যস্ততা সে সময়, সে মাসগুলো এমন অবস্থায় ছিল কি মনে হ'ত শরীরটা ফেটে যাবে, মাথাটা ফেটে যাবে; যখন এই রকম প্রায় হয়ে যাবার যোগাড় তখন একজন ইসারায় বললো অমুকের সঙ্গে যদি কথা বলতে পারো কাজ হোতো। কথা বলতে বলতে সেই বড় হলের এক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হলো আর কিছু বলা হোলো—যা plan দেওয়া হয়েছে সেটা মঞ্জুর হয়েছে।

এই কথা আলোচনা করতে ঘেন্না করে। যে লোকটি আগুনের ভেতর ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, সে কি এমন নৃশংস এমন অত্যাচারী এমন হত্যাকারী হবে সে অবস্থায় একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে। আর কোনো মেয়ে যদি সে-অবস্থায় সম্পর্কে আসবার জন্য বলে, তাহোলে সেই লোকের পক্ষে এটাই তাকে বলা স্বাভাবিক যে আগে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে নি, তারপর এ-সম্বন্ধে বিচার করতে হবে।

সদ্যজাত শিশু এবং সদ্যপরিণীতাকে আগুনে ফেলে চলে গেলো। আর সেই মহিলাও রাজী হয়ে গেলেন। দাদাদের আবার বাংলায় লেখা হোতো কবে? আর দিন, তারিখ, জায়গার নাম একেবারে চিঠির নীচে—এটাও কখনো ঘটেনি।'

'কোনো মানুষ যখন crucial huzardous কাজ হাতে নেয়, তখন সে-মানুষটা কিছুতেই স্ত্রীসঙ্গ করতে পারে না। সে সময় সঙ্গে স্ত্রী থাকলে সে মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কোনো secret কাজ, hazardous কাজ, কোনো national or international সংবাদকে full proof করতে হলে কেবল একজনকে সেটাকে আগলে রাখতে হবে—দুজন তাতে জড়িয়ে থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, সে কাজ আর হবে না।'

এমন এক পরিস্থিতিতে, ঘটনাচক্রের এমনি পরিণতি যে এই ঘৃণ্য সাজানো ঘটনাগুলি সম্পর্কে মহাকালের মুখ খুলতে হলো। আর চারণ ও সাথীদের স্তব্ধ নিঃশ্বাসে সে কথা শ্রবণ করতে হলো। ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গে কেউ কোথাও উল্লেখ করেছেন, এবং সেই সব বইয়ের উল্লেখ করলে বলেছেন, 'খবরদার এসব ইতর আলোচনা আমার কাছে পেশ করবে না, আর কখনোই ঐসব বই আমার কাছে আনবে না।'

কিন্তু সেদিন তীব্র বেদনা থেকেই হয়তো এত কথা বলে গেলেন! এ-প্রসঙ্গে সর্বশেষ উক্তি—
'চিঠি টা forgery। ছোটবেলা থেকে চিঠির ওপর একটা মাঙ্গলিক চিহ্ন থাকতো।'

একটি মহৎ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব আত্মবিস্মৃত, আত্মচিন্তায় মগ্ন নন এটাই স্বাভাবিক, আর মহাকালের বাণীবাহকের পরিচয় তো সেখানেই। মহাকালের বাণীবাহক, চিরন্তন বিপ্লবী সে-ই যে একদিন দেশনেত্রীর আদেশে ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে দেশনায়কের পরিক্রমণ সংবাদ দূর পল্লীতে গভীর রাত্রে পৌঁছে দিয়েছিল। হয়তো অনেকে ব্যাখ্যা করবেন সেটি তারুণ্যের উন্মাদনায় করেছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে যৌবনে, পুনরায় যেদিন দেশনেত্রী মহাকালের সংস্পর্শে এসে আত্মাহুতি দিলেন, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, পরিচয়ের তুঙ্গে থেকেও যিনি নিমেষে মহত্তম সাধক বিপ্লবীর কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিঃশেষ করতে পিছুপা হন নি সেই দিনটিতে আবার সেই চল্লিশ দশকের কিশোরের ডাক পড়লো। এই ঘটনা এই অন্তরালের কথা কেউ জানলো না, অথচ এ-কথা ইতিহাসের খাঁটি মুক্তোগলানো কথা—সেই যুবক বর্তমান ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে দিনের পর দিন যে কায়িক' মানসিক এবং অন্যান্য সংগ্রাম করলো, তার জন্য তাঁর কোনো শ্লাঘা নেই, কোনো অতৃপ্তি নেই আত্মপ্রচারহীনতায়। কিন্তু চারণের প্রশ্ন জাগে যদি কোথাও মহাকালের কর্মকাণ্ডে প্রচারহীনতায় অতৃপ্তির ছোঁয়া থাকে, কোথাও

মহাকালের বাণীবাহক পরম শ্লাঘায় বুঁদ থাকেন তখন তাঁর পরিপূর্ণ বিপ্লবীর পরিচয়ে কিন্তু খাদ থেকে যায়ই। আশার দীপ জ্বেলে কত বিপ্লবীই তো আজও দিন গুণছেন, কারো কানে আজও বাজছে, আমরা মিলবো, আবার একত্রে কাজ করবো এবং আমরা একত্রে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করবো, দেশত্যাগের পূর্বে এই কথা মহাকাল বলে গিয়েছিলেন, আজও অপরিবর্তিত মগ্ন সে বিপ্লবী।

কিন্তু মহাকাল এই সব বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি মনুষ্য জীবনের ঊর্ধ্বে রয়েছেন, তাই মুহূর্তে তিনি অন্য জগতের আলোচনায় চলে যান। যে আলোচনা আনন্দ-স্বরূপের আলোচনা। যে আলোচনায় মহাকাল তন্ময় এবং চির আনন্দময়। ক্লান্তির রেশ সেখানে নেই, সময়ের গতিময়তা সেখানে অবান্তর।

"যার মন পুরানো স্মৃতিকে চারণ করে সে মনের দিক্ থেকে পরম ধনী।

যার discernment যত fine ততই তার মধ্যে বাড়বে wisdom। wisdom যখন nourished হতে থাকে তখন সে আস্তে আস্তে upper plane-এ যায়, যখন razor-sharp discernment দিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তায় প্রবেশ করা যায়।

একেবারে শৈশবের কথা ভাবলে, মনে করতে হবে তার আগে কি হয়েছিল, তার আগে কি হয়েছিল—এইটে করতে করতে যখন finally holed হয়ে যাবে, হতে হতে point finesse হয়ে যাবে তখন you will enter the intelligence which you knew when you were remaining in the foetus.

এ-কথাটা তোলার আসল কারণ—একটা ছোট কথা, তোমার জীবনে শুধু এ-জন্মটাই নয়, তোমার বর্তমানে যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছো, সেই রাস্তার পরিমাণটাকে তুমি বলছো—এই আমার আয়ু। তোমার জীবন শুধু এই রাস্তাটুকু নয়। ধর তোমার এই পথটা ১০,০০০ বছর আগে শুরু হয়েছে। তোমার জীবনের পরিক্রমায় একটা ছোট অংশ তোমার মনে দেখা দেয় একটু জীবনে যখন তোমার মন ঘুর ঘুর করছে এবং আনন্দে ডগমগ হয়ে যাও তাতে, তাহোলে বুঝে দেখো তুমি এর আগে যে রাস্তা পরিক্রমা করেছো, সে-সবটা মনে পড়লে কি আনন্দই তোমার হবে!

অনন্ত প্রকারের শক্তি আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের plasticity আছে।

চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে তোমার ইষ্ট দেবতাকে মনে মনে পূজা করবার কথা ভাবলে। কিছুক্ষণ পরই তোমার শরীরে শক্তির বাহুল্য হয়ে গেলো, তোমার শরীরে আরো শক্তি জড়ো হওয়ার দরুণ এই বাহুল্য। তুমি ঘেমে যাবে। কিছুক্ষণ বাদে শক্তির ভারসাম্য ফিরে এলো।"

একদিন মহাকাল তাঁর সাম্প্রতিক পরিক্রমণের কথা বলছিলেন। "I had to undertake this hazardous solo-journey by myself. Hazard শুধু এই জন্য যে দিগন্তের কেউ guard করবার বা সাহায্য করবার থাকবে না। যেতে হবে প্রথমে 'ক' তে, 'ক' ডিঙ্গিয়ে আরেকটা জায়গায়, সেখান থেকে

ডিঙ্গিয়ে একটি sea-shore এ, অন্য দেশের লোক যারা আমার বন্ধু তাদের কাছে তারপর তোমাদের প্রতিবেশী সবার সঙ্গে দেখা করে বলে দিতে হবে আমি যে বলেছিলুম এটা পাকা কথা, বারবার আসতে পারবো না। ভ্রূকুটি করতে হবে না, Line যখন cross করলুম, রাস্তা এত সুন্দর ৬টা Lane, শেষ পর্যন্ত আসলুম যেন velvet-এর ওপরে। এই তল্লাটে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হোল গা গুলোন, মাথা ঘোরা ও পিত্তকষ্ট। এ কষ্টের কথা আমি তোমাদের কি বলবো। ছোটবেলার Blind faith তুলসীপাতা চিবুতে আরম্ভ করলুম, লেবু চুষতে আরম্ভ করলুম। দিগন্তের বাইরের চারজনকে word দেওয়া ছিল, যার গোড়াপত্তন পূর্বেই হয়েছিল, তাদের কাজ দেখতে আসতে হল।

ভালোবাসা, প্রেম স্নেহ এ-যে কী জিনিষ এর সত্য মর্ম সেই জানে যে এসব থেকে নির্বাসিত। তোমরা কি বুঝবে 'এ বোঝা', তোমাদের বোঝা সম্ভব নয়। (এ কথা বলে মহাকাল বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লেন) আমি যে বাঙালী তারপরে আবার মহান।

মন্থনের সময়ে এবং পরে পথিকের অস্তিত্ব কি হবে ?
বাংলার আত্মভোলা সাধক গেয়েছেন,

'ভয় পেও না পাগলা…
আমি চাইব নাকো শালদোশালা
বালাখানা ঘোড়ার গাড়ী
আর ঝুড়ি ঝুড়ি টাকার থলি
যে যার মত চেয়ে নিল……

পৃথিবীর সবাই দীন ভিখিরীর ঝোলা থেকে যা নেবার নিয়ে নিয়েছে। অমূল্য রত্ন, মণিমাণিক্য সবই নিয়ে নিয়েছে, তোমাদের জন্য দেবার কিছুই নেই আছে কেবল গাঁজার কল্কে, আর সিদ্ধির পাতা।"

মহাকালের আসরে বিষয় ও বিষয়ান্তরের কোনো নির্ধারিত সূচী নেই, কখনো ব্যক্তিগত কখনো নৈর্ব্যক্তিক কখনো জাগতিক কখনো অন্যলোকের আলোচনা।

"আমার ওদিকে আর কাউকে আনতে চান না। এখন তিনি মিনমিন করছেন আর কাউকে নিতে চান না। তাঁর চারজন assistant আছেন। তাঁর ওপর ভার আমি থাকি বা না থাকি ১২ মাসে তের পার্বণ করে যাওয়া। ইনি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। আমার cook-এর একটি Team আছে। তারমধ্যে একজন authority, অর্থাৎ ছোটোখাটো ডাক্তার। উনি আমার সামনে বসেন না। অন্যান্য Full General-এর সামনে অবশ্য টেবিলে ঠ্যাং তুলে বসেন। তাঁর একটা Fad আছে, গোঁ জিদ্, সেটি হল আমার জন্য any poultry chicken ducks মুরগী, তিতির বটের, কবুতর, ঘুঘু all sorts of poultry and Birds আমি যেখানে পৌঁছে

যাই, পুরো kitchen সব লোক এদিকে দাঁড়িয়ে তিনি woven এ অধিষ্ঠান, পুরো roast করতে তিনি expert, এমন দিনও গিয়েছে ১২টা Roast হবার পর আমি এসেছি। Airtight container-এ করে আধঘণ্টা রেখে দেন, তার বেশী দেরী হলে আবার আরেকটি হয়।

ভট্টাচার্যি মশাই প্রথম প্রস্তাব করেন মোষ বলি। বাঙালীরা খায় না, অন্যেরা ভক্তিভরে নিয়ে যান। তিনি বলেন মহিষাসুর বলি যদি না হোলো তাহলে পূজা কি? এঁকে আনি রাঙামাটি নামে আসামের একটি অঞ্চল থেকে।"

আরব ইসরায়েল সম্পর্কের কথা একদিন বৈঠকে উঠেছিল। 'তোমাদের perspective আর আমার perspective একেবারে আলাদা। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরবরা তো first shot অনেক আগেই ছুঁড়েছে যেদিন থেকে বলেছে ইসরায়েলকে exist করতে দেবো না। আরব দেশগুলির কোনো root আছে? এরা তো সব..... । Battle of Smarna-র পূর্বে আরব দেশগুলি কোথায় ছিল? সেদিন সব Ottoman Empire-এর মধ্যে ছিল এরা। আর এই যুদ্ধের পর তুর্কীর খলিফ চৌদ্দ দেশে ভাগ করে দিল। Palestine-এ Christ যেদিন crucified হন সেদিন the sky suddenly became dark and there were some constant tremors. তখন এই Jewরা তাদের সমস্ত নারীজাতিরা cross-এ উনি ঝুলছেন, ওঁর সামনে তাদের ছেলেমেয়েদের রাখছে, আর কাঁদছে, দয়া চাইছে। তখন Jesus বলেছিলেন, Weep mothers of Jerusalem, weep. Weep for your own selves, weep for you men-folk, weep for your children for henceforth for 2000 years, you shall roam over the world as a homeless tribe, living in the life of utter degradation and servitude, despised by the whole world, hated by everyone. Weep, mothers of Jerusalem weep for 2000 years. After that by the Mercy of My Father shall return and find your hearth and home.'

এমন জলদগম্ভীর কারুণ্য নিয়ে কথাগুলি বেরিয়ে এলো, মনে হলো যেন যিশুর পদপ্রান্তে বসে শুনছি। কোন্ অতীতের করুণাঘন বেদনার্ত বাণী মনকে অশ্রুসজল করে তুললো।

'Jew মাত্রেই fanatically, unswerving faith ওরা রাখে, ওদের religion ও scripture-এর ওপর। তাদের সেই ancient culture, religion, faith ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে as it is। 2000 বছরের buffeting ওদের সব নষ্ট করেছে কিন্তু faith in their religion, faith in their destiny, faith in Old Testament in tact আছে।

এই জন্যে they have implicit confidence in their faith, এই perspective না রাখলে could you achieve any thing ? What sustains a man, it is faith. বুঝলে হে ? তোমাদের সঙ্গে এইখানে আমার তফাৎ।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নতুন করে যোগাযোগের পর একদিন কয়েকটি কথা বলেছিলেন, এই কথাগুলি চারণের আশপাশের রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে খাটে। চারণ এসবে লিপ্ত নয়, তাই তার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির উদ্বেগ নেই। বেদনা জাগে দেশনেত্রী যে আত্মবিলোপে ডুব দিয়েছিলেন, তাঁর অনুগামীরা সেই আদর্শে সংহত হলেন না কেন ?

'আদর্শের জন্য যে মুহূর্তে পুরানো ঘর ছেড়ে দিয়ে এলে সে-সময় তোমাদের নূতন বর্তমান ঘরে না ঢুকে যদি ছোটো কোনো জায়গা বেছে নিয়ে কোনো নাম ছাড়াই Grass-roots tend করতে তাহোলে এতোদিনে a force to reckon with হতে পারতে। আর তোমাদের তো জোর ছিল, যে লোক এ পৃথিবী ছেড়ে যায় নাই, তার পুনরাগমন হবেই সেটাই তোমাদের শক্তি দিতে পারতো। তা না করে নামের মোহে বাঁধা পড়ে গেলে। এতো লোক চলে গেল, আত্মদান করে গেলো, তাদের কথা তোমরা কেউ ভাবো না। তোমাদের কাছে এসব বৃষ্টির ফোঁটা গা থেকে মুছে ফেল্লেই চলে গেল। আমার কাছে এসব ঘটনা প্রতিটি রক্তবিন্দু। আমার মধ্যে যা হচ্ছে তা দেখবারও কেউ নেই, বোঝবারও কেউ নেই, অনুভব করারও কেউ নেই।"

কিত্‌না বদল গয়ে ইন্‌সাঁ
সূরজ না বদলা চাঁদ না বদ্‌লী
না বদলা আস্‌মান
কিত্‌না বদল গয়ে ইনসাঁ

সুর করে গাইতে গাইতে মহাকাল বল্লেন :

এই দুটো লাইনই মনে ধরে, গেঁথে রয়ে গেছে। সূর্য বদলান না, চাঁদ বদলান না, আসমান বদলায় না আর মানুষ কত বদলে গেছে ! এই কথাটা কত সত্য !

A whirlwind which might or may transform itself into a cyclone of appalling density and momentum. You are all pawns, willy-nilly, in A GAME....সবাই মনে করছি we are the main actors, bu the bitter thing is here—তোমরা কেউ main actor নও। Out of Bounds হয়ে থাকে বহু লোক যারা নানা Securityর কাজে কর্মে জড়িত রয়েছেন। তাদের বাইরের কারুর সঙ্গে মেলামেশার অধিকার নেই, বড়জোর টেলিফোনে কথা বলতে পারে। যারা মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করে—তারা তো condemned হয়েই আছে they are already dead. Dr. Faustusএর বইয়ের মত তাদের জীবন একটা ব্লেডের অগ্রভাগের ১০০ ভাগের এক ভাগ যদি ভুল হয় এঁদের, তবে

সর্বনাশ হবে। সেই পরিবেশ থেকে যারা বেরিয়ে আসে তাদের চাকচিক্যময় পোষাক সত্ত্বেও তাদের মুখে-চোখে একটা বিষাদের ছায়া পড়বে—তা কেবলই বলছে 'I am dead !' 'I am dead' ! 'I am dead' !

মহাকাল বচন বেদ সম। চারণের কোনো সংশয়, কোনো প্রশ্ন, কোনো নবতর কৌতূহল নেই। মহাকালের পরিচয় নিয়ে তাই কোনো তথ্য, কোনো তত্ত্বের সন্ধান তল্লাশ করার প্রয়োজন হয় নি, চিরন্তনী বিপ্লবীর কষ্টিপাথরে যে দেশনেত্রী মহত্তমার পরিচয়ে নির্ধারিত তাঁর আত্মবলিদানই চারণের কাছে শ্রেষ্ঠ ও অভেদ্য সত্য।

নিয়ত কানে বাজছে একটি কথা—এই ধ্বনি দেশময় নতুন দিন আনবে, সূচনা করবে সূর্যোদয়ের—
'মহাকাল কারুর দাক্ষিণ্যের উপর কোনোদিন নির্ভর করে নাই, করবেও না। সে যখন আসবে তখন এমনি-ই আসবে সেজন্য কারোর সম্মতি, অনুমতি এ-সব দরকার হবে না। ঝড়ের মত আসবে সে।'

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

With Compliments from :

REKHI ROADLINES PVT. LTD.

Regd. Office : **40/42 SHROFF BHUVAN**
159 P. D'MELLO ROAD
BOMBAY-400 038

leaders in technology for
Power Generation

VINEYLITE

KIRLOSKAR &
CUMMINS
GEN SET

1 KVA to 1250 KVA AC
Single/three Phase 220/440
Volts with Control Panels

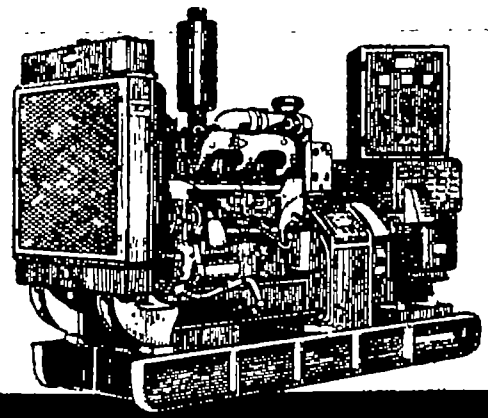

Contact Authorised Dealer and largest Stockist
WESTERN INDIA MACHINERY
COMPANY
24, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013
Phone : 23-5011, 22-6463 Gram : DHINGRASON
Telex : 021—2675. Branch: Delhi and Tarakeswar

AUTHORISED O E / S. EOR KIRLOSKAR & CUMMINS ENGINES

শতাব্দীর দুঃস্বপ্ন

শারদীয় জয়শ্রী প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে ২৬শে সেপ্টেম্বর বিকাল থেকে তিনদিন অবিশ্রান্ত প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন ক'লকাতা শহরের জীবনযাত্রা স্তব্ধ ক'রে দিয়ে গেলো, পশ্চিম বাংলার ষোলটি জেলার বারটি জেলায় অধিকাংশ এলাকায় দ্বিতীয়বার প্রবল বন্যার অভূতপূর্ব বিধ্বংসী তাণ্ডব সৃষ্টি করে প্রায় দেড়কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুললো। তিন দিনে ৭২ সেন্টিমিটার বর্ষণ, দামোদর, বরাকর, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী, অজয়—বলতে গেলে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে সকল নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলিতে প্রবল বর্ষণের পরিণামরূপে ভয়াবহ জলোচ্ছাসের কূল ছাপানো দুরন্ত প্লাবনে বহু জনপদ, গ্রাম শহর, চর, বন্দর ১৫ থেকে ৩০ ফিট জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়ে গেলো। একদিকে নদী ও তার শাখা-প্রশাখাগুলিতে প্লাবনের স্রোত আর অন্যদিকে দামোদর, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষীর জলাধারগুলিতে বহনক্ষমতার অতিরিক্ত জলপ্রবাহ সঞ্চিত হয়ে বাঁধগুলিকে বিপন্ন করে তুললে সেখানকার মাত্রাতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের প্রবাহ—এই মিলিয়ে ধ্বংসের বিভীষিকায় জেলার পর জেলা আচ্ছন্ন হয়ে গেলো, সেখানকার অধিবাসীরা সতর্ক হবার পূর্বেই। এইভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবন্দী হয়ে কোনো কোনো জায়গায় চারদিন কাটিয়েছেন, রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে, খাদ্যহীন, পানীয় জলহীন পরিস্থিতিতে ছাদের ওপর; বা গাছের ডগায়। খাস কলকাতা শহরেও বহুমানুষ গৃহহারা হয়েছেন, অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন, কোথাও বা দিনের পর দিন আলোহীন, পানীয়জলহীন অবস্থায় জলবন্দী, খাদ্যহীন জীবনও যাপন করেছেন। মৃতের সংখ্যা কত তা অনির্ণেয়। বহু গ্রাম ভেসে গেছে, বহু মানুষ নিখোঁজ—তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ তো বটেই। সরকারীসূত্রে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ২১০ জনের মৃত্যুর সমর্থন পেয়েছে।

এই সর্বগ্রাসী বিপদের মুখে সেনাবাহিনীর জোয়ানেরা, বেসামরিক বাহিনীর সদস্যরা, যে সকল সরকারী কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবী যুবকেরা বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলে সকল প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জলমগ্ন মানুষদের উদ্ধার করেছেন ও দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে আর্তত্রাণে এগিয়ে গেছেন তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করে তাদের শোকতপ্ত আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এই মুহূর্তে আমরা আমাদের দেশবাসীদের প্রতি বন্যায় বিপন্নদের সর্বতোমুখী সহায়তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। শতাব্দীর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষ নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, নূতন ভাবে জাতিগঠনে অগ্রসর হবেন, অন্যথায় নিকট ভবিষ্যৎও তাদের ক্ষমা করবে না। এই দায়িত্বের নেতৃত্ব নিলে প্রশাসনও তাদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দেবেন, তাদের সকল ব্যর্থতার স্খালন হবে।

৩রা অক্টোবর, ১৯৭৮

জয়শ্রীর গ্রাহক হউন

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১২·০০। ষাণ্মাসিক ৬·০০। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না। বিশেষ সংখ্যাগুলির পৃথক মূল্য।

একটি অমূল্য সংখ্যা

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা ১০·০০ সডাক ১৪·০০

অফিস : ২০-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
ব্লক মেকার্স এণ্ড প্রিণ্টার্স
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২
ফোন : ২৬-৫৯২৯

ভারত অন্বেষণে আরব মনীষী

ক্ষিতিমোহন সেন, শাস্ত্রী

যে সময়ে মুসলমান শক্তি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়টিকে বলা যাইতে পারে টোল চতুষ্পাঠী বা অধ্যাপক-যুগ। মহাপ্রভু চৈতন্য স্বয়ং এইরূপ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। কাশী, মিথিলা, বাংলা, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ প্রভৃতি সর্বদেশে শিক্ষার এই ব্যবস্থাই চলিত ছিল। আজিকার হীন অবস্থা দেখিয়া চতুষ্পাঠীর বিচার করিলে অন্যায় হইবে। প্রাচীন-ন্যায় হইতে নব্য-ন্যায়ের উদ্ভব এই চতুষ্পাঠীতে।

ইতিমধ্যে ভারতে আসিলেন মুসলমান শক্তি। জ্ঞান ও ভাবের রাজ্যে তাঁহারা ভারতীয়, ইহুদী খৃষ্টীয় ও গ্রীক প্রভৃতি সম্পদের উত্তরাধিকারী। আরবেরা ভারতের দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র, সাহিত্য, গল্প প্রভৃতির অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার পরে আরবেরা আকৃষ্ট হন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি। গ্রীক ভাষা হইতে আরব ভাষায় বহু গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। অনেক বিদ্যার্থী ওডেসা, এন্টিওক প্রভৃতি বড় বড় খৃষ্টীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারাই দক্ষিণ য়ুরোপে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

আরবদের মধ্যে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট হইল তাহাদের চিত্তের সজীবতা। এই সজীবতা সর্বাঙ্গ মানব-জীবনের প্রতি সকল ভাবের সরস কৌতূহল। সরস কৌতূহল ছিল বলিয়াই তাঁহারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া যথার্থ ভূগোল-বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিলেন। দেশ-বিদেশের বিবরণে তাঁহাদের সাহিত্য আশ্চর্য রকমে সমৃদ্ধ। ভারত বিজয়ের বহু পূর্বেকার ভারত সম্বন্ধে আরবদের লিখিত বিবরণ এত আছে যে, সে-সব একত্র হইলে ভারতবর্ষের বিস্মৃত ইতিহাসের অনেক অন্ধকার বিদূরিত হইবে।

অফুরন্ত প্রাণ ছিল বলিয়াই আরব পর্যটক চীন, ভারত প্রভৃতি নানা দেশের মহাবিদ্যালয়সমূহের তথ্য এবং সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের সংস্কৃতিতে ভরপুর হইয়া নিজেদের আনন্দে তাঁহারা বসরা-বাগদাদ-দামাস্কাস-তিহরান হইতে আরম্ভ করিয়া মুর-অধিকৃত স্পেনের গ্রানাডা করতোভা প্রভৃতি স্থানগুলি পর্যন্ত, এই বিরাট ভূভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাইয়া ফেলিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন আচার্য বা গুরু। কাজেই তাঁহাদের স্থান তখন খুব উচ্চে।

সে-সব বিদ্যায়তন এখন নাই, তাহা হইলেও মিশরের অল-অজহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিলে এখনও উপলব্ধি করা সম্ভব প্রাচীন কালে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা মুসলিম জগতের ছাত্রদের কিরূপ মহাসম্মিলন ঘটিত।

আফগানিস্তানের গজনী-নিবাসী মহমুদ ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনে যখন রত তখন একই সঙ্গে আগত আরব ভাষার লেখক আবুরিহান অলবিরুণী লাগিয়া গেলেন অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত, ভারতবর্ষের জ্ঞান ও অধ্যাত্ম সম্পদের সন্ধানে। বিদেশী সংস্কৃতি শ্রদ্ধার সহিত আয়ত্ত

করিয়া আলবিরুণী যেমন ভাবে ভারতকে জয় করিয়াছিলেন তেমন করিয়া কোন বিজয়-প্রয়াসী শক্তি ভারতকে জয় করিতে পারেন নাই। মানবের প্রতি কৌতূহল ছিল বলিয়াই মুসলমানেরা জগতের একটি বিরাট অংশের অধীশ্বর হইলেন।

অলবিরুণীর জন্ম পারস্য দেশে হইলেও শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি পরিপূর্ণ আরব। তাঁহার জন্ম পারস্য দেশের খারিজমে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন জ্যোতিষ, গণিত, ইতিহাস ও আয়ুর্বিদ্যায় পণ্ডিত, দর্শনেও তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। গজনীতে গ্রীক-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিলেও তিনি সেখানে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান করিতেন। ভারতে আসিয়া অলবিরুণী সংস্কৃত ভাষা আরও উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন ও ভারতের নানা চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইয়া তারিখ-অল-হিন্দ বা তহকীক-অল-হিন্দ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস জোতিষ রীতিনীতি বিষয়ে অতি সুন্দর বিবরণ দেওয়া আছে। গ্রন্থকারের ইচ্ছা ছিল এই রচনা তাঁহার পূর্বতন বিখ্যাত গ্রন্থ অসার-অল-বাকিয়ার একটি অঙ্গরূপে প্রকাশ করা, কিন্তু এই অংশটাই বড় হইয়া যাওয়ায় পরে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়।

অলবিরুণী ছিলেন খারিজমের অধিপতির সভাসদ্। খারিজম জয় করিয়া মহমুদ দেশে ফিরিবার সময় অলবিরুণীকে সঙ্গে লইয়া আসেন। তিনি তখন অসার-অল-বাকিয়া রচনায় ব্যস্ত। তৎকালিক সকল জাতির সাহিত্য জ্ঞান ধর্ম প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া হইতেছিল। গজনীতে বসিয়া গ্রন্থকার ভারতের অংশটি বিস্তৃত করার প্রয়োজন আছে মনে করিয়া বড় করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি আসিলেন ভারতে।

মির্জা খাঁ ফকরুদ্দীন মুহম্মদ নামে পারস্যবাসী আর একজন পণ্ডিত কয়েকশত বৎসর পরে ভারতে আসেন। এ-দেশের সংস্কৃতি চিন্তাধারা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তুহফতুল হিন্দ বা ভারতের উপহার নামে এক মূল্যবান বিশ্বকোষ রচনা করেন। ব্রজভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সেই উপলক্ষে রচিত হয়। অভিধানে ছন্দ অলঙ্কার গান নৃত্য তাল রস শাস্ত্র চিকিৎসা জ্যোতিষ আদি সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে মানুষ আপন আপন রুচি-বশতঃ কর্ম জ্ঞান ও প্রেম এই তিনটির কোন-না-কোনটির উপর বেশী জোর দিয়াছে। ধর্মের কর্ম-অংশবাদীরা প্রায় শাস্ত্রাশ্রিত, জ্ঞানপন্থীরা মুক্তিবাদী। প্রেমপন্থীরা ভক্ত।

ধর্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা ইমামদের নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সূফী, দার্শনিক স্বাধীন মতবাদী সকলেরই পরিচয় কিছু কিছু দেওয়া প্রয়োজন। কারণ বিশ্ববিদ্যার দিক দিয়া ইহাদের কাহারও কীর্তি উপেক্ষা করা চলে না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক সংস্কৃতির পরিচয় দিতে হইলে কাহাকেও বা কোনো চিন্তাধারাকে বাদ দেওয়া চলে না।

ইমাম বা শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ঃ হজরতের বাণী আছে, ইখ্‌তিলাফু উম্‌মতি রহমতুন। অর্থাৎ আমার দলে যে মতের ভেদ হয় তাহা ভগবানেরই দয়া। হজরতের বাণী আছে, অল ইলমু ফরীজতুন অলা কুল্লে মুসলিমুন বা মুসলিমাত। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে মুসলমানকে জ্ঞান লাভ করিতেই হইবে, তাঁহার আর একটি বাণী উৎলেবুলে ইল্‌মু ব্‌লউকান বিসসীন। বিদ্যা চীনে থাকিলেও তাহা অন্বেষণ কর।

একটি কৌতুকজনক প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া কেহ

কেহ বলিয়াছেন আরব দেশে শিক্ষকদের স্থান ছিল খুব হীন। অহমক মিন মুঅল্লিম অল কুত্তাব, অর্থাৎ গ্রন্থ-জীবি হইতেও মূর্খ। কিন্তু মনীষী জাহিজ প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন মুসলমান ধর্মের প্রথম অভ্যুদয়-কালে মদিনার যুদ্ধের যুগে অত্যল্প শিক্ষিত রাজবন্দীদের দ্বারা মুক্তির অর্থের বদলে আরবেরা ছেলেদের বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা দেওয়াইয়া লইতেন। বর্ণপরিচয়-মাত্র শিক্ষা দিতে সক্ষম সেই সব শিক্ষকের দল অতিশয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের ছিলেন বলিয়া এইরূপ হীন বচনের উদ্ভব হইয়াছে। গ্রীকদের পেডাগগ বাক্যটির পশ্চাতেও ঠিক এইরূপ একটি ইতিহাস আছে।

হজরতের পরে ইমাম আবু হানিফা (৭০২ খৃষ্টাব্দ) ইমাম মালিক (৭১৪ খৃষ্টাব্দ) ইমাম শাফি ঈ (৭৬৭ খৃষ্টাব্দ) ইমান আহমেদ অর্থাৎ ইবন্ হম্বল (৭৮০ খৃষ্টাব্দ) এই চারিজন ইমাম কর্তৃক চারিটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

ইমাম ইব্ন্ হম্বল ছিলেন অতি কৃচ্ছ্রাচারী শাস্ত্রনিষ্ঠ মানুষ। তাঁহার নিষ্ঠার জন্য তিনি খালিফা অল হারুন এবং অল মামুন প্রভৃতির নিকট দারুণ নির্যাতন ভোগ করেন। হম্বল স্বীকার করেন নাই যে কোরাণ সৃষ্ট বস্তু।

ধর্মব্যাখ্যাতা আরও অনেক আছেন কয়জনেরই বা নাম করিব। ইহাছাড়া সূফী দার্শনিক জ্ঞানপন্থীদের দু-একটি করিয়া নাম উল্লেখ করা ছাড়া বিস্তৃত বিবরণ সম্ভব নয়। তাঁহারা প্রত্যেকেই তখনকার সংস্কৃতির গুরু ছিলেন ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য।

মহিউদ্দিন ইব্ন্ অরাবীও ছিলেন একাধারে ধর্ম-শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ও সূফী। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের দক্ষিণ ভাগে তাঁহার জন্ম, সেই জন্য তাঁহাকে অণ্ডালুসীও বলা হয়। তিনি কোরাণের জাহির অর্থাৎ প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণকারী ছিলেন, অথচ আধ্যাত্মিক বিষয়ে ছিলেন বাতিনী অর্থাৎ গুপ্তার্থগ্রাহী। তাঁহার তরজুমান অল অশ্বাক-কে অনেকে অসংযত প্রেমের কবিতা বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অবশ্য ভিন্ন রূপ। অথচ তিনি ছিলেন নব প্লাটোনিক প্লোটিনাসের ভাবে অনুপ্রাণিত বিশ্বব্রহ্মবাদী।

মোলানা জালালুদ্দীন রুমীর কবিতা পাঠ করিলে এক এক জায়গায় মনে হয় কোনো ভারতীয় ধর্মসাধকের লেখা পড়িতেছি। তাঁহার জন্মান্তরের মধ্য দিয়া ক্রমকিাশ সুন্দর ফুটিয়াছে তাঁহার এই লেখায়।

ছিলাম পাষাণ, মরিয়া হইলাম বৃক্ষ
বৃক্ষজীবন ছাড়িয়া হইলাম পশু
পশু হইতে হইলাম মানব
মানব হইতে হইব দিব্যধামবাসী
তাহার পর যাহা হইব, মানব চিন্তার অতীত
চরমে আমি বিলীন হইব শূণ্যে
শূণ্যে হইব শূণ্যময়।

তাহার পর আসিলেন হাফেজ। তিনি মহাকবি। তাঁহার পরিচয় এই স্বল্প পরিসরে আর দিব কি? ওমর খয়্যাম প্রভৃতির নাম আজ কে বা না জানেন।

মুসলমান দার্শনিকদের এত শ্রেণী, এত সংখ্যা যে এখানে বলা সম্ভব নহে। তাহার মধ্যে এখন দুএক-জনকে লওয়া যাউক যাঁহাদের প্রভাব পড়িয়াছে সকলের উপর।

অবু বা বু 'অলী সীনার জন্ম ৯৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে। ভারতীয় গণিত আয়ত্ত করিয়া তিনি আরিষ্টটলের মেটাফিসিক্স অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। বুঝিতে না পারায় চল্লিশবার তাহা তিনি অধ্যয়ন করেন। পরে অল ফারাবীর টীকার সাহায্যে তাহা বুঝিতে পারেন।

আরব দার্শনিক আবুল ইব্‌ন রুশদ্ য়ুরোপে পরিচিত এভেরোজ নামে। স্পেনের করতোভায় তাঁহার জন্ম। প্রথমে তিনি হকীমী শাস্ত্র পড়েন। ইব্‌ন তুফৈলের অনুরোধে তিনি আরিষ্টটলের টিকা লেখেন এবং নিজ মতামতের জন্য ধর্মগুরুদের দ্বারা উৎপীড়িত হন।

তাঁহার মতে সৃষ্টি নিত্য। অসত্য ও শূন্য হইতে বিশ্বের উদ্ভব অসম্ভব। কালের মধ্যেই অসীমের উপলব্ধি। তাঁহার মতবাদ কতকটা ইব্‌ন সিনার মত।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে ইব্‌ন তুফৈলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১১১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি স্পেনের গ্রানাডা শহরের উত্তর-পশ্চিমে এক সম্ভ্রান্ত আরব বংশে তুফৈলের জন্ম। স্বাধীন মরমিয়া ভাবে তিনি ছিলেন ভরপুর। তাঁহার রূপক কাব্য হয়-বিন-য়কজান গভীর তত্ত্বে পূর্ণ। কেমন করিয়া প্রকৃতির শিক্ষার মধ্য দিয়া জীবনের ক্রমবিকাশ হইতে পারে তাহাই রূপকের মতো করিয়া এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানপন্থী বা ইনটেলেকচুয়ালদের স্থান বড়। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে অল গজ্‌জালীর নাম। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন না। বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় তিনি যখন অধ্যাপক তখন তিনি ছিলেন সংশয়বাদী। পরে তিনি হন সূফী। সাঙ্কেতিক ভাষায় তিনি নিজ মত প্রচার করেন। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় টমাস একাইনস প্রভৃতি ইঁহার চিন্তাধারার কাছে ঋণী।

জ্ঞানপন্থী জাহিজ ছিলেন মু'তাজিলা অর্থাৎ গুণাতীত-বাদী। মানবতত্ত্ব, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ ছিল অসামান্য। শিক্ষা বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত, নিজেও তিনি ছিলেন গুরু। প্রখ্যাত অধ্যাপক ও জীবনীকোষকার ইব্‌ন খল্লিকান ছিলেন জ্ঞানপন্থী। ইব্‌ন তৈমিয়ার হম্বলী মতের ধর্মব্যাখ্যাতা হইয়াও বড় জ্ঞানপন্থী ছিলেন।

জ্ঞানপন্থীদের পরেই আর একটি চিন্তাধারা বা দলের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাঁহারা নিজেদের বলেন ইখ্‌বানউস সফা বা শুচিতার ভ্রাতৃমণ্ডল। দশম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদের প্রভাব দেখা যায়। পবিত্রতা ও উদারতার প্রতিষ্ঠাকল্পে ইহারা সাধনা করিয়াছেন নানা দেশের ভাল ভাল গ্রন্থের চমৎকার অনুবাদ এই দল করিয়া গিয়াছেন। এই কাজে ভারতীয় পারসিক গ্রীক প্রভৃতি নানা দেশীয় জ্ঞানগুরুদের গ্রন্থ হইতে তাঁহারা চয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রার্থনীয় : সকল ধর্মের ও সর্ববিধ সাধনার মধ্যে মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। সকল ধর্ম যেন পরস্পরকে ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্য প্রত্যেকের চিত্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত অর্থাৎ নির্মল রাখা আবশ্যক। নির্মল ভাব বা পবিত্রতা কাম্য ছিল বলিয়া ইঁহাদের পরিচয় পবিত্র ভ্রাতৃমণ্ডলী। এই মতবাদ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তির দ্বারাই ধর্মের এই মৈত্রীবোধ সম্ভব।

মনীষী আবু অল্ আলা মু' অরবী ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত আরব বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে বসন্ত রোগে তিনি অন্ধ হইলেও প্রতিভাবলে সর্বশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানকে গেল বহু দূরে ছাড়াইয়া। জান্তব খাদ্য তিনি গ্রহণ করিতেন না। মাছ মাংস ডিম্ব দুগ্ধ মধু কিছুই না।

অহিংসা ছিল তাঁহার ধর্ম, নির্বাণ তাঁহার কাম্য। যোগী হইয়া তিনি গুহাতে বাস করিতেন, সম্প্রদায়বদ্ধ সকল ধর্মকেই তিনি বলিতেন মিথ্যাচারণ এবং ভণ্ডামী। পুণ্যার্থীদের তিনি বলিতেন দারুণ বৈষয়িক।

ইহলোকের বৈষয়িকতাতে তাঁহাদের পিপাসা মেটে নাই।

স্বাধীন মতের জন্য আবু অল আলা মু' অরবীকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে বহু ধন দিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন। জিন্দিকদের কথা এখানে না বলিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকে। জিন্দিকদের কেহ বলেন নিরীশ্বর, কেহ বলেন শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কেহ বলেন ধর্ম-বিরোধী। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন প্রচলিত ধর্মের বিরোধী, স্বাধীন মতাবলম্বী বলিয়াই নিন্দনীয়। এখন দেখা যাইতেছে জ্ঞান ও শিক্ষার দিক দিয়া ইঁহাদের মনীষা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আচার্য জাহিজের মতে জিন্দিকের লক্ষণ হইল যিনি ভিক্ষু পরিব্রাজক হইয়া জীবে মৈত্রী করেন, সত্যতা শুদ্ধতা সাধুতা ও অকিঞ্চনতা—এই চারি শীল তাঁহারা রক্ষা করিতেন। জীবে দয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ছিল।

একটি উটপাখী একটি রত্ন গিলিয়া ফেলে। দুই জন জিন্দিক তাহা দেখিতে পাইয়াও মৌন হইয়া রহিলেন, পাছে পক্ষিটিকে বধ করা হয়। সেই অপহৃত রত্নের সন্ধান বলিবার জন্য প্রহার করিয়া তাঁহাদের জর্জরিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা কিছুতেই সে কথা বলিয়া দেন নাই।

আরব ও পারসিকদের লেখার অধিকাংশেই ভারতের গৌরবের কথা। গজনী ও ঘোরের রাজত্ব স্থাপনের পূর্বেই বহু মুসলমান তপস্বী এ-দেশে আসিয়াছেন ও সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন। রাজনৈতিক দুর্বলতা এই উদারতার হেতু নহে, কেহই যুদ্ধবল লইয়া এ-দেশে আসেন নাই। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে গুজরাতের তেজপাল ও বস্তুপাল নামে মন্ত্রী হইলেও আসলে ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা। গুজরাত তখন ভারত ও পাশ্চাত্য জগতের বাণিজ্যের মধ্যবর্তী, বিপুল ধন উঠিয়াছে জমিয়া। কী সদগতি করা যায়? বস্তুপালের সহধর্মিণী অনুপমা দেবী ছিলেন বিদুষী এবং বুদ্ধিমতী নারী। তিনি এই সদ্ব্যয়ের ভার লইলেন। জৈন হইয়াও তিনি পাঁচশত হিন্দু মন্দির রচনা করিলেন, আশিটি মসজিদ তৈয়ার করিলেন, মনে রাখিতে হইবে তখনও সেখানে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং মহমুদ গজনীর আক্রমণে ভারতের চিত্ত বিষতিক্ত হইবার কথা। মহাভক্ত মখদুম সৈয়দ অলি অল হুজবীরী অল জুল্লারীর নাম আজ মনে পড়ে। লাহোরে তিনি সাধনা করিয়া ১০৭২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ কশ্‌ক-অল্‌-মহবুব গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন সাধনাতে গুরু ছাড়া অগ্রসর হওয়া কঠিন।

খ্বাজা মুইন-উদ্দিন চিস্তি চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের মহাসাধক। আকবরের সলীম চিশ্‌তিও এই সম্প্রদায়েরই সাধক। মুইন-উদ্দিনের শিষ্য কুত্‌ব-উদ্দিন কাকী ও ফরীদ-উদ্দিন শকরগঞ্জ। শকরগঞ্জের শিষ্য দিল্লীর প্রখ্যাত নিজাম-উদ্দিন ঔলিয়া। ক্রমে সুরবর্দী কাদিরী প্রভৃতি মতের সাধকেরা তাঁহাদের বাণী প্রচার করেন। এই কাদিরী শাখারই সাধক প্রখ্যাত মীয়াঁ মীর। বাংলার শাহজলাল এদেশে সুপরিচিত। এই সব সাধক-সম্প্রদায়েই গুরু ও শিক্ষার অতিশয় সমাদর।

মুসলমান পণ্ডিতেরা ভারতে জ্ঞানের পীঠস্থান রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। স্বাভাবিক কারণবশতঃ তাঁহারা প্রাচীন শিক্ষাক্ষেত্র কাশীর কাছে জৌনপুর, মগধের কাছে পাটনা—এইরূপ মুখ্যস্থানই নির্বাচন করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগে ভারতীয় মুসলমান ধর্মশাস্ত্রগুরুদের মধ্যে শেখ দায়ুদ জিহনীবাল, বজী হুদ্দিন গুজরাতী, শেখ

বুঢ়ঢা দানাপুরী, হজরত শাহবলী উল্লা, শাহ অবদুল অজিজ দেহবলী প্রভৃতি মহাপণ্ডিতরা ছিলেন প্রখ্যাত। এই ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে যেমন বড় বড় ধর্মব্যাখ্যাতা আবির্ভূত হইয়াছেন তেমনি বড় বড় স্বাধীন মতবাদী মনীষীরও ভারতে জন্ম হইয়াছে। পুরাতন পথ ধরিয়া চলিতে গভীর নিষ্ঠার প্রয়োজন কিন্তু স্বাধীন বা বিদ্রোহী কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রয়োজন প্রবল মনীষার। আর জ্ঞানের রাজ্যে এই মনীষা লইয়াই প্রধান কারবার। আকবরের প্রধান সহচর আবুল ফজল ও ফৈজীও তাঁহাদের পিতা গ্রীক দর্শনের পণ্ডিত মুবারক নাগোরীর নাম বিদিত। মুবারক তাঁহার এক পুত্রকে প্রধানতঃ গ্রীক বিদ্যায়, অন্য পুত্রকে প্রধানতঃ সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত করিয়া তোলেন।

স্বাধীন চিন্তাশীল সূফী সাধকদের মধ্যে সিন্ধুদেশের শাহ করীম, ইনায়ৎ, বেদিল, বেকস রোহন কুতুব এবং দিল্লীর নব-সূফীবাদের বাবরী শাহ স্মরণীয়। সূফী শেখ আলাই তাঁহার স্বাধীন মতের জন্য জাহাঙ্গীরের সময়ে ও সরমদ আওরংজেবের সময়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

"……REMEMBER THAT I AM PRESENT IN THEE
AND LOSE NOT HOPE ;
EACH EFFORT, EACH GRIEF,
EACH JOY AND EACH PANG,
EACH CALL OF THY HEART,
EACH ASPIRATION OF THY SOUL……
ALL, ALL WITHOUT EXCEPTION,……
LEAD THEE TOWARDS ME,……"

—THE MOTHER

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষানীতি

আলোচনা

শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার স্থান চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহারের উপযোগিতা, নানা প্রাক্-প্রস্তুতির পর বিচার ক'রে প্রয়োগ করা হবে। সে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিমধ্যে সুরু হয়ে গেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে, যাঁরা মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে পাঠক্রমের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে চান, তারাও ঐ স্তরে ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃভাষার ব্যবহারে ধীরগতি-নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী। কোনো ত্বরিৎ-পরিবর্তনের বিঘ্নগুলি সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ সজাগ।

বিপদ হয়েছে অন্যান্য পর্যায়ে ভাষাকে বাদ দেওয়া নিয়ে। স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রমে ভাষা-শিক্ষা অপরিহার্য কিনা সে প্রশ্ন উঠেছে। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলের একাডেমিক উপ-সমিতি স্নাতক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, মানবিক-শিক্ষাই হৌক, বিজ্ঞান-শিক্ষাই হৌক—শিক্ষার স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-উপসমিতি। স্নাতক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হবে। সুতরাং এদের মতে মাতৃভাষার চর্চা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আর প্রাথমিক পর্যায়ে ইরাজী ভাষা-শিক্ষা বর্জন করা হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থার ফলে স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজীর ভাষাজ্ঞান, তাদের পাঠক্রমের গভীরে প্রবেশ করতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষার বিলোপ, মাঝখানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ক্ষেত্রে ইংরেজীর সংযোজনের পর আবার স্নাতক পর্যায়ে ইংরাজী ভাষার বিলোপ, ইংরেজী-ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের কী পরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি করবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। স্নাতক পর্যায়ে মাতৃভাষার ব্যবহারে যদি বাঙলাভাষী শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন শিক্ষার্থীরা অনায়াসে বাংলাভাষায় সড়গড় হয়ে যাবেন, তবে সেটা নিতান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে। কারণ পাঠক্রমে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের সংযোজন থাকা সত্ত্বেও যে-ক্ষেত্রে অনুশীলনের অভাবে বাক্যরচনার ব্যভিচার থেকে বর্ণাশুদ্ধি পর্যন্ত পরীক্ষার পাতায় অহরহ দেখা যায়, সেখানে স্নাতক পর্যায়ে বাংলাভাষার আবশ্যিক পঠন-পাঠনের পরিবর্তে ঐচ্ছিক পঠন-পাঠনের ওপর ভর করলে পরিণাম অশুভ হতে

বাধ্য। 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে যেমন গোবিন্দর পায়ে নিবেদিত খৈ পৌঁছাবে না, তেমনি যারা আবশ্যিক ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করে পরীক্ষার্থীদের বোঝা হালকা করতে চান, তারাও সেই পথেই চলবেন। তাদের এই নীতির ফলে তারা শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ভুলের বোঝা বাড়িয়েই চলবেন। সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপসমিতি স্নাতক স্তরে বাতিল করে দিয়েছেন। তাদের যুক্তি একই। স্নাতক পর্যায়ে মানবিক-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য তাদের মতে, সংস্কৃতের আবশ্যিক পাঠ একেবারে নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত বাংলাভাষার মূলাধার, ভারতীয় সংস্কৃতির বহু ঐশ্বর্য সংস্কৃত ভাষায় খোদিত এবং লিখিত। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার প্রবাহ সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে উদ্ঘাটন করা যাবে না।

১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের পর জীবনের সকল স্তরে বিদেশী বর্জনের হিড়িক দেখা দিয়েছিলো। ইংরাজী-ভাষাও এই ভাষাগত কালাপাহাড়ী কোপে পড়ে বিতাড়নের পথে বিদায় নিচ্ছিল।

একদিকে যেমন এই ধরণের ইংরাজী-বিতাড়ন মত্ততা দেশের বেশ কিছু মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দিকে অহিন্দি-ভাষীদের উপর জোর করিয়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল। সে জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা-দাঙ্গা হয়ে গেছে। এ-জন্য নেহেরুকে কবুল করতে হয় জাতীয় স্তরে ইংরাজী, হিন্দির সহযোগী ভাষার (Associate Language) প্রতিষ্ঠা পাবে, যতদিন না অহিন্দিভাষীরা স্বেচ্ছায় হিন্দিকে যোগাযোগের ভাষারূপে গ্রহণ করেন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে ভাষা-বিরোধ মীমাংসার জন্য ত্রিভাষাসূত্রের বিধান স্বীকৃত হলেও তার বিচ্যুতি দেখা গেছে।

সুতরাং, প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বাঙলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইংরাজী ঐচ্ছিক হলে, অন্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাদের মেধা খর্বিত হবে। সংস্কৃত-শিক্ষার বনিয়াদও পোক্ত করা চাই, সেজন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সংস্কৃত আবশ্যিক চাই। মাতৃভাষা যাদের বাংলা, বাংলাভাষার ঐচ্ছিক শিক্ষাই তাদের পক্ষে বাংলা-ভাষার শিক্ষাগত বনিয়াদ পোক্ত করতে যথেষ্ট, এই ভাবনার সর্বনাশা পণিতি সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রশাসকদের অবিলম্বে সতর্ক হয়ে বাংলাকেও স্নাতক স্তর পর্যন্ত আবশ্যিক করবার দায়িত্ব নিতে হবে।

সর্বভারতীয় কোঠারী শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৫-৬৬) সুপারিশ ছিল স্কুল ও কলেজে ইংরেজী আবশ্যিক হবে। মাতৃভাষা হবে সর্বস্তরের শিক্ষার বাহন। কোঠারী কমিশন প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা সুরু করতে বলেছেন। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী যেমন সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হবে তেমনি ইংরাজীও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের এবং জ্ঞানের আদান-প্রদানের ভাষারূপে সচল থাকবে। সময়মত হিন্দিভাষা যোগাযোগের সূত্র হবে। সে কবে তা অনির্দেশ্য এবং অনির্ণেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষানীতি নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে-সম্পর্কে 'জয়শ্রী'র আলোচনায় তিনজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। সেজন্য আমরা 'জয়শ্রী'র পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই আলোচনাগুলি পত্রস্থ করা হল। আশাকরি শিক্ষা-প্রশাসকেরা তাঁদের মতামতগুলির প্রতি মনোযোগ দেবেন।

সম্পাদক, জয়শ্রী

শিক্ষা-নীতির প্রসঙ্গে

অমলেন্দু বসু

১

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বভাবতই জাতীয় জীবনের বহুদিকেই অল্প বা বিস্তর পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। বস্তুত, এসব প্রয়োজনের কথা স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই আলোচিত হয়েছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক। দেশের লোকের প্রয়োজন কোথায় সে-বিষয়ে দেশের লোকের সংবেদনা ও চিন্তা প্রধান অংশভাক্ হতে বাধ্য। একজন সিস্টার নিবেদিতা, একজন চার্লস অ্যান্ড্রিয়ুজ ছিলেন ভারতবর্ষের কল্যাণার্থে সমর্পিতপ্রাণ বিদেশী, তাঁদের (এবং তুলনীয় অন্যান্য বিদেশীদের) কথা ভারতবর্ষীয়েরা স্মরণ রাখবে চিরকাল। তবুও একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে তাঁদের যার যার কর্মপ্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল ভারতীয় চিন্তারই উৎস, উদ্দীপনা, উদ্যম যার প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ অথবা তাঁদেরই মত কোনো দেশপ্রেমিক ভারতীয়। পরিবর্তনের প্রয়োজনবোধ করা ছিল তাঁদের দেশপ্রেমের অবিভাজ্য অংশ।

ভারতীয় সর্বস্পর্শী দেশপ্রেমের একটি দিক ছিল (এবং আজো, স্বাধীনতার পরেও) ভারতবাসীর শিক্ষাপ্রণালী সংক্রান্ত। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী ইংরেজ আগমনের পূর্বে রাজ্য-শাসনব্যবস্থার অঙ্গ ছিল না, ছিল সমাজ-জীবনের ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছাত্রগণ গুরুগৃহে অধ্যয়ন করতেন কিন্তু আজকের ধরণের পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রীলাভ করতেন না। গুরু এবং আঞ্চলিক বিদ্বানগণ মৌখিক পরীক্ষার পরে যখন বলতেন, এই যুবক যথার্থ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছে, তখন তাঁদের স্বীকৃতি সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতি হয়ে যেত। বস্তুত এই সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতিই ছিল যাবতীয় সভ্য সমাজে প্রচালিত। কী সোক্রাটেস্-প্লেটো-আরিস্টটলের শিক্ষাজগৎ, কী আল্ আজহার-এর শিক্ষাজগৎ, কী শঙ্করাচার্যের, কী চৈতন্য দেবের চতুষ্পাঠী, সর্বত্রই গুরুর স্বীকৃতি ছিল ছাত্রজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই অধ্যাপনা-অধ্যয়ন সংগঠনে পঠিতব্য বিষয়ের কোনো আবশ্যিক-ঐচ্ছিক তারতম্য ছিলনা, কোনো ধ্রুব কালসীমা ছিল না, কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি ছিল না। শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার সময়দৈর্ঘ্য, শিক্ষার অন্তে পরীক্ষা, এ-সব বিষয়ে পরবর্তী কাল থেকে ছক কাটা বাঁধাধরা নিয়ম প্রবর্তিত হল, যে কালে শিক্ষার বাজার দর নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো না কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাপমারা পত্রের—ডিপ্লোমার, ডিগ্রীর—নির্ভরে শিক্ষার্থীর বিদ্যার মূল্যায়ন হতে থাকল। প্রতিষ্ঠানের গৌরবে গৌরবান্বিত হল শিক্ষার্থী, গুরুর ব্যক্তিগত মহত্ত্ব আর রইলোনা শিক্ষার্থীর গৌরববোধের উৎস। প্রাচীনকালে কোনো বিদ্যার্থী বলতে পারত আমি আট কি দশ কি বিশ বৎসর আমার পরম পূজনীয় গুরুর পদতলে বসেছি, তাঁর মুখনিঃসৃত

বাণী শুনেছি—সে গুরু হতে পারতেন অ্যারিস্টটল, ঋষি গৌতম ; ইব্‌ন্ খালদুন্, ইরেস্‌মাস্—আমি জ্ঞানের রাজপথে পদার্পণ করেছি, কতদূর কৃতকার্য হব আমার সত্যানুসন্ধানে সেটা নির্ভর করে আমার নিষ্ঠার উপরে।

কিন্তু কালে জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি নিছক গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে আবদ্ধ রইলো না। বিদ্যাচর্চার ব্যাপারটি রাজ্যশাসন-চালনার একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। শিক্ষা কারা পাবে, কোথায় পাবে, কী ভাবে পাবে, বিদ্যালাভের কয় ধাপ পর্যন্ত পাবে, এই সমস্তই শাসনতন্ত্রের সব-ছোঁওয়া কর্তব্যসীমার মধ্যে এসে পড়ল। ব্যক্তির চেয়ে অনেক অনেক বড়ো হয়ে দাঁড়াল সমষ্টি। এবং বস্তুত তেমনটি না দাঁড়ালে ব্যক্তির স্বাধীনতাও নিরাপদ থাকে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা যতই দৃঢ় এবং নিশ্চিত করতে চাইব, সে-স্বাধীনতা ততই সমর্পণ করতে হবে সমষ্টি-সত্তার কাছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আশ্চর্য দ্বৈততা পরিস্ফুট হল। বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষার যে ব্যবস্থা, যে মূল্য, তার দুটি দিক আছে : (এক) শিক্ষার্থী শিক্ষার অবশেষে যে ডিগ্রি পেলেন সেই ডিগ্রির জোরে তিনি একটি চাকুরি পেলেন, সমাজ-জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন। যদি তিনি ডিগ্রি না পেয়ে থাকেন অথবা তাঁর ডিগ্রিটি যদি নিচুস্তরের হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো তিনি আদৌ চাকুরি পেলেনই না, অথবা লঘু মূল্যের চাকুরি পেলেন। অর্থাৎ, কথাটা দাঁড়াচ্ছে যে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট—শিক্ষার সময়সীমার অন্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যা পাওয়া যায়—সেই স্বীকৃতিপত্রের শক্তিতে অর্থোপার্জন করা যায়। লেখা-পড়া এবং তার পরিণাম—ডিগ্রি—এদের মূল্য হচ্ছে আসলে অর্থমূল্য। "লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই" কথাটার মধ্যে কিছু সত্য তো আছেই। বহু বৎসর পূর্বে একখানা সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গচিত্র দেখেছিলাম গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা, সেই ছবিতে দেখানো হয়েছিল একটি বিশাল ভবন, ভবনটি হচ্ছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (আমাদের দেশের যে কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয় হতেও পারত), ভবনটি একটি ফ্যাক্টরি, তার একদিকে একটি মস্ত চোঙা, এই চোঙার ভিতরে প্রবেশ করছে গণনাতীত ছাত্র-ছাত্রী, তারা বেরচ্ছে অপরদিকের মস্ত চোঙা দিয়ে, বেরবার সময় তারা সব ন্যুব্জদেহ, তাদের পিঠে ডিগ্রির তক্‌মা সাঁটা আছে।

অর্থাৎ, আজকের দিনে আমাদের দেশে শিক্ষায়তনে যে শিক্ষা মেলে তা তো জ্ঞানার্জন নয়, ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধায়নী শক্তিসম্পন্ন নয়, নিতান্তই অর্থকরী বিদ্যা। এতৎ সত্ত্বেও হয়তো কোনো শিক্ষার্থী এই পঙ্কিল পদ্ধতির মধ্য থেকেই কিছু জ্ঞান অর্জন করলেন, সে-অর্জন তাঁর নিজস্ব নিষ্ঠা ও প্রয়াস থেকে উদ্ভূত, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত নয়। এ হচ্ছে বর্তমান শিক্ষার একটি দিক।

(দুই) বর্তমান শিক্ষার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে তার শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা। আজকের দিনের শিক্ষাব্যবস্থায়ও নিছক অর্থকরিতার, সামাজিক প্রতিষ্ঠার ঊর্ধ্বে একটা আদর্শিক প্রেরণা থাকতে পারে, থাকেও। আজো এমন শিক্ষক আছেন, এমন শিক্ষার্থী আছেন, যাঁরা অর্থমূল্যে জ্ঞানের মূল্যায়ন করেন না, যাঁরা বিশুদ্ধ জ্ঞান পিপাসা-দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন, চারিদিককার মালিন্যের মধ্যে তাঁদের নির্লোভ জ্ঞানচর্চা যেন একটি নিষ্কম্প দীপশিখা। কিন্তু আজকের সমাজে, আজকের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই দীপশিখা বড়ই বিরল, বিরল বলেই মহার্ঘ।

২

এককালে শিক্ষার কেন্দ্রস্থ বিষয়কে বলা হত: the three R's; Reading, Writing (A)Rithmetic। কথাটির অবধানযোগ্যতা আজো কমেনি। গণিত একটি বিষয় যদ্দ্বারা শুদ্ধ জ্ঞান এবং অশুদ্ধ জ্ঞানের তারতম্য প্রকটিত হয়। গণিত একটি বিষয় যা কখনো তিন সাত্তে বাইশ বা কুড়ি এ হেন হিসাব বরদাস্ত করবে না, তিন সাত্তে একুশ হতেই হবে। অতএব, উপরোক্ত ইংরেজি প্রবচনটি থেকে আমরা জানছি জ্ঞানবস্তুর চরিত্র। কিন্তু এই যে জানলাম, কী ভাবে জানলাম? জানলাম আমার পঠনশক্তি দ্বারা এবং লিখনশক্তি দ্বারা। এই দুটি শক্তিরই কার্যক্ষেত্র হচ্ছে ভাষা যা কিনা মানুষের বচনে মানুষের শ্রবণে বিধৃত হয়, তাছাড়া ভাষা লিখিত হয় এবং লিখিত হলেই পঠিত হতেও পারে। ভাষা ছাড়া জ্ঞান হয় না। জ্ঞানের অর্জন হয় না, জ্ঞানের প্রকাশও হয় না। জ্ঞান আহরণের ও বিকীরণের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। আমার জ্ঞান আমি বচন দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, লিখে প্রকাশ করতে পারি, অথবা কর্মদ্বারা প্রকাশ করতে পারি। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি সাঁতার কাটতে পারেন, সেলাই করতে পারেন; কবিতা লিখতে পারেন? তখন আমি স্রেফ 'হ্যাঁ, পারি', না বলে সাঁতার কেটে, সেলাই করে, একটি কবিতা লিখে আমার সাধ্যের প্রমাণ দিতে পারি। যে বিষয়টি ছিল অন্তরে জানা, তার বহিঃপ্রকাশ করে সেই জানার প্রমাণ দিলাম। এই বহিঃপ্রকাশিত কর্মরূপায়িত প্রমাণের অন্য একটি ধরণও আছে। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবিষয়ে মশাই কি কিছু জানেন?—তদুত্তরে আমি মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ করলাম না অথবা কাগজে-কলমে কিছু লিখলাম না, কেবল ঘাড় নাড়লাম, একভাবে ঘাড় নাড়ার সর্বজনবোধ্য মানে হল, না জানিনা, অন্যভাবে ঘাড় নাড়ার মানে হল, হ্যাঁ জানি। এই ভাষা লিখিতং পঠিতং ভাষা নয়, যদিও এতদ্বারাও অর্থ প্রকাশ হয়, এ-ও একরকম ভাষা। প্রতীচ্যে একে বলে Language as Gesture।

প্রায় যাবতীয় মনুষ্যেরই ভাষার উপরে (নিজ নিজ মাতৃভাষার উপরে) অল্পবিস্তর দখল আছে। দুর্ভাগ্যবশত যার বাক্‌শক্তি নেই, শ্রবণ শক্তি নেই, দু' রকম শক্তিই নেই, (এ হেন মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়), সেই মানুষকে বাদ দিয়ে অন্য সব মানুষ নিজ মাতৃভাষার উপরে দ্বিবিধ দখল অর্জন করে: (১) সেই ভাষায় কেউ তাকে কিছু বললে সে বক্তব্য বুঝতে পারে; (২) সে নিজে সেই ভাষায় কথা বলতে পারে। এই দুটী শক্তি হচ্ছে ভাষাজ্ঞানের একান্ত মৌলিক দুটি শক্তি। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের অন্য দ্বিবিধ দখলও আছে; (৩) সে নিজের চিন্তা লিখে প্রকাশ করতে পারে; (৪) অপরে যে কথা লিখেছে সে কথা পড়ে বুঝতে পারে।

ভাষা শুধু কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি নয়, বহু অভিধা-সম্পন্ন ধ্বনির বৈচিত্র্য, এই ধ্বনিতে নিহিত থাকে বহুবিধ বাগর্থ, এই ধ্বনির ও এই বাগর্থের প্রকার-ভেদও হয়ে থাকে যুগে যুগে, দেশে দেশে, এমনকি একই গৃহবাসী দু'জনায়। ভাষার জটিলতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন প্রাচীন পণ্ডিতগণ। পাণিনির নাম কে-ই বা না শুনেছে! এ যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিত চম্‌স্‌কি'র নামই বা কে না শুনেছে! যেহেতু আমরা ভালোমত কিছু জানার বা বোঝার পূর্বেই নিজের মাতৃভাষা বলতে এবং শুনে বুঝতে পেরেছি,

তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা নির্বুদ্ধিতা হবে যে ভাষা বড়োই সহজ ব্যাপার।

বস্তুতঃ ভাষাতত্ত্ব তেমনই দুরূহ যেমন হচ্ছে গণিত বা ন্যায়শাস্ত্র। গণিত ও ন্যায়শাস্ত্র শিখতে হয়, ভাষাও তেমনি শিখতে হয়, এমনকি মাতৃভাষাও শিখতে হয়। ভাষা-শিক্ষা ছাড়া, ভাষা-মাধ্যম ছাড়া কোনো জ্ঞান অর্জিত হয় না, প্রকাশিত হয় না।

৩

এতক্ষণ যে সব কথা বলা হল, সে সবই একটি বিশেষ ধারণা পেশ করার প্রস্তুতি। ধারণাটি হচ্ছে যে, শিক্ষার কোনো স্তরেই ভাষা-শিক্ষাকে অবজ্ঞা করা চলে না, কোনো স্তরেই ভাষাকে বাদ দিলে শিক্ষা সার্থক হয় না। ইস্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষার সর্বস্তরে যখনই আমরা জ্ঞান-জগতের কোনো বিশেষ ক্ষেত্র বেছে নিই, তখনই সেই সঙ্গে সেই জ্ঞানক্ষেত্রের সঙ্গত যে ভাষারীতি, সেটিও আমাদের শিখতে হয়। প্রতিটী জ্ঞানক্ষেত্রের ভাষামাধ্যমে কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। জ্ঞানার্থীকে জ্ঞানবস্তু শেখার সময় সমীচীন ভাষামাধ্যমও শিখতে হয়। জ্ঞানবস্তু ও ভাষামাধ্যম কখনোই স্বতন্ত্র নয়। যখন অঙ্ক শিখি, শুধু অঙ্কের বিষয়ই শিখিনা, অঙ্ক-বিষয়ের সঙ্গত ভাষামাধ্যমও শিখি। অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে যদি কবিতা পড়তে শুরু করি তাহলে দেখব যে কাব্য-সম্বোধির ভাষামাধ্যম স্বতন্ত্র। অঙ্ক ও কাব্য, দুইয়েই একই ভাষা কাজ করছে (ধরুন ইংরেজি ভাষা) কিন্তু ইংরেজি ভাষার যে বাক্‌রীতি কাব্যপাঠে সুষ্ঠু, সে বাক্‌রীতিতে অঙ্ক শেখা চলে না। মনন কার্যের বহুবিধ প্রকারের প্রতিটিতে স্বতন্ত্র বাক্‌রীতির প্রয়োজন হয়। খুব বিস্তৃত দৃষ্টিতেও যদি দেখি, তাহলেও বলব যে ডিগ্রি ক্লাশে দর্শন শাস্ত্র পড়ায় ও লেখায় যে ভাষারীতি প্রযুক্ত হয়, গণিতবিদ্যার পড়ায় ও লেখায় সেই ভাষারীতি প্রযুক্ত হয় না।

অতএব, শিক্ষাজগতে ভাষার স্থান অপরিবর্তনীয়। শিক্ষার দ্বৈতরূপটি আমাদের বুঝতে হবে ঃ শিক্ষা হচ্ছে একটি বিষয়ের শিক্ষা; আবার সেই বিষয়টি সমুচিতভাবে জানতে হলে, সমুচিত জ্ঞানটি প্রকাশ করতে হলেই ভাষা-মাধ্যমের শরণাপন্ন হতে হবে, এবং প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয়ের ভাষারীতির কিছু না কিছু স্বকীয়তা আছেই।

আজ আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা-মাধ্যমটিকে অবহেলা করার ক্ষতিকারক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ভাষা সম্বন্ধে নানারকম উক্তি শোনা যাচ্ছে, এবং যেহেতু (এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে যে কথা বলা হয়েছে) আজকের জগতে শিক্ষা হচ্ছে জটিল রাষ্ট্রশাসন প্রণালীর অন্তর্গত একটি দপ্তর এবং সে কারণেই শিক্ষা ব্যাপারটাই পেশাদার রাজনীতিবিদ্ ও সংবাদিকের পায়ের কাছে ফুটবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যদি এখন শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা লাভ করি তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার পূর্ববর্তী শাসনকর্তার তুলনায় আমি কত বেশি সমজদার ব্যক্তি, কত অগ্রগামী, কত কুশলী। অতএব, এতাবৎ প্রচলিত প্রথা পালটে ফেলা দরকার।

আমাদের বাংলা দেশে দীর্ঘকাল শিক্ষার্থিগণ মাতৃভাষার সঙ্গে আরো ভাষা শিখেছেন ঃ ইংরেজি এবং সংস্কৃত (অথবা আরবী / ফারসী)। সংস্কৃত একটানা দীর্ঘকাল ধরে সচরাচর শেখা হয়নি, কিন্তু বাংলা ভাষা ও ইংরেজী ভাষা—এই দুই ভাষা ইস্কুলের প্রথম থেকে ডিগ্রিক্লাশ অবধি শেখা হয়েছে। এখন শাসনকর্তারা সাব্যস্ত করেছেন যে প্রাইমারি স্তরে শুধু

মাতৃভাষা শিখলেই চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা (যাঁরা শিক্ষাশাস্ত্রবিৎ কিনা জানি না, যদিও অবশ্য তাঁরা স্ব স্ব জ্ঞানক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান) ভেবেছেন যে ইস্কুলের মাধ্যমিক স্তরে যখন ছাত্রগণ ভাষা শিক্ষা করেছে তখন ডিগ্রিস্তরে আর ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই ধারণা যে গ্রহণযোগ্য নয় সেকথা উপরের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলেছি এবং এখনো পুনরাবৃত্তি করছি: শিক্ষার প্রতিস্তরে, শিক্ষণীয় প্রতি বিষয়ের জন্যই ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। ভাষা শিক্ষা তুলে দিলে বিষয়ের জ্ঞান এবং সে-জ্ঞানের প্রকাশ দুই-ই ভঙ্গুর হতে বাধ্য।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা বর্জন করা, আমার ধারণায়, অতীব আপত্তিজনক। এই বর্জনের ফল দাঁড়াবে (ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েও গেছে) যে প্রাইমারী স্তরের পরে একই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হবে: যারা ইংরেজি কিছু শিখেছে, আর যারা ইংরেজি আদৌ জানে না। শ্রেণীবর্জন-কামী আমরা আইন করে একটা শ্রেণীবিভেদ তৈরী করলাম। এই শ্রেণীবিভেদের ফলে হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের অর্থ-উপার্জনশক্তি কমে যাবে। আজ দেখতে পাই প্রাইমারি স্তরের পরে বহু ছেলেমেয়ে আর ইস্কুলে পড়ে না, আসলে তাদের পড়ার সংস্থান নেই, অবিলম্বে উপার্জনকরী কাজ শিখতে হবে। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে উপার্জন-ক্ষমতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান,, নিষ্কাম জ্ঞান,—এসব আদর্শ বর্তমান জগৎ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখন এসেছে তীব্র সকাম জ্ঞানচর্চা। ছাত্ররা পড়াশোনা করে যাতে করে কিছু উপার্জন করা সম্ভব হয়। আমাদের সমাজের অভাবগ্রস্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অর্থাভাবে ইস্কুলের শেষ অবধি পড়তে পারে না, প্রাইমারির পরেই পড়া ছেড়ে দেয়, কাজকর্মের চেষ্টায় থাকে। এদের অনেককেই ছোটখাট মিস্ত্রীর কাজ শিখতে হয়—কাঠের মিস্ত্রী, দর্জিগিরি, দালান তৈরির ওস্তাগরের কাজ, সাইকেল, মোটর এবং অসংখ্য যন্ত্রপাতির মিস্ত্রী—যে সব যন্ত্রপাতি ছাড়া আজকের নাগরিক জীবন এক মিনিটও চলতে পারে না। এই সমস্ত মিস্ত্রীর পক্ষে সামান্য ইংরেজি জ্ঞান অশেষ উপকারী। আমি দেখেছি একটি বড়ো মোটর-মেরামতি কারখানায় যিনি হেড মিস্ত্রী তাঁর মাসিক বেতন ১৩০০ টাকা, তাঁর ইস্কুল জীবন ক্লাস ফোর-এ সমাপ্ত হয়। কিন্তু ঐটুকু ইংরেজি জ্ঞান তিনি বিচক্ষণভাবে প্রয়োগ করে এমন দক্ষতা লাভ করলেন যে কোম্পানী তাঁকে ছয় মাসের জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠালো, ফিরে এসে উনি হেড মিস্ত্রী হয়ে গেলেন। এতটা উন্নতি ঠিক সাধারণ ঘটনা নয় কিন্তু ইংরেজি ভাষায় সামান্য জ্ঞান থাকলে সেই জ্ঞান কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিম্নবিত্ত তরুণ নিজ পেশায় রীতিমতো উন্নতি করতে পারবে এবং তার সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে সারা ভারতবর্ষে, হয়তো বহির্জগতেও, কেবল নিজ গ্রামে, শহরে, প্রদেশে আবদ্ধ থাকবে না। সর্বত্র তার পাসপোর্ট হবে ইংরেজি। আজ যে প্রদেশ প্রাইমারি বিভাগ থেকে ইংরেজি দূরীভূত করবে সে-প্রদেশ নিম্নবিত্তকে নিম্নতর বিত্তের শ্রেণীতে নেমে যেতে বাধ্য করবে যদিচ মুখে বলা হতে থাকবে যে আমরা ব্যক্তির সমত্বে বিশ্বাস করি।

ডিগ্রি ক্লাস থেকেও ইংরেজির আবশ্যিক শিক্ষা তুলে দেওয়া একই ধরনের দুর্বিচারী পদক্ষেপ। আধুনিক জগতে শিক্ষা যখন প্রধানত অর্থকরী প্রক্রিয়া, ইংরেজি বাদ দিলে শিক্ষার অর্থকরিতা হ্রাস পায় একথাটি সাধারণ লোকে যেমন বোঝেন, পেশাদার

রাজনীতিবিদগণ তেমনই বোঝেন, তবে তাঁরা নিজেদের সন্তানগুলিকে ইংরেজি-মাধ্যম ইস্কুলে পাঠিয়ে দেন অথবা ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় স্কুলে পাঠিয়ে দেন।

ইংরেজির বিরুদ্ধে একটী অতিপ্রচলিত অথচ অগ্রাহ্য যুক্তি আছে। যুক্তিটি হচ্ছে যে এটি এদেশের প্রাক্তন শাসনকর্তাদের ভাষা। আমাদের এ-ভাষা শিখতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কথাটা সত্য নয়। ইতিহাস বলে যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সপক্ষে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো গোঁড়া হিন্দু। ঈশ্বরচন্দ্র পাঠজীবনে ইংরজি শেখেন নি, পরে শিখে নিয়েছিলেন। এঁরা ইংরেজির একটি মস্ত গুণ উপলব্ধি করেছিলেন, এর জাতি-ধর্ম-দেশোত্তর প্রচলন, অতএব বিশ্বের সর্বকর্মে এর প্রয়োজনীয়তা। যে রাজনৈতিক উচ্চাবচ তারতম্য ইংরেজ আমলে ছিল, স্বাধীনতার পরে সেই তারতম্যও দূরীভূত হল। এখন আমরা ইংরেজি শিখব কোনো inferiority complex থেকে নয়, সম্পূর্ণ সমত্ব চেতনা থেকে। আজকের পৃথিবীতে ইংরেজি এমনভাবে বিশ্বভাষাত্ব অর্জন করেছে যে, যে-সব জাতি আদৌ ব্রিটেনের বন্ধু নয়—রুশদেশ, চীন,—তারাও সমনোযোগে ইংরেজি চর্চা করে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। একদা সংস্কৃত ছিল সারা ভারত-বর্ষের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের ভাষা (এমনকি চীন, তিব্বত, বৃহৎ বঙ্গেরও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের ভাষা)। একদা লাটিন ছিল সারা ইওরোপের ভাষা; আরবী ছিল মধ্য এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার ভাষা, স্প্যানিশ ছিল তামাম দক্ষিণ আমেরিকার ভাষা। ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজিনবিশ হওয়া কোনোমতেই অসম্মানজনক নয়। আজকের দিনে ইংরেজি হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিপুণ মাধ্যম। এই নিপুণতা অর্জন করতে আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির যে কত দশকের পরে দশক অতিবাহিত হবে তার হিসেব নেই, এবং জাতির পক্ষে এমনভাবে কালহরণ করা হবে আত্মহত্যার তুল্য এবং কে জানে, নিশ্চিত ব্যর্থতার কারণ। এহেন ব্যর্থতার একটি নজির আছে আমাদের সামনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে হায়দ্রাবাদ নিজামের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার আকবর হায়দারি। তিনি ভাবলেন যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় পঠন-পাঠন হবে উর্দুর মাধ্যমে। যেহেতু উর্দুতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ছিল না, এই বই লেখার জন্য কতকগুলি কমিটি তৈরি করা হল। বই লেখা তো সত্যি সত্যি নয়, সুপরিচিত ইংরেজি বইয়ের তর্জমা। কিন্তু তর্জমা প্রকাশ করতে করতে বিষয়টি সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব এবং নূতন তথ্য প্রকাশিত হয়ে গেল, ইংরেজিতে নূতন বই প্রকাশিত হল, আর উর্দুর অনুবাদ পুস্তকটি বস্তাপচা মাল হয়ে রইল। তিন চার বছর পরে কর্তৃপক্ষ এই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যপ্রেম বর্জন করলেন।

অতএব, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ইংরেজি বর্জন করা অতীব ক্ষতিকারক হবে শিক্ষাকামী নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ভারতীয়দের পক্ষে।

তবে একদিকে সচেতন হতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রের শাসনকর্তাদের। যে ভাষা আমরা শিখব, সেটি শিখব তার সাহিত্যিক গুণের জন্য নয় (আমাদের সাহিত্য-প্রীতি আমাদের নিজ ভাষাতেই মিটতে পারে), তার সর্বস্পর্শী যোগ্যতার জন্য। বস্তুত ইংরেজি ভাষা মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজনেই সুযোগ্য মাধ্যম হতে পারে। ইংরেজি যেমনি উজ্জ্বল সাহিত্যের ভাষা, তেমনি সাহিত্যাতিরিক্ত সহস্র প্রয়োজনেরও ভাষা। যে ইংরেজি আমরা ইস্কুলে কলেজে শিখেছি, সে-ইংরেজি

যাতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য ছাড়িয়ে পরা-সাহিত্যিক সুষ্ঠুতার বাহন হয়, জীবনের aesthetic মূল্য ছাড়িয়ে factual মূল্য প্রকাশের বাহন হিসাবে প্রকাশিত হতে পারে শিক্ষার্থীর কাছে, সে বিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌গণকে সতর্ক হতে হবে। চার্লস্ ল্যামের 'ড্রীম্ চিল্‌ড্রেন' নামক প্রবন্ধের অতীব কল্পনাশক্তিসম্পন্ন গদ্যভঙ্গি না শিখিয়ে ছাত্রদের এমন গদ্যভঙ্গি শেখাতে হবে (এ হেন গদ্যভঙ্গির হাজারো দৃষ্টান্ত আছে) যাতে রূঢ় কর্মজগতের প্রয়োজনগুলি অনায়াসে মিটতে পারে। ইংরেজিতে এ হেন শৈলীর আস্বাদ পেয়ে আমরা কালক্রমে নিজ নিজ মাতৃভাষার সেবা করব।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থ বা বিভেদ চিন্তা অনুপ্রবিষ্ট না করিয়ে শিক্ষার্থীর, তথা জাতির শ্রেষ্ঠ উপকার করা সর্বতোভাবে কাম্য।

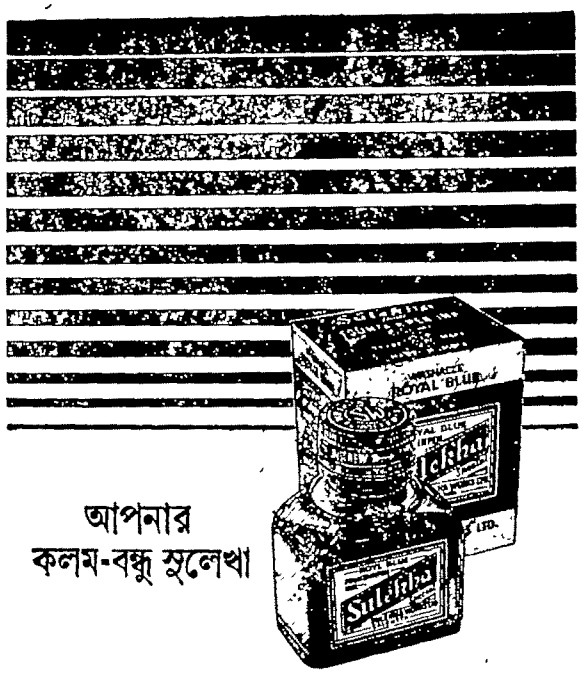

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড • কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

উচ্চশিক্ষায় ভাষা-পাঠের ভাবনা

ভূদেব চৌধুরী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০+২+৩ (২) বর্ষানুক্রমিক পাঠক্রমে স্নাতক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষার পরিধি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এতোদিন মানবিক-বিদ্যা শাখায় স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি এবং মাতৃভাষা অবশ্য-পাঠ্য ছিল; এখন সে ব্যবস্থা রদ করার চেষ্টা চলেছে। নূতন উদ্যমের পেছনে যুক্তি প্রধানত দুটি; অন্তত তাই স্পষ্টোচ্চারিত ঃ (১) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখায়িত বিভাগের বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত করে আন্তঃশাখাগত বৈচিত্র্যকে প্রসারিত করে দেওয়া —[প্রধানত শিক্ষার্থীর রুচি এবং প্রবণতা অনুসারে] —নূতন শিক্ষা পরিকল্পনার একটি লোভনীয় বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ দিয়ে বলা চলে—মানবিক শাখার একটি ছাত্র ইংরেজি ও সংস্কৃত কিংবা বাংলার সঙ্গে তৃতীয় বিষয়টি গণিত কিংবা রসায়ন—অথবা জীবন-বিজ্ঞান শাখা থেকেও নির্বাচন করতে পারে; বিপরীতভাবে বিজ্ঞান-শাখার কোনো বিদ্যার্থী পদার্থ-বিদ্যা এবং রসায়নের সঙ্গে তৃতীয় বিষয়টি ইংরেজি-বাংলা-ইতিহাস-দর্শন ইত্যাদি যে-কোনো বিষয় থেকে গ্রহণ করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থায় মানবিক-বিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার পাঠক্রমে আনুপাতিক সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় থাকা আবশ্যিক। আর বিজ্ঞানের পাঠক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য অনেক ক্ষেত্রেও ভাষাশিক্ষার কোনো অবকাশই নেই; অতএব মানবিক-বিদ্যার ক্ষেত্রেও তাকে পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই।

(২) দ্বিতীয় যুক্তিটি পণ্ডিত মহল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে, তবু তার মূল্য একেবারেই অধিবিদ্যাগত নয় ঃ— পরিসংখ্যানসূত্রে নাকি লক্ষিত হয়েছে মানবিক-বিদ্যা ও বাণিজ্যশাখায় বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী ভাষা বিষয়েই অকৃতকার্য হয়ে থাকেন; অতএব ভাষা-শিক্ষার আবশ্যিকতা পরিহার করতে পারলে পাশের হার বাড়বে।

এসব যুক্তির যথাযথ মূল্য যাচাই করার আগে ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য আর প্রয়োজনীয়তার কথাটি ভেবে দেখতে হয়। আসলে সব রকমের শিক্ষাই ব্যায়াম—মানবিক সত্তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন মাধ্যমে তার শক্তি ও সম্ভাবনাকে পূর্ণ পরিণত করে তোলার চেষ্টা। ইদানীন্তনকালে শারীর-বিদ্যাও বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়েছে সংগতভাবেই; শরীরের গঠনে ব্যায়াম যেমন, মন, বুদ্ধি ও আত্ম-চৈতন্যের পরিণিত বিধানেও শিক্ষার বিভিন্ন শাখা কিংবা বিষয়ের ভূমিকা তেমনি।

একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট করা উচিত, শিক্ষার চূড়ান্ত ফল ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র-সম্পূর্ণ পরিণতিতে— কেবল কিছু-কিঞ্চিৎ নূতন খবর জানতে পারা বা সংগ্রহ করতে পারাতে নয়। নিছক ভাষার ক্ষেত্রেই যদি আসি ঃ—ব্যাকরণের 'ণত্ব-ষত্ব' বিধানের নিয়ম কিংবা বাক্য-বিশ্লেষণের করণ-কৌশল সম্পর্কে শেষ তথ্যটুকু জানাই যথেষ্ট নয়,—অনায়াসে সাবলীল, নির্ভুল ভাষা-রচনার দক্ষতা আয়ত্ত হয়ে না গেলে শিক্ষার সমস্ত উদ্যম

এবং প্রয়াসটিই ব্যর্থ হয়। তেমনি বিজ্ঞানের চর্চায় কয়েকটি নীতি-নিয়ম মুখস্থ করে, অথবা এমন কি গুটিকয় নির্বাচিত অঙ্ক কষতে শিখলে কিছুই হল না, যদি তার ব্যবহারিক প্রয়োগ যথাযোগ্য স্থলে স্বতস্ফূর্ত না হয়। সকলেই গবেষণা করবে, সকলেই বিশেষজ্ঞ হবে, এটা কোনো কথাই নয়। কিন্তু সকলেই অধীত বিদ্যাকে অধিগতও করবে—জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রয়োজন মত প্রত্যেকেই তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োগ-পন্থা উদ্ভাবন করে নিতে পারবে—এটাই শিক্ষার শেষ কথা—শেষ কথা ঐ আত্মচৈতন্যের সংগঠন এবং পরিণতি সম্পাদন।

সে-পথে ভাষা-শিক্ষার প্রাথমিক ভূমিকা দ্বিবিধ—অনুধাবন ও প্রকাশক্ষমতার অনুশীলনগত প্রসার সম্পাদান। ভাষার ব্যবহারিক মূল্য বোঝা এবং বোঝানোর ক্ষমতায়। অতএব যাঁরা ভাষা-বিষয়ে দুর্বল তাঁদের বুঝবার এবং বোঝাবার ক্ষমতাটাই যথোচিত বিকাশ লাভ করে নি। তারপরেও তাঁরা যদি অপরাপর বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যান, তার যাদুটা আসলে অন্ধ মুখস্থ-বিদ্যার কারসাজিতে। যে-বিষয়ের জ্ঞানই হোক, তাকে ভাষার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতেই হয়। ভাষা-মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষমতা নেই, তবু ঐ ভাষাতেই প্রকাশের নিরিখে যাঁরা পাশ নম্বর পান, তার ভোজ-বাজিটা বিদ্যাও নয়, শিক্ষাও নয়—পরের কথা উগরে দেবার তাৎক্ষণিক প্রয়াস। এ-বিদ্যা স্থায়ী হয় না—এ-বিদ্যা কাজে লাগে না। এই অচিরজীবী অকেজো বিদ্যার ওপরে কৃতকার্যতার ছাপ দেয় যে শিক্ষণ আর পরীক্ষণ-ব্যবস্থা, আসলে তারই আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। আমরা একই মুখে পরীক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের কথা বলি, আর সেই সঙ্গেই পাশের হার হিসেব করে শিক্ষনীয়তার মূল্য যাচাই করি; এই স্ববিরোধিতায় আচ্ছন্নতা ঘোচে না, কারণ শিক্ষার ব্যবস্থা আজ আর শিক্ষাবিদ্‌দের হাতে নেই, অনেক কিছুর সঙ্গে রাজনৈতিক সুবিধা-চিন্তার অনুপ্রবেশও তাতে ঘটেছে; কিংবা বহমান অপরিচ্ছন্ন সমাজ-পদ্ধতির চাপে যথার্থ স্বাধীন শিক্ষাবিদের অস্তিত্বই প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে।

যাই হোক, স্নাতকপর্যায়ে ভাষা-শিক্ষা রদ করে দেবার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় যুক্তিটি যথেষ্ট সারবান্ নয়, অন্তত তার কোনো অধিবিদ্যাগত মূল্য নেই, সে-কথা বোঝাই গেল। এবারে প্রথম দফা আপত্তির উত্তরে এই কথা বলাই উচিত যে, শিক্ষার আন্তঃশাখায়িত বিস্তার ও বৈচিত্র্যের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার বাঞ্ছনীয়তা প্রশ্নাতীত। আর সেজন্যে উচ্চশিক্ষার সকল শাখায় পাঠক্রমের একটা আনুপাতিক সামঞ্জস্যের অনিবার্যতাও অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তার জন্যে বিপরীতটাও তো হতে পারে! অর্থাৎ, মানবিক-বিদ্যার শাখায় আবশ্যিক ভাষা-শিক্ষার পাঠক্রম তুলে না দিয়ে অপরাপর শাখাতে তার যোজনাও করা যেতে পারে। সবটাই অবশ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—ব্যক্তিক প্রবণতার সর্বায়ত পূর্ণ-পরিণতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে কল্পিত হওয়া উচিত।

এদিক থেকে একটা প্রশ্ন অবশ্যই প্রাসঙ্গিক—অন্তত মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে—বিদ্যালয়ের নিম্নতম ধাপ থেকে যে-ভাষা শিখে আসা চলেছে, কিংবা আরো আগে, জন্মাবধি যে-ভাষায় বুঝবার এবং বোঝাবার কসরৎ অবিরাম চলে আসছে, মাধ্যমিক—তথা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ১২-১৪ বছরের প্রশিক্ষণ চেষ্টাতেও সে-ভাষার ওপরে অনায়াস অধিকার যদি স্বভাবত-ই প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকে, তাহলে স্নাতক পর্যায়ের এক-দু বছরের চেষ্টায় আর কতটা কি হতে পারে!

বরং ইংরেজি যতদিন উচ্চশিক্ষার মাধ্যম রয়েছে, ততদিন বিদেশী ভাষায় বোঝা এবং বোঝানোর অভ্যাসটাকে ঝালিয়ে চলার কিছু-কিঞ্চিৎ যুক্তি থাকতেও পারে—যদিও তা সামান্যই।

তাহলেও ভাষা-শিক্ষাকে উচ্চপর্যায়ে আবশ্যিক করার নীতিগত আপত্তি যাঁদের, তাঁরাও যে-কোনো কারণেই হোক্—শেষ পর্যন্ত, অন্তত কিছুকালের জন্যও, কেবল ভাষা-শিক্ষাকেই মানবিক-বিদ্যার্থীদের পক্ষে অবশ্যপঠনীয় করে রাখতে চেয়েছেন ; সাহিত্যপাঠকে কদাপি নয়। আবার সেই যে-কোনো-রকমে আপোশ-রফার গভীরতারহিত তালেগোলে মিলিয়ে ফেলার বিফল চেষ্টা। অর্থাৎ, চাপের প্রভাবে যাঁরা এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তাঁদেরও মানতে হয়েছে মাতৃভাষার প্রশিক্ষণে আমাদের দেশে গলদ রয়েইছে—যাতে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যার্থীও ভাষার ব্যবহারে দুর্বল। সেই গোড়ায় গলদ গোড়াতেই আবিষ্কার করা চাই ; নইলে মূলে ক্ষত জমে রইল, অথচ গাছের মাথায় সার চাপিয়ে গাছকে বলিষ্ঠ করার অস্বাভাবিক উৎসাহে হাস্যকরতাই একমাত্র লাভ হবে। অন্যপক্ষে স্নাতক পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষার প্রধান উপকরণ হওয়া উচিত সাহিত্য-পাঠই।

ভাষার প্রাথমিক ভূমিকা বোঝা আর বোঝানোর মাধ্যম রূপে। কিন্তু ভাষার পরিণামী মূল্য উপলব্ধির বাহন হিসেবেই। কেবল বোঝা নয়—তার সঙ্গে মন দিয়ে অনুভব করা, বুদ্ধি দিয়ে জানা কিংবা গ্রহণ করা—এই সকল প্রচেষ্টার ফল যখন আত্মগত হয় তখনই উপলব্ধির আলোকে চেতনা উদ্ভাসিত হতে পারে—প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার মূলগত আত্মচৈতন্যের গঠন ও পরিণতির প্রধান উপকরণ উপলব্ধি। ভাষার সফলতা কেবল বোধ নয়, উপলব্ধির সর্বাত্মক প্রসারে। আর ঐ দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠতর সাফল্যের বাহন সাহিত্য।

শিক্ষাকে যদি যন্ত্রশিল্প বা কারখানার সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে সে হল মানবিক উৎপাদনের আকর। অন্যপক্ষে মানুষের মনুষ্যত্ব তার প্রত্যয়দৃঢ় মূল্যবোধের ফসল। 'মানুষ কেবল রুটি নিয়ে বাঁচে না'—এ তত্ত্ব নেতিবাচক অর্ধসত্য ; পূর্ণ সত্য সিদ্ধান্ত হতে পারে—মানুষ বাঁচে তার মূল্যবোধের প্রগাঢ়তায়—মাছ যেমন জলে। সাহিত্য সেই মূল্যবোধের উৎপাদক। দেশে-কালে-সমাজে সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেই। কিন্তু যথার্থ সাহিত্য জাতির জীবন-সম্ভব, এবং জাতীয় জীবনমূল্যের পরিবেশক। তাই জাতীয় মূল্যচেতনা—তথা মানবিক চৈতন্যের প্রবোধনের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত সাহিত্যপাঠ সর্বস্তরের শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়াই চাই।

এ-নিয়ে বিতর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই ; কেবল একটা উদাহরণের কথা বলি। বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞান-শিক্ষার পাঠক্রম রচিত হয়েছিল পরাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে ; শিক্ষাকে তাঁরা এদেশে জীবন-বিচ্ছিন্ন পরোপজীবী জীবিকার্জনের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই বিজ্ঞান কিংবা কারিগরি শিক্ষার জগৎ থেকে সাহিত্যচর্চার অবকাশকেও নির্মূল করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ যখন যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়-রূপ পেল, তখন থেকেই কারিগরি-বিদ্যার আবশ্যিক অঙ্গ হয়েছে মাতৃ-ভাষার সাহিত্য-পাঠ। কিংবা কেন্দ্র পরিচালিত প্রতিটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের (I.I.T.) অনিবার্য সম্পূরক হয়ে আছে একটি করে মানবিক-বিদ্যা বিভাগ। এ-সব কিছুর পেছনে যুক্তি—বিশ্বের প্রাগ্রসর অনেক দেশেই নাকি ঐ রকম ব্যবস্থা আছে। আজ যখন স্বাধীন

ভারতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আবার একদফা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উত্তেজনা চলেছে, তখন ভাববার কথা—কারিগরি শিক্ষার বেলা যে-কথা সত্য, বিজ্ঞান-শিক্ষার বেলা তা নয় কি? কিংবা নয় কেন?

তা হলেও শেষ কথা মানতেই হয়—কারিগরি শিক্ষার পৃষ্ঠদেশে এই মানবিক-বিদ্যা আরোপণের প্রয়াস উদ্দিষ্ট সফলতা কতটা অর্জন করেছে—মোটেই করেছে কী?

আসল কথা—অনুকরণ, হুজুগ কিংবা ক্ষণিক চমৎকারিতা সম্পাদনের নিতান্ত আকস্মিকতা-বিদ্ধ উদ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল নিত্য নূতন বিড়ম্বনাই ডেকে আনতে পারে—আনছেও। অতএব আরো ধীরে ভাবা চাই—আরো গোড়া থেকে—এবং গভীরভাবে, সামগ্রিক ভাবেও। সে ভাবনার জন্য যোগ্য অধিকারীর সন্ধানও করতে হবে বৈকি।

With Best Compliments of :—

RAYCO ENGINEERING SYNDICATE

Electrical Engineers, Govt. Licensed Contractors & Consultants

11/1, SOOTERKIN STREET
I. F. A. Building
3rd Floor
CALCUTTA-700072
Phone : 23-8596

স্বাধীন ভারতের শিক্ষায় ভাষা-সমস্যা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বাঁচা ও বাড়া। পশু-পক্ষী ও তরুলতাও তো বাঁচে ও বাড়ে, কিন্তু মানুষ তো শুধু প্রাণন-ক্রিয়ার দ্বারাই জীবিত থাকে না, জীবিত থাকে মননের দ্বারা, সে শুধু দেহটাকেই পুষ্ট করে তুলতে চায় না, সে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে চায়, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে যেতে চায়, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আনন্দ-লোকে বা অমৃতলোকে যাত্রা কোরতে চায়। যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষাই জন্তুধর্মী মানবকে দেবধর্মী মানবে পরিণত করে। তাই স্বামীজি বলেছেন—মানুষের অন্তরে যে পূর্ণতা রয়েছে, শিক্ষা তাকেই বিকশিত করে তোলে। (Education is the manifestation of the perfection already in man.)

কবি টেনিসন বলেছেন, 'প্রাচীন বিধান বদলে যায়, নতুন বিধান তার স্থান গ্রহণ করে।' ভারতবর্ষেরও শিক্ষার আদর্শ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন বৈদিক যুগের শিক্ষা, পৌর বা নাগরিক সভ্যতার যুগের শিক্ষা, বৌদ্ধ যুগের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা এবং চতুষ্পাঠী ও মক্তবসমূহের শিক্ষায় যে পার্থক্য ছিল, সে কথা সকলেই স্বীকার কোরবেন। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তির ওপরেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা উচিত কিন্তু শিক্ষাকে যুগোপযোগী হওয়াও আবশ্যক। এই জন্যই যুগ-প্রবর্তক রাজা রামমোহন এক দিকে উপনিষদ ও বেদান্ত প্রচার করেছিলেন ও বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অপর দিকে এ দেশে ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করে লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে আমাদিগকে যদি বিশ্বের দরবারে বীর্যবান, শক্তিমান ও আত্ম-প্রত্যয়সম্পন্ন জাতিরূপে পরিচিত হতে হয়, যদি পৃথিবীর অগ্রগামী জাতিসমূহের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়, তবে আমাদিগকে নানা দেশের মনীষীদের অবদানকে অকুণ্ঠ স্বীকৃত দান কোরতে হবে, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে ও মাতৃভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হবে। পরবর্তী-কালে পরাধীন ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায় যে সকল স্বাধীনচেতা ও স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও এই ত্রিভাষা-সূত্রকেই গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের পরে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করার সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, সংস্কৃত কলেজের দ্বার হিন্দুমাত্রেরই জন্যে উন্মুক্ত করেছিলেন, স্বয়ং উত্তমরূপে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সর্বোপরি বাংলা গদ্য-সাহিত্যে শিল্প-নৈপুণ্যের অবতারণা করে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। আরও পরবর্তীকালে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, স্যার আশুতোষ

মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন যে, মাতৃভাষাই উচ্চ-শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত কিন্তু তাঁরা কেউ ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতাকে অস্বীকার করেন নি। এমনকি, যে জাতীয় শিক্ষা-পর্ষদ বা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের' সঙ্গে মনস্বী গুরুদাস ও হীরেন্দ্রনাথ এককালে যুক্ত ছিলেন, সেখান থেকেও 'ইংরেজি হঠাও' বা 'হিন্দি হঠাও' রূপ কোনো স্লোগান বা সঙ্ঘনাদ উত্থিত হয়নি। ব্রিটিশ রাজ-পুরুষগণ অবশ্য তাদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্যেই এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু এই ইংরেজি শিক্ষার ফল যে আমাদের জাতীয় জীবনে অনেকাংশে কল্যাণপ্রসূ হয়েছিল, এই ভাষাকে আশ্রয় করেই যে একদিন সর্বভারত ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ইংরেজি শিক্ষিত মনীষিগণই যে একদিন মাতৃভাষার সাহায্যে আত্ম-বিস্মৃত যুবকগণকে আত্মসম্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন এ সকল কথা অস্বীকার করলে সত্যেরই অপলাপ হবে।

পরাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা-সমস্যা দেখা দেয়নি কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতে ইংরেজি, সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার কি স্থান হবে, সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাবিদগণ আজ পর্যন্তও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। ফলে তাঁরা এ বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। পরাধীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নানারূপ দোষ-ত্রুটি থাকলেও স্বাধীন ভারতে যে শিক্ষার মানের অধিকতর অবনতি ঘটেছে এবং নানা কারণে ছাত্রসমাজের মনে যে নৈরাশ্য ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, সে বিষয়তো অস্বীকার করা চলেনা। বাংলা দেশে বাংলা ও অন্যান্য দেশে অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা উচ্চ-শিক্ষার বাহন হয়েছে সত্য কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় মনীষিগণ যে সব উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার তুলনায় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই গ্রন্থসমূহ প্রায়ই নীরস ও সাহিত্যিক গুণ-বর্জিত, তাই এ বিষয়ে আমরা শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরচি। তথাপি মাতৃভাষাই যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত এবং এই ব্যবস্থার ফলেই যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালিনী হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আমাদের কোনো মতদ্বৈধ নেই। ভাষাসম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকে আবশ্যিক কোরতে হবে, এবং অন্তত দশম শ্রেণী পর্যন্ত তথাকথিত 'মৃত ভাষা' সংস্কৃতকে অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে স্বীকৃতি দান কোরতে হবে। সম্প্রতি প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কিন্তু মৃত ভাষা (?) সংস্কৃতের শ্রাদ্ধেরই আয়োজন করা হয়েছে। এ দিকে আবার নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের উচ্চ-শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা যদি ঐচ্ছিক হয় এবং বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালিনী ভাষাকে বর্জন কোরেও যদি শিক্ষার্থিগণ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তবে বিশ্বসাহিত্যের দ্বার তাদের কাছে চির-রুদ্ধ হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য যে এমন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল, তার কারণ শুধু এই নয় যে এই শতকে বহু মনস্বী ও প্রতিভাশালী বাঙালীর অভ্যুদয় হয়েছিল, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, এই সকল বরেণ্য পুরুষের প্রায় সকলেই ইংরেজি ও সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন এবং সংস্কৃত-সাহিত্যের শব্দসম্পদ এবং প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের ভাব-সম্পদ আহরণ করে তাঁরা মাতৃভাষাকে পুষ্ট করেছিলেন যার ফলে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা মর্যাদার আসন লাভ করেছিল। হিন্দি বা

হিন্দুস্তানী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকেও যদি ঐশ্বর্যশালিনী করে তুলতে হয়, তা হলে শুধু অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ কোরলেই চলবে না, সাহিত্যসাধকগণকে ইংরেজি ও সংস্কৃত-সাহিত্যেও নিষ্ণাত হতে হবে। বিশেষত, সংস্কৃত ভাষাকে বর্জন করার অর্থ হবে, নিজেদের পিতৃ-পিতামহকে অস্বীকার করা, ভারতীয় গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া, এ পাপ নিশ্চয়ই আত্মহননের তুল্য। ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ প্রমাণ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষা প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাসমূহের, এমন কি, ফারসী ভাষারও জননী, (যেমন ফারসী খোদা—সংস্কৃত স্বধা, ফারসী রোজা—সংস্কৃত রোচস্‌ অর্থাৎ দিবস, ফারসী নামাজ—সংস্কৃত নমম্‌, ফারসী পাকিস্তান—সংস্কৃত পাবকস্থান ইত্যাদি।) তা ছাড়া, এ দেশে ব্রিটিশের আগমনের পূর্বে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিল। কারণ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রীতি-নীতি বা আচার-ব্যবহারের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, সকল প্রদেশেরই বিদ্বৎসমাজ একই সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্র, মহাকাব্য ও নাটকসমূহ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র পাঠ কোরতেন। যখন ভারতের নানা দেশের পণ্ডিত সমাজ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিলেন এই ধর্ম প্রস্থানত্রয়ীর ওপর (উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্ম-সূত্রের ওপর) প্রতিষ্ঠিত নয়, তখন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যগণ সংস্কৃত ভাষায় গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল ভাষ্য রচনা করে প্রমাণ করেছিলেন যে, এ অভিযোগ মিথ্যা। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাণীকে সর্বভারতের বিদ্বৎ-সমাজে পৌঁছে দেবার জন্যেই আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' নামক মহাগ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচনা করেছিলেন। পূর্ববর্তীকালে সান্ধ্য-ভাষায় লিখিত চর্যাপদের সংস্কৃত টীকা রচিত হয়েছিল আর পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরম ভাগবত রাধামোহন ঠাকুর সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এই সকল প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাষাই সর্বভারতের বিদ্বৎ-সমাজের ভাষা ছিল, তাই কোনো আঞ্চলিক ভাষাই সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মর্যাদা লাভ কোরতে পারে নি। তা ছাড়া, আর এক ভাবেও সংস্কৃত ভাষার ভেতর দিয়ে ভারতবাসীদের মনে অখণ্ড ভারতের চেতনা জাগ্রত হোতো। আমাদের পুরাণ-কারদের দৃষ্টিতে ভারত মাতা হচ্ছেন জগন্মাতা, সতীরই প্রতিমূর্তি, জগন্মাতার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ভারতের নানা স্থানে বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। তাই, এক কালে ভারতবাসিগণ প্রৌঢ় বয়সে পুত্রের হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করে তীর্থদর্শনে বহির্গত হতেন এবং তীর্থ-পরিক্রমার ভেতর দিয়েই তাদের মধ্যে অখণ্ড ভারতের চেতনা জাগ্রত হোতো। সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকগণও পদব্রজে নানা স্থান পর্যটন করে ভারতের আত্মার সঙ্গে পরিচিত হতেন। আমাদের পুরাণকারদের মতে ভারতভূমি পুণ্যভূমি আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হচ্ছে ভোগভূমি, মানুষ বহু পুণ্যফলেই এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। তাই যাঁরা মনে করেন, আমরা শুধু ইংরেজি বিদ্যার অনুশীলনের ফলেই অখণ্ড ভারতের চেতনা লাভ করেছি তাঁরা ভ্রান্ত। আবার যাঁরা পাশ্চাত্য ভাষাকে গলা ধাক্কা দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত বা নির্বাসিত করে দিতে চান, তাঁদেরও বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করা চলেনা। আমরা

চাই, স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ভেতর দিয়ে এমন নাগরিক গড়ে উঠবেন যাঁরা মাতৃভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত কোরবেন অথচ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন, যাঁরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের ভেতর দিয়েই জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবেন ও পাশ্চাত্য মনীষীদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিতির ফলে বিশ্বের নাগরিক হয়ে উঠবেন।

যে সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী কলাবিভাগে অধ্যয়ন কোরবেন, 'হিউম্যানিটিজ' নিয়ে পড়াশুনা কোরবেন, তাঁদের শিক্ষার ভেতর দিয়েই জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও মানবধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। তাঁদের হতে হবে ত্রিজ, সংস্কৃত-ভাষার অনুশীলনের ভেতর দিয়েই তাঁরা দ্বিজত্ব লাভ কোরবেন ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হলেই তাঁরা হবেন ত্রিজ। তাঁরা বেশভূষায়, আচারে-আচরণে হবেন খাঁটি স্বদেশী কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল গুণ অনুসরণীয়, তাঁরা তার অনুসরণ কোরবেন। আমাদের দেশে এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর। বেশভূষায় তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী, ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, অথচ সত্যকে তিনি কোনো দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোরতে চাননি, তাঁর কর্মশক্তি ছিল অক্লান্ত ও সর্বোপরি তিনি ছিলেন মানবধর্মে দীক্ষিত। স্বাধীন ভারতে কিন্তু এক শ্রেণীর লোক দেখতে পাই যাঁরা মুখে ইংরেজি শিক্ষাকে বিজাতীয় শিক্ষা বলে অভিহিত করেন অথচ ভারতের সংস্কৃতির সম্পর্কেও আগ্রহান্বিত নন। বিজাতীয় বেশ-ভূষা পরিধান করে এঁরা মনে মনে গর্ব অনুভব করেন। এঁদেরই অনেকের গৃহে কোন ধর্মীয় পরিবেশ নাই, অথচ এঁরা অনেকেই বিনা দ্বিধায় ছেলে-মেয়েদের মিশনারী স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না হোলো কিন্তু কোনো সুষ্ঠু শিক্ষা পরিকল্পনা তো আজো রচিত হোলো না। মাধ্যমিক পরীক্ষা (School Final), উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রভৃতি চালু হোলো। এই দু'বছরে গ্রহীতব্য ডিগ্রি কোর্সে ইংরেজির স্থান কী হবে, তা নিয়েও পরীক্ষা চললো। প্রথমত, এই ত্রৈবার্ষিক পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গ্রহীতব্য প্রথম পরীক্ষায়, তার পর দ্বিতীয় পরীক্ষায়, তারপর উভয় পরীক্ষায়ই ইংরেজি অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে নির্ধারিত হোলো। আবার দেখা গেল, প্রথম পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই পরবর্তী পরীক্ষার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি হতে হচ্ছে। সম্প্রতি আবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী, দুবছরের ডিগ্রি কোর্স ও তিন বছরের অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। একদিকে শিক্ষার রাজ্যে দেখা দিয়েছে নৈরাজ্য, অপর দিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে চলেছে নানা রকমের পরীক্ষা, বসেছে নানা কমিশন, দেখা দিয়েছে আদর্শ শিক্ষকের একান্ত অসদ্ভাব। আজ রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, রামতনু লাহিড়ী, আশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশ পণ্ডিত, বেণীমাধব দাস প্রভৃতির মতো শিক্ষক কোথায় গেলেন! আজ সরস্বতীর কমলকাননে রাজনীতির মত্ত হস্তী প্রবেশ করেছে, এ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের অন্তরে স্বদেশ প্রেমের বীজ রোপণ করে দেওয়াও শিক্ষক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বাংলা দেশের খাঁটি ইতিহাসও অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে গৃহীত হওয়া উচিত। আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের ভাব উদ্দীপ্ত হচ্ছে না, তারা বিজাতীয় ভাবাদর্শ গ্রহণ কোরচে, এটা বড়োই দুঃখের

বিষয়। নিয়তির পরিহাস এই যে, পরাধীন ভারতে বহু তরুণ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুশীলন কোরতেন, দেশবিদেশের বীরপুরুষগণের ও স্বাধীনতাসংগ্রামীদের চরিত-কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ কোরতেন, আর স্বাধীন ভারতে বহু তরুণ বৈদেশিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের পূর্বগামী মহামানবদের প্রতিও চরম অশ্রদ্ধার পরিচয় দিচ্ছে। নেতা ও শাস্তার অভাবেই তরুণসমাজে আজ এই বিভ্রান্তি ও প্রমাদ দেখা দিয়েছে। অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখনো অনেকে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান কিন্তু নেতার অভাবে তারা অসংহত। তাই দেশের এই দুর্দিনে যাঁরা সংস্কৃত ভাষাকে পাঠ্যসূচী থেকে তুলে দিতে চান, তাঁরা দেশের মঙ্গলকামী বলে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি আমাদের যদি জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ ও উন্নতিকামী হতে হয়, তা হলে সর্বপ্রকার গোঁড়ামি সংকীর্ণতা পরিহার করে ত্রিভাষা-সূত্রকেই গ্রহণ করা উচিত।

With Best Compliments of :—

Bharat Trading Corporation

Suppliers of :
All Sorts of Electrical Goods

'COMMERCE HOUSE'
2, Ganesh Chandra Avenue
6th Floor, Room No. 5A,
Calcutta-700013
Phone : 23-3435

এই প্রতীক
কী এবং কেন?

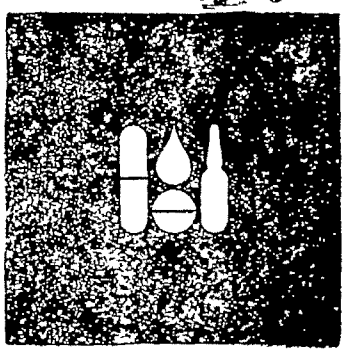

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্—
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর পোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

E.P.I.-PR-10 BEN

ঈস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল্
ওয়ার্কস্ লিমিটেড্,
কলিকাতা-১৭

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্
আপনার সেবায়

আইনষ্টাইন ও মহাবিশ্ব

বিমলেন্দু মিত্র

আমরা মনশ্চক্ষে প্রাচীন গ্রীসের এক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিককে যদি দেখি, তবে দেখব, বক্ষনিবদ্ধ হস্তে, গভীর কুঞ্চিতভ্রূ আননে তিনি চিন্তা করছেন—এই বিশ্ব 'কেন?' 'কেন' দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী ঘটছে? তারপর অনেকদিন কেটে গেল। মধ্যযুগ এল। তখন গ্যালিলিও চিন্তা শুরু করলেন,—'কিভাবে' ঘটনাগুলি ঘটছে। কিভাবে সূর্য, চন্দ্র এরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে? কিভাবে পাথরের টুকরো পর্বতগাত্র থেকে গড়িয়ে পড়ে? 'কেন'র বদলে 'কিভাবে' ঘটনাবলী ঘটে চলেছে, এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই গ্যালিলিও আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তার জন্ম দিলেন। তাঁর চিন্তা ও পরে নিউটনের কাজের ফলে জন্ম হল পরবর্তীকালের যান্ত্রিক বিশ্ব-গতির ধারণা। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বের ঘটনার আইনকানুন লেখা হতে লাগল। গতিতত্ত্বের জন্ম হল, আর দেখা গেল আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বে সমস্ত ঘটনাবলীই যেন গতিতত্ত্বের আইনে শৃঙ্খলিত। নিউটনের মেকানিক্স্-এর বাইরে আর কিছু নেই।

কিন্তু বর্তমান শতকের প্রায় গোড়া থেকেই ছোট ছোট ঘটনা ঘটতে লাগল। যে সব ছোট ছোট ঘটনার কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী প্রথম চিন্তা শুরু করলেন যে—আমরা বিশ্বের সত্যিকারের রূপের সন্ধান পেয়েছি কি? নিউটনীয় বিজ্ঞান কি আমাদের মহাবিশ্বের সবটুকু বুঝতে সাহায্য করছে?

১৯০০ আর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত হল কোয়ান্টাম তত্ত্ব আর সাধারণ আপেক্ষিক-তত্ত্ব। একটিতে পরমাণুর অদৃশ্যজগৎ বোঝবার চেষ্টা করা হল আর অন্যটি কাজে লাগানো হল মহাবিশ্বের রহস্য বোঝবার জন্য। দুটিই পদার্থতত্ত্বের ক্ষেত্রে অন্যতম মূলগত তত্ত্ব। কিন্তু এরা কেউ গ্রীক দার্শনিকদের মত 'কেন'র ব্যাখ্যা করে না, আবার নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার 'কিভাবে'—তাও বলে না। বিশ্বজগৎকে বোঝাবার চেষ্টা করা করা হল বস্তুনিরপেক্ষ অঙ্কের সমীকরণে। গ্রীক দার্শনিক ডেমক্রিটাসের মতে—মিষ্টি কি তেতো, অথবা গরম ও ঠাণ্ডা সবই শুধু ধারণার মধ্যেই বিধৃত, আসলে তাদের অস্তিত্ব নেই। John Locke বাস্তব সত্বাকে দুভাগে ভাগ করছেন,—স্থূলত্ব, আকৃতি, গতি,—এক কথায় জ্যামিতিক চরিত্র হচ্ছে সত্বার 'প্রাথমিক' বা 'মূল' (primary) চরিত্র, আর শব্দ, শ্রুতি, রঙ, এসব হল সত্বার গৌণ বা অপ্রধান (secondary) চরিত্র। Leibintz (লাইবনিৎজ) এর মতে আলো, রঙ বা উষ্ণতা এমন কি বস্তুসত্বার আয়তনও শুধুমাত্র "বোধ"-এর বা ধারণার মধ্যে রয়েছে, তাদের কোন অনড় অস্তিত্ব নেই।

ক্রমশঃ এই ধারণাই বদ্ধমূল হতে লাগল, যে 'বস্তু' যখন তার কতকগুলি বিশেষ 'গুণের' সমষ্টি মাত্র, যে সব বিশেষ গুণের অস্তিত্ব রয়েছে কেবলমাত্র আমাদের মানসে, তখন বস্তুসমৃদ্ধ বিশ্বজগৎও রয়েছে

মানুষের কতকগুলি ধারণার মধ্যেই। যাকে বাস্তব-সত্তা বলে ভাবছি, তার বাস্তব উপস্থিতি কোথায়? বিশ্ব-প্রকৃতির—অ্যাটম, মলিকিউল থেকে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিদেরও—আমাদের মনে ছাড়া কোনও অস্তিত্ব নেই। Berkeley বলেছেন,—"অথবা কোন Eternal Spirit-এর মহামানসেই তারা বিধৃত।"

আইনষ্টাইনও প্রায় একই ধরনের লজিক উপস্থিত করলেন। তিনি দেখালেন ব্যাপ্তি বা Space এবং কাল বা time; তারাও আমাদের বিশেষ কতকগুলি ধারণামাত্র—যেমন রং, উষ্ণতা, ইত্যাদি সবই আমাদের ধারণামাত্র। কালের ও ব্যাপ্তির নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই। আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের অনুভবের মধ্যেই বিশ্বের অস্তিত্ব। কিন্তু সেই অনুভবকে সাহায্য করছে আমাদের অতিশয় অপূর্ণ ইন্দ্রিয়-উপলব্ধি। এক্স-রে, গামা-রে, আলট্রা-ভায়োলেট, ইনফ্রা-রেড, রেডিও তরঙ্গ, সাধারণ আলো,—সবারই 'জাত' এক, সবই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। কিন্তু আমাদের চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ছে শুধু সাধারণ আলোটুকু, অন্যেরা রয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির বাইরে। শ্রুতিপারের—ultra-sonics—শব্দ আমরা শুনতে পাই না। বিজ্ঞানীদের অভিযান চললো বোধ বা perception-এর সীমা বাড়িয়ে দেবার। যন্ত্রের সাহায্যে এক্স-রে, গামা-রে 'অনুভব' করা গেল। রেডিও তরঙ্গ 'অনুভূতিতে' ধরা পড়ল। বিশ্বজগতের রূপ অনুভবের উপলব্ধির সীমা বাড়তে লাগল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'রামের' অনুভূতি আর 'শ্যামের' অনুভূতি কি এক? রাম যে 'রঙ' দেখছে, শ্যামও বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ-বর্ণালীর সেই একগুচ্ছ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাহায্যে কি সেই একই রঙের অনুভূতি পাচ্ছে? এই perception-এর মধ্যে, বিজ্ঞানীরা দেখলেন একটা শৃঙ্খলা কিন্তু নিশ্চয়ই রয়েছে, যেন মনে হয় সত্যিই বস্তুসত্তার মধ্যে শাশ্বত কোন বাস্তবতা রয়ে গেছে। দার্শনিকরা এই শৃংখলার এক নিয়ন্তাকে কল্পনা করেছেন, তাঁরই নাম দিয়েছেন ঈশ্বর। বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরকে হিসাবের মধ্যে না এনেও বস্তুবিচারে এই শৃংখলা মেনে নিয়েছেন আর তাই অংকের সুদৃঢ় নিয়মে, সমীকরণের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে প্রকাশ করছেন। কিন্তু মজা এই, বৈজ্ঞানিকেরা অংকের হাতিয়ারকে যতই শাণিত করে ব্যবহারে লাগাচ্ছেন, ততই দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশিত বাস্তব জগৎ ও মানুষের বোধশক্তি, এ দুয়ের ব্যবধান বেড়েই যাচ্ছে। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম-তত্ত্ব প্রথম এই ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন করলো মানুষকে। আলোর জন্ম ঠিক কিভাবে হচ্ছে তা না জেনেও অংকের নিয়মে তার 'চরিত্র', বর্ণালী, বোঝান গেল। আইনষ্টাইন সরাসরি সেই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ফটোইলেকট্রিক প্রভাবের ব্যাখ্যা দিলেন। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে আলো, যা এতকাল তরঙ্গ বলে জেনেছি, তার চরিত্রে রয়েছে নিউটনীয় বস্তুকণার বিশেষত্ব। আইনেষ্টাইন আলো-কণার নাম দিলেন ফেটন (photon)। তা হলে 'সত্য' কি?

১৯২৫ সালে দ্য ব্রোগলি (Louis De Broglie) অংক কষে বললেন,—আলোর জন্মের জন্য দায়ী যে ইলেকট্রন, তাকে আর নিউটনীয় বস্তুকণা ভাবা চলে না, ওদের মধ্যে বিধৃত রয়েছে তরঙ্গধর্মিতা। অর্থাৎ, 'বস্তু'র মধ্যে তরঙ্গের (শক্তির) চরিত্র রয়েছে। কি মুস্কিল, তাহলে এতদিন যে ইলেকট্রনকে মূলকণা বলে ভাবা হয়েছে। বা তা ভেবে নিয়েই তবে 'কমপটন প্রভাব' (যাতে এক্সরে 'কণা' ও ইলেকট্রন-কণার সংঘাতের ফলে কি হয় তার ব্যাখ্যা করা গেছে)

বা রমনের (Raman) আবিষ্কার (সেখানেও 'ফোটন' !) ব্যাখ্যা করা গেছে। এদের কি হবে? হাইজেনবার্গ (Heisenberg) অতি সুগঠিত "ওয়েভ-মেকানিকস্" বা তরঙ্গ-গতিবিদ্যা খাড়া করলেন, যাতে ইলেকট্রন, প্রোটন, সব মূলকণাকে 'তরঙ্গ' ভাবা হল। আবার এই তত্ত্ব যে শুধুমাত্র অংকের যাদু নয়, তার প্রমাণ হয়ে গেল ১৯২৭ সালে Davisson ও Germer-এর পরীক্ষায় যখন কেলাসের ওপর থেকে বিচ্ছুরিত শক্তিশালী ইলেকট্রনগুচ্ছের ডিফ্র্যাকশন ঘটল। বোঝা যাচ্ছে আমাদের বাস্তব জগৎকে আমরা তরঙ্গ হিসাবে ভাবতে পারছি, আবার কণা হিসাবেও নিতে পারছি। তবে 'সত্য' কি?

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ (Principle of Uncertainty) বিজ্ঞানীর আর এক দৃঢ় পদক্ষেপ—যা সাধারণ perception বা ধারণাকে আরও হতবুদ্ধিকর অবস্থায় এনে ফেলল,—"পরমাণুর আনুবীক্ষণিক জগতে, ইলেকট্রনের অবস্থান আর গতি, দুটি একসঙ্গে জানা সম্ভব নয়।" ধরে নেওয়া যাক আমরা এত সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ আবিষ্কার করেছি যা ইলেকট্রনকে 'দেখতে' পায়। তা হলে, ইলেকট্রন যদি 'বাস্তব' হয়, তবে কেন তার অবস্থান ও গতি দেখা যাবে না? অঙ্ক বলছে, তা সম্ভব নয়। Causality ও determinism দিয়ে গড়া পুরোনো ধারণা ভেঙ্গে পড়ল। সুতরাং বিজ্ঞানের 'সত্য' কি?

নিউটন ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই বলেছিলেন, —"The motions of bodies included in a given space are the same among themselves, whether that space is at rest or moves uniformly a forword in a straight line". অর্থাৎ, যে কোনও স্থানে অবস্থিত বস্তুসমূহের গতি পরস্পরের কাছে অপরিবর্তনীয় থাকবে, তা সেই 'স্থান' বা space স্থির থাকুক বা সেই space নিজেই সরল-রেখায় চলতে থাকুক।' একেই বলা হয় গ্যালিলিওর প্রবর্তিত আপেক্ষিকতার নিয়ম। দার্শনিকদের কাছে এই মতবাদের গুরুত্ব রয়েছে এই জন্যে যে বিজ্ঞান যেহেতু মুখ্যত পার্থিব ব্যাপার ব্যাখ্যা করে, সমগ্র মহা-বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তার নিয়মকানুনগুলোর স্থিরতা কতটুকু, তা জানা প্রয়োজন। মহাকর্ষের নিয়ম পৃথিবী ও আপেল ফলের মধ্যে সত্য, কিন্তু তা সমগ্র বিশ্ব-জগতে—,ধরা যাক সূর্য ও চন্দ্রের ওপরেও খাটবে কি? এই আইন কতটা বিশ্বজনীন? সেই ভাবে, সব রকম গতির ক্ষেত্রেই, ইলেকট্রন-প্রোটনের ক্ষেত্রেও নিয়ম-কানুনগুলো কতটা বিশ্বজনীন? সমগ্র বিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্র সর্বদা গতিশীল। এই গতির অপেক্ষিকতায় পৃথিবীতে বসে নিরীক্ষার সত্যতা কতটুকু? নিউটনও এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তিনি স্থির করলেন, 'স্থান' বা space-কে অনড় অস্তিত্ব হিসাবে ভাবা যায় আর সেই স্থানীয় আপেক্ষিকতায় সমস্ত রকম গতির সত্যতা হিসাব করা যাবে। স্থানের বা space-এর যেন কোনো জড় অস্তিত্ব রয়েছে। পরবর্তীকালের দার্শনি-করাও কতকটা এই চিন্তা মেনে নিয়েছিলেন। দেকার্তে (Descartes) বলেছিলেন,—বস্তু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নতাই প্রমাণ করে যে তাদের মধ্যে কোন মাধ্যমের অস্তিত্ব আছে। আলোর তরঙ্গগতির মাধ্যম হিসাবে ভাবা হল ইথারের বিশ্বজনীন অস্তিত্ব।

মাইকেলসন ও মর্লির সুবিখ্যাত 'ইথার-ড্রিফ্‌ট্' পরীক্ষায় জানা গেল আলোর গতি, পৃথিবীর নিজস্ব গতির ওপর নির্ভরশীল নয়।

আইষ্টাইন বললেন, পৃথিবীর গতি যদি আলোর গতিবেগের কোন হেরফের ঘটাতে না পেরে

থাকে, তবে পৃথিবীর বাইরেও কোন সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারার গতিও আলোর গতিকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। এটি একটি বিশ্বজনীন সত্য। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল। বস্তুর গতির জন্য এর পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এই ধারণা থেকেই আইনষ্টাইন আরো বললেন যে প্রাকৃতিক সমস্ত নিয়মকানুনও 'সমগতিতে' চলিষ্ণু পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্র বা জাগতিক সকল 'স্থানের' গতিবেগের ওপর নির্ভর করে না। তা বিশ্বজনীন, তা চলন্ত পৃথিবীর ওপরেও যেমন সত্য, সুদূর অ্যানড্রোমিডা নেবুলার ওপরেও তেমনই সত্য। আইনষ্টাইনের 'বিশেষ আপেক্ষিকতার' সূত্র ওপরের উক্তির মধ্যেই রয়েছে।

মহাবিশ্ব চলমান বস্তুর সমষ্টি। কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জই হোক বা একক তারকা বা সূর্যই হোক, তাদের গতি সবটাই আপেক্ষিক। এমন কোন অনড় অচল 'কাঠামো' নেই যেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বজগতের বস্তুপুঞ্জের গতির বেগের পরম মূল্যায়ন করা সম্ভব। পরম (বা absolute) স্থান বা (space) নেই। স্থানের ধারনা বস্তুর পারস্পরিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। সূর্য এবং পৃথিবী রয়েছে বলেই সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধানটুকুও রয়েছে। পৃথিবী ও অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ (বা যে কোন নক্ষত্র, ইত্যাদি) রয়েছে বলেই মহাশূন্য বা spaceও রয়েছে। মহাশূন্যের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। নিউটনের ধারণা ঠিক নয়। আইনষ্টাইন এখানেই শেষ কথা বললেন না, তিনি বললেন, 'কাল' (time) বা সময়েরও নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই ; ঘটনা-পারম্পর্য দিয়ে কাল মাপা হয় এবং ঘটনা একটির পরে অন্যটি ঘটছে বলেই 'কাল' ও রয়েছে। অন্যথায়,—নেই। ঘটনা ঘটছে,—ধরুন পৃথিবী নিজের অক্ষে একবার ঘুরে আসাতে দিন ও রাত্রি ঘটছে,—আমি শুধু সংখ্যা বসিয়ে দিয়ে সপ্তাহ, মাস, বৎসর তৈরি করছি। সুতরাং আমাদের পৃথিবীর এই 'কালের' কোন নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব নেই, তা দিনরাত্রি ঘটনার ওপর নির্ভরশীল। এই নিয়মও বিশ্বজনীন। মহাবিশ্বেই কোন 'পরম' বা absolute কাল নেই। আর পৃথিবীতে বসে অন্য সমগতিসম্পন্ন মহাবিশ্বের জড়পিণ্ডে "এখনই" কি ঘটছে, তা বলার কোন অর্থ নেই। প্রতিটি system তার নিজস্ব 'কাল' বহন করছে, তাৎক্ষণিকতা বা simultaneityর সাধারণ-গ্রাহ্য ধারণা ভুল।

আলোর গতিবেগ সার্বজনীন ধ্রুবক। কিন্তু 'দেশ' বা 'কাল' ধ্রুব নয়। তা পরিবর্তনীয়। মহাজগতে বস্তুর অবস্থান ও গতির ওপর দেশ ও কাল নির্ভর করছে। আইনষ্টাইন বললেন বিশ্বজনীন সমগতি বোঝাতে হলে যে কাঠামো ব্যবহার করতে হবে তা ত্রিমাত্রিক 'দেশ' ও তারই সঙ্গে একমাত্রিক 'সময়কে' ধরে তৈরি করতে হবে। এই 'চতুর্মাত্রিক' কাঠামো (reference frame) বিজ্ঞানী Minkowski ব্যবহার করেছিলেন। আবার আগেই Lorentz 'দেশ' ও 'কালকে' পরিবর্তনীয় ব্যাপার ধরে কতকগুলি সমীকরণ খাড়া করেছিলেন—পারস্পরিক গতিশীল কাঠামোতে গতির যোগ-বিয়োগ হিসেব করতে। আইনষ্টাইন সেই সমীকরণ ব্যবহার করলেন। তিনি যে সিদ্ধান্তে এলেন তা হল—"আলোর গতিই চরম গতি, এর গতিবেগের চেয়ে বেশি গতিবেগ সম্ভব নয়।" চলমান বিশ্বের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন system-এ পারস্পরিক সময়ের কোন পারম্পর্য কিন্তু নেই, সে সময় আপেক্ষিক। এখন বিশ্বজগতে তিনটি 'পরিমাণগত সত্তা' (quantity) দেখা যাচ্ছে,—(১) সময় (২) দূরত্ব (৩) বস্তু-ভর

(mass)। আইনষ্টাইন প্রমাণ করে ফেলেছেন যে কোন তথাকথিত system বা বিচ্ছিন্ন ছায়াপথের পরস্পরের কাছে সময়, দূরত্ব (বা space) দুই-ই আপেক্ষিক। তাহলে কি বাকি পরিমাণগত সত্তাটি, অর্থাৎ বস্তু-ভর, তাও আপেক্ষিক? জড়পিণ্ডের বস্তুসমূহের সমারোহের কিকোন নির্দিষ্ট মাত্রার ভর নেই? গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে 'ভরও' কি পরিবর্তনশীল? আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বলল,—'ভর' মোটেই ধ্রুবক নয়, তাও গতির সঙ্গে বদলায়। গতি যত বাড়ে, ভরও তত বাড়ে। বস্তু আলোর গতিবেগে চললে তার ভর দাঁড়াবে অসীম। Lorentz-এর সমীকরণে দেখা গিয়েছিল, বেগ বাড়লে সেই দিকে বস্তুর দৈর্ঘ্য কমে যাবে, এখন দেখা গেল বেগের সঙ্গে বস্তু ছোট হয়ে গেলেও তার ভর বেড়ে যাচ্ছে। ভরের সংজ্ঞা যদি হয়: গতির পরিবর্তনের বিপক্ষে 'বস্তুর' সৃষ্ট "প্রতিরোধ" (resistance), তবে এটাও বোঝা যাবে যে আলোর গতিবেগে পৌঁছলে ভর বা 'রোধ' হবে অসীম,—রোধ অসীম হলে বেগ হবে শূন্য। অথবা অন্য ভাষায়, এমন কোন জাগতিক বস্তু থাকতে পারে না যা আলোর গতির চেয়ে বেশি বেগবান হতে পারে।

বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুর ভর বেড়ে যায়, তা হাতে-কলমে প্রমাণ পাওয়া যায় মূল-কণিকার ত্বরণ-যন্ত্র, cyclotron accelerator, পরিচালনার ব্যাপারে। গতিবেগের সঙ্গে ভর যতটা বেড়ে যাচ্ছে তার হিসাব ক'ষে যন্ত্রের মধ্যে কণিকার ঘূরণ-পথ হিসেব করতে হয়, নইলে চলে না। আইনষ্টাইন এখন চিন্তা করলেন: বস্তু গতির সঙ্গে বস্তু তার ভরের বৃদ্ধি ঘটায়। যেহেতু গতি হচ্ছে শক্তি (Energy); তাই ভরের বৃদ্ধি শক্তিরই বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। অন্য ভাষায়—শক্তি হচ্ছে ভর। Lorentz-এর সমীকরণ ব্যবহার করেই তিনি খুব সহজ অঙ্ক কষে পেলেন: $m=E/c^2$। বিশ্বের আশ্চর্যতম সত্যগুলির এটি অন্যতম। এই সত্যেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়েছে পারমাণবিক শক্তি মুক্তকরণের ক্ষেত্রে। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন রেডিয়াম, কেন অতীব শক্তিশালী আলফা, বিটা কণা নিঃসারণ করে তা জানা গেল। জানা গেল সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্বলন্ত বস্তুপিণ্ডের শক্তির উৎস কি। পদার্থ বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসে এরকম গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ আর কয়টি আছে বলা শক্ত, —নিউটনের গতিসূত্র ছাড়া।

এখন ইলেকট্রন কণা না তরঙ্গ, এ প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেল। পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক বিক্রিয়া, —কখনও যা বস্তুর ধর্ম পালন করে, কখনও করে তরঙ্গরূপ শক্তির ধর্ম,—এখন আর ধারণা করা শক্ত রইল না। জানা গেল বিশ্বের একই সঙ্গে দুই রূপ, —কারণ শক্তি ও বস্তুভর ভিন্ন হলেও তারা অভিন্ন ব্যাপার। বস্তুর বিনাশে শক্তির উদ্ভব, শক্তিরই রূপান্তর বস্তু। হিন্দু দর্শনেও অনুরূপ ব্যাপার কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু তা বলে বিজ্ঞানের সব 'সত্য' নিশ্চয়ই উদ্ঘাটিত হয়নি। আমরা জানি না, 'কেন', 'কি ভাবে' সমস্ত বস্তু মূল কণায় রূপান্তরিত হতে পারে এবং সমস্ত কার্যশক্তি বা force (বল), Energy —শক্তিতে পর্যবসিত হতে পারে।

দেখা গেল আইনষ্টাইনের ঐ 'বিশেষ'-আপেক্ষিকতাবাদ আমাদের প্রাচীন নিউটনের গড়া বিশ্বধারণা থেকে আমাদের বহুদূরে এনে ফেলেছে। পরমাণুর অতি ক্ষুদ্র জগতে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রচুর রহস্যের সমাধান করেছে। কিন্তু মহাবিশ্বের সেই মূলগত ধারক-শক্তি, মহাকর্ষ, তা বোঝবার জন্য আইনষ্টাইনকে আবার চিন্তা করতে হল।

আইনষ্টাইনের ব্যবহৃত চতুর্মাত্রিক 'দেশ' সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। ব্যাপ্তির তিন মাত্রা ও কালের এক মাত্রা নিয়ে তাঁর চতুর্মাত্রিক কাঠামো বা 'দেশ-কাল'-কাঠামো। পৃথিবীতে আমরা ঘটনার আগু-পিছু থেকে সময়ের বিচার করছি। কিন্তু মহাবিশ্বের সময়ের চেতনা ঈশ্বর বা কোন super-intelligence-এর থাকতে পারে—অন্যথায় ধরে নিতে হবে যে মহাবিশ্ব 'বর্তমান', তার কোন শুরু নেই, তাই সে শুধু 'দেশ-কাল' কাঠামে রয়েছে।

সমগতির কথা ছেড়ে আমরা অসমগতিতে আসি। সমগতিতে চলার সময়ে গতিশীল ট্রেনের ভেতরে বসে থাকলে আমরা গতি কিছুই বুঝতে পারি না। একটা বল নিয়ে স্বচ্ছন্দে লোফালুফি করতে পারি। কিন্তু হঠাৎ যদি ট্রেনটা গতিবৃদ্ধি করে তবে সেই ঝাঁকানী আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো। আইনষ্টাইন ভাবলেন, তাহলে এরকম অসম-গতি (যা ত্বরণের ফলে হতে পারে) হয়তো 'পরম-গতি' বা absolute motion আখ্যা পেতে পারে। কিন্তু আইনষ্টাইন বিশ্বাস করলেন না মহাবিশ্বের ছন্দে কোথাও এরকম অসম-গতি আবির্ভূত হচ্ছে। আইনষ্টাইন মহাকর্ষ বোঝাবার জন্য নিউটনের আইনের 'জাড্যের' নিয়মের দিকে নজর দিলেন। 'জাড্য' বা inertia' বোধ করা যায়, যখনই ট্রেন হঠাৎ থেমে যায়,—আমাদের শরীর গতির দিকেই যেতে চায় ও আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাই। অর্থাৎ ট্রেন ব্রেক কষলে আমাদের শরীরে একটা শক্তি অরোপিত হয়, আমরা ঐ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে চাই। পদার্থের এই রোধ বা এই শক্তিই জাড্য।

নিউটন প্রমাণ পেয়েছিলেন, তাঁর প্রবর্তিত মহাকর্ষের নিয়মের মহাকর্ষীয়-বল, জাড্য বলের সমান। নিউটন বলেছিলেন, বস্তু পরস্পরকে মহাকর্ষীয় বলে আকর্ষণ করছে। এর কারণ জানা নেই, এ মেনে নিতে হয়। আইনষ্টাইন এই মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে।

আইনষ্টাইন মহাকর্ষের যে তত্ত্ব খাড়া করলেন তাতে তিনি বললেন—মহাকর্ষ কোন আকর্ষক 'বল' বা force নয়, মহাকর্ষ পদার্থের জাড্যগুণেরই অংশ, গ্রহনক্ষত্রের গতি অন্তর্নিহিত জাড্যের দরুণ; তাদের গতিপথ নির্ধারিত হচ্ছে—চতুর্মাত্রিক 'দেশ-কালের' নিরবচ্ছিন্নতায় বিভিন্ন মাত্রার মাপে। আমি জানি, ওপরের কথাগুলি বোঝা খুব শক্ত। কিন্তু উপায় নেই, অঙ্ক ছাড়া এ-বোঝানো আমার সাধ্যাতীত। তবু এইভাবে বোঝানো যাক। চুম্বকের বলক্ষেত্রের কথা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারি। পদার্থবিদ্‌রা বলবেন—চুম্বক আছে বলেই চতুষ্পার্শে একটা ভৌত অবস্থা রয়েছে (যা 'ক্ষেত্র' বলছি), লোহার টুকরো কাছে এলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তার দরুণ কিছু ভৌত ঘটনা ঘটে। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রেও সেরকম—বস্তু রয়েছে বলেই একটা ভৌত অবস্থা রয়েছে; সেই 'ক্ষেত্র' থাকার দরুণ অন্য বস্তুর উপস্থিতিতে যে ভৌত ঘটনা ঘটে, তা আইনষ্টাইন চতুর্মাত্রিক-দেশকাল কাঠামো ব্যবহার করে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। মোট কথা হল, মহাবিশ্বে নক্ষত্র-গ্রহ-চন্দ্র ইত্যাদি বস্তু space বা 'দেশে'র ভৌতধর্মকে নির্ধারিত করে।

এডিংটন নানাবিধ উদাহরণ দিয়েছেন। একটি উদাহরণ Lincoln Barnett তাঁর বইতে লিখেছেন। ধরা যাক খুব এবড়ো-খেবড়ো জমিতে একটি ছেলে মার্বেল খেলছে। পাশে দশতলা বাড়ির ওপর তলা থেকে একজন দর্শক খেলা দেখছে। সে জমিটা কতটা উঁচুনিচু, কিছুই বুঝতে পারবে না, শুধু

দেখবে, ছেলেটি মার্বেল সোজা মারলেও হঠাৎ কোন কোন জায়গায় বেঁকে এদিকে-ওদিকে চলে যাচ্ছে। দর্শকের কাছে মনে হতে পারে, কোন "বল" (force) ওই মার্বেলকে এদিক-ওদিক আকর্ষণ করছে। ওটি ঘটছে যে ক্ষেত্রের 'উঁচুনিচু'-'বিশেষত্বের' (peculiarities) জন্য দর্শক তা বুঝতে পারছে না। —চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের কাঠামোর নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে বস্তুর উপস্থিতির দরুণ যে 'এবড়ো-খেবড়ো' peculiarity-র জন্ম হচ্ছে, সেজন্যই মহাকর্ষকে আকর্ষণ.বল বা force বলে মনে হচ্ছে।

আইনষ্টাইনের এই মহাকর্ষের তত্ত্ব খুব চমকপ্রদভাবে সত্য বলে জানা গেল, বুধ-গ্রহের কক্ষের অ-ব্যাখ্যাত বাৎসরিক মরণকে যখন এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল। সূর্যের খুব কাছে থেকে বুধগ্রহ খুব বেশি বেগে সূর্যকে বেষ্টন করে ঘুরছে। সূর্যের ও বুধগ্রহের ভরের হার বা বুধের বেগ, কোন কিছুই নিউটনের আকর্ষণের নিয়মকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু আইনষ্টাইনের অঙ্কে দেখা গেল ঐ কারণগুলি বুধের নির্দিষ্ট কক্ষপথের বৃত্তাভাসকে (ellipse) সূর্যের চারদিকে—যেন ফুলের কেন্দ্রের চারিদিকে সাজানো বিভিন্ন পাঁপড়ির মত—ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রমাগত অবিচ্ছিন্নভাবে সরিয়ে দিচ্ছে। জ্যোতির্বিদদের দেখা বুধগ্রহের কক্ষের ঐ বিভ্রান্তিকর ভ্রংশ আইনষ্টাইনের হিসাবে অদ্ভুতভাবে মিলে গেল।

আইনষ্টাইনের আর একটি ধারণা, আলোর ফোটন-কণাগুলি মহাকর্ষের দরুণ বেঁকে যাবে—তাও প্রমাণিত হল। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় দূর নক্ষত্র থেকে আসা সূর্যের খুব কাছে ঘেঁষা আলো যে বেশ বেঁকে যায়, যার জন্য দূরের নক্ষত্রের অবস্থান যেন বদলে যায়, তাও দেখা গেল।

সমগ্র মহাবিশ্বের অসংখ্য বস্তুপিণ্ড নিয়ে দেশ-কাল-নিরবচ্ছিন্নতা কি ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে? আইনষ্টাইন বললেন—ইউক্লিডের জ্যামিতির নিয়ম মহাবিশ্বে চলে না, সেখানকার জ্যামিতি Non-Euclidean ও এর উপসংহারে তিনি বললেন—মহাবিশ্ব সীমাহীন নয়, তা সীমিত। একটি বড় গ্লোবের ওপর পিঁপড়ে চলতে শুরু করলে তার কাছে সেই পথ হবে অসীম—তার বিশ্বও হবে অসীম। বস্তু থাকার দরুণই আইনষ্টাইনের চতুর্মাত্রিক দেশকালে সরল রেখা নেই, তা সর্বদাই বক্র রেখা (অঙ্ক ছাড়া বোঝা যাবে না, আমার কথা মেনে নিতে হবে)। তাই বিশ্ব সীমিত হলেও তা বন্ধনহীন unbounded। কিন্তু আমরা এ জিনিষ মনশ্চক্ষে আনতে পারি না।

আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের 'বক্রতা' তার বস্তুপুঞ্জের ঘনতার ওপর নির্ভর করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী Edwin Hubble প্রমাণ করেছেন, মহাবিশ্বে বস্তুপুঞ্জের 'ঘনত্ব' এক গ্রামের $১০^{৩০}$ ভাগের এক ভাগ বা ০·০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ গ্রাম। আইনষ্টাইনের দেশ-কাল সমীকরণে এই মান বসিয়ে দেখা যায় মহাবিশ্বের ব্যাসার্দ্ধ ২১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলো পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে মহাবিশ্বের বক্রতার জন্য আবার এক সময়ে পৃথিবীতেই ফিরে আসবে, তবে তা আসবে ২০০,০০০,০০০,০০০ পার্থিব বছরের পরে!

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুজগতের বেলায় এবং বিশাল হতে বিশালতম মহাবিশ্বের ঘটনাবলীর বেলাতেও সমস্ত আধুনিক গবেষণায় আইনষ্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব একমাত্র নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র প্রথমটি দিয়ে ও মহাকর্ষ দ্বিতীয়টি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

আইনষ্টাইন শেষের প্রায় ত্রিশবৎসর ধরে একটি মাত্র সাধারণ সমীকরণ দিয়ে এই দুই বিশেষ তত্ত্বকে বিধৃত করা যায় কিনা, তারই নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বজগৎ একটিমাত্র সাধারণ নিয়মের অধীন—এখানে দ্বৈততত্ত্বের ভূমিকা নেই। তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হবার আগেই তিনি প্রয়াত হলেন।

মারফি রেডিও

আকাশে
বাতাসে
আগমনী সুর
উৎসবের দিনগুলি
আনন্দে ভরিয়ে তোলার
এইতো সময়

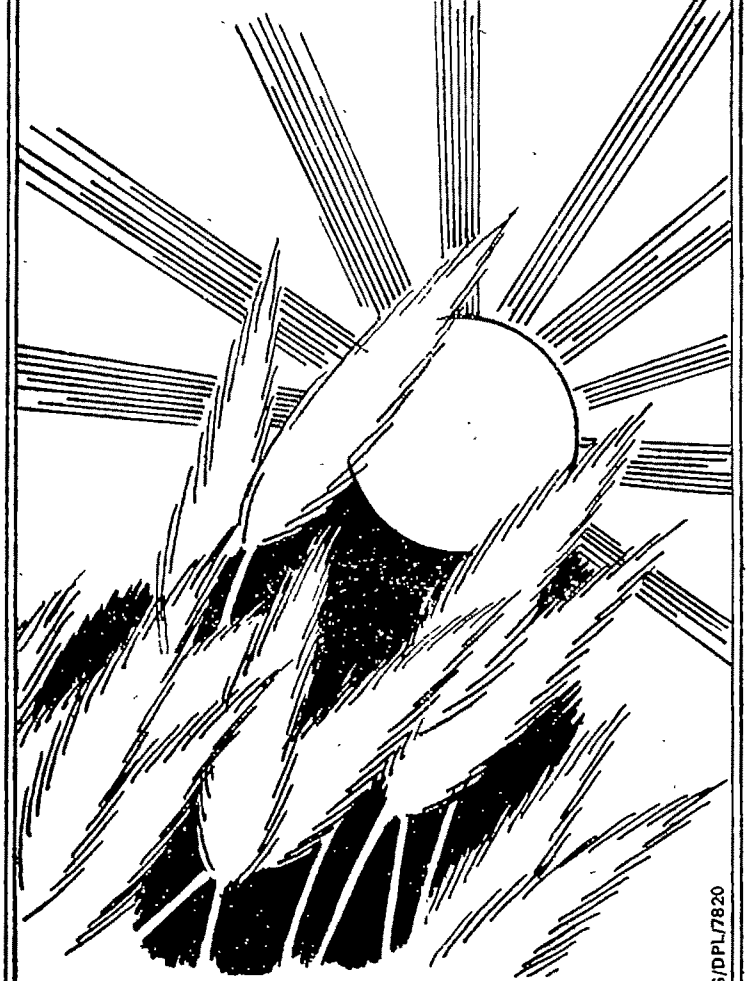

দেবসন্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ● পাটনা ● কটক ● গৌহাটি ● জব্বলপুর

BEEVAS/DPL/7820

সূর্য সেন

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

জন্ম : ১৮৯৪, ১৪ই মার্চ, গ্রাম নোয়াপাড়া, জেলা চট্টগ্রাম। মৃত্যু : ১৯৩৪, ১২ই জানুয়ারী ভোর সাড়ে বারোটায়, ফাঁসীতে। ৪০ বছর বয়সের এই মহাপ্রাণ নিজের জীবন দিয়ে বাংলার ঘুমন্ত মানুষের তৎকালীন অধঃপতিত বর্তমানের সংগে অতুল ভবিষ্যতের সেতু বেঁধে দিলেন।

ইতিহাসের কাছে বাঙালীর একটা বড় ঋণ ছিল, সেটা ছিল কাপুরুষতার ঋণ। সাহস বলতে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ও সাধারণ দস্যুবৃত্তির কাপুরুষতা। বাঙালী একটু দেরীতে বোঝে তাই ছাপাখানার আগমনের মতন দীপ্ত আত্মমর্যাদা-বোধও তাদের কাছে পৌঁছতে বহু শতাব্দী লেগেছে। এর অর্থ এই নয় যে উপমহাদেশের অন্যান্য গোষ্ঠী বাঙালীর চেয়ে দড় ছিল। কিন্তু তারা সামরিক অভ্যাস বজায় রাখার ফলে মানব চরিত্রের একটা বড় অভাব পূর্ণ হয়েছে। বাঙালীর ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। বাংলার হলধরের হাড় দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে-যুগের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গড়েছে, এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের জমি দিয়েছে, বাংলার বাইরে। সামরিক শিক্ষাটা বিদেশীর দেওয়া, টাকাটা বাংলার। বাঙালী শুধু পড়ে পড়ে মার খেয়েছে, অপমানের পঙ্ক-শয্যায় আকণ্ঠ ডুবে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে, আত্মকলহের মধ্যে নিজেকে ভুলে, আত্মপ্রবঞ্চনা করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হল ১৯০৮-এ মজফ্‌ফরপুরে, দুটী বাঙালী তরুণের আত্মদানে। তারা হলেন মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু ও রংপুরের প্রফুল্ল চাকী। সূর্য সেনের বয়স তখন ১৪, ইস্কুলের ছাত্র। এই প্রথম ইতিহাস তাকে হাতছানি দিয়ে বল্লো, "আমার সংগে হাত মেলাও, আমি তোমায় অতুল সম্ভাবনার জগতে নিয়ে যাবো।" বিদ্যালয়ের বালক বিচলিত কিন্তু কে তাকে হদিস্ দেবে!

১৯১৫-তে বালেশ্বরে বুড়ীবালাম নদীর তীরে চাষখণ্ডের মাঠে আর এর যুগান্তকারী ঘটনা ঘটলো। ৯ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরের যতীন মুখার্জির দলের সংগে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ। এটা পৃথিবীর অন্যত্র একটা ঘটনাই নয় কিন্তু ভীরু ভারতে সাড়া পড়ে গেল; ভারত চমকে উঠলো, ভাবলো ভেতো বাঙালীর এত সাহস! জন কতক বাঙালী যুবক প্রমাণ করলো খাদ্যের সংগে সাহসের কোনও সম্পর্ক নেই। গুর্খা ও জাপানীরাও ভাত খায়। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে চীনে ও ভিয়েৎনামীরাও ভাত খেয়ে যুদ্ধ করে। শুধু তাই নয় পাউরুটী আর গোস্ত খাওয়া জাতকে রুখতে পারে। বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধের অনুরণন সুরু হল চট্টগ্রামের অন্তরে বাহিরে। তখন সূর্য সেনের মনে

ভারত-চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তার স্থান বা অবকাশ নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের দু'বছর গড়িয়ে গেল। সূর্য সেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ্. এ পাশ করে গেলেন বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে বি, এ পড়তে।

ঐ কলেজেরই এক প্রাক্তন ছাত্র নলিনী বাগ্‌চীর সঙ্গে গৌহাটীতে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ তাকে গরুখোঁজা করছে আসামে, নলিনী বাগ্‌চী তখন ঢাকায়। সেই সহরেই কলতাবাজার এলাকায় তিনি ধরা পড়লেন; কিন্তু পুলিশ তাঁকে বন্দী করতে পারলো না। পিস্তল যুদ্ধ হল। বাগচী নিহত হলেন। সারা ভারতে কাগজে কাগজে খবর গেল। বাকী ভারত আবার চম্‌কে উঠলো। এই ঘটনায় ছাত্র সূর্য সেনের মনে বৈশ্বানরের লীলা সুরু হল। শহীদ বাগচী ঐ কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। সূর্য সেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। ভারতের মোহ, স্বাধীনতার মোহ।

১৯১৮-তে বি, এ পাশ করে তিনি চট্টগ্রামে ফিরলেন এবং উমাতারা হাইস্কুলে গণিতের শিক্ষকের কাজ নিলেন। বিবাহ হলো পুষ্পকুন্তলা দত্তের সঙ্গে কিন্তু তাঁর বৈবাহিক জীবন বলে কিছু ছিল না। তিনি গৃহত্যাগ করে থাকতেন চট্টগ্রাম সহরে কর্ণফুলি নদীর ধারে, এক পর্ণকুটীরে। কখনও উপাক, কখনও অরন্ধন। মুক্তি-যুদ্ধের স্বপ্নই তাঁর স্বপ্ন, ভারতই তাঁর প্রেম; সাংসারিক দায়িত্ব, পুত্র-কন্যার প্রবল বন্যাটা তাঁর কাছে বিভীষিকা। ধর্মের বইগুলো কুলুংগীতে তুলে আরম্ভ করলেন বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ।

১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল: বৈশাখী পূর্ণিমা। পুণ্য নগরী অমৃতসরের একটী মাঠ, নাম জালিয়ানওয়ালা-বাগ। ২৩ হাজারের অধিক নরনারী ও শিশু এক ধর্মীয় উৎসবে সমবেত। মাঠের তিন দিকে বাড়ী। শুধু একটী মাত্র আসা-যাওয়ার পথ। এই পথে এল সেনাপতি ডায়ারের নেতৃত্বে ৯০ জন ভারতীয় সৈন্য আর দুটো সাঁজোয়া গাড়ী। সমবেত জনতা ভাবলো এটা তৎকালীন জরুরী অবস্থায় সরকারের স্বাভাবিক সৈন্য সমাবেশ। হঠাৎ আরম্ভ হল গুলি-চালনা। ১,৬৫০ রাউণ্ড গুলি চলার পর বীর সেনাপতি ডায়ার ক্ষান্ত হলেন। ততক্ষণে ৩৭৯ মৃত, সহস্রাধিক আহত। রবীন্দ্রনাথ সার উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডকে চিঠি লিখলেন। জাতির নেতৃবৃন্দ অনুসন্ধান কমিটি বসিয়ে বিবেক হাল্কা করলেন। গান্ধিজী বিবৃতি দিলেন, "এ-অবস্থায় অসহযোগীদের পক্ষে কোনও আন্দোলন করে সরকারকে বিব্রত করা বিধেয় হবে না।" পরে অসহযোগ আন্দোলনে মৃত ইংরেজের ওয়ারিশদের মাথাপিছু খেসারৎ দেওয়া হল ৬৮,৬১৭ টাকা এবং ৪০ জন ভারতীয় ওয়ারিশকে মাথা পিছু ৫০০ টাকা।

চট্টগ্রামের পর্ণকুটীরে গণিতের শিক্ষক তখন নীরব আগ্নেয়-গিরিবৎ। ব্যাপক ভারতীয় হত্যার প্রতিবাদ অনুসন্ধান কমিটী? ভারতীয় জীবনের দাম ৫০০ টাকা? ভারতবাসীর কাপুরুষতা দেখে পৃথিবী তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। ইংরেজের সৈন্য হিসেবে ওদের যত মুরোদ, বেসামরিক ভারতীয়রা ভেড়া। অস্ত্রের মুখে এর প্রত্যুত্তর দরকার। নান্যঃ পন্থা।

অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, বোমার বিস্ফোরণ, কামানের

গর্জন, পিস্তলের গগনভেদী হুংকার তাঁর কানে দীপক রাগিনীর মতন মধুর বলে মনে হল। কিন্তু কোথায় সেই অস্ত্র! কি ভাবে অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত হবে! কোথায় সেই অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য! সারা রাত নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রণায় কাটল। সকালে যথারীতি ইস্কুলে গেলেন গণিতের ক্লাস নিতে। মন তখনও খুঁজছে দ্রোণাচার্যকে।

সূর্যসেন বোর্ডের ওপর অংক কষে দেখাচ্ছেন, এখন সময় লক্ষ্য করলেন যে কয়েকটী ছেলে উত্তেজনাভরে চুপিসাড়ে কথা বলছে। তিনি বকাবকি, চেঁচামেচির একান্ত বিরোধী; তাই করুণা-ঘন চোখ মেলে তাদের দিকে চাইলেন। একটি ছেলে থতমত হয়ে জবাব দিলো, "মাপ করবেন স্যার, চট্টগ্রামের একজন বাঙালী আজ যুদ্ধ থেকে ফিরছেন। নাম নগেন সেন। তাঁর কথাই আলোচনা করছিলুম।" সূর্য সেনের মনস্তত্ত্বের ক্ষমতা অসাধারণ; তিনি প্রাক্তন সৈন্যটীর নাম অন্তরে লিখে রেখে স্মিত-হাস্যে বল্লেন, "নগেন সেন; ভাল কথা, এবার অংকটা শেষ করা যাক।"

ইস্কুলের পর খোঁজ নিয়ে জানলেন নগেন সেন জুলু সেন নামে পরিচিত। ১৯ বেংগলী রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়াতে ছিলেন। এই রেজিমেন্ট (পদাতিক) এবং ক্যালকাটা লাইট হর্স (অশ্বারোহী)—ভারতে মাত্র দুটী রেজিমেন্ট, যা বাঙালী নিয়ে গঠিত; অফিসাররা ইংরেজ ও উত্তর ভারতীয়। এরা যুদ্ধ করেন নি কিন্তু অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী। এই কি আমাদের দ্রোণাচার্য!

১৯২১-এ হল আসাম-বেংগল রেল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে চট্টগ্রাম খুবই উদ্যোগ দেখিয়েছে। ধর্মঘট সফল হলেও সূর্য সেনের মনে দুঃখ রয়ে গেল। এত বড় একটা জাগরণ, এত উদ্যোগ আয়োজন, আর তার পরিসমাপ্তি হল মজুরী-বৃদ্ধি! এ-যেন মুদীর ব্যবসার ব্যাপকতর সংস্করণ। জাতীয় মুক্তির কথা নেই, ইস্পাত-কঠিন সংগঠন নেই, আছে শুধু সোচ্চার নিষ্ক্রিয়তা।

১৯২২। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন চলছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গোরখপুর জেলায় চৌরি-চৌরা গ্রামে গ্রামবাসীদের সংগে পুলিশের সংঘর্ষ। পরে পুলিশদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। গান্ধীজীর নির্দেশে সারা ভারতে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। সূর্য সেন লক্ষ্য করলেন অসহযোগের অন্তর্দ্বন্দ্ব; এটা না অহিংস, না সশস্ত্র অভ্যুত্থান। চৌরিচৌরায় পুলিশের অত্যাচার হয়েছিল শতগুণ কিন্তু প্রতিশোধ নেবার সংগঠন নেই, অস্ত্র নেই, অস্ত্রশিক্ষা নেই, উৎসর্গিত মানুষ নেই। খালি জেল খেটে আর স্বায়ত্বশাসন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে দেশবাসী তৃপ্ত; এ যেন দুধের বদলে পিটুলী-গোলা পান করার আনন্দ।

এই ঘটনার পর চট্টগ্রাম সহরে পাঁচজন কর্মীর গুপ্ত-বৈঠক বসল। ইতিহাস এই তারিখটা লিখে রাখেনি। এতে ছিলেন জুলু সেন, সূর্য সেন, অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, চারুবিকাশ দত্ত। দত্ত মহাশয় তখন অনুশীলন সমিতির সদস্য, অন্যান্যরা কোনও গুপ্ত-সমিতির সদস্য নন। যুগান্তর-অনুশীলন দ্বন্দ্বের ক্ষয়রোগ থেকে তখনও চট্টগ্রাম মুক্ত। সেদিন সৈনিক মাত্র পাঁচ জন, লক্ষ্য চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান, শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী

একমাত্র জুলুদা। কয়েকজন উৎসাহী যুবক দলে যোগ দিলেন। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে এদের দেশভক্তির হাতে খড়ি হয়েছে। গুপ্ত-সমিতির সিদ্ধান্ত হল আদর্শকে যদি বাহুবল দিয়ে সমর্থন করবার ভাকৎ না থাকে তাহলে সে আদর্শ নখদন্তহীন বাঘ। গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম চর্চার সংঘ প্রতিষ্ঠিত হল। এতে উদ্যোগী হলেন বিশেষ করে দু'জন যুবক, অনন্তলাল সিংহ আর লোকনাথ বল। অনেকে বলাবলি করেন যে সিংহরা বাঙালী নন, উত্তর ভারতীয়। কথাটা ভুল। ওরা চারপুরুষ চট্টগ্রামের বাসিন্দা। অনন্তলালের পিতা গোলাপলাল, মা, বড় ভাই নন্দলাল ও দিদি ইন্দুমতী সকলেই চাটগাঁইয়া উপভাষায় কথা বলতেন।

সূর্য সেনের মাথায় এক চিন্তা সশস্ত্র অভ্যুত্থান, যোদ্ধা সংগ্রহ চলতে লাগল গোপনে, অতি সন্তর্পণে। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে এই বিপ্লবীদলে যোগ দিতে হলে মা-কালীর সামনে গীতা স্পর্শ করে শপথ নিতে হত। এটা মিথ্যা কথা। দলের সভ্য হতে হলে আগে প্রার্থীকে বহুদিন ধরে লক্ষ্য করা হত, তার আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতি তার মনোভাবের খোঁজ নেওয়া হত, পড়াশুনা ও শরীর চর্চার প্রতি একাগ্রতা আছে কিনা তা দেখা হত। তারপর পূর্বোক্ত পাঁচজন নেতার সর্বসম্মতিক্রমে প্রার্থীকে দলের সভ্য করা হত। মা-কালীর প্রতি ভক্তি হয়ত অনেকের ছিল কিন্তু দলের সভ্য সংগ্রহ ব্যাপারে মা-কালী বা গীতা ছিল অবান্তর কারণ দলের দু' চারজন বিপ্লবী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের, যারা নিরাকার ঈশ্বরের ভক্ত। একটী মুসলমান ছাত্র কলকাতায় জুলুদার কাছে সাড়ে সাত হাজার টাকা নিয়ে আসে; উদ্দেশ্য পিস্তল কেনা। ছেলেটীর নাম রহমান। এটা ছদ্মনাম নয়, ছেলেটীর পিতৃদত্ত নাম। একজন নীরব কর্মী-যুবক সমস্ত নিরাপত্তা তুচ্ছ করে বাঙালী নাবিকদের মারফৎ পিস্তল সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের দিতেন; তাঁর নাম আবদুর রেজ্জাক খাঁন। ইনি পরে মৌলানা আক্রাম খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। যারা অভিযোগ করেন যে অহিন্দুদের বিপ্লবী দলে নেওয়া হত না তাদের প্রতি আমার এই বক্তব্য: —ভারত-মুক্তির জন্যে আপনাদের প্রাণ যদি এতই ব্যাকুল হয়েছিল তাহলে আপনারা অস্ত্র সংগ্রহ করে নিজেরাই একটা গুপ্ত-সংগঠন পড়েননি কেন?

ভারতে তখন বহু গুপ্ত-সংগঠন:—বাংলায় যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসঙ্ঘ, বেংগল ভলান্টিয়ার্স, আত্মোন্নতি এবং পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মি। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংঘের নাম ছিল ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি। অনেকে বলেন যে আরও একটা সংগঠন ছিল যার অস্তিত্বের কথা ভারত স্বাধীন হবার পর জানা যায়। এদের নামটা কিন্তু আজও অজ্ঞাত। হয়ত একদিন জানা যাবে।

এই সমস্ত বিপ্লবী দলের ভেতর ঐক্য আনবার চেষ্টায় সূর্য সেন অগ্রণী হলেন। ১৯২৪-এ মৌখিক ঐক্য এল কিন্তু একটা কারণে এই ঐক্য সংগঠনে পরিণত হল না। ১লা অক্টোবর ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে বাংলা ও উত্তর ভারতের প্রায় সব ক'জন বিপ্লবী নেতা কারাগারে স্থান পেলেন; বাইরে

রইলেন সূর্য সেন আর জুলু সেন। এঁরা আত্মগোপন করলেন। এই সময় এঁরা দু'জন যথাক্রমে আসাম ও উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এদের দু'জনকে দেখতে একেবারে ভিন্ন। সূর্য সেন পাঁচ ফুট, শীর্ণদেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শুধু চোখ দুটো দেখলে বোঝা যায় ইনি অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষ। জুলু-সেন তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, শক্তিশালী দেহ, দেখলে মনে হয় ছফুট লম্বা আরাকানী মগ। যুক্তপ্রদেশ দীর্ঘাংগ মানুষের দেশ, সে জন্যে তিনি বোধ হয় ধরা পড়েন নি।

১৯২৬-এর ৮ই অক্টোবর। সূর্য সেন কলকাতার রাজপথে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে পাঠানো হল বোম্বাইয়ের রত্নগিরি জেলায়। সেখানে তার সঙ্গী ছিলেন অনুশীলনের নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। ২৭ সালে এঁরা মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন। তখন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি চলেছে। সুভাষ বসুর অধিনায়কত্বে বেংগল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর পদাতিক, অশ্বারোহী, সাইকেল ও নারী-বাহিনী প্রত্যহ ড্রিল করছে। এই বাহিনী পরে বে-আইনী হয়ে যায়।

সূর্য সেন গোপনে কলকাতায় এলেন। তিনি তখন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। সমস্ত বিপ্লবী দলগুলো একমত হয়ে সুভাষ বসুকে বল্লেন যে তাঁকে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব আনতে হবে। সুভাষ যথারীতি প্রস্তাব তুল্লেন; প্রস্তাব পরাজিত হল। গান্ধিজী জয়ী হলেন। তার ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাব পাশ হল। সূর্য সেন হতভম্ব। এর কি কারণ থাকতে পারে। কারণটা পরের বছর জানা গেল। লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হল। প্রস্তাবকারী জওহরলাল নেহেরু। সবার জ্ঞাতসারে গান্ধিজী নেহেরুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

১৯২৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর। লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বেংগল ভলান্টিয়ার্স-এর মেজর যতীন দাসের প্রায়োপবেশনে মৃত্যু। (২০শে সেপ্টেম্বর বর্মায় স্বাধীনতা সৈনিক ফুংগী বিজয় আরও দীর্ঘদিন প্রায়োপবেশন করে আত্মদান করেন কিন্তু বর্মা তখন ভারতের অংশ হলেও আমরা নীরব ছিলুম)। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভকৎ সিংহ, রাজগুরু, শুকদেব ও বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে মেজর যতীন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাক্ষীসাবুদের অভাবে মামলা আনা সম্ভব হয় নি, তাই রাজবন্দী করা হয়। যেদিন মেজর দাসের শবদেহ কলকাতায় এল সেদিন মহানগরী উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম। সূর্য সেন কর্ণফুলির ধারে পর্ণকুটীরে গুটিকয় অনুচর নিয়ে আলোচনায় মগ্ন। বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে অভ্যুত্থানের ভিত্তিতে ঐক্য আনা সম্ভব হয়নি। ১৯২৪ থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে একই ভিত্তিতে যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; তাছাড়া ওদের ধর্মগুরু লেনিন-এর হিসেবে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি হল টেররিষ্ট। কমিউনিষ্ট মতে ওঁরা স্বতঃস্ফূর্ততা বা স্পণ্টেয়্‌নি-টি রোগে ভোগেন। (পরে এই স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে আলজিরিয়ার মহাবিপ্লব সাধিত হয় এবং তাতে কমিউনিষ্ট জগৎ পূর্ণ সমর্থন জানায়। দোষ শুধু সূর্য সেনের)। জুলু সেন কলকাতায় অস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত, অনুরূপ সেন মৃত। সূর্য সেন ধীর-কণ্ঠে প্রস্তাব করলেন যে আর দেরী নয়, ১৯৩০-এর

পুণ্য ইষ্টার দিবসে সূর্যাস্তের পর সশস্ত্র অভ্যুত্থান; চট্টগ্রামকে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার জন্যে পৃথিবীর সংগে সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ১৯১৭ সালে, ঐদিন আয়ারল্যাণ্ডে ডি. ভ্যালেরার নেতৃত্বে ইষ্টার বিদ্রোহ হয়।

ইতিমধ্যে ব্যায়াম-চর্চায় সংঘগুলি খুবই জোরদার। কংগ্রেস অফিসে সংবাদ এল স্থানীয় দুটো গুণ্ডা বাতা সেন আর সিরাজ উৎপাত আরম্ভ করেছে। খাস্তগীর বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রতি ওরা অশ্লীল উক্তি করে। অভিভাবকরা এসে সূর্য সেনের কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি দেখলেন এ-মহা বিড়ম্বনা; নারীর ইজ্জৎ না রাখলে শরীর শক্ত করার মূল্য কানা-কড়িও না; অন্য পক্ষে, শক্তিশালী সভ্যরা এইভাবে গ্রেপ্তার হলে অভ্যুত্থানে যোগ দেবে কারা?

বাতা সেনকে শুধু উত্তম-মধ্যম দিয়ে খালাস দেওয়া হল। সিরাজকে ধরে আনলেন ডাক্তার বিধু ভট্টাচার্য ও অনন্তলাল। চট্টগ্রাম সহরে সিরাজকে ধরে নিয়ে আসতে পারে এমন লোক ছিল না। সিরাজ ভীতিবিহ্বল। এরা কারা! মেডিকেল স্কুলের বিচার সভায় তাকে শাসানি দেওয়া হল যে আর অভিযোগ এলে তার দুটো হাত ভেঙে দেওয়া হবে। বিধু ডাক্তার আর অনন্তলালের শরীর ও তাকৎ দেখে সিরাজের এবিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। সদ্ব্যবহার করবার জন্যে আল্লার নামে শপথ করিয়ে তাকে রেহাই দেওয়া হল। অভিভাবকরা বুঝলেন যে সূর্য সেনের দল জেলার সমান্তরাল সরকার না হলেও একটা বিকল্প শক্তি। তড়িৎ বিচারের কাহিনী সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়লো, সংগে সংগে সূর্য সেনের নাম। কিন্তু তখনও জনসাধারণ তাকে চোখে দেখেনি। কেউ ভাবে তিনি পাহাড় প্রমাণ, কেউ ভাবে ইস্পাতের মতন চেহারা, কেউ ভাবে কাবলীওয়ালাদের মতন গোঁফ-দাড়ি, লক্ষ্যভেদে একলব্য। আসলে, সূর্য সেন সাইজে নেপোলিয়ন, রঙ কালো (ডাক নাম কালু), দেখতে কুলী-মজুরের মতন (অনেক ক্ষেত্রে কুলী মজুর-সেজে ইনি সৈন্য ব্যূহ ভেদ করে রক্ষে পেয়েছেন)। পিস্তল চালনায় ইনি বিশেষ দড় ছিলেন না। ওটা শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল নির্মল সেন ও বরিশালের তারকেশ্বর দস্তিদারের ওপর।

১৯৩০। এপ্রিল। আয়োজন শেষ। এবার শত্রু-পক্ষকে বিভ্রান্ত করা দরকার। তখন সারা ভারতে লবণ-আইন ভংগ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে। এর পূর্বে ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার এবং ২রা মার্চ গান্ধিজীর ডাণ্ডী যাত্রা। পাঠান মুল্লুকের নারী ও পুরুষ কাতারে কাতারে আইন অমান্য করছে, কারাবরণ করছে, অনেকে মৃত্যুবরণ করছে। মহান নেতা আবদুল গাফ্ফার খাঁন বন্দী। চট্টগ্রামে অনুশীলনের নেতৃত্বে লবণ আইন ভংগ আরম্ভ হল। পেশোয়ার থেকে কক্সবাজার, মহারাষ্ট্র থেকে আসাম—সারা ভারত উত্তাল। বিপ্লবীদের তরফ থেকে এই বলে প্রচার করা হল যে আগামী ২১শে এপ্রিল যুবক, ছাত্র ও জন-সাধারণ লবণ-আইন অমান্য করবে। সামরিক অভ্যুত্থানের গোপন তারিখ ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার খৃষ্ট-অবতারকে ক্রুশ-বিদ্ধ করার দিন।

১৮ তারিখের কয়েকদিন পূর্বে এক বিভ্রাট ঘটল; তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বোমা

বিস্ফোরণে আহত হলেন। এদের দুজনকে সরিয়ে গোপন আস্তানায় চিকিৎসাধীন রাখা হল। ১৮ই এপ্রিল বলবৎ রইল। এই দিন অসীম যন্ত্রণার মধ্যে তরুণ যীশুর তিরোধান ঘটে কিন্তু সে মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। কবি ইকবাল লিখেছেন "লক্ষ তারকার বক্ষ শোণিতে অরুণোদয়ের সৃষ্টি হয়।" ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল, অপূর্ব আত্মত্যাগে ভারতের পূর্বগগনে নতুন সূর্যের উদয় হবে।

রাত্রি ৯টা ৪৫। যুগপৎ আক্রান্ত হল রেল অক্সিলিয়ারী পুলিশের অস্ত্রাগার (নেতা লোকনাথ বল, গাড়ীর ড্রাইভার জীবন ঘোষাল), টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কেন্দ্র (নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, ড্রাইভার আনন্দ গুপ্ত) রিজার্ভ্ বাহিনীর অস্ত্রাগার (নেতা অনন্তলাল সিংহ, ড্রাইভার স্বয়ং)। গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে একটী দল ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে যায় কিন্তু সেদিন যীশুখৃষ্টের মৃত্যু দিন। সায়েবরা ঐ দিন ক্লাবে আমোদপ্রমোদ করে না। বিপ্লবীদের জানা ছিল না। গণেশ ঘোষের দলটী এসে দুঃখের সঙ্গে ক্লাবের কাহিনী সূর্য সেনকে বল্লেন। (পরে ১৯৩২-এ এই ক্লাবটী ও সভ্যদের ধ্বংস করেন বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদেদার)। উপেন ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে একটী দল ধুম স্টেশনে একটী মালগাড়ী লাইনচ্যুত করলো এবং লাঙলকোট স্টেশনে রেললাইন উপড়ে ফেলে দিলো। চট্টগ্রাম বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। একাধিক সরকারী ভবনের চূড়োয় তখন জাতীয় পতাকা উড়ছে।

সবাই একত্র জড় হয়ে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনকে গার্ড-অব্-অনার দিলো। এখানে বলা দরকার যে এই সর্বাধিনায়ক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত। বিদেশী অনুপ্রেরিত ব্যক্তিরা এদের প্রতি 'দাদাইজ্‌ম্'এর যে অভিযোগ করে সেই 'দাদাবাদের' জোরে নয়। যাই হোক, সূর্য সেন বল্লেন, "এবার আমরা চট্টগ্রাম সহর দখল করব।" সবাই তৈরী। হঠাৎ বিপর্যয়। ওয়াটার ওয়ার্কস্-এর দিক থেকে ঝাঁকেঝাঁকে মেশিনগানের গুলি আসতে লাগল। সবাই চল্লেন পাহাড়ের দিকে কয়েকজন ছাড়া; এঁরা হলেন হিমাংশু সেন (অগ্নিদগ্ধ) অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল। (চন্দননগরে টেগার্টের দলের সংগে যুদ্ধে ঘোষাল শহীদ হন)। এই ক'জন ছাড়া বাকী সবাই জড় হলেন পাহাড়ে। এই মহান অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারীদের তালিকা:

১। সূর্য সেন
২। অম্বিকা চক্রবর্তী
৩। অনন্তলাল সিংহ
৪ লোকনাথ বল
৫। নির্মল সেন
৬। গণেশ ঘোষ
৭। মধু দত্ত
৮। উপেন ভট্টাচার্য
৯। বিধু ভট্টাচার্য (মেডিকেল স্কুলের ছাত্র)
১০। নরেশ রায় — — —
১১। দেবপ্রসাদ গুপ্ত (কলেজের ছাত্র)
১২। নারায়ণ সেন (— —)
১৩। মনোরঞ্জন সেন (— —)
১৪। রজত সেন (— —)
১৫। হিমাংশু সেন (— —)
১৬। বিধু সেন (— —)

১৭। সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী (কলেজের ছাত্র)
১৮। সুবোধ চৌধুরী (— —)
১৯। শ্রীপতি চৌধুরী (— —)
২০। শশাংক দত্ত (— —)
২১। ফণীন্দ্র নন্দী (— —)
২২। অমরেন্দ্র নন্দী (— —)
২৩। সুধাংশু বসু (— —)
২৪। নিতাইপদ ঘোষ (— —)
২৫। বিনোদ চৌধুরী (— —)
২৬। সুবোধ বল (— —)
২৭। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী (— —)
২৮। মণীন্দ্র গুহ (— —)
২৯। স্বদেশ রায় (— —)
৩০। দ্বিজেন দস্তিদার (— —)
৩১। মহেন্দ্র চৌধুরী (স্কুলের ছাত্র)
৩২। কৃষ্ণ চৌধুরী (— —)
৩৩। দীপ্তিমেধা চৌধুরী (— —)
৩৪। অশ্বিনী চৌধুরী (— —)
৩৫। আনন্দ গুপ্ত (— —)
৩৬। অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার (— —)
৩৭। হেমেন্দু দস্তিদার (— —)
৩৮। প্রভাস বল (— —)
৩৯। ট্যাগরা বল (হরিগোপাল)(— —)
৪০। বিনোদ দত্ত (— —)
৪১। বনবিহারী দত্ত (— —)
৪২। পুলিন ঘোষ (— —)
৪৩। মলিন ঘোষ (— —)
৪৪। নির্মল লালা (— —)
৪৫। মতি কানুনগো (— —)
৪৬। ত্রিপুরা সেন (— —)
৪৭। ফকির সেন (— —)
৪৮। জিতেন দাশগুপ্ত (— —)
৪৯। রণধীর দাশগুপ্ত (— —)
৫০। ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায় (— —)
৫১। ভবতোষ ভট্‌চায্‌ (— —)
৫২। সুবোধ রায় (— —)
৫৩। সীতারাম বিশ্বাস (— —)
৫৪। হেমেন্দু দস্তিদার (— —)
৫৫। শান্তি নাগ (— —)
৫৬। ননীগোপাল দেব (— —)
৫৭। সুরেশ দেব (— —)
৫৮। সরোজ গুহ (— —)
৫৯। সহায়রাম দাস (— —)
৬০। সুকুমার ভৌমিক (— —)
৬১। ধীরেন দে (— —)
৬২। হরিপদ মহাজন (— —)

তখন সারা চট্টগ্রামে মানুষের অন্তরে ভৈরব রাগিনী বাজছে। কলকাতায় বিপ্লবীদের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বাংলার বাইরে সমস্ত প্রাদেশিক রাজধানীতে সরকার যত সংবাদ চাপা দেবার চেষ্টা করছেন ততই বেসরকারী সূত্রে খবর ছড়িয়ে পড়ছে; কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অবধি যতেক সামরিক ছাউনীতে ভারতীয় সেপাইরা কপাল কুঁচকে স্বগতোক্তি করছে, "একমুঠো ভেতো বাঙালী যদি চট্টগ্রাম দখল করতে পারে তাহলে আমাদের মতন পেশাদার সৈন্যরা ঐ পথে নামলে বিদেশী সরকার করবেটা কি।"

এদিকে অর্দ্ধমৃত সুধাংশু সেনকে নিয়ে অনন্ত

সিং, জীবন ঘোষাল, গণেশ ঘোষ ও আনন্দ গুপ্ত নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করার সময় প্রধান দলটী পাহাড়ের ওপরে চলে গিয়েছে। "তারপর যাহা ইতিহাস তাহা শুনে নাই কোনওকালে।" ২২শে এপ্রিল অবধি ৫৮ জন বাঙালী-যোদ্ধার সংগে বিদেশী-বাহিনী যুদ্ধ করলো কয়েক শত সৈন্য নিয়ে। জল, খাদ্য, চিকিৎসা এবং বুলেটের অভাবে বাঙালীদের যুদ্ধ বন্ধ করতে হল। নিহত:— নির্মল লালা, ট্যাগরা বল, প্রভাস বল, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, নরেশ রায়, শশাংক দত্ত, মধুসূদন দত্ত, ত্রিপুরা সেন, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, মতি কানুনগো। বিদেশীর মেশিন-গানের উত্তর দিতে পারত' একমাত্র যোদ্ধা জুলু সেন; ইনি তখন কলকাতায়।

বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করে ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় আত্ম-গোপন করলো। বহুজন গ্রেপ্তার হলেন, বহুজন খণ্ডযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলেন। মামলা আরম্ভ হল; বিদেশী সরকার মামলাটীর নাম দিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। ভারতবাসীর কাছে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অর্থ হল অভ্যুত্থান, ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের আত্ম-বলিদান।

শরৎচন্দ্র বসু চট্টগ্রামে গেলেন বিপ্লবীদের হয়ে মামলা চালাতে। গোপনে সূর্য সেনের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে তিনি যদি গোপনে দেশত্যাগ করতে চান তাহলে পাশপোর্ট ও জাহাজের ব্যবস্থা করা হবে। সূর্য সেন শরৎ বসুকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশত্যাগ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চট্টগ্রামের বুকেই রয়ে গেলেন এবং বিদেশী শাসকদের যথা-সম্ভব শাস্তি দিতে লাগলেন। তাঁরই আদেশে একাধিক ইন্‌স্‌পেক্‌টার জেনারেল অব পুলিশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও গোয়েন্দা বাঙালী বিচারের স্বাদ পেয়েছেন। এই বছর ২৩শে মার্চ লাহোরে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী হয় এবং বটুকেশ্বর দত্তের বয়স কম বলে হয় দ্বীপান্তর। ২৮-এ নভেম্বর বর্মায় থারওয়াডি বিদ্রোহের নেতা ভিক্ষু সায়াসানের ফাঁসী হয়। এবারও ভারত নীরব।

১৯৩৩-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফর নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় গৈরলা গ্রামে সূর্য সেন গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪-এর ১২ই জানুয়ারী পুলিশ সুপার হিক্‌স্ ও সহকারী সুপার স্প্রিংফিল্ড এই মহানায়ক আর তারকেশ্বর দস্তিদারকে বুটের লাথি মারতে মারতে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড় করান। মিলিটারী ইন্‌টেলিজেন্স অফিসার স্টিভেন্সন দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন। ডেপুটী জেলার নীলমণি মুখার্জি সূর্য সেনের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু সায়েবের সামনে মুখ খোলার মুরোদ ছিল না। রাত বারোটার কিছু পরে এই জঘন্য প্রহসন শেষ হল। ফাঁসীতে দুই রুদ্রপ্রাণ বিপ্লবী আত্মদান করলেন। এদের শবদেহ নিয়ে বিদেশী সরকার কি করেছেন সেটা আজও কেউ জানে না।

চেকোশ্লোভ্যাকিয়ার পতনের সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"রক্তরাঙা ভাঙনধরা পথে,
দুর্গমেরে পেরুতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরাণ দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।"

"Along the road full of pitfalls,
Slippery with blood,
You have to drive
the all Conquring Chariot
and build bridges with Your lives."

সূর্য সেন ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুচর পরাণ দিয়ে সেতু বেঁধে দিলেন যার ওপর দিয়ে বাংলাভাষী মানুষ কাপুরুষতার পংকশয্যা থেকে দুঃসাহসিকতার মালভূমিতে উপনীত হল। বাঙালী অভ্যুত্থানের এই প্রথম কিস্তি। বাকী পনেরো আনা পূর্ণ হল মহান মুজিবের নেতৃত্বে, ১৯৭১-এ। সারা জগৎ দেখলো বাঙালী জাতির সার্বিক অভ্যুদয়।

ইতিহাসের কোনও দান হারিয়ে যায়। দেশবন্ধু এলেন বংগবন্ধুরূপে, সুভাষের 'জয় হিন্দ' প্রতিধ্বনিত হল 'জয় বাংলা' রণহুংকারে, সূর্য সেনের জাতীয় অভ্যুত্থানের স্বপ্ন মূর্ত হ'ল মুক্তি-বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধে।

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ

কিভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো ও পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের স্বার্থে কাজ করুন। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ৯—৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

বাহার একটি গরুর নাম

অন্নদামোহন বাগচী

বাহারকে নিয়ে বেজায় মুস্কিলে পড়েছে কায়ুম। পাঁচ বছর বয়স হতে চলল, অথচ আজ পর্যন্ত ওকে একটা দিনের জন্যও লাঙ্গলে জোতা গেলনা। এদিকে দেখ—কী স্বাস্থ্য! ছুদণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। বুক, পিঠ, গা, গড়ন নিটোল; মাছিটা পর্যন্ত বসলে পিছলে যায়। সাদা, কালো আর খয়েরি রঙ মিশিয়ে কেউ যেন ওর গায়ে আলপনা এঁকে দিয়েছে। আর তার জন্যই ওর নাম হয়েছে বাহার। নামটা দিয়েছে কায়ুমের পাঁচ বছরের ছেলে কাহার। বয়সের দিক দিয়ে উভয়ে সমবয়সী। আর ভাবও দুজনের মধ্যে খুবই। একজন এঁড়ে গরু, আর একজন মানব-সন্তান। একজন কথা বলতে পারে, আর একজন তার দুই চোখের বোবা চাহনি মেলে তা সহজেই বুঝতে পারে। দুজনের মধ্যে তাই এত মিল—এত মিত্রতা। কাহার বাহারকে ডাকে মিতে। বাহার ঐ ডাক শুনে সাড়া দেয়, ছুটে কাছে আসে, আদর করে গা চেটে দেয়। কেউ কাহারকে শিখিয়ে দেয়নি। হয়তো নিজের নামের সাথে বাহারের নামের ধ্বনিগত খানিকটা মিল দেখে, সে নিজের মন থেকেই মিতালি পাতিয়ে বসেছে।

কাহারের সারাটা দিন কাটে বাহারের সাথে খেলা করে, ওর পিঠে চড়ে, ওকে নিজে হাতে খাইয়ে। নাওয়া-খাওয়ার সময় রশিদা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় গোয়ালবাড়ি থেকে। খেয়ে-দেয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে উঠেই কাহার আবার ছুটে যায় গোয়ালবাড়িতে। বাহারও বুঝি ঐ সময়টাতে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কাহারের পায়ের শব্দ শোনার জন্য, দূর থেকে উলঙ্গ কাহারকে মুড়ির কাঁসি হাতে আসতে দেখে, বাহার আনন্দে হাম্বা বলে বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। কাহার দু-চার গাল মুড়ি গালে ফেলেই, কাঁসিটা এগিয়ে ধরে বাহারের মুখের সামনে। ঐ স্নেহের দান সে তার রসালো মোটা জিভ দিয়ে একবারেই সাবড়ে দেয় সবটা। কাহার খুব খুশী। কিন্তু খুশী হতে পারেনা —গোয়ালবাড়ির রাখাল ছোঁড়া আমিন। সে গিয়ে নালিশ জানায় কায়ুমের কাছে: জানেন চাচা-মিঞা, আজ না—বাহার করেছে কী—কাহার ভাইয়ের হাত থেকে সব মুড়ি কেড়েকুড়ে খেয়ে নিয়েছে।

কায়ুম ভেতে-পুড়ে কেবলই মাঠ থেকে এসেছে, বাহারের এই বেয়াদপির কথা কানে যেতেই সে রেগে মেগে ছুটে এসে হাতের লাঠি দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি পিটোতে শুরু করল। হারামজাদার আস্পর্দ্ধা দিনকার দিন বেড়ে যাচ্ছে, ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খায় রাক্ষসটা। বাহার তার বোবা

চোখের সজল চাহনি মেলে বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়! কিন্তু কাহার দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে, বাপের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে তেড়ে গিয়ে প্রশ্ন করে: ওকে মারছ কেন আব্বা? কী করেছে ও?

: করে নি? রাগে কাঁপতে কাঁপতে কায়ুম বলে

: তোর হাত থেকে মুড়ি কেড়ে খায়নি রাক্ষসটা?

: কে···কে বলেছে তোমাকে? তুমি নিজে চোখে দেখেছ খেতে?

কাহারের চোটপাটে ঝিমিয়ে পড়ে কায়ুমের গলা-

: খায় নি?

: না। আমি তো নিজে থেকেই দিয়েছি ওকে। ও অমন লুভিষ্টি না!

কায়ুম মুন্সি বাদী আমিনকে আর খুঁজে পায়না। সে কোন ফাঁকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়েছে। এমনি করেই দিনের পর দিন বেড়ে উঠতে থাকে দুইটি প্রাণীর মধ্যে অসম-বন্ধুত্ব। মানুষ আর গরুর মিতালি!

কাহার খোদার ফজলে পাঁচ বছরে পা দিল। এবারে হাতে-খড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। একটু-আধটু পড়াশুনা না করলে লোকে বলবে কী? লম্বা জোব্বা পরা, আর মেহেদি দিয়ে রাঙানো এক মুখ দাড়ির জঙ্গল নিয়ে, মক্তবের মৌলভী রোকোনুদ্দিন সাহেব এক শুক্রবারের জুম্মার নামাজ বাদে এসে হাজির হল কাহারের হাতেখড়ি দিতে। কাহারকে জোর করে নতুন জামা প্যান্ট পরিয়ে, চোখে কাজল দিয়ে, দিব্যি ফিটফাট সাজিয়ে গুছিয়ে এনে বসিয়ে দেওয়া হল—মৌলভীর সামনে। মৌলভী চঞ্চল ছাত্রের একখানা হাত চেপে ধরে সামনের খোলা কেতাবের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল: বল বেটা, আমার সাথে গলা মিলিয়ে বল—আলেপ, বে, পে, তে—

: হাত ছাড়, আমি পড়ব না।

: ছিঃ বেটা, ও কী কথা! লেখাপড়া না শিখলে আল্লাতালা তার বান্দাকে পেয়ার করেনা।

: না করে—না করুক, হাত ছেড়ে দাও বলছি।

: ছিঃ। কেমন মনপছন্দ ছড়া বলছি শুন। লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।

: গাড়ীতে না চড়লে আমার বয়ে গেছে। মিতের পিঠে চড়ে আমি সারা গাঁ ঘুরে আসতে পারি। এখন যাব—ছেড়ে দাও।···হাত ছাড় বলছি। মৌলভী রোকোনুদ্দিনেরও রোখ চেপে গেছে—ছাড়বে না, কাহারও বেপরোয়া। শেষ-মেশ গায়ের জোরে না পেরে, কাহার গেরিলা-পদ্ধতির আশ্রয় নিল। খোলা ডান হাত বাড়িয়ে খপ করে সে মৌলভীর মুখের রঙকরা একমুঠো দাড়ি ছিঁড়ে নিল। মৌলভী 'ইয়া আল্লা', 'ইয়া আল্লা' রবে চীৎকার করতে করতে ছুটে পালাল। কাহার ততক্ষণে মুঠো বোঝাই দাড়ির স্তূপ নিয়ে দে ছুট। সেইদিন থেকে তার হাতেখড়িরও খতম।

কাহারকে কাছে আসতে দেখলেই বাহার হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। কাহার অবলীলাক্রমে উঠে বসে ওর পিঠের উপরে। বাহার ওকে পিঠে তুলে নিয়েই

বেরিয়ে পড়ে মাঠের পথে। উঁচু-নীচু রাস্তায় যখন ঝাঁকুনি লাগে, তখন কাহার হাত বাড়িয়ে ওর খাড়া তড়তড়ে শিং দুটো দুই হাতে চেপে ধরে টাল সামলায়। এটা ওদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। দেখে দেখে আর কোন কূলকিনারা না পেয়ে, অবশেষে কায়ুম একদিন কাহারের অলক্ষ্যে মাঠে নিয়ে গিয়ে বাহারকে লাঙ্গলে জুড়ে দিল। আশ্চর্য। বাহার এতটুকু প্রতিবাদ করল না। দিব্যি শান্ত-শিষ্ট লক্ষ্মী ছেলেটির মত মুখ বুঁজে জোয়াল কাঁধে তুলে নিল। কায়ুম তো দেখে শুনে মহাখুশী। এই তো চাই। গরু গরুর মতই হবে! তা নয়, মানুষের ছেলের সাথে অত মেলামেশা করলেই কী আর—মানুষ হওয়া যায়!

লাঙ্গলে ওর সাথের জুড়িটা ছিল—একটা নির্জীব বলদ। বাহার লাঙ্গল কাঁধে নিয়েই সহসা মাঝমাঠ বরাবর এমন জোরে ছুট দিল যে, অন্য গরুটার ঘাড় থেকে জোয়াল খুলে গিয়ে কোথায় যে ছিটকে পড়ল। কায়ুমের হাত থেকে ছুটে গেল লাঙ্গলের মুঠি। মনের আক্রোশে খোলামাঠে কাহারের নজর এড়িয়ে এতদিনের ঝাল মিটিয়ে খুব খানিকটা এলোপাতাড়ি পিটিয়ে নিয়ে অবশেষে শান্ত হল কায়ুম। আর সেইদিন থেকে কাহারের অক্ষর পরিচয়ের হাতেখড়ির মত—বাহারের কৃষিচর্চারও খতম। তখন আর পায় কে? দুই বন্ধুর অবাধ মিলন, অবাধ স্বাধীনতা! আমিন যখন জাব দেয় সব গরুকে, কাহার কাছে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে হুকুম করে: এই মিতেকে আরও দে। ওতে ওর পেট ভরবে না। আমিন বিনা প্রতিবাদে এই ক্ষুদে মনিবের হুকুম তামিল করে। সে জানে—ওর হুকুম মত কাজ না করলে ঐ বিচ্ছুটা হয়তো ছুটে এসে ওর হাতেই কামড় বসিয়ে দেবে। অমন যে মক্তবের মৌলভী, তার দুর্দশাটা সে তো নিজের চোখেই দেখেছে।

হায় আল্লা! কী তার দাপাদাপি আর চিল্লাচিল্লি! সময়ে সময়ে কাহার মিতার জন্য নিজে হাতে বাড়ীর সব তরি-তরকারীর খোসা আর ঐ সাথে লুকিয়ে আস্ত কিছু শাক-শব্জি বা ফলপাকুড়, এনে তাকে খাওয়াতে বসে। মিতাও চোখ বুজে বন্ধুর হাতের এই স্নেহের দানের সৎকারে মন দেয়।

কয়দিন থেকে কাহার লক্ষ্য করছে, কোথাকার কে একটা উট্‌কো লোক প্রায়ই আসছে তার আব্বার কাছে। প্রায়ই দুজনে গোয়াল বাড়ীর নির্জনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে। সে কাছে গেলে আব্বা চোখের ইশারা করে কথা থামিয়ে ফেলে, বা জোরে জোরে অন্য সব আজেবাজে কথা বলতে শুরু করে। অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যাপারটা কিছুই তখন বুঝতে পারে না। কিন্তু সেই রাতেই সে সব শুনল, সব বুঝল।

সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে কায়ুম রশিদাকে বলল: আকবর দালালটা বড্ড পেছনে লেগেছে দিনরাত ঘুর ঘুর করছে। কী করি বলতো?

: কেন, কী হয়েছে?

: বাহারকে ওর ভারি পছন্দ। তিন কুড়ি টাকা দাম দিতে চাচ্ছে। ভেবে দেখলাম—ঐ অকর্মার ঢেঁকিটাকে রেখে আমার কী ফয়দা উঠবে? খালি খালি বসিয়ে খাওয়ানো, আর সেও চাড্ডিখানি নয়। তিনটে গরুর জাব—ও এক।

খায়। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে তাই—রাজী হয়ে গেলাম। রশিদা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মৃদুকণ্ঠে বলল—

: কাজটা কী ভাল হ'ল? কাহার আমার দিনরাত ওকে নিয়েই থাকে। ওর ভালবাসার জিনিষ—

চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল কায়ুম: ঐ পর্যন্তই। আধাপয়সার উপকারের আশা নেই। খালি বসে বসে খাওয়া আর গতর বাড়ানো। একদিন লালচে জুতে আমার বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে হারামজাদা।

বিষণ্ণ গলায় রশিদা বলল: সবাই কী আর সমান হয়? কাহার আমাদের খোদার দেওয়া একমাত্র ধন। ওটা তারই মিতে, ওর বড় পেয়ারের জিনিষ। আর তা ছাড়া দুটিতে —এক বয়সী! আর মিলজুলও খুব। ওকে কশাইয়ের দালালে নিয়ে যাবে—

: অতশত দেখলে চলে না। টাকাটাও তো আর হেলাফেলার নয়। হাটে, বাজারে কোন্ গেরস্ত দেবে ওর জন্য তিনকুড়ি টাকা? ওর গতরের গোস্ত দেখেই তো অতো দাম:

উঃ। বলে রশিদা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। কায়ুম চুপ করে গেল। আড় হয়ে পড়ে থেকে সব শুনল কাহার। মনে মনে বলল—দাঁড়াও বেচাচ্ছি। কাল থেকে মিতেকে গোয়াল থেকে এনে বাড়ীর উঠোনে লেবুগাছটার নীচে বেঁধে রাখব। আর লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দেব। দেখি—কার সাধ্যি ওর দড়ি ধরে ওকে নিয়ে যায়—আমার সামনে থেকে? লাঠি হাতে পাগড়ি মাথায় ঐ দালালটাকে দেখতে পেলেই ইট মেরে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেব।

এই সব মতলব মনে মনে আঁটতে আঁটতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল কাহার। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সে ছুটে গেল গোয়াল-বাড়ীতে। সব গরুই আছে, কিন্তু কাহার কই? বুকের মধ্যে তার হ্যাঁৎ করে উঠল। পাগলের মত সে 'মিতে' 'মিতে' বলে ডাকতে ডাকতে চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল। রাখাল ছোঁড়া আমিন তখনও আসেনি। কাকে সে জিজ্ঞেস করবে মিতের খবর? সে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল বাড়ীতে। কায়ুম মিঞা সবে মাত্র একটা নিমের দাঁতন মুখে পুরে বদনা হাতে মাঠের পথে পা বাড়িয়েছে, কাহার দৌড়ে এসে দুই হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠল: আব্বা, আমার কাহার কই? আমার মিতেকে দেখছিনে কেন গোয়ালে?

* * * * *

কাহারের গলার দড়ি টেনে ধরে, হাতের লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে একরকম টেনে হিঁচড়ে অন্ধকার পথ ধরে তাকে নিয়ে চলেছে আকবর বেপারী। গরুটা বড্ড তেজী আর বেজায় গোঁয়ার। বেশী টানাটানি করলে চোখ বড় বড় করে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসতে চায়। গরুটা যে এতবড় হারামী তা সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। পারলে সঙ্গে আরও একজন লোক আনতো। পিটিয়ে ওর বদমায়েশী ঠাণ্ডা করে দিত দু'জনে মিলে। এদিকে পুব আকাশের জমাট অন্ধকারটা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চারদিক

ফর্সা হয়ে যাবে। ভোর হবার আগেই তাকে মাল পৌঁছে দিতে হবে হানিফ কশাইয়ের হাতে। ষাট টাকায় কিনে আশি টাকায় বিক্রী। হাতে হাতে নগদ কুড়ি টাকা লাভ। এখনও প্রায় এক ক্রোশ পথ। একটু পা চালিয়ে যেতে হবে। পর পর কয়েকটা নির্মম লাঠির আঘাত হানল আকবর—বাহারের মাছি-পিছলানো নশ্বণ পিঠের উপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ছুটালো ওর বাপ-মাকে উদ্দেশ করে।.....

অনেক মারধোর আর টানা-হিঁচড়া করে অবশেষে কোনমতে সে এসে' পৌঁছুল হানিফ কশাইয়ের বাড়ীর দরজায়। তখন সদ্য জবাই করা একটা গরুর গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছিল হানিফ। আকবরের ডাক শুনে সে রক্তমাখা চাকু হাতেই দোর খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর সামনে দাঁড়ানো বাহারকে এক ঝলক দেখেই তার লোভের চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল: সাবাস দোস্ত, বহুত উমদা মাল। চাকুটা বাঁ হাতে নিয়ে সে ডান হাত দিয়ে বাহারের বুকে পিঠে পরপর জোরে কয়েকটা থাবা মেরে মনে মনে গোস্তর একটা হিসাব করে নিল তারপর বাহারের গলার দড়িটা আকবরের হাত থেকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল: তুমি একটু দাঁড়াও দোস্ত। একে ভেতরে বেঁধে রেখে তোমার টাকা এনে দিচ্ছি।.... চা খাবে?

: সারারাত জাগা, পেলে তো ভালই হয়।

: ঠিক আছে। চা আর টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাহারের গলার দড়ি ধরে শক্ত হাতে টানলে হানিফ। কিন্তু বাহার যেন শক্ত খুঁটি—হেলানো কঠিন। ওর অবচেতন মন এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে এখানকার ব্যাপার-স্যাপারগুলো। হানিফের হাতের রক্তমাখা চাকু, তার গায়ের গন্ধ, আর ভেতর থেকে ভোরের বাতাসে ভেসে আসা সদ্য-নিহত গরুর রক্তের গন্ধ, সব মিলে-মিসে এক নিমেষে কে যে তার জড় পশুসত্তাকে ভিতর থেকে প্রবল বেগে আলোড়িত করে তুললো। হানিফ আর একবার আরও কড়া হাতে গলার দড়িতে হেঁচকা টান মারলো। বেয়াদপ পক্ষ তবুও একচুল নড়েনা। সে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল: এ শালা বড় হারামী দেখছি। সমুন্দিকে আজই কোতল করব।

পা দিয়ে সে জোরে-সোরে বাহারের পেটে এক লাথি মারল। আর যায় কোথায়? দুই চোখ বড় বড় করে, নাক ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে মত্তমাতঙ্গের মত সামনের দুই পা উঁচু করে করে লাফিয়ে উঠল বাহার। পরক্ষণেই ঐ পা দিয়ে সে ঝেড়ে লাথি মারল—হানিফের তলপেটে। এতটার জন্য হানিফ বা আকবর কেউই প্রস্তুত ছিল না। 'আরে বাপ' বলে একটা আর্তচীৎকার করে উঠেই হানিফ চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে তার হাতে ধরা চাকুটা অতর্কিতে খপ্ করে বিঁধে গেল তার বুকের বাঁ পাশে। একটা মর্মভেদী আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার অন্তিম কণ্ঠ থেকে।.....

এবারে পিছন দিকে তাকাল বাহার তার ক্রুদ্ধ চোখের একজোড়া জ্বলন্ত চাহনি মেলে।

তার দৃষ্টি ঠিকরে গিয়ে পড়ল সামনে দাঁড়ানো পাগড়ি মাথায় লাঠি হাতে আকবরের মুখের উপরে। তারই চোখের সামনে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে যেতে দেখে আকবরের সমস্ত শরীর তখন ভয়ে আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। এখন সে কী করবে? এই মুহূর্তে এখানে তার উপস্থিতি—তার বিরুদ্ধে হত্যার কোন সন্দেহজনক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে কী না—, আর হলেই বা—আত্মপক্ষ সমর্থনে গরুতে হত্যা করেছে বললে সেটা অন্যের কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবে, এই সব জটিল চিন্তার জট খুলতে সে তখন প্রায় দিশেহারা, আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল বাহারের এক জোড়া লাল চোখ, আর কানে গেল তার নাকের ফোঁস ফোঁস শব্দ। হায় খোদা, এবারে ঐ বেয়াদপ বেতমিজ এঁড়েটার লক্ষ্য কী তবে সে নিজেই? আর সে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে সোজা দৌড় লাগাল—সামনের পথ ধরে। কিন্তু তার সাধ্য কী দৌড় প্রতিযোগিতায় সে বাহারকে হারিয়ে দেয়। বন্ধন মুক্ত বাহার এখন অকুতোভয়—বেপরোয়া। এবার সে তার রণকৌশল পরিবর্তন করলো। সম্মুখ সমরের বদলে গেরিলাপদ্ধতি। সে মাথা নীচু করে ক্ষিপ্র বেগে ছুটে গিয়ে ধাবমান আকবর বেপারীর পিঠে তার ছুটো তরতরে ধারালো শিং দিয়ে সজোরে ঢু মারল। পিঠ ফুটো হয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের প্রবাহ ছুটলো। আর ঐ থৈ থৈ রক্তের মধ্যে আকবর একটা কাটা গাছের মত মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পথের উপরে। বাহার আর কোন দিকে না তাকিয়ে আকবরের অচৈতন্য দেহটাকে চারটি পায়ের নির্মম আঘাতে মাড়িয়ে দিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে সামনের দিকে ছুটে চলল—লেজ উঁচু করে।

* * *

কায়ুম আর রশিদা দু'জনের কেউই সারা রাতের মধ্যে চোখে পাতা দেয়নি। দু'জনেরই দু'জোড়া রাত-জাগা চোখ জুড়ে রাজ্যের উদ্বেগ আর আশংকা। অনেক রাতে সহসা কাহার ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে বাহার···বাহার কই? আমার মিতে? কোথায় গেল সে? এখনি এনে দাও তাকে। ঐ চীৎকারে দু'জনেই ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। রশিদা ছেলের উন্মত্ত আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে আবিষ্কার করল যে কাহার পরিপূর্ণ অজ্ঞান, আর প্রবল জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। অমঙ্গল আশংকায় সে ডুকরে কেঁদে উঠে। কায়ুম ততোধিক বিভ্রান্ত। এত রাতে কোথায় কী করবে—কিছুই ভেবে পায়না। তখন উভয়ে পরামর্শ করে মাথায় জল ঢালতে লাগল। বিকারের ঘোরে বহুক্ষণ দাপাদাপি করে—অবশেষে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল কাহার। ···সারাটা দুপুর আচ্ছন্নভাবের মধ্যেই কেটে গেল। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠে, আবোল তাবোল বলে। আবার নিঃঝুম মেরে যায়। মাথায় জল ঢালার কামাই নেই ····কায়ুম আর রশিদা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে সমানে মাথার কাছে বসে আছে। রশিদার দুই চোখে অবিরল অশ্রুর ধারা, আর কায়ুমের অন্তর জুড়ে অনুশোচনার দাবানল।···

সহসা খাঁ খাঁ দুপুরের নিঃসীম নিস্তব্ধতা ভেদ করে গোয়াল বাড়ীর দিক থেকে একটা একটানা

হাম্বা রব ছুটে এসে এই ঘরের চার দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল। দুজনে একই সাথে চমকে উঠল। বড় চেনা চেনা গলা। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। পরমুহূর্তে আবার হাম্বা রব। এবারে আরও জোরে, আরও কাছে। সহসা চমকে উঠে চোখ মেলে তাকাল কাহার। পরক্ষণেই উঠে বসতে গেল: মিতে··· মিতে ডাকছে। আমি যাই। কায়ুম আর রশিদা তাকে চেপে ধরে রাখতে পারে না—এত জোর।

রশিদা কেঁদে বলে: লক্ষ্মীবাপ আমার, এই কাহিল শরীরে উঠিস্‌নে। আমরা দেখছি—রুখে উঠল কাহার: আমি বলছি মিতে ডাকছে। আমি চিনিনে ওর গলা?

রশিদা তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দিল।

: হায় খোদা, সে কী আর আছে! কায়ুম ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অল্পক্ষণ পরে বাহারের গলার দড়ি ধরে উঠোনে দাঁড়িয়ে সহর্ষে বলল: ওগো শুনছ, কাণ্ড দেখ, সত্যি সত্যি ও ফিরে এসেছে।

কিন্তু শিং দুটো রক্তে একেবারে মাখামাখি। ভাবছি—এল কী করে?

কাহার ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে বসেছে বিছানার উপরে। কপালে অসংখ্য মুক্তাবিন্দুর মত ঘাম চিকচিক করছে। শংকিতা রশিদা ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত দিল—খোদার দোয়ায় জ্বর ছেড়ে গেছে। মনে মনে খোদার দরগায় সে সিন্নি মানত করল। মেহেরবান খোদা, আমার হাজার সালাম নাও। তোমার দয়ায় আমার কাহার ভাল হয়ে বিছানায় উঠে বসেছে। ওর মিতে ভালয় ভালয় ফিরে এসেছে। আর ভয় নেই।···খোদা হাফেজ।····

With best Compliments from :

BOOK STALL

Serampore Railway Station

E. Railway

UP & DN Platform

Authorised Railway Contractor :

SRI ASHOKA JAIN

কাছে-দূরে

বিজনকুমার ঘোষ

সময় দেওয়া ছিল ছ'টা। স্থান পড়িয়াহাটার মোড়। ট্রাম বাসের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সমীরের সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। প্রীতি একটা জমকালো কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। সমীর একটু হেসে এগিয়ে গেল, সরি—

প্রীতি অন্য দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, খুব হয়েছে!

—রাগ করেছ? তা কি করব বল, বেহালার ট্রাম-বাসের যা হাল।

—যাদবপুরের বাসের হালও খুব সুবিধের নয়।

—আহা, তোমরা হ'লে কলকাতার লোক। ভিড়ের বাসে-ট্রামে আমি উঠতেই পারিনে। একটু কনসিডার করবে তো!

প্রীতি এবার হেসে ফেলল। বলল, ঠিক আছে, কনসিডার করলাম। এবার চল কোথাও যাওয়া যাক্। তুমি জান না হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে একটা মেয়ের কত অসুবিধা হয়!

—তার উপর সে মেয়েটি যদি সুন্দরী হয়।—সমীর হাসল।

প্রীতি চোখের মণিতে অপরূপ ঝলক দিল।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে একটা অভিজাত রেস্টুরেন্টে উঠে এল ওরা। বেয়ারা মৌঘলাই কায়দায় কুর্ণিশ করল। বাইরে চেয়ার-টেবিলে বসলে খাবার-দাবারের দাম একটু সস্তা পড়ে। ভিতরটা এয়ার কণ্ডিশনড্। সেখানে সব জিনিসের দাম চড়ে যাবে। প্রীতির ইচ্ছে ছিল বারান্দায় বসে। সন্ধ্যার রূপসী কলকাতা দেখতে দেখতে কফির কাপে চুমুক দেয়। কিন্তু সমীর সে ছেলেই কি না! টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর একরাশ খাবারের অর্ডার। প্রীতি চোখ পাকিয়ে বলল, এতো দশজনের খাবার! কে খাবে এত?

সমীর বলল, কেন, তুমি খাবে আমি খাব।

—তবেই হয়েছে! তোমার সাথে বিয়ে হলে কপালে অনেক দুঃখ আছে।

—কেন?

—সাত দিনেই মাসের মাইনে ফুরিয়ে ফেলবে।

প্রীতির ভীতির কথা শুনে সমীর হো-হো করে হাসল। বলল, ট্রেনিং শেষ হতে আর বছর খানেক। তারপর এত মাইনে দেবে যে এক মাসেরটা ফুরাতে দু'মাস লেগে যাবে।

—তাই নাকি?—প্রীতি মিষ্টি করে হাসল।

কিন্তু দেখা গেল প্রীতির কথাই সত্যি। লতা-

পাতা আঁকা চমৎকার ডিসে প্রচুর খাবার পড়ে রইল। অকারণে জিনিস নষ্ট প্রীতির সহ্য হয় না। তাই সুযোগটা ছাড়ল না। বলল, দেখলে তো, যতই পাশ উড়িয়ে তুমি দেবেই।

—ঠিক আছে, মাইনে পেয়েই তোমার হাতে দিয়ে দেব।

—মনে থাকবে তো?

— নিশ্চয়ই।

এরপর আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার আশায় ওরা লেকের দিকে হাঁটতে লাগল।

সময় বেশি নেই। অফিসার্স ট্রেনিং কোর্সে যোগ দিতে দু' মাস আগে সমীর হায়দ্রাবাদ গিয়েছিল। ছাত্র হিসেবে ভাল, আবার উচ্চাভিলাষীও। কিছু দিন দিল্লীতে একটা বড় ফার্মে চাকরী করেছে। সমীরের ভবিষ্যৎ যাকে বলে সোনা দিয়ে বাঁধানো। দিন কয়েকের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিল। পরশু দিনই আবার হায়দ্রাবাদ চলে যাবে। তাই যতটুকু কাছে পাওয়া যায়।

লেকের ওপারটা একেবারে নিঝুম। অন্ধকার। লোকজনের চলাচল নেই। আর দু'দিন বাদেই কলকাতা উৎসবের সাজে সাজবে। শরৎ কাল। দোকানে দোকানে আলোর বাহার। শো-কেশে দামী দামী শাড়ি কেবলই হাতছানি দিচ্ছে। ফুটপাথে হকারদের তারস্বরে চিৎকার। সে সব ফেলে কে এই নিঝুম অন্ধকারের মধ্যে কাব্যি করতে আসবে।

ফুরফুরে একটা মধুর গা জুড়োনো বাতাস পুরোনো দিনের পঙ্কজ মল্লিক মুখে নিয়ে উড়ে আসছে। 'প্রভু আঁধার পারাপারে ফোটাও আলোর শতদল'—হয়ত রেল-লাইনের ওপারে কোথাও মাইক বাজছে। জলের খুব কাছে একটা নিরালা বেঞ্চে সমীর আর প্রীতি বসল, পাশাপাশি। অবসর-প্রাপ্ত বুড়োদের মিটিং অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। রোয়িং করতে কয়তে দুটি যুবক এদিকে এসে পড়েছিল। জল ছুঁয়েই পরক্ষণে হারিয়ে গেল। প্রীতি বলল, তুমি চিঠির উত্তর বড় দেরী করে দাও। সবটাতেই তোমার লেট—

সমীর বলতে যাবে মোটেই না, কিন্তু তার আগেই ঘাড়ে কার গরম নিঃশ্বাস পড়ল। সমীর আর প্রীতি দু'জনেই এক সঙ্গে চমকে ফিরে তাকাল। বুকটা হিম হয়ে গেল নিমেষে। বিভৎস চেহারার একটা লোক ঝুঁকে আছে। বুকের সব কটা হাড়ই গোণা যাচ্ছে। চোখের গর্তে কিছু নেই—শূন্য। উঃ মা-গো—বলে চিৎকার করে উঠল প্রীতি। সমীর দাঁড়িয়ে উঠে হুঙ্কার দিল, গেট আউট রাস্কেল, আভি নিকালো—

লোকটা তবু দাঁড়িয়ে। চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই। প্রীতি সমীরের হাত ধরল, চল আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বসি। ভাল লাগছে না—

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে এগিয়ে গেল। জলের ধারে বকুল গাছের নিচে পাথরে বসল। জোনাকি জ্বলছে চার দিকে। অনেক দূরের ছুটন্ত লাইট পাখিদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, কারও মুখে কথা নেই। মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছে লোকটা। এক সময় বিরক্তি প্রকাশ করল সমীর, কোথাও একটু

নিশ্চিন্তে বসার উপায় নেই। ভিথিরীতে দেশটা ছেয়ে গেছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল প্রীতি। সেই পাটকাঠির মত লোকটা ফের গরম নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রীতি প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, সমীর ধরল। এত বিচ্ছিরী অবস্থার মধ্যে বেচারা কখনো পড়েনি। আজ সন্ধ্যাটাই মাটি। এক মুহূর্ত আর লেকের পারে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ভাগ্য ভাল, কোন রকমে সাদার্ণ এভেনিউতে এসে পৌঁছুতেই একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেল।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। বৌদি দু'বার চা এনেছিল। তৃতীয় বারে মা গায়ে হাত দিলেন, বাবা সমু ওঠ, কি হয়েছে তোর ?

ধড়মড় করে উঠে বসল সমীর। এত বেলা ? রোদ কখন মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। লজ্জা পেল। বৌদির হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। এমন কখনো হয় না। মা'কে তাই আশ্বস্ত করতে হল, না মা, কিছুই হয়নি।

বৌদি ফুট কাটল, ঠিক বলছ তো ?

—কেন ?

—না মানে, কাল যে ভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত ট্যাক্সি থেকে নামলে।

সমীর শব্দ করে হাসল, তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি, সেই জন্যে—

বৌদির কথাটা বিশ্বাস হ'ল না। তবে সমীরের দাদার অফিসের তাড়া থাকায় বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও পারল না। কাল প্রীতিকে পৌঁছে দিয়ে ওই ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরে আসে। সত্যি মেজাজটাই তিরিক্‌খে হয়ে গিয়েছিল। নির্জনে একটা চুমু খাওয়ারও ফুরসত মেলেনি।

হঠাৎ খবরের কাগজে একটা ছোট হেডিংয়ের দিকে নজর গেল। লেকের পারে মৃত দেহ। স্টাফ রিপোর্টার। সমীর খবরটা দ্রুত পড়ে গেল। স্টাফ রিপোর্টার লিখছে: গত মঙ্গলবার ঢাকুরিয়া লেকের দক্ষিণে জলের ধার ঘেঁসে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়! বয়স আনুমানিক ষাট। দেহের কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। অনাহারজনিত মৃত্যু বলে পুলিশের ধারণা। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়। তদন্ত চলছে।

সমীরের মনে পড়ল নতুন টাইম টেবিলে ট্রেনের সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে এসেছে। বাথরুম থেকে এসে সুটকেসটা গুছোতে বসল: হায়দ্রাবাদ শহরে বিশাল ওসমান সাগরের পাশে ওদের স্টাফ কলেজ হোস্টেল। ছবির মত দেখতে জায়গাটা। চারদিকে লাল গোলাপের মস্ত বড় বাগান। হঠাৎ চমকে উঠল সমীর। খেতে না পাওয়া লোকটা কি অত দূরেও উঁকি দেবে ?

কবন্ধের মুখ

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

সর্বাঙ্গ ঘামে জবজবে। জিভে নোনা নোনা স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। সামনের দম্পত্তির (সম্ভবতঃ নূতন) অবস্থাও আমারই মত। বিশেষ স্বাস্থ্যবতী ফর্সা বউটির মুখ ও দেহের জামায় ঘামের অস্তিত্ব উৎকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। ওর চওড়া করে পরা সিঁথি ও কপালের সিঁদুর থেবরে-টেবড়ে একাকার। লাল তরল রেখা ওর কপাল ও মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে গলার উপর দিয়ে জামার ভেতরে প্রবেশ করছে। প্রবহমান রক্তিম ধারা ওর মুখটাকে বিশ্রী রকম রাঙা করে তুলেছে।

ভাদ্রমাসে থার্ড ক্লাস (থুড়ি সেকেণ্ড ক্লাস) এ যাত্রা করবার সুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে উপভোগ করছি। এর উপর আছে বেকার ভাই-বেরাদরদের শ্রীহস্তের কর্মকৌশলের জলন্ত নিদর্শন। মাথার উপরের পাখাগুলি হাওয়া হওয়াতে প্রায় বিনি পয়সার সুখটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়ে রয়েছি।

'এই যে দাদারা—' কর্কশ গলার চীৎকারে চমকে চাই। ফিরিওয়ালা।

'এই যে দাদারা, শুয়োরের বাচ্চারা—'

অ্যাঁ। এই গরমে মেজাজ এমনিই বেশ খাসা হয়ে আছে তার উপর খামোখা ফিরিওয়ালার গালাগাল। আশেপাশে সবার ভুরু কুঁচকে উঠেছে। দুয়েকটা ছোঁড়া জামার আস্তিনও গোটাচ্ছে যেন। ফিরিওয়ালা কিন্তু নিরুদ্বেগে বলে চলেছে —এই যে দাদারা—শুয়োরের বাচ্চারা—কুকুরের বাচ্চারা—গাধাদের বাচ্চারা—'

চক্ষু আমাদের ছানা-বড়া।

'কিম্বা মানুষের বাচ্চারা—এরা কেউ যদি পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পায় তবে এই তিনটি বটিকাতেই একেবারে—'

সবার টেরা-বেঁকা ঘাম-গড়ানো মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কয়েকটা ছোকরা যারা বোধ করি আস্তিন গোটাচ্ছিল হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে লাগল।

—হাঁ মশাই, শুয়োর কুকুর মানুষের বাচ্চাদের জন্যই কেবল বটিকা? তাদের বাপ-দাদাদের জন্য নেই কিছু—ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসে ছোকরার দল।

সামনের নব বধূটির মুখে আঁচল উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওর স্বামীটি বেশ প্রয়াস করে গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছে।

—দিয়ে যান দাদা এক সিসি। বাচ্চারাও সারবে, বাপ-দাদারাও সারবে।

—নাঃ দাদা। গাঁটের পয়সা খরচ করে ও সব বড়লোকী আমাদের পোষায় না। পেটের বেদনা হলে আমরা পেট চেপে বসে থাকি।

হা হা হি হি হু হু করে ছোকরাদের হাসির কনসার্ট শুরু হয়ে যায়।

—দাদা তা বললে আমাদের পেট চলে কী করে?—ফিরিওয়ালা হাসি মুখেই বলে।

—আরে দাদা আপনারা তো তাও পথে পথে ফিরি করছেন। আমরা যে মসাই তাও পারি না। ভদ্দরলোকের ছেলে যে। বাপের হোটেলে আছি। দুদিন পরে বাপও খেদাবে।

—দাদারা গরমে বসে করুন পান—তাজা হবে শরীর, ঠাণ্ডা হবে প্রাণ।

বোতলের ঠুং ঠাং।

ফ্যান্টা—ক্যাম্পা—লিম্‌কা।

গলাটা শুকিয়ে গেছিল। একবোতল "লিম্‌কা' নিয়ে নিলাম। অনেকেই নিল। 'বেদনা উপশমে' ফিরিওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুণ গুণ করে গান গাইছিল। বলল—স্লা বটিকা হজমী লবণের ব্যবসা ছেড়ে এবার ফ্যান্টা-কোকাকোলা বেচা ধরব—ওহো, এখন তো আবার কোকাকোলা নেই। ঐ একই। সকাল থেকে বেটাচ্ছেলে একটা পয়সার মুখ দেখলাম না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে গেল মুখে গ্যাঁজলা উঠে গেল। মাখ্‌না, তুই স্লা এসেই বাজিমাৎ করলি। মাখ্‌না অর্থাৎ ফ্যান্ট-বেচা ছোঁড়াটা বলল—হ্যাঁ হে স্যাঙাত। গরমকালে তো বাজিমাৎ। আর শীতকালে। তখন স্লা পেটে কিল মেরে বসে থাক্। লোকেরটা দেখতে খুব। তোর তো তবু সব সময় সমান যায়। শীতের সময় আমার মত অন্ন ধান্দা দেখে বেড়িয়ে হয়রাণ হতে হয় না। এখন আবার এ লাইনে সব ব্যাটারা শব্বত বেচা ধরেছে। নে এখন কে কত বেচবি বেচ্। ঠাণ্ডা জল স্লা মানুষ কত খায় বল্ দেখি।

—ঠাণ্ডা জল! ফ্যান্টা-লিমকা বলে লোককে সেরেফ ঠাণ্ডা জল গেলাচ্ছিস মাইরি।

মাখ্‌না একটু থতমত খায়। তারপর বলে ওঠে—আরে ঐ একই কথা। ফ্যান্টা খেয়ে তো মানুষের পেট ভরে না।

কোনো স্টেশনে ট্রেণ দাঁড়াল। ফিরিওয়ালা দু'জন কথা কইতে কইতে নেমে যাচ্ছিল। দুজনের কথাবার্তা শুনলাম কান দিয়ে। প্রথম জন বলল—ট্রেনে হকারী করে কোনো ফয়দা নেই মাইরি।

অন্য জন—ফয়দা নেই কিরে? বিনি পয়সায় কত খেল্ দেখা যায় বল্ তো? আমার মাইরি বেস্ লাগে। পয়সা ছাড়া আর কোনো মজা নেই দুনিয়ায়?

—ঘরে যদি দশ দশটা গণগণে পেট থাকত তাহলে বুঝতি দুনিয়ার মজাটা কোথায়? সে সব ঝুট-ঝামেলা তো নেই যাদু তোমার—

—দশটা গণগণে পেট! কথাটা আঁতে ঘা দিল। নিজের পেটের চেয়েও ঐ গণগণে পেট-গুলোর জন্য মানুষের যত ভার—যত অপমান—যত গঞ্জনা।

ট্রেণের হকারদের নিয়ে কোনোদিন ভাবি নি। আজ হঠাৎ ওদের কথা মনের অনেকখানি জুড়ে বসল। ওদের সম্বন্ধে হঠাৎ আবেগময় চিন্তা মনকে আলোড়িত করে তুলল। এই যে এরা নানা চুটকী করছে—নিজে হেসে যাত্রীদের হাসাচ্ছে—এই হাসি কী ওদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে? এই হাসি বাইরের মোড়ক মাত্র। এর ভিতরে

সযত্নে ঢাকা রয়েছে কত কান্না—কত বেদনার ইতিহাস।

পরের দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের ছা-পোষা মানুষের পোষায় না। তবু হঠাৎই ফিরিওয়ালাদের জন্ম একটা ক্ষীণ বেদনা ক্ষণেকের জন্ম মনকে খোঁচা দিল।

মুড়ি ঝাল মুড়ি—

—গরমে বসে বসে হয়েছেন হয়রাণ, খান দাদারা, চাঙা হোন। টক-মিষ্টি-ঝাল। মুখরোচক। দশ পয়সায় দুটো।

নানা ফিরিওয়ালা আসছে হাঁকছে—নেমে যাচ্ছে, বেশীর ভাগেরই কিচ্ছু বিক্রিরি হচ্ছে না। ঝালমুড়ি বা চানাচুরওয়ালাদের তবু দু-পাঁচ পয়সার কাটছে। চিরুণী, ছুরি, তালা-চাবিওয়ালাদের তো কিছুই হচ্ছে না।

একজন এল কেক-পাঁউরুটী নিয়ে। তারও কিছু হ'ল না। থার্ড ক্লাসের যাত্রী দশ পয়সার ভাজা বাদাম খেয়ে পেটকে শান্ত করে যারা—তারা চার আনার কেক কিনে পনেরো পয়সা বাড়তি খরচ করবে কেন খামোখা?

আমার স্টেশন এসে গেল। নেমে পড়লাম। গেটের দিকে যেতে যেতে এক জায়গায় মৌচাকের মত এক ঝাঁক লোককে দেখে এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি, একটা লোক দু হাতে পেট চেপে প্রায় উবুড় হয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে। জটলার মধ্যে থেকে নানা প্রশ্নবাণ লোকটার উপর পড়ছে। মরার উপর খাড়ার ঘা।

একজনকে শুধোলাম—কী হয়েছে?

—পেট কামড়ানি।—নিশ্চিন্ত গলায় লোকটা বলল।

সহসা আমার চোখে পড়ল লোকটার এক পাশে ঝুড়িতে ভরা আছে পাঁউরুটী, কেক, বিস্কুট। ট্রেণের একটু পূর্বে দেখা ফিরিওয়ালা বলে মনে হচ্ছে। ভীড় ঠেলে ওর খানিকটা কাছে গেলাম। হ্যাঁ সে-ই।

রাস্তার লোকের দুঃখ দেখে বিগলিত হওয়া আদৌ আমার স্বভাব নয়। কিন্তু সেদিন কী একটা ছোট্ট পাওগোল ঘটে গেছে মনের ভেতরে। নিজেই বিস্মিত হলাম নিজের মনোভাবে।

কনুই দিয়ে, গা দিয়ে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে লোকটার পাশে গেলাম। ওর পিঠে হাত দিলাম।—কী হয়েছে ভাই?

লোকটা আমার ছোঁয়ায় চমকে উঠে চাইল। মাথা নেড়ে বলল—কিচ্ছু না।

সে খানিকটা নিজেকে সামলে নিল। মাথা তুলে সোজা হয়ে বসতে চাইল।

বললাম—চলো তোমায় ধরে নিয়ে যাই। ঐ বেঞ্চিটাতে গিয়ে শোবে চলো।

লোকটা বিস্ফারিত চোখে আমাকে দেখল খানিক। বলল—বাবু, আপনি ব্যস্ত হবেন না। এমন আমার মাঝে মাঝে হয়। এখুনি সেরে যাবে।

—'ওখানে চলো দেখি।'—আমি আদেশের গলায় বলি। আমার কথা শুনে ও আস্তে আস্তে উঠল। ঝুড়িটার দিকে হাত বাড়াল। বললাম—ওটা থাক্। আমি নোব। লোকটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল।—তা কী কখনও হয় বাবু? বলে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেঞ্চির

দিকে চলল। আমি ওকে ধরে রইলাম। ও যেন কেমন সঙ্কুচিত আড়ষ্ট হয়ে থাকল। কিন্তু কিছু আপত্তি জানাল না।

বেঞ্চিতে ধপ্ করে বসে পড়ল। বলল—ফিক্ বেদ্‌না! বড় ভোগায়।

—ডাক্তার দেখাও নি?

—ডাক্তার দেখালে পয়সা লাগে। ডক্তার বড়লোকদের জন্ত। আর ডাক্তারে কী বা করবে?

লোকটা খানিক চুপ করে থাকে। পেটে হাত দুটো চেপে রেখেছে. মাঝে মাঝে মুখটা বিকৃত হচ্ছে।

—বেদনাটা একটু কমল কী?

—কমেছে। পেটে কিছু পড়লে একদম ঠিক যায়।

—পেটে কী পড়লে?—বেফস্‌কা বলে ফেলি।

লোকটা হলদে হলদে দাঁতে একটু হাসল—দানাপানি বাবু। আর কি! সকাল পাঁচটায় বেরোই বাড়ী থেকে। এক দানা পেটে কিছু না দিয়েই। এখন কটা হ'ল বাবু—?

—দুটো? এক খুড়ি চা হয়েছে ইস্তক।

একটু বিরক্তির সঙ্গে বলি—তা সঙ্গে এত পাঁউরুটি, বিস্কুট থাকতে সকাল থেকে পেটে দানা পড়ে না কেন?

লোকটা ঝুড়ির দিকে চাইল। যেন দুটো পাথরের চোখ।

—ছোটবেলায় যখন দেশে ছিলাম—ঠাকুমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতাম। কবন্ধের কথা শুনেছিলাম। ভয় পেতাম। কল্পনায় দেখতাম মস্ত বিরাট একটা হাঁ। যেন তার দেহে হাত নেই, পা নেই মাথা নেই আছে শুধু প্রকাণ্ড কুচ্ছিৎ একটা মুখের হাঁ। সেই হাঁ-টার আছে দাউ দাউ খিদে। কেবল খাই খাই 'কী খাই' বড় বড় জন্তু মানুষ গিলে ফেলছে তবু খাই মেটে না। সেই আমার ছেলেবেলার মনের মধ্যে দেখা কবন্ধ আমারই ঘরে আছে। একটা নয়—সাত সাতটা। জলজ্যান্ত। এগুলো আবার রক্তবীজের ঝাড়। কমে না। বরং দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে। বাবু, আপনি কবন্ধ কেমন জানেন না। বড় লোকদের ঘরে কবন্ধের মুখ নেই।

লোকটা চুপ করে যায়। 'কবন্ধের মুখ' কথাটার মধ্যে একটা কেমন গা শিরশিরে ভাব আছে।

একটু থেমে লোকটা আবার বলতে শুরু করল-বাবু আপনাকে বড় কষ্ট দিলাম। আপনি যান এবার। আপনার মত লোক এদেশে আর পাঁচজন থাকত তো—তাড়াতাড়ি ওর কথা কেটে বলি—শোনো, তুমি কিছু খাও—

—এ ঝুড়ির কিচ্ছুটি ছোঁওয়া যাবে না। এটার সব জিনিস যদি বেচা যায় তবে সাত সাতটা লকলকে আগুনের কুণ্ডে কিছু তবু ফেলতে পারা যাবে। ঝুড়িটার কোনো জিনিসে যদি হাত দিতে পারতাম তাহলে কী আমার এই উটকো অসুখটা হত! একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—বেলুনে হাওয়া ভরলেই ফোলে। কী দরকার হাওয়া ভরবার। এই তো বেশ আছে।—তালি দেওয়া জামাটা তুলে ধরল সে। দেখলাম, চুপসানো বেলুনের মতই একটা পেট।

প্রচণ্ড শব্দে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে মেল্ ট্রেন ঢুকল। লোকটা স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল।

—ঐ বাবু মেল্ ট্রেন। বহুৎ দূর থেকে আসছে। মানুষের পেটে আগুন জ্বলেছে নিঘ্‌ঘাৎ। চলি বাবু। আপনার দয়া—

পেটে একটা হাত চেপে, অন্য হাতে মাথার ঝুড়িটা ধরে ছুটল সে।

মনে হ'ল এখুনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু পড় পড় হয়েও অদ্ভুত কায়দায় নিজেকে সামলে নিয়ে অস্বাভাবিক বেগে দৌড়ে মেল ট্রেন ধরতে গেল।

প্রবন্ধ

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু-সাহিত্য

সুকোমল বসু

শিশু-সাহিত্যের প্রথম পরিচয় বা আবেশ শিশু-মনে আসে ছড়ার মাধ্যমে। পৃথিবীর সব দেশের শিশুদের মনে ছড়ার একটি বিশেষ আবেদন আছে। বাঙলা সাহিত্যে অসংখ্য ছড়া ছড়িয়ে আছে এর মধ্যে অনেক ছড়ার রচয়িতার নাম পর্যন্ত আর কারুর স্মরণে নেই। তবু বংশ পরম্পরায় এই সব ছড়া মায়েদের মুখ থেকে শিশুদের আনন্দ বর্দ্ধন ক'রে চলেছে।

যেমন বলা যায়—

'ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি
চামে-কাটা মজুমদার'

অথবা

'গড় গড়ের মা লো গড় গড়ের মা
তোর গড় গড়েটা কই—
হালের গরু বাঘে খেয়েছে
পিঁপড়ে টানে মই।'

বাস্তবিক পক্ষে—'ইকড়ি মিকড়ি' বা 'গড়গড়ে' বলে কোন পদার্থ নেই—তবু এই শব্দগুলির উচ্চারণই শিশুমনে আবেশ আনবার পক্ষে যথেষ্ট।

'হাট্টিমাটিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম—
তাদের খাড়া দুটো শিং।'

হাট্টিমাটিম টিম ব'লে কোন জন্তু বা জানোয়ার নেই, তবু এই মাঠে ডিম-পাড়া খাড়া-শিঙ-ওলা জীবটি শিশুদের মনে প্রচুর কৌতুক নিয়ে আসে। তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে নিখুঁৎ বাস্তব-বোধের প্রয়োজনই নেই এই সব ছড়ায়। বরং অবাস্তবতাই এর উপাদান। আবোল-তাবোল বা Nonsense Rhyme সব দেশের ছড়ায় একটি প্রধান অঙ্গ। বাঙলা সাহিত্যে ৺সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' পুস্তকখানি এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'এখান থেকে মারলাম তীর
লাগলো কলা গাছে-
উরুৎ দিয়ে রক্ত পড়ে
চোখ গেলরে বাবা'

কিম্বা ইংরাজী ছড়ায়

Humpty dumpty sat on a wall
Humpty dumpty had a great fall.

প্রথমোক্ত ছড়ায় কলাগাছে তীর লাগলে উরুৎ দিয়ে রক্ত পড়ার কোন কারণ নেই, তার পরে চোখের উপর তার কোন প্রভাব থাকতেই পারে না। তবু এই অসংলগ্ন অসংবদ্ধ ভাবটাই ছড়াকে সুন্দর করে তুলেছে। দ্বিতীয় ছড়ার Hump dumpty হ'ল একটা 'ডিম'—পা ঝুলিয়ে ডিমটা ব'সে ছিল দেয়ালের ওপর—'হঠাৎ পা

ফস্কে একেবারে কুপোকাৎ'। এই সব ছড়ায় যুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছড়া :

'খাস্ত-বুড়ীর দিদি শাশুড়ীরা
পাঁচবোন থাকে কালনায়
শাড়ীগুলি তারা উনুনে শুকায়
হাঁড়িগুলি রাখে আলনায়।'

বাস্তবিক কতগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও সঙ্গতিহীন ভাব-সমষ্টিই হ'ল এই সব ছড়ার উপাদান ও কৌতুক। এ ছাড়া আছে ছেলে ভোলানো ছড়া যাকে ইংরাজীতে বলে Nursery Rhyme.

'খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে ?'

এই ছড়ার মধ্যে একটু বাস্তব জ্ঞানের ইঙ্গিত আছে। কারণ, বর্গীরা সত্যিই খাজনা আদায় করতো আর বুলবুলিতে সত্যিই ধান খেয়ে অনর্থ ঘটাতো। ছড়ার মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের ইঙ্গিত আরো অনেক ছড়াতেই আছে।

বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের —

'তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর পরে রাগ করো—
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত-ভেঙে—ভাগ কর—
তার বেলা ?'

এই ছড়ায় ভারত ব্যবচ্ছেদের ইঙ্গিত তো আছেই এবং এটা যে একটি বুদ্ধিহীন কাজ তারও শ্লেষ আছে ছড়াটার মধ্যে।

অন্নদাশঙ্করের আরো অনেক অপূর্ব ছড়া আছে। ছড়ার বইও আছে কয়েকটা।

বাঙলার ছড়ার ক্ষেত্রে ৺সুনির্মল বসুর অবদানও উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের উপর তিনি নানা-পত্র-পত্রিকায় মনোহারী ছড়া লিখে গেছেন। ছড়ার বইও তাঁর আছে দশ বারোখানা। তিনি যশস্বী ছড়াকার। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশী' শিশুমনের অনেক বিচিত্র খোরাক জুগিয়েছে। জীবজগতের প্রকৃতি বা জীবন-ধারণের বৈপরীত্যের যে কত সুন্দর রস সৃষ্টি করা যায়—৺যোগীন্দ্রনাথ সরকারের—

'এক যে আছে মজার দেশ-সব রকমে ভালো
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো

প্রভৃতি কবিতাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যোগীন্দ্রনাথের ছড়া :

'কোথা থেকে আসছো তুমি ছোট্ট মানুষটি
গল্প যদি বলতে পারো বল তো একটি।'

তারপর সেই ছোট্ট মানুষটি তার মেরুপ্রদেশের জীবনধারা ছড়ার মধ্যে শুনিয়ে দিল। মনটাকে টেনে নিয়ে যায় বহু দূরের রহস্য-ঘন পরিবেশে।

সত্যেন দত্তর ছড়া হ'ল খাঁটী ছড়া—এসব ছড়া শিশু ও বুড়ো সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করে।

'ই'লশে গুঁড়ি-ইলশে গুঁড়ি ইলিশ-মাছের ডিম
ইলশে গুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি-রোদ্দ্রে রিম ঝিম'।

কিম্বা :

'পাল্‌কি চলে-পালকি চলে'—জাতীয় ছড়াগুলি শুনতে যেমন মধুর—আবৃত্তি করতেও তেমনি

কৌতুককর। স্বপন বুড়ো (শ্রীঅখিল নিয়োগী) অনেক ছড়া লিখেছেন। যুগান্তর পত্রিকায় 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগে নিজের ও অন্যান্য লেখকদের ছড়া ছাপার অবদান তাঁকে সুনাম দিয়েছে। আর যাঁরা ছড়া লিখে নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুল, প্রেমেন্দ্রমিত্র, ৺নরেন্দ্র দেব, ৺কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ৺গিরিজাকুমার বসু, ৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু, গৌতম রেবতীভূষণ, হরেন ঘটক 'সবুজ সাথি', 'মৌমাছি', হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শান্তশীল দাস, ৺বুদ্ধদেব বসু তার 'লিমেরিক' জাতীয় কবিতাতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু, 'সত্যজিৎ রায়', অমিতাভ চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষও ছড়ায় তাঁদের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

এই হল মোটামুটি ছড়াকারদের পরিচয়। অবশ্যি এর থেকে কিছু নাম বাদ পড়তে পারে যা এখন স্মরণে আসছে না। এছাড়া শিশু-সাহিত্যের কবিতার ক্ষেত্র অতি বিশাল, কবিও আছেন অসংখ্য। সব সাহিত্যিকদেরই ছড়ায় লেখার দিকে ঝোঁক থাকে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তাঁদের বিদগ্ধতা ও আত্মসচেতনতা শিশুরাজ্যের লোভনীয় সামগ্রী হ'য়ে ওঠেনা। শিশু-মনের সবচেয়ে বড় জিনিষ হল কল্পনা। সেই কল্পনাকে যদি শুধু অতিবাস্তব জ্ঞান দিয়ে পীড়িত করা হয়—তা শিশু-মনের উপযোগী হতে পারে না। এবার আসা যাক শিশুদের জন্য লেখা গদ্য-সাহিত্যে।

আমাদের যুগে সবচেয়ে প্রিয় শিশু-সাহিত্যের বই ছিল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'চারু ও হারু'।

ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলির দৈত্য-দানা মনকে এমনই হানা দিতো যে রাত্রের স্বপ্নের মধ্যেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যেতো! অমন সুন্দর গল্প ও লেখকের নিজের হাতের আঁকা ছবিগুলি যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। তারপর অবনীন্দ্র নাথের 'রাজ-কাহিনী' ও 'ক্ষীরের পুতুল'। কথা বলাও যে একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে অবনীন্দ্র নাথের বইগুলিতে। ছবির তো কথাই নেই। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী শিশু মনের অনেক খোরাক জুগিয়েছে।

তারপর শিশু মন যাঁর লেখায় সম্পূর্ণ সাড়া দিত তিনি হ'লেন ৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ও তাঁর পুত্র ৺সুকুমার রায়।

তাঁদের পরিচালিত ও সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকা শিশু-মনের অনেক খোরাক জুগিয়েছে।

উপেন্দ্র কিশোরের ভাই ৺কুলদারঞ্জন রায়ের কয়েকটি বই বিশেষ করে 'রবিন-হুড', 'টম-কাকার কুটীর' প্রভৃতি ইংরাজী সাহিত্যের অনুবাদ প্রথম শ্রেণীর শিশু-সাহিত্য।

'সন্দেশের' মত আরো কয়েকটি শিশু-পত্রিকাও শিশুদের অনেক কল্যাণ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মৌচাক, খোকাখুকু, শিশুসাথী শুকতারা, মাস পয়লা, রামধনু, কিশোর-ভারত ইত্যাদি। শিশুদের মনে রহস্যলোকের প্রথম সংবাদ দিয়েছিলেন ৺হেমেন্দ্র কুমার রায় তাঁর 'যখের ধন ও 'চাঁদের পাহাড়' গল্পগুলির মধ্যে। তাঁর গল্পের মধ্যে অন্য গ্রহনক্ষত্রের অধিবাসীদেরও কিছু পরিচ

পাওয়া যায়। এই সূত্র ধরে সত্যজিৎ রার দু একটি গল্প বা উপন্যাসে মঙ্গলগ্রহবাসীদের উল্লেখ করেছেন। তাঁর ফেলু চরিত্র রূপায়ণ ও উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা-কেন্দ্রিক গল্পগুলি একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য-জগৎ সৃষ্টি করেছে।

অনুবাদ-সাহিত্যে সুধীন্দ্র রাহা ও ৺নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশু মুখোপাধ্যায় নিজের লেখা ও পরের লেখা প্রচারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। শিল্পী ও লেখক শৈল চক্রবর্তীও অখ্যাত নন। বন-জঙ্গলের পরিবেশে সার্থক গল্পটি লিখেছেন—সুকুমার দে সরকার।

শিশুসাহিত্যে যারা অনেকগুলি বই লিখেছেন—তাদের মধ্যে, সুনির্মল বসু, লীলা মজুমদার, স্বপন বুড়ো, ধীরেন্দ্রলাল ধর, ৺যোগেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আশাপূর্ণা দেবী, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, রবিদাস সাহা রায়, নির্মলেন্দু গৌতম, রমেন দাসও শিশু-সাহিত্যে পরিচিত। হাস্যরস সৃষ্টিতে শিবরাম চক্রবর্তী অদ্বিতীয়।

তার অনুপ্রাসে বাক্য-রচনা (pun) এক অভিনব সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের কথা আর বিশেষ ক'রে বলবার কী আছে? সাহিত্যের সকল বিভাগের মত শিশু-সাহিত্যে দানও সর্বশ্রেষ্ঠ!

বর্তমান যুগে শিশু-সাহিত্যের অগুন্তি বই প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে।

শিশু-সাহিত্য নামে যে সব বই চলছে—তার অধিকাংশকেই কিশোর-সাহিত্য বলা চলে—এবং এই কিশোর-সাহিত্যের মধ্যে কিছু কিছু এমন বিষয় দেওয়া হচ্ছে যা কিশোরদের অপাঠ্য। এই সব বিপত্তির নিষ্পত্তি করলে, শিশু-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তা জোর দিয়েই বলা চলে। শিশু বা কিশোররাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং তাঁদের চরিত্র ও ধ্যান-ধারণা গ'ড়ে তোলবার দায়িত্ব লেখকদের উপর বর্তায়। এ-সম্বন্ধে লেখকদের বিশেষ সচেতন হওয়ার প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ
২ নং রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৬

পূজার আনন্দ

আপনার পূজোর বাজার সকলের চেয়ে সেরা হওয়া চাই।
অন্তত রুচি-সম্মত এবং বিশেষ ঐতিহ্য পূর্ণ।
এক কথায়—সব রকমের সেরা—সকলের সেরা।
সেরা সুতী খাদি এবং সিল্কের বস্ত্রসম্ভার কেনাকাটার জন্য পর্ষদের নিজস্ব বিক্রয় ভাণ্ডার 'গ্রামীণে' আসুন।

ঠিকানা

রাইটার্স বিল্ডিংস, বি, বি, ডি, বাগ, ভবানীপুর, গড়িয়াহাট, বেলঘরিয়া, বোলপুর, দুর্গাপুর, তমলুক, মালদহ, বসিরহাট, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট।
প্রচার বিভাগ

পাব (২) ৭৬-৭৭

'হেজিমনিজম্'-এর তোলপাড়

অভয়শঙ্কর শর্মা

হেজিমনিজম্-এর অর্থ কি ?

একটা শব্দ নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। তোলপাড় হচ্ছে রুশ-চীন সম্পর্ক, তোলপাড় হয়ে গেলো গত জুলাই মাসের শেষে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত নন্-এলাইনড্ সম্মেলন। ৮৬টি জোট-নিরপেক্ষ দেশের সম্মেলনের সমাপ্তি-খসড়ায় 'হেজিমনি' ('Hegemony') শব্দটা থাকবে, কি থাকবে না, তা নিয়ে বিতর্কের তুফান উঠেছিল। 'হেজিমনি'র ইতিহাসগত প্রয়োগে বৃহৎ-শক্তির মুরুব্বীয়ানার দখলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্রশক্তিগুলিকে রেখে তাদের ওপর রাষ্ট্রনৈতিক খবরদারীই এতোকাল 'হেজিমনি'-রূপে চিহ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির ওপর সোভিয়েত রুশের এই খবরদারী ক্রমশ পাকাপোক্ত হয়েছিলো; কিন্তু বর্তমানে সেই 'হেজিমনি'কে রুমানিয়া পুরোপুরি গ্রাহ্য করতে চাইছে না। যুগোশ্লাভিয়ার ওপরও গোড়ায় সোভিয়েত খবরদারীর পত্তন হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে টিটো সেই খবরদারীর খাঁচা ভেঙে মুক্ত হয়ে বাইরে আসেন। সামরিক বেষ্টনীর দিক থেকে একদিকে ওয়ার'শ চুক্তির দেশগুলি সোভিয়েত খবরদারীর বা 'হেজিমনি'র বজ্রমুষ্টিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে; আর অপর দিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের 'হেজিমনি'তে বা তদারকে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গ্যানাইজেশনের বা 'ন্যাটো'র সামরিক আওতায় যুথবদ্ধ হয়ে আছে। এই দুই 'হেজিমনি'র মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। সোভিয়েত রুশের তাঁবে পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিকে 'ওয়ারশ' চুক্তির' সামরিক বেষ্টনীতে বেঁধে রাখা হয়েছে যুথবদ্ধ দেশগুলির মতামতকে গ্রাহ্য না করে, সোভিয়েত রুশের সামরিক শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপে, আর 'ন্যাটো' চুক্তির দেশগুলি যুথবদ্ধ হয়েছে স্বেচ্ছায়, সোভিয়েত রুশের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট সামরিক শক্তির সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে।

'হেজিমনি' শব্দের জনক : চীন

কিন্তু 'হেজিমনিজম্' ('Hegemonism') শব্দটিকে প্রচারের অঙ্কুশ করে তুলেছে মাও সে-তুং-এর চীন। চীনের এই প্রচারের লক্ষ্য আর কেউ নয়—চীন-রুশ দ্বন্দ্ব-এর উগ্রতা বৃদ্ধির পর থেকে সোভিয়েত রুশ। ১৯৫০ সালের গোড়ায় মাও সে-তুং চীন-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি যে সময় স্বাক্ষর করেন তখনকার অবস্থা ছিল ভিন্নতর। কম্যুনিষ্ট চীন ও সোভিয়েত রুশ সে-সময় অভিন্ন-হৃদয়। কিন্তু

১৯৬০-এর পর থেকে চীন-রুশ সংঘাত ধীরে ধীরে উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে ওঠে এবং ১৯৬৯-র অক্টোবরে চীন-রুশ যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সোভিয়েত রুশের সামরিক নেতৃত্ব, সে-দিন চীনকে সামরিক আঘাতে, প্রয়োজন হ'লে আনবিক আঘাতে, পর্যুদস্ত করতে পা বাড়িয়েছিলো। সে-সময় ইন্দোচীনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী জাতীয় নেতা হো-চি-মিন. লোকান্তরিত হওয়ায়, এই লোকান্তরিত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য বিশ্বের সকল কম্যুনিষ্টরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ হ্যানয়তে সমবেত হ'ন এবং তাঁদেরই মধ্যস্থতায় সোভিয়েত রুশ ও চীন অস্ত্র সম্বরণ করে বিরোধ-মীমাংসার জন্য আলোচনা বৈঠকে বসতে সম্মত হ'ন। সেই থেকে চীন-রুশ আলোচনা চলছে, মাঝে মাঝে বিরতিও গেছে। কিন্তু এই মীমাংসার আলোচনা এক চুলও অগ্রসর হয় নাই। বরং, চীন ও রুশের দ্বন্দ্ব সাম্প্রতিককালে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে 'হেজিমনি'

১৯৭৮-এর জুলাই মাসের শেষে বেলগ্রেডে পাঁচদিন ব্যাপী ৮৬টি রাষ্ট্রের জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনের ৭০ পৃষ্ঠার দলিলে সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিদের সম্মতি দুইদিন বিতর্কের পরও প্রায় অমীমাংসিত রয়ে যায়। তার কারণ ঐ 'হেজিমনি' শব্দটি। সোভিয়েত রুশ কিম্বা চীনের, সম্মেলনে অংশগ্রহণের অধিকার না থাকলেও, সম্মেলনে তাদের দুই শিবির পরস্পর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয়ে ওঠে। এ-দিকে কিউবা সোভিয়েট রুশের মুখোশধারী প্রতিনিধি, অপরপক্ষে কাম্বোডিয়া চীনের মুখোশধারী। সোমালিয়া-বেলগ্রেড' জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন থেকে কিউবার বহিষ্কার দাবী করে আর এদিকে কাম্বোডিয়া দাবী করে ভিয়েৎনামকে বহিষ্কার করা হউক। কিউবা এবং ভিয়েৎনাম—দুই-ই সোভিয়েত রুশের পোষ্য।

'হেজিমনিজম', বা 'মুরুববীয়ানা' শব্দটি বেলগ্রেড জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনের দলিলে স্থান পেয়েছে, সোভিয়েত রুশ শিবিরের প্রাণপণ বাধা সত্ত্বেও, তবে 'হেজিমনিজম্'-এর ব্যাখ্যাটা সম্মেলনে পরস্পর-বিরোধীশক্তিগুলির কাছে গ্রহণীয় করা হয়েছে। তার অর্থ মনকে চোখ ঠারা হয়েছে মাত্র। আসলে চীন এবং চীন-বন্ধু অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে 'হেজিমনিজম্' বললে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকেই বোঝায়—তাদের কাছে এর কোনো দ্বিতীয় বিকল্প অর্থ নেই। চীনের কাছে সোভিয়েত রুশ ও রিভিসনিজম্ বা শোধনবাদ যেমন সমার্থক, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় চীনের কাছে সোভিয়ত রুশ ও 'হেজিমনিজম্'ও সমার্থক পরিচয় বহন করছে। 'হেজিমনিজম্' শব্দটা চীনা নেতৃত্বের দিক থেকে সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে কত বড়ো রণধ্বনি, যতদিন যাচ্ছে, ততই পরিষ্কার হয়ে আসছে। পাকিস্তানে কারাকোরাম-এর উপর দিয়ে চীনের সিনকিয়াং পর্যন্ত ৮০০ কিলোমিটার রাস্তা উদ্ঘাটনের জন্য পাকিস্তানের পথে চীনের অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী কেং পাও গত জুনের শেষে আবার সেই 'হেজিমনি-বিরোধী' সংগ্রামের কথা বলেছেন: 'তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্বে

'হেজিমনি-বিরোধী' সংগ্রাম দ্রুত সবেগে এগিয়ে চলছে।' বেলগ্রেড সম্মেলনে কিউবা, সোভিয়েত রুশের পক্ষ হয়ে সম্মেলনের সনদে 'হেজিমনি' শব্দটা ব্যবহারের প্রবল বিরোধিতা করে এবং বেলগ্রেডে এক পৃথক সাংবাদিক সম্মেলনে কিউবার পলিটবুরোর পররাষ্ট্র বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য কার্লোস রাফায়েল রড্‌রিগ বলেন হাভানা (কিউবার রাজধানী) 'হেজিমনি' শব্দটা বরদাস্ত করতে সম্মত আছে, যদি এই শব্দটি সোভিয়েত রুশকে না বোঝায়: "I am in a position to say Cuba is ready to accept any definition of the term hegemony which corresponds to the realities of contemporary life."

আমেরিকা চায় সংরক্ষণ: রুশ চায় সম্প্রসারণ

১৯৭৭-এর আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির একাদশ জাতীয় কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক প্রস্তাব আলোচনাসূত্রে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির মাও-উত্তর চেয়ারম্যান হুয়া কুয়ো-ফেং সোভিয়েত রুশকে আগামী যুদ্ধের উৎসরূপে বিবৃত করে বলেন: 'আমেরিকা পৃথিবীতে তার স্বার্থ বজায় রাখতে ব্যস্ত, আর সোভিয়েত রুশ ব্যস্ত 'নিজ স্বার্থ সম্প্রসারণে'। '.....বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা নয়, চীনদেশের অধিবাসীরাও নয়, কিন্তু যুদ্ধ চায় কে?—বৃহৎ শক্তিবর্গ।' চেয়ারম্যান হুয়া সেই সূত্রে আরও বলেন: "The Soviet Union and the United States are the source of a new world war, and Soviet Social Imperialism in particular presents the greater danger. The current strategic situation in their contention is that Soviet Social Imperialism is on the offensive and U S Imperialism on the defensive."

—অর্থাৎ, আগামী যুদ্ধের উৎস সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌স। সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদই বিশেষভাবে অধিকতর বিপজ্জনক। রণকৌশলের পারপ্রেক্ষিতে বলা যায় সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণকারীর এবং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আত্মরক্ষার ভূমিকায় রয়েছে।

হুয়া কুয়ো-ফেং সেই সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রস্তাব আলোচনায় আরও বলছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই দুইটি দখলদারী-শক্তি ('The two hegemonistic powers') বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সব চাইতে বড়ো শোষক ও পীড়ক এবং বিশ্বের সাধারণ মানুষের শত্রু। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যেও চীনের সঙ্গে এদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভেদ রয়েছে। সোভিয়েত রুশ-মার্কিণ সম্পর্ক, ১৯৭২ সালে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত সাংহাই বিবৃতি, এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে। এই বিবৃতি অনুযায়ী এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্রম-উন্নয়নের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে 'তাইওয়ানের' সঙ্গে সকল প্রকার পারস্পরিক প্রতিরক্ষচুক্তিসহ বিশেষ সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে মূল চীন ভূখণ্ডের অংশরূপে তাইওয়ানের স্থান নেবার পথে সকল অবরোধ দূর

করতে হবে। সাংহাই বিবৃতিতে হেজিমনি শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়।

'হেজিমনি' : চীন-রুশ সম্পর্ক

আর চীন-রুশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কী? হুয়া বললেন : হেজিমনিজমের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবে। অবশ্য চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক রাষ্ট্রগত সম্পর্ক স্বাভাবিক স্তরে বজায় রাখতে হবে। কিন্তু '৭৭ সালের আগষ্টে একাদশ জাতীয় পার্টি সম্মেলনের অব্যবহিত পর থেকেই চীন-সোভিয়েতের দূরত্ব বাড়ছে, আর চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে। একাদশ পার্টি সম্মেলনের পরই '৭৭-এর ২২শে আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব সাইরাস ভ্যান্স পিকিং এলে তার আপ্যায়ন-ভোজে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুয়াং হুয়া বলেন : মানুষ চাক্ বা না-ই চাক্, হেজিমনির জন্য বিশ্বজোড়া দ্বন্দ্বের পরিণামে আজ হউক, কাল হউক যুদ্ধ বেধে যাবে : 'The rivalry for world hegemony will lead to war sooner or later; this is independent of man's will."……তাছাড়া ভ্যান্স বলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির মর্মস্থলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিহিত রয়েছে—কার্টার এবিষয়ে নিঃসন্দেহ।…সুতরাং চীন-যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যত্র শান্তি স্থাপনের ভিত্তি-ভূমিরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

কিন্তু এ কী ঘটনা ঘটে গেলো যার ফলে গত চারমাসের মধ্যে চীন-মার্কিণ বোঝাপড়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে? সোভিয়েত রুশের সে-কারণে উদ্বেগের সীমা নাই! কারণ আর কিছুই নয়। চীন স্থির করেছে,—যে সিদ্ধান্ত তারা একাদশ জাতীয় পার্টি কংগ্রেসে গত বছর আগষ্ট মাসে গ্রহণ করেছিলো,—২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে কৃষির, শিল্পের, জাতীয় প্রতিরক্ষার, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে চীনকে একটি শক্তিশালী ও উন্নত সমাজবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে :—"to persist in continuing the revolution……modernize our agriculture, industry, national defence, and science and technology by the end of the century, turn China into a powerful and prosperous socialist country."

চীনেকে দিয়ে তুরুপের তাস খেলা কেন?

আধুনিকীকরণের তাগিদে যদি আমেরিকা, সোভিয়েত রুশের সঙ্গে বোঝাপড়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে, আর চীনের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্কের বন্ধন তৈরী করতে থাকে, সোভিয়েত রুশ অবশ্যই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এজন্য পশ্চিমী কারিগরী-বিদ্যা চীনাদের চাই-ই চাই। যে পরিমাণে চীনাদের জন্য কারিগরী বিদ্যার ব্যবস্থা হবে, সেই পরিমাণে সোভিয়েত রুশের অংশে তার ঘাটতি পড়বে। অথচ প্রায় গোটা সত্তর দশকটাই রুশ-মার্কিণ বৈষয়িক সম্পর্কের লেনদেনে সোভিয়েত রাশিয়া এই সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে চাকা বিপরীতমুখী মোড় নিয়েছে, যাকে স্বভাবতই

সোভিয়েত রুশ, কিসিংগারের আমলের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শুধু অবনতি নয়, ধ্বংসস্তূপ রূপেই দেখতে চাইবে। এই কারণে ক্রুদ্ধ সোভিয়েত রুশ, মার্কিণী রাষ্ট্রকর্তাদের কড়া সুরে বলছে: "তোমরা চীনকে দিয়ে তুরুপের তাস খেলছো? আচ্ছা দেখা যাবে!" —ঘটনা এতোই গড়িয়েছে যে ব্রেজনেভ তো আর রেখে-ঢেকে বলতে না পেরে গত ২৫শে জুন আমেরিকাকে ধমকে দিয়ে বল্লেন: "সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীনকে খেলানো অত্যন্ত অদূরদর্শী ও বিপজ্জনক" হয়ে দাঁড়াবে। গত মে মাসে কার্টারের নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা জবিগনিউ ব্রেজেজিন্স্কি (Zbignlew Brzezinski) পিকিং পরিদর্শনের সময়কার সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কেই ব্রেজনেভ উপরোক্ত মন্তব্য করে বলেন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে "চীনকে দিয়ে তুরুপের তাস খেলাবার চেষ্টা করছে—"...attempts were being made at a high level in the U. S. A to play the China Card against this Country."।

চীনের বাড়-বাড়ন্ত: সোভিয়েত-এর শক্তিশেলের লক্ষ্য হবে

কিন্তু এখানেই কী এর শেষ? চীন যদি পশ্চিমীদেশগুলির যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিদ্যার সাহায্য নিতে শুরু ক'রে, অস্ত্রশস্ত্রও পশ্চিমী দেশগুলি থেকে সংগ্রহ করতে পারে, তবে সেই পরিস্থিতিতে কি সোভিয়েত রুশ আর একটি শক্তিশালী সমকক্ষ রাষ্ট্রের উত্থান বসে বসে দেখবে? না দেখারই কথা। চীনের বাড়-বাড়ন্ত অনিবার্য-ভাবে সোভিয়েত রুশের শক্তিশেল-এর লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং চীনের সেই সামরিক-বৈষয়িক শক্তি অর্জনের পূর্বেই সোভিয়েত রুশ যে চীনকে ঘায়েল করে দেবে না, সে কথা কে কবুল করবে? তাই মনে হয় চীন 'হেজিমনি'র বক্ষস্ত্রাণ ও শিরস্ত্রাণ চড়িয়ে সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে সেদিনের জন্য প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরী করছে। আর সে-ও খুব বাস্তব-সম্মত হিসাব-নিকাশের পর।

চীন, সোভিয়েত রুশ-এর দিক থেকে 'হেজিমনি'র তাল সামলাবার জন্য তৈরীও হতে সুরু করেছে। চীনের বহু ছাত্রদের ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, সুইডেনে এবং পশ্চিম জার্মানীতে কারিগরীবিদ্যা শিখতে পাঠানো হয়েছে এবং আরও বহু ছাত্রকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবার জন্য চীন তৈরী হচ্ছে। এ ছাড়া বড়ো বড়ো মার্কিণী তেল-ব্যবসায়ীদের চীনে তেল-সম্পদ আবিষ্কারের এবং সংগ্রহের সুযোগ দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের বহু সরকারী প্রতিনিধিদের চীন-পরিদর্শনে স্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং চীন অঢেল মার্কিণী পণ্য ক্রয় করছে। চীনে অস্ত্র পাঠিয়ে, সম্প্রতি যা ঘটেছে তার চাইতে যুক্তরাষ্ট্র মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক আরো অবনতি ঘটাতে চায় না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার ইউরোপীয় বন্ধুদের ওপর থেকে চীনকে অস্ত্রের চাহিদা মেটানোর বাধা তুলে নিয়েছে। কিন্তু আমেরিকার সেনেট এই সেপ্টেম্বরেরই প্রথম সপ্তাহে চীনকে—'most-favoured nation'—বিশেষভাবে আপ্যায়িত রাষ্ট্রের মর্যাদা আরোপ করে

ভোট দিয়েছে, যার ফলে চীন আমেরিকায় শস্য-ক্রয়ের জন্য ঋণের সুযোগ পাবে।

চীন-মার্কিণ সম্পর্কের এই নবপর্যায়কেই লিওনিদ্ ব্রেজনেভ আমেরিকার দিক থেকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চীনকে দিয়ে তুরুপের "তাস খেলাবার" তিক্ত অভিযোগ তুলেছেন: "...to play the China Card against this country"। ব্রেজনেভ বলছেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রম-অবনতির মধ্যে দাঁড়াত কি করে কার্যকরী করা যায়, সেটাই আসল কাজ। ব্রেজনেভ সোভিয়েত বাইলো-রুশের রাজধানী মিন্স্ক থেকে বলছিলেন। স্ট্রাটেজিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য রুশ-মার্কিণ আলোচনা-বৈঠকের কোনো উল্লেখই না করে, ধমকের সুরে ন্যাটোর দেশগুলিকে তিনি বললেন: 'কাজে নেমে পড়ো'—"Get down to business"। মধ্য ইউরোপে ওয়ারশ ও ন্যাটো চুক্তির মধ্যে সৈন্য-শস্ত্র হ্রাসের যে আলোচনা কয়েক বছর যাবৎ ভিয়েনায় চলছে, সেই বৈঠকে প্রথম পর্যায়ে তিন ডিভিসন সেনাবাহিনী এবং এক হাজার ট্যাঙ্ক হ্রাসের পুরাণো প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলেন ব্রেজনেভ। গত মাসে সোভিয়েত রুশের 'তাস' পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে চীনের নিকট অস্ত্র বিক্রয়ের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয় যারা চীনকে উস্কে দিচ্ছে সোভিয়েত রুশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে, চীন-রুশ যুদ্ধের উত্তাপে যে তারা পুড়ে ছাই হবেন না, তার গ্যারান্টি কোথায়: "But? where is the guarantee: that the enemies of peace and detente who hope to warm themselves in the heat of Soviet-Chinese war, will not themselves burn: their own fingers?"

ইউরোপ: দুই মুরুব্বীশক্তির সংগ্রামভূমি

কিন্তু চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুয়াং হুয়া গত ২৯শে মে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দশম বিশেষ অধিবেশনে স্পষ্টই বলেন দুইটি বিশ্বমুরুব্বী-শক্তির (two hegemonist powers) আসন্ন সংঘাতের মর্মকেন্দ্র হবে ইউরোপ। মধ্য ইউরোপে পারস্পরিক সেনা-শস্ত্র হ্রাসের সম্মেলনটি ধূম্রজালরূপে ব্যবহার করে সোভিয়েত রুশ তার প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র ও সেনা-বাহিনী বৃদ্ধি করেছে—পূর্ব ইউরোপে তাদের ভূতল-বাহিনীর সংখ্যা ষাট হাজারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। হুয়াং হুয়া আরও বলেছেন: সোভিয়েত রুশ ট্যাঙ্কের, সশস্ত্র পরিবহনের, সাঁজোয়াবাহিনীর শস্ত্রসম্ভারের এবং বিমান-বাহিনীর আক্রমণশক্তির প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে এবং পশ্চিম ইউরোপকে ঘিরে সব কয়টি সমুদ্রে নৌবাহিনীর বহর বাড়িয়েছে। তার অর্থ আকস্মিকভাবে পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণের সকল আয়োজনই সম্পূর্ণ করে তুলেছে। হুয়াং হুয়া বলে চলেন: এই চতুর বৃহৎশক্তিটি (অর্থাৎ সোভিয়েত রুশ) এতো কাণ্ডের পরও বেলগ্রেডের ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে হঠাৎ প্রস্তাব দিলো যে আনবিক শক্তির প্রথম

আঘাত থেকে বিরত হ'বার জন্য সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রদের কাছে আবেদন জানানো হোক্, যদিও ইতিপূর্বে সোভিয়েত রুশ নিজেও 'first use of nuclear force' থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করেছে। এই ঔদার্যের কারণ আর কিছুই নয়। হুয়াং হুয়ার ভাষণে পাওয়া যায় বৃহৎ-শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে সোভিয়েত রুশ, প্রচলিত শস্ত্র-সরঞ্জাম (Conventional weapons) বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে সক্রিয় হয়েছেন এবং একা সোভিয়েত রুশের এই অস্ত্রের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমবেত উৎপাদনের চাইতে অনেক বেশী : "The amount of conventional weapons produced by the Soviet Union alone already equals the sum total of those produced by the United States and the Western European Countries,"।

চীন-জাপান মৈত্রী-চুক্তি : 'হেজিমনি'র পরাজয়

'হেজিমনি' শব্দের লড়াইতে সোভিয়েত রুশ চীনের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে চীন-জাপান শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির বেলায়। দশ বছরের মেয়াদে এই শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি গত ১২ই আগষ্ট পিকিং-এ জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুনাও সোনোদার এবং চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুয়াং হুয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭২ সালে চীন ও জাপান তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক স্তরে ফিরিয়ে আনবার জন্য যে যৌথ-বিবৃতি স্বাক্ষর করেন তাতে ব্যর্থহীনভাবে 'হেজিমনির' উল্লেখ থাকাতে দ্বিপ্রতিক শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিতে জাপানকে কবুল করতে হয় যে তারা উভয়ে এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় অথবা পৃথিবীর অন্যত্র 'হেজিমনি'-বিরোধী। অন্য কোনো একাধিক দেশ বা রাষ্ট্রগোষ্ঠি কোনো 'হেজিমনি' প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলে, চীন ও জাপান তাদের প্রতিরোধ করবে। চুক্তিতে অবশ্যি বলা আছে স্বাক্ষরকারী কোনো শক্তির অন্য কোনো তৃতীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক, এই চুক্তির ফলে ব্যাহত হবে না।

চীন-জাপান শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিতে 'হেজিমনি'-বিরোধী ধারা (anti-hegemony clause) সংযোগের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রুশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিকো ১৯৭৬-এর গোড়ায় সচেষ্ট হন। গ্রোমিকো জাপ-সোভিয়েত মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হয়ে এ-কাজে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যর্থতার কারণ জাপানের উত্তরাঞ্চল সোভিয়েতের দখলে যে চারটি দ্বীপ রয়েছে, সে দ্বীপগুলি জাপানকে ফিরিয়ে না দিলে, জাপান সোভিয়েত রুশের সঙ্গে কোনো মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না। অথচ চীন-মার্কিণ-রুশ অক্ষে জাপান একটি অনিবার্য সংযোজন। চীনের এই 'হেজিমনি'-বিরোধীধারা ব্রেজনেভ-এর এশীয় যৌথ নিরাপত্তার (Asian Collective Security) বিরুদ্ধে একটি শলাকা বিশেষ। গ্রোমিকোকে তাই সে-সময় বলতে হয়েছে : "—the Chinese leadership is trying to pressurise Japan into adopting Peking's hostile line towards the Soviet Union.....this proves China itself is seeking hegemony।"

অথচ, ১৯৭২ সালে চৌ-নিক্সন সাংহাইতে যে যৌথ বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে সর্বপ্রথম 'হেজিমনি'-বিরোধী ধারা থাকলেও, সে-সময় সোভিয়েত রুশ সেই বিবৃতির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করে নাই।

মস্কৌতে এবছর ১৩ই সেপ্টেম্বর বাজ পাই-এর সম্মানে এক ভোজসভায় গ্রোমিকো সরাসরি বলেই দিলেন চীন এই উপমহাদেশটিকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাও সে-তুং ত্রিশ বছরের জন্য যে চীন-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তাতে একটি জাপান-বিরোধী ধারা সংযোজিত ছিল। এই চুক্তির ১৯৮০-র এপ্রিলে মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে, কারণ চুক্তিটি কার্যকরী হয়েছিলো ১৯৫০-এর এপ্রিলে। সুতরাং তার এক বছর পূর্বে এই চুক্তি বাতিলের নোটিশ সোভিয়েত রুশকে পাঠাবার কথা জাপানকে চীন জানিয়ে দিয়েছে। চীন-জাপান চুক্তির ফলে চীন জাপানের সর্ববৃহৎ পণ্যের বাজারে পরিণত হতে পারে। ১২ই আগষ্ট চীন-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই চুক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রুশের তীব্র ধিক্কার জানা গেছে, কারণ তাদের ধারণায়, চুক্তির 'হেজিমনি'-বিরোধী ধারার লক্ষ্য আর কে, সোভিয়েত রুশ ছাড়া? আর সোভিয়েতের মতে জাপান তো পিকিং-এর হুকুম বরদার হয়ে উঠেছে আর চীনের 'হেজিমনি'র বেড়াজালে ঘেরা পড়েছে: "entangled in China's hegemonistic policy"।

চীন-জাপান শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ১৬ই আগষ্ট থেকে ২৯শে আগষ্ট হুয়া কুয়া ফেং রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও ইরাণের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং সর্বত্রই 'হেজিমনিজম'-এর (big power hegemonism) অঙ্কুশ দিয়ে বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত রুশকে আঘাত করেন। হুয়া কুয়ো-ফেং-এর 'হেজিমনি-বিরোধী' আঘাত সোভিয়েত রুশকে প্রায় পাগল করে তুলেছে। লাল কাপড়ের টুকরো দেখলে ষাঁড়ের যে অবস্থা হয়, 'হেজিমনি' শব্দের পৌনঃপুনিক উচ্চারণে সোভিয়েত রুশকেও চীন সেই পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে।

'হেরিমনিজম্' শব্দের তোলপাড় রুশ-চীন সংঘাতে শেষ পর্যন্ত পরিণতি পাবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। সম্প্রতি ব্রেজনেভ রুশ-চীন সীমান্তে রুশ শস্ত্র-সজ্জা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে এসেছেন। অবস্থা দেখে মনে হয় চীনও সকল শক্তি রুশ 'হেজিমনিজম'-এর বিরুদ্ধে সংহত করবে এবং চীনের আধুনীকিকরণে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমীদেশগুলির সহায়তা নেবে। চীনের সেনাবাহিনীর গড়ন ও রণকৌশল বদলাচ্ছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত পুঁজিবাদী দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে এবং উন্নয়নশীল তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলির চীন সঙ্গে যত বেশী বোঝাপড়া করে নিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেবে। সেদিক থেকে চীন তৃতীয় বিশ্বের ভারতবর্ষের সঙ্গেও বিরোধ মিটিয়ে রুশ-'হেজিমনির' বিরুদ্ধে শক্তি সংহত করবে আশা করা যায়। চীনও প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করেছে এবং পশ্চিমী দেশগুলির থেকে আরও ক্রয়ের আশা রাখে।

১৫-৯-৭৮

লোক্যাল ট্রেনের ছায়ায়

আর্য দেব

কখন কোন ট্রেন যাচ্ছে বলতে পারে টগর।

ছটা পঞ্চান্ন থেকে সুরু। প্রথমে যায় ছানার গাড়ি। ব্যাণ্ডেল, ত্রিবেণী থেকে সুরু করে শ্রীরামপুর পর্যন্ত সব ছানার জোগানদার। বাঁকভর্তি ছানা নিয়ে পৌঁছে দেয় বৌবাজারে মিষ্টির দোকানে।

তারপর হুহু করে ছুটে যায় বাসি মুখে বড় বড় গাড়িগুলো। তুফান, অমৃতসর, দার্জিলিং। ওসব মেলগাড়িতে বড়লোকরা চড়ে—এখানে থামেই না। একবার ওপাশের বাড়ির গজা স্টেশন মাস্টারকে বলেছিল :

: স্যর, দার্জিলিং মেলটা কখন এখানে আসবে—

স্টেশন মাস্টার রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন : রসিকতা হচ্ছে, তোমার এই ছোট্ট স্টেশনে দার্জিলিং মেল দাঁড়াবে ?

—না স্যর, আমি—বলে মুচকি মুচকি হেসেছিল গজা—

স্টেশন মাস্টার পাল্টা বলেছিল : আবার হাসি হচ্ছে—যত সব। দেখি তোর প্ল্যাটফর্ম টিকিট।

—প্ল্যাটফর্ম টিকিট ?

—হ্যাঁ, প্ল্যাটফর্ম টিকিট। আমার প্ল্যাটফর্মে উঠলেই টিকিট লাগে। গজা হাসতে হাসতে পালিয়ে এসেছিল। সেই কথা স্টেশন মাস্টারও যেমনি একে ওকে অন্যরকমভাবে বলেছেন, গজাও তেমনি বলেছে তার বন্ধুদের।

কিন্তু ঐ সব বড় বড় গাড়ি এক একবার বাসি মুখেই থেমে যায় এই স্টেশনে—কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! বাঙালী মেয়েগুলো সালোয়ার কামিজ পরে নেমে আসে প্ল্যাটফর্মে, একটাই কল—সেইখানেই হুড়োহুড়ি করে মুখ ধোয়, জল ছিটোয়। কেউ কেউ ওপাশের ঝোপ দেখে সালোয়ার নামিয়ে—কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! গাড়ি যখন ছাড়ে তখন মেলাশেষের মেলাতলার মত পাতা, ঠোঙা, এটাসেটা পড়ে থাকে। একবার গজা আর তার তিন বন্ধু সোনা, মানকে, পটলা মিলে চা সাপ্লাই করে বিস্তর রোজগার করেছিল। এ স্টেশনে স্টল-ফল নেই—বাসিমুখের লোকেদের আবার চা না খেলে সকালে বেগ আসে না।

গজা আগের দিনই রাত্তিরে বলেছিল : বৌদি, কাল মস্ত মওকা—

টগর জিগ্যেস করেছিল : কী ব্যাপার ?

—চা গো, চা—কাল সব কটা গাড়িই কিছুক্ষণ করে দাঁড়াবে—সামনের সিগন্যালটায় গোলমাল, কন্ট্রোল থেকে খবর পেয়ে খালাসী বাবু সবুজ ফ্ল্যাগ দেখাতে দেখাতে আমাদের চায়ের হাঁড়ি শেষ

হবে বুঝতেই পারছো। ভেলি গুড়, আদা আর গুঁড়ো চা—

ঠিক তাই হয়েছিল পরদিন।

সেদিন টগর সবেমাত্র উঠোনে গোবরজল ছড়া দিয়ে দাওয়ায় উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় প্রায় ভুলে-যাওয়া একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল দূর থেকে: কই গো মালী গেটটা খোলো।

দাওয়া থেকে নেমে টগর দেখলো সেই বাড়ি-অলা নতুন ভদ্রলোক বিজনবাবু তাঁর বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। গেটের তালা খুলছে মালীর বউ দুর্গা।

বিজন তার বাড়ির ভেতর চলে গেল। আর তখনই ভোর পাঁচটা দশ-এর গাড়িটা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে স্পিড নিতে লাগলো।

এত সকালে বিজনকে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়েছিল টগর। আশ্চর্য এই সহরের লোক। পয়সা খরচ করে জমি কিনে, বেড়া দিয়ে, তারপর সীমানায় পাঁচিল তুলে কত দিন ধরে জমজমাট বাড়ি করলো একখানা। গাছ বসালো কতরকমের—ফুলের গাছ, ফলের গাছ, ভেতরে নিজেদের ব্যবহারের পুকুর কাটলো একটা—অথচ বসতের বেলায় ভোঁ ভাঁ।

প্রথম প্রথম বিজন ও তার বন্ধুরা ফি শনিবার আসতো, রবিবার বিকেলে ফিরে যেত। কলের গান বাজতো সারাদিন। পুকুরে মাছ ধরতো ওরা। বিকেলে লাইন ধরে বেড়াতে যেত। তারপর আসার নেশা কমতে লাগলো। মাসে একবার, ছ মাসে একবার, শেষে বছরে একবার।

'তাহলে বাড়ি করা কেন? একদিন টগর জিগ্যেস করেছিল ওবাড়ির মালীর বউ দুর্গাকে।

দুর্গা হেসে বলেছিল: তোকে রাখবে বলে।

'আ মর্ মাগী, মুখ না পায়খানা' বলে কপট রাগ দেখিয়েছিল টগর। তারপর বলেছিল: কেন আমার সোয়ামী নেই নাকি? ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে দুর্গা ওকে ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়িটা দেখিয়েছিল। কোনটা বসার ঘর কোনটা শোওয়ার, কোনটা পড়ার। কোনখানটায় ওরা প্ল্যান করেছে টেবিল বসবে, কোনখানে চেয়ার, আলমারি, খাট, ড্রেসিং টেবিল আরো কত কী।

পুকুরঘাটে বেড়াতে বেড়াতে দেখিয়েছে ঐ ছোট ঘরগুলো হাঁসের, আর ঐ তারের বেড়া দেওয়া জায়গাটায় হবে 'পোলট্রি'—মুরগী থাকবে; আর ঐ টালিছাওয়া কুঠরিগুলোয় থাকবে গরু, মুলতানী লাল গরু—

টগর হেসে ফেললো: তোকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, খেয়ে খেয়ে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিব্যি নধর হচ্ছিস, দেখিস বাবুর নজরে পড়ে ভগ্নীপতির কপাল না ভাঙে—

দুর্গা হেসে ফেললো: তোরও ত মুখ কম নয়—

টগর হাসলো, উত্তর দিল না।

এদিক সেদিকে বুগেনভিলিয়া লালে লাল, নারকোল চারা ধীরে ধীরে বাড়ছে, পেঁপেগাছে পেঁপে ধরছে।

টগর বললো: রাম না হতেই রামায়ণ।

—কেন, কেন? জিগ্যেস করলো দুর্গা।

—দূর, তোর বাবুদেরই ত পাত্তা নেই, ত হাঁস আর মুরগী আর গরু। দুর্গা কথা ঘুরিয়ে বললো:

হ্যাঁ রে তুই ত কলকাতা দেখিস নি, বাবুর সঙ্গে যা না একবার—দেখে আয় চিড়িয়াখানা, জাদুঘর—

—তোর বাবু আমায় নিয়ে যাবে কেন ?

—বললেই হবে, তোর ডাগর চেহারা দেখলে বাবু নিয়ে যেতে আপত্তি করবে না—

খিল খিল করে হাসল টগর—কিন্তু, কলকাতা দেখার জন্যে আমার কোন আঁকুপাঁকু নেই—ট্রেনের ঐ বাদুড়ঝোলা ডেলি পাষণ্ডদের দেখেই আমার সাধ মিটে গেছে।

দুর্গার ঘর থেকেই টগর দেখতে পেল বিজন বাগানে পায়চারি করছে—একবার পুকুরঘাটে যাচ্ছে, গাছপাতার ওপর হাত বুলোচ্ছে, আবার গিয়ে বসছে দাওয়ায়, ঘরে যাচ্ছে, বাইরে বেরিয়ে আসছে, এদিক-ওদিক ছুটছে।

টগর আস্তে গলায় জিগ্যেস করলো : হ্যাঁ রে দুর্গা, তোর বাবু পাগল হয়ে গেল নাকি, আর এত সকালেই বা আজ এল কেন ?

দুর্গা বললো ; না রে, না—বাবু এজায়গাটা ভালবেসে ফেলেছে—অথচ শুনছি নাকি এই সম্পত্তি বেচে দেবে—আমাদের বলেছেন 'কী হবে এসব রেখে. সহর ছেড়ে যখন এখানে থাকতেই পারবো না'।

—এত গাছপালা, বাগান, বাড়ি সব ছেড়ে যাবে ?

—হ্যাঁ। কয়েকবার ত খদ্দের এল—হয় দাম ঠিক হয় না, নয়ত বাবু নিজেই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। আজ নিশ্চয় কোন খদ্দের আসবে।

দুর্গার কথাই ঠিক হল। দশটা পঞ্চান্নর ট্রেনে এক ভদ্রলোক, আর তাঁর বউ মেয়ে সব এল একে একে।

'আসুন, আসুন—চিনতে কোন কষ্ট হয় নি নিশ্চয়ই'—বলে এগিয়ে গেল বিজন।

ভদ্রলোকটি বললেন : নতুনবাড়ি বললে সবাই চিনতে পারে—সকলেরই কিন্তু ঐ এক কথা 'বাড়ি কিন্তু লোক নেই। হাসলো বিজন। ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন—এ আমার স্ত্রী, ও আমার বড় মেয়ে।

আদর আপ্যায়নের পর বাগানে টেবিল পেতে চেয়ার জুড়ে বসলো ওরা। কাগজপত্র, ম্যাপ, এটাসেটা দেখিয়ে দেখিয়ে বোঝাতে লাগলো বিজন। সেই পর্ব শেষ হতে ওদের সকলকে ঘরদোর, পুকুর, বাগান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো বিজন। ভদ্রলোকের বড় মেয়ে কয়েকটা চাঁপা ফুল কুড়োতে বিজন ডাল ঝুঁকিয়ে কয়েকটা চাঁপা পেড়ে তার হাতে দিয়ে বললো : এই নিন, এই নিন···ওই বাসি ফুল কুড়িয়ে কী হবে ?

দুর্গা ওদের ফাইফরমাস খাটছিল। চায়ের কাপ ইত্যাদি নিয়ে গেল। টুকরো টুকরো কিছু কথা শুনতে পেল, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারলো না। ভদ্রলোকরা যাই-যাই করছিলেন ; একসময় ভদ্রলোক বোধ হয় বললেন : দামটা একটু যদি কমাতেন—

বিজন হাসছিল : ঠিক আছে—সে আপনাকে কাল ফোনে বলবো, মোটামুটি পছন্দ ত ?

ভদ্রলোকের মেয়ে-বউ বলে উঠলো—ওয়াণ্ডার-ফুল, ইডিলিক, এরকম পরিবেশে লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, প্রাণ সব কিছুই নতুন অর্থ পায়—

ওদের যাওয়ার সময় দুর্গা শুনতে পেল বিজনের গলা—ঠিক আছে, কাল ফোনে—

দুর্গা আপন মনেই মিটিমিটি হাসছিল। সে জানে বিজনবাবুর এ এক বিলাস। কত লোক এল গেল—বাড়ি বিক্রি এই হয়, এই হয়—কিন্তু হয় না। ও যেন খানিকটা আঁচ করতে পেরেছে লোকটার—বিজনবাবু এখানে থাকতেইও পারেন না, আবার এটাকে ফেলতেও পারেন না—বাড়িটা লোককে দেখিয়ে হয়ত একটা আনন্দ পান।

দুপুরে এক সময় টগর এল। তার চোখে-মুখেও কৌতূহল। সেই জিগ্যেস করলো: হ্যাঁ রে দুর্গা, ব্যাপার কি?

—কি আবার? সেই একই—

—সেই একই।

—হ্যাঁ, নতুন বাবু এলেন, তাঁর বউ এল, সোমত্ত একটা মেয়েও ছিল—দেখতে ভারী সুন্দর, সিনেমার মেয়ের মত—

খিলখিল করে হাসলো টগর।

দুর্গা বলে চললো: আমি ভাবলাম সিনেমা-মেয়ের সঙ্গে বাবুর একটা ইয়ে হলে মন্দ হয় না—দূর ছাই, সেদিক দিয়ে গেল না বাবু—শুধু হিসেব-নিকেশ, দলিল-দস্তাবেজ, শেষকালে বিদায়।

টগর বললো: তোর বাবু মাইরি একটা আজব জিনিস—

দুর্গা হাসলো: আজব জিনিসই বটে, এটাকে ফেলতেও চায়, রাখতেও চায়, বিয়ে-থা না করলে যা হয়—একটা কিছু চাইত—তার চেয়ে এক কাজ কর টগর।

—কী?

—তুই রাগ করিস না, তোর সোয়ামী ত কতকাল বিবাগী—তুই ছাখ্ না বাবুটিকে যদি বশ করতে পারিস।

—আঃ মরণ!

—না, না—আমি ঠিকই বলছি দেখনা আমার বাবুটিকে যদি এখানে আটকে রাখতে পারিস—চল্, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ওরা দুজনে ধীর-পায়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে হাজির হল। সেখানে পাড়ে বসে দাঁতে করে ব্যাস ছিঁড়ছিল বিজন।

সেই বললো: কি দুর্গা, কিছু বলবে? তোমার সঙ্গে ওটি ত টগর, না—ঐ ওপাশের বাড়িতে থাকে?

—আজ্ঞে—বললো টগর।

—বলো কী বলবে—

—আজ্ঞে, টগর কলকাতা দেখেনি।

বিজন যেন আকাশ থেকে পড়লো: কলকাতা দেখে নি? দু পা গেলে স্টেশন, হাজার হাজার ডেলি প্যাসেঞ্জার দু'বেলা যাচ্ছে আসছে—আর কলকাতা দেখে নি?

—আজ্ঞে, কে নিয়ে যাবে—মেয়েছেলে, তাছাড়া কলকাতার কথা শুনলে ওর নাকি ভয় লাগে।

টোপটা ঠিকই ফেলেছিল দুর্গা। সে বিজনের উচ্ছ্বাস দেখেছে মাঝেমধ্যে।

বিজন বললো: কোই বাৎ নেহি—চলো আমার সঙ্গে আজই। আমার ফ্যাক্টরিতে অনেক মেয়ে কাজ করে, তাদের সঙ্গে আজ আর কাল দুদিন থেকে, কলকাতা দেখে নিয়ে বাড়ি ফিরো।

উৎসবের সময়

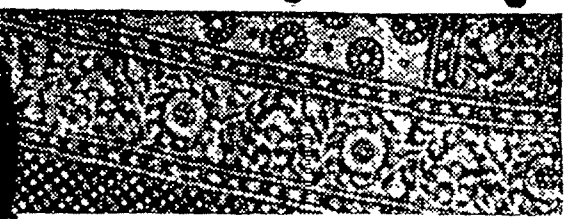

"খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করলে হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীকে সহায়তা করা হবে, তাদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে গ্রামীণ শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে।"

জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

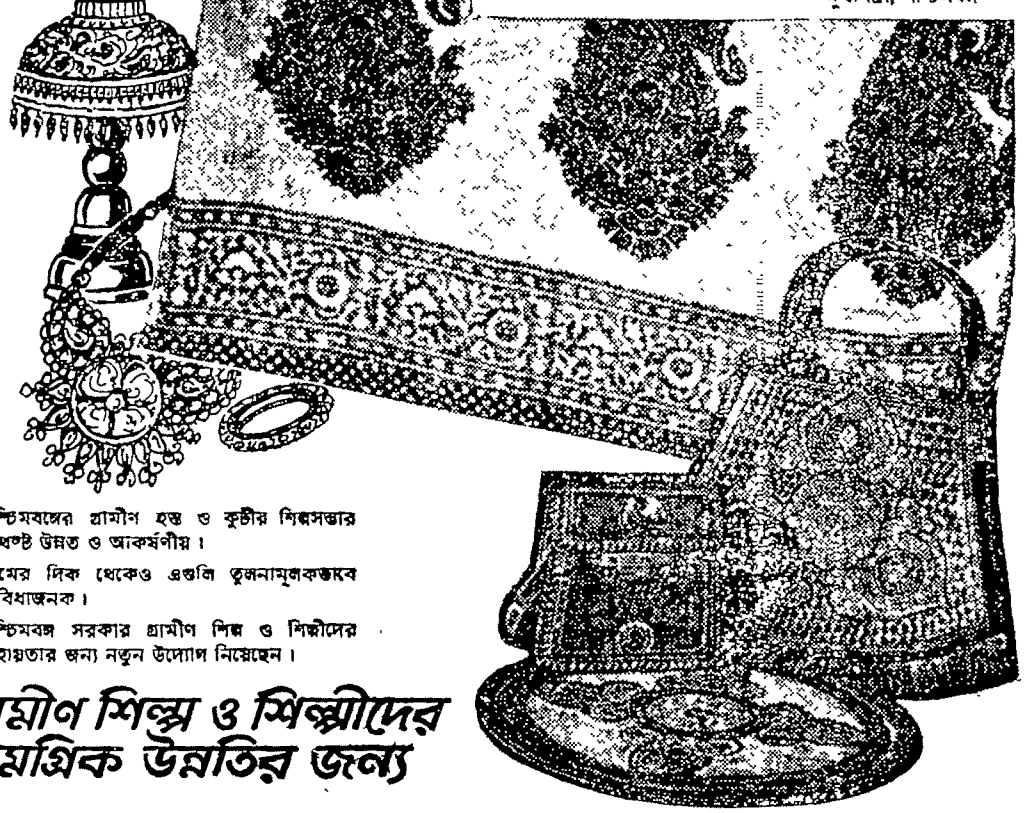

- পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ হস্ত ও কুটীর শিল্পসম্ভার যথেষ্ট উন্নত ও আকর্ষণীয়।
- দামের দিক থেকেও এগুলি তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের সহায়তার জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন।

গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য

খাদি ও গ্রামীণ শিল্পবস্তু ক্রয় করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দুর্গা হাসতে হাসতে বললো : তাহলে ওকে তৈরি হয়ে নিতে বলি।

—আলবৎ। বলে উঠলো বিজন।

শেষ দুপুরে ট্রেনটা বেশ ফাঁকা ছিল। আগে বিজন উঠলো, পেছনে টগর—তার হাতে ছোট একটা কাপড়ের প্যাকেট।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা নীচে থেকে বলে উঠলো—সব দেখে নিস বাবুকে বলে—হাওড়ার ব্রিজ, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর।

টগরের ঘাড় নাড়াটা বুঝতে পারলো না দুর্গা। গাড়ি স্পিড নিয়েছিল। সামনাসামনি বসেছিল দুজনে—বিজনবাবু আর টগর। বিজনই বললো—অত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছো কেন, ভয় লাগছে নাকি?

—না, না ভয় কিসের—হাসল টগর। বিজন বললো : আমি কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে তুমি কলকাতা দ্যাখোনি—কলকাতার এত কাছে থাকো, অথচ কলকাতা দ্যাখো নি, আর ওদিকে দুনিয়ার লোক কলকাতায় ভিড় করেছে, পথেঘাটে থিকথিক করছে মানুষ আর মানুষ—সারা ভারতের লোক, সারা দুনিয়ার লোক।

টগরের পাল্টা বলতে ইচ্ছে করছিল যে তারও অবাক লাগছে এক ভদ্রলোক বাস করবেন বলে কত টাকা ঢেলে চকমিলানো বাড়ি, পুকুর, বাগান করে, মালী-মালীর বউ রেখেও সে বাড়িতে একদিন দূরের কথা, কয়েক ঘণ্টাও তিষ্ঠোতে পারেন না—কেন পারেন না?

সে শুধু বললো : কে নিয়ে আসবে—আমার মত অনেক মেয়েই আছে ওখানে যারা কলকাতা দেখে নি—জানেন, আমাদের ভীষণ ভয়—কলকাতায় গেলে আমরা হারিয়ে যাব।

বিজন হো হো করে হেসে উঠলো—ওর নিষ্পাপ সরলতাটা উপভোগ করছিল ও, কিন্তু ওর মনে পড়লো দৈনিক কত শাকসবজি বিক্রিওয়ালী রোজ কলকাতায় আসে আর দিনশেষে ফিরে যায়।

টগর একটু সাহস পেয়ে এক সময় বলে ফেললো বাবু আপনি ওখানে থাকেন না কেন?

—কোথায়' তোমাদের গ্রামে?

—হ্যাঁ।

হাসলো বিজন : ছাখো টগর, মুখ বুজে চুপ করে আমরা থাকতেই পারি না, শুধু মুখবদল করতে যাই মাঝে মাঝে।

—তাও ত বেশিক্ষণ থাকেন না।

—থাকার কি জো আছে—পুকুরপাড়ে বসে থাকতে থাকতে আমার কেবলই ফ্যাক্টরির কথা মনে পড়ছিল, কত কাজ পড়ে আছে বিশ্রামের সময় কোথায়?

গাড়িটা ধীরে ধীরে হাওড়া ইয়ার্ড ছাড়িয়ে স্টেশনে ঢুকছিল। দূরে দূরে কলকারখানায় ধোঁয়া, বড় বড় বাড়ি দেখছিল টগর।

বিজনই দেখালো : ঐটা হাওড়ার পুল, ওর ওপর দিয়ে আমরা কলকাতায় যাব।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই হুড়মুড় করে ফিরতি প্যাসেঞ্জাররা উঠতে আরম্ভ করলো। অতি কষ্টে ওরা নামলো ট্রেন থেকে। চারদিক ফ্লুয়োরিসেন্ট আলোয় আলোকিত। ফলের ঝুড়িঝোড়া, বইয়ের দোকান প্ল্যাটফর্মে আর অগুন্তি লোকের মাথা।

বিজন যাচ্ছিল আগে আগে, টগর তার পেছনে।

হঠাৎ টগর চেঁচিয়ে উঠলো : বাবু—

থমকে দাঁড়ালো বিজন : কী হল?

—আমার ভয় করছে বাবু, আমি ফিরে যাব

—সে কি, কিসের ভয়, আমি ত রয়েছি

—না বাবু, আমি এই ফিরতি গাড়িতেই ফিরে যাই, আপনার কলকাতা আপনার কাছেই থাকুক, আমি চললুম—বিজন হাসি ও বিস্ময় চাপতে চাপতে বলেছিল : আরে শোনো শোনো কাল বাদে পরশু ত ফিরতেই—

ততক্ষণে টগর গাড়িতে চড়ে পড়েছে, তার গলা বুঝি বা শোনা যাচ্ছিল : কিছু মনে করবেন না, আমার ভারী ভয় করছে, আমাদের স্টেশন পাড়ের সেই—

আর শুনতে পেল না বিজন—লোক্যাল ট্রেন ততক্ষণে স্পিড নিতে সুরু করেছে।

শিকড়ের দিকে ঃ কিরণশংকর সেনগুপ্ত

একেবারে শিকড়ের দিকে যেতে হবে।
দেখা যাক মাটির আড়ালে
কতোদূর সহিষ্ণু বৃক্ষের
অব্যাহত স্বাধিকার,
দেখা যাক ইট পাথরের ঘসা লেগে
কোথাও আলগা হ'লো কিনা
আয়ুর বিস্তার।

একেবারে শিকড়ের দিকে যেতে হবে
কেননা বাইরে বজ্রপাতে
বার বার ঝলসে গেছে বহু বনস্পতি,
বৃক্ষের শরীর।
স্পষ্ট নয় মুখের আদল, নিশ্বাসের
দ্রুত চলাচল
যেন স্তব্ধ হয়ে আছে,
চতুর্দিকে লতাপাতা গুল্মের ভিতরে
আবছায়া, যুগের বিকার।

একেবারে শিকড়ের কাছে যেতে হবে
যেখানে মমতা,
গাঢ় রস ক্ষতহীন কিছু সহিষ্ণুতা,
এখনো নিভৃতে জেগে রয় ;
যেখানে বীজের উৎস
জয় করে ভ্রান্তি কিংবা ক্ষয়॥

জীবনকে নিয়ে যারা ঃ শিবদাস চক্রবর্তী

জীবনকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে,
অথবা যাদের কাছে এ জীবন নিশার স্বপন
কিংবা যারা জীবনের অর্থ খুঁজে অযথা হয়রান,
আরেক জীবন আছে এই জীবনের পরপারে—
এই ভেবে এই জীবনের সঙ্গে করে প্রতারণা,
আমি নই তাদের দলের। জীবন আমার কাছে
শুধু অপরূপ নয়, অতলান্ত বিপুল বিস্ময়।
নিত্য তার নব রূপ, ভিন্ন স্বাদ সকাল সন্ধ্যায়।

বাস্তবের কশাঘাতে স্বপ্ন হলে ভেঙে চুরমার
জীবনকে দায়ী করি, জানাই ধিক্‌কার।
নতুন স্বপ্নের কুঁড়ি ফুটে ওঠে বৃন্তে যেই তার
আবার জড়াই তাকে অনুরাগে নিবিড় আশ্লেষে।
ধার্মিকে তার্কিকে মিলে যত খুশী করুন বিবাদ,
তাত্ত্বিক কাটান জেগে বিনিদ্র প্রহর,
আমি ততক্ষণ বসে সুরসিক কৃপণের মতো
সানন্দে লেহন করি জীবনের তিক্ত-মধুরস।

কেন বলি ঃ শান্তশীল দাশ

কেন বলি ঃ মনে রেখো। মনে রেখে দেবে কি না দেবে,
সেটুকু দেখার জন্যে কোনদিন আসবো না ফিরে।
তোমার চোখের কোনে নামবে কী তপ্ত অশ্রুধারা।
অথবা বিস্মৃত হব একেবারে—দেখবো না কিছুই।

তবু কেন বারবার এই কথা নিঃশব্দে জানায়
এই মন ঃ ভুলো না তুমি,মনে রেখো, মনে রেখে দিও ;
অবসরে এক ফোঁটা আঁখিজল ফেলো মনে করে—
অর্থহীন এ কামনা, বুঝি, তবু মন-যে মানে না।

যেটুকু পেলাম এই খানে,
সেই পাওয়া নিয়ে খুশি কেন-যে হয় না এই মন।
কেন আশা করে থাকে, স্মৃতি তার থাকুক উজ্জ্বল
কারো মনে, অবসরে ফেলুক সে কিছু আঁখিজল
সেই স্মৃতিটুকু নিয়ে ঃ এ আশা কত-না অর্থহীন।

যদিও লক্ষ মানুষ : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

যেখানে লক্ষ মানুষ সেখানে কি বসে বসে
দিনরাত্রি মশা-তাড়ানো
একজন ছা-পোষা কিন্তু সারাদিনই টহল পাড়ছে
রাতে কতটুকু ঘুম
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে লাভাস্রোত
লাল রক্তের গাঢ় ধারা
অন্যদিকে ছাই শুধু ব্লাস্ট ফার্নেসের
কোন ফার্নেস সত্য তবে
এ ওর ঘাড়ে যেখানে ঢলে পড়ছে
পথে দাঁড়াবার জায়গা নেই
ঘুমোবার সময় কমেছে
যদিও লক্ষ মানুষ
দিনরাত্রি মশাই তাড়ায়।

ঘর : বাসুদেব দেব

দুই দিকে ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে দিগন্ত অবধি
এক পাটি জুতো কার ভাঙা ঘোড়া হারানো চামচ
ছেঁড়া বই পোড়ো ইট অজস্র চোখের মণি আঙুলের নখ
পোড়া কাঠ যন্ত্রপাতি স্প্রীং আর জং ধরা লোহা
ওখানে সংসার ছিল খেলা ছিল
শিল্প আর প্রেম রাজনীতি
এই সব ফেলে রেখে শামুকের মত ভণ্ড নাস্তিকের মত
চলেছে সে খুঁজে নিতে ঘর।

স্মৃতি চিহ্ন : বিজয়কুমার দত্ত

দিন ক্ষণ পল অনুপল
মুহূর্তকে বেঁধে রাখে পাঁজির পাতায়
তিথি ও নক্ষত্র থেকে ছুটে আসা সময় শরীর—
এই সব তবু কিছু নয় :
আসলে অনন্ত নীল যবনিকা পারে
কেউ যেন বসে থাকে তারই অপেক্ষায়
সমস্ত জীবন যেন ছট্‌ফট্ করে যেতে চায়
হাত-পা বাঁধা বন্দীর স্বভাবে

হঠাৎ এক একটা দিন মুক্তির স্বাধীন
বাতাসের আসা যাওয়া চলে
ঘ্রাণের ভিতরে
যদিও যৌবন গেছে জ্ঞানলাহীন বদ্ধ কারাগারে
অকারণ মাথা ঠুকে ঠুকে—

তবু সেই মাথা উঁচু করে
নশ্বর অস্তিত্ব ফের নিজেকে অজর
অফুরান যৌবনের উদ্ধত প্রতীক বলে' আজ
পৃথিবীকে ডেকে বলতে চায়
ঘড়ির দোলন, কিংবা ক্যালেণ্ডারে হরফ ঘোষণা
কতটুকু পরিচয় দিতে পারে তার ?

পুরাতনী : হৃদয় হৃদয় : শামসুল হক

চৌদিকে বিষ ছড়ানো
চৌদিকে বিষ ছড়ানো
নেই রে বুড়ো ওঝা
নীল ভুবনের হলুদ শিকড়
লাল লিরিকের প্রজা
পার্বতীকেও পদ্মগোখুর
ছায় টল্‌টল্ তীব্র ঝুমুর
একটু তবু থাকেই
চাঁদবেনে সায়বেনে ছাখে
পুত্রকে কন্যাকে

সারা রাত ধরে ঘুমের আগুনে : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেজলণ্ঠনের গোল ছায়া পড়েছে। রাতজাগা দেয়াল
চেয়ে আছে গূঢ় কোটরের নিচে ঢুকে যায় ঘুমন্ত মানুষ।
পাছতলায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে বেড়াল, চৌকি-বাক্‌শ-আলনাভর্তি জামাকাপড়
আবছায়া বনপাহাড়সরিৎস্বপ্নের পুরু মণ্ডনের ছোপ হয়ে ভেসে :
মাঝ দিয়ে ছুটেছে জিত সোয়ারের একা ভোট ঘোড়া—
ডালপালানিষুত মুখে ঝুঁকে পড়ে, উদাসী বৃক্ষের
নিচে জেগে বসে আছে শেজলণ্ঠনের গোল ছায়া।
হিম কালো ছায়া—এত হিম কেন ? পাথরতুষারে জ্বলে ছায়া···
মোটা মোটা ঝুরির বেণীতে জোঁক, বর্ষার শৈবাল
ঘুমিয়ে রয়েছে—ঢঙ ঢঙ বেজে গেল হুকুমদার ঘড়ি—আঁধাধাঁধা পথঘাট,
গোল শূন্য চক—দপ্‌দপ্‌ কাঁপছে তীরের পুঙ্খা !
শত ফোয়ারায় ফুঁসে উঠে আসে মাটির তলার
বিষজল—নিয়তি আছড়ে পড়ে চুলের রেণুতে, গাল বেয়ে
গলে পড়ে সারাদিনকার সব হেরে যাওয়া···পিছোতে পিছোতে
আশপাশ দশপাশ জুড়ে কালো গুমোট কোটর
আন্ত মানুষ গিলে ফিরে শুলো। বেড়ালকুণ্ডলি
হিম কালো ছায়া—এত হিম কেন ? পাথর দেয়ালে জ্বলে ছায়া
ছায়া গলে যায় সারারাত ধরে ঘুমের আগুনে

জেগে আছে শেজলণ্ঠনের গোল ছায়া···

ডিনামাইট : মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

কয়েকটা ডিনামাইট চাই—
পাথর চাপা পাগলা ঝোরা
জলস্রোতে মৃত্তিকাকে উর্বরা করুক
কিংবা অতল পাতাল থেকে
উঠে আসুক কালো সোনা।

একদিন ভাবতাম—আমার শ্যামলী বৌ
তার চোখ থেকে সত্যি সত্যি
ছুঁড়ে দেবে ডিনামাইট—
হয়তো বা তার দীর্ঘ পায়ের
নূপুরে বাজবে সেই সম্ভাবনা।

সূর্য ঢলে পড়ে এক দ্রাঘিমাংশ থেকে
অন্য দ্রাঘিমায়—
বুকের সুদূর থেকে ঠিক শব্দ
উঠে আসছে না—
রগের পাশে পাকাচুল টানে
অনুবাদহীন অনুভবকে
সমাধির দিকে—

অত্যন্ত দ্রুত কয়েকটা ডিনামাইট চাই।

গঙ্গা-বাণী ঃ পরিমল চক্রবর্তী

নবদ্বীপের চিত্রে, গল্পে, কাব্যে, চৈতন্যমঙ্গলে
গঙ্গার পবিত্র রূপ কী-প্রশান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা,
নিয়ে বেঁচে আছে, ছাখো, একবার ভেবে ছাখো শুধু!
কোথাও বিচ্ছেদ নেই কামরূপ-বঙ্গ-উৎকলে
কীর্তন-প্লাবিত সেই পূত ঋদ্ধ পটভূমিকায়।
সবাই গৌড়ীয় তারা ; শ্রীহট্ট-পুরী-বৃন্দাবন
যেখানে হোক না ঘর, ভূগোলের যে-কোনো প্রান্তরে,
অন্তরে-অন্তরে তারা সকলেই এক সঞ্জীবনী
মন্ত্রবলে উদ্দীপিত।

অথচ আশ্চর্য, কী-কুটিল
হিংস্রতায় মত্ত হয়ে পরস্পর ধ্বংসের পাতাল
খুঁড়ে চলছে দিগ্‌ভ্রষ্ট সাম্প্রতিক জগাই মাধাই!
অথচ তারাও জানি অনুতাপে পুড়ে সোনা হয়ে
ধ্রুবপথ খুঁজে পাবে একদিন ; আজো তাই জননী গঙ্গার
স্নেহকণ্ঠ শুনতে পাই ঃ অন্তরের নিগূঢ় কালিমা
মুছে ফেলো, শুদ্ধ হও, ক্ষমা-মন্ত্রে বিভেদকে ভোলো ;
নবদ্বীপ তীর্থ হ'তে ধূলিরেণু নিয়ে যাও কুটিরে-কুটিয়ে।

মহাযাত্রিক ঃ সুমনা দাস

বুকের মাঝে নৈঃশব্দ্যের
পাহাড় জমে অটুট
শালিক পাখি জোড়ে পালায়
তিতির ডাকে হাওয়ায়
তবুও সন্ধ্যা ঘোর হয়নিকো রাত্রিতে॥
সূর্য্য তাহার প্রাখর্য্য নিয়ে
মিশে যায় প্রতীচিতে
জন-সমাগম ধীর বিক্ষেপে
স্থান লয় প্রান্তরে
এখনও বিলাপ রূপিত হয়নি হরি ধ্বনিতে॥
এক শরীর ক্লান্তি মেখে
ফিরে আসে কেউ কেউ
শূন্য শয্যা শুভ্রতা নিয়ে
অপলকে চেয়ে থাকে
এখনই সন্ধ্যা ঘোর হল রাত্রিতে॥

দুঃখ পেলে ঃ প্রবীর সরকার

দুঃখ পেলে কি মুখ বুজে সহ্য করা যায়?
তুমিই বল,
শ্রাবণী মেঘের ধারা—সে তো হবেই
তাই বলে আমি কি জলে যাব না?

ওরা আমায় ভালো বাসবে বলেছিল
এই বালুচরে অনেক অনেক দিন আগে
তারপর ওরা চলে গেল মস্ত এক পালতোলা জাহাজে
তারপর কত ঢেউ আছড়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে
কত জাহাজ বন্দরে ভিড়ল শাদা নিশান উড়িয়ে
কলকাতার রাজপথ অনেক সুন্দরী হোল
সুরার পাত্রে মন্ত্রী বদল হোল অনেক অনেক বার
—তবু আজও ওরা ফেরেনি
ওরা আমায় ভালো বাসবে বলেছিল,
ওরা এই সমুদ্রের বুকে মস্ত এক প্রমোদ-তরণীতে
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুঃখ পেলে বল বল,
আমি কি এখনও মুখ বুজে সহ্য করব?
আমি কি চীৎকার করে সমুদ্রে ঝড় ডেকে আনব না?
আমি কি ওদের জাহাজকে লণ্ডভণ্ড করে দেব না?
বল মনীষা, দুঃখ পেলে
আমি কি শিশিরের শব্দের মত কাঁদবও না!

মন্দিরা : শংকর দে

তুমি একটা ছবির মতো।
মুখে কিছু না বললেও
আমি তোমার চোখের ভাষা বুঝি।

ছায়ার মতো জলের মতো।
চোখে কিছু না দেখলেও
আমি তোমার মনের ভাষা খুঁজি।

পাথর হলো পাগল হলো মানুষ
আঁধার হলো প্রদীপ হলো মাটি
নীরব হলো বধির হলো চিতা

চোখের জল না পড়লেও
আমি তোমার পথের ভাষা বুঝি।

অন্যরূপ : গৌতমকুমার হাজরা

ছেয়ে আছে চারিদিক—গ্রাম, মাঠ, সবকিছু
মমতার মতো,
যতদূর চোখ যায়—শুধুই-ধূসর স্নিগ্ধতা
অশান্ত ঝাউবনের নিচে, ধূ-ধূ বিজন সাগরসৈকতে।

প্রদীপের নীচে সুখ-দুঃখ-ভালোবাসার জটিল বিকার
তীব্র আকাঙ্ক্ষায় রক্তের ভেতরে বাজে দুরন্ত
আদিম।
বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে দুঃস্বপ্নের নগরী
ফিরে আসে—প্রতীক্ষার প্রহরে প্রহরে—
বিস্ময় জেগে ওঠে শহরের মুখে
এবং সন্ত্রস্ত হাতের মুঠোয় ধরা থাকে উত্তর পুরুষ।
এখন মধ্যাহ্ন
পৃথিবীর অন্যরূপ।

যাওয়া : রথীন্দ্রনাথ রায়

যাওয়া
যা ভেঙে দিয়ে যায় শক্তসমর্থ গরাদ
ফ্রেমে বাঁধা কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি
অভাববোধ ছবি হয়ে থাকে

যাওয়া
যা ছাপ এঁকে দিয়ে যায় হয়ত পায়ের
ধুলো মাখা কিছু উজ্জ্বল পথে
যদিও মুছে যাবে যাওয়া

অভাব মানেই
বাতাসের শব্দ ছুটে
ঝড় এসে যাবে হঠাৎ
যা ভেঙে দিয়ে যায়
আরো শক্তসমর্থ গরাদ

ছেলেটা : শ্যামলকুমার দাশ

ছেলেটার বুক ছিল
সরল স্বচ্ছ মুখ ছিল
বাদামী রংয়ের হৃৎপিণ্ড
ভালোবাসা ছিল ছেলেটার
এতটুকু ছিল না অহংকার
যাকে তাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল
ছেলেটা

এই সব নির্বোধ পাপপুণ্য নিয়ে
সাঁতার কাটতে চেয়েছিল ছেলেটা
শেষে সাঁতার কাটতে কাটতে ছেলেটা
সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছুতে পারে নি কোনদিন।

আশ্চর্য মাতাল ঃ সন্তোষ চক্রবর্তী

না গেলেই নয়, স্বপ্নে বা পুকুরে
না গেলেই নয়
কেননা বুকের ভিত নড়ে ওঠে,
শহরের প্রান্তে কোনো মৃত্যু কোনো রাত
মন্থর স্মৃতির দিকে পা রাখে...

স্বপ্নে বা পুকুরে আর অভিকর্ষ নেই,

আশ্চর্য শরীর ডুবে গেলে
মাতাল যে কতো শান্ত সমাহিত
হতে পারে
প্রেম তা জানে না, শব্দ-ও জানে না ॥

চাঁপা আগুনের ধোঁয়া ঃ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনে টঙ্কার ছিলো এই জেনে ছিলায় রেখেছি টান, তাই ঝড় থেমে আছে—
তাই রক্ত পাথরকুচির ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি, তার শিকড়ে-বাকড়ে জন্ম,
পাতায়, কাণ্ডে, শাখারোমে থির হয়ে থাকে গহন অঙ্কুর
আমি এই স্তব্ধ ভীড়ের বুকে একা সারাক্ষণ জেগে আছি টানটান,
কেবল আমার এই ঠাসবুনোটি বারুদ ঠোঁটে ও শরীরে উসখুস
বসন্ত ভাঙবে বলে, চুরোবে মণ্ডপ, শ্মশানে ওড়াবে ধুলো-ছাই,
টুঁটি চেপে ধরে দেখি তক্ষকের হাঁসফাস
টাটাল মাটাল ডিঙিখান্,
তোমরা যে-যার ঘরবাড়ী, আপন-বাগান সামলাও,
সারাটা শরীর জুড়ে চাপা-আগুনের ধোঁয়া
বিস্ফোরণে খার হয়ে যেতে পারে বুক-বুক করে রাখা তোমাদের রাজ্যপাট।

ইচ্ছা-কলম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় সাহিত্য

সাহিত্যের অনুরাগী পড়ুয়া, সাহিত্য বলে কী আপনি পড়েন? প্রবন্ধ নয়, সে হল জ্ঞান-তথ্যের আড়ম্বর, যার কাজ সে পড়ুক গিয়ে। কবিতা? কম্পোজিটরেরাও যদি একটু দেখে পড়তেন। ছোটগল্প, যা নিয়ে বিশ্বের দরবারে বাঙালির অহঙ্কার? লিখিয়েরা বলেন, প্রকাশক তাঁদের বই ছাপার ঝুঁকি নিতে নারাজ। বাকি রইল

যেটুকু পাঁচজনার কথা জানি, সাহিত্যেরঁঅনুরাগী হলেন উপন্যাসের গোগ্রাসী পড়ুয়া। সেদিকে চেয়ে গত ক-বছর গর্মি মাসে যে প্রকাশন-খতিয়ান বেরোচ্ছে সাময়িকপত্রে, দেখছি উপন্যাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে কেউ কিছু না। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের কবিযশঃপ্রার্থীদের স্বমুদ্রিত বই বা মধ্য-উচ্চ-শিক্ষার্থী-দের জন্য নানা বিষয়ের বিপুলোৎসাহিত বোধিনীপ্রবন্ধ তালিকাগম্য হয় না। সে ধরনের অনুল্লেখিত উপন্যাসও বড় কম নয়, জানলে জানা যেতে পারে।

পাঠক অহরহ উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়তে চাইছেন,—চায়ের সকালে, বাসট্রামের সহসা আসন মিলে গেলে, তাসের চতুরঙ্গী-চ্যুত একলা রেলযাত্রায়, উঢ়া-অনূঢ়ার প্রতি রন্ধ্রের অবসরে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একদা অবহেলা করে লিখেছিলেন, 'বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী', সেই উপন্যাস তো নিজেও শুরু করেছিলেন লিখতে। দ্র' বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বাংলা গ্রীষ্মবার্ষিকী বৈশাখী ১৩৬২ বর্ষের সংখ্যা। জীবনানন্দের মতো অমন আদ্যোপান্ত কবির অন্তত দুটি উপন্যাস বেরোলো পর-পর, মরবার পরে অবশ্য। লিখে গিয়েছিলেন। আরো পর দিয়ে আগাগোড়া আরেকজন তরুণতর কবি আলোক সরকারের অল্প বয়সের লেখা উপন্যাস সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছেপেছিলেন পূর্বাশা কাগজে।

কবির লেখা যে উপন্যাস সে উপন্যাস সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছিলেন পরপর একাধিক্রমে প্রায় পেশাদার ঔপন্যাসিকদের মতো করে, অনেকে বলেন সে সব লেখা তাঁর কবিতার চেয়ে পারঙ্গম। কিন্তু তার একটিও আর বেঁচে আছে বলে জানি না। কারোর কাছে শুনি না 'রাত্রি' পড়েছিলাম 'সৃষ্টি' পড়েছিলাম। কবিদের লেখা, সে নিশ্চয় ভালো। কিন্তু কবিদের উপন্যাস যদি পড়তে হয়, আছে 'শেষের কবিতা'; কলেজ-কলেজ-পেরোনো অনতিবয়সী একাধিকের কাছে শুনলাম সাংস্কৃতিক প্রেমের ভাষা জানতে এই বই না পড়লেই নয়। তা ছাড়া, আরো বিদগ্ধ যাঁরা বললেন, পাঁচখানা অন্নদাশঙ্কর পড়বার চেয়ে একখানা 'শেষের কবিতা' পড়াই ভালো। নয় তো কী! দেখুন, অমন কবিত্বকে অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসে জনপ্রিয় করে রাখতে চাইলেন কেন? পাঠক উপন্যাস থেকে না পড়ে এখন পড়তে চাইছে ছড়া থেকে। কেন লেখেন না উপন্যাস আসলে যদি আপনি কবি? কার

জন্যে ? বিভূতিভূষণ মানিকবাবু এঁরাও তো শুনি কবি। মানিকবাবুর একখানা কবিতার বইও ছাপা হয়েছে। এঁরা তো হালের লোক। আমাদের কথাসাহিত্যের পিতৃস্থানীয়, বঙ্কিমচন্দ্র ? তিনিও যে কবিতা লেখা ছেড়ে বসলেন কবিপ্রাণ উপন্যাস লিখতে। তা যদি বলেন তা হলে দেখুন, আমাদের এখনকার মান্য এক কবি-ঔপন্যাসিক কী বলেন। চল্লিশ পেরোবার পর আশৈশবের শ্রুতকীর্তি বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস পড়তে গিয়ে দেখলেন কি না হিন্দী ছবির আর্কেটাইপ। তবুও উপন্যাস-পড়ুয়ার উপন্যাস বলতে পারব ? অন্য খ্যাতি থেকে আসা খ্যাতি—বন্দেমাতরম্, কৃষ্ণচরিত্র, জাতীয়তাবাদ—এই সব খ্যাতির জন্যেই জেনে রাখতে হয়। প্রিয় পাঠ্য নয়, জ্ঞাতব্য।

মূলে কবি, ইতিহাসের সম্পদ এঁদের লেখা। সবসময়ের ব্যবহার মেটাবার তাই বলে ? এ তো পাশকাটানো কথা। তা হলে বলি, বড্ড কথা কচাকচি ভেতরকার। নইলে অকারণ মন খারাপ করে দেওয়া। সমাজ-সামাজিকতা কই ? ভালো উপন্যাস যে শুনি আখ্যানকবিতা হয়ে ওঠে ভেতরকার কচাকচি নিরানন্দ এসব নিয়েই ? সে তো বটেই—পথের পাঁচালী অন্তর্জলী যাত্রা শীর্ষেন্দু। বড্ড বড় বড় পড়ছে যে পা উপায় নেই। পুতুল নাচের ইতিকথা চৌড়াই তিতাস—বাদ পড়ল গণদেবতা নাগিনী কন্যা। থামি নি এখনো। তারাশঙ্কর কিছু-জগদীশ গুপ্ত অমিয়ভূষণ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—সমাজই তো এদের সপাট চলাচলের জমি। এটা কী হল ! বাদ দিয়ে গেলেন শঙ্কর-সমরেশকে ? একালের সমাজকে জানতে গেলে···অবশ্য সমাজের কথাই তোলেন তো শরৎবাবুর তুল্য নেই এখনো। নিজেদের ঠিক চেহারা দেখতে এখনো শরৎবাবুর উপন্যাস পড়তেই হবে। সব্বার পড়তে হবে। ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া উচিত শরৎ রচনাবলী। এ দায়িত্ব তো সরকারের। শস্তায় শরৎচন্দ্রকে পাওয়ার দাবিতে গণকমিটি গড়তে হবে পাড়ায় পাড়ায়। একশোয় নয়, অর্ধেকে।

কী হবে শরৎচন্দ্রকে জেনে এখন ? ইতিহাস পড়ছি নাকি ? এ কী কথা ! চলে গেছে নাকি শরৎচন্দ্রের সমাজ-সমস্যা ? গ্রাম দেখেছেন ? গেরস্থঘর ? দেখুন, এখনো যে শরৎচন্দ্রের জয়-জয় বইছি মাথায়, তারই প্রমাণ আশাপূর্ণা দেবীর এই সদ্য ভুবনজয়ী পুরস্কার। পড়েছেন ? দুই উচ্চশিক্ষিত পড়াশুনোর ব্যবসায়ী, প্রথমজন পুরুষ, বললেন—একটা স্পষ্ট জায়গাঅঞ্চলের মধ্যবিত্ত গেরস্থ ঘরের ভাষা পরিভাষা নিখুঁত অন্তরঙ্গ পড়লুম সত্যিকার ঘরণী মেয়েমানুষের চোখ দিয়ে। কায়দা নেই, ভেজালও নেই। দ্বিতীয় মহিলা বললেন, মোটে দশ পৃষ্ঠার পুঁজি গ্যাজগ্যাজ করে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কী যে লেখা - ফাঁপা, ট্র্যাশ ! বেঁচে থাকুন জেন অস্টেন, মেয়েদের লেখা পড়ি তো ওই অবধি।

তবে মেয়েদের লেখা মানেই যে একসময় ভশ্চাজ্জি বামুনের নীতিপাঠ দাঁড়িয়েছিল সে তো আর এখন পড়তে হয় না। মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন। ভয় করে, মেয়েদের লেখা বলতেই মনে পড়ে যায় অনুরূপা-নিরুপমার সেই সব উপন্যাস। সে একদিন গেছে। তবে, অভয় দেন তো একটা কথা বলতে উশখুশ লাগছে। বাঙালি লেখকদের অনেকের লেখা পড়তে গিয়েই কি মনে হয় নি, মলাট উলটে নামটা ভালো করে দেখে আবার মনে হয় নি—ছদ্মনাম নয় তো ? বাঙালির ছেলে এখনো কবিতা ছাপার সহজ ছাড়পত্র

পেতে মেয়ের নামে কবিতা লেখে। উপন্যাসে হয় তো বা উলটো। অবশ্য মেয়েলি লেখাই আদরের লেখা, কার নয়? আমাদেরও। বলুন, যদি না জানতেন আরো কাউকে কাউকে, বা বিমল মিত্রকেই, কী মনে হতো? আপনারও?

আসলে সুখ-রোমাঞ্চ পাব বলেই না পড়া! এক হাতে আর কত লিখবেন রোমাঞ্চ, শরদিন্দু? নির্বিষ যে যৌনতা, সেও একটু ভালো বাঙলা করে বললেই গেল গেল। নইলে বুদ্ধদেবের বই নিষেধ হয়? কেন, বাঙালি পাঠক কি যথেষ্ঠ 'এ'-বইসী হয়ে উঠতে পারেন না। বোধ হয় নিজেদেরও তাই বিশ্বাস। নইলে সমরেশ বসুর একটা বই চোখে পড়ল তো চোখে কাপড় দাও, নয় তো যেন হুমড়ে পড়েছে। এ আজকের ব্যাপার নয়। অচিন্ত্যকুমার-বুদ্ধদেবকে আর কোনোদিকে যেন চাইতেই দেবে না এই বিশেষ খ্যাতির ঘেরে বেঁধে ফেলে। দুর্ভাগ্য, দুজনকেই উপন্যাস ছেড়ে বিষয়ান্তরে যেতে হল অন্য কথা বলার জন্য।

কাজেই, কী দরকার বাপু ঝামেলার। তর্জমা করে নাও যা দরকার। হ্যারল্ড রবিন্স্, আলস্ট্যার ম্যাকলীন, দাগাবাজি চাও তো আয়ান ফ্লেমিং, হেডলি চেস।

অত লঘুচিত্ত নই, তো পাব কোথায়? বুদ্ধিজীবী লেখক কই? নাম শুনেছি বটে ধূর্জটিপ্রসাদের। এক একবার ভাবি, দরকার কি কষ্টকৃত লেখার? একএকবার ভাবতে হয়, বুদ্ধি তো শুধু মগজের নয়, হৃদয়ে বোঝা বুদ্ধিও বুদ্ধি। মনে হয় যাঁদের মুখে হোমারদ্বৈপায়নের মুখ, জগতের তাবৎ বিদ্যা মানুষের যাবতীয় ছায়াপথ যে-নর জেনেছেন লেখার আগে, সেই সব লেখকের পায়ের কাছে বসে অনুগত হয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়—যেমন এইসব লেখা: মায়া পাহাড়, পুরোনো জিনিশের স্মৃতি, অমানুষকারী জগৎচেষ্টার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজের মানুষগন্ধ বাঁচাবার জন্য যোঝা 'প্লেট'র মতো লেখা। বাঙালি লেখক হয়তো এমন জীবননিয়োগ করে লিখতে ভয় পান পাঠকের কথা ভেবে, মূলত যাঁরা সেই প্রাক্‌চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তরল্লিশ পৌরস্ত্রী, সুধীন্দ্রনাথ যে ভাবে নির্ণয় করেছিলেন। তবু, সময়ের চাপ বলেও তো একটা কথা আছে। সল বেলোর এক উপন্যাসের নায়ক বলছে, পৃথিবীর এই সবচেয়ে খারাপ সময় কিনা আমি জানি না, কিন্তু সব যে ধসে যাচ্ছে চারদিক ভর্তি সেই খবর আর আওয়াজ, আমারও গায়ে তার আঁচ লাগছে।

আঁচ আমাদেরও গায়ে, আমরাও যুঝছি সমাজ-মেশিনের মধ্যে থেকে তার বিরুদ্ধে, কিন্তু অত মনখারাপ করা ভারি লেখা পড়তে আমাদের ভালো লাগে না। যা পড়ার এমনি কুণ্ঠা, তা লেখবার দম আসবে কিসে? এখনো পড়তে চাই সাধারণ মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা যিনি সিংহাসন ছেড়ে সমাজকল্যাণের শর্ত নিয়েছেন। কিংবা ভবঘুরে নিষ্কিঞ্চনের জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে রাজকন্যা—অর্থাৎ কি না মিলমালিকের একমাত্র মেয়ে, দুজনের হাতে বিপ্লবের নিশান। এই হল সুখরোমাঞ্চ যোগ সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা। খুলে বলি, আরো একটু চাই, একটু পারমিসিভ সমাজ—মাঝারি ঘরে যে সব কথা ভাবতে সাহিত্য সংস্কৃতির হাত ধরে যাওয়াই সহজ। আর সৎসাহিত্য মানেই সমাদৃত উপন্যাস, সমাদর মানেই সিনেমাস্বাগত, আর সেন্সরশাসনে যা যা সেলুলয়েড-পরিস্রুত হয়ে আসতে পারল না তা জানতেই না রোজ যাত্রা ভুলে দিন জেগে সাহিত্য পড়া। কত আছে সাহিত্যে, না পড়লে কিছুতেই পাবার নয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২৭ জুলাই ১৯৭৮। আজ সকালে শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভাতকুমারকে সাহিত্যসাধনার সর্বোচ্চ মর্যাদা জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করলেন। প্রভাতকুমারের আজ সাতাশি বছরের জন্মদিন। সত্তর বছর আগে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধচ্ছেদ হয়েছিল। সত্তর বছর অবশ্য লাগে নি, তার অনেক আগেই ১৯৫৩ সালে সরোজিনী বসু পদক দিয়ে ১৯৫৯ সালের লীলা-বক্তৃতা ও ১৯৬৪ সালের বিদ্যাসাগর-বক্তৃতার বক্তারূপে বৃত করে বিশ্ববিদ্যালয় হৃতযোগ দৃঢ়রচিত করে নিয়েছিলেন। তবু নতুন সম্মান নেওয়ার সময় প্রভাতকুমারকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখি অভিপ্রেত তাঁর স্থানটুকুতে। খবরকাগজের উদ্ধৃতি এই রকম, 'বিশ্ববিদ্যালয় আমায় সাহিত্যসাধক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যদিও নিজেকে আমি মানি ইতিহাসসন্ধানী।'

প্রভাতকুমারের প্রথম বই অল্পবয়স্কের পাঠ্য ইতিহাস বই, যদুনাথ সরকার তার ভূমিকা লিখেছিলেন। তারপর প্রভাতকুমার পরিণত সুচিন্তিত ইতিহাস লিখেছেন—পুরোণো পৃথিবীর ইতিহাস, বৃহত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস, আবার রামমোহন রায় ও সেই সময়কার সামাজিক ইতিহাস লিখেছেন, আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। কেবল ইতিহাস নয়, আরো অনেক বিদ্যা আরো অনেক বিষয় সগৌরবে রয়েছে তাঁর রচনাতালিকায়। তবু সবচেয়ে অনপনেয় তাঁর যে সৃষ্টি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুপূর্ব জীবনবৃত্তান্ত, 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক' উপনাম হলেও তাকে সর্বতঃ গ্রহণ করতে হয় রবীন্দ্রইতিহাস বলে, আর রবীন্দ্রইতিহাস বলতে তো উনিশবিশব্যাপী শতবর্ষের বাঙালিরই ইতিহাস।

এই গুরু ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রভাতকুমারকে স্মরণ করতে দেখি অনূন থুকিদিদেসের নাম, তাঁর নিষ্ঠা, সত্যদর্শিতা। প্রথমাংশের নতুন সংস্করণ কালে ইন্দিরা দেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে দেখি 'রবীন্দ্রজীবনী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই দুইটি কথা ছাড়া পুরাতন গ্রন্থের কিছুই বোধ হয় ছাপা হইতেছে না'—ইতিহাসবিদেরই যোগ্য এই ভাষা। সে ইতিহাস রবীন্দ্রনাথেরই কাছে যখন জানতে যাওয়া হয়েছিল 'দুই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহে'র মাঝপথেই ক্ষান্তি দিয়ে তিনি সম্ভোগ করতে বসলেন নিজের হাজার স্মৃতি, যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে প্রস্তুত হল সুরভিময় আর তথ্যপরাঙ্মুখ 'জীবনস্মৃতি'। 'জীবনস্মৃতিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনের শেষ কথা বলিয়া মানিতে পারি না।' প্রভাতকুমারের এই উক্তি ঈষৎ সেরে নিয়ে তবু বলতে পারি, শেষ কথা না হোক, অন্তত সব কথা বলে মানতে পারি না। প্রায় একই সময় যে রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থখানি অজিতকুমার চক্রবর্তীর, কিছু বেড়েছে সেখানে জীবনসীমানা—কিন্তু সে হল অন্তরের অভিব্যক্তির বিবরণ, 'জীবনস্মৃতি'র পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে কথা বলেছিলেন, 'সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন' তারই সম্পূরণ, সেও ইতিহাস নয়। প্রভাতকুমারের চরিতাখ্যান যদি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী বলেও মনে হয় তার কারণ পূর্বাপরের একেলে সন্ধিৎসা, বা পুরোনো কুলগ্রন্থীদের প্রভাব। দুই-ই ইতিহাসপ্রবণতা।

'স্বভাবত ইতিহাসবিমুখ' 'স্বভাবত তথ্যসন্ধানে পরাঙ্মুখ' আমাদের জন্য প্রভাতকুমার তাঁর দীর্ঘ দীর্ঘ জীবন নিয়োগ করে গড়ে তুলেছেন অতিকায় এই জীবনবৃত্ত, দেশমানুষের নিত্যবিনিময়ের মণ্ডন যাঁর কপালে লেগেছে।

'রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র কবি হইতেন তবে হয়তো তাঁহার জীবনচরিত রচনারই প্রয়োজন হইত না, কারণ কাব্যই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।' কিন্তু কেবল-মাত্র কবি তো নন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সূর্যশুভ্র আলোর মধ্যে অন্তত সাতরঙের বর্ণালি। কবি, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি বিচিত্রকর্মা এই কবি। অজিতকুমার 'জীবনের ভিতর হইতে কাব্যকে, অথবা কাব্যের ভিতর হইতে জীবনকে' দেখবার আয়োজন করেছিলেন, প্রভাতকুমারের আঙ্গিক আরেকরকম। নন্দনতত্ত্বের উপর জোরটুকু না চাপিয়ে, এক একটি জীবনমুহূর্ত ঘিরে তিনি স্তূপিত করে তুলেছেন তথ্যউপচার, 'শতদলবিহারিণী জীবনদেবতা'র শতপথের বিবরণ। 'তাঁহার রসাত্মক কাব্যজীবন রহস্যময়' প্রভাতকুমার লিখেছেন। রহস্যমোচনের চাইতে স্পৃশ্য লোকগম্য বিবরণ—সেই কি বরণীয় নয় জীবনেতিহাস বর্ণয়িতার? এর পরেও, অভ্যাশবশে এই লেখারও থেকে খুঁজতে যাই কবিতাউৎকর্ষ মল্লিনাথকে, কিন্তু তখনও পূর্ণ হয়ে থাকতে হয় তাঁর বিপুল সহায়তায়। প্রায় অর্ধশত বছর ধরে, মোটে সতর পৃষ্ঠার একটি বর্ষ-পঞ্জী থেকে শুরু করে কণা কণা পূরণ করে তোলা প্রতিদিনের রবীন্দ্র দিনপঞ্জী—এতখানি এখন হাতে তাঁর, চল্লিশ হাজার কাগজ কার্টিং-এর স্তূপ গুছিয়ে সার্ধ-সহস্রাধিক পৃষ্ঠার চার খণ্ড গ্রন্থ দিনে দিনে সংস্করণে সংস্করণে অভূত অবরুদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমাগত, রবীন্দ্রনাথ পড়তে এর চেয়ে বড় এর চেয়ে বেশি নির্ভর আর কোথায় পাওয়া যাবে এখন?

পাঠক গবেষক সাহিত্যামোদী বিচিত্রসন্ধানী সর্বো-পরি ইতিহাসার্থী সভার জন্য এই অক্ষয় ভাঁড়ার। তাঁর কীর্তিমান ছাত্র প্রমথনাথ বিশী শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে একসময় লিখেছিলেন, 'যতকাল রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালীর আগ্রহ থাকবে; তার মানে, চিরকাল প্রভাতকুমারও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' প্রভাতকুমারের সকল পাঠকেরই অনুগতির প্রাথমিক ভাষা এর চেয়ে অন্যরকম হবে না।

বলতে পারা যায় কোষগ্রন্থের এই স্মরণীয়তা। হয়তো অনেকদিন এই অভিধানগৌরবই লেগে থাকবে রবীন্দ্রজীবনীতে নাই ভাবলাম এত দূরের পাঠকদের কথা এখনো যা স্পন্দিত পৌর্বাপর্যে বাঁধা রীতিমতো তাৎপর্যময় বই। বৈচিত্র্য ও সমগ্রতার প্রবল আদলেই গাঁথা, সেই সঙ্গে সদাজাগর এই সাবধান।

১. রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কাছে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কবিকে যাঁহারা কোনো গণ্ডি দল বা ism-এর মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে পাইবেন না; অন্ধের হস্তীদর্শন হইবে।
—রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড।

২. আমাদের কাহারো কাছে তিনি হয়তো কেবলমাত্র কবি বা নাট্যকার বা রাজনৈতিক; কেহ বা তাঁহাকে শিক্ষক, ধর্মগুরু, বৈয়াকরণ, সংগীতকার বা নৃত্যকলাবিদ এইরকম কোনো বিশেষ একটি পরিচয় নির্দিষ্ট করিয়া জানিতে চাই। তাঁহার প্রতিভায় এই সকল রূপেরই সমন্বয়, সব মিলাইয়াই তাঁহার স্বভাবের অখণ্ড সত্তা। বিশ্লেষণ করিয়া

খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টায় বিপদ আছে—তাঁহার নানান কর্ম এবং সৃষ্টির গভীর ঐক্যসূত্র ধরা না পড়িলে তাঁহার প্রতিভাকে স্ববিরোধী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

—প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

এই সাবধান তাঁর নিজেরও প্রতিমুহূর্তের সতর্ক-সচেতনতা। তারই ফলে খণ্ড খণ্ড রবীন্দ্রবিষয়ের বদলে এখানে একলগ্ন বিবিধ প্রসঙ্গ—কখনো কবিতা-বীজ থেকে ব্যাপমান, কখনো নানাকৃত্য থেকে কেন্দ্রিত, তারই ফলে প্রভূত প্রত্যেকটি ক্ষণদণ্ডলহমার পুঙ্খানুপুঙ্খ। রবীন্দ্রজীবন-ভাষ্যকার হিসেবে প্রভাতকুমারের বহুমুখী যোগ্যতার কথা বলতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন আরো একটি সুকৃতির কথা স্মরণ করেছিলেন, সেটি হল : 'কালগত অতি ব্যবধান না থাকায় তিনি রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রাণস্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে কালগত অতি-নৈকটের অভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে যথেষ্ট দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনলীলা পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগও পেয়েছিলেন।' এই যুগ্মসুযোগের সুফলে যে ধরনের প্রত্যক্ষতা ও অপক্ষপাত তৈরি হয়েছে, যে স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থে, ভবিষ্যতের শুদ্ধতর উৎকৃষ্টতর জীবনীর প্রণেতাকেও তার থেকে প্রবর্তনা আহরণ করতে হবে। আর; অন্তত এই সূত্রে থুকিদিদেসের যুদ্ধেতিহাস থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাংশ : 'আমার ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি' তাঁর জীবনেতিহাস সম্বন্ধেও সুপ্রযোজ্য।

CLIMAX

With Best Compliments From ;

Climax Pipes Private Limited
Climax Synthetics Pvt. Ltd.
Climax Exports Pvt. Ltd.

2nd Floor, PNB Annexe
18-B, Brabourne Road
Calcutta-700001

Tel : 26-7051/5124/9244
Gram : 'SUPERB'
Telex : 021-2597

302, Asha Deep,
9, Hailey Road,
New Delhi-110001

Tel : 38-2272/2541/7590
Gram : 'REJOICE'
Telex : 031-4331

২০৯বি বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা ৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

With best Compliments of :

THE ANDHRA CEMENT CO. LTD.

Regd. Office : **484, PANTHEON ROAD,**
MADRAS : 600 008

Calcutta Office :
6, South End Park,
Calcutta 700 029.

Secunderabad Office :
Chandralok, 2nd Floor,
111, Sarojini Devi Road,
Secunderabad 500 003.

Works :
Gandhinagar P. O.
Vijayawada 520 003

47-9-27 Dwarakanagar
Visakhapatnam 530 016

With Compliments of :

WELL-WISHERS

With best Compliments from :

A WELL WISHER

With Compliments From :

BEARING TRADE CENTRE

138, CANNING STREET
CALCUTTA-1

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮·০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ তনু দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

4 JUL 1979

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(১ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/69

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 3·00 with Regd. Postage Rs. 5·50 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

৪৩ বর্ষ ঃ ১৩৮৫ ঃ কার্ত্তিক

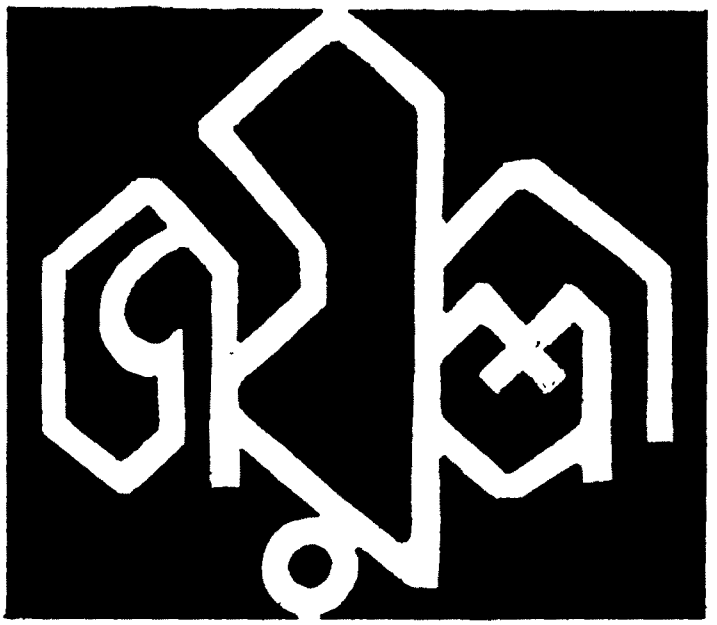

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-১৯২৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

H. V. KAMATH

LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : Rs. 15/-

NANDA MOOKERJEE

NETAJI THROUGH GERMAN LENS : Rs. 20/-

VIVEKANANDAS INFLUENCE ON SUBHAS : Rs. 6/-

NETAJI SPEAKS : VOL. I Rs. 4/-

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় দাম : ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড ৩৪·৫০ এর পরিবর্তে ২৭ টাকায়। বাংলায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় : লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীতার প্রেক্ষায় ৬১টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত। প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের এই বই ভাল লাগবে। দাম : ১০.০০

পুবদেশি উপকথা : দেবাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পুব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গল্প, গণেশ পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম : ৯.০০

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম : ৯.০০

চিত্তজয়া চিত্তরঞ্জন : ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম : ২০.০০

রামমোহন : সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দাম : ৬.০০

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ কার্তিক ১৩৮৫ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

হাওয়া বদল ৪৩৯

স্মৃতিকথন-ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নেই ॥ গোপাললাল সান্যাল ৪৪৭

স্বদেশের পথে

গ্রীস। তুর্কী ॥ নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৫৬

স্মৃতিচারণ

নিষ্কম্প অগ্নিশিখা। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৪৬৩

কবিতা

আচ্ছন্ন ॥ কাঞ্চন কুন্তলা মুখোপাধ্যায় ৪৬৯

বন্ধুরা শোনো : ডেভিড ডিয়প (সেনেগাল) ॥
অনুবাদ কৃষ্ণধর ৪৭০

ছোটগল্প

নায়কের মুখ ॥ চন্দ্রশেখর রায় ৪৭১

ইচ্ছাকলম ॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭৫

কবিতা

সার সেরা ॥ বাসুদেব দেব ৪৮১

যেতে যেতে ॥ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৪৮২

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ৭৮ তম জন্ম-বার্ষিক, জননেতা নিশীথনাথ কুণ্ডুর ৮৬ তম জন্ম দিবস, বিপ্লবী নেপাল নাগের লোকান্তর ৪৭৯

পুস্তক পরিচয় : সমদর্শী

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ [প্রথম খণ্ড] :
জগদীশচন্দ্র মণ্ডল ৪৮৩

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

অগ্রহায়ণ সংখ্যায়

নেতাজী সংখ্যার খবর

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

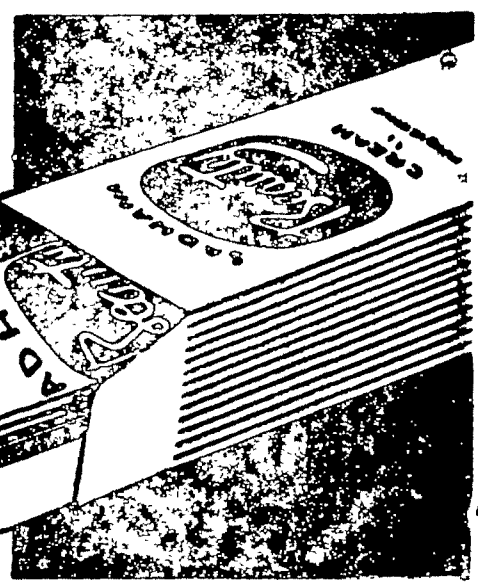

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

The chosen one.

For your transistor

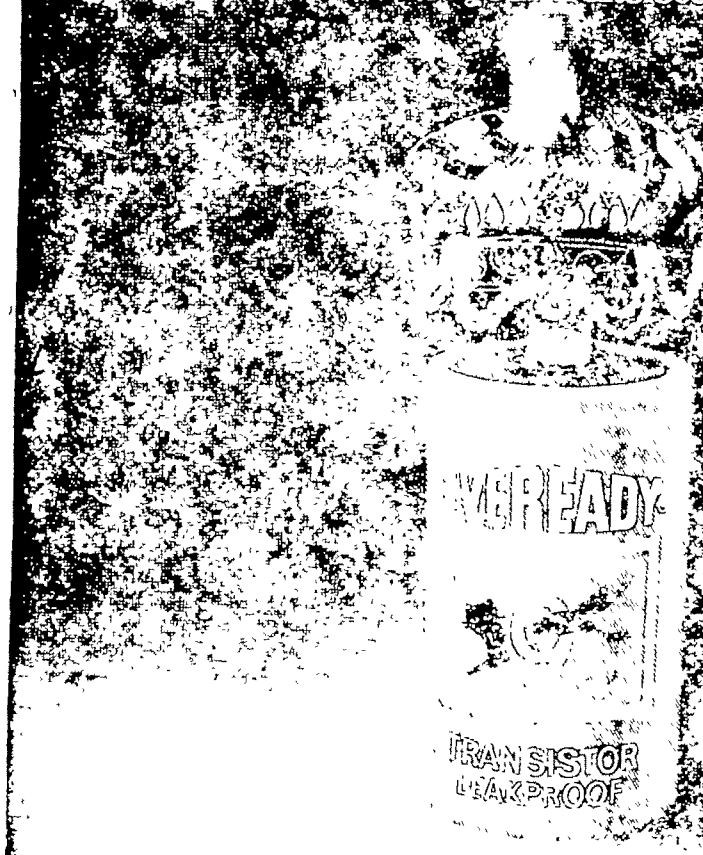

UNION CARBIDE

আয়করদাতাগণ

আপনাদের প্রদত্ত আয়করের রসিদ চটপট আনিয়ে নিন

আপনারা যে অনুমোদিত ব্যাঙ্ক মারফৎ চালান ফর্মে কর জমা দেবেন, সেই চালানের প্রতিপত্রের (কাউন্টার ফয়েলের) ভিত্তিতে আয়কর আধিকারিক আপনাদের প্রদত্ত করের টাকা খাতায় তুলে দেবেন।

আয়কর দপ্তরের নথিপত্রে আপনার দেওয়া কর যথা সময়ে যথারীতি পঞ্জীকৃত হোক এটা নিশ্চয় চান।

*** সঠিক চালান ফর্ম বেছে নিন**

বিভিন্ন ধরণের আয়কর জমা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের চালান আছে। সেগুলি হল এই—

কোন্ ধরণের জমা	চালান ফর্ম
অগ্রিম কর	
কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে	ITNS 35 A
অন্যান্যদের ক্ষেত্রে	ITNS 35
স্বনিরূপিত কর	
কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে	ITNS 166
অন্যান্যদের ক্ষেত্রে	ITNS 166A
আয়ের সূত্র থেকে কাটা কর	
মাস মাহিনা থেকে	ITNS 191
অন্যান্য প্রাপ্য থেকে	
—কোম্পানীগুলিকে প্রদত্ত	ITNS 39A
—অন্যান্যদের প্রদত্ত	ITNS 39

নিয়মিত ভাবে নিরূপিত কর জমা দেওয়ার জন্য, আয়কর আধিকারিক ঠিক ঠিক চালান ফর্ম যোগান দেবেন।

ভুল চালান ব্যবহার করলে নথিপত্রের বর্গীকরণে গণ্ডগোল হতে পারে, ফলে প্রদত্ত করের রসিদ চট্ করে পেতে অসুবিধা হয়।

*** চালান ফর্ম সঠিক ভাবে পূরণ করুন**

পড়া যায় এমনভাবে লিখবেন :

(ক) আপনার নাম ঠিকানা

(খ) আয়কর দপ্তরের কোন্ ওয়ার্ড বা সার্কেলে আপনি পড়েন

(গ) আয়কর ও তার ওপর সারচার্জের পরিমাণ পৃথকভাবে লিখতে হবে

(ঘ) আপনার পার্মানেণ্ট এ্যাকাউণ্ট নম্বর

(ঙ) ধৃতিয়ান বর্ষ

ছোট খাটো ভুল বা অসাবধানতার ফলে আপনার দেওয়া করের স্বীকৃতি পেতে আপনার অকারণ দেরী হতে পারে।

বিভাগীয় নথীপত্রে যথারীতি সঠিকভাবে তোলা, যথাসময়ে কর জমা দেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি বিষয়ের দিকেই সযত্ন দৃষ্টি রাখুন।

ডিরেকটর অফ ইন্সপেক্শান কর্তৃক প্রচারিত
(রিসার্চ স্ট্যাটিসটিকস্ এ্যাণ্ড পাবলিকেশানস্)
ইনকামট্যাকস্ ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী—১১০০০১

davp 78/289

বন্যা—শহর—গ্রাম

এবার বন্যা আর দুর্যোগে বেশ কয়েকটি ছবি ফুটে উঠলো। কেবল খবরের কাগজে বন্যাক্লিষ্ট ছবিগুলোর কথাই বলছি না।

কর্পোরেশন আর সি, এম, ডি,-এর ট্রাকে করে চলেছে জল। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়ার গ্রামগুলিতে তিনদিন ধরে পানীয় জল নেই একফোঁটা। সেই সব গ্রামের আকুল আবেদনে সাড়া দিল কলকাতা।

আবার অন্য চিত্রটা মনে আসে। কলকাতা শহরে রাস্তার কলে বা বাড়ীর চৌবাচ্চায় হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে নষ্ট হচ্ছে। এখনও কি আমরা জলের অপচয় সম্বন্ধে সচেতন হব না?

আবার অন্য ছবি। গ্রামকে গ্রাম আজ কয়েক সপ্তাহ জলবন্দী। কলকাতার মানুষও হয়েছে জলবন্দী। এবার কি শহরের লোক গ্রামের লোকের কষ্টটা—বন্যার দুর্গতির পরিমাণটা বুঝতে পারবে না? কলকাতায় তবু তো ড্রেন আছে, নর্দমা আছে। সি, এম, ডি, এ অনেকগুলি বসিয়েছে, আর কর্পোরেশনের সঙ্গে একসঙ্গে অনেকগুলি পরিষ্কারও করেছে। তাই হয়তো জলটা নেমে গেল তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায়,—কিন্তু এর থেকে কলকাতার লোক কি বুঝতে পারবে না, নর্দমার গুরুত্ব কি? এখনও কি জঞ্জাল দিয়ে ভরে ফেলবে নর্দমার ভেতরটা আর মুখগুলি?

আর একটি ছবি। ট্রাম বাস বন্ধ। এপাড়া ওপাড়া যাওয়া বন্ধ। অফিস-কাছারী বন্ধ। ঘরে বসে দম বন্ধ। সেই সঙ্গে ঘরে বসেই মনে আসছে গ্রাম-গ্রামান্তরের ছবিগুলি। গাছের ওপর ডালে বসে কাটছে, দিন-রাত্রি-সপ্তাহ। দুশ্চিন্তা। ঘুম নেই। জীবনের আশা নেই।

এই সব ছবি থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ ছায়াচিত্র তৈরী হয়। কলকাতা আর গ্রাম বাংলা আলাদা নয়। দুঃখের দিনে সব একাকার হয়ে গেছে। এখন শুধু সেই ছবিগুলির স্মৃতি একটু ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

হয়তো বা শহরে আছে চওড়া রাস্তা, ফ্লাইওভার, পানীয় জল প্রকল্প আর সি, এম, ডি, এ-র অন্যান্য শহর উন্নয়ন প্রকল্প। গ্রামে গ্রামে সে সব নেই। তাঁদের অভাব আরও বেশী। কলকাতা বড় হয়েছে। গ্রাম সাহায্য করেছে। আবার গ্রাম বাংলা যখন বিপদে, তখন কলকাতা কি নীরব থাকবে?

শহর-গ্রামের বিরোধে যাচ্ছি না। শুধু চাইছি, পশ্চিম বাংলার এই দুর্যোগে এই দুঃসময়ে আমরা যেন সবাই এক সঙ্গে থাকি।

কলকাতার দায়িত্ব আজ একটু বেশী। কারণ, কলকাতার ছবিতে দুঃখের দিনগুলি মাত্র কয়েকদিনের। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জে দুর্যোগ কাটতে সময় নেবে।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গড়ে উঠছে অনেক সংগ্রাম। এই সংগ্রামী শহর যেন গ্রামের মানুষের বাঁচার সংগ্রামে শরিক হয়।

চ্যালেঞ্জ?

চলতি দুনিয়ায় "সাথী" কথাটি আরও সার্থক।

সি, এম, ডি, এ
নভেম্বর, ১৯৭৮

প্রশান্ত শূর

আপনি এখনও

দ্বিগুণ টাকা পেতে পারেন

হিসাবী সঞ্চয়ী মানুষদের মনোমত এই সিকিউরিটিতে বছরে সরল সুদ পাওয়া যায় শতকরা ১৪.৩ টাকা করে।

এতে ১০০ টাকা খাটালে ৭ বছরে ২০০ টাকা পাওয়া যায়।

জাতীয় সঞ্চয় পত্র

পঞ্চম পর্যায়

পাঁচটি সুবিধাজনক মূল্যে পাওয়া যায়।

লগ্নির সীমা বাঁধা নয়।

তিন বছরে ভাঙানো যায়।

অন্যান্য লাভ

★ আয়কর হিসাবের জন্য সুদ বছর বছর জমা পড়ে
(সম্প্রতি এ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে)

★ সম্পদকর থেকে রেহাই
(দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত)

★ করমুক্ত সুদ
(বছরে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত)

বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন :

- কোনও অনুমোদিত এজেন্ট, অথবা
- জেলা সঞ্চয় আধিকারিক, অথবা
- নিকটতম ডাকঘর, অথবা
- নিজের এলাকার জাতীয় সঞ্চয় সংক্রান্ত আঞ্চলিক অধিকর্তা।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পোঃ বঃ নং ৯৬

নাগপুর-৪৪০০০১

davp 78/204

৪৩ বর্ষ। আশ্বিন ১৩৮৫। সপ্তম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

হাওয়া-বদল

কর্ণাটকের এক প্রান্তে চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর জনতা পার্টির প্রার্থী বীরেন্দ্র পাতিলকে ৭৭,৩৩৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জয়ী হয়ে পুনরায় পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী একক নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করলেও তার সারথি ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আরস। গত বছর রায় বেরিলিতে ৫৫,০০০ হাজার ভোটে পরাজিত হবার পর মাথা তুলে দাঁড়াতেই শ্রীমতী গান্ধীর কয়েক মাস সময় কেটে গিয়েছিলো। তারপর শাহ কমিশনের এবং অন্যান্য তদন্তের সম্মুখীন হবার পর আরো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাকে ঘিরে ধরে এবং এমারজেন্সীর সময় সংবিধান লঙ্ঘন করে দুষ্কর্মের ও অত্যাচারের অপরাধে দণ্ডের উদ্যত শাসন তাকে, তার পুত্রকে এবং তাঁর দুষ্কর্মের সহচরদের মনে উদ্বেগ ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো। তা কাটিয়ে উঠে শ্রীমতী গান্ধী বর্তমান জনতা শাসকদের বিরুদ্ধে দরিদ্র মানুষদের প্ররোচিত ক'রে দেশে অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টিতে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী একদিকে এই ধরণের অরাজকতার অভিযান ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, অপর দিকে পরিষদীয় ক্ষমতার অংশীদার হবার সুযোগও খুঁজেছিলেন। উত্তর-ভারত তার পক্ষে এখনও নিরাপদ নয়, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কংগ্রেস (ই) দলে তার অন্যতম যোগ্য সারথি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আরসের অভিভাবকত্বে লোকসভার সদস্যপদে আসীন হবার জন্য চিকমাগালুর মত অনগ্রসর এলাকার সব চাইতে নিরাপদ আসনটি বেছে নিয়েছিলেন। এই আসনে কংগ্রেস (ই) নির্বাচিত সদস্য চন্দ্র গৌড় শ্রীমতী গান্ধীর জন্যই আসনটি শূন্য করে দেন এবং কংগ্রেস (ই) ভেবেছিলো এই কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধী অনায়াসে নির্বাচিত হতে পারবেন। কিন্তু জনতা দলের প্রচার অভিযানের নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ-এর কুশলী এবং ক্ষিপ্র-প্রচারে শ্রীমতী গান্ধীর দলীয় প্রচারকেরা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে জনতা পার্টির প্রচার অভিযানকে বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হন। কর্ণাটকের পুলিশও গুলি-গোলা-কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, জনতা প্রার্থীর সুসংগঠিত প্রচারে দুরন্ত বাধা সৃষ্টি করে। যার পরিণতিতে এমারজেন্সীর অত্যাচারে কর্ণাটকের শহীদ

স্নেহলতা রেড্ডীর কন্যা শ্রীমতী নন্দনার মুক্ত প্রতিরোধক ভাঙবার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, মিছিল ছত্রভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছুঁড়ে কর্ণাটকের পুলিশ প্রাক্-স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী গায়ত্রীকে হত্যা করে। জনতা দলের তীব্র প্রচারে এমারজেন্সীর তীব্রতা কর্ণাটকের গ্রামীণ মানুষকে যে আদৌ স্পর্শ করতে পারে নাই, তা ফলাফল থেকেই বোঝা যায়। বীরেন্দ্র পাতিল লিঙ্গায়েত শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের প্রায় সব ভোটই তিনি পেয়েছেন। জনতার অন্য কেউ প্রার্থী হলে সেটা হোতো না। আর ফারনাণ্ডেজের ঝড়ে বেগে প্রচারে শহরের মানুষ অধিক সংখ্যায় জনতা প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে, না হোলে ভোটের ব্যবধান আরও বেশী হতো। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, চিকমাগালুরের অন্তর্গত প্রতিটি বিধান সভা কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী বেশী ভোট পেয়েছেন। নীচের তালিকা থেকে তা বোঝা যাবে :

কেন্দ্রের নাম	শ্রীমতী গান্ধীর ভোট	বীরেন্দ্র পাতিলের ভোট
বেলুরাংগাদি	৩৪,৩৭৫	১৮,৫৩৭
কারকালা	৩১,৬২১	১৭,৪৫০
শ্রীঙ্গেরী	৩৫,৪৭৪	২০,৭১৬
মুদিগেরে	৩৩,৬২৮	১৭,৩৪২
চিকমাগালুর	২৮,০৭৫	২০,৩৭৩
বিরুর	২৬,৬৯৮	২৪,০৬০
কাডুর	২৭,৩৪০	২৪,৬৬০
তারিকিরে	৩২,১০৪	২৮, ৬১
ডাক-ভোট	৩১	১৯

বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট দেখে বোঝা যায় মহিলা, হরিজন, গিরিজন, ও অন্যান্য নিম্নসম্প্রদায়ের ভোট, সংখ্যালঘু মুসলিমদের এবং মোটামুটিভাবে গ্রামীণ ভোটের সিংহভাগ ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে গেছে। কর্ণাটকের ভোক্কালিগ্গা ও লিঙ্গায়েতদের মধ্যে লিঙ্গায়েতের প্রায় সবটাই পাতিলের পক্ষে গেছে এবং ভোক্কালিগ্গার বেশীর ভাগ শ্রীমতী গান্ধীর দিকে। পাতিল নিজে লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের এবং ভোক্কালিগ্গা ও লিঙ্গায়েতের মধ্যে কর্ণাটকের রাজনীতিতে আহি-নকুল সম্পর্ক।

ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় জেতার ফলে এমারজেন্সীর যে সরীসৃপগুলি এতোকাল মৃতবৎ হয়েছিলো, সেগুলি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে দেশে স্বৈরাচারের পথ অনিবার্যভাবে সুগম করবে। শ্রীমতী গান্ধীর কাছে সব চাইতে বড় সমস্যা আত্মরক্ষার, পরিবার-রক্ষার এবং অনুচরবৃন্দের রক্ষা। এই লক্ষ্য-সাধনের জন্য হয় তাকে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে হবে, না হয় তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আইনের শাসন অচল করে তুলতে হবে। একটি কিম্বা দুইটি নির্বাচনে জয়ী হয়েই ক্ষমতা করায়ত্ত করা যাবে না আর বিশৃঙ্খলার পথে উদ্দেশ্য-সাধনের পথও দুর্গম। কারণ আইনের-শাসনের যন্ত্রটিকে একেবারে উপড়ে ফেলবার জন্য যে বেগবান বৈপ্লবিক আদর্শের জোয়ারের প্রবাহ প্রয়োজন, সেই জোয়ারের ভগীরথ আর যেই হোন না কেন শ্রীমতী গান্ধী হবেন না, আর ওটা তার ক্ষমতার বাইরে। অবশ্য কোনো বৈদেশিক শক্তির সহযোগে যদি দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ক্ষমতার কার্যত দখলদারী অপর

দেশকে দেবার সঙ্কল্প কেউ করে থাকেন এবং সে-মতলব হাসিল করবার উদ্দেশ্যে ক্ষমতার মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, তাহোলে সে-কথা স্বতন্ত্র।

শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনকে লঘু ক'রে দেখবার কোন কারণ নেই। ১৯৭৭-এর মার্চের নির্বাচন যেমন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটি নূতন দিকের সম্ভাবনা উন্মোচিত করেছিলো, তেমনি ১৯৭৮-এর ৫ই নভেম্বরের চিকমাগালুর উপনির্বাচন আর এক দিগন্তের সূচনা করলো কিনা সেটাই প্রধান সমস্যা। চিকমাগালুর উপনির্বাচন নিঃসংশয়ে জনতা পার্টিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে। জনতা পার্টির সফলতার দিকগুলি যে পরিমাণে জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে, সেই পরিমাণ তাদের ব্যর্থতার দিকগুলি বহু-আলোচিত হয়ে দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীও এই ব্যর্থতার দিকগুলিকে সাধারণ মানুষের সম্মুখে তুলে ধরে তাদের চিত্তজয় করে নিয়েছেন। লোকসভায় উপস্থিত থেকে জনতা দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী জনতা পার্টিকে দুর্বল করে তাদের মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য উদ্যোগী হবেন। শ্রীমতী গান্ধীর জয়ের পর চ্যবন-রেড্ডি কংগ্রেসের পলায়নবাদ অবধারিত। আর জনতা পার্টি তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য মিটিয়ে নিতে না পারলে, লোকসভায় তীব্রতর বিরোধী-অভিযানে সাধারণ নির্বাচনের সীমান্তে কয়েক-মাসের মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারে। সেই আঘাতের সম্মুখীন হ'লে জনতা পার্টি হয় দু-ভাগ হয়ে যাবে, নয়তো কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবেন, আর নয় তো মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং এই ধরণের আকরিক অর্থে সর্বভারতীয় পার্টির সহযোগে জাতীয় সরকার গঠন করবেন। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ইন্দিরা-বিরোধী ঝোঁক বজায় রাখতে পারবে না, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের ইন্দিরার সঙ্গে জোট বাঁধতে দেখা যাবে। যে যেদিকেই যাক্ না কেন, মোট ফল হবে রাজনৈতিক অস্থৈর্য বৃদ্ধি। সুতরাং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে যেমন দ্রুত পট-পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে, ভারতবর্ষও সেই আবর্তে মথিত হতে পারে। ভারতবর্ষের সীমান্তে আফগানিস্তানে সোভিয়েত রুশ সমর্থকরা সৈন্যবিক অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতা দখল করেছে, সোভিয়েত রুশের আনুকূল্যে। তারই পাশে রেজা শাহ পহলবীর দেশ পারস্যে, রাজার বিরুদ্ধে প্রায় সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং সে-বিদ্রোহ দমনের সেনাবাহিনীর শাসন পারস্যে কায়েম হয়েছে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থৈর্যের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনুমান করা দুরূহ।

তবে এরই মধ্যে স্থৈর্যের বাঁধও যে বাঁধা হচ্ছে না তা নয়। বোম্বাই পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, চিকমাগালুর-এ ইন্দিরা গান্ধীর ও কংগ্রেস (ই) দলের বিপুল জয়ের পরদিন। ৮ই নভেম্বর বোম্বাই পৌরসভার নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) এবং কংগ্রেস জোট ১৩০টি আসনের মধ্যে পেয়েছে মাত্র ২৫টি আসন—কংগ্রেস (ই) ১৭টি কংগ্রেস ৮টি অর্থাৎ, ৫ই নভেম্বরের 'ইন্দিরা-ঢেউ' চিকমাগালুর খাড়িতেই

বন্দী হয়ে রইলো, তার বাইরে এসে ঝড় তুলতে পারলো না। মহারাষ্ট্র জনতা পার্টি ও শারদ পাওয়ারের প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট যে মোর্চা তৈরী করেছে, এই মিউনিসিপ্যালি নির্বাচনে তারাই এক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পৌরশাসনের অধিকারী হয়ে বসলো। এরা পেয়েছেন ১৪০টি আসনের ৮৫টি। তার মধ্যে জনতা পার্টির ৬৭টি, শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীর ১৩ মুসলিম লীগের ১টি রিপাবলিকান পার্টির ১, সি. পি. এম-এর ১টি।

কংগ্রেস (ই) আগের পৌরসভায় ২২টি আসনের অধিকারী ছিলো, চিকমাগালুর পর সেই সংখ্যা বৃদ্ধি তো দূরের কথা, কমে দাঁড়িয়েছে ১৭-তে। শিবসেনার দুর্গতি এবারকার নির্বাচনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গত পৌরসভায় তাদের আসন ছিল ৪২টি, এবার ১১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ২১টি আসন তারা রক্ষা করতে পেরেছে, সি, পি, এম ৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১টি আসন পেয়েছে।

জনতা পার্টি ১৯৭৭-এর লোকসভার নির্বাচনে বোম্বাই শহরের ৫টি আসনের ৫টি-ই দখল করেছিলো, তেমনি ১৯৭৮-এর মার্চ-এ বিধান সভা নির্বাচনে শহরের ৩৫টি আসনের ৩৫টিতেই তারা জিতেছিলেন। কিন্তু এবার তারা একশোতে একশো নম্বর পাননি। এবার তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ১০৩টি আসনে, পেয়েছেন ৬৭টি জনতা পার্টির আভ্যন্তরীণ দুর্যোগের মধ্যেও যে এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে, সেটাই প্রশংসার্হ। শহরে জনতা পার্টির সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় বহন করছে এই জয়। ফলে শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বে পি, ডি, এফ মন্ত্রী-সভার ভিত্‌টা আরও মজবুদ হোলো।

বন্যার তাণ্ডবের হিসাব-নিকাশ যেমন করা হচ্ছে, তেমনি পরিকল্পনা করা হচ্ছে বন্যার্তদের পুনর্বাসন এবং বন্যাক্লিষ্ট গ্রামগুলির পুনর্গঠনের। জুলাই মাসের শেষে ও আগস্টের প্রথম পর্যায়ের বন্যার পর পাঁচটি জেলা বন্যাক্লিষ্ট হবার পর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বন্যায় প্রায় দুই কোটি লোক বন্যা-বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই দুই কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ এক কোটি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। অন্যান্যবারের বন্যার সঙ্গে এবারকার বন্যার তফাৎ এই যে এবার বাড়ী-ঘর, বাসনপত্র, আসবাব, পরিধানের বস্ত্র, গরু-মহিষ এ-সব তো গেছেই; এমন কি উপার্জনের জন্য যে যন্ত্রপাতিগুলির প্রয়োজন, সেগুলিও ভেসে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ কয়েকটি সর্বনাশা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। অন্তহীন দুঃখ ও পীড়ন সেদিন তাদের জীবনের সঙ্গী হয়ে পড়েছিলো। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে ত্রিশ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যু-পথযাত্রী হয়েছিলেন, তাদের কঙ্কালের বিভীষিকা দীর্ঘকাল এই রাজ্যের মানুষের মনকে বিষিয়ে রেখেছিলো। দেশবিভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ তার শিকার হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশের জীবনে সে-এক বিধ্বংসী পর্যায়। আর তারপরই এবারকার বন্যা। আপাতদৃষ্টিতে হিংস্র না হলেও বিধ্বংসী ও প্রলয়ঙ্কর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে ত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকা বন্যা প্লাবিত হয়েছে; ১১ লক্ষ বাড়ী-ঘর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রায় ৬ লক্ষ বাড়ী

গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ বসতবাড়ী ধ্বংস হয়েছে। এবং ২ লক্ষ বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবাদি জন্তু বিনষ্ট হয়েছে ২ লক্ষের বেশী। মানুষ প্রাণ হারিয়েছে কতজন তার ঠিক-ঠিকানা নেই, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা কম বেশী এক হাজার হলেও বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলীতে নিখোঁজের সংখ্যা অনির্ণিত।

অন্যদিক থেকেও দেখা যায় ১৩০টি ব্লক গুরুতর-রূপে বিধ্বস্ত হয়েছে, আংশিক বিধ্বস্তের সংখ্যা ১০০টি ব্লক, বন্যাবিধ্বস্ত জেলাগুলিতে ৩৩টি মিউনিসিপ্যালিটি জলে ডুবে গিয়েছিল। আরো ৩৪টি মিউনিসিপ্যালিটি আংশিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিলো, রাস্তা-ঘাট, নিকাশী ড্রেন, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা কিছুই, রেহাই পায়নি। সব কয়টি বিধ্বস্ত জেলার সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা, ইলেকট্রিসিটি, রেলওয়ে, টেলিফোন, টেলি কমিউনিকেশন সবই অচল হয়ে গিয়েছিলো। কয়লা-খনিগুলি জলে ডুবে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। 'ইষ্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড'র—রাণীগঞ্জ—ঝরিয়া এলাকায়—১১৬টি সক্রিয় খনির ৪৫টি জলে ডুবে গিয়েছিলো, 'ভারত কোল' ৮৫টি খনির ৭টি জলে ডুবলেও, ৩৫৯টি 'উৎপাদক জেলার' ১১৬টি-ই বন্যাবিধ্বস্ত হয়েছিলো। কয়লা উৎপাদনের প্রাথমিক ক্ষতির পরিমাণের হিসাব হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। আসলে এ-বছর বন্যার দরুন গতবারের চাইতে কয়লা উৎপাদন ৭০ লক্ষ টন কমে যাবে, যার ২০ লক্ষ টন সেরা কয়লা—যা ইস্পাত উৎপাদনে অপরিহার্য। এমনিতেই দুর্গাপুর ইস্পাত-কারখানা বন্যায় জলে ডুবে প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে, তার উপর ইস্পাত-উৎপাদক কয়লার ঘাটতি ইস্পাত উৎপাদনে ঘাটতি সৃষ্টি করবে।

হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মাঝারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, হস্তচালিত তাঁত শিল্প, তন্তুবায় শিল্প, চটশিল্প—সব শিল্পই সর্বনাশের মুখে। চার পাঁচদিন জলে ডুবে যন্ত্রপাতিগুলি বিকল হয়ে গেলে, কাঁচা মাল ও উৎপাদিত মাল দুই-ই জলে ডুবে অকেজো হয়ে গেছে। কৃষিতে প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায় ২১০ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এবার প্রায় ৬০ লক্ষ টন আমন ধান উৎপাদিত হবার কথা ছিল। কিন্তু ৩৪ লক্ষ একর জমির ফসল তো ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থার ক্ষতির পরিমাণ ৮ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের এক লক্ষ পাম্প-সেট-এর শতকরা ৫০ ভাগ বন্যায় ভেসে গেছে, ৪৬০০০ টন সার আর প্রায় সব বীজই নষ্ট হয়ে গেছে।

আমনের ফসল ভেসে গেলো, শীতের ফসল উৎপাদনের সুযোগ নাই। চাষের বলদ নাই, লাঙল নাই, বীজ নাই, অন্যান্য যন্ত্রপাতি নাই, ঘরে খাবার নাই মাথার ওপর আচ্ছাদন নাই, হাতে ক্রয়-ক্ষমতা নাই—আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া হতচকিত কৃষকের আর কি করণীয় আছে?

বন্যায় বিধ্বস্ত মানুষদের একটা বড় অংশ বছরের পর বছর দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় রয়েছেন। বন্যার শিকার হবেন তারাই সব চাইতে বেশী। ১৯৭১-এর সংখ্যা গণনায় পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি। ১৯৬১ প্রতি কিলোমিটার

পিছু বসতির সংখ্যা ৩৯৯-এর তুলনায় ১৯৭০-এ সেই সংখ্যা ৫০৪ জন। ১৯৭১-এ গোটা ভারতবর্ষের জন্য এই সংখ্যা ১৭১ জন, ১৯৬১তে ছিল ১৩৪ জন। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ১৯৬১ তে ১৮ হেক্টার, আর ১৯৭১-এ তা কমে দাঁড়ায় ১৪ হেক্টার-এ; গোটা ভারতবর্ষের জন্য এই সংখ্যা ১৯৭১, ২৮ হেক্টার, ১৯৬১তে ৪৪ হেক্টার জমি। এই রাজ্যের জাতীয় আয়ের শতকরা ২৭ ভাগ কৃষি থেকে সংগৃহীত হয় এবং রাজ্যের কর্মনিযুক্তদের শতকরা ৬১.৩ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত হয়—এদের মধ্যে রয়েছে শতকরা ৩২ ভাগ কৃষক শতকরা ২৬.৪ ভাগ কৃষকশ্রমিক এবং শতকরা ২ ভাগ পশু পালন, বনসম্পদ আহরণ, কৃষি এবং শিকারে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-র মধ্যে এই রাজ্যে কৃষকের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ কমে গেছে—৪৪.৬০ লক্ষ থেকে ৪০.০৩ লক্ষে। একই সময়ে কৃষকশ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৮৩.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৭০ লক্ষ থেকে ৩২.৪৬ লক্ষে দাঁড়ায়। এই ক্রমদারিদ্র্য আন্ধ্রপ্রদেশ বন্যায় সব চাইতে বেশী বিধ্বস্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩৫০ কোটি সরাসরি সাহায্য চেয়েছেন এবং ঋণের সুযোগ চেয়েছেন ১৩০ কোটি টাকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষক দল তিন বার বন্যার পর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান তৈরী করেছেন। তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যে; পশ্চিমবঙ্গকে ১২৯.৯৪ কোটি টাকা সর্বসাকুল্যে সাহায্য দিয়েছেন। যোজনা খাতে অগ্রিম অতিরিক্ত ৬৯.৬৩ কোটি টাকার বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুত শেষ কিস্তি, দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের সুপারিশ অনুযায়ী এই বরাদ্দ হয়েছে। তার পূর্বে ১৯.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই দুই মঞ্জুরীর যোগফল দাঁড়াল ৮৮.৯৩ লক্ষ টাকা। এ-ছাড়া কেন্দ্র ১৩.১৪ কোটি টাকার খাদ্যশস্য খয়রাতি সাহায্য দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫০ হাজার টন গম, ৪৫ হাজার টন চাল, ও ৫০০ টন মুসুরী ডাল 'ফুডফর অয়ার্ক' বাবদ এক লক্ষ টন গম দেওয়া হয়েছে, যার দাম হবে ১২.৫০ কোটি টাকা। রবি শস্য চাষের জন্য ১৫ কোটি টাকার স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া আছে, এর ওপর ও আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিতে যেন কার্পণ্য না করা হয়। কেন্দ্র ওষুধ সরবরাহ করেছে ৩৭ লক্ষ টাকার—সেটা অবশ্যি ঋণের ভিত্তিতে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১৮.৭০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

সর্বসাকুল্যে এই দাঁড়ালো যে রাজ্য সরকার ত্রাণের জন্য বার্ষিক যে ৬.৬১ কোটি টাকা পেয়ে থাকে তার অতিরিক্ত ১২৯.৯৪ কোটি টাকা কেন্দ্র মঞ্জুর করেছে। এই সাহায্য খরচের মেয়াদ ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত। তারপর অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরাসরি ৩৫০ কোটি টাকার অনুদানের মঞ্জুরী চেয়েছিলেন, সে-জায়গায় পেলেন ৬৯.৬৩ কোটি টাকার প্ল্যান-অন্তর্গত অগ্রিম বরাদ্দ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হলে ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্ল্যান-অন্তর্গত অগ্রিম বরাদ্দ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে দিয়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রেও ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্ল্যান অন্তর্গত অগ্রিম বরাদ্দ ৬৯.৬৩ কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র থেকে ইসারায় বলা হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের বেলায় তাদের দেওয়া অগ্রিম Plan Assistance ফেরৎ চাওয়া হয় নাই, পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেও তাই হবে। অর্থাৎ, এই পরিমাণ অগ্রিম বরাদ্দ টাকা ফেরৎ চাওয়া হবে না, যদিও নিয়মমাফিক এই টাকার শতকরা ৭০ ভাগ পরিশোধ করতে হবে। ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এই সাহায্য ফেরৎ চাইবার কোনো অবকাশ থাকা উচিত নয়। কেন্দ্রের সরাসরি বলে দেওয়া উচিত এই পরিমাণ অর্থ বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য অনুদান হিসাবেই দেওয়া হল।

রাজ্য সরকার দু'বছরের জন্য ৩৫০ কোটি টাকার মঞ্জুরী চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত ১২৯ কোটি টাকার বরাদ্দ করেছেন,—অর্থাৎ রাজ্যের ১৭৫ কোটি টাকার চাহিদার পরিবর্তে ১২৯ কোটি টাকা। কেন্দ্র আরও বলে দিয়েছে রাজ্য সরকার সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করে উঠতে পারলে কেন্দ্র তাদের মঞ্জুরীর বরাদ্দ বাড়াতে পারবে। তবে রাজ্য সরকারকেও বন্যা-পীড়িতদের এবং রাজ্যের অধিবাসীদের সংশয় নিরসনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে যে অপক্ষপাত-ভাবে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে রাজ্য সরকার অগ্রসর হবে।

রাজ্য সরকার গৃহ নির্মাণের জন্য ৪৫ কোটি টাকা চেয়েছিলেন, কেন্দ্র বরাদ্দ করেছেন মাত্র ১১ কোটি টাকা। গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায় ভেসে যাওয়া বাড়ী তৈরীর জন্য পরিবার পিছু ৪০০ টাকা, ধ্বসে যাওয়া বাড়ী অথচ বাড়ীর মাল-মসলা ভেসে যায়নি এমন বাড়ী তৈরীর জন্য পরিবার পিছু ২০০ টাকা, আর যে বাড়ীগুলি পড়ে যায় নাই অথচ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদের বাড়ী তৈরীর জন্য পরিবার পিছু ১০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই সামান্য টাকা দিয়ে কি করে বাড়ী তৈরী হবে এটাই সব চাইতে যন্ত্রণাদায়ক ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গ্রামে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং যে পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনের পর কাজে রূপায়িত হতে চলেছিলো, বামফ্রন্ট কমিটি নামাঙ্কিত সরকার পরিচালনার কমিটি তাতে বাদ সেধেছে। এসোসিয়েশন অফ ভলান্টারি এজেন্সিস ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (The Association of Voluntary Agencies for Rural Development) বন্যাক্লিষ্ট গ্রামে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দু'হাজার বাড়ী তৈরী করে দেবার দায়িত্ব নিতে চান। এঁরা হাওড়ায় ১২টি, মেদিনীপুরে ১৩টি, হুগলীতে ৫টি, নদীয়া, মালদহ, ২৪ পরগণা বাঁকুড়ায় ১টি করে গ্রামের ভার নেবেন। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জয়প্রকাশ নারায়ণ। রাজ্য সরকারই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তারা যেন বন্যাবিধ্বস্ত গ্রাম পুনর্গঠনের ভার নেন। ১৮ই অক্টোবরে এক সভায়

স্থির হয় যে গ্রাম পুনর্গঠনের সর্বাত্মক দায়িত্ব নিয়ে বাড়ী তৈরী, পানীয় জল সরবরাহ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলির পুনর্গঠন, পথ-ঘাট, গ্রামের সমবেত মিলনকেন্দ্র নির্মাণ এবং রবি-মরসুমে কৃষি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ-ছাড়া শিশুদের, রোগীদের, গর্ভবতী মেয়েদের দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা, সেচের জন্য নলকূপের মেরামতির কাজ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সাহায্য করতে হবে।

স্থির হয়েছিলো দাসপুর এবং ঘাটালে 'কেয়ার' (CARE) ৫০০০ পরিবারযুক্ত ৩২টি গ্রামের দায়িত্ব নেবেন। লুথেরান ওয়ার্ল্ড সারভিস মুর্শিদাবাদের কাঁদি ও বাড়োঁয়া এলাকার ৫০টি, নবদ্বীপ এলাকায় ৫০টি গ্রামের ভার নেবে। অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ পরিবারের অক্সাম (OXAM) মঙ্গলকোট ও পূর্বস্থলী—বর্ধমান জেলার ২০০০ মানুষের বসতিযুক্ত পাঁচটি গ্রামের ভার নেবে। ক্যারিটাস (CARITAS) নেবে ময়নার ১২টি, কেশপুরে ৩টি, পিঙ্গলায় ২টি মেদিনীপুর জেলার—গ্রামের মোট ৩,৬০০ পরিবারের ভার নেবে। ব্যাপটিস্ট মিশন নেবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে ৫টি, মেদিনীপুরের ময়নায় ও তমলুকে একটি করে। উইমেন্স কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল বাগনানের পানিত্রাস ও সহামতাবেড়ের ভার নেবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৮,০০০ পরিবারের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হোতে পারতো। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুরুব্বী রামক্রষ্ণ কমিটি বেঁকে বসেছেন। গ্রামে গ্রামে বৈষম্যমূলক গৃহ নির্মিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমালোচনার পাত্র করে তুলবে। এই পরিণতি হতে দেওয়া চলবে না। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নির্মিত বাড়ীঘর ও গ্রামগুলি সরকারী তৈরী বাড়ী-ঘর ও গ্রাম থেকে অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় হবে—এই আতঙ্কেই সরকার তাদের মত পরিবর্তনের কথা ভাবছেন। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিরও অন্যত্র ডাক পড়েছে—বিহার ও উড়িষ্যার বন্যাক্লিষ্ট এলাকায় তাদের সাহায্যে এই দুই রাজ্যের সরকার পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে যেতে চান। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যাখ্যান করলে অবিলম্বে এই সংগঠন-গুলির সম্পদ অন্য রাজ্যে নিয়োজিত হবে। পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সম্পদ পেয়েও যারা কাজে লাগাতে চান না, তারা কেনই বা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাদের চাহিদার চাইতে কম অর্থমঞ্জুরীর অভিযোগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিনীতি ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। ফসলের কে ভাগ পাবেন, সেই নীতি-নির্ধারণের পরিণতিতে বর্গাদারের সঙ্গে বর্গাদারের বিরোধ বাধিয়ে তুলছেন। বর্গাদারও চাষী, কখনো ছোট জোতের মালিকও বা। দুই বর্গাদারের বিরোধে দলীয় পতাকাবাহী বর্গাদার যে ফসলের অধিকার পাবে। তার নজীর রয়ে গেছে। পূর্বেকার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্টগুলির আমলে। তাই বর্তমান সরকারের ভূমিনীতি কী দলীয় পতাকা যার ফসল তার, সেদিকে অগ্রসর হচ্ছেন না?

১১ই নভেম্বর ১৯৭৮

যে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

মিঃ চারি সেই যে টেলিগ্রাফ আপিসে গেলেন, আর আস্তানায় ফিরলেন না। সটান চললেন ষ্টেসনে। তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিষপত্র তাঁর হাতব্যাগে সঙ্গেই আছে। ফিরে যাবার আর কি প্রয়োজন? ষ্টেসনে রেঁস্তরায় আর কিছু না হোক্ চা বিস্কুট মিলবে। অবশিষ্ট রাতটুকু ঐ দিয়েই চালিয়ে দেবেন। কলকাতাগামী ভোরের ট্রেন ষ্টেশনেই আছে। একটা কামরায় শুয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দেবেন।

এদিকে কলকাতার রাজনীতিক মহলে, বিশেষতঃ সরকারী দপ্তরে ও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বড়কর্তাদের মহলে সোমবার আপিসের কাজ সুরু হতে না হতেই নানা শলা-পরামর্শ সুরু হয়েছে, টেলিফোনে, মিটিং-এ, পেলিটি, ফিরপোর ঘরে খানাপিনায়। অতর্কিতে হত্যাকে যদি খোলাখুলিভাবে অভিনন্দন করা হয়, তবে বিদ্রোহের আর বাকী থাকে কি? এ-অবস্থায় কোনও কাজ করার, চলাফেরার সম্ভাবনাই বা কোথায়? একজনের পরিবর্তে ভুল করে যদি আর একজনকে হত্যা করেও বাহবা পাওয়া যায়, তবে যে-কোনও বৃটিশ সন্তানের জীবন যে সর্বদা বিপন্ন, সে-কথা বোঝা কি সহজ নয়? অচিরে এর বিহিত-ব্যবস্থা যদি কঠোরভাবে অবলম্বন করা না হয়, তবে বিদেশী বণিক সম্প্রদায় কোন ভরসায় এখানে কাজ-কর্ম করবেন?

সরকার যাতে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন, তার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-তদ্বির সুরু হয়ে গেল।

১৯১৯-২০ সালের আগে-পিছে যে ক'জন পুরাণো 'স্বদেশী' দলনায়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের আবার ভারত-রক্ষা আইনানুসারে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করা হল। এদের মধ্যে রইলেন 'আত্মশক্তি' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চেয়ি-প্রেস পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গোপীমোহনের প্রশস্তি-সূচক প্রস্তাবের ধুয়ো ধরে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তিদানের নামে নতুন সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করা হল। বড়লাট, তথা ভারত সরকার, বাঙ্গলাদেশকে 'বিপ্লবী' বলে ঘোষণা করলেন এবং দেশকে 'আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য' বিশেষ 'অর্ডিনান্স' জারি করে, সঙ্গে সঙ্গে পঁচশ' জায়গায় খানা-তল্লাসী ও ৭২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র,

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অনিলবরণ রায় ও আরও অনেকে।

এ সবই হয় ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে—সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের প্রায় বছর খানেকের মধ্যেই। এক মিথ্যা সংবাদ রটনা করে, তারই উপর ভিত্তি করে, দেশকে শ্মশানে পরিণত করবার দানবীয় প্রয়াস, আধুনিক ইতিহাসে আর কোথায় আছে?

চারি নিজে অবশ্য ও-সংবাদ প্রচারে কম লাভবান হন নি। সন্ত্রাসবাদীদের রোষ থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য ঐ সংবাদ প্রচারের পরই তাকে দিল্লীতে বদলি করা হয়—কেন্দ্রীয় সরকারের নিশ্চিত আশ্রয়ে। তারপর কিছুদিন সিমলা এবং অবশেষে লণ্ডনে তাঁকে বৃটিশ-সিংহের কোমল পক্ষপুটে আশ্রয় দেওয়া হয়। যথাযোগ্য আর্থিক পুরস্কার ছাড়াও ভারত-সম্রাট তাকে নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতে 'সি-আই-ই' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'সি-আই-ই' অর্থাৎ কি না ভারত-সাম্রাজ্যের অন্যতম সহকারী।

দৈনিক পত্রের কলম-পেশা নিয়ত ভ্রাম্যমান এক রিপোর্টারের ভাগ্যে বিরাট সাম্রাজ্যের সহকারী হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!

গোপীমোহনের মহিমায় তাও সম্ভব হল।

* * *

একদিকে নিপীড়ন, সঙ্গে সঙ্গে তোষণ এই হল বৃটিশ রাজনীতি। বাঙ্গলার নতুন অর্ডিনান্স জারি করে সরকারপক্ষ যেমন ঘরে ঘরে হাহাকার সৃষ্টি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক দলগুলিকে আরও কিছু অধিকার বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়ে শান্তি রাখবার চেষ্টাও সুরু হয়ে গেল।

প্রাথমিক চেষ্টা করেন বাঙ্গলার তদানিন্তন লাট সাহেব, লর্ড লিটন। স্বরাজ্যদল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৪ সালের বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রীমণ্ডলীর বেতন-মঞ্জুর সম্পর্কীয় প্রস্তাব ভোটাধিক্যে বাতিল করে দেন। এতেও নিরুদ্যম না হয়ে সরকারীদল পরবর্তী অধিবেশনেও অনুরূপ প্রস্তাব আবার উত্থাপন করেও পূর্ববারের ন্যায়ই ভোটে পরাজিত হন।

এরপরই সুরু হয় আপোষমীমাংসার গোপন শলা-পরামর্শ। বেলুড় মঠের প্রান্তরে বটের ছায়ায় লিটন-দেশবন্ধুর আলোচনা এ সময়ই সুরু হয়। তারপর বিলেতের পার্লামেন্টে ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড গোপনে নানা বে-সরকারী 'বন্ধু' বা 'সাংবাদিক' মারফৎ দেশবন্ধুর সঙ্গে আলাপ সুরু করেন। উদ্দেশ্য ঐ একই। সন্ত্রাসবাদীদের সংযত করে, সাংবিধানিক পরিবর্তনের সাহায্যে দেশের যুবকদলকে কিভাবে আইনানুগ পন্থায় দেশসেবার কাজে নিয়োজিত করা যায়, তার উপায় নির্দ্ধারণ করা। সন্ত্রাসবাদী যুবকদের উপর দেশবন্ধুর প্রভাব যে মহাত্মাজী অপেক্ষা অধিক, তা ইংরাজ সরকারের অজানা নেই। তাছাড়া ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে দেশবন্ধুকে অনেকটা রাজী করানো সত্ত্বেও মহাত্মাজীর 'অসঙ্গত' দাবীর ফলেই যে বড়লাট লর্ড রিডিং-এর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, সে-কথা লর্ড বার্কেনহেড ভুলে যান নি। সন্ত্রাসবাদে বাংলার যুবকগণই অগ্রণী; তারাই অন্যান্য প্রদেশে শাখা বিস্তার করবার চেষ্টায় ক্রমশঃই এগিয়ে যাচ্ছে

—এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যলাভও করেছে তা জেনে তাড়াতাড়ি একটা মীমাংসার পথ আবিষ্কারের জন্য বার্কেনহেড দেশবন্ধুকেই অগ্রণী হতে অনুরোধ করলেন। তিনি এগিয়ে এলে গান্ধীজী যে আর পিছিয়ে থাকবেন না বা আপত্তি উত্থাপন করবেন না, এরূপ অনুমান করবার কয়েকটি কারণও বার্কেনহেড আবিষ্কার করলেন :

১। গান্ধীজী আর যাই হোন, হিংসাশ্রয়ীর সমর্থক নন। তা না হলে চৌরীচৌরার ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন—যা তাঁর নেতৃত্বে এবং নির্দেশেই সুরু হয়েছিল তা তিনি বন্ধ করে দিতেন না।

বাঙ্গলায় অর্ডিনান্স জারি করবার পর গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধারণা ও কর্মধারা উভয়েরই পরিবর্তন হয়েছে। তিনি এখন কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মধারা পরিচালনার ভার স্বরাজ্যদল, তথা দেশবন্ধুর উপর অর্পণ করে, নিজে সর্ব-ভারতীয় চরকা-প্রচার ও কাটুনি-সংঘ স্থাপন এবং হরিজন-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

এ অবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা দেশবন্ধুর অনুমোদনে পরিচালিত হলে সুফল সত্বর লাভের সম্ভাবনা। তাছাড়া হিংসাশ্রয়ী যুবকদের চিন্তা ও কর্মধারার পরিবর্তনও সম্ভব।

বস্তুতঃ বাঙ্গলায় সন্ত্রাসবাদীদের পুনরাবির্ভাব, স্থানীয় বৃটিশ বণিক-দলের প্রাণভয় এবং সরকারী পুলিশ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের সতত সংঘাতের আশংকা—প্রধানতঃ এই তিন কারণই লর্ড বার্কেনহেডকে নতুন শাসন-সংস্কারে আগ্রহী হতে বাধ্য করেছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে বার বার সরকারী দলের পরাজয় ও হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার গ্লানিকর অভিজ্ঞতা ত' ছিলই।

* * *

অন্যান্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ থাকাকালে নতুন অর্ডিনান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। বিশেষতঃ প্রায় দেড় বছর পূর্বে ঐ পদে নিযুক্ত হবার পর থেকে সুভাষচন্দ্র একদিনের জন্যও কলকাতার বাইরে যাবার সুযোগ পান নি—সহর থেকেও কোনওরূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদানের সামান্য অবসরও পান নি। একে ত' ক'লকাতা কর্পোরেশনের শাসনকার্যে বহুদিনের জঞ্জাল পুঞ্জীভূত ছিল। সহর মানে তখন শ্বেতাঙ্গ কর্তারা জানতেন চৌরঙ্গী, পার্কষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ ও আলিপুরের কিয়দংশ। অন্যান্য অঞ্চল, সবই ছিল 'নেটিভ কোয়ার্টার'। সেখানে যা যা সুখসুবিধে আছে তা ঐসব নোংরা কালো লোকদের পক্ষে যথেষ্ট।

এই নীতি অনুসারেই এতদিন কলকাতা কর্পোরেশনের শাসন চালু ছিল। চৌরঙ্গীর রাজপথ যেন তকতকে ঝকঝকে থাকে, চওড়া ফুটপথে যেন ভিখিরী না বসে, কোনও নেটিভ কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন ইতি-উতি না তাকায়, কোথাও যেন ভীড় না করে ময়দানে সন্ধ্যার পর যেন কেউ চোরের মত চলাফেরা না করে; ও সব দিকের রাজপথে যেন প্রচুর আলোর সুব্যবস্থা থাকে,

রাস্তায় যেন নিয়ত ঝাঁট দিয়ে জল ছড়ানো হয়। ময়লা-জঞ্জাল যেন বার বার পরিষ্কার করানো হয়—লোকে যেন বুঝতে পারে ও-পাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে নেটিভদের অনেক, অনেক তফাৎ। আর তাদের অঞ্চলের জন্য যে সব নিয়ম-কানুন করা আছে, তা পালন করা হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্য ত' অনেক দেশী কর্মচারী নিযুক্ত করা আছে। তারা ঠিকমত কাজ করছে কি না তা দেখার জন্য ত' সিভিলিয়ান কমিশনার আছেনই।

যদি এ সব সত্ত্বেও দেশীপাড়ার জঞ্জাল সাফ না হয়, কলে জল না আসে, রাস্তায় আলো না জ্বলে বা খোয়াভর্তি পথ বর্ষার জলে নদী-নালায় পরিণত হয়, তবে তার দোষ কার? যদি কর্মচারীদের গাফিলতির জন্যই এরূপ হয়ে থাকে, তবে তাদের শাস্তিবিধানের হুম্‌কীতেই এত 'ডালি' আসতে থাকে যে শাস্তির পরিবর্তে পদোন্নতিই সঙ্গত বোধ হয়।

এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সুভাষচন্দ্র এলেন প্রধানরূপে। নিযুক্তির পর তিনি ঘোষণা করলেন, মেয়র দেশবন্ধুর নির্দেশিত পথে তিনি কর্পোরেশনকে চালিত করবেন। কলকাতা মানে যে শুধু চৌরঙ্গী বা পার্কষ্ট্রীট নয়, তা তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেবেন। ও-পাড়ার বাসিন্দারা যে-সব সুখ-সুবিধা ভোগ করেন, কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলবাসীরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যাতে সেই সব সুবিধা পান, তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করাই হবে কংগ্রেস কর্তৃক কর্পোরেশন পরিচালনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সহরের সকল অঞ্চলের করদাতাই যাতে পর্যাপ্ত পানীয় জল, রাস্তায় যথোচিত আলো, সর্বত্র সুপরিসর, পরিচ্ছন্ন রাজপথ, বর্ষায় সত্বর জল-নিকাশের জন্য নালা-নর্দমার সংস্কার ও বিস্তার-সাধন, আবর্জনা দূরীকরণের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও রোগ-প্রতিকারের জন্য প্রতি পল্লীতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, বস্তিগুলির উন্নতি বা অপসারণ এবং সর্বোপরি দরিদ্র শহরবাসী বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিধানের জন্য প্রতি পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন—এই কর্মধারা সত্বর প্রবর্তন ও তার সাফল্যসাধনের জন্য তিনি সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করবেন।

এই ঘোষণা অনুযায়ী তিনি কাজও সুরু করেছিলেন। এছাড়া অন্য কোনও কাজ করবার অবসর তাঁর কি করে থাকা সম্ভব?

সকাল সাতটায় তিনি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে কর্পোরেশনের বিভিন্ন কারখানা ও কর্মকেন্দ্র পরিদর্শনে যেতেন। এ পরিদর্শন মামুলি সরকারী-ধরণের ছিল না। গন্তব্যে পৌঁছেই তিনি সরাসরি অকুস্থলে উপস্থিত হতেন এবং গোলমাল বা অসুবিধাটা কিসের বা কেন হচ্ছে তা হাতে-কলমে জানবার চেষ্টা করতেন।

একদিন সকালে দেখা গেল বাড়ীতে সুভাষচন্দ্রের বসবার ঘরে, তাঁর টেবিলের পাশে একজোড়া বিরাট আকারের গামবুট। মেজদা শরৎচন্দ্র ঘরে ঢুকেই বুট-জোড়া দেখে থেমে গেলেন।

—এ আবার কি? এ দিয়ে কি হবে?

সুভাষচন্দ্র টেবিলের পাশেই বসেছিলেন। মাথা নীচু করে বললেন,

—আমি পরব

—কেন ?—জিজ্ঞাসা করলেন মেজদা।

একবার কালিতলা যাচ্ছি। ড্রেনে নামতে হবে। ওখানে এত জল কেন জমে তা জেনে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

—ও, বলেই মেজদা ওখান থেকে সরে পড়লেন।

একটু পরই কর্পোরেশনের চীফ-ইন্‌জিনিয়ার, ডিস্‌ট্রিক্ট ইনজিনিয়ার, ড্রেনেজ বিভাগের ইনজিনিয়ার এবং আরও অনেকে এলেন। সুভাষচন্দ্র ঐ নতুন গামবুট সঙ্গে নিয়ে চললেন কালিতলা, জলনিকাশের ব্যবস্থার উন্নতির আশায়।

এরূপ প্রাভাতিক অভিযান চল্‌তো প্রায় নিত্যই। আজ এ-পাড়ায়, কাল ও-পাড়ায়। কোথাও জল-নিকাশের ব্যবস্থা-সাধন, কোথাও রাজপথের সংস্কার, কোথাও বা পরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য।

এর পরই আছে নিত্যকার অপিসের কাজ। সেখানে তিনি হাজির হতেন সকাল দশটায়। প্রাত্যহিক পরিদর্শন শেষে দশটায় আপিসে পৌঁছতে হলে অধিকাংশ দিনই তাঁর পক্ষে বাড়ী ফিরে আহারাদি সমাপন করা সম্ভব হত না। কিন্তু সেদিকে কোনও দিনই তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সকালেই স্নান সেরে, চা পান করে তিনি পরিদর্শনে বের হতেন—ওদিকের কাজ সেরে আপিসে গিয়ে এক কাপ চা-এর সঙ্গে আবার কাজ সুরু করতেন। মাঝে মাঝেই ঐ চায়ের কৃপায় আহারের পর্ব শেষ করে কোনওদিন বাড়ী ফিরতেন রাত ন'টা নাগাদ, কোনও দিন বা তারও পরে। ইতিমধ্যে গৃহেও অর্থী বা প্রত্যর্থীর দল বা জমায়েৎ হচ্চে সন্ধ্যা ছটা থেকে। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনাদি শেষ করতে কোনও দিন রাত এগারোটা, কোনও দিন বা তারও পরে।

এরূপর সুরু হত তাঁর নিজস্ব লেখাপড়া। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত নতুন আইন পুংখানুপুংখরূপে পাঠ ও আলোচনা হত নিত্যরাত্রে। এ কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। অসহযোগের প্রথম পর্যায়ে সাবিত্রীবাবু গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে অধ্যাপনা করতেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ফরওয়ার্ড প্রেস ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সহকারী, তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে সাবিত্রীবাবু মিউনিসিপ্যাল আইন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের গৃহ-শিক্ষক বা সহাধ্যায়ী ছিলেন, বলা যেতে পারে। অবশ্য এ পদে তিনি অতি অল্পদিনই ছিলেন।

* * *

সামান্য চা-এর উপর দিয়ে সুভাষচন্দ্র যে কত দিন, কত রাত কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরাই জানেন।

পরবর্তীজীবনে এর ফলে তাঁকে যে কিরূপ রোগে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, তাও কারো অজানা নয়।

রাজবন্দী অবস্থায় মান্দালয় জেলে তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি, আরও পরবর্তীকালে রুগ্ন অবস্থায় অষ্ট্রিয়ায় গমন, সেখানে পেটে অস্ত্রোপচার এবং তার পরবর্তীকালের অসুস্থতা, ত্রিপুরি কংগ্রেস-কালে অদ্ভুত ব্যাধির আক্রমণ—এ সবের মূলে ঐ কর্পোরেশনের কাজ, দিবারাত্র পরিশ্রম, অনাহার

বা অনিয়মিত আহার এবং অত্যধিক চা পান যে কতখানি দায়ী, তা কে বলবে ?

এর পরে ১৯২৭ সাল। শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রস্তাব করার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক সার জন সাইমনের নেতৃত্বে কমিশন গঠিত হয়েছে। সে কমিশন ভারতে আসবে। নানা প্রদেশ পরিদর্শন করে, বিভিন্নদলের নেতাদের মতামত জেনে কমিশন স্থির করবেন তাদের সিদ্ধান্ত। আর কতটুকু স্বাধিকার দিলে ভারতের "ক্রোধোন্মত্তদের" শান্ত করা যায়, তার ব্যবস্থাসাধনের জন্য।

জাতীয় কংগ্রেস এ-কমিশনের বিরোধী। আমাদের দাবী পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন, যার অপর নাম স্বরাজ, তার কম কিছুতেই নয়। সুতরাং ও ভিক্ষার দানের ব্যবস্থার জন্য কোনও কমিশনের প্রয়োজন নেই—'চলে যাও সাইমন'—এই ধ্বনি উঠছে ভারতের প্রতি প্রদেশে, প্রতি শহরে। যেখানেই ঐ কমিশন ইতিপূর্বে গেছে, সেখানে কংগ্রেসদল শুধু কমিশন বয়কট করেন, পথে পথে মিছিল, হরতাল, সভা হয়েছে, ও সব জনসমাবেশে প্রতিধ্বনিত হয়েছে নিত্যকার আকাঙ্খা—সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, তার কমে কিছুতেই নয়, চলে যাও সাইমন।

ফল হয়েছে, পুলিশের গুলি-চালনা, কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি চালনা, ছত্রভঙ্গ, আহত ইত্যাদি। লালা লাজপত রায় লাহোরে এক অনুরূপ মিছিলে পুলিশের দণ্ডাঘাতে বৃদ্ধবয়সে অসুস্থ হয়ে আর উঠলেন না—সেই শয়নই হল তাঁর অন্তিম শয্যা।

সেই সাইমন-দল আসছেন কলকাতায়। সুভাষচন্দ্র তখন বাঙ্গলা কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর উপর কলকাতায় 'গো-ব্যাক সাইমন' আন্দোলন পরিচালন এবং জোরদার করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যে পথ দিয়ে ও-কমিশন সহরে ঢুকবে, সে-পথের দুদিকে থাকবে শুধু এক বাণী—'গো-ব্যাক্ সাইমন'।

কিন্তু এঁরা কবে, কখন, কিভাবে সহরে প্রবেশ করবেন সে-খবর সঠিকভাবে কোনও ক্রমেই জানা যাচ্ছে না। সবই খুব গোপন রাখা হয়েছে। অনেক চেষ্টায় ওদের আসবার তারিখটা জানা গেল; কিন্তু কোন পথে এবং কখন যে তাদের আগমন, তা জানা যাচ্ছে না।

স্পষ্টতঃই সরকার এত স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন বোমার ভয়ে। বাঙ্গালাদেশ বোমা বারুদ বিপ্লবীর রাজ্য। বিলেতের সভ্যবৃন্দ যাতে অক্ষত-দেহে এখান থেকে ফিরে যেতে পারেন, তা দেখার দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের। এদের আগমনের সময় ও পথের নিশানা পূর্বে জানানো হলে কোথায় কোন বিপ্লবী যুবক বোমা রিভলভার নিয়ে কি বেশে অতর্কিতে মাননীয় অতিথিদের আক্রমণ করবে কে জানে ? সেজন্য পথের ইঙ্গিত, সময়ের নির্দেশ বা আবাসের হিসেব কাউকে জানানো হবে না। কোনো বিপদ ঠেলে তার পুরো দায়িত্বভার বাঙ্গলা সরকার তথা পুলিশ বিভাগের উপরই আরোপিত হবে। পুলিশ মানেই ত' টেগার্ট, যিনি এতকাল কলকাতায় অঘোষিত শাসকরূপে বর্তমান আছেন।

সুভাষচন্দ্রও দৃঢ়সংকল্প, এ কমিশনকে কলকাতায় কোনও কাজ করতে দেওয়া হবে না। প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকে এ-সম্বন্ধে নানারূপ কাজ সুরু হল।

প্রথমেই চাই বড় বড় প্রাচীর পত্র—'গো-ব্যাক সাইমন'। ও-দলের আসবার পূর্ব মুহূর্তে প্রাচীরে প্রাচীরে ও-পত্র টাঙ্গানো হবে—নইলে পুলিশে সেগুলো খুলে দেখতে পারে, বা যারা টাঙ্গাতে যাবে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে।

সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে নানা কর্মীর আস্তানায় দুটি চারটি করে বিরাট আকারে প্রাচীরপত্র—লাল শালুর উপর শাদা রং-এর লেখা 'Go Back Simon' তৈরী হতে থাকল, যেন পাকা সংবাদ পাওয়া মাত্র সেগুলি রাজপথের দুপাশে টাঙ্গানো হয়। এজন্য হাওড়া ও শিয়ালদহ দুই ষ্টেশনের পার্শ্ববর্তী বড় বড় রাজপথের আশে-পাশে প্রাচীর পত্রগুলি জমা রাখা হল—যেন আদেশ পাওয়ামাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ও-গুলি টাঙ্গানো হয়ে যায়।

অবশেষে জানা গেল, কমিশন হাওড়া ষ্টেসন দিয়ে আসছে, এক স্পেশাল ট্রেনে। সে ট্রেন যে কখন পৌঁছবে, তা থাকবে পুলিশের ইচ্ছাধীন। কোন পথ দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে যাবে তাও রইল অনুমান-সাপেক্ষ।

নির্দিষ্ট দিনে সুভাষচন্দ্র প্রত্যূষে বৌবাজারে কংগ্রেস কার্যালয়ে উপস্থিত। হাওড়া লাইনের বর্ধমান ও খড়্গপুর এবং শিয়ালদহ লাইনের রাণাঘাট ও নৈহাটি ষ্টেসন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র এমনভাবে সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করলেন যেন যে কোনও দিক দিয়ে 'স্পেশাল' এলে অন্ততঃ দু'ঘণ্টা পূর্বে উনি খবর পেতে পারেন।

ঐ দু'ঘণ্টা সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে যাতে যথেষ্ট হয়, তার ব্যবস্থা সুভাষচন্দ্র করেছেন, বৌবাজারে কংগ্রেস আপিসে বসে।

সারাদিন তিনি আসন ছেড়ে কোথাও যান নি। কমিশন আগমনের সঠিক সংবাদ জানবার জন্য তিনি একাগ্র প্রতীক্ষায় আছেন। আর আহার? সে-ত' অতি তুচ্ছ ব্যাপার। পূর্বেই বাড়ীতে জানিয়েছেন তিনি বাড়ী যেতে পারবেন না খাবার ব্যবস্থারও কোনও দরকার নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাড়ী থেকে টিফিন কেরিয়ারে ওঁর খাবার পাঠানো হয়েছে, বৌবাজারে। যে বেয়ারা এনেছে তাকে বোধ হয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খাওয়া শেষ হলে সে যেন বাড়ী ফিরে যায়। তার আগে নয়। সে জন্যই হয়ত সে এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সামনে ঐ টিফিন-কেরিয়ার।

রাত ন'টার সময় সঠিক সংবাদের আশায় সাংবাদিকরা এলেন কংগ্রেস আপিসে। তাঁরা দেখেন আপিস ভর্তি লোক, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই, সবাই সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে নানাস্থানে বসে আছেন।

সুভাষচন্দ্রের পাশেই যতীন্দ্রমোহন, তাঁর পাশে কিরণশংকর। ওদিকে ঘরের একপাশে টিফিন কেরিয়ার, তার পাশে সুভাষচন্দ্রের বাড়ীর বেয়ারা, শুক্‌নো মুখে দাঁড়িয়ে। বেচারীর হয়ত সারাদিন আহার জোটে নি। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রমোহন ও কিরণবাবু উভয়েই সুভাষচন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করেছেন কিছু খেয়ে নিতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? তিনি উৎকর্ণ হয়ে বসে আছেন এক সংবাদের প্রতীক্ষায়, কখন, কোনপথে আসবে কমিশন-স্পেশাল।

খবর নিয়ে জানা গেল, সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত বারো ঘণ্টায় সুভাষচন্দ্র পান্

করেছেন মাত্র কাপের পর কাপ চা—সবসমেত চব্বিশবার।

এদিকে নটা থেকে দশটা-এগারোটা বেজে গেল, তবু স্পেশালের গতিবিধির কোনও খবর নেই। কলকাতায় বিভিন্ন পথের পুলিশী ব্যবস্থা দেখে জানা গেল ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে অবিরত পুলিশের গাড়ী, মোটর সাইকেলে গোরা সার্জেন্ট যাতায়াত করছে। ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, গঙ্গার ধার হয়ে, ময়দানের মধ্য দিয়ে রেড রোড পর্যন্ত সর্বত্র পুলিশের গাড়ী, মিলিটারী টহলদারী লরী, সার্জেন্টদের মোটর সাইকেল। বোঝা গেল, ঐ পথ দিয়েই কমিশনের সভ্যরা হয় লাট-প্রাসাদে নয়ত বেলভেডিয়ারে যাবেন কিন্তু কখন?

তাও জানা গেল, একটু বাদে।—রাত দুটোর আগে নয়। ইতিমধ্যে গাড়িটিকে আসানসোলে আটকে রাখা হয়েছিল। এখন বর্ধমান অতিক্রম করে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে।

তবে আর দেরী নয়। কয়েকদল মই, দরিদরা ও ব্যানার নিয়ে চলল, বড়বাজারের দিকে। রাত তখন বারোটা। বড়বাজার-হ্যারিসন রোড-ষ্ট্র্যাণ্ড-রোডের মুখে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেখান-থেকেই মিলিতভাবে ধিক্কার দিয়ে জানাতে হবে—এ-কমিশন আমরা চাই না।

বোধ হয়, আর বেশীদূর পুলিশ কাউকেই এগোতে দেবে না। সুতরাং বড়বাজারের ঐ সীমান্ত পর্যন্তই আমরা অগ্রসর হতে পারবো। সেখান-থেকেই বার বার চীৎকার করে জানাবো আমাদের দৃঢ় সংকল্প।

শীতের কলকাতা। ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন। দোকান-পাট সব বন্ধ। রাস্তায় দূরে দূরে মিটমিট গ্যাসের আলো। রাত তখন একটা বেজে গেছে।

ঐ আধো অন্ধকারে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের জংসনে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, সম্মুখে কালো ওভারকোট পরা গোরা সৈন্যদের বিরাট ব্যারিকেড্—তারা হ্যারিসন রোডের মুখ বন্ধ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুতরাং আর অগ্রসর নয়। এখানেই আমাদের ব্যূহ রচনা করতে হবে।

পাহারাদার মিলিটারীদের কিছু দূরে কংগ্রেস-দলের নেতৃবর্গ, স্বেচ্ছাসেবকদল, বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আর কিছু স্থানীয় অধিবাসী—এই নিয়ে প্রতিবাদকারীর দল। সামনে হাওড়া পুলের দীর্ঘপথ কুয়াশায় ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন—কিছুই দেখা যায় না।

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর দেখা গেল, একখানা কালো রংয়ের বড় মোটর, সামনে ছোট ছোট দুটি বাতিজ্বেলে, ঝড়ের বেগে অগ্রসর হতে হতেই নিমেষে ডান দিকে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে অনুরূপ আর একখানা, প্রথমটির অনুসরণ করল। তারপর আর দু' খানা চোখের নিমেষে ডানদিকে চলে গেল।

একটু পরই ওভারকোট পরা মিলিটারীর দল উত্তরদিকের ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে অপেক্ষমান তিনচার খানি ভ্যান ভর্তি করে দক্ষিণাঞ্চলে চলে গেল।

ধীরে ধীরে ওদিকের পথ খালি হয়ে গেল।

কংগ্রেসদলের নেতৃবৃন্দ প্রথম গাড়ীটি চলে যাবার পরই ছন্দোবদ্ধভাবে চীৎকার সুরু করলেন, 'গো-ব্যাক্ সাইমন', 'গো-ব্যাক সাইমন।'

এই ধ্বনি চলতে থাকল, যতক্ষণ না মিলিটারী ভ্যানগুলি অদৃশ্য হল ততক্ষণ পর্যন্ত। তারপর ফেরার পালা।

পথ চলতে চলতে সুভাষচন্দ্র বললেন, 'যাক্, আজ খুব একটা হাস্যকর-পর্বের সমাপ্তি করা গেল।'

অন্ধকার শীতের রাতের তৃতীয় যামে, অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে, 'চলে যাও, চলে যাও' চীৎকার, হাস্যকর বই কি।

তাও যদি বা পুলিশ সক্রিয় হত—লাঠি চার্জ করত বা কাঁদুনে গ্যাস ছাড়তো—তাহলে যা কিছু হত। কিন্তু এত প্রতীক্ষা ও আয়োজনের পর শুধু হাত-নাড়া প্রতিবাদ ও আপন-মনে চীৎকার 'চলে যাও, চলে যাও'—হাস্যকর নয়ত' কি?

* * *

জয়শ্রী প্রকাশন-এর

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বই

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ
১ম খণ্ড ৯·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০
ও ৩য় খণ্ড ১৩·৫০

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ৩·৫০

Netaji Through German lens :
Nanda Mookerjee Rs 20·00

Vivekananda's influence on
Subhas Nanda Mookjee
Rs 6·00

NETAJI SPEAKS : Volume One
A collection of speeches & writings
5·00

রামমোহন : ভারতের সাধিক চিন্তার সূচনা
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬·০০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ
অনিল রায় ৬·০০

বাংলাদেশের বিপ্লব : সুনীল দাস ·২৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান : অনিল রায় ২·০০

২০-এ গ্রিজগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

গ্রীস

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

৩০শে আগষ্ট সালোনিকায় পৌঁছলুম। বৈকালে গেলুম আপোস্তলু পাভলু (ইংরিজীতে এ্যাপোস্‌ল্ পল) গলির ৭ নম্বর বাড়ীটা দেখতে। গোলাপী রঙের ছোট বাড়ী, গত শতাব্দীতে তৈরী। এই বাড়ীতে মহাবীর কামাল আতাতুর্কের জন্ম, ১৮৮০তে, সালোনিকা তখন তুর্কী রাজ্যের অন্তর্গত।

খানকতক ছবি তুলে গলির কাফেতে বসেছি এমন সময় মালিক এসে হাজির, "কি ইচ্ছে হয় বলুন।" ক্যামেরা ব্যাগে ভরতে ভরতে বল্লুম, কফি।—এস্‌প্রেসো না তুর্কী ?

—তুর্কী।

এই বস্তুটী যুগোস্লাভিয়াতে আবিষ্কার করি। কফির মোটা মোটা গুঁড়ো একটা ছোট কাপে দিয়ে তার ওপর ফুটন্ত গরম জল ঢালা। ঠাণ্ডা হতে যা সময় লাগে ততক্ষণে কাগজ পড়া, চিঠি লেখা, গল্পগুজব বা চুরোট ফুরিয়ে যাবে। কফিতে চুমুক দিচ্ছি হঠাৎ দেখি চতুর্দিকে পুলিশ। আমার বিপরীত দিকে চেয়ারটা খালি। একজন সুবেশিত প্রৌঢ় এসে বসলেন। কফির হুকুম দিয়ে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, আমি মৃদু হাসলুম। পরিষ্কার ইংরিজীতে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন কোন দেশের ? আমি বল্লুম, ভারতীয়।

—পেশা ?

—সাংবাদিক। ভদ্দরলোককে আর জেরার সুযোগ দিলুম না। প্রশ্ন করলুন,

—এত পুলিশ কেন ?

—প্রতি বছর ছাত্ররা জোটে আর ঐ বাড়ীটার ওপর বিয়ার-বোতল ছোড়ে।

—বাড়ীটার অপরাধ ?

—কেমাল পাশার জন্মস্থান বলে।

১৯২০ শে কেমাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কীর জাতীয় বাহিনী তুর্কীর অভ্যন্তরে ডুমলুপিনার থেকে গ্রীক বাহিনীকে ঠেলে ২৫০ কিলোমিটার দূরে ইজ্‌মিরে নিয়ে যায়। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর দয়াতে গ্রীকরা ঘরে ফেরে। ইজ্‌মিরকে ইংরেজ বলে স্মার্ণা। ৫৮ বছর আগেকার পরাজয়ের শোধ নেয় গ্রীক ছাত্র-সমাজ মহানায়ক কেমালের বাড়ীতে বোতল ছুঁড়ে। আমি প্রশ্ন করলুম,

—এই বাড়ীটার ওপর ঢিল ছুঁড়ে সামরিক পরাজয়ের শোধ তোলা যায় ?

—কি করব ? ভদ্দরলোকের কথায় হতাশা।

—অভিভাবকরা পারেন।

—যথা ?

—ওদের ভাত-কাপড় বন্ধ করুক।

শুনে ভদ্রলোক হেসে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার

উপক্রম। পাশের টেবিলের লোকদের বলাতে তারাও অট্টহাস্য করলে।

—ভারতে অভিভাবকরা কি তাই করেন?

আমি বল্লুম, না তবে আমি ফিরে প্রস্তাব করব। বেলগ্রেড থেকে দীর্ঘ রেল যাত্রার পর আমার দেহে মনে পরম ক্লান্তি। এখন ঘুমবো; কাল ভোর (আমার বয়সী মানুষের কাছে ভোর) আটটায় ইস্তাম্বুলের ট্রেন। হোটেলে ফিরছি। চতুর্দিকে গ্রীক অর্থাৎ সিরিলিক অক্ষরে নাম ও সাইনবোর্ড। বেলগ্রেডের রাস্তার নামও ঐ হরফের তবে লাটিন বর্ণমালায় রাস্তার অন্যধারে নাম পাওয়া যায়। তুর্কী থেকে কেমাল আতাতুর্ক আরবী বর্ণমালা বিদায় করেছেন। ফলে তুর্কী হয়েছে এশিয়ায় ইউরোপীয় দেশ আর গ্রীক হয়েছে ইউরোপে এশিয়ার দেশ। অতীত ইতিহাস আর সূর্যকিরণের বদৌলত গ্রীসের কদর; আর কদর মার্কিণ নৌবহরের অন্যতম বিরাট ঘাটি বলে। যদি রাশিয়া রাজা বদল্যায় এবং ইস্রায়েল-আরবে মিটমাট হয় তাহলে গ্রীসের অর্থনীতিতে ধ্বস্ নামবে।

গ্রীকরা ইউরোপের সমস্ত অনুষ্ঠান ও ঠাট বজায় রাখলেও ১৫ আনা গ্রীক। ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন নয়। এলিটদের কথা ভিন্ন। তার প্রমাণ ইউরোপের সভ্যতা রক্ষে করার জন্য যে শৌর্য অর্জন করা প্রয়োজন, তার প্রতি গ্রীকদের কোনও আগ্রহ নেই।

ইংরেজ ও ফরাসীর দয়ায় গত শতাব্দী থেকে তুর্কীর তারবর্তী বহু ডজন দ্বীপ গ্রীসের অধিকারে। সেই সূত্রে গ্রীস সাইপ্রাসের মালিক। সেই জোরেই ওরা ১৯৬৩ তে সাইপ্রাসের তুর্কী নাগরিকদের কচুকাটা করে। ভারতভাগের দাংগা ও হত্যাকাণ্ডে দুপক্ষই অংশগ্রহণকারী ও পাপী। সাইপ্রাসে ১৯৬৩ তে ব্যাপক হত্যাটা এক তরফা। ওদের রক্ষক আমেরিকা অবধি আঁৎকে উঠেছিল। তুর্কী কিছু করেনি যদিও দ্বীপটা তুর্কী থেকে থাপ্না জাল ফেলার দূরত্বের ভেতর। ১৯৭৫-এ সাইপ্রাসের গ্রীকরা ভাবলে ইংরেজকে যখন তাড়িয়েছি, তুর্কীকেও তাড়াবো। ওরা নিকোস স্যামসন নামক এক গ্রীকভক্তির ভক্তর পেছনে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট আর্চ বিশপ মাকারিওস্কে তাড়াবার চেষ্টা করে; সাইপ্রাসের তুর্কী নেতা বুঝলেন যে এবার ১৯৬৩র হাজারগুণ তুর্কী হত্যা করা হবে; সব সৈন্য গ্রীক। নেতা দেংক্তাশ আবেদন করলেন খাস তুর্কীর প্রধান মন্ত্রী বুলেন্ত্ এচেভিতের কাছে। তুর্কী ছত্রী-বাহিনী সাইপ্রাসে নাম্ল। তুর্কী নাগরিকরা হাঁপ ছাড়লে। এই সময় আর একটা কলংককর ঘটনা ঘটে যা আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের মাথা ব্যাথা। তুর্কীবাহিনী নামলে দ্বীপের সমস্ত গ্রীক সৈন্যবাহিনী অস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। মানুষের কাছে আত্মসম্মানের চেয়ে বেঁচে থাকা যখন বড় হয় তখন তাদের সন্তান-সন্ততিরা চেহারায় যাই হোক, পৌরুষের মানদণ্ডে যারা কেঁচো হয়।

১৯১৮—১৮র কথা আগেই বলেছি। মানুষ এই ধরণের কাপুরুষ হলে আমার দুঃখ হয়। ইতিহাস তাদের ভুলে যায়। তারা বেঁচে থাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে, যেমন গ্রীস। ওরা ভাবে পাশ্চাত্য ওদের রাখবে কারণ ওরা গ্রীক। এছাড়া আর কোনও গুণ নেই। ভারতের অবস্থা অবিকল তাই।

সকালে ইস্তাম্বুলের গাড়ী না ধরে চল্লুম পেল্লায় যেখানে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এর জন্ম—সালোনিকা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। বিরাট উপত্যকার মধ্যে রাস্তার বাঁ দিকে একটী ছোট যাদুঘর,—বড় জোর তিরিশ ফিট বাই তিরিশ ফিট। ডান দিকে তার-ঘেরা একটা রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, দু'তিনটে ছোট থাম আর মোজেকের মেজ। এই ভগ্নাবশেষের সাইজটাও যাদুঘরের মতন। পয়সা দিয়ে ঢুকতে হয়।

ভগ্নাবশেষ দেখে, ফটো তুলে, যাদুঘরে ঢুকলুম। সেখানে আলেকজাণ্ডারের 'আ'-ও নেই। আছে সেই সময়কার হাঁড়কুঁড়ি। তবে খুবই উন্নত ধরণের।

যাদুঘরের বড়বাবু একজন মহিলা (মহিলা পাঠকরা আশাকরি নারাজ হবেন না কারণ বড়বাবুর বা মাইকেলী কায়দায় বড়বাবুরী লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। ইনি আমাকে দেখে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোন দেশের? আমি বল্লুম, ভারতীয় (এবার থেকে জামার ওপর ইণ্ডিয়া লিখে ঘুরব)। মহিলা আকাশ থেকে পড়ে বল্লেন, এখানে কোনও কালে কোনও ভারতীয় আসেনি। পাশে একদল মার্কিন টুরিষ্ট ছিল; তারা হামড়ে পড়ল আমার ফটো তোলার জন্যে। আমি বিরক্ত হয়ে, এক্সকিউজ মি বলে রাস্তার উল্টোধারে একটা কাফেতে গিয়ে বসলুম।

এক ব্রিটেন ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র কাফে আমার মতন নির্বান্ধব মানুষের সান্ত্বনা। এই খানে কাগজ কলম নিয়ে বসলে আমি স্থান কাল পাত্র ভুলে যাই। লতাপাতা ঘেরা পেল্লায় এই কাফেটি মনোরম, ছায়া সুশীতল, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও হ্রদ, পুকুর, নদী বা খাল নেই। কাফেতে পাওয়া যায় মাছ ভাজা (মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করছে)। আর আছে লেমোনাদে আর চায় অর্থাৎ চা। চা'ই সই। কাফেটা উপযুক্ত হাতের হাতে পড়লে নন্দন কাননে পরিণত হতে পারে কিন্তু সে ধারণা গ্রীক (বা ভারতীয়) কারোর নেই।

দূরের বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারের পৈত্রিক ভিটে। সেখানে আজ ঘুঘু চড়ছে। মনে মনে বল্লুম, হে মহাবীর, তুমি বিশ্ব জয়ে যাবার সময় স্বদেশের সমস্ত পৌরুষ সংগে নিয়ে গিয়েছিলে। তারা ফেরেনি। তারপর গ্রীসের কপালে সামরিক জয় বলে কিছু ঘটেনি।

পেল্লা। ৩১শে আগষ্ট।

তুর্কী

ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা আসার পথে ট্রেনে এক তুর্কী অফিসারের সংগে ভাব জমে গেল। আমি বল্লুম আমার ক্ষুদ্র হোটেলে পায়ের ধুলো দাও। বিবিসি শোনাবো। ও খুব খুসী; ইংরেজী বলবার সুযোগ, তার ওপর বিবিসির সংবাদ ও মতামত শোনার লোভে উতলা তরুণ তুর্ক, আমন্ত্রণ শুনে রোমাঞ্চিত।

বিকেলে আড্ডা জমল। ছোকরা ক্যাপ্টেন একজন সহযোগী সংগে এনেছে। তিনিও ক্যাপ্টেন। কয়েক কাপ কফি খতম হওয়ার পর বৈকাল ৭টা। আমি পুরোণো রেডিওর বোতাম টিপে বিবিসি ধরলুম। প্রথমেই ইরাণ। সংবাদ শুনে আমরা পরস্পরের দিকে চাইলুম। গুলী

চলেছে, নরনারী ও শিশু নিহত হয়েছে। দোকান, ব্যাংক্, চলচ্চিত্র গৃহ, পুড়ে একাকার।

ইরাণী জনতার দাবীতে মজুরী বৃদ্ধি, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ছুটী, পেন্সান, আহত শ্রমিকদের খেসারত এসব কিছু নেই। আছে মেয়েদের চাকরী করা চলবে না, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশানে নামা, মুখ না ঢেকে রাস্তায় বার হওয়া বন্ধ করা হোক। শিয়া সম্প্রদায়ের দাবীর দাপটে ইরাণ নয়ছয় হয়। এর নৈতিক ক্ষতি পূরণ হতে আরও পঁচিশ বছর লাগবে যেমন স্বাধীন ভারতে ৩০ বছর অনাসৃষ্টির খেসারৎ দিতে হবে শতাব্দীর সংক্রান্তি অবধি।

আমার ধারণা ছিল যে সুন্নীদের হাতে শিয়াদের এত অবিচার হয়েছে যে ওরা সমাজের উন্নতিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে। ইরাণ শিয়াদের দেশ। ওখানে হচ্ছে তার বিপরীত; শিয়ারাই ৭ম শতাব্দীতে ফিরে যেতে চায়। এখন দেখা যাচ্ছে ওরা মোল্লাদের প্ররোচনায় সুন্নীদের ঘাড়ে চড়ে। অথচ কোরাণ শরীফে কোথাও মোল্লা, বোর্খা বা ফেজ-এর অনুশাসন নেই।

এই বীভৎস ব্যাপার ইরাণে আরম্ভ হয়েছে চীনের প্রধানমন্ত্রী হুয়া কুয়ো ফেং-এর পরিদর্শনের ঠিক আগেই। এটা সোভিয়েটের অপছন্দ। ইরাণের তৈল সম্পদ ও শিয়া মতবাদ দুটোই সৌদী আরবের চোখের বিষ। ইরাণে হাজার হাজার ভারতীয়, পাকিস্তানী ও বাঙালী চাকরী করে যেটা এই আর্থিক দুর্দিনে সাধারণ ইরাণী প্রজার কাছে ক্ষতিকর অথচ ওরা এই ধরণের কাজের যোগ্য নয়। এর ওপর বাদশা পেহ্‌লবীর শাসন সংস্কার ঘোষণায় দেরী হয়েছে ৩০ বছর। এই সব ঘটনার সংমিশ্রণে ইরাণের সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ। কিন্তু দাবীর নমুনা দেখে বোঝা যায় যে বেয়াড়া শিশুর আর্তনাদ উৎপীড়কের ক্রন্দনরোল নয়, পেটব্যথা—প্রসব বেদনা নয়, মোল্লা-প্ররোচিত, বিদেশে পরিকল্পিত বিক্ষোভ-জাতির রাজনৈতিক প্রগতির পতাকা নয়। সংবাদ শুনে আমরা, তিনজনেই মর্মাহত। শিয়ারা সুন্নী-অধ্যুষিত দেশে অপাংক্তেয়। পাকিস্তানে জিন্না, ভুট্টো ও ইস্কান্দার মির্জা বাঙালী বিদ্বেষের জোরে, ইস্কান্দার মির্জা বাঙালী বিদ্বেষের জোরে (ইনি বলেছিলেন, "দরকার হলে দশহাজার বাঙালীকে হত্যা করব")।

তুর্কীতে এসবের বালাই নেই। মহাবীর কেমালের অসীম সামরিক মনীষা ও কূটনৈতিক সাফল্যের ফলে তিনি তুর্কী জাতির হৃদয়ে যে স্থান করে নিয়েছিলেন তার ফলে তাঁর উদার নীতি ও দর্শনকে কেউ বাধা দিতে পারেনি। এমন কি ইসলামের তবিলদার সৌদী আরবের নিরেট মোল্লারা অবধি টুঁ শব্দ করতে পারেনি।

এখন মহাবীর গত, বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি। এই সুযোগে তুর্কীতে সাম্প্রদায়িক সাপদের পেছনে টাকা ঢালছে লিবিয়া, সৌদী, কিমাশ্চর্যম অতঃপরম—সোভিয়েট। দ্বিতীয় ক্যাপ্টেনের কাছে কারণ শুনে আমি হতভম্ব। আরবী ভাষা প্রচারের জন্যে, হাফিজ হবার জন্যে, মক্কা-শরীফে তীর্থ যাত্রার জন্যে। এরা ইসলামের খেদমতে মেবেছে ইরাণকে ভজনচ্ করবার জন্যে, তুর্কীকে ৭ম শতাব্দীতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে। কারণ ওদের তিনজনই জানে যে কেমালের তুর্কী ইসলাম জগতে বর্শা ফলক এবং ভাবী প্রাচ্যের পেশোয়া।

দুই ক্যাপ্টেনই ছোকরা। আমি খুব গম্ভীর ভাবে বল্লুম,—দেখো বাপু, আমি ঘর পোড়া গরু। এই সাপগুলোর বিষদাঁত উপড়ে ফেল নয়ত কেমালের অপূর্ব কীর্তি ধূলায় ধূসরিত হবে।

দুই ক্যাপ্টেনই একযোগে বল্লে,—নেভার!

হোটেলের ম্যানেজার আংকার একমাত্র ইংরিজী দৈনিক টার্কিস্ নিউজ দিয়ে গেল। তুর্কীতে থাকার সময় রোজ এই কাগজটা পড়তুম কারণ তুর্কীভাষা জানি না। কাগজটায় প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে লেখা, "সিভায় সাম্প্রদায়িক দাংগা। সিয়া-সুন্নীর সংঘর্ষ। ন জন নিহত। আহত বহু"। পত্রিকাটা বিছানার ওপর পেতে দিলুম যাতে ওরা দুজনে পড়তে পারে। যে সম্প্রদায়টা শিয়া বলে তুর্কীতে পরিচিত তাদের নাম আলভিতে, ইংরেজরা বলে আলাওয়াইট্। সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি জেনারেল আসাদ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। সংবাদে বলা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী তরবার্ঘানের দল রামাদানের আগে থেকে সিভা সহরে দাংগার জন্যে লোক আমদানি করেছে। তারপর রামাদানের ভোজের প্রথম দিনই দাংগা।

নীরবতা ভংগ করে প্রথম ক্যাপ্টেন বল্লে, "আমরা যে কোনও দাংগাকারীকে গুলি করব। এইভাবে আতাতুর্ক দিয়ারবেকির ও ইজমির-এর ধর্মান্ধতা নির্দেশ করেছিলেন।" আমি বল্লুম, "সাপগুলো আবার মাথা তুলছে।" দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন বল্লে, ওদের পেছনে বিদেশীর টাকা আছে, কারা দিচ্ছে তাও জানি, কাকে দেয় তাও জানি।" আমার ধারণা হল দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন সামরিক ইন্টেলিজেন্সের লোক। আলাপটা একতরফা হয়ে যাচ্ছে দেখে বল্লুম, "আমার দেশের সাপ বহুরকমের, সাম্প্রদায়িক, কাষ্ট্, ক্লাস, ভাষা, প্রদেশ। দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন বল্লে, "এ-দেশে সে-সব হওয়া মুস্কিল। আমরা সব যুবককে ফৌজে ঢুকিয়ে এক হাঁড়িতে ফুটিয়ে নি।"

তুর্কীর সুলতানেরা এক আইন করে গিয়েছিলেন যে, সমস্ত তুর্কী প্রজাকে যৌবনে কিছু দিন সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। সিয়া, সুন্নী, আলভিতে, দরবেশ, মোল্লা, আর্মেনিয়ান, কুর্দ সবাই। ইস্রায়েলের প্রথম দিকে শিক্ষামন্ত্রী শার্টক যৌবনে তুর্কী বাহিনীতে ছিলেন। কেমাল আতাতুর্ক সেই ধারাকে বিস্তৃত করেছেন; পূর্বভাগের সৈন্যরা পশ্চিম ভাগে, পশ্চিম ভাগের সৈন্যরা পূর্বভাগে, এবং আংকারার রিক্রুটরা পূর্ব-পশ্চিম দুভাগেই শিক্ষা নেবে।

দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন বল্লেন, "কাল আমাদের দুজনকে ট্রেনে ট্রাবজোনে যেতে হবে;" তারপর খিলখিল করে হেসে বল্লে, "ক্ষেত-চষার ডিউটী"। প্রত্যেক সৈন্যকে কিছুদিন জমিতে খাটতে হয়, এতে মানুষ মানুষকে চিনবে, ভাব-ভালবাসা হবে, নতুন তুর্কীর অভ্যুদয় হবে।

সুলতানদের অধীনে যে স্থায়ী সৈন্যদল তৈরী হয় তার নাম ইয়েনি চেরে—ইংরেজরা যাকে বলে জেনিসারী, যেমন গালিবলুকে বলে গ্যালিপোলি, চানাক্কালেকে ডার্ডেনালে, ইজমিরকে বলে স্মার্ণা। এই ধরণের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী তখন ইউরোপে ছিল না। ১৬৮৩ তে তুর্কীর সৈন্যবাহিনী ভিয়েনার দরজায় হাজির, ফলে ইউরোপে সাজ্ সাজ্ রব পড়ে গেল। অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও হাংগারীর

স্বেচ্ছাসেবকদের অমিত আত্মত্যাগে তুর্কী জোয়ার-ভাঁটায় পরিণত হল। মধ্য এশিয়া থেকে বেরিয়ে ইরাণ তুর্কী হয়ে ইউরোপ যাওয়ার পথে তুর্কীদের এই প্রথম পরাজয়। ওরা তখন সাম্রাজ্য বিস্তার করলে দক্ষিণে মক্কা, উত্তরে অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত, পশ্চিমে লিবিয়া অবধি। তুর্কীবাহিনী কোনও দিন ভারতে পা দেয়নি; যারা এসেছে তারা মধ্য এশিয়ার তুর্কীভাষী মানুষ, যাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গুরুদাসপুর গড়ে, বান্দা সমরে বন্দী হইল তুরাণী সেনার করে।"

অষ্ট্রিয়াতে পরাজয়ের পর তুর্কীর অভ্যন্তরে পচন আরম্ভ হল। সুলতানরা তখন তিনটে ধারায় প্রবর্তন করেছেন: স্থায়ী আমলাতন্ত্র, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী আর স্থায়ী নৌবাহিনী। ধীরে ধীরে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী তুর্কীর খিড়কী দরজা দিয়ে ঢুকল। ১৮৪৮-এ জার্মান বিপ্লবের পর এল পার্লামেন্টের ধারণা। এই নিভৃত স্রোত কিন্তু সুলতানের দরবারে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে, তুর্কী বিদগ্ধজন রাজনৈতিক চিন্তায় এগিয়ে গেল, সুলতান রংশ পড়ে রইল পেছনে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কী পরাজয়ের তিক্ততা মর্মে মর্মে অনুভব করলে; ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইটালীর দয়ায় খাস তুর্কীর হৃদকেন্দ্র আনাতোলিয়াতে তখন গ্রীক সৈন্য। দিকে দিকে তুর্কীদের প্রতিরোধ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। কেমাল এই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত গেরিলা বাহিনীগুলোকে এক করে গ্রীকদের তাড়ালেন এবং কূটনৈতিক চালে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইটালীয়ানদের। (এবিষয় লেখকের "মহাবীর কেমাল আতাতুর্ক" দ্রষ্টব্য)।

এই সব সাফল্যের পর দু একজন তুর্কী নেতা আবার পররাজ্য জয়ে উৎসাহ দেখালেন। কেমাল দেখলেন ইউরোপ ৪ বছর যুদ্ধের পর এত দুর্বল যে আবার ভিয়েনা যাওয়া মুস্কিল নয়। কিন্তু মানবজাতির স্বাধীনতাকে তিনি অসীম শ্রদ্ধা করতেন। ভিয়েনা যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি রেগে টেবিলে ঘুঁষি মেরে বল্লেন, "কখনই না। তুর্কীরা তুর্কীর সীমানার ভেতরে উন্নত হবে, উদাহরণবলে বিশ্ব শান্তি আনবে। 'স্বদেশে শান্তি, বিশ্বে শান্তি' হবে তুর্কীর পথ।" আংকোরায় এই মহামানবের স্মৃতিসৌধের দেওয়ালে সোনার জলে এই কথাগুলো লেখা আছে: ইওর্ত সুল, জেহান্দার সুল। তুর্কী পরাজিত হয়েছে, কিন্তু পরাধীন হয়নি। ভারতের মতন ছিন্নকাঁথুনে ও বিকলাংগ হয়নি।

আরব ও উপমহাদেশের অধিবাসীরা কলহ-প্রবণ, তুর্কীরা একতা-প্রবণ। আরব ও উপমহাদেশের মানুষ স্বভাবতঃ পরমুখাপেক্ষী, তুর্কীরা স্বাধীনতা প্রিয়। কেমাল দেখলেন যে স্বাধীন তুর্কী জাতির পক্ষে অনির্দিষ্ট আরবীবর্ণমালা, বোর্খা, ফেজ ও কোরাণী বিচার পশ্চাদপদ আরবীদের দাসত্ব। লাটিন বর্ণমালা প্রবর্তন করে, বোর্খা ফেজ ও কোরাণী বিচারের অবসান করে তিনি তুর্কী স্বাধীনতাকে হীরের জৌলুষ দিলেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে ফেজ প্রথম অষ্ট্রিয়াতে তৈরী হয়। প্রুশিয়ান সমরবিদরা যখন তুর্কীতে শিক্ষা দিতে আসেন তখন তারা পাগড়ী সরিয়ে ফেজ চালু করলেন; কেমাল ফেজ সরিয়ে ইউরোপীয় টুপি

চালু করলেন। বিদেশের টাকায় সাম্প্রদায়িক সাপগুলো নিজেদের ঘরের মেয়েদের বোর্খা পরিয়ে রাস্তায় বার করত। শিক্ষিতা তুর্কী মহিলা ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলাবলি করত, "মেয়েটা বোধ হয় হতভাগী আরবী" অথবা ওর "মুখশ্রী এতই কুৎসিৎ যে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়।" এই সব ঠাট্টা-টিট্‌কিরির ঠ্যালায় বোর্খা আন্দোলন এগোয়নি। এর ওপর আছে মহাবীর কেমালের সর্বব্যাপী বিরাট ব্যক্তিত্ব। বোর্খা ও ফেজ বর্তমান তুর্কীতে আইনতঃ দণ্ডনীয়। আমার সন্দেহ দুটোই সওদাগর ও মোল্লাদের স্বার্থের ব্যাপার। ফেজ যদি এতই ধর্মীয় ব্যাপার তাহলে তুর্কী প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত এচেভিৎ, ইরাণের শাহানশা পেহ্‌লবী, সিরিয়ার আসাদ, মিশরের সাদাৎ লিবিয়ার গাদাফী, সৌদের রাজা খালেদ পাকিস্তানের জেনারেল জিয়া উল্ হক্, বাংলাদেশের জেনারেল রহমান কেউ ফেজ পরেনা কেন। আতাতুর্কের বাণী বিশ্ব-ইসলামকে প্রভাবান্বিত করছে; মোল্লা আর মুনাফাখোর গোষ্ঠী হারছে। আমার সন্দেহ নামাবলীর পেছনেও ব্যবসাদারী আছে!

যখন সুলেমান দি ম্যাগ্নিফিসেন্ট্ বা কেমাল আতাতুর্কের কথা ভাবি তখন মনে হয় ভারতের সম্রাট, সুলতান বা বাদশারা ছিল রাজমুকুট পরা ভোঁদা। প্রাচুর্য ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েও তারা শক্তি, সমর ও অর্থনীতির স্থায়ী ধারা রেখে যাননি। যাও বা রেখে গিয়েছিলেন তাও আমরা অবহেলায় হত্যা করেছি। যে ধারা বেঁচে আছে তা প্রাকৃত-জনের উদ্যোগে—কি ক্ষেতে, কি সমুদ্রতীরে, কি বিদ্যার্জনে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে।

১৪৯২-তে ভাস্কোডাগামা জলপথে ইউরোপ থেকে কালিকাটে এলেন। এর পর আফগানিস্তান থেকে তুর্কী অবধি বিরাট ভূভাগ ভারতের কাছে অজ্ঞাত হল; আরব দেশগুলো একেবারে পরিত্যক্ত। এই সময় থেকে আমাদের হোম ইউরোপের সংগে, প্রতিবেশীদের অবজ্ঞা করে। এ-যেন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া। গত শতাব্দীতে বিবেকানন্দ ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, এবিষয়ে বিশদ তথ্য অধীনের অজ্ঞাত; মৌলানা আজাদ তুর্কীতে কিছুদিন ছিলেন কিন্তু সে বিবরণও আমাদের অজ্ঞাত। গান্ধী, সুভাষ, নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জাকির হোসেন, গিরি, রাধাকৃষ্ণন, ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ, শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী কেউ তুর্কীতে ভুলেও পা দেন নি। কথাটা তোলাতে বিলেতের এক মোটা সাংবাদিক বলেছিলেন, "আরে বাপু, ওটা স্যাটোর ঘাঁটী"। এদিকে স্যাটোর ঘাঁটী বিলেত, জার্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী মায় খাস আমেরিকা যেতে আমাদের নেতারা পা বাড়িয়ে থাকেন।

১০ই নভেম্বর আসছে। ঐ দিন মহাবীর কেমাল আতাতুর্কের মৃত্যুদিন। সুভাষ এই মর্মে এক নির্দেশও দিয়েছিলেন। এবার আমাদের দেশ প্রমাণ করুক এশিয়ায় এই মহানায়ককে আমরা সম্মান করি কি না।

আংকারা। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।

নিষ্কম্প অগ্নিশিখা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর
৭৮-তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে
শ্রদ্ধার্ঘ্য। জঃ সঃ]

সাল তারিখ কিছুই মনে নেই। ঘটনাটা মনে আছে। চিরদিন থাকবেও।

বিকেলে রয়েল লেকে বেড়াতে গিয়েছি। মাঝে মাঝে যেতাম, একদিকে সোয়েডাগন প্যাগোডার স্বর্ণাভ শিখর। লেকের জলে তারই কম্পমান প্রতিচ্ছায়া। অন্যদিকে ঘন সন্নিবদ্ধ বিটপী-শ্রেণী। কাছেই পশুশালা। বাতাসে জীবজন্তুদের বন্দীত্বের দুঃসহ আর্তনাদ।

একেবারে জলের ধারে বসেছিলাম। আশে-পাশে লোকের জটলা। হঠাৎ মনে হ'ল সকলের মধ্যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব। কাকে যেন সবাই পথ ছেড়ে দিচ্ছেন।

আমি ঘুরে বসলাম।

আর তখনই চোখে পড়ল, দু পাশে দুটি পুলিশ অফিসর, মাঝখানে খদ্দর আচ্ছাদিত তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের একটি মানুষ।

সংবাদপত্রের কল্যাণে মানুষটির পরিচয় আমার জানা।

সুভাষচন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়ালেন।

পুলিশ অফিসার দুটি একটু পিছনে।

সুভাষচন্দ্রের অন্য কোনদিকে দৃষ্টি নেই। নিষ্পলক নেত্রে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

যেখানে রঙের আলপনা এঁকে সূর্য নেবে যাচ্ছে।

তাঁর দৃষ্টির তাৎপর্য সেদিন বুঝিনি। পরে বুঝতে পেরেছি।

সূর্যাস্তের সেই গোধূলি বর্ণচ্ছটার মধ্যে চির-বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র বুঝি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিতাগ্নির স্বরূপই নিরীক্ষণ করছিলেন।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। অনেক ঢেউয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে ইরাবতী।

কলেজ-জীবনে সতীর্থ হিসাবে পেয়েছিলাম বর্মার শৃঙ্খলমুক্তির উপাসক আউং সানকে। স্বাধীন বর্মার প্রধানমন্ত্রী রূপে কাজ করার সময় হীন চক্রান্তের বলি হয়ে যাঁর জীবনান্ত হয়েছিল।

বর্মা দেশের এই যে রাজনৈতিক চেতনা, পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করার মানসিকতা, এর

সবেরই উৎস ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদ্‌দের চিন্তা আর পরিকল্পনা।

বৃটিশ সিংহের উদ্যত থাবা থেকে আত্মগোপন করে বহু বিপ্লবী বর্মায় চলে এসেছিলেন। বর্মার জাগ্রত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষের বিদ্রোহবহ্নির লেলিহান শিখায় বর্মার আকাশ বার বার রক্তিম হয়ে উঠেছে।

দেশপ্রেমের উদ্দীপনার ভাবগুরু ভারতবর্ষ, এ সত্য বর্মা কোনদিন অস্বীকার করে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে বর্মাদেশ নতুন এক চেতনার আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

যা ছিল এতদিন একটা সম্ভাবনা মাত্র, সুভাষচন্দ্রের বন্ধুত্বের অহ্বানে সে-সম্ভাবনা মুক্তি-যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল।

তারপর বহু পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করে যুগপৎ বর্মা আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে। এ স্বাধীনতার বেদীমূলে বিসর্জিত হয়েছে বহু অমূল্য প্রাণ।

এই দুই দেশের স্বাধীনতার অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্রের অবদান কতটা সে বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই।

বর্মা ছেড়ে এদেশে ফিরে এসেছি।

বর্মার স্বাধীনতা প্রয়াসকে উপজীব্য করে উপন্যাস লিখেছি, ইরাবতী, আরাকান, অভিষেক। সাম্প্রতিকতম উপন্যাস, দিনান্তে নিশান্তে।

প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে নেতাজীর বলিষ্ঠ মতবাদ, খুরধার চিন্তাশক্তি আর কর্মচাঞ্চল্য।

শুধু রাজনৈতিক ভাষ্য উদ্গীরণ করেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না, সে-ভাষ্য কর্মের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করে তুলেছিলেন।

একদিন একটি চিঠি পেলাম। তারিখ ১৪ই অগষ্ট ১৯৫২ সাল। জয়শ্রী অফিস থেকে। লিখেছেন শ্রীমতী লীলা রায়।

ভারতবর্ষ আমার কাছে বিমাতা। আমার বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবন কেটেছে বর্মাদেশে। এ-দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু লীলা রায়ের নামের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম।

আমার উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করার জন্য এ-দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন হয়েছিল। সে-ইতিহাসে দেশের কাজে নিবেদিত প্রাণ যে কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ ছিল, তার মধ্যে লীলা রায়ের নাম যে প্রথম সারিতে সেটা জানা ছিল।

সবচেয়ে তাঁর বড় পরিচয় যা আমাকে আলোড়িত করেছিল, তা হচ্ছে লীলা রায় ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী।

সুভাষচন্দ্র তখন আমার কাছে ভগীরথের প্রতীক। বিপ্লব ও গণচেতনার শঙ্খনিনাদে দশদিক প্রকম্পিত করে যিনি স্বাধীনতার স্রোতস্বিনীকে আমাদের আয়ত্বের আওতায় এনেছিলেন।

লীলা রায়ের চিঠির একাধিক বিশেষত্ব ছিল। এই প্রথম চিঠি, কিন্তু চিঠির প্রতিটি অক্ষর জুড়ে একটা অন্তরঙ্গতার উত্তাপ।

লিখেছেন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার হিড়িকে কাজকর্ম সব বন্ধ, নইলে অনেক আগেই আমার কাছে লেখা চেয়ে চিঠি দিতেন। আমি যেন শারদীয় সংখ্যার

জন্য ছ পাতার একটি গল্প সাতদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিই এবং দেরীতে যোগাযোগ করার ত্রুটি মার্জনা করি।

এ-কথাও লিখেছেন, যথাযোগ্য সম্মান-দক্ষিণা গল্পটি পেলেই পাঠিয়ে দেবেন।

মনে আছে, চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম।

তখন নানা পত্রিকায় লিখছি। সেই জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে কৌতূহল তো ছিলই।

স্টল জয়শ্রী পত্রিকাও উল্ট-পাল্টে দেখেছি। এটুকু লক্ষ্য করেছি ঠিক সাধারণ গোত্রের পত্রিকা এটি নয়। জানতাম বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের মুখপত্র।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সারা পত্রিকাটিতে কোথাও এই মতবাদ প্রকট হয়ে ওঠে নি। পরিচ্ছন্ন রুচির সাংস্কৃতিক পত্রিকা, এটাই মনে হয়েছিল।

তবে স্বভাবতই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, কারণ যে-পত্রিকার কর্ণধার লীলা রায় স্বয়ং, সে-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হ'লে একটু ভাবতে হয় বই কি!

চিঠির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমাকে বিস্মিত করেছিল, তা হচ্ছে লেখার জন্য সম্মান-দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি।

সাধারণত এ-ধরণের পত্র-পত্রিকা আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে রচনা প্রার্থনা করেন বিনা দক্ষিণায়। পত্রিকাটি যে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত নয়, সেটাও জানিয়ে দেন।

কিন্তু জয়শ্রী পত্রিকা সব কিছু মূল্য দিয়ে নিতে চায়, এটাই তার বিশেষত্ব।

শ্রীমতী লীলা রায় নিজের জীবনেও সব কিছু মূল্য দিয়ে আহরণ করেছেন, কিছুই তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ আসে নি, এটা বুঝি তারই সঙ্কেত।

তারপরে যখনই বলেছেন, চিঠিতে অনুরোধ করেছেন, কিম্বা ফোনে, গল্প দিয়েছি।

এই গল্প দেওয়ার সূত্রেই পরিচিত হয়েছি শ্রীসুনীল দাসের সঙ্গে, শ্রীবিজয় নাগ ও শ্রীঅপূর্ব ঘোষের সঙ্গে।

তখন লীলা রায়কে চোখে দেখিনি। কতবার মনে মনে দুর্বার আকাঙ্খা হয়েছে, একবার গিয়ে দেখা করে আসি।

আমার বাড়ী থেকে জয়শ্রী অফিসের দূরত্ব বেশী নয়, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। তাঁকে ঘিরে নিজের অন্তরে যে আগ্নেয় পরিমণ্ডল রচনা করেছিলাম, দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, সেটা অতিক্রম করবার মতন মানসিক বল পাইনি।

কিন্তু দেখা একদিন হয়ে গেল।

রাসবিহারী এভিনিউতে ঘুরছিলাম। একেবারে লক্ষ্যহীনভাবে। শ্রীসুনীল দাসের মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

কোথায় যাচ্ছেন?

কোথাও নয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছি।

এত কাছে এসেছেন, জয়শ্রী অফিসে একবার আসবেন না?

দ্বিধা তো ছিলই তার সঙ্গে সঙ্কোচ এসে মিশল।

আমি সামান্য কথা-সাহিত্যিক। নিভৃতে বসে

গল্প-উপন্যাস রচনা করি। কিছুটা স্বীকৃতি লাভ হয়তো করেছি।

কিন্তু এইটুকু সম্বল নিয়ে লীলা রায়ের মতন মহান দেশসেবিকা, দেশের কাজে নিবেদিত প্রাণ, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ান যায় না।

এ-টুকু ইতঃস্তত করেছিলাম।

সুনীলবাবু শুনলেন না। প্রায় আমাকে কবলিত করে একটি সৌধের দু'তলায় নিয়ে গিয়ে তুললেন।

চৌকাঠের কাছাকাছি গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন: দিদি, হরিনারায়ণবাবু।

বড় একটা টেবিল। তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজপত্র। কলম, কাগজ কাটার ছুরি, লাল, নীল পেন্সিল ইত্যাদি।

বোঝা যায় সম্পাদকের টেবিল। এ-ধরণের আরও যে-সব টেবিল দেখেছি সেই রকমই। কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

বৈশিষ্ট যা কিছু পিছনে বসা মানুষটির মধ্যে।

চুলে অল্পবিস্তর রূপালী স্পর্শ। দুই সংবদ্ধ ওষ্ঠে সংকল্পের আভাস। উন্নত নাসা। ঋজু ভঙ্গী। এসবের মধ্যে প্রখর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন একটি মানুষ লুকিয়ে আছে, সেটা প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়।

বোঝা যায়, এ-মানুষটি অন্যায়ের সঙ্গে, অসত্যের সঙ্গে, অকল্যাণের সঙ্গে আপোষ করার জন্য পৃথিবীতে আসেন নি। তাঁর পথ বিপ্লবের পথ। সে পথ যতই কণ্টকাকীর্ণ হ'ক, বিপদ বহুল, তবু সে পথ থেকে তাঁকে কোন শক্তি বিচ্যুত করতে পারবে না।

ব্যতিক্রম শুধু মানুষের চোখ দুটি। আয়ত, অতলস্পর্শী, মমতাসিঞ্চিত। সহানুভূতিতে মেদুর।

তিনি দাঁড়িয়ে যখন বললেন, আসুন ভাই, তখন বুঝলাম, এই দুটি চোখই কথা বলল।

আমাকে তাঁর মুখোমুখি বসিয়েই সুনীলবাবু সরে গিয়েছিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের ওপর ছিলাম।

তাঁর কাজের ক্ষতি হচ্ছে, এমন একটা শঙ্কা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঠোঁটে অভয় হাসি ফুটিয়ে বললেন, কোন্‌টা সঞ্চয়, কোন্‌টা অপচয় এর হিসাব করা বড় কঠিন। এত দিনের জীবনে যেটাকে সঞ্চয় ভেবে এসেছি, সেটাই শেষে অপচয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার যেটাকে ক্ষতি ভেবে আমল দিই নি, পরে দেখেছি সেটাই মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থেকেছে।

কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছিলাম। এতো অগ্নিমন্ত্রের বাণী নয়, এ যেন কোন সাহিত্যিকার মর্ম নিঃসৃত বেদনার কথা। যে বেদনা কালজয়ী রসসাহিত্যে পরিণত।

সেদিনের আলাপের প্রথম পর্বে লীলা রায় লীলাদি হয়ে গিয়েছিলেন। দূরের কেউ নয়, আমার পরিবারের কোন আপনজন, যাঁর কাছে আনুষ্ঠানিকতার পর্দা সরিয়ে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, সহজ হওয়া সম্ভব।

সেদিন অনেক কথা হয়েছিল।

তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। সে বিস্ময়ের ঘোর আজও কাটেনি।

আরও কিছু বিপ্লবী মহিলার সঙ্গে যোগাযোগের

সৌভাগ্য উত্তরজীবনে হয়েছে। সাহিত্যের ব্যাপারেই এই যোগাযোগ। কিন্তু তাঁরা সাহিত্য নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি, নিজেদের রাজনৈতিক মত আর পথের কথাই বলেছেন। তাঁদের পথই শ্রেষ্ঠ এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

কিন্তু লীলাদি শুধু সাহিত্যের কথাই বলেছিলেন। সাহিত্যের রীতিনীতি, প্রকরণ আর আদর্শবাদ সম্বন্ধে। শুধু বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রই নয়, আরো আধুনিক কালের, কল্লোল যুগ আর উত্তর-কল্লোলের সাহিত্যিকদের রচনাশৈলী সম্বন্ধেও যুক্তগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন।

আমি একজন সাহিত্যিক, তিনি একটি মাসিক পত্রের সম্পাদিকা, এ ছাড়া যেন তাঁর অন্য কোন পরিচয় ছিল না।

বিদায় নিয়ে যখন উঠে এলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসেছিলেন।

হেসে বলেছিলেন, আবার একদিন এমনি করে চলে আসবেন।

আসব লীলাদি, বলতে গিয়েই থেমে গিয়েছিলাম।

অন্ধকার নামছে, অথচ আলো সম্পূর্ণভাবে নিভে যায় নি। আলো-আঁধারির রহস্যময়তার মধ্যে লীলাদির অবয়বের কাঠামো কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট। মমতার আধার দুটি চোখ দেখা গেল না। তার পরিবর্তে অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তচ্ছটা চশমার পুরু দুটি কাঁচের ওপর।

যে আগুন যুগে যুগে বিপ্লবীরা আহরণ করে সারা দেশের বুক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে আগুনের জন্ম সারা পৃথিবীর বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিত সত্তার দুর্মর বেদনার মধ্যে, সেই আগুনেরই যেন দুটি স্ফুলিঙ্গ।

সেই প্রথম দেখা। সেই শেষ।

আমার চাকরির সুতো সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো। সেই সুতোর প্রান্ত ধরে এ দেশের নানা সহরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। সাহিত্য-সৃষ্টিরও সাময়িক বিরতি।

জয়শ্রীতে শেষ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৯ সালের শারদীয় সংখ্যায়।

তারপর জয়শ্রীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধারণা হয়েছিল জয়শ্রীর প্রকাশ হয়তো সাময়িকভাবে স্থগিত আছে।

এতেও বিস্ময় বোধ করিনি কারণ উন্নতমানের সংস্কৃতি-সম্পন্ন আদর্শবাদী পত্রিকার অসুবিধা অনেক। এ যুগের সত্যাশ্রয়ী কৃষ্টিবান মানুষের মতন পদে পদে তার বিপদের সম্ভাবনা: বাঁচার বিড়ম্বনা প্রতিমুহূর্তে তার চলার গতিকে ব্যাহত করে।

ইতিমধ্যে দেশের মানচিত্র যেমন বদলেছে তেমনি বদলেছে নেতাদের চরিত্রও। বাংলার মসনদে বহু দরদী জননেতা বসেছেন। কণ্ঠে মানুষের দুর্দশা লাঘবের বাণী নিয়ে, কিন্তু দেশের দুঃখ আরও বেড়েছে। এই সব মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা তো দূরের কথা একমুষ্টি অন্ন জোটে নি।

উদ্বাস্তু সমস্যা সারা দেশকে নাজেহাল করে তুলেছিল। তখনি মনে পরে গিয়েছিল লীলাদির কথা।

এই সর্বনাশা দেশবিভাগ রোধ করার প্রাণপণ

চেষ্টায় তিনি ছুটে গিয়েছিলেন নেহেরুর কাছে, গান্ধীজীর কাছে। ফিরছিলেন বুক ভরা হতাশা নিয়ে। তখন বোধ হয় স্থির করেছিলেন,

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে।

তাই সারা দেশ যখন অলীক স্বাধীনতার উৎসবে প্রমত্ত, তখন লীলাদি নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে, সেই আলোয় পথ খুঁজে খুঁজে পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামান্তে অসহায় শঙ্কিত মানুষদের মাঝখানে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

লীলাদির জীবন বিপ্লবের বেদীমূলে সমর্পিত। উৎসর্গীকৃত প্রাণ। যখন যে কাজ দেশের মানুষের কাছে শুভঙ্কর বলে মনে করেছেন, তখন সব বাধা বিপত্তি দূরে ঠেলে, নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে, সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

তাঁর অশান্ত আত্মার বুঝি এইটাই জপমন্ত্র ছিল।

"মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেইদিন হব শান্ত ;
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে
বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে
রণিবে না,
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

লীলা রায়ের জীবনের ইতিহাস অসত্য আর ভীরুতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের ইতিহাস।

মাত্র সতের বছর বয়সে কিশোরী লীলার আত্মপ্রত্যয়ের বাণী :

আমার উদ্দেশ্য নয় এই পৃথিবীতে লোকের প্রিয় হওয়া কিন্তু এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া। খাঁটি হয়েও যদি প্রিয় হতে পারি তবে ত কথাই নাই।

তারপর কোথুন কলেজে পড়ার সময়ে অধ্যক্ষ শ্রীমতি রাইটের সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত। নারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বার বার তিনি জ্বলে উঠেছেন। প্রতিপক্ষ নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত সংগ্রামের অবসান ঘোষণা করেন নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সহশিক্ষা চালু করার ব্যাপারেও সেই এক কঠিন সংকল্প। সমস্ত বাধা, সব বিপত্তি দুর্মর প্রতিজ্ঞার কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। দীপালী সংঘের বৈপ্লবিক রূপান্তরের মূলেও জন্মবিপ্লবী লীলা রায়ের অদম্য প্রেরণা।

পরবর্তীকালে গণআন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লববাদের যে গ্রন্থিবন্ধন ঘটে ছিল, যার প্রধান হোতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র, সেই সমন্বয় সাধনের মঞ্চেও সুভাষচন্দ্রের পাশে ছিলেন লীলা রায়।

লীলা রায়ের অগ্নিঝরা বাণী : আমি আত্ম-নিবেদিত বিপ্লবী, পেছুটান আমি রাখি না। চিরকাল ভাস্কর হয়ে থাকবে।

বস্তুত ভারতের যে কোনো বিপ্লবী আন্দোলন লীলা রায়কে বাদ দিয়ে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

কঠিন ও কোমলতায় অদ্ভুত সংমিশ্রণ লীলা রায়ের চরিত্রে। তাঁর কথা চিন্তা করলেই চোখের সামনে তাঁর যে ভাবমূর্তি রূপায়িত হয়ে ওঠে, সেই

মহিয়সী নারীর এক হাতে মশাল, অন্য হাতে প্রদীপ।

বিপ্লবী কর্মধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশেছিল জননীর অপত্য স্নেহ, ভগিনীর সহমর্মিতা।

মশাল ঘরে আগুন লাগিয়ে মানুষের ভোগনিদ্রা ভাঙিয়ে তাকে বিপ্লবের পথে যাযাবর হবার মন্ত্র দেয়, আবার প্রদীপের শান্ত শিখা তাকে দেয় ঘর বাঁধার ইঙ্গিত।

দেশ স্বাধীন হল! এ এক মর্মান্তিক স্বাধীনতা। দুটি প্রদেশের বুকের রক্তে স্বাধীনতার অভিষেক হ'ল। রাজনীতি-দের খেয়াল-খুশীর আঁচড়ে বাংলা আর পাঞ্জাবের মুমূর্ষু দেহের ওপর চলল তাদের প্রেতনৃত্য।

এই সর্বনাশা সম্ভাবনার কথা লীলা রায় বুঝতে পেরেছিলেন।

সারা জীবন শুধু চ্যালেঞ্জ আর চ্যালেঞ্জ।

অন্তিম জীবনে মৃত্যুদূতকে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে বিমূঢ় করে সুদীর্ঘ উনিশ মাস ধরে অচেতন অবস্থায় রইলেন।

বিশ্বকবি লিখেছিলেন:

বিজয়িনী নাই তব ভয়,
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়॥

শুধু জয়শ্রীরই নয়, জন্মবিপ্লবী লীলা রায়েরও এই পরিচয়।

আচ্ছন্ন : কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

এবার তাকে বলবো, দেখো, বলবো
'এমন করে এড়িয়ে যেতে পারবে না কক্‌খনো'
বহুদিন তো দেখা-ই নেই, কবিতা নেই একটি
পাতা পড়ার শব্দ আসে, বাইরে দারুণ রোদ্দুর
বর্ষ পরে বর্ষ
আকাশ ছেয়ে পলাশ ঝরে দু' একটি দিন মাত্র
ঝর্ণা ফোটার শব্দ ওঠে রাত্রে

আসছে-বছর আসবে আবার যাত্রী
হয়তো আমায় জানান্ না দিয়ে
যাবার সময় গভীর করে বুঝবে, তখন বুঝবে
এড়িয়ে যাওয়া যায় না কোন দিনও
এমন করে, যায়না কোনও দিনও
কারণ, তোমার চোখের কোণায় অশ্রু

শহর ছেড়ে যেদিন তুমি পালিয়ে গেলে পাখি
বারান্দার অন্ধকারে ফেলেছো অনবধানে
লুডো-খেলার রঙিন গুটি একটি।

আফ্রিকার কবিতা

বন্ধুরা শোনো : ডেভিড ডিয়ন (সেনেগাল)

সংগ্রামী শতাব্দীর বন্ধুরা তোমরা শোনো
আফ্রিকা থেকে সুরু করে আমেরিকার নিগ্রোদের
আর্ত চীৎকার
তারা মাম্বাকে খুন করেছে
যেমন করে তারা খুন করেছে মার্টিনস্‌ভিলের
সাতজনকে
আর ওই মাদাগাস্কারের মানুষটাকে
কারাগারের ভেতর বিবর্ণ আলোয়
সে তার চোখের দৃষ্টিতে ধরে রেখেছিল
হৃদয়ের উষ্ণ বিশ্বাস
বেদনা সত্ত্বেও অটুট রেখেছিল মুখের স্মিতহাসিটুকু
সজাগ রেখেছিল একগুচ্ছ আশার উজ্জ্বল বর্ণালি।

সাচ্চা খবর যে তারা পাকাচুল মাম্বাকে খুন করেছে
যে দশবার আমাদের জন্য বয়ে আনত দুধ
আর আলো
স্বপ্নে আমি তার মুখ দেখতে পাই
অনুভব করি তার বুকের শান্তলয়ের কম্পন
আর আমি আবার হারিয়ে যাই
মায়ের বুক থেকে উপড়ে-ফেলা চারা গাছের মতন

কারণ আমার দুঃখের চেয়ে বড়
বুনো জন্তুরা যে-সকালে জেগে ওঠে তার চেয়ে
নির্মল
শত শত গরাদ-ভাঙা মানুষের চীৎকার শোনা যাচ্ছে
দীর্ঘকাল নির্বাসিত আমার রক্ত
যে-রক্তকে ওরা কথার বাঁধুনিতে আটকাতে চেয়েছিল
তা চিনতে পেরেছে কুয়াশার অস্পষ্টতা
যা আড়াল করতে চেয়েছিল তার হৃদয়ের প্রেরণা।

সংগ্রামী শতাব্দীর বন্ধুরা শোনো
আফ্রিকা থেকে সুরু করে আমেরিকার নিগ্রোদের
তীব্র চীৎকার
এ হল ভোরের সংকেত
মানুষের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভ্রাতৃত্বের
সংকেত।

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

নায়কের মুখ

চন্দ্রশেখর রায়

ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখলাম হাত উঁচিয়ে হিমাংশু ছুটে আসছে ঝড়ের মতো। রিক্সাওয়ালাকে থামতে বললাম। ও আমাকে দাদা বলে ডাকছে শুনে আশ্চর্য হলাম। রিক্সার সামনে এসে হিমাংশু বলল, কবে এসেছেন ?

বললাম, কাল রাত্তিরে।

—এখন, কোথায় ?

——চলে যাচ্ছি।

—আজই ?

— হ্যাঁ, ছুটি নেই।

—হিমাংশু সুবোধ বালকের মতো রিক্সার পথ ছেড়ে দাঁড়াল। বলল, তবে যান। আর বিরক্ত করব না।

—আমার রিক্সা চললো। হিমাংশু পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাল।

স্টেশনে এসে দেখলাম ট্রেন লেট। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানি না। শুনলাম চাকদার ওদিকে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সেই কারণেই এই বিভ্রাট। অগত্যা চায়ের দোকানের একখানা বেঞ্চিতে একটু জায়গা পেয়ে বসে পড়লাম।

হিমাংশুর কথাটা বারবার মনে পড়তে লাগল। ও আমার চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও এককালে ওকে আমার 'দাদা' বলে ডাকতে হয়েছিল। তখন হিমাংশু সরকার এ-তল্লাটের একজন হিরো। হিমাংশু সরকারের নামে দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার। সব রকম সভা-সমিতিতে হিমাংশু সরকার। আমার ঠাকুর্দার বয়সী লোকেরাও হাত জোড় করে হিমাংশুর সামনে দাঁড়ায়। বিধাতা-পুরুষের অসাধ্য কাজও তখন সাধিত হয় হিমাংশু সরকারের নির্দেশে। থানার ও-সির সঙ্গে হিমাংশুর মাই ডিয়ার সম্বন্ধ। আমি ত কোন ছাড়। এ হেন হিমাংশুকে তখন সবাই 'দাদা' বলে ডাকে। আমিও ডেকেছিলাম।

কিন্তু সেই হিমাংশু আজ আমাকে 'দাদা' বলল কেমন করে। ভুল শুনিনি নিশ্চয়। কারণ আমার রিক্সার সামনে ও এসে দাঁড়িয়েছিল অনুগত ভাইয়ের মতো।

আমাকে কি প্রয়োজন থাকতে পারে ওর ? বলতে গেলে ওরা আমাকে ঘেন্নার চোখেই দেখে। সমাজের অকেজো মানুষ বলে মনে করে। রাজনীতিতে আবহাওয়া থেকে যারা দূরে দূরে থাকে, রাজনীতির দাদারা তাদের ভাল চোখে দেখে না। হিমাংশুর মতো রাজনীতিতে পোক্ত ছেলে আমার রিক্সা থামিয়ে 'দাদা' বলে কথা বলবে

এটা ভাবাই যায় না। নাকি এটাও রাজনীতির কোন খেলা?

চায়ের দোকানী গরম চায়ের ভাঁড় আমার হাতে তুলে দিল। চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়েছি এমন সময় দোকানের সামনে হিমাংশুকে নামতে দেখলাম রিক্সা থেকে। অমায়িক হাসি ছড়িয়ে বললাম কী ব্যাপার? আবার এলেন যে?

আমার বোঝাতে দ্বিতীয় জবার বসার জায়গা ছিল না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হিমাংশুকে বসতে বলতেই ও একেবারে চেঁচিয়ে উঠল। বলল, না, না, আপনি বসুন, আপনি বসুন। আমি এই বেশ আছি।

হিমাংশুর কথামতো আমি আর বেঞ্চিতে বসতে পারলাম না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হিমাংশুর সামনে এখনো নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়

আর একটা চায়ের অর্ডার দিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে হিমাংশু বলল, আপনার ট্রেন লেট আছে জেনেই চলে এলাম।

—বেশ করেছেন। আমি 'আপনি' সম্বোধন না করে পারলাম না? আপনার কী খবর বলুন।

—আমাদের মতো মানুষের খবর থাকে না। ভেলকী বাজির মতো আমরা অপরের শক্তিতে চলাফেরা করি। নিজের বলতে আমাদের কিছু নেই।

হিমাংশু চায়ের ভাঁড়ে একটা লম্বা চুমুক দিল। বলল, আমার একটা উপকার করবেন, অরুণদা?

ওর মুখের দিকে তাকালাম। হিমাংশু সরকার আমার কাছে উপকার চাইছে এটাই যেন ভেলকী-বাজির মতো লাগল আমার। একদিন আমিই এই ভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর কাছে। সেইবার ভাইয়ের আর পরীক্ষা দেওয়া হয় না। হিমাংশুর চেলা-চামুণ্ডারা ওকে শাসায়; ভাল ছেলের মতো পরীক্ষা দেওয়া চলবে না। গণ-টোকাটুকী মেনে নিতে হবে। আমার ভাইটি ওদের প্রস্তাবে রাজী হয়নি ফলে খুন করার ভয় দেখাল ওরা। শুনে আমার হাত পা ঠাণ্ডা। চারিদিকে তখন সন্ত্রাসের রাজত্ব। প্রতিবাদ করার বুকের পাটা নেই। অবিচারের পদতলে মাথা নিচু করে বেঁচে থাকার চেষ্টা মানুষের। আমাদেরও তখন, এই হিমাংশু সরকারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। ওদের পার্টি অফিসে তখন বেশ ভীড়। ভক্তদের পুজো কুড়োচ্ছে হিমাংশু সরকার। যখন ওকে একা পেলাম তখন তার কথা বলার মতো সময় নেই। বলেছিল পরে এস। এখন আমি ব্যস্ত আছি।

দিনাতনেক এভাবে ফিরিয়ে একদিন হিমাংশু যেন প্রসন্ন হ'ল কিছুটা,—বলেছিল, তোমার ব্যাপারটা কী শুনি। রোজ রোজ আমার কাছে আসচ কেন?

—হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। আমাদের অঞ্চলের এম এল এ পর্যন্ত যে হিমাংশুর পরামর্শ ছাড়া এক পা চলতে পারে না, সে আমার কথা শুনতে চাইছে। আমি সমস্ত ব্যাপারটা বললাম। হিমাংশুর মন আর ভেজে না। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর একটা সোজা পথ আমাকে বাতলে দিয়েছিল। বলেছিল, আমার তিনটে ক্যানডিডেট আছে। তারাও পরীক্ষা দেবে। তোমার ভাই যদি তাদের পাশ করার গ্যারান্টি নিতে পারে তাহলে তাকে আমরা মাপ করব।

—তা কি করে হয়?

—কেন হবে না? ওরা ক্লাস থ্রি-ফোর পর্যন্ত পড়েছে। বাংলাটা কোনরকমে লিখতে পারবে। অঙ্ক, ইংরেজির খাতা ভাইকে লিখে দিতে হবে।

আশ্চর্য হলাম। ক্লাস থ্রির বিদ্যে নিয়ে ওরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে বসেছে; বললাম, ওরা টেষ্টে এলাউ হ'ল কী করে?

খাম্বাজ গলায় ধমক দিয়েছিল হিমাংশু। বলেছিল সে সব ব্যাপার তোমার জেনে দরকার কী? যা বললাম সেই মতো কাজ করতে পারলে তোমার ভাই জানে বাঁচবে।

সেই হিমাংশু আজ আমার কাছে উপকার চাইছে। এটা বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু বিশ্বাস করতে হল। বললাম, রাজনীতি করে কিসসু পেলাম না। এখন দু মুঠো খেয়ে বেঁচে-বর্তে থাকাই হয়েছে মুস্কিল।

—আমাকে কী করতে বলেন আপনি?

—আমি একটা ব্যবসা করব মনে করছি। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন.....

—কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

—তা জানি না। তবে সাহায্য ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না। আপনার কাছেই শুধু এই সাহায্যের কথা বলতে পারি।

হিমাংশু ঠিক কি বলতে চাইছে বুঝলাম না। বললাম, এককালে আপনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন, সে কথা ভুলিনি। আমার ভাইয়ের জান নিয়ে যখন টানাটানি চলছে, তখন আপনিই ওকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

আমার এই কৃতজ্ঞতাকে আমল দিল না হিমাংশু। বরং সে যেন এ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল। বললাম, হঠাৎ রাজনীতি ছাড়লেন কেন? আপনার নায়কত্ব করার যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল।

চা-পর্ব অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাটির ভাঁড়টা এতক্ষণ হাতেই ধরে রেখেছিল হিমাংশু। এবার সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, জানেন, অরুণদা, এই রাজনীতি করেই জীবনটা নষ্ট করলাম। আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে কতজন ওপরে উঠে গেল। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। আমারই শুধু আজ ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।

ওর শেষ কথাটা যেন তীরের মতো আমার বুকে এসে বিঁধল। যেন সাবেকী আমলের একটা ভাঙা বাড়ির সামনে আমাকে দাঁড় করাল হিমাংশু। রাজনীতি করা মানুষদের ওর বিশ্বাস আমার কম। তবু এই মুহূর্তে আমি হিমাংশুকে বিশ্বাস না করে পারলাম না। ও আবার বলল, এমন লেখাপড়া জানে যে, চাকরীর চেষ্টা বা ব্যবসা করার মতোও টাকা পয়সা নেই। তবু একটা ত কিছু করতে হবে।

কথাটা যেন ও নিজেকেই শোনাল। আর আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছোটবেলাকার একটা ঘটনা। পুজোর বারোয়ারী মণ্ডপে যাত্রা হত তিন রাত্রি। মহেশ বসাক রান্না সাজতো। তিনটে রাত যাত্রার আসর মাত করে রাখতো সে। 'শ্রীবৎস চিন্তা'য় শনি, 'সীতা হরণ' পালায় রাবণ, 'ভক্ত প্রহ্লাদ' হিরণ্যকশিপুর অভিনয় ভুলবার নয়। কিন্তু সেই মহেশ বসাককে চতুর্থ দিন যখন বাজারে আলু বিক্রি করতে দেখতাম, তখন তার এই অকৃত্রিম পরিচয়টিকে মেনে নিতে পারতাম না। আমার

চোখে সেই হিরণাক্ষীপুর দস্তটাই জেগে থাকত। হিমাংশুর সঙ্গে সেই মহেশ বসাকের যেন অদ্ভুত একটা মিল খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বললাম, আপনার দলের কাউকে কি আপনার অবস্থার কথাটা জানিয়েছেন?

—না।

—জানালে ভাল করতেন। তারা আপনার জন্যে নিশ্চয় কিছু করত।

অদ্ভুত হাসি হাসল হিমাংশু। বলল, আপনি ওদের চেনেন না।

তা হবে। আমি মানুষকে বড় স্থূলভাবে বিচার করি।

ও বলল, অমিয় দাসকে চেনেন?

—কোন অমিয় দাস? তিন নম্বরের প্রাইমারী স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক?

—হ্যাঁ। সেই অমিয় দাস আগে কী করত জানেন? কতদূর তার বিদ্যে ছিল?

—আগে ত শুনেছি কী একটা কাজ করতেন।

—চোলায় মদের এজেন্ট ছিলেন উনি। ক্লাস ফোরের বিদ্যে নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে ভরসা পেয়েছিল আমার জন্যে। বাইরে থেকে ওর সব খাতা লিখে সাপ্লাই করেছে এই হিমাংশু সরকার। রতন মুখুজ্জে এখন ব্যাঙ্কে ভাল চাকরী করে। সে ব্যবস্থাও হয়েছে আমার দ্বারা। কিন্তু ওরা আমাকে ভুলে গেছে। আমাদের দলের প্রভাব যদি থাকত, আমারও প্রভাব থাকত।

ষ্টেশনে অসহিষ্ণু যাত্রীদের কলগুঞ্জন বাড়ছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বুঝি ট্রেন আসবে। আমার কোলকাতা পৌঁছুতে প্রায় বারোটা বেজে যাবে। আমার মতো অনেক অফিস যাত্রীই আজ বিপন্ন।

হিমাংশু বলল, একটা কাজ করবেন অরুণদা? আমার জীবন নিয়ে আপনি কিছু লিখুন না। আমাদের মতো যুবকদের নিয়ে নেতারা যে কত পাপ কাজ করিয়ে নেয় তা একবার দেশের লোক জানুক। দেশের নামে এরা কত বড় সর্বনাশ করছে তা আমার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আজ আমার কথা কেউ শুনবে না।

ঘড়ি দেখলাম। সওয়া দশটা বেজে গেছে। বললাম, আপনার ব্যবসার ব্যাপারটা খোলাখুলি কিছু আলোচনা হ'ল না। ট্রেন এসে পড়বে শুনছি। আপনি বরং—

হিমাংশু উঠে দাঁড়াল। বলল আপনি আবার কবে আসছেন?

—সামনে শনিবার।

—সেদিনই আলোচনা করব।

ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম। হিমাংশু ফের আমার কাছে ছুটে এল। ফিস্ ফিস্ করে বলল, আমার কথাটা মনে রাখবেন, অরুণদা।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। হিমাংশু ফিরে গেল। আমি ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। ট্রেন আসছে। একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা যাচ্ছে খুব মৃদু। তখনি মনে হল, হিমাংশু ওর কোন কথাটা মনে রাখতে বলল? ব্যবসার কথা, না জীবনের কথা?

ইচ্ছা-কলম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর

ইংরেজি ১৭৭৮ সালের বর্ষার দিনে কোম্পানি-সরকারের বিদ্বান রাইটার নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-প্রণীত এদেশাগত কর্মার্থী ফিরিঙ্গিদের উপকারার্থ বোধপ্রকাশ শব্দশাস্ত্র 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ' হুগলির আনন্দগঞ্জ সাহেবের ছাপাখানায় ছাপতে শুরু হয়। ইংরেজিতে লেখা বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ, কিন্তু ভাষানিয়মের সমুদয় দৃষ্টান্ত এবং সে দৃষ্টান্তের পরিমাণ বড় কম নয়—ছাপা হয় বাঙলা হরফে। ছেনি কেটে ছাঁচে ঢেলে এই ধাতব হরফ বানিয়ে দিয়েছিলেন পরের দিনের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ চার্লস উইলকিন্স। সে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল। হ্যালহেড উইলকিন্স দুজনেই তখন হুগলি কুঠিতে কর্মরত।

বাঙালি শিক্ষার্থীদের জন্য বাঙলায় লেখা ইংরেজি ব্যাকরণ—গৌড়ীয় যুগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যা লিখেছিলেন তারই মতো দরকারি অ-স্মরণীয় এই বই—হতে পারত, কিন্তু বিদেশি রাজভাষায় শাস্ত্র-নিরিখে গরিব দেশের একটা ভাষার যাচাই-বাছাই, তখন রাষ্ট্রভাষাও নয় যে ভাষা, তার দাম সর্বতোভাবেই স্বতন্ত্র, অনেক বেশি। গুরু-তর স্মরণীয়তারও কারণ আছে। এই বই থেকেই প্রথম দেখতে পাওয়া গেল তত্তাবৎকাল প্রচলিত পুরোনো বাঙলা পুঁথির, অর্থাৎ পুরোনো বাঙলা কাব্যের মুদ্রিত আদি পাঠ। শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের ছাপাখানায়, তারপর বাঙ্গাল গেজেটি প্রেসে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের যে মুদ্রাঙ্কিত ইতিহাস শাখাপল্লবে বিস্তৃত হতে শুরু করল, তার প্রথম শুরু এই ইংরেজি বইখানি। এ কথা একটু বেশি কথা। আসলে ছাপার হরফে যে কোনোরকম বাঙলা ছাপার শুরু এই বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজের গ্রামার বইয়ে। সে হিসেবে আজ ১৯৭৮ সালে বাঙলা মুদ্রণের দুশো বছর পূর্ণ হল।

জিজ্ঞাসা-প্রকাশন সংস্থার বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে শ্রীঅতুল সুরের এই নামের একখানি বই সম্প্রতি বেরিয়েছে: 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর'। শ্রীঅতুল সুর নানা বিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপণ্ডিত, মুদ্রণ ব্যাপারে তাঁর অধিকন্তু একটু অধিকার আছে। ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ এই পঞ্চাশ বছর চালু ছিল তাঁদের নিজেদের এক ছাপাখানা, নিজেও সারাজীবন প্রেস ও পত্রিকার নির্বন্ধ করেছেন। কাজেই বাঙলা মুদ্রণের অনেক খুঁটিনাটি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর বলার আছে, বই পড়ে যা পাবার নয়। আশি পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঠেসে ভরে দিয়েছেন তিনি তথ্য,

আর তথ্য, বলবার সহজ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিটুকু হারায় নি তাতে।

বাঙলা হরফের নানা রকমফের ও ক্রমোন্নতি, হরফআদলের চেনা অনতি চেনা নির্মাতারা, বিদেশি মুদ্রাঙ্কনযন্ত্রের আমদানি-ব্যবহার থেকে স্বদেশি উৎপাদন, ছবি ছাপার কলাকৌশল, ছাপার কাগজ ছাপার কালির কথা, বাঁধাই-গ্রন্থনা-প্রকাশন ব্যবস্থা এবং এই সব বৃত্তির সংযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, বইয়ের মলাটচিত্র ভেতরচিত্রের শৈলি-বিবর্তন, সর্বোপরি এই সব ছাপা বইয়ের রক্ষণ-সংগ্রহের হদিশ—বহু দিক দিয়ে পুরিয়ে তুলতে চেয়েছেন লেখক দুশো বছরের বাঙলা মুদ্রণের আদ্যোপান্ত ইতিহাস। তাঁর বই থেকে জানা গেল গত শতাব্দীতে স্থাপিত ছাপাখানার কয়েকটি বিদ্যমান রয়ে গেছে অদ্যাবধি, এই কলকাতাতেই এমন প্রেস রয়েছে আমাদের হাতের কাছে যেখানে মেশিনের একদিক দিয়ে কাগজ ঢোকালে আর এক মুখ থেকে ছাপাই বাঁধাই হয়ে মলাটশুদ্ধ বেরিয়ে আসে বই, প্রথম অফসেটে ছাপা হয় ইণ্ডিয়ান প্রেসের একখানা পুস্তক, পূর্বপ্রকাশিত না-ফুরোনো বই নতুন প্রকাশক আবার ছেপে বেচতে গিয়ে আইনের হুমকিতে পড়েছিলেন উনিশ শতকের বিশ দশক না ফুরোতেই, আমেরিকায় এক বাঙালি হিন্দু বিবাহে অনায়াসেই ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি থেকে পাওয়া গেল রীতিমতো 'পুরোহিত দর্পণ', পূর্বতন এক গেঞ্জিমোজার কারবারী এখনকার কলেজ স্ট্রীট পাড়ার একজন প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক ব্যবসায়ী—এমনি নানা বিবরণ, একাধারে প্রয়োজনীয়-আকর্ষণীয়। দুশো বছরের আগের দিকে যত সবিস্তার, মাঝপথ থেকে তেমনই সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক কেন বইয়ের বিবরণ—এই অভিযোগ তবু জমতে পারে পাঠকের মনে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে যিনি এমন সর্বতোমনস্ক, সময়বিকাশের পদক্ষেপ ধরে বা আরেকটু কেন এগোলেন না। দুটিরই হেতু বুঝতে পারা যায় বইয়ের ছোট পরিসর। অতএব এই বিষয়ের বৃহৎবিশদ আরেকখানি বইয়ের প্রত্যাশা তিনি আমাদের জাগিয়ে দিয়েছেন, জানাতে চাই।

শেষের পরিশিষ্ট দুটির দ্বিতীয়টি অবশ্য বাহুল্য বলে মনে হয়, প্রথমটি অ-পর্যাপ্ত।

'গাঙ্গেয় পত্র'

নতুন কাগজপত্র হাতে আসে মাঝে মধ্যে, কবিদের গল্পলেখকদের ছোটকাগজ, যাকে বলি লিট্‌ল ম্যাগাজিন। 'গাঙ্গেয়পত্র' পেলাম—কবিদের গল্পলেখকদের নয়, বিদ্রোহের পথবদলের সরগরম নেই, দেখি স্থির স্থিত সু-লেখা, সুন্দর ছবি ছাপা পাতার ফাঁকে। সম্পাদক-প্রকাশক অঞ্জন সেন, কবিতা লেখেন, 'কথাবার্তা' নামে তাঁর একখানি কবিতার বই বেরিয়েছে 'কছুদিন, কবিতায় উপরি ছবি—স্থাপত্যভাস্কর্যের তিনি সমঝদার, দেখছি সব শিল্পের অ্যাকাডেমিক রীতিয়েওয়াজের উপর তাঁর প্রবণতা। কাগজে সেই ছাপ—নীরদ মজুমদার শ্যামল দত্তরায় গণেশ পাইন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি—শিল্পীদের আঁকার নেপথ্য পরিচয় তত্ত্বধারণার পরিচয় তিনি সঙ্কলন করেছেন—তাঁদের প্রশ্ন করে কিংবা তাঁদের বিষয়ে আলোচনা

প্রবন্ধ লিখিয়ে, গণেশ পাইনের ছবি আর মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ে লিখেছেন নিজে। শুধু চিত্রী নয়, কবি-ঔপন্যাসিকদেরও জবানবন্দি ছাপা হয়েছে কাগজে—দেবেশ রায়ের উপন্যাস চিন্তা, অমিয় চক্রবর্তী অরুণ মিত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষের কবিতাবিষয়ক ধারণা-অভিজ্ঞতার বিবরণ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়েও আলোচনা দেখছি এবং সেই আলোচনা সম্বন্ধে পাঠকের মন্তব্য: 'সমস্ত রচনাটি পড়লে মনে হয়, উপন্যাস কী রকম ভাবে লিখতে হয় তা ঔপন্যাসিক জানেন না, জানেন সমালোচক····।'

কবিতা-ছোটগল্পের কাগজ নয়, গাঙ্গেয়পত্র মূলত তত্ত্ব-আলোচনার পত্রিকা এবং সে ক্ষেত্রেও একটু স্ব-তন্ত্রী। লেখার ভাষা-রীতি নিয়ে ভাষা-তত্ত্ব বা রীতিতত্ত্বগত বিশ্লেষণের একটা ধারা এখানে মুখ্যস্থানে—প্রবাল দাশগুপ্ত উদয়নারায়ণ সিংহ আশিস কুমার দে—এঁরা পর্যালোচনা করেছেন অন্নদামঙ্গল থেকে এখনকার লেখা অবধি লেখা, এঁদের বিশেষ নিরিখদণ্ডে। সুহাস চট্টোপাধ্যায় পরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ভাষা-তত্ত্ব। একটি সংখ্যায় কবিতা-অনুবাদের ক্রোড়পত্র ছাপা হয়েছে কয়েক পাতার, সেই সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের লেখা 'অনুবাদের দায়'—'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তে'র অন্যতম সম্পাদক কৃতকর্মের সমালোচনা করেছেন এখানে। বিদ্যাসাগর সংখ্যা হয়েছে একটি সংখ্যা—জমিয়ে রাখার মতো।

দু-সংখ্যা হাতে পেলাম এ অবধি 'গাঙ্গেয় পত্রের,' সপ্তম সংখ্যা পড়বার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

সদ্যোজাত আর একখানি

খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ, অরুণ মিত্র পবিত্র সরকার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরঞ্জিৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বেরোলো 'প্রমা', এই অক্টোবর ১৯৭৮ এ। 'প্রমা'র প্রথম লেখা বিজন ভট্টাচার্যের আত্মজীবনী, একাধিক সাক্ষাৎকার থেকে আহৃত—চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় প র্ব পর্বে ভাগ করা বিবরণ, আংশিকতায় ছাপ লাগা কিন্তু সঞ্চয়যোগ্য লেখা।

গুরু ভাবনার কাগজ 'প্রমা', এই গোড়ার সংখ্যাতেই তার আভাস পড়েছে। পবিত্র সরকার লিখেছেন ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা কিভাবে কখনো ঐক্য কখনো অনৈক্যের প্রতিরূপ হতে থাকে এবং কিভাবে একটি ভাষা একটি ক্রমপ্রকাশ্য জাতি সত্তার সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক লাভ করতে থাকে তার কৌতূহলপ্রদ পর্যালোচনা। প্রবোধচন্দ্র সেনের সাম্প্রতিক ছন্দ-গ্রন্থখানির সূত্রে দীপঙ্কর দাশগুপ্ত লিখেছেন ছন্দ-পাঠের সমস্যা, প্রসঙ্গ। এ ছাড়া আছে এদেশের জনসংযোগ মাধ্যমগুলির নিষেধ ও মুক্তির নানা তথ্য, ব্রেশটের কবিতা নিয়ে আধুনিক ফরাসী উপন্যাস নিয়ে জ্ঞানগর্ভ লেখা। মহাশ্বেতা দেবীর দাগ কাটা একটি গল্প আর প্রায় দুশো পাতার পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ।

জানা গেল ত্রৈমাসিক পত্রিকা হবে এই কাগজ। সুপ্রমায়ু হোক 'প্রমা'।

পুজো

পুজো পেরিয়ে গেলাম ১৩৮৫ সালের। সারা দেশ প্রলয়পয়োধিজলে ভাসছে, খবরকাগজ ভর্তি নিশ্চিহ্ন দেশের সাতচুড়ো মাথার ওপরকার জল আর বোবা মরণ চিৎকার আর ব্যাকুল জননেতাদের 'এই যে আছি আমরা' মুহুর্মুহু মন্ত্র। ত্রাণ আসছে নিমিষে নিমিষে এদেশবিদেশের, রিলিফ পাহাড় হয়ে উঠল খবরকাগজের পাতায়, শহরের এমুড়ো ওমুড়ো জিপগাড়ি ছুটছে হুশহুশিয়ে—আর এরই ভেতর অনুপক্রুত লোকজন ঠায় দাঁড়িয়ে আলুর তেলের মিনিবাসের মাইল লাইনের লেজে। কতই বা, একটু চড়া দু এক কাহন গুনে দিয়ে ঘরে নিয়ে যান, এখুনি নিয়ে যান ফুরিয়ে যাবার আগেই, নিত্যি সামগ্রী—চলবে না নিলে? কথা নয়, দাম বাঁধা, এর ওপরেও যদি চড়ত!

মাথা অবধি শোধন করে নিলে স্বস্তি হয়, কিন্তু এত জলের মধ্যে জল কই? ভাপসা অন্ধকার ঘর। জ্বালানি জুটিয়ে দিয়ে গেছে যারা ক'টা টাকা বেশি দিতে হয়েছে মূল্য ধরে, যাক্‌গে, অসময়ের উপকারী। হ্যালোজেন ট্যাবলেট নেই ওষুধের দোকানে, থাক গে, জল ফুটিয়ে নাও। রাস্তার জোয়ারের মুখে খেপলা জাল ফেলে মাছ ধরতে নেমেছে এ ও সে, ছায়াটা সরলো তাহলে এ যাত্রা, মাছের দামটাও মনে হয় পড়বে। কিন্তু যারা সেই প্লাবনের দেশে বাঁধের ওপর, ছাদের ওপর, গাছের মাথায় শূন্যর দিকে চেয়ে কাঁপছে? খবরকাগজ পৌঁছোচ্ছে না বলে জানতেও পারছে না সারা দেশ জুড়ে ত্রাণযাত্রার সাজ-সাজ রব?

কর্মস্থলিতে রিলিফের চাঁদা, পার্টি-ব্যাজ লাগানো কমিদের কৌটার কাটা মুখে—এ ভাবে তো রিলিফ উঠছে না এবারে! ও কথা রাখুন। দেশ ভাসছে, আমাদেরও তো করবার আছে কিছু? পাড়ার পুজো কমিটিতে আলাদা রিলিফ-চাঁদা—কেন, পুজোর চাঁদা থেকেই তো দেয়া যায় খানিকটা কেটে। বলতে চান, ক্লাবের, পুরুত ম্যারাপ-দাম এরা উপুস করবে সম্বচ্ছর। পাড়ার স্কুলবাড়ি ভরে উঠল বস্ত্রার্তদের ভিড়ে। পাড়ার মধ্যে না-খেয়ে শুকোবে, আপনারা থাকতে? কেন খবর যায় নি? যথাস্থানেই গেছে। কিন্তু যতক্ষণ না এসে পৌঁছোয়, ততদিন? এ তো মনুষ্যত্ব।

পুজোর সকাল থেকে ঝকমক করে উঠল আলো। —কল্লোলিনী মুখ মুছে কলকাতা আবার সেজে নিয়েছে তিলোত্তমা। জহুরত মোড়া আকাশ-উঁচু মণ্ডপের রত্নগুহার মধ্যে চালাচিত্রে বন্ধ দেবী। কে দেখতে এল এমন ছবির মতন প্রতিমা? লোক কম। শহরে প্রতিমার সংখ্যা এবারে বেশি, কিন্তু লোক কম। দেখতে এলেই আবার মনটা নরম হয়ে যায় যদি রিলিফ-চাঁদার আবেদনে। কে জানে। আড়ম্বরহীন পুজো, 'আড়ম্বর নয় দেশের এই মুহূর্ত' 'মুক্তহস্তে দান করুন বন্যার্ত উদ্ধারে' —চারপাশে শালুতে হীরের অক্ষরে লটকানো আবেদন। লোক সামলানোর অমন বৃহৎ সুব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে হাই তুলছে কর্তব্যরত শান্ত্রী। সবাই ভাবতে বসেছে নাকি রাস্তাতেও খবরকাগজ ছাপা ছায়া? যাক, এও একটু আরেকরকম।

তবু নবমী রাতে বের হয়ে দেখি উত্তাল রাত, রাস্তায় ফেট পড়েছে বিজুরিরেখা আলোর নক্‌শা, জমজম করছে ছেলেবুড়ো মেয়েমরদ খাবারখেলা দোকানচাপা। তারই মধ্যে ভোর হল।

পুজো পেরিয়ে গেলাম। নতুন রেকর্ড জামা-কাপড় বায়স্কোপ যাত্রার গালগল্পের সুখ-আঁচ চারধারে। তরুণ লিখিয়ে গুনতে বসেছেন ক'টা কাগজ বেরোলো, কটা লেখা বেরোলো। বেরোলো এর মধ্যে? বেরোবে না? সংস্কৃতি হল প্রাণ, বাঙালির।

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ৭৮-তম জন্ম বার্ষিকী

২রা অক্টোবর বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের জন্মদিন। তাঁর ৭৮-তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য এবারকার ২রা অক্টোবরের আয়োজন কলকাতায় প্রবল বর্ষণ এবং গোটা বাংলাদেশের বিধ্বংসী বন্যার জন্য ১লা অক্টোবর সংবাদপত্র ও রেডিওর সাহায্যে স্থগিত রাখার সংবাদ প্রচারিত হয়েছিলো। অতঃপর রবিবার ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৮ সকাল ৯টায় দক্ষিণ ক'লকাতার শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের হরেন্দ্রকুমার মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও 'জয়শ্রী'র পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদক অনুষ্ঠানটির আহ্বায়ক ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ক'লকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। সভার প্রারম্ভিক ভাষণে জয়শ্রীর সম্পাদক সুনীল দাস বলেন: দিদি ছিলেন প্রকৃষ্টতম Non-Conformist, যাঁরা জীবনে গতানুগতিক পথে চলেন না। তাই চির-বিপ্লবীর ভূমিকায় তাঁরা নিজেদের স্থান নির্দিষ্ট ক'রে সকল প্রকার বন্ধন-মুক্তির সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজেদের নিযুক্ত করেন। চির-বিপ্লবী লীলা রায় ছিলেন বন্ধনমুক্তির অভিযাত্রীদের সর্বোত্তম প্রতীক স্বরূপ।

সুসাহিত্যিক শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চারণ করে বিপ্লবী দেশনেত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। 'নিষ্কম্প অগ্নিশিখা' এই শিরোনাম দিয়ে জয়শ্রীর শারদীয় সংখ্যায় গল্প-লেখার সূত্রে দেশনেত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের স্মৃতি মধুপম ভাষায় বিবৃত করেন।

বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়ও তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে দেশনেত্রীর চারিত্রিকশক্তির অপরূপ মহিমার কথা উল্লেখ করেন।

দেশনেত্রী লীলা রায়ের অন্যতম সহকর্মী প্রবীণ বিপ্লবী নেতা ভবেশচন্দ্র নন্দীও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

শ্রীমতী গীতা বসু মল্লিক, দেশনেত্রী সম্পর্কে কবি নরেন্দ্র দেব লিখিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

সভায় বিপ্লবী দেশনেত্রীর বহু সহকর্মী, গুণগ্রাহী পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমতী মীনাক্ষী দাশগুপ্তা।

জননেতা নিশীথনাথ কুণ্ডুর ৮৬-তম জন্মদিবস

গত ১৩ই অক্টোবর জননেতা নিশীথনাথ কুণ্ডুর ৮৬-তম জন্মোৎসব দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত "নিশীথ-নগরে" উদ্‌যাপিত হয়েছে। ৪ বছর পূর্বে শিলিগুড়ির নিকটে নিশীথনাথের নামাঙ্কিত গ্রামটির প্রতিষ্ঠা হয়। এই গ্রামে চা-বাগানের পাহাড়ী শ্রমিকদের বাস। বহু বাধা অতিক্রম করে চা-শ্রমিকদের এইখানে

বসবাসের অধিকার অর্জন করতে হয়। বাধা এসেছিলো, চা-বাগানের মালিকদের পক্ষ থেকে। জননেতা নিশীথনাথ সেদিন সর্বশক্তি দিয়ে শ্রমিকদের সংগ্রামী প্রতিরোধ-শক্তিকে সাহায্য করেছিলেন সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই শিলিগুড়ির কাছে চ্যাংরাবান্ধা গ্রামের শ্রমিক অধিবাসীরা গ্রামের নামকরণ করেন 'নিশীথনগর'। নিশীথনাথের চেষ্টায় এই গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু পানীয় জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। একটি জুনিয়র হাইস্কুলেরও অভাব রয়েছে। নিশীথনাথের আজন্ম সহকর্মী ডাঃ বিভূতি দে গ্রামের উন্নতির জন্য সব কিছু দেখা-শোনা করেন এবং তাঁর সহকারী রয়েছেন গ্রামেরই অধিবাসী সংগ্রামী নন্দলাল শর্মা। এবার অনুষ্ঠানে নিশীথনাথের অপর এক সহকর্মী শ্রীসত্যরঞ্জন দাস রায়গঞ্জ থেকে 'নিশীথনগরে'র অধিবাসীদের আমন্ত্রণে সেখানকার অনুষ্ঠানে অগ্রণীর অংশ গ্রহণ করেন।

রায়গঞ্জে নিশীথবাবুর বসতবাটিতেও তাঁর ৮৬তম জন্মদিন তাঁর অনুরাগীদের উদ্যোগে পালিত হয়।

বিপ্লবী নেপাল নাগের লোকান্তর

গত ৪ঠা অক্টোবর বিপ্লবী নেপাল নাগ প্রায় সত্তর বছরের সীমান্তে পৌঁছে লোকান্তরিত হন। নেপাল নাগের বিপ্লবী জীবন সুরু হয়েছিলো বিশদশকের ঢাকায়, সেদিনকার বাংলার দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর সদস্যরূপে। এই বিপ্লবী দলের সংগঠন-নেতা ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিপ্লবী অনিল রায়। তাঁর গ্রেপ্তারের পর নেতৃত্ব ভার তুলে নেন দেশনেত্রী লীলা রায়। নেপাল নাগের নেতৃত্ব-শক্তির স্ফুরণ সেদিনই এই দীর্ঘদেহী তরুণের সংগঠন-প্রতিভায় দেখা গেছে। কারণ ঢাকা শহরে 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর গেণ্ডারিয়া-শাখার একটি বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত ছিল, তার মূলে ছিল বিপ্লবী নেপাল নাগের তারুণ্য শক্তির মন্থন, সে-এলাকার যুবকদের মধ্যে। নেপাল নাগের মাতৃদেবীর মমত্ব ও ব্যক্তিত্ব যুবকদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। ত্রিশদশকে দেউলী বন্দীশালায় নেপাল নাগ মার্ক্সবাদের পাঠ নিয়ে মুক্ত হবার পর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দান করেন। তদবধি নিয়লসভাবে এবং শারীরিক ব্যাধির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেও যে আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে সে-পথই অনুসরণ করে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের ও পথের অনেক অমিল হয়ে গেলেও তাঁর সর্বক্ষণ সংগ্রাম তাকে যে আদর্শবাদে উত্তীর্ণ করেছিলো, চিরকালের বিপ্লবীদের সেখানে একটা মিলনভূমি রয়েছে। বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন পথের বৈপরীত্য সত্ত্বেও এই মিলনভূমির আবেদন পৌঁছে যায় তাঁদের কাছে, যারা বিপ্লবীর শাশ্বত সত্তায় বিশ্বাস করেন। আমাদের সেই পুরানো দিনের বন্ধনের মধ্য দিয়ে সেই শাশ্বত আবেদনের স্পর্শ দিয়ে গেছে বিপ্লবী নেপাল নাগের লোকান্তর। তাই গত ৫ই নভেম্বর বহু বিভিন্ন পথের বিপ্লবী ও সংগ্রামীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে নেপাল নাগের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছি।

সার সেরা

বাসুদেব দেব

ঘড়ির কাঁটায় লেগেছিল ব্যাণ্ডেজের তুলো
জ্যোৎস্নার মতন নেমেছিল
সারসেরা দীর্ঘ ছাতে
পড়ে আছে রক্তমাখা অজস্র পালক
শহরে ছিল না আলো
ছিদ্রময় বুকে বুকে মধ্যরাত ছেনেছে ঠোক্কর
স্বপ্ন ও সংস্কৃতি কিছু শ্লেষ্মা আর দুঃখ ভরা ধূপ
শূন্যতাকে সাজিয়েছে খুব
অজস্র নিষ্প্রাণ ধাতব সিরিঞ্জ
গাণিতিক ক্লোরোফর্ম ডুবেছিল শহরের রক্তমাংস হাড়ে

তারই মধ্যে কালোগাড়ি কয়েকটা বর্তুল সরল
মৃত্যু এসে গণিকার আলিঙ্গন থেকে
নিয়ে গেছে যুবককে ছাতের ওপর

সারারাত শোনা গেছে পক্ষ বিধুনন

যেতে যেতে

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

যেতে যেতে সোজা রাস্তা ভেঙে যায় হঠাৎ দুদিকে
একটি চলেছে ঠিক স্টেশনের দিকে—
অন্যটি অনেক দূরে বনগ্রাম পেরিয়ে, এড়িয়ে
কাঁটাঝোপে অথবা পাহাড়ে, কিংবা কোনো সমুদ্রের কোলে।

লোক আসছে নিরন্তর—কেউ বলছে স্টেশন এদিকে
অন্য এক পথচারী অন্যদিকে তর্জনী দেখালো—
সত্য ও মিথ্যার এক মোহনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
এইভাবে বেলা হয়—সময় গড়িয়ে যায় দ্রুত
ওয়াটার বটল থেকে শেষবিন্দু জল ক্রমে শেষ।

তারপর সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষ
যেদিকে পড়েছে বেশী ভোট সেইদিকে যেতে থাকি—
পথ শুধু দীর্ঘ হয়—অস্থিরতা সাপের ছোবল—
তোমার আসার কথা স্টেশনে এখন—
আর কতক্ষণ!
তুমি অপেক্ষায় ক্লান্ত সেখানে দাঁড়াবে।

মহুয়াবনের মধ্যে জ্যোৎস্নাহীন অমায় দাঁড়িয়ে
তুমি একদিকে আর অন্যদিকে আমি
সত্য ও মিথ্যার ফাঁদে ঘুঘু চাঁদ ধরা পড়ে নেই।

পুস্তক পরিচয়

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ [প্রথম খণ্ড]। জগদীশচন্দ্র মণ্ডল। মহাপ্রাণ পাবলিশিং সোসাইটি, কলিকাতা-৩৩। পনের টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি অবিভক্ত বাংলার তফসিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জীবনালেখ্য। পুস্তকটির লেখক যোগেন্দ্রনাথ পুত্র। মুখবন্ধেই লেখক সে-কথা উল্লেখ করে বলছেন: "বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারাইয়া যাওয়া ছিন্ন পত্ররাজির ধূলা ঝাড়িয়া কিছু কিছু কাণ্ডবিহীন একটি বৃক্ষের সহিত সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সেই বৃক্ষ ও তাহার সমস্ত উপকরণ আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কর্মবহুল জীবন।" "অবানবন্দী" এই শিরোনাম দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথা লেখার অভ্যাস শুরু করেছিলেন জীবনের উপান্তে। ১৯৬৮র ৫ই অক্টোবর নির্বাচনী প্রচারের সময় যোগেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হ'লে দেখা গেল 'অবানবন্দী'তে ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্ত কিছু নেই। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের সহায়তায় লেখক সে-কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন। এই বইটি তারই ফলশ্রুতি।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে বহু বিতর্কিত ব্যক্তি। অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্তদের সমাজে সে-সময় যে নিদারুণ অভিশাপের গ্লানি বহন করতে হতো, ছাত্রজীবনে যোগেন্দ্রনাথকে তারই বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং ১৯৩৭ সালের বরিশালের এক অজ্ঞাত নবীন উকিলের পরিচয় নিয়ে শক্তিশালী উন্নত সম্প্রদায়ের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে যোগেন্দ্রনাথ শুধু আলোড়নই সৃষ্টি করেন নাই, বাংলার রাজনীতিতে অনতিকালের মধ্যে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৮ সালের মধ্যেই যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের সহকর্মীর স্থান গ্রহণ করেন (পৃঃ ৪৪)। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের পর বরিশাল সফরে গেলে সুভাষচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা সভা-সমিতিতে যোগ দেন (পৃঃ ৪৭)। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করলে যোগেন্দ্রনাথও কংগ্রেস ত্যাগ করেন (পৃঃ ৫০)। কিন্তু তারপরই ধীরে ধীরে বাংলায় তফসিল জাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুসলিম লীগের সহযোগিতা গাঢ়তর হয়ে ওঠে এবং যোগেন্দ্রনাথ মুসলিম লীগের রাজনীতির পোষক হয়ে পড়েন। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর ফজলুল হক সাহেবের পরিষদীয় দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন হ'লে বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পূর্ণ অন্যখাতে বইতো। ভারত বিভাগই হয়তো সম্ভব হতো না, কারণ বাংলায় মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রাধান্যের পথ অবরুদ্ধ হয়ে বাংলা-বিভাগ অনিবার্যভাবে রুদ্ধ

হোতো। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে গান্ধীজী ও নেহেরু শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্রের এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে ফজলুল হককে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবর্তে ঠেলে দিলেন। তা না হ'লে হয়তো যোগেন্দ্রনাথও মুসলিম লীগ রাজনীতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রীসভায় জিন্নার আহ্বানে একমাত্র তফশিলী হিন্দুমন্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণে চূড়ান্তভাবে অগ্রসর হতেন কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষের এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই লাঞ্ছনার জন্য যোগেন্দ্রনাথকেও ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাজার হাজার স্বজাতি-নিধনের দুঃস্বপ্নের নিরুপায় সাক্ষী হয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও গোপন সুরঙ্গপথে অমর্যাদার গ্লানি নিয়ে ভারতবর্ষে চিরকালের জন্য চলে আসতে হয়।

রাজনীতিতে যোগেন্দ্রনাথের দ্রুত শিখরে আরোহণ এবং তারই পাশাপাশি তফশিলীদের সামাজিক, শিক্ষাগত ও পেশাগত মর্যাদার জন্য সংগ্রাম যেমন যোগেন্দ্রনাথকে অল্পকালের মধ্যেই একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারীরূপে চিহ্নিত করেছিলো, তেমনি মুসলিম লীগের রাজনীতির শরিক হয়ে ক্ষমতার পদমর্যাদায় আসীন হবার অল্পকালের মধ্যেই যোগেন্দ্রনাথ ইতিহাসের নেপথ্যে হারিয়ে গেলেন। এই পুস্তকটিতে যোগেন্দ্রনাথের কীর্তির তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রয়েছে, তবে রাজনৈতিক মূল্যায়ন তো রাজনৈতিক প্রেক্ষা সাপেক্ষ। লেখকের প্রেক্ষা ও আলোচকের প্রেক্ষা তো অভিন্ন হওয়া দুরূহ।

সমদর্শী

২০৯।৩ বিধান সরণিস্থিত কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮ ০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১ ০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫ ০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২ ৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১ ৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ, বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

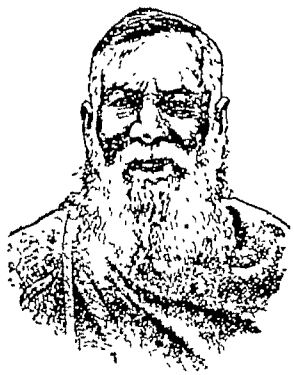

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইন্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

6 DEC 1978

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/68

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Re. 1·00 with Regd. Postage Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone.: 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

৪৩ বর্ষ ঃ ১৩৮৫ ঃ অগ্রহায়ণ

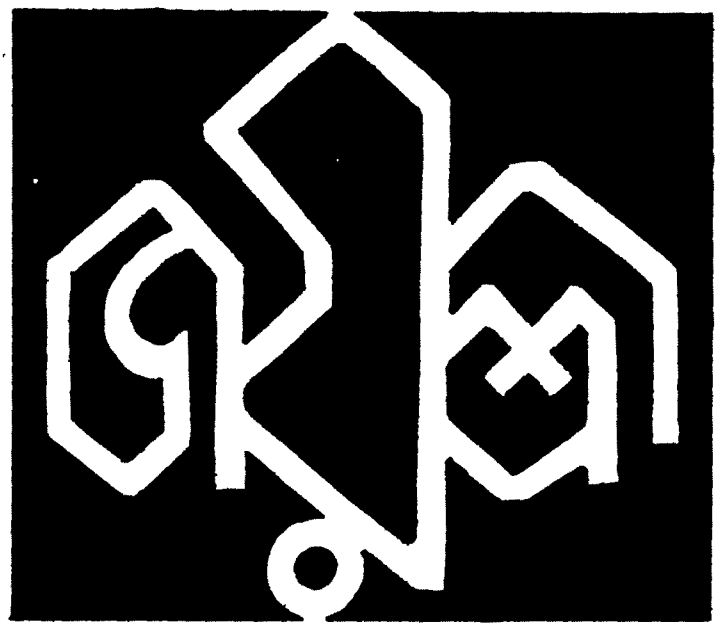

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা
লীলা রায়

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-১৯২৮

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

H. V KAMATH

LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : Rs. 15/-

NANDA MOOKERJEE

NETAJI THROUGH GERMAN LENS : Rs. 20/-

VIVEKANANDAS INFLUENCE ON SUBHAS : Rs. 6/-

NETAJI SPEAKS : VOL. I Rs. 4/-

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় দাম : ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড ৩৪·৫০ এর পরিবর্তে ২৭ টাকায়। বাংলায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় : লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীতার প্রেক্ষায় ৬১টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত। প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের এই বই ভাল লাগবে। দাম : ১০.০০

পূর্বদেশি উপকথা : দেবাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গল্প, গণেশ পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম : ৯.০০

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম : ৯.০০

চিত্তজয়া চিত্তরঞ্জন : ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম : ২০ ০০

রামমোহন : সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দাম : ৬.০০

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ অগ্রহায়ণ। ১৩৮৫ অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বন্যাত্রাণ ৪৮৫
রাজনীতির ঢেউ ৪৯০

স্মৃতি-কথন : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ৪৯৩
গোপাললাল সান্যাল

কবিতা

শকুন্তলা ৫০৫
সুধাংশু দাশ

স্বদেশ

মনোরমা সিংহরায় ৫০৮

শহীদ-স্মরণ

শহীদ অনিল দাস ৫০৯

বিপ্লব-কথা

বাঙালী বিপ্লবের গতি ও পরিণতি ৫১৫
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

সাহিত্য-সমালোচনা

ইচ্ছাকলম ৫২১
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা

গাড়োয়ালী লোকগীতে সমাজচিত্রের একদিক ৫২৬
মানসী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

নেতাজী সংখ্যা

জয়শ্রী । পৌষ । ১৩৮৫

সুভাষচন্দ্র বসুর অপ্রকাশিত পত্র

বড় প্রবন্ধ

The Forward Movement within the Indian National Congress
—H. V. Kamath

যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল

আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী ও স্বাধীনতা :
ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা : স্মৃতিকথন

পবিত্রকুমার ঘোষ : সুভাষ-চর্চা

এছাড়া

চারণিক-এর মহাকাল-কথন

দাম : চার টাকা

সাত বছরে আপনার টাকা দ্বিগুণ করুন

জাতীয় সঞ্চয় পত্র—পঞ্চম পর্যায়

কিনুন

★ এই বিনিয়োগ থেকে আপনার বছরে ১৪.৩% সরল সুদ আয় হবে।

★ তিন বছর পর আপনি এই সার্টিফিকেট ভাঙাতে পারবেন।

★ আপনি যত খুশী বিনিয়োগ করতে পারেন।

অন্যান্য সুবিধা

★ আয়করের জন্য সুদের হিসেব বার্ষিক ভিত্তিতে করা হবে (সম্প্রতি এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে)

★ সম্পদ কর থেকে রেহাই (১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)

★ সুদ করমুক্ত (বছরে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :—

★ অনুমোদিত এজেন্ট অথবা

★ জেলা সঞ্চয় আধিকারিক

অথবা

★ নিকটতম ডাকঘর

অথবা

★ আপনার এলাকার আঞ্চলিক অধিকর্তা (জাতীয় সঞ্চয়)

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পোস্ট বক্স নং-৯৬

নাগপুর-৪৪০০০১

davp 78/343

৪৩ বর্ষ । অগ্রহায়ণ । অষ্টম সংখ্যা

বন্যাত্রাণ

বন্যার প্রকৃতি

এ-বছর সেপ্টেম্বরের শেষে ও অক্টোবরের গোড়ায় তৃতীয় পর্যায়ের বন্যায় পশ্চিম বঙ্গের নয়টি জেলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। জুলাই-আগস্টের প্রথম পর্যায়ের এবং সেপটেম্বরের গোড়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের বন্যায় পাঁচটি জেলা প্লাবিত হয়েছিলো। তৃতীয় পর্যায়ের বন্যার পর বারোটি জেলার প্রায় দুই কোটি মানুষ বন্যা-কবলিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রায় এক কোটি মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে। এবারকার বন্যার সঙ্গে পূর্বেকার বন্যার প্রভেদ এই যে, এবার বন্যা-কবলিত মানুষগুলি শুধু যে তাদের বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, আসবাব-বাসনপত্র, গবাদিপশু, উৎপন্ন ফসল হারিয়েছে তাই নয়, তাদের জীবিকার উপকরণগুলিও বন্যায় জলে খুইয়েছে। কলকাতাও রেহাই পায় নাই।

গত ২৬শে-২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি থেকে ৭২ ঘণ্টায় অবিরাম ৩০ ইঞ্চি বর্ষণের ফলে যে বিধ্বংসী প্লাবন সৃষ্টি হয়ে গেলো, তার জন্য আদৌ কেউ প্রস্তুত ছিলো না, —এমন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। দ্বিতীয় পর্যায়ের বন্যার পর হুগলী জেলার সচকিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খানাকুল থেকে জেলা-সদর চুঁচুড়ায় রেডিও-গ্রামে আর্ত সংবাদ পাঠিয়ে বলেন—'এতো বন্যা নয়, এ যে প্লাবনের প্রলয়'—'a deluge, not a Flood"। তারপরেই বা সরকার সতর্ক থাকবেন না কেন? আর হুগলী জেলার এই খানাকুল, আরামবাগ, গোঘাট এলাকাগুলি তৃতীয় পর্যায়ের বন্যার সময় চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা দশ থেকে ত্রিশ ফুট জলের তলায় ডুবে ছিলো।

ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, কংসাবতী ইত্যাদি নদ-নদীগুলির উচ্চ ও নিম্ন-জলরোধের এলাকাগুলিতে বিপর্যয়কর বৃষ্টিপাতের সঞ্চিত জল যেমন জলাধার ও ব্যারেজগুলিকে বিপন্ন করলে দামোদর-ময়ূরাক্ষী-কংসাবতীর বাঁধ ও জলাধার থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ছেড়ে বাঁধ ও জলাধারগুলি রক্ষা করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, তেমনি এই নিষ্ক্রান্ত জলপ্রবাহ জলপ্রপাতের বেগে নদীর জলের প্রবল বানের সঙ্গে মিশে গিয়ে দুরন্ত বন্যার প্রকোপে জেলার পর জেলায় জলমগ্ন মানুষের জীবনে মরণের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলো। বাঁধ ও জলাধারগুলি বন্যার দুঃস্বপ্নের দিনগুলিতে কী রকম মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তা বোঝা যায় যখন আমরা জানতে পারি যে বন্যার একাদশতম দিনেও ১৯৭৮ এর ৭ই অক্টোবর তারিখ, ডি. ভি. সি. ১,২০,০০০ কিউসেক থেকে ৩,০০,০০০ কিউসেক পর্যন্ত এবং কংসাবতী থেকে ১০,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল। দুর্গাপুর ও তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে জল নিষ্কাষণের সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়িয়েছিলো ৪,০০,০০০ কিউসেক। যে বাঁধ ও জলাধারগুলি বন্যা নিরোধের জন্য তৈরী করা হয়েছিলো, ডি. ভি. সি. কার্যকরী হবার ত্রিশ বছর পর (১৯৪৮এ

ড়ি. ভি. সি. কার্যকরী করা হয়েছিলো) সেই বাঁধ ও জলাধারগুলি থেকে নিষ্কাশিত জল প্রলয়ঙ্কর বন্যার উৎস হয়ে কেন দাঁড়ালো—এই জিজ্ঞাসার আশু অনুসন্ধান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বন্যায় বিভিন্ন জেলায় নদীর বাঁধে কতগুলি ভাঙন ধরেছিলো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার হিসাব দিয়ে বলেছেন ঃ

জেলা	ভাঙনের সংখ্যা	জেলা	ভাঙনের সংখ্যা
মালদা	১৩	নদীয়া	৩৬
মুর্শিদাবাদ	২২৩	বীরভূম	৮০০
মেদিনীপুর	৫,৫৩৫	হাওড়া	১,০০৮
হুগলী	৩৫৭	বাঁকুড়া	৩০৩
বর্ধমান	৮১৭	পুরুলিয়া	১
		২৪-পরগণা ও কলিকাতা	৩৪৬

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি

এবারকার বন্যায় সরকারী হিসেবে প্রাণ হারিয়েছেন মাত্র প্রায় একহাজার মানুষ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এখনও যারা "নিখোঁজ" তাদের সংখ্যা খতিয়ে দেখছেন। তিলপাড়া ব্যারেজের ও হিংলো ড্যাম-এর ভাঙনে বীরভূমের বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শোনা যায় সেখানকার হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ। সুতরাং প্রাণনাশের সংখ্যার চূড়ান্ত হিসাব কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখনই বলা মুস্কিল। প্রায় দু'লক্ষ গবাদি-পশু মারা গেছে। সরকারী হিসাবে প্রায় ১৮ লক্ষ বাড়ীঘর হয় ধ্বংস হয়েছে, না হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মধ্যে ১১ লক্ষ বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, ৬ লক্ষ বাড়ী বেশী পরিমাণে এবং ২ লক্ষ বাড়ী অল্প পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীগুলির মালিকানা ভূমিহীন কিংবা ছোট জোতের কৃষকদের। ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২০০ কোটি টাকা মূল্যের—প্রায় ৩৪ লক্ষ একর বন্যাক্লিষ্ট জমির। এর ফলে ১৫ লক্ষ ছোট এবং প্রান্তিক চাষী ও ২০ লক্ষ ভূমিহীন চাষীর রুজি-রোজগারের পথ বিপন্ন হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের সকল স্তরের মানুষই বন্যার ফলে বিপন্ন। কিন্তু যারা দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় সর্বদাই বাস করছেন, যাদের শতকরা ভাগ ৪৭, তাদের বিপদই সর্বাধিক। কারণ তাদের এই বিপদ সামলাবার কোনো উপায় নাই। নতুন ফসল উৎপাদনের সুযোগ, কিম্বা তাদের উপার্জনের সুযোগ ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তাদের হয় খয়রাতি সাহায্য দিতে হবে, না হয় 'কাজের বদলে খাদ্য'-এর বরাদ্দ দিতে হবে। কিন্তু সব চাইতে বিপদের কথা রাজ্য প্রশাসনের দলীয় মনোভাব, দলীয় বিধানে ত্রাণ বণ্টনের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি উদাহরণের উল্লেখই যথেষ্ট। ১৯৭৮-এর ২৬ আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ক্যাবিনেটের অন্যতম মন্ত্রী, মালদা ও মুর্শিদাবাদ পরিভ্রমণ করে কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেন মালদার কুন্ডীরায় এবং মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা এবং সুতি এলাকায় দলীয় ভিত্তিতে ত্রাণ বণ্টনের অভিযোগ তার নজরে এসেছে। বলতেই হয় মন্ত্রী এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েই সংবাদপত্রে সংবাদটি পরিবেশন করেছেন।

এই বন্যায় উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত পুঁজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কুটির ও ক্ষুদ্র কারিগরের যন্ত্রপাতি ও কাজের কাজের হাতিয়ার ভেসে গেছে। সরকারী শিল্প সমেত নানারকম শিল্পোদ্যোগের বনিয়াদ বিধ্বস্ত হয়েছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শত শত বাড়ীঘর জলে ডুবে বিনষ্ট হয়েছে। উৎপাদন ও উপার্জন মিলিয়ে রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ ২০০০ কোটি টাকারও বেশী। আর কেবলমাত্র রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উৎপাদন ও উপার্জনের ক্ষতির পরিমাণ

রাজ্য সরকারের হিসাবে ৭৫০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে বাজেট-ভিত্তিক অনুদান চেয়েছেন ৩৫০ কোটি টাকা (১৯৮০র মার্চ পর্যন্ত) এবং বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে অল্পসুদে ঋণ চেয়েছেন ১৩০ কোটি টাকা। প্রথম দুই পর্যায়ের বন্যার ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নিকট সরাসরি বাজেট গ্রাণ্ট চেয়েছিলেন ১০১.৪৩ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবীর পর প্ল্যান-বাবদ অগ্রিম সাহায্য দিয়েছেন ১৯.৩০ কোটি টাকা (স্বল্পমেয়াদী শস্য-ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা ছাড়া)। ১০ই নভেম্বর ১৯৭৮ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যান-বাবদ অগ্রিম বরাদ্দ পূর্বেকার ১৯.৩০ কোটি টাকার পরও আরও ৬৯.৬৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং সর্বসাকুল্যে প্ল্যান-বাবদ অগ্রিম বরাদ্দ (Advance Plan Assistance) দাঁড়ায় ৮৮.৯৩ কোটি টাকায়। নগদে ও খাদ্যে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে :

(কোটি টাকায়)

(১) এ-পর্যন্ত প্ল্যান-বাবদ অগ্রিম বরাদ্দের পরিমাণ :	৮৮.৯৩
(২) খয়রাতি সাহায্যের জন্য ৯৫,৫০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ডালের মূল্য :	১৩.১৪
(৩) কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের ১ লক্ষ মেট্রিক টন গমের মূল্য :	১২.৫০
(৪) রবি শস্যের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ :	১৫.০০
(৫) প্রেরিত ঔষধপত্রের মূল্য :	০.৩৭
মোট :	১২৯.৯৪
(৬) ষষ্ঠ অর্থ কমিশন অনুযায়ী ত্রাণকার্যে ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা :	৬.৬১
(৭) প্রধান মন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত :	০.১৮
(৮) অতিরিক্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ : সাপ্লিমেণ্টারী বরাদ্দ ভোটে পাশ হলেই যা দেওয়া হবে :	১৫.০০
মোট :	১৫১.৭৩

রাজ্য সরকার বাজেট বরাদ্দ খাতে ১৯৭৮-৭৯ ও ১৯৭৯-৮০ এই দুই বছরের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা চেয়ে ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১৫১.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের মঞ্জুরী পেয়েছেন। রাজ্য সরকারের দাবীও, ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত—অর্থাৎ এক বছরের জন্য—৩৫০ কোটি টাকার অর্ধেক—অর্থাৎ, ১৭৫ কোটি টাকা। কিন্তু ৩৫০ কোটি টাকার দাবীর মধ্যে, রাজ্য সরকার ২০ কোটি টাকার স্বল্পমেয়াদী শস্য ঋণ পেয়েছেন। সুতরাং তাদের দিক থেকে অনুদানের বরাদ্দের দাবী দাঁড়ায় দুই বছরে ৩৩০ কোটি, অর্থাৎ ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত ১৬৫ কোটি টাকা। ১৬৫ কোটি টাকা চেয়ে ১৫১.৭৩ কোটি পেয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অকিঞ্চিৎকর সাহায্যের অজুহাত তুলে হা-হুতাশকে রাজনীতি ছাড়া আর কী বলা যাবে। ফাঁকটা তো মাত্র শতকরা ৯.৮ ভাগ। কেন্দ্র তো বলেই দিয়েছেন, এই অর্থ ব্যয়ের পর আরও অর্থের প্রয়োজন হলে তারা সর্বদাই উদার হস্তে সাহায্যের জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছেন। ত্রাণের জন্য খয়রাতি সাহায্য বাবদ কিম্বা 'কাজের বদলে খাদ্য' প্রকল্পের জন্য খাদ্য-শস্যেরও অভাব হবে না।

কিন্তু রাজ্য সরকার বলছেন কৃষি ও ক্ষুদ্র-শিল্পের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাদের ৩৭ কোটি ও ১২ কোটির টাকার দাবীতে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যথাক্রমে প্রয়োজনানুযায়ী ১৩.২০ কোটি ৭.২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ করেছেন। রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য, গবাদি পশুর ক্ষতিপূরণের জন্য, ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলবাড়ী মেরামতের

জন্য, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য এবং ব্যাপকভিত্তিতে গৃহনির্মাণের জন্য বরাদ্দ অত্যন্ত সামান্য হয়েছে। এই দাবী ও বরাদ্দগুলি নীচে দেওয়া হ'লো :

(কোটি টাকায়)

কোন-কোন খাতে	বরাদ্দ রাজ্য সরকার চেয়েছেন	বরাদ্দ কেন্দ্র
১. বাড়ী তৈরী বাবদ	৪৫·০০	১১·০০
২. অন্যান্য ত্রাণ বাবদ	৫০·০০	
৩. কৃষি ,,	৩৭·০০	১৩·২০
৪. সমবায়	৭·৫০	১·০০
৫. পশুপালন ও পশুচিকিৎসা	২৩·৫০	১·৩০
৬. মৎস্য	৫·০০	·৮০
৭. কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প	১২·০০	৭·২৫
৮. সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ	২২·০০	৮·৭৮
৯. পথঘাট	৩৫·০০	১০·০০
১০. শিক্ষা	১২·০০	২·৬০
১১. জন স্বাস্থ্য	৪৫·০০	৫·৭০
১২. পৌরপ্রশাসন ও সহর উন্নয়ন	২৪·৫০	৪·০০
১৩. পঞ্চায়েত (পথঘাট ইত্যাদি)	১৫·০০	৪·০০
১৪. অন্যান্য	১৬·২৫	
	৩৪৯·৭৫	৬৯ ৬৩

রাজ্য সরকার ভূমিহীন কৃষকদের, ক্ষুদ্রজোতের কৃষকদের এবং দরিদ্র কারিগরদের ১১ লক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহনির্মাণের উপকরণ কেনবার জন্য ৪৫ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়েছেন এবং এই বাড়ীঘরগুলি তৈরীর মজুরী বাবদ 'কাজের বদলে খাদ্য' প্রকল্প অনুযায়ী আরও ২৫ কোটি টাকা চেয়েছেন। সে জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১১ কোটি টাকা বরাদ্দে বাড়ী প্রতি মাত্র ১০০ টাকা সাহায্য দাঁড়াবে—এই ভাবনায় রাজ্য সরকার মর্মাহত। কিন্তু রাজ্য সরকার বাড়ী তৈরীর জন্য সাহায্যের যে তিনধাপের পরিকল্পনা করেছেন, তারই বা কী পরিণতি দাঁড়াবে? যে বাড়ী একেবারে ভেঙ্গে গেছে তা পুনর্গঠনের জন্য তাদের সাহায্যের বরাদ্দ ৪০০ টাকা; ২। যে বাড়ী আংশিক বিনষ্ট হয়েছে তার বরাদ্দ ৩০০ টাকা। ৩। যে বাড়ীর চালটা দাঁড়িয়ে আছে তার বরাদ্দ ১০০ টাকা। এই বরাদ্দ দিয়েই বাড়ী পুনর্নির্মাণ করা যাবে? গবাদি পশুপালনের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় বরাদ্দে রাজ্য সরকার ক্ষুব্ধ। ২লক্ষ গবাদি পশু বিনষ্ট হয়েছে। এজন্য তারা ৩৩·৫০ কোটি টাকা সাহায্য চেয়ে পেয়েছেন ১·৩০ কোটি টাকা। তাতে কতগুলি বলদ কেনা যাবে? বলদ কেনা না হলে চাষ হবে কী করে? এটা তাদের প্রশ্ন। কিন্তু প্রতিপ্রশ্ন হলো ১৯৭৯ সালের মধ্যে যে ১৫১·৭৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ হয়েছে; তা কি রাজ্য সরকার খরচ করে উঠতে পারবেন? সে রকম প্রশাসনিক যন্ত্র কী তাদের আছে? আর যদি ব্যয় করে ওঠা সম্ভবই হয়, কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই তাদের প্রতিশ্রুতি মতো আরো বরাদ্দ করবেন। রাজ্য সরকার অগ্রিম ব্যয় করেও কেন্দ্রের কাছ থেকে তা উশুল করে নিতে পারবেন।

আর বন্যার জন্য বরাদ্দ যে প্ল্যান-বাবদ অগ্রিম সাহায্য খাতে (Advance Plan Assistance) মঞ্জুরী হওয়া উচিত নয়, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের পদ্ধতি অনুসরণ করে বরাদ্দের প্রকৃতি নির্ণয় করছেন; সপ্তম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশে পদ্ধতিগত পরিবর্তন হবে, আশা করা যায়। তাছাড়া গত বছর অন্ধ্র ঘূর্ণীঝড়ে কেন্দ্র ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলো, সেই অর্থ অন্ধ্র সরকার সম্পূর্ণ ব্যয় করতে

পরে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সে-অর্থ ফেরৎ চায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেলায়ও তা ফেরত চাইবার কোনো কারণ নাই। সপ্তম অর্থ কমিশনের রিপোর্টে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ক্লিষ্ট রাজ্যগুলির ত্রাণের জন্য পূর্বেকার ৫০·৭১ কোটি টাকা সাহায্যের পরিবর্তে ১০০·৫৫ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। যদি বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগের জন্য ত্রাণের ব্যয় এই বরাদ্দের প্রান্তসীমা পেরিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ প্ল্যান-বহির্ভূত অনুদানরূপে কেন্দ্র সেই রাজ্যকে দেবে। কিন্তু সব চাইতে উদ্বেগের কারণ হোলো রাজ্য সরকার রিলিফ বন্টনে দলীয় মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়ে পরিস্থিতি কলুষিত করেছেন। তেমনি বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সেই মনোভাবেরই স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। দলীয় পঞ্চায়েত কর্তৃক তৈরী গৃহনির্মাণের সাহায্যের তালিকায় দলীয় বন্যাক্লিষ্টদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, অর্থবন্টনের ব্যাপারেও তাই। অভিযোগ উঠেছে মঞ্জুরীকৃত অর্থ থেকে একটা অংশ কেটে রেখে কোথাও কোথাও বন্যক্লিষ্টদের অর্থ বন্টন করা হচ্ছে। আর যেখানে পঞ্চায়েতে দলীয় প্রাধান্য নেই, সেখানে সেই পঞ্চায়েতের পাশ কাটিয়ে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজে শাসকদের প্রধান দল এগিয়ে যাচ্ছেন। গৃহ নির্মাণ কর্মসূচীকে সরকার অগ্রাধিকার দিলেও, এই খাতে বরাদ্দ সাহায্য দেওয়া নভেম্বর মাসের শেষভাগে সুরু হয়েছে এবং কার্যত প্রথম কিস্তি কোথাও ১০০ টাকা, কোথায় ৫০ টাকা দেওয়া হচ্ছে, অনেক অঞ্চলে প্রথম কিস্তিও পৌছায় নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে রাণাঘাটের নিকট আইস-তাওয়ার সি-পি এম নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েত-প্রধান বলছেন মঞ্জুরী টাকার তহবিল থেকে এর চাইতে বেশী তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা, একই কারণে যাদের বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে, তাদের সকলকেও টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের চেষ্টায় যে ভাবেই হোক মাথার উপর আশ্রয় তৈরীর জন্য বিধ্বস্ত বাড়ীর মালিকরা উঠে-পড়ে লেগে গেছেন। কিন্তু বিধ্বস্ত বাড়ী পুনর্নির্মাণের জন্য ৪০০ টাকা বরাদ্দের সরকারী প্রতিশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে ১০০ টাকা বরাদ্দে নেমে এসেছে ফলে বহু বন্যাবিধ্বস্ত মানুষ বিহ্বল হয়ে গেছেন। অবশিষ্ট বরাদ্দ তারা পাবেন কিনা তার কোনো জবাব নাই।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের দাবী পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৭৫ ভাগ রবিশস্যের বীজ বোনা হয়ে গেছে। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী রবিশস্যের জন্য সাধারণত যে পরিমাণ জমিতে বীজ বোনা হয়ে থাকে এবার তার চাইতে শতকরা ৫০ ভাগ বেশী জমিতে—অর্থাৎ মোট ৬১ লক্ষ একর জমিতে এই শস্যের বীজ বোনা হয়েছে। কিন্তু খবর নিয়ে দেখা যায় নদীয়া, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরের পঞ্চায়েতগুলিতে দরিদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করা যায় নাই। আমতা ব্লক পঞ্চায়েতে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ কৃষকদের মধ্যে বীজ বিলি করা হয়েছে। আবার এ-ও দেখা গেছে কোথাও কোথাও ক্ষেতের একটি অংশের জন্য মাত্র বীজ বিলি করা হয়েছে।

চাষের জমিতে জমা বালি সরানো নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেচ বিভাগ এই বালি সরিয়ে নদীতে ফেলতে দিতে রাজী নয়। অবশ্য ২৮ লক্ষ একর বন্যাকবলিত এলাকার মধ্যে এই সমস্যাটা ২০,০০০ একর জমিতে সীমিত।

ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্পে নিযুক্ত কারিগরেরা

সরকারের মুখ চেয়ে বসে নেই। রাণাঘাট—কৃষ্ণনগর—শান্তিপুর—নবদ্বীপ—নদীয়া জেলার এই পরিধিতে একলক্ষেরও বেশী হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত রয়েছে। তাঁতিরাই তাদের তাঁত মেরামত করে কাজে লেগে গেছেন। যেগুলি মেরামতের বাকী আছে, সেগুলিও তারা দ্রুত কাজের উপযুক্ত করে নিচ্ছেন। সরকারের মুখ চেয়ে কেউ নিষ্ক্রিয় নেই। ছোট তাঁতিদের কথা স্বতন্ত্র। তারা তাঁত চালাবার জন্য এখনও মহাজনের মুখাপেক্ষী। রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র-শিল্প বিভাগ থেকে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁতিদের ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান সংগ্রহের জন্য পঞ্চায়েতগুলিতে প্রশ্নাবলী গেছে। অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পেরও সেই অবস্থা।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে খয়রাতি সাহায্যের এবং 'কাজের বদলে খাদ্যের' পরিকল্পনার জন্য উদারহস্তে খাদ্যসস্যের সাহায্য পাওয়ায় গ্রামের বন্যাক্লিষ্টদের খাদ্যের সংস্থান সম্ভব করে, খাদ্যের জন্য তাদের শহর অভিযান বন্ধ করা গেছে। যত 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে' বন্যাবিধ্বস্তদের নিযুক্ত করা যাবে, খয়রাতি সাহায্যের আওতা থেকে তত বেশী সংখ্যক লোককে সরিয়ে আনা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৯-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খয়রাতি সাহায্য বাবদ ৯৫,০০০ মেট্রিক টন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছেন যার মূল্য ১৩·১৪ কোটি টাকা এবং ১৯৭৯-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১ লক্ষ মেট্রিক টন পরিমাণ গম 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে'র জন্য দিয়েছেন, যার মূল্য ১২.৫০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের সর্বাত্মক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বরাভয়ের আশ্বাস নিয়ে দাঁড়ালেও রাজ্য সরকার ও শাসক দল পশ্চিম বাংলার জনগণের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারকে কর্তব্যচ্যুতির দায়ে খর্ব করতে অহরহ সচেষ্ট রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই অভিযান প্রতিহত করতে কালবিলম্ব না ক'রে উদ্যোগী হ'তে হবে। তেমনি পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকেও সে বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হ'তে হবে। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৮

রাজনীতির ঢেউ

উত্তর প্রদেশের আজমগড় ও কর্ণাটকের চিকমাগালুরে লোকসভায় উপনির্বাচনে জনতা পার্টির প্রার্থী প্রতিপক্ষ ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হবার পর বিহারের সমস্তিপুরে জনতা প্রার্থী অজিত কুমার মেহেতা মাত্র প্রায় ২৭,০০০ ভোটের ব্যবধানে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীতারকেশ্বরী সিংহকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। ১৯৭৭এর মার্চের লোকসভায় সাধারণ নির্বাচনের পর সমস্তিপুরে জনতা পার্টি চতুর্থ উপ-নির্বাচনের জয়ী হোলো। ৮টি রাজ্যের ৯টি উপনির্বাচনের মধ্যে জনতা পার্টি অপর দলের ২টি আসন কেড়ে নিয়েছে, নিজেদের দুইটি আসন বজায় রেখেছে আর দুইটি আসন ইন্দিরা কংগ্রেসের কাছে খুইয়েছে। জনতা পার্টি মণিপুর রাজ্যের বাহির-মণিপুর (Outer Manipur) এবং গুজরাতের রাজকোট আসনটি অপর দল থেকে কেড়ে নিয়েছে অন্ধ্র প্রদেশের নান্দিয়াল-এর ও উত্তর প্রদেশের আজমগড়ের আসনটি খুইয়েছে এবং কারনাল ও সমস্তিপুরের আসন বজায় রেখেছে।

ইন্দিরা কংগ্রেস চিকমাগালুরের, কংগ্রেস ওয়ারাঙ্গালের (অন্ধ্রপ্রদেশে) এবং আকালী দল ফরিদাবাদের আসনটি বজায় রেখেছে।

সমস্তিপুরের আসনে ১৯৭৭-এর মার্চে কর্পুরী ঠাকুর ৩২৭.০০০ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস-প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। আর ১৯৭৮এর বিধান সভা নির্বাচনে সমস্তিপুরের লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত ৬টি বিধান সভার আসনের মধ্যে ৫টিতে জনতা পার্টি একত্রিতভাবে মাত্র ৬৪.০০০ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করে। ষষ্ঠ আসনটিতে কংগ্রেস জয়ী হয়। সুতরাং ৩২৭.০০০এর ব্যবধান কয়েকমাসের মধ্যেই ৬৪.০০০এ নেমে আসে এবং আরও ১০ মাসের মধ্যে সমস্তিপুরে জনতার গরিষ্ঠতার ব্যবধান নেমে দাঁড়িয়েছে ২৭.০০০ ভোটে। সেদিক থেকে জনতার এই জয়ে উল্লাসের অবকাশ নাই, ঘোরতর আত্মসমীক্ষার অবকাশ রয়েছে।

তাছাড়া এই সামান্য গরিষ্ঠতাও জনতার, না জাত-পাতের, সে বিষয়ে ঘোরতর সংশয় রয়েছে। বিহারের রাজনীতি জাত-পাতের দ্বন্দ্বে জীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং তারই উপর 'অনগ্রসর' জাতিদের জন্য সাম্প্রতিক শতকরা ২০ ভাগ চাকুরী সংরক্ষণের যে নীতি কর্পুরী মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছে তার ফলে রাজনৈতিক আনুগত্যের স্তরবিভাগ আরও তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়েছে। এই কেন্দ্রের ৭.৩৭ লক্ষ ভোটারদের মধ্যে "অনগ্রসর" বর্গদের সংখ্যা ৩.৮৬ লক্ষ, "উচ্চবর্গের" সংখ্যা ২লক্ষের কিছু বেশী, হরিজন ১.১৪ লক্ষ এবং মুসলিম ৯২,০০০ হাজার। তারকেশ্বরী সিংহ 'উচ্চবর্গের' এবং 'কোয়ের' জাতের জনতা প্রার্থী, 'অনগ্রসরদের ভোট পেয়েছেন। হরিজন ও মুসলিমদের ভোটও তারকেশ্বরী সিংহর দিকে ইন্দিরা গান্ধী ঝুঁকাতে অসমর্থ হয়েছেন। এই নির্বাচন 'অনগ্রসরদের' 'চাকুরী সংরক্ষণ' নীতির জয় বলা যেতে পারে, জনতাদলের জয় কতটুকু বলা মুস্কিল, তার উপর জনতা দলের নেতৃস্থানীয়রা গোপনে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করেছে। সমস্তিপুর নির্বাচনের পরও চাকুরী সংরক্ষণ বিরোধীরা বিহারের বিভিন্ন সহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছে। সুতরাং শেষ পরিণতি কোথায় তা বলা মুস্কিল সমস্তিপুরে জনতার জয় সত্ত্বেও।

ফতেপুর দশম উপনির্বাচনেও জনতা দলের লিয়াকত হোসেন প্রায় ত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। এই কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা শতকরা ১২ আর কংগ্রেস (আই) প্রার্থীর জাত ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা শতকরা ১৫। সুতরাং ইন্দিরা গান্ধী এই কেন্দ্রে মুসলিম কিম্বা উচ্চবর্ণ কারুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে চরণ সিংএর প্রভাবই ফতেপুরে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং জনতা দশটি উপনির্বাচনের পাঁচটিতে জয়ী হয়েছে।

গত ২০শে নভেম্বর লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সমর গুহ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে লোকসভার অধিকার-ভঙ্গের অভিযোগের বিচার করে কমিটির পক্ষ থেকে লোকসভায় তার রিপোর্ট পেশ করেন। প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বে থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে গুরুতররূপে অধিকার-ভঙ্গের এবং সভার অমর্যাদার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাজা দেওয়ার ভার কমিটি লোকসভার সমবেত জ্ঞানদীপ্ত বিচারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর কোনো পরিষদকেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধিকার-ভঙ্গের জন্য শাস্তি বিধান করতে হয় নাই। সেদিক থেকে এ-ও এক অভিনব পরিস্থিতি। চিকমাগালুরে জয়ী হয়ে

জনসাধারণের একাংশের আস্থা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় ফিরে এসেছেন, এই যুক্তির বলে তার বিরুদ্ধে অধিকার-ভঙ্গের অভিযোগ স্খালন হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। ভোটে জয়ী হ'লে আইন-বিরুদ্ধ অপরাধের দায় উবে যায় না, আইন তার পথ করে নেবে। শ্রীমতী গান্ধীও তার ব্যতিক্রম হতে পারেন না, লোকসভার শাস্তি, সে যে ধরণেরই হোক, তাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

ঐ একই দিনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি সমবেতভাবে দিল্লীতে বিরাট শ্রমিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। বিভিন্ন পর্যায়ে সকল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে পরামর্শ করেও কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী রবীন্দ্র ভর্মা বিলের বিরুদ্ধে তাদের বিরূপ করে তুললেন, ভাবতে অবাক হতে হয়। সংবিধান প্রদত্ত শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও এসোসিয়েসন গঠনের অধিকার, এই বিলটি আইনে পরিণত হলে হরণ করে নেবে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে। অন্যায়-ভাবে বরখাস্তের এবং লক-আউটের বিরুদ্ধে বিলে বিধান দেওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন গঠনে নিজেদের মুখপাত্র বাছাই-এর অধিকার হরণের আশঙ্কাও ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রবলভাবে পোষণ করে। সম্প্রতি বিভিন্ন শিল্পে, ডক ও পোর্টে ধর্মঘট বে আইনী ঘোষিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিলটি সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। এমন কি জনতা পার্টির উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত শিবিরেও দলের সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যরা কঠোর মন্তব্য করেছেন। সুতরাং বিলটির পুনর্বিবেচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিষয়ে কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরিষার এক দিকে থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের বিভ্রাটের সৃষ্টি উভয়পক্ষের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সংশয়ান্বিত করে তুলবে।

কয়লার দাম বৃদ্ধির কথা কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী ভাবছেন। তিন বছরের মধ্যেও কয়লার মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে এবং সেজন্যই উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি না হওয়ার দরুণ কয়লার লোকসানের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কয়লা শিল্পে বেতনের পরিমাণই উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা ৬২ ভাগ, যন্ত্রপাতির দামও বৃদ্ধির দিকে। বর্তমানে একজন কয়লা খনির শ্রমিকের গড় বেতন দৈনিক তিশ টাকা, জাতীয়করণের পূর্বে ছিল দশ টাকা। আর ভূমিহীন শ্রমিকদের দৈনিক বেতন মাত্র ৮.১০ টাকা। সরকার ব্যয়বৃদ্ধির অজুহাতে কয়লার দর বাড়াবেন কিন্তু যারা ক্রেতা তারা কোথায় দাঁড়াবেন, সে-বিষয়ে সরকারের কি চৈতন্য আছে? আর এদিকে কয়লার উৎপাদন সঙ্কটজনকভাবে কমতির দিকে।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮

সে কথাও শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

সুভাষচন্দ্রকে প্রধান কর্মাধক্ষের পদে নিয়োগ করলে দলে যে ভাঙনের সূত্রপাত হয় তা অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে।

সুভাষচন্দ্রকে কর্পোরেশনের প্রধান পদে নিয়োগে স্বরাজ্যদলে যে-ভাঙনের সূত্রপাত হয়, পরবর্তী অন্যান্য নিযুক্তি-সূত্রে ধীরে ধীরে সে বিভেদ, অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় হয়ত ভেবেছিলেন মেদিনীপুরের খাজনা বন্ধ আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার পর তাঁর এই নতুন পদ-প্রাপ্তির যোগ্যতা ও দাবী নিশ্চয়ই অগ্রগণ্য হবে। কিন্তু তা হল না। বিপ্লববাদীদের নায়কগণ—যাঁরা বিভিন্ন নির্বাচন দ্বন্দ্বে স্বরাজ্যদলের প্রধান কর্মী ও সহায়ক ছিলেন, তাঁরা শাসমল মহাশয়কে সমর্থন করলেন না। হয়ত বা শাসমল মহাশয়ের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে এঁদের বিরোধ ছিল, কিংবা অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।

শাসমল মহাশয়ের দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি প্রস্তাবিত নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান—ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। একথা দেশবন্ধুকেও জানিয়ে দিলেন।

দেশবন্ধু তাঁর সংকল্পে অটুট। যত বাধাই আসুক, পত্রিকা তিনি প্রকাশ করবেন এবং কর্পোরেশনের কাজ সুপরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রকেই প্রধানরূপে নিযুক্ত করবেন।

এ ব্যাপারে শুধু শাসমল মহাশয় নয়, দেশবন্ধুর কোনো কোনো নিকট আত্মীয় এবং স্বরাজ্যদলের অনেকেই, এমন কি সুভাষচন্দ্রের এক বিশিষ্ট বন্ধু ও ক্ষুব্ধ হলেন এবং গোপনে দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে গুঞ্জন সুরু করলেন।

কিন্তু প্রথম কাজ প্রথমে। ফরওয়ার্ডের প্রস্তাবিত ম্যানেজার মনমোহন বাবুকে দেশবন্ধু বললেন,—সুভাষের দাদা শরৎকে ডাকো; আমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা করবে।

কেন দেখা করবার প্রয়োজন, শরৎবাবু তা কিছুই জানেন না। পরদিন সকালে যেতেই দেশবন্ধু বললেন,

'শোন, ফরওয়ার্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তোমাকেই হতে হবে। যা কিছু করতে হবে সব মনমোহনের কাছে জেনে নিও। সব ব্যবস্থা

শীগ্‌গির করে ফেল, তোমার উপর সব ভার। এ সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিন্ত হতে দাও।'

'আমার একটি কথা। আপনি যখন আদেশ দিচ্ছেন আমার তা পালন করতেই হবে। কিন্তু আমারও ত নানা কাজ। সব সময় সব কাজ দেখা বা করা আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হবে না। বিশেষত টাকা-পয়সা, লেন-দেনের ব্যাপারে। সেজন্য আমি যাকে যোগ্য ও বিশ্বস্ত মনে করব, সেরকম লোককে যদি ম্যানেজার বা অন্য দায়ত্বশীল পদে নিযুক্ত করি তবে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?'

'কিছু না, কিছু না। এটি রাজনৈতিক নয়, ব্যবসায়িক সংস্থা। এর লাভ-লোকসান, সাফল্য-অসাফল্যের দায়িত্ব সব তোমার। এতে তুমি যা ভাল মনে কর, তাই করবে।'

দলের লোক পেলে ভাল, যদি না পাও, নিশ্চয়ই অন্যত্র থেকে বিশ্বাসী, যোগ্য ব্যক্তিকে যে কোনো পদে নিয়োগ করবে।

এইভাবে সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসুকে নতুন ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে অভিষিক্ত করে দেশবন্ধু পত্রিকার সুপরিচালন ও সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন।

এই নতুন ব্যবস্থায় সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়ায় শরৎচন্দ্রের দায় ও দায়িত্ব যেরূপ বৃদ্ধি পেল, আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও তেমনি রহিত হয়ে গেল বরং নানাকাজে ব্যক্তিগত ব্যয় এবং সময়ক্ষেপ হতে থাকল প্রচুর। আইনজীবীদের সাফল্যের প্রধান উপকরণ, নিয়মিত অধ্যয়ন, অনুশীলন ও সময়ের সদ্ব্যবহার। এখন থেকে অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পরিবর্তে পত্রিকা পরিচালনের ব্যবস্থাসাধনে এবং সামান্যতম বাড়তি সময়টুকুও এই সংস্থার কাজে ব্যয়িত হতে থাকল। আর অর্থাগম?

প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে-কোনো উপায়ে কর্মীদের পুরা বেতন দানের ব্যবস্থা ও বড় বড় পাওনাদারদের হিসেব মেটানোর জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জামিনে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হত—অর্থলাভ তা দূরের কথা।

সুখের বিষয়, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর সাফল্যও খুব দ্রুত হয়েছিল।

কিন্তু প্রচারের সাফল্যেই দৈনিক পত্রিকার আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে না। সেকালের দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা সপ্তাহে ছ'দিন প্রকাশিত হত, নিত্য দশ বা বারো পৃষ্ঠা, সপ্তাহের শেষদিন বারো বা ষোল পৃষ্ঠা, প্রতি কপি এক আনা, অর্থাৎ বর্তমানের ছয় নয়া পয়সা।

সেকালে ঐ এক আনা থেকে বিক্রেতাকে কমিশন দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকত, তাতে তখনকার সস্তার বাজারেও বিদেশী কাগজের দাম পুরো উঠতো না।

এর জন্য নির্ভর করতে হত বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর। কিন্তু সেকালে স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল সীমিত—প্রধান প্রধান শিল্পসংস্থা সবই ছিল বিদেশী বণিকের আয়ত্বে। তাদের উচ্ছেদের সংকল্পধারী স্বদেশী পত্রিকাগুলিতে তারা কেন বিজ্ঞাপন দেবে?

অবশ্য কোনো কোনো ব্যবসায়ী বলেন আমাদের উদ্দেশ্য পণ্যবিক্রয়—রাজনীতি নয়।

যে কাগজের প্রচার সর্বাধিক, তাতে বিজ্ঞাপন দেওয়াই আমাদের স্বার্থের অনুকূল—সেজন্য বেশী প্রচারের পত্রিকার আনুকূল্য বিবেচনা করা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী। তাছাড়া যারা নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ তৈরী ও বিক্রয় করেন—যেমন, কাপড়, জামা, জুতো, সাবান, সেন্ট, তেল, ঘি, বই, কাগজ, পেনসিল, কলম ইত্যাদি তাদের পক্ষে ত' পত্রিকার প্রচারই প্রধান বিবেচ্য।

তবু সব ব্যবসায়ীকেই সর্বাগ্রে মানতে হয় সরকারী (অর্থাৎ সরকারের বড় কর্তাদের) 'অনুরোধ'—যা হুকুমেরই নামান্তর।

এই বড় কর্তাদের প্রধান হলেন পুলিশ কর্তা, কলকাতার পুলিশ কমিশনার। এঁর ইচ্ছায় সারা সহর চলে বা অচল হয়। যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যে কোনো উপলক্ষ্যে হেয় বা নিগৃহীত করবার নানা ফন্দী এর করতলগত।

এহেন ব্যক্তি যদি বলে বসেন, ঐ পত্রিকাখানি স্বদেশী; ওতে বিজ্ঞাপন না দিয়ে, অন্য আর একখানা বা একাধিক পত্রিকায় দেওয়াই ভাল, তবে ব্যবসায়ীরা কি করবেন? এজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বহুল প্রচারিত স্বদেশী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিতে বিরত থাকতেন।

তাছাড়া আরো একটি সমস্যা। যে পত্রিকা সর্বদা প্রচার করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করুন, বিদেশী বর্জন করুন—সে পত্রিকায় কোন্ যুক্তিতে বিদেশী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব?

ফলে, কয়েকটি স্বদেশী ব্যাংক, জীবনবীমা কোম্পানী, যন্ত্রপাতি নির্মাতা, চা-কোম্পানী, প্রসাধন নির্মাতা, বস্ত্র, পোষাক ও ঔষধ প্রস্তুতকারক, থিয়েটার ও সিনেমা—এরাই ছিল প্রধান বিজ্ঞাপন-দাতা। সব পত্রিকাতেই এদের বিজ্ঞাপনের চাহিদা। সেজন্য বিজ্ঞাপন প্রদানে যেমন, উহার মূল্যবাবদ অর্থদানেও তেমনি, এদের ছিল অত্যন্ত অমীহা। ব্যবসায়িক লেন-দেন নয়, দাতা ও গ্রহীতার মনোভাব নিয়েই এ সব বিজ্ঞাপনের 'কারবার' চলত।

এরূপ "দানের" উপর নির্ভর করে কোনো প্রতিষ্ঠানই সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব নয়।

মাসের শেষে যখন নির্দিষ্ট ব্যয় অবধারিত, আয়ের আনুমানিক হিসেব তখন পর্যাপ্ত হলেই চলে না। আদায়ও নিশ্চিত হওয়া চাই।

কিন্তু তা কখনো হয় না। দাতা ও গ্রহীতার মনোভাবই এর প্রধান অন্তরায়।

এ অবস্থায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর—যিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী, তিনি কর্তব্য-নিষ্ঠ হলে, তাঁকে সর্বস্বান্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে কি?

শরৎচন্দ্রের যোগ্যত ও কর্তব্যবুদ্ধি উপলব্ধি করেই দেশবন্ধু তাঁর উপর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রও এ দায়িত্ব পালনে সর্বস্ব-পণ করেছিলেন। তার ফলে সাফল্য ও খ্যাতি কম অর্জন করেন নি। যে-কোনও সংস্থার প্রথমাবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়েও যিনি অকুতোভয়ে কর্তব্য পালনে অগ্রসর হন, তিনিই যদি বীররূপে গণ্য হন, তবে শরৎচন্দ্র ছিলেন অসামান্য বীর। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সর্বদা উৎসাহী, আশাবাদী ও আগ্রহশীল। আইন-জীবী রূপে তাঁর জীবনে সাফল্য এসেছিল। সংবাদ-

পত্র পরিচালনে সাফল্য ও সুখ্যাতি তাঁকে জনগণ-মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসনে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করেছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি যে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাতেই প্রমাণিত হয় তাঁর খ্যাতি দেশের সর্বত্র কিরূপ ব্যাপ্ত হয়েছিল। এতে ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেডের সাফল্যময় পরিচালনের অবদান যে কম নয়, তা স্বীকার করতেই হবে।

বলা বাহুল্য শরৎবাবু তাঁর সকল কাজে ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের সকলের কাছ থেকেই অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার, নাড়াজোলের দেবেন্দ্র লাল খাঁ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা—এ ছাড়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বোর্ডে ছিলেন। এ ছাড়া এটর্ণী ছিলেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়—যাঁকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে প্রাত্যহিক বিরোধের সম্মুখীন হবার ও আনুসঙ্গিক সর্ববিধ ব্যবস্থা-সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।

প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকে যতই সুনাম ছড়িয়ে পড়ল, পরিচালকদের বিপদ ততই ঘনীভূত হতে শুরু করল। বিপদ সরকারপক্ষীয়দের দিক থেকে। তারা এ পত্রিকার সাফল্যে শুধু যে নিজ নিজ ব্যর্থতায় ব্যথিত হলেন তা নয়, একমাত্র ফরওয়ার্ড গোষ্ঠীর ধ্বংসেই যে তাদের স্থিতি এবং সাফল্য নিহিত তা অনুভব করে, নানা অপপ্রচার ছাড়া, ডিরেক্টর-বোর্ডের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির নানা অপকৌশল অবলম্বন করলেন।

এ অপকার্যের নায়ক পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এবং তাঁর পোষ্য, অনুগত স্তাবক ও সেবকের দল, যাদের একমাত্র অভিসন্ধি—যে কোনো উপায়ে ফরওয়ার্ড-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে বিরূপতার সৃষ্টি। তজ্জন্য নেতৃবর্গের ব্যক্তিগত চরিত্রে কুৎসা-লেপন করা ছাড়াও হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত নানাভাবে পরিচালন, এ দলের উপজীব্য হয়েছিল। ফরওয়ার্ড গোষ্ঠীকে সাহায্যকারীদের অনুরোধ-উপরোধে বিরত ও বিব্রত করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, নানা প্রলোভনের দ্বারও উন্মুক্ত করা হত।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেডের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের চক্রান্ত যে তখন কিরূপ সুবিস্তৃত ছিল, এ থেকে তা উপলব্ধি হবে।

সে সময় শীতকালে, বিশেষত ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বড়লাট বাহাদুর সাঙ্গপাঙ্গ সহ কিছুদিন অবস্থান করতেন এবং নাচ, গান, ঘোড়দৌড় ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে যোগদান করতেন। এজন্য বড়লাট ও তাঁর অনুচরবৃন্দ ছাড়াও তদানীন্তন রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ ত' বটেই, ভারতের নানা প্রান্তের বহু রাজন্য কলকাতায় বড়লাটের আসর জমজমাট করতে শুভাগমন করতেন।

এরূপ আষ্টবজ্র সম্মেলনেই হল বণিক ও ব্যবসায়ীদের সুবর্ণ সুযোগ। তারাও আসতেন দলে দলে এবং একসঙ্গে এতগুলি প্রভাবশালী ও

ধনপতি ব্যক্তির সান্নিধ্য ও কৃপালাভের সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশী ব্যবসায়-সংস্থার বড় বড় ডিরেক্টর, ম্যানেজার বা প্রতিনিধিরাও এই সময়েই কলকাতায় তাদের নিজ নিজ ব্যবসায় কর্মের পর্যবেক্ষণে এবং আগামী বছরের কার্যসূচী নির্দ্ধারণের জন্য সভা-সমিতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসতেন।

এইরূপ একটি সুবৃহৎ আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের প্রাচ্যদেশীয় বড়কর্তার কলকাতায় আসবার কথা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। থাকবেন তিনি ফরওয়ার্ড কার্যালয়ের পাশেই—গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে।

ডাকবিলির ভুলে ঐ অনাগত ভদ্রলোকের নিকট পাঠানো এক চিঠি ফরওয়ার্ড আপিসে বিলি হয়। আপিসের ডাক বিভাগ যথারীতি অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ফরওয়ার্ড ম্যানেজারের কাছে ঐ চিঠিখানিও পাঠিয়ে দেন।

ম্যানেজার চিঠিখানা পড়েন। লিখেছেন বোম্বাই-এর এক সুপরিচিত বিদেশী বিজ্ঞাপন এজেন্সী—এরা ফরওয়ার্ডেরও স্থানীয় এজেন্টরূপে কাজ করেন।

লেখা হয়েছে আমেরিকার একটি সুপরিচিত ফাউন্টেনপেন নির্মাতা ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রাচ্য-দেশীয় ম্যানেজারকে—যাঁর ঐ গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে থাকবার কথা।

চিঠির মর্মার্থ এই যে, আপনার ফরওয়ার্ড পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রচারের ইচ্ছা জানিয়েছেন, তা বর্তমান অবস্থায় সঙ্গত হবে না। ঐ পত্রিকায় প্রচার বেশী সত্য; তবে ফরওয়ার্ড সরকার-বিরোধী ও বর্ণ-বিদ্বেষী। ইয়োরোপীয় ও আমেরিকানদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করাই ওদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এরূপ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিয়ে অন্যান্য সরকারী সহযোগিতাকামী পত্রিকায়, দেওয়াই সঙ্গত।

এরূপ অপপ্রচার শুধু বোম্বাই থেকে নয়, কলকাতায়ও বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃথক পৃথকভাবে টেলিফোনে বা আলাপ আলোচনার মারফৎ 'অনুরোধ'-এ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ফরওয়ার্ড ও সংশ্লিষ্ট বাঙ্গলা সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন না দিয়ে কোন কোন বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে 'অনুরোধ' করা হয়েছে।

এ সব 'অনুরোধ'-এর পরোক্ষ প্রয়োগকর্তা যে পুলিশ কমিশনার, তা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকেই জানা গেছে।

এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ফরওয়ার্ড-এর প্রভাব বা প্রচার ক্ষুণ্ণ করা সরকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং মাঝে মাঝেই সরকারী গোপন খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সরকার পক্ষকে নানাভাবে বিব্রত হতে হয়েছে।

* * * *

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি করবার পর বাঙ্গলাদেশের সর্বত্র পুলিশী থানা-তল্লাস, ধরপাকড় ও নানা অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রায় পাঁচশো স্থানে খানাতল্লাসীর নামে নানা পুলিশী নির্যাতন চলে। ৭২ জন যুবককে অতর্কিতে এবং বিনাবিচারে বন্দী করে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য নানা জেলে আটক রাখা হয়। এদের

মধ্যে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেক প্রবীণ ও বহু-নির্যাতীত পুরাতন রাজবন্দীও ছিলেন।

এর প্রতিবাদে দেশময় যে তীব্র আন্দোলন সুরু হয়, ফরওয়ার্ড পরিচালকগণই তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাঙ্গালার লাট লিটনকেও এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার আন্দোলন সুরু করা হয়।

সে সময় লিটন-স্তাবকের দল তাঁর কার্যকাল আরো পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেবার জন্য পুনর্নিয়োগ প্রার্থনা করেন।

ফরওয়ার্ড এর জবাবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, "I ord Lytton must Go."—লর্ড লিটনকে যেতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় আন্দোলনও সুরু করা হয়। ফরওয়ার্ডের সুদৃঢ় মতবাদ প্রচারে অন্যান্য প্রদেশেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লর্ড লিটনকে চলে যেতেই হয়। ১৯২৬ সালের ৩১ মার্চ তার কার্যকাল শেষ হয়।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলার লাট সাহেবের কার্যভার গ্রহণ করেন সার ষ্ট্যানলি জ্যাক্সন।

এর পূর্বে ইংলণ্ডে তিনি কোনো রাজনৈতিক দলাদলিতে ছিলেন না— অন্য কোথাও লাটগিরিও করেন নি।

সাধারণ উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। ছাত্রাবস্থায় ক্রিকেট খেলায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঐ পর্যন্ত।

তবে, এদেশে আসবার পূর্বে তিনি যে বাংলা-দেশের সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে এক নতুন পন্থা স্থির করে এসেছিলেন, তা তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল।

বিগত দু'বছরে, বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারির পর হতেই, লর্ড লিটনের বেনামীতে টেগার্ট সাহেবই সারা বাংলায় সন্ত্রাসের শাসন পরিচালন করেছেন। খানাতল্লাসীর নামে বাড়ী বাড়ী পুলিশের হামা ও নানা অত্যাচার চলছে। কোন্ যুবক কখন ধরা পড়বে, কোনোই স্থিরতা নেই।

সার স্ট্যানলি লাটভবনে আসীন হবার কদিন পরই এক সন্ধ্যায় তাঁর এক সেক্রেটারী সাধারণ ভদ্রবেশে ফরওয়ার্ড আপিসে সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করলেন।

তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং জানালেন, বর্তমান পরিস্থিতি সত্বর পরিবর্তনের আশায় নতুন লাটসাহেব সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করেন। সেজন্য তিনি লাটসাহেবের শুভেচ্ছা বহন করে এনেছেন এবং জানতে চাইছেন এক গোপন (private) চা চক্রে যোগদান তাঁর পক্ষে (অর্থাৎ ফরওয়ার্ড সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়ের) সম্ভব হবে কি? এ অনুষ্ঠান শ্রীযুক্ত বক্সীর ইচ্ছানুসারে যে কোনো স্থানে, যে কোনো দিনে ও সময়ে হতে পারে। শ্রীযুক্ত বক্সী যাকে যাকে বলবেন, মাত্র তাদেরই আমন্ত্রণ করা হবে।

বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত বক্সী ধন্যবাদের সঙ্গে নতুন লাটসাহেবের এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানান, পুলিশী অত্যাচার, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও অনির্দিষ্টকালের জন্য যুবকদের কারা-বাসের ফলে দেশে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সন্তোষজনকভাবে

দূর করা না হলে, শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন কখনই সঙ্গত নয়। এবং কিভাবে তা সম্ভব, তা প্রায় প্রতিদিনই ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। নির্বিচারে বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, বে-পরোয়া খানাতল্লাসের নামে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত ও আইনানুযায়ী শাস্তি-প্রাপ্ত বন্দীদের সাধারণ কায়েদী পর্যায় ভুক্ত না করে, বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে এবং তাদের কায়িক ও মানসিক উন্নতি বিধানের বিবিধ অবস্থা অবলম্বন করতে হবে, ইত্যাদি।

সর্বাগ্রে চাই বর্তমানে বিনা বিচারে বন্দীদের মুক্তি এবং সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগ ও কাগজ-পত্রের ব্যাপক প্রকাশ।

এ হল অত্যাবশ্যকীয় এবং আশু কর্তব্য। এ কাজ সম্পাদন করা হলে তবে অন্যান্য উন্নতি-বিধায়ক প্রস্তাবের আলোচনা সম্ভব।

লাটসাহেবের সেক্রেটারী মহোদয় সব কথা শুনে, ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে গেলেন।

আবার এলেন দুতিন দিন বাদে। এবারে লাটসাহেবের নয়, লাট-গিন্নী লেডী জ্যাকসনের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর আগমন।

জানালেন, লেডি জ্যাক্‌সন তাঁর নিজের পাঠের জন্য প্রত্যহ সকালে এক কপি করে 'ফরওয়ার্ড' চান। যে কাগজ নিয়মিত লাটভবনে যায়, তা আপিসেই যাবে। লেডি জ্যাকসনের কাছে পৌঁছায় না।

সেজন্য তাঁর অনুরোধ, প্রত্যহ প্রাতে, লাট-প্রাসাদের পূর্বদিকের দ্বিতলে, লেডি জ্যাক্‌সনের নিজস্ব পাঠ কামরায়, ফরওয়ার্ডের পিয়ন যেন নীচের 'লন' থেকে ছুঁড়ে কাগজখানা দোতলার জানলা দিয়ে ফেলে দেয়। এর জন্য যা খরচ তার জন্য বিল পাঠাতে হবে না, সেক্রেটারী সাহেব এখনই দেবেন।

মোট কথা, লেডী জ্যাক্‌সনের এতাহ প্রত্যুষে ঘরে এক কপি করে ফরওয়ার্ড চাই।

এ কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। স্থির হল পরদিন থেকেই এ ব্যবস্থা করা হবে।

সেক্রেটারী সাহেবের আর একটি অনুরোধ। লেডি জ্যাক্‌সন জানতে চেয়েছেন তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে যদি মিঃ বক্‌সীকে চা-পানে আমন্ত্রণ করেন তবে তাঁর কি আপত্তি আছে? লাটসাহেব সম্বন্ধে যে-আপত্তি, লেডি জ্যাক্‌সনের আমন্ত্রণেও কি তা প্রযোজ্য হবে?

শ্রীযুক্ত বক্‌সী দুঃখের সঙ্গে জানালেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ আমন্ত্রণের জন্য তিনি লেডি জ্যাকসনের কাছে কৃতজ্ঞ।

এর পর নতুন লাটসাহেব কাজ সুরু করলেন। তিনি সরকারী স্বরাষ্ট্র বিভাগে নির্দেশ দিলেন, যে-হেতু ধর-পাকড় এবং খানাতল্লাসী সম্বন্ধে নানা অভিযোগ ও বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে, সেজন্য তিনি এ সম্বন্ধে সব 'ফাইল' নিজে দেখতে চান।

অতএব অর্ডার দেওয়া হল, অবিলম্বে ধর-পাকড় ও খানাতল্লাসী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ও ফাইল ইত্যাদি তাঁর ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য লাটসাহেবের কাছে পাঠানো হোক্।

লাটসাহেব সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও তথ্যাদি অনুসন্ধান করতে করতে দেখলেন ফরিদপুরের

একস্থানে খানাতল্লাসী করে যে নম্বরের যেরূপ রিভলভার পাওয়া গেছে, এবং যার জন্য একাধিক স্থানীয় যুবককে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়েছে, কলকাতার আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের এক বস্তী খানাতল্লাসী করে ঠিক একই নম্বরের অনুরূপ রিভলভার পাওয়া গেছে এবং এখানেও সন্দেহবশে কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আটক রাখা হয়েছে।

এ কি করে সম্ভব হল ?

একই নম্বরের একই প্রকারের রিভলভার অর্থাৎ একটি অস্ত্রই, ফরিদপুর ও কলিকাতায় দুই স্থান থেকে কি করে পাওয়া সম্ভব, তা জানবার জন্য লাটসাহেব পুলিশকর্তাকে তলব করলেন। জানতে চাইলেন, একটি অস্ত্র সম্বন্ধে যদি এরূপ ভুল হয়, তবে অন্যান্য বিবরণ যে সঠিক, তা বিশ্বাস করবার কোনো সঙ্গত কারণ আছে কি ?

লাটসাহেব এখন থেকে নিজে রাজনৈতিক বন্দী সংক্রান্ত সকল 'ফাইল' পরীক্ষা করে দেখবেন স্থির করলেন এবং তাঁর নির্দেশ ব্যতীত ভবিষ্যতে আর খানাতল্লাসী বা গ্রেপ্তার করা হবে না জানালেন।

সার স্ট্যানলি কার্যভার গ্রহণের পর-পরই এ নির্দেশ দেওয়ায় বাংলার পুলিশমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল।

তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ এ চাঞ্চল্যকেও ছাড়িয়ে গেল—পুলিশ মহলে আতঙ্কের কালো মেঘ নেমে এল।

১৯২৭ সালের মার্চ মাসের শেষে লর্ড লিটন এ দেশ ত্যাগ করেন। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মান্দালয় জেলে বন্দী সুভাষচন্দ্র বিপুল ভোটাধিক্যে উত্তর কলকাতা অ-মুসলমান কেন্দ্র থেকে সহযোগিতা-পন্থী উদারনৈতিক দলের প্রার্থী, প্রবীণ স্থানীয় নেতা যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পরাজিত করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তিদানের প্রস্তাব বার বার ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত ও ভোটাধিক্যে গৃহীত হবার পরও সরকারপক্ষ অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। শুধু বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নয়, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টেও অনুরূপ প্রস্তাব জয়লাভ করে। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার কোনই পরিবর্তন হয় না।

অবশেষে কারারুদ্ধ এবং অত্যন্ত অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে ভোটাধিক্যে নির্বাচন যুদ্ধে জয়ী করার, এবং সম্ভবত ; জনসাধারণের দাবী আর প্রত্যাখ্যান অসঙ্গত মনে হওয়ায় বাংলার তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র-সচিব মি. মোবার্লি কয়েকটি সর্তাধীনে, উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য, রুগ্ন সুভাষচন্দ্রকে মুক্তিদানে সম্মত হন।

অন্যান্য সর্তের সঙ্গে এও ছিল যে,

যদিও সুভাষচন্দ্র অত্যধিক পীড়িত বা একেবারে কর্মশক্তিহীন হন নি, তবু সরকার চিকিৎসার জন্য তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে দিতে পারেন, যদি তিনি 'ভদ্রলোকের কথা' দেন, যে তিনি যাবার পূর্বে,

ক. কোনো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলবেন না বা স্বগৃহে গমন করবেন না ;

খ. যে জাহাজে তিনি যাবেন, তা কোনো ভারতীয় বন্দরে নোঙ্গর করবে না ;

গ. নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হলেও যতদিন বেঙ্গল অর্ডিনান্স আছে, ততদিন দেশে ফিরবেন না, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র এ সব সর্তে বিদেশে গিয়ে নির্বাসিত হতে রাজী হন নি।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা, মিছিল ও রোগমুক্তির জন্য পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদি হতে থাকল।

এমনি পরিস্থিতিতে এলেন নতুন লাট সাহেব। ইতিমধ্যে ডাঃ সুনীল বসু একাকী ভ্রাতা সুভাষ-চন্দ্রকে মান্দালয় জেলে রোগ নির্ণয় কল্পে নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানালেন, উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে তাঁকে জেল থেকে স্থানান্তরিত করে কোনো স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

সার স্ট্যানলি ডাঃ নীলরতন সরকারের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ইয়োরোপীয় চিকিৎসককে পাঠালেন মান্দালয় জেল-এ সুভাষচন্দ্রকে পরীক্ষা করতে। তাঁরাও ডাঃ সুনীল বসুর অনুরূপ মত প্রকাশ করলেন। সুভাষচন্দ্রকে যে অবিলম্বে মান্দালয় থেকে স্থানান্তরিত করে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে আর মতভেদ রইল না।

কিন্তু কবে, কোথায় কে নিয়ে যাবে তাকে? মিঃ মোবার্লি সরকারপক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সুভাষচন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দেশবাসী যখন এই দুঃশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছেন তখন জুন মাসের শেষাশেষি খবর পাওয়া গেল সুভাষচন্দ্রকে স্টীমার যোগে রেঙ্গুণ থেকে কলকাতায় আউটরাম ঘাটে এনে, সেখান থেকে লাট সাহেবের নিজস্ব লঞ্চে চড়িয়ে বারাকপুর লাট ভবনের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেখান থেকে কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের গৃহে লাট সাহেবের মোটরেই তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং জানানো হয় সুভাষচন্দ্র এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

মাত্র একমাস পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ মোবার্লি যে সব সর্তাধীনে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তির নামে চির-নির্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, নতুন লাট সাহেব তা শুধু সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেই দিলেন না, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে এবং নিজস্ব ব্যবস্থানুযায়ী শুধু বাংলার এই অবিসম্বাদী জন-নায়ককে নয়, অন্যান্য প্রায় সকল রাজবন্দীকেই মাসাধিককালের মধ্যেই বিনা সর্তে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করলেন।

কার্যভার গ্রহণের মাত্র দু'মাসের মধ্যে পূর্ব-ঘোষিত সকল নির্দেশ নাকচ করে রাজবন্দীদের সরাসরি মুক্তি দেওয়ায় যে সাহস ও কর্তব্যবোধ সার স্ট্যানলি দেখালেন, বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে।

এইভাবে বাংলাদেশে লর্ড লিটন ও টেগার্টের অত্যাচারী শাসনের কিঞ্চিৎ উপশম হল।

সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে হিন্দু-মুস্লিম প্যাক্ট প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু এ প্যাক্ট কার্যকরী করার চেষ্টায় কোনো পক্ষেরই তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। দেশবন্ধু নিজেও এনিয়ে আর তেমন আগ্রহ দেখালেন না।

এর প্রধান কারণ এই যে স্বরাজ্যদলের এক বৃহৎ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী, যাকে বলা চলে রাঢ় দেশের দল, তাঁরা এ প্যাক্টের উপযোগিতা বুঝলেন না, বা বুঝতে চাইলেন না।

পুরো বাঙ্গলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে যত অধিকসংখ্যক মুস্লিম ও হিন্দু-সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর বাস, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে, তথা রাঢ়দেশে সেরূপ নয়। সেজন্য সাম্প্রদায়িক সমস্যা উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে যেরূপ জটিল, পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের কিয়দংশ, ২৪শ পরগণার ও খুলনা, যশোরের কিছু অংশ ব্যতীত অন্যত্র তেমন নয়। অবশ্য, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর এবং বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার অনেকাংশেই আদিবাসী ও সাঁওতালদের বিশেষ সমস্যা আছে, যেমন আছে বর্তমানের উত্তর বঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীদের নানা সমস্যা। কিন্তু আজ পর্যন্ত সহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ সমস্যা তেমনভাবে আঘাত হানেনি, সেজন্য আকৃষ্টও করে নি।

সেজন্য রাঢ়দেশের শিক্ষিত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা তেমন উপলব্ধি করতে পারেন না। পক্ষান্তরে, উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসিদের নিত্য এর উত্তাপ সহ্য করতে হয়।

ও অঞ্চলেই প্রতি গ্রামেই উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন —তিন শ্রেণীর বসবাস পাশাপাশি। একজনের সহযোগিতা ব্যতীত অপরের দিন চলে না। একজন আঘাত পেলে তার প্রতিক্রিয়া অপরকেও ভুগতে হয়।

এ জন্য ওখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসেব স্থির না রাখলে ভারসাম্য বজায় থাকে না। সন্দেহ' অবিশ্বাস, মারামারি, কাটাকাটিতে সকলেই বিপন্ন হয়।

পশ্চিমের অধিবাসীরা এ সাম্প্রদায়িক তীব্রতা থেকে মুক্ত। সেজন্য তারা কোনোরূপ চুক্তির উপযোগিতা মানেন না, বরং মনে করেন চুক্তি করলেই অচিরে তা দাবীতে পরিণত হবে এবং তা থেকে সুরু হবে নিত্যই কলহ, অবিশ্বাস, সন্দেহ ও সংঘাত।

পরবর্তীকালে ঘটনাবলী, মুসলিম্ লীগের আবির্ভাব, সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা-বৃদ্ধি, বার বার খুন, জখম, হানাহানি; অবশেষে দেশবিভাগ এবং দেশের একাংশ থেকে এক সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের প্রয়াস—এ থেকে কি মনে হয় না, শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি প্যাক্টের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলতাম, তাহলে পরবর্তীকালের অঙ্গচ্ছেদ হয়তো বা প্রয়োজন হত না, হয়ত দেশবন্ধু পরিকল্পিত প্যাক্ট-এর সাহায্যে অবিভক্ত বাংলায় সুশাসন প্রবর্তন করা সহজ ও সম্ভব হত?

সাধারণভাবে স্বীকৃতি না পেলেও দেশবন্ধু তাঁর নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারেই জনসেবার কাজ চালিয়েছেন।

স্বরাজ্যদল কর্তৃক কলকাতা কর্পোরেশনের কার্যভার গ্রহণের পর দেশবন্ধু মেয়র নির্বাচিত হলেন, ডেপুটি মেয়র হলেন তরুণ ব্যারিস্টার শহীদ সুরাবর্দী সাহেব। এইভাবে, কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারেও দেশবন্ধু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যানুপাতিক সমতা বজায় রাখতে ব্যগ্র ছিলেন।

এই নীতি যথোচিত উদারতার সঙ্গে অনুসৃত হলে যেরূপ সুফল আশা করা যেত, কার্যত তা হয়নি, ফলও প্রত্যাশানুযায়ী হয় নি—এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

এই অনুদার মনোভাবের বিস্ময়কর পরিণতিতে আজ আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আজ নিরর্থক।

দেশ বিভক্ত হয়ে গেছে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী নিঃস্ব, কৃপাপ্রার্থী হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ফিরে অবাঞ্ছিত, অনাত্মীয়ের জীবন যাপন করছে; অনুরূপভাবে পশ্চিমাঞ্চল থেকেও সংসার উঠে গেছে উত্তর বা পূবে। তারাও কি সুখে আছে, না শান্তি ফিরে পেয়েছে?

রাজনীতিতে এক একটি চালের উপর সমগ্র জগতের ভাগ্য নির্ভর করে। আজো মনে হয়, অহিংস, আপস-আলোচনায় অগ্রসর না হওয়া কি রাজনৈতিক দূর-দৃষ্টি প্রসূত, না নিজের দুর্বলতার অক্ষম স্বীকৃতি?

চৌরী-চৌরার পূর্ব পর্যন্ত, ভারতের ভাবী-সম্রাটের কলকাতায় নিরুপদ্রব অভ্যর্থনা আশ্বাসের বিনিময়ে, তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিডিং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজির মাধ্যমে কারাবন্দী দেশবন্ধুর কাছে, ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা সাধনের প্রস্তুতিকল্পে, অচিরে গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বানের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং যে প্রস্তাবে তাঁর ব্যক্তিগত সম্মতি জানিয়ে দেশবন্ধু সমগ্র গণ-আন্দোলনের নায়ক গান্ধীজীর অভিমত গ্রহণের জন্য মালব্যজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন; আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি এবং তাদের পরামর্শ ব্যতিরেকে যে অনুরোধ রক্ষায় গান্ধীজী অক্ষমতা জানিয়েছিলেন; যদি তা না হত, গান্ধীজী যদি ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিতেন, তবে বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদিত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হয়ত আরো পঁচিশ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও শত শত শহীদের প্রাণ-ত্যাগের প্রয়োজন হত না।

পক্ষান্তরে এও বলা চলে, পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও তৎসম্পর্কীয় বৈঠকের অধিবেশনে সম্মত হবার পর যদি চৌরি-চৌরার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত এবং বড়লাট বাহাদুর যদি ঐ ঘটনার ওজুহাতে পূর্বঘোষিত বৈঠকের প্রস্তাব বাতিল করে দিতেন, তাহলেই বা কি হত?

এ সকলই এখন অনুসরণ সাপেক্ষ তবে সামান্য একটি হাঁ বা না-এর শক্তি যে কত অসামান্য, এ তারই একটি উদাহরণ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

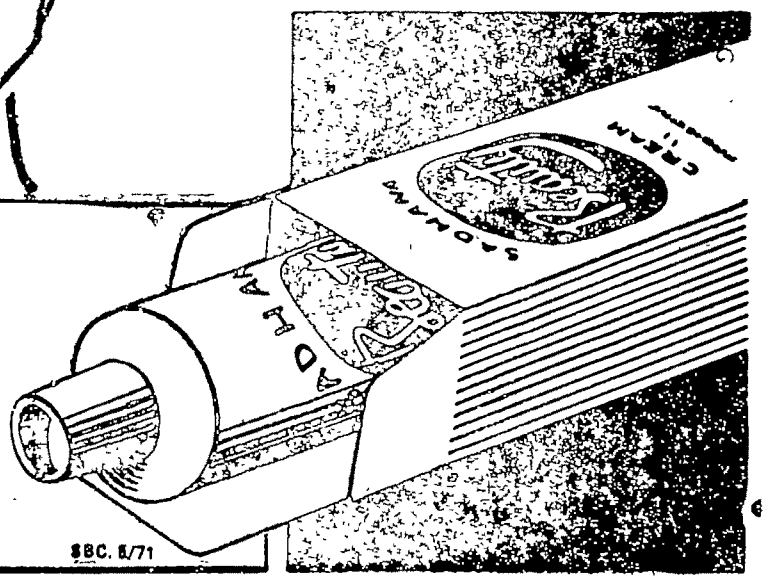

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

শকুন্তলা

সুধাংশু দাশ

শকুন্তলা, বকুলতলা দিয়ে চলো কথা আছে।
এক দিন এইখানে অনেক নির্জনতা ছিল—
বাতাসের শব্দ ছিল—পাখিদের সুর ছিল—
গাছের পাতার ভিতর আরো ঢের সফলতা ছিল
ছিল চাঁদ, সূর্য, ছায়া—আরো অনেক নক্ষত্র ছিল।
অনেক নিসর্গ ছিল পৃথিবীর কাছে।

অনেক নিসর্গ চলে গেছে পৃথিবীর থেকে
বহুদিন হলো। বহুদিন হলো একটা বকুল গাছ এই খানে
নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল—আজ নেই।
আমার অনেক ঋণ থেকে গেছে—কেটে গেছে
কুড়িটা বছর। আমার কুড়ি বছরের ছেলেবেলা সেই।

কতবার হেঁটে গেছি—কতবার দেখে গেছি
ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাখা কিংবা ঝাঁ ঝাঁ রোদ দুপুরবেলা
বকুল বিছানো গাছতলা—আমি একা।
একদিন আমার জীবনে সত্য ছিল—স্রষ্ট ছিল
অন্ধকারে এই পথে পথ হাঁটা।

মনে পড়ে, এক আকাশ অন্ধকার দেখেছিলাম এইখানে
দেখেছিলাম এক আকাশ আলো;—
সপ্তর্ষি তারার তিমির আমার দুচোখ কতবার
কেড়ে নিয়েছিল।

একদিন আমার জীবনে ধ্রুব সত্য ছিল এই সব অনুভব
ছায়া নির্জনতা আলো।
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি—এই এখানেই—যেন—তোমাকেই
ছুঁয়ে গেছি—তোমার নরম হাতের মতন
নুয়ে পড়া বকুল পল্লব। অসম্ভব ভালো।

নিবিড় হবার সাধ সৃষ্টির আদিতে ছিল—এখনো আছে।
নিবিড় হবার স্থান পৃথিবীর কোনখানে নেই—
কোনখানে নেই পাখীর নীড়ের শান্তি শান্ত দেশ।
প্রয়োজন থেকে গেছে তবু।

অনেক নিসর্গ ছিল
অনেক নিসর্গ চলে গেছে।

অন্ধকারে জোনাকীরা একদিন জ্বলে যেত এইখানে,
জ্বলে যেত সারারাত।
কোন কাজ নেই ভেবে বহুদিন হলো তারা চলে গেছে
আর কোন প্রান্তরের দিকে অতিদূর অন্ধকার ডাকে।
তাদের জ্বলন্ত মুখ খুঁজে আর পাবে না এখানে
পাবে না কোথাও।

এখানে এখন বিজলী বাতির আলো কত ভালো!
হাঁটলেই লোক—লোকেদের মাথা—
নিরালোক অন্ধকার আজ আর ছুঁয়ে নেই কেউ।
কেউ আর পথ হাঁটে নাকো একা।
তাকিয়ে ছাখো, চারিদিকে আলো আর আলো
লোকেরা নিবিড়।

তবু ভিড়, অস্থিরতা, ভয় লোকেদের আলোচনার বিষয়
কারো চোখে ভাল করে ঘুম নেই।

কেন নেই ? কেন এই বিফলতা ? শতাব্দীর সফলতা নেই ?
শতাব্দীর সফলতা আছে। তবু এই শতাব্দীর পৃথিবীতে
বিজ্ঞানের আলো হৃদয়ের আলো ছাড়া অন্ধকার
গভীর গভীরতর প্রমাণিত সত্য হয়ে গেছে।

সময়ের তুঙ্গে উপনীত হয়ে সভ্যতার পরিমাপ নিতে এসে
অনেক মনীষী আজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে—প্রশ্ন তোলে
নিজেদের কাছে। জীবনের সোনালী সৈকত চোরাবালি
নয়তো ?—উত্তর মেলে নি। মিলেছে হয়তো।

শতাব্দীর সফলতা মেনে নিয়ে—মানুষের প্রতিভাকে
ধন্যবাদ দিয়ে তবু বলে যেতে হয়
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সে এক অদ্ভুত দেশ বিপন্ন সময়।
—বকুলতলার আদি নির্জনতা, অন্ধকার ছিল যেন ভালো।
তাকিয়ে ছাখ আকাশে তারার লগন
আকাশের নিচে পৃথিবীর বিষণ্ণ মুখ বিরস বদন এখন।

অনেক শতাব্দী পার হয়ে এসেছি আমরা
অনেক শতাব্দী পার হয়ে যাবো
আজকের এই পথ হাঁটা এখনই ফুরিয়ে যাবে
তবু ফুরোবে না—

ফুরোবে না তোমার আমার পৃথিবীর পুরোনো হৃদয়
হৃদয়ের গভীর গভীরতর নক্ষত্র লগন।
জেনো, জীবনের শান্তি, সফলতা প্রেমে শেষ সত্য হবে।

স্বদেশ

মনোরমা সিংহরায়

যতোই তোমাকে জানছি
ততোই দেখছি তোমার করুণ মুখ
যতোই দেখছি কৃষ্ণচূড়ার হাসি
রাধাচূড়ার সাজ
কাঠ-চাঁপা আর স্বর্ণচাঁপার
ফুটন্ত ফুলের উৎসব
সব ছাপিয়ে কেন দেখতে পাই—
তোমার সজল চোখ
তোমার বেদনা আর কতো লুকিয়ে চলবে ?

হোটেলে হোটেলে মত্ত উল্লাস
ফুটপাথে অনাহারী ছেলে মেয়েরা
চতুর্দিকে সাজপোষাকের ঝলমলাদিরূপ
বস্ত্রহীন দীনদুঃখীর সজল চোখ
তোমার চোখের জল মুছবে কী করে ?

নদীর ধারে বসে নদীর ছলছলানি শুনি
মনে হয় তোমার চোখেই বান ডেকেছে বুঝি
নৌকো চলে ভাটিয়ালী গান গায় মাঝি
মনে হয় কে যেন কিছু পায়নি, খাওয়া
জোটেনি ভিক্ষে করেও
ফুটপাথে রাস্তায় বাড়ীতে বারান্দায়
এদের পেরিয়ে কোথায় যাবো ?
তোমার সজল চোখ ভুলতে পারি না যে ॥

শহীদ অনিল দাস

জন্ম : ১৮ই জুন, ১৯০৬
২৩ হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড)
কলিকাতা

মৃত্যু : ১৭ই জুন, ১৯৩২
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল

বিশ দশকের ঢাকা শহর। শহরের এক প্রান্তে বক্সীবাজার পল্লীতে ঢাকায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিনই আনাগোনা চলতে দেখা যায়। মেধাবী বললেই তাদের সম্বন্ধে সবটা বলা হোলো না। শারীর-চর্চা; জনসেবা, পল্লীর অসামাজিক ও অশুভ শক্তি-গুলিকে দমন করে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রচনার দিকেও তাদের অখণ্ড মনোযোগ ছিল। ডনখানায় ডন-কুস্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে ছেলেদের মিলিত সমাবেশ ও তাদের অস্ফুট আলোচনা ঢাকা শহরে সে-দিন এক রহস্যময়তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো।

ঢাকা শহরে সেদিন যারা এইভাবে মেলামেশার রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছিলেন তাদের নির্দেশ আসতো শহরের বিশেষ কেন্দ্র থেকে। যারা প্রতিনিয়ত নানা কাজকর্ম ও অনুশাসনের ভেতর দিয়ে এদের গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন এবং ধীরে ধীরে জনসেবা থেকে দেশসেবার দিকে ঢাকা শহরের সমৃদ্ধ-যৌবনকে পরিচালিত করছিলেন এবং দেশসেবার অন্তিমলক্ষ্য-রূপে দেশের স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন অনিল রায়। আর যে সঙ্ঘ ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্ধর্ষ সংগঠনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গড়ে উঠছিল এবং ঢাকার সীমানা ডিঙিয়ে যে-সংগঠন অনতিকালে কলকাতাসমেত বাংলার পশ্চিম প্রান্তের বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং পূর্বপ্রান্তে ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট জেলায় ছড়িয়ে পড়লো, সেই গোপন সংগঠন পরবর্তী কালে 'শ্রীসঙ্ঘ' নামাঙ্কিত হয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠনের নেতৃত্বে অনিল রায়ের সহযোগী হলেন লীলা নাগ (পরবর্তী কালে লীলা রায়)। এই সংস্থায় সে সময় বহু বিশিষ্ট বিপ্লবী গড়ে উঠেছিলেন।

এই সংস্থাকে গোড়ায় যাঁরা লালন করেছেন প্রবীণ বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দত্ত, প্রমথ দেব চৌধুরী, প্রমথ চক্রবর্তী অন্যতম। হেমচন্দ্র ঘোষ রাজনৈতিক কার্য্য শুরু করেন অনুশীলন সমিতির সদস্যরূপে। তিনি ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাস কর্তৃক ঢাকা রাজার দেউরীর শাখার ভারপ্রাপ্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজবন্দীরূপে আটক হন। ১৯২০ সালে কারামুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ দেখলেন অনিল রায়ের প্রতিভা ও প্রচেষ্টায় একটি শক্তিশালী সুসংহত তরুণ দল।

অনিল দাস-এর জন্ম ১৩১৩ সালের ৪ঠা আষাঢ়, ১৯০৬-এর ১৮ই জুন কলকাতার ২৩নং হ্যারিসন রোডে তৎকালীন সরকারী প্রশাসনিক চক্রের উচ্চপদাধিকারী মাতামহ রায় বাহাদুর নিখিলনাথ রায়ের বাড়িতে। তাঁর মাতামহ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের পদে

আসীন থাকাকালীন চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অনিল দাসের পিতামহ নারায়ণগঞ্জের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজীবী ৺প্রসন্নকুমার দাস এবং পিতা ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ৺নিবারণচন্দ্র দাস। খুল্লতাত ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী প্রবোধচন্দ্র দাসের অভিভাবকত্বে ঢাকার ছাত্রজীবন ১৯১৯-এ শুরু হবার অল্পকালের মধ্যেই বিপ্লবীদলের আদর্শবাদ এবং ত্যাগের আবেদন তাঁকে বিপ্লব-সাধনার পথে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করে আনে। অনিল দাসের স্বগ্রাম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার পাইকপাড়া গ্রাম। বিপ্লবী অনিল দাসের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতিভায় পাইকপাড়ার যুবকদল 'শ্রীসঙ্ঘে'র পতাকাতলে বিপ্লব-সাধনায় সমবেত হন। পাইকপাড়ার এই যুবকগোষ্ঠির অগ্রণী ছিলেন আর এক সর্বস্বপণ সংগ্রামী, গ্রামের সর্বজনপ্রিয় যুবক ৺ সুবোধ মজুমদার (ময়না)।

অনিলকুমারের স্নিগ্ধকান্তি দেহ, দরদভরা মন, হৃদয়ভরা প্রাণপ্রাচুর্য সকলকেই কাছে টেনে নিত। তাঁর সঙ্গে কাজ করতেও সকলেই ভালবাসত। খেলায়ও অনিলকুমারের খুব উৎসাহ ছিল। ঢাকা হলের ও লক্ষ্মীবাজার টীমে অনিলকুমার ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন।

অনিলকুমারের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় তাঁর মা কিরণবালা দেবীর নিকট। মা সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণা এবং বাংলা ও অঙ্কে সুনিপুণা ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর নারায়ণগঞ্জে শুরু হয়। অনিল কুমার ১৯১৯ সালে ঢাকা পোগোজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হবার অল্পকালের মধ্যে 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অংশীদার হলেন এবং অনিল রায় ও লীলা নাগের পরম স্নেহভাজন সর্বস্বপণ সংগ্রামী-রূপে দলগত জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। পোগোজ স্কুলে অনিল দাসের সহপাঠীদের মধ্যে শ্রীসঙ্ঘের তরুণ সদস্যদের অন্যতম ছিলেন অনিল ঘোষ, শৈলেশ রায়, রেবতী বর্মন, হরিপদ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। আত্মত্যাগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে অনিল দাস বৃহত্তর বিপ্লবী জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দরদভরা হৃদয় এবং অনুজ সহকর্মীদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ তাঁকে আত্মভোলা করে তুলেছিল। কপর্দকশূন্য সঙ্গীদের দ্বিধাহীনভাবে অর্থ, জামা-কাপড় সব কিছু বিলিয়ে দিতে তাঁকে মুহূর্তের জন্যও ভাবতে হোতো না। বিলিয়ে দিয়েই তাঁর আনন্দ। নিজেকে তিল তিল করে আদর্শ উদ্‌যাপনের জন্য বিলিয়ে দিতেই যেন তাঁর চরম পরিতৃপ্তি। আর একটি চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিপ্লবীর অনন্যতা দান করেছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক মর্যাদার শিখরে বাস করেও ছোট-বড় সকল রকম কাজেই অনিলকুমার অবিচল নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন।[১]

অনিল দাস ছিলেন বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীপালী সংঘের সকল কাজের সহায়ক ছিলেন অনিল দাস। এমন নির্ভরযোগ্য, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ছোট-বড় সকল কাজকে তুল্যমূল্য দিয়ে গ্রহণ করবার মানসিকতার অধিকারী সহকর্মীকে দলনেত্রী কাছে টেনে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে ক্রমশঃ তাঁকে অনেক দুরূহ বৈপ্লবিক কর্মের ভার দিয়েছেন। অনিল দাস ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। সমাজে দরিদ্রদের প্রতি অবহেলা, দাক্ষিণ্য, অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা প্রদর্শন এবং এই সর্বব্যাপী দারিদ্র্য ও মনুষ্যত্বের অবমাননার জন্য বিদেশী শাসনের চরম দায়িত্ব অনিল দাসকে একদিকে মানবতাবাদের করুণাধারায় সিঞ্চিত করেছে এবং অপরপক্ষে দেশকে বিদেশী শাসকদের

বন্ধন থকে মুক্ত করবার জন্য তাঁকে দুর্বার বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছে। তাই শ্রীসঙ্ঘের তরুণ নেতা অনিল দাস বিপ্লববাদ ও মানবতাবাদের দ্বৈত-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ছাত্র-জীবন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। অনিলকুমারের এক বাহু দীপালী সংঘ ও অপর বাহু শ্রীসংঘের কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত ছিল।

এম. এসসি. পাশ করার পর অনিলকুমার গণিত বিষয়ে কয়েকখানি পাঠ্য বই লিখেছিলেন এবং সেগুলো বেশ চলেছিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে অনিলকুমার বন্ধু অনিল ঘোষের সহযোগে জয়ন্তী অর্ঘ্যস্বরূপ গায়ত্রী দেবী ছদ্মনামে 'রবীন্দ্রনাথ' লেখেন।

১৯২৮ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে রসায়নে এম এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর অনিল দাস মাতামহ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও উচ্চতর সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের জন্য পরীক্ষা দেবার প্রস্তাব একেবারে উড়িয়ে দেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর নেতৃত্ব ততোদিনে—'man-making'-এর—মানুষ-তৈরীর কাজে ডুব দিয়েছেন। কারণ সময় এগিয়ে আসছে, ইংরেজ-শাসনকে চূড়ান্ত আঘাতের দিন এলো বলে। অনিল দাসও সে-পথেরই পথিক। প্রাণপ্রাচুর্যের উদ্বেলতা নিয়ে এ-কাজে ডুবে গেছেন অনিল দাসও।

এমন দিনে ১৯৩০-এ চট্টগ্রামে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ইংরেজ শক্তিকে দারুণ আঘাত হানলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার সুরু হলো। ১৯৩০-এর ১৯শে এপ্রিল অনিল দাসকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বাড়ি ঘিরলে তাকে পেলো না। সেই থেকে বিপ্লবী অনিল দাস আত্মগোপন করে সংগঠনকে বৈপ্লবিক খাতে পরিচালনার কর্মসূচী নিয়ে কাজে এগিয়ে গেলেন।

বছর দুই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সংগঠনে দারুণ অর্থাভাব। কাজ এগোতে চায় না। অনিল দাস বিপ্লবী সহকর্মীদের সহযোগে স্থির করলেন, দিনের বেলায় ভৈরববাজার থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ট্রেন থামিয়ে ভৈরববাজারের পাটের ব্যবসায়ীদের অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া হবে। ১৯৩২-এর ১৩ই মে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমনা প্রান্তে নীলক্ষেতের নিকটবর্তী রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এ অনিল দাসের নেতৃত্বে নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮।১০ জন সহ-কর্মীর সহায়তায় অর্থ নামিয়ে নেওয়া হয়। বিপ্লবীদের গুলিতে ট্রেনের গার্ড আহত হয়।[২]

ঢাকা শহরে দিন-দুপুরে ট্রেন থামিয়ে টাকা লুণ্ঠনের স্পর্ধায় পুলিশ হতচকিত, ভীত, সন্ত্রস্ত। অকস্মাৎ ১৯৩২-এর ৬ই জুন, ট্রেন থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার মাত্র কয়েকদিন পর, বিক্রমপুরের তালতলা ঘাটে রাত্রিবেলায় ষ্টীমারে অনিল দাস গ্রেপ্তার হলেন। বিপ্লবী অনিল দাস, আত্মগোপনকারী অনিল দাস, হয়তো বা ট্রেন থেকে অর্থ-লুণ্ঠনের নেতা অনিল দাস পুলিশের হেফাজতে। সুতরাং বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত করে তাঁর থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। ইংরেজ ও ভারতীয় গোয়েন্দা অফিসাররা বিপ্লবী অনিল দাসের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরি-মাপ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ তারা হবেই। কারণ অনিল দাসের মত বজ্রকঠিন মানসিক বলের অধিকারী বিপ্লবীদের সাক্ষাত তারা হয়তো বেশী পায় নাই।

অনিল দাস ১৯৩২-এর ১৭ই জুন ঢাকা জেলে শহীদের মৃত্যু বরণ করে নিলেন। নির্মম অত্যাচারের অন্তিম পরিণতিতে এই বিপ্লবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে যাবার সময়ও অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকবর্গ সান্ত্বনা পাবার মতো কোনো সূত্র এই

মৃত্যুপথযাত্রী শহীদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেনি।

শহীদ অনিলকুমার অমরত্বে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। চিরং জীবতু অনিলকুমার।

অত্যাচারিত অনিল দাসের মর্মান্তিক মৃত্যুতে দেশময় তুমুল আন্দোলন

১৯৩২ সালের ৬ই জুন রাত্রিবেলা ঢাকা হতে তালতলাগামী ষ্টীমারে অনিলকুমার গ্রেপ্তার হন। ১৭ই জুন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তাঁর জীবনান্ত হয়। এই ১১।১২ দিন তাঁর ওপর চলে ইংরেজ পুলিশ অফিসার ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার। এই কয়দিনের অস্নাত, অভুক্ত, নির্জন কক্ষে আবদ্ধ মানুষটির ওপর চালায় পৈশাচিক তাণ্ডব। অমন স্বাস্থ্যবান্ বলিষ্ঠ যুবককে অত্যাচারে অত্যাচারে পঙ্গু, অসুস্থ ও বিকৃত-মস্তিষ্ক করে দেয়। গ্রেপ্তারের পর অনিলকুমারকে শহরের মধ্যস্থলে জনবহুল রাস্তায় অবস্থিত কোতোয়ালি থানায় রাখা হয়। দু'দিন পরই গোয়েন্দা-পুলিশ বিভাগের অনুরোধে ঢাকার পশ্চিম প্রান্তে জনবিরল লালবাগের কেল্লার প্রান্তে অবস্থিত লালবাগ থানায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। যেখানে শত অত্যাচার হলেও কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না, একটু হা-হুতাশও করবে না। সেখান হতে শুধু গুজব ছড়াবে এই মর্মান্তিক অত্যাচার-কাহিনী যেমন রটেছিল সিপাই যুদ্ধের সময় যখন এই লালবাগ কেল্লার ভারতীয় সিপাইদের ধরে ধরে ইংরেজরা জবাই করেছিল আর সেই সব কায়াহীনদের করুণ ক্রন্দন 'মৈ ভুখা হুঁ' নিশীথ রাত্রে পরীবিবির দীঘির চারপাশে লোকে শুনতে পেত।

পাঁচ দিনে লালবাগ অনিলকুমারকে শেষ করে দিল। মাতা কিরণবালা দেবীর কাতর আবেদনে যেদিন অনিলকুমারকে কোর্টে উপস্থিত করা হল, সেদিন তাঁর চেহারা দেখে কোর্ট শুদ্ধ লোক আঁতকে উঠল। স্বয়ং সদর মহকুকা হাকিম এস্ এন্ চ্যাটার্জি তাঁর আদেশে মন্তব্য লিখলেন "He seems to have a crazy look"—তার চাহনি দেখে তাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে মনে হয়। অনিলকুমারের স্নেহময় কাকা ঢাকা বারের উকীল প্রবোধচন্দ্র দাস এবং বেদনাতুর মায়ের উকীল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসার জন্য কাতর আবেদন জানালেন। ঢাকা বার লাইব্রেরীর শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকীল রাজেন্দ্রকুমার রায়, রজনীকান্ত দাস, ডাঃ শৈলেন্দ্র কুমার সেন অনিল কুমারের জীবনরক্ষার জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা চালালেন। ঢাকা পিপ্‌ল্‌স এসোসিয়েশন, বার এসোসিয়েশন, বার বার গবর্নরের নিকট সুদীর্ঘ আবেদনপত্র পাঠালেন। কিন্তু এণ্ডারসনী-শাসনের লৌহকাঠামোয় তা ঘা খেয়ে ফিরে এল। ব্যর্থ হল মায়ের অশ্রুজল, নিষ্ফল হল দেশবাসীর প্রয়াস।

সেদিন এণ্ডারসনী-শাসনে বাঙালীর কণ্ঠ নীরব, সমগ্র দেশে চলছে অত্যাচারের রাজত্ব। সেই দুর্দিনে এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের ও নির্মম মৃত্যুর বিরুদ্ধে বাংলার সমস্ত জাতীয়তাবাদী বাংলা ও ইংরেজি সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের সংবাদপত্রে এই মর্মান্তিক জীবনদানের নির্মম-কাহিনী ভারতের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, মা-বোনদের বুকের শোকবহ্নির প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন এ যে কত বড় সাহসের কাজ ছিল, তা আজকের ভারতবাসী বুঝতে পারবে না। সেই সাংবাদিকবৃন্দ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে চিরস্মরণীয় রইবেন। আমরা তাঁদের সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

দীর্ঘ ছিয়াল্লিশ বছর পরে এদেশের মানুষকে সেদিনের মর্মান্তিক কাহিনীর ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্তসার এখানে দিলাম। বিস্তৃত বিবরণ মাসে মাসে পত্রিকার মাধ্যমে জানাবার ইচ্ছা আছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, এ্যাড্‌ভান্স, লিবার্টি, দৈনিক বসুমতী, দৈনিক বঙ্গবাণী, ইষ্ট বেঙ্গল টাইম্‌স্, বাংলার বাণী প্রভৃতি পত্রিকায় অনিল দাসের মৃত্যুকাহিনী সুবিস্তৃতভাবে ১৯৩২ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হ'তে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে সারা দেশে এক বিপুল প্রতিবাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তোলে। আমাদের সেই সাংবাদিকদের সেদিনকার সেই মর্মভেদী লেখনাবলী শহীদ-তর্পণরূপে ভারতবাসী চিরকাল স্মরণে রাখবে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় ২১।৬।৩২ তারিখ হ'তে ১৫।৭।৩২ তারিখ পর্যন্ত পাঁচটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় আলোচনা (প্রত্যেকটি ২ কলাম হতে ২½ কলাম) 'Anil Kumar Das' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ছোট আলোচনাও বের হয়। ৩০।৬।৩২ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় পূর্ণ এক পৃষ্ঠাব্যাপী অনিলকুমারের মৃত্যু-সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলী ও চিঠিপত্রাদি প্রকাশিত হয়ে শহীদের শেষ জীবনকে দেশবাসীর সম্মুখে প্রসারিত করে ধরে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের ৫ই আষাঢ় হতে ৩০শে আষাঢ় পর্যন্ত পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (প্রতিটি দুই-আড়াই কলামে) 'অনিলের মৃত্যু' শিরোনামে। দৈনিক বসুমতী, দৈনিক বঙ্গবাণী, ঢাকার সাপ্তাহিক বাংলার বাণী প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখন ও বিস্তৃত সংবাদপ্রকাশ উল্লেখযোগ্য।

এ্যাড্‌ভান্স পত্রিকায় ২১।৬।৩২ তারিখ হ'তে ১৪।৭।৩২ তারিখ পর্যন্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাঁচটি দীর্ঘ আলোচনা (Tragedy in Lock-up ইত্যাদি নামে) প্রকাশিত হয় এবং ১৯।৭।৩২ তারিখে পূর্ণ এক পৃষ্ঠা ব্যাপী অনিল দাসের গ্রেপ্তার, বর্বরোচিত অত্যাচার ও ফলে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও মৃত্যুর বিবরণ প্রকাশিত হয়।

লিবার্টি পত্রিকায় ২০।৬।৩২ তারিখ হতে ৩।৭।৩২ তারিখ পর্যন্ত পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, প্রত্যেকটি দেড়-দু কলাম।

ঢাকার ইষ্ট বেঙ্গল টাইমস ২৫।৬।৩২ তাং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ২ কলাম এবং ২ পৃষ্ঠায় ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ (প্রায় ৭ কলাম) প্রকাশিত হয়।

ইহা ছাড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নরেন্দ্র কুমার বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ভারতের বড়লাটের কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য মুরাপাড়ার জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু নেতা অনিলকুমারকে অত্যাচার হতে রক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ, পরে মৃত্যুর তদন্তের জন্য চেষ্টা করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার প্রভাস মিত্র ও গবর্নরের মুখ্যসচিব মিঃ রীডকে তৎকালীন খ্যাতনামা বিরোধী সদস্যগণ প্রশ্নবাণে জর্জরিত ও বিব্রত করেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা অনড় থাকে।

১৭ই জুন (১৯৩২) অনিলকুমারের মৃত্যুর সংবাদ ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ার পরই বুড়ীগঙ্গার তীরে করোনেশন পার্কে স্মৃতিসভার উদ্যোগ করার সম্পর্কে পুলিশ শ্রীমতী সুরবালা দেবী, শ্যামলা সুব্রধর ও অনিলকুমার সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে।

পর বৎসর কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে

জে. সি. গুপ্তের সভাপতিত্বে অনিলকুমারের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপিকাবিলাস সেন ভাষণ দেন।

এখানে অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটু নমুনা তুলে দিচ্ছি। অনিলকুমারের জন্য কতখানি বেদনাবোধ ও সহৃদয়তা এবং ইংরেজ শাসকের ওপর কত বড় ক্ষোভ ও ঘৃণা থাকলে এরূপ উক্তি বের হয়। ঢাকার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট অনিলকুমারের ওপর পুলিশী নির্যাতনের কথা বেমালুম অস্বীকার করে সেই নির্যাতিত মহাপ্রাণকেই মিথ্যাবাদী বলতে কসুর করেনি। ইংরেজপুঙ্গব বলেছিল, "The deceased (Anil Das) was not maltreated by any way while in police custoday and the allegation that he was beaten is entirely false". অমৃতবাজার পত্রিকা এর জবাবে লিখলেন, "There was only one person who could have challenged this denial and that person was Anil Kumar. But he is no more. However the District Magistrate has charged him with making false allegations. It still remains with his countrymen to say if they should believe Anil Kumar to be a liar".

(Editorial II : Anil Kumar Das
Dt. 23.6.32)

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

---

১. অনিলকুমারের ভাই-বোনের কথা সংক্ষেপে লিখছি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিমলকুমার দাস ১৯৩৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকা শহরে রেল লাইন পার হবার সময় চলন্ত ট্রেনের আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হবার পরই মারা যান। স্নেহময় দাদার শোচনীয় মৃত্যুতে পরিমল বড়ই ভেঙ্গে পড়েছিল এবং মানসিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। মৃত্যুর দুদিন আগেও গোপীবাগে আমার গোপন আবাসে এসে দেখা করে এবং দাদার জন্য কেঁদে কেঁদে আকুল হয়। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছিল।

অনিলকুমারের একমাত্র ভগ্নী লতিকা দাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এবং দীপালি সংঘের কর্মী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সালে কলিকাতায় কমিউনিষ্টদের আয়োজিত এক মহিলা-বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান-কালে বহুবাজার ষ্ট্রীটে ১৯৪৯-এর ২৭শে এপ্রিল পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। পর পর এইরূপ মর্মান্তিক শোকঘাতে অনিলকুমারের বিধবা মাতা একেবারে মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে খুব কম মায়ের ভাগ্যেই এত দুঃখ ভোগ ঘটেছে।

অনিলকুমারের মেজভাই সুনীল দাস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাবপূত অনিল রায় ও লীলা রায়ের অনির্বাণ দীপশিখা প্রত্যয়নিষ্ঠ সবল হস্তে বহন করে চলেছেন, জয়শ্রীর সম্পাদনায় তার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। বহু বিচিত্র তাঁর কর্মধারা। এককালে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য, প্রজা-সোসিয়ালিস্ট দলের সভাপতি, অধুনা বঙ্গীয় জনতা দলের সহ-সভাপতি, সুনীলকুমার চিন্তাশীল লেখায়, বিশ্লেষণপূর্ণ ভাষণে, দরদভরা ব্যবহারে সকলের সুপ্রিয় হয়েছেন।

২. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনিত সূর্য সেন স্মারক-বক্তৃতামালায় এই দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতির বৈপ্লবিক দুর্ধর্ষতার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

বাঙালী বিপ্লবের গতি ও পরিণতি

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

অর্ধ শতাব্দী আগে এক মহারাষ্ট্রীয় নেতা বলেছিলেন, "বাংলা আজ যা ভাবে, সারা উপমহাদেশ কাল তাই ভাববে।" অরবিন্দ থেকে মুজিব অবধি সবাই সেটা প্রমাণ করে গিয়েছেন। এই ধরণের একের পর এক মহানায়ক উপমহাদেশের অন্য কোথাও জন্মায়নি। গান্ধীজী দিয়েছেন নৈতিক দায়িত্ব বোধ, নেহেরু দিয়েছেন গণতন্ত্রবোধ কিন্তু বাঙালীর নেতাদের দান হল স্বাধীনতা-যুদ্ধে সেনাপতিত্ব, অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুর্জয় সাহস। সে নিজে প্রদীপ শিখার মতন জ্বলে সারা উপমহাদেশকে আলোকিত করেছে। তার প্রতিটি দুঃসাহসিক কার্যকলাপ উপমহাদেশের মনকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করেছে। এই আলোকে, এই শিক্ষায় মানুষ নিজেদের নতুন করে দেখেছে এবং জাতীয় লক্ষ্যে ফিরে এসেছে।

প্রদীপ বা মশাল নেতৃত্ব দেয়না, দেয় আলো যাতে মানুষ পথ দেখতে পায়, এগিয়ে যেতে পারে। বাঙালী সেই প্রদীপ, বাঙালী সেই মশাল। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সাম্যবাদীরা সেই প্রদীপের তলার অন্ধকার। ওদের অস্তিত্বে প্রদীপশিখা ম্লান হয়নি, হবে না।

সুভাষের নিরুদ্দেশের পর বাঙালী যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। কেউ কল্পনাও করেনি যে ১২ বছরের মধ্যে মুজিবের মতন এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হবে। এইভাবে ইতিহাস নিজে রাজপুরোহিত হিসেবে একের পর এক বাঙালীর অনামিকায় রাজকীয় আঙটী পরিয়ে দিয়েছে।

অনেক বাঙালী নেতার মতন মুজিবও ছিলেন ভাবাবেগে ভরা। এঁরা সাধারণ মানুষের মতন হাসতেন, কাঁদতেন, রাগতেন। আবার আশুতোষের মতন আশু তুষ্ট হতেন। সেই জন্যে এঁরা মানুষকে বুঝতেন। মানুষ এঁদের বুঝত।

এই ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে দেশে-বিদেশে বহু মানুষ মুজিবের ছত্রছায়াতলে ঢুকে পড়েছিল। এদের কাজ ছিল স্বার্থসিদ্ধি। এদের স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু খেসারৎ দিয়েছেন মুজিব। এঁরা মুজিবের দয়ায় কূটনীতি, রাজনীতি ও সৈন্যবাহিনীতে মর্যাদা পেয়েছিলেন। এঁরাই মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রে বিদেশীর সংগে লিপ্ত হয়েছিলেন যার পুরো ইতিহাস বিছুদিন পরে প্রকাশিত হবে। এবার বংগাধিপ সিরাজের হত্যা ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত হয়েছিলেন তাদের আখেরটা দেখুন। মীরজাফর—কুষ্ঠরোগে, তস্যপুত্র মীরণ—বজ্রাঘাতে, উমিচাঁদ—উন্মাদ-রোগে, জগৎশেঠকে দুর্গপ্রাকার থেকে আছড়ে মেরে ফেলা হয়, মহম্মদী বেগকে—জনশ্রুতি—তাঁর স্ত্রী বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এগুলো ঘটে সিরাজ-হত্যার (২রা জুলাই, ১৭৫৭)র কয়েক বছরের ভেতর।

সিরাজকে হত্যা করে ষড়যন্ত্রকারীরা দু'শ বছরের বিদেশী শাসনের অভিশাপ ডেকে এনেছিল। মুজিবকে

হত্যা করে ওরা সাম্প্রদায়িক সর্পকুলকে সাপের ঝাঁপি থেকে মুক্তি দিয়েছে। আধুনিক মহম্মদী বেগদের আখের সিরাজহত্যাকারীদের চেয়ে ভয়াবহ। কেন, তার ঐতিহাসিক কারণটা বলা দরকার। সিরাজের সময় বাঙালী জাতি ছিল দর্শক। ক্লাইভ তার রিপোর্টে লিখেছিলেন ঃ "মুর্শিদাবাদে জয়যাত্রার সময় আমার সংগে ছিল ২৭৬ জন গোরা সৈন্য আর ১,৩০৮ জন তেলেংগা। রাস্তার দুধারে বাঙালীরা এত বিপুল সংখ্যায় ভীড় করেছিল যে তারা শুধু ঢিল মেরে আমাদের নিকেশ করতে পারত।" কিন্তু সে যুগের বাঙালী সাড়ে পাঁচ শতাব্দীর বিদেশী শাসনে স্বাধীনতা শব্দটাও ভুলেছিল, রাজনীতির ধার ধারত না। কে বাংলার মসনদে বসেছে তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাত না। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা দেশভক্তির দিক দিয়ে ছিল গোলামের গোলাম, সাহসের দাঁড়িপাল্লায় চূড়ান্ত কাপুরুষ। ওরা বাঙালী হিসেবে ভাবতেও পারত না। এখন বাঙালী ভাবতে ভয় পায় না। প্রকাশ্য আন্দোলন বা মতামত প্রকাশ রোয়েদাদ দিয়ে স্তব্ধ করা যায় কিন্তু তার মনকে স্তব্ধ করা আর কোনও কালে সম্ভব হবে না। বাঙালী ভাবছে কিন্তু কি ভাবছে তা শাসকরা জানে না। মুজিবোত্তর বাঙালীর কাছে রাজনীতিটাই সবার বড় কথা এবং '৭১এর দীক্ষায় সে দুঃসাহসী। বহুক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক চেতনার সংগে মিশেছে কেতাদুরস্ত সামরিক শিক্ষা, ফলে ময়দানী ও গুপ্ত যুদ্ধে (আমি পারতপক্ষে গেরিলা শব্দটা ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক) বাঙালী এখন পটু। বাংলার বর্তমান শাসকদের এই নতুন বাঙালীর সংগে মোকাবিলা করতে হবে। এটা যদি আপসের (কম্প্রোমাইজ বা রিকন্সিলিয়েশানের) পথে হয় তাহলে বাঙালী সভ্যতা এক শতাব্দী এগিয়ে যাবে। আপোষ যদি না হয় তাহলে বর্তমান শাসকদের আখের ভয়াবহ।

স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুত্তাপূজার ফলে বাঙালী উন্নত জাতিসমূহের তুলনায় ৭০০ বছর পেছিয়ে ছিল। মুজিব এসে বাঙালীকে আত্মমর্যাদা-বোধের সিংহাসনে বসালে। আবার সেই আত্মমর্যাদা-বোধ সরকারীভাবে বিনষ্ট হয়েছে। বাঙালী পরস্পরকে দেখছে বিভিন্ন দেশের দালাল হিসেবে। ফলে বাঙালী আজ সবার দালাল, এক বাঙালীর ছাড়া। বাঙালীর চিন্তা আজ কেন্দ্রাপসারী, এটাকে কেন্দ্রাভিমুখী অর্থাৎ বাংলামুখী করা দরকার। লজ্জা, দ্বিধা, ভয় ত্যাগ করে, ইজ্‌মের ভূত ও সাম্প্রদায়িকতার সর্পকুলকে উপেক্ষা করে বাঙালী যখন বলবে, "আমি বাংলা-দেশের দালাল," তখন বাঙালী আবার জগৎ সভায় যোগ্য আসন পাবে। গত এপ্রিল মাসে বিশ্ব-পার্লা-মেন্ট সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের বহিষ্কার মর্যাদা হারানোর প্রথম কিস্তি মাত্র। আরও কত অমর্যাদা বাকী আছে কে জানে। দেশের অভ্যন্তরে দংশনক্ষত স্বাধীনতার শ্যেনবিহংগের সংগে বিদেশের তাঁবেদার ভুজংগের জীবন-মরণ যুদ্ধ বেধেছে। কাদের সিদ্দীকিরা তার কারণ নয়, লক্ষণ মাত্র। কারণ হল বাঙালীত্বের বিস্মিত সংজ্ঞা।

কেউই চায় না বাংলাদেশে আরও রক্তপাত হোক। মিস্ত, রাষ্ট্রপতি, নারী, নাবালক, গর্ভবতী স্ত্রী ও বন্দী-দের হত্যা করা হয়েছে। এটা একটা সদ্যস্বাধীন জাতি বিনা তদন্তে, বিনা বিচারে কিভাবে মেনে নেবে। মনে রাখা দরকার যে অতীতে বাঙালী মহাপ্রতাপশালী মোগল বা ততোধিক শক্তিমান ব্রিটিশের পরোয়া করেনি।

এই শাসকদের আশা যে মার্কিন অস্ত্র দেবে, তেল-

আমীররা টাকা ও তেল দেবে, চীন বাংলা দেশকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে আর বাংলাদেশে ও পাকিস্তান এদের সংগে মিলে ভারতকে শায়েস্তা করবে। হিসেবটা অডিট করা যাক।

বিদেশীরা টাকা দিয়েছে মুজিব হত্যার জন্যে, অন্য কোনও কারণে ওরা টাকা বা তেল দেবে তার মুচলেকা কোথায়? লিবিয়ার টাকা ও তেল আছে কিন্তু তিউনিসিয়া ও মিশরের নেতাদের খুন করবার ষড়যন্ত্রে লিবিয়া যথের ধন ব্যয় করছে। তাছাড়া লিবিয়ার কংসকারায় কংসহন্তা জন্মিছে অনাগত। উপরন্তু লিবিয়া ও তেল আমীরদের দেশেই কবে রাতারাতি শাসক বদলায় তার ঠিক নেই।

পাকিস্তানের শিরে আফগান ও পাখ্তুন পীড়া বুকে বালুচ ব্যাধি, পায়ে সিন্ধী সংকট। এই অবস্থায় পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে বালুচ, সিন্ধী ও পাখ্তুনরা পাকিস্তান বলে কিছু রাখবেনা, থাকবে শুধু পশ্চিম পাঞ্জাব। বাংলার সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সাম্যবাদীরা দ্বিতীয়বার বিধবা হবে।

চীন হয়ত এই চক্রে যোগ দিত এবং বাংলাদেশে সৈন্য পাঠাত কারণ দু'একটা ডিভিশান সৈন্য ওদের কাছে মুড়িমুড়কি, কিন্তু সৈন্যদের যোগান দেবে কোন পথে? তারপর "মাটী কাটি লভি কোহিনুর" চীনারা যদি বাংলাদেশ ছাড়তে না চায়।

রাশিয়ার পক্ষে যেমন পূর্ব-ইউরোপ সামলানো এবং চীনের সংগে যুদ্ধ করা এককালীন সম্ভব নয়, তেমনই চীনের পক্ষে ৫,০০০ মাইল রুশ সীমান্তে ও ১,০০০ মাইল ভারত সীমান্তে এককালীন যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। রাশিয়া পশ্চিমের সংগে মিত্রতা করেছে। চীনও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে বর্মা, থাইল্যাণ্ড মালয় ও ফিলিপাইনের সংগে। বাকী ছিল ভারত, এখন ভারতের সংগে চীনের স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক। কিন্তু সবার বড় কথা, রাশিয়া ও চীনের ভেতর মিত্রতা হয়নি। হিটলার-স্টালিন চুক্তির মতন (২৩এ অগষ্ট, ১৯৩৯) হঠাৎ যদি মাও-ব্রেজনেভ চুক্তি হয় তাহলে এশিয়া পূর্ব-ইউরোপের কপালে অসীম দুঃখ। যদি চীন ও রাশিয়ায় যুদ্ধ বাধে তাহলে এই দুই ভূভাগের ভাগ্য ভাল। এই মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা বর্তমান থাকতে চীন বাংলাদেশে সৈন্য পাঠাবে বা ভারত আক্রমণ করবে,—এটা সামরিক হিসেবে মেলে না।

আমেরিকা। আমেরিকার বৈদেশিক নীতি এতদিন পরিচালিত করত চাণক্যের ভাষায়, গূঢ় পুরুষের দল। ওয়াটারগেট কেলেংকারীর পর সেনেট ও কংগ্রেস তাদের খবরদারীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বর্তমান আমেরিকার সর্বপ্রকার বৈদেশিক নীতি সেনেট ও কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষ। তার প্রমাণ (১) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে প্রত্যাহার, (২) থাইল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাহার (৩) এ্যাংগোলায় মার্কিন নিষ্ক্রিয়তা এবং (৪) রোডেশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে মার্কিনী সমর্থন। এইসব কারণে আমার ধারণা মুজিবই সি, আই, এর শেষ খুন। এ অবস্থায় মার্কিন সরকার জিয়া সরকারকে ঝাঁকাভর্তি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও জংগীবিমান দেবে এটাও সেনেট বা কংগ্রেস অনুমোদন করবে না। ওরা বড়জোর বাংলাদেশে বিমানঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি ও মোনিটারিং কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। ঝাঁকা ভর্তি অস্ত্র বা বিমান নৈব নৈব চ।

নেপাল। ওদের সীমান্তের ২৫ মাইলের ভেতর বাংলাদেশের সীমান্ত, বিদেশীর প্রলোভন ও প্ররোচনা যথেষ্ট এবং নেপালীরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক।

ভারতজয়ের জন্যে ওরা চীন, পাকিস্থান ও বাংলাদেশের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে না। সুতরাং জিয়া সরকার ভারতকে বাগে পেয়েছেন বলে যে হিসেব করেছেন সে হিসেবটা ভুলে ভরা। ভারতকে বাগে পাওয়া ব্যাপারে বাংলাদেশের বর্তমান মিত্ররা কিভাবে সেটাও বিবেচনা করা দরকার। এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ-বিরোধী ছিল। স্বভাবতঃ, এরা ভাববে, "যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ভারতের মিত্রতা করেছে, আজ ভারত বাংলাদেশের শত্রু এবং আমাদের মিত্র, এদের ওপর কতটা নির্ভর করা যায়? এবং তার ভিত্তিতে আমাদের দীর্ঘসূত্র বৈদেশিক নীতি রচনা সম্ভব কি?"

মুজিব বিরোধীরা বলেন যে মুজিব-হত্যার প্রতিবাদ হয়নি। ইতিহাস প্রশ্ন করবে, যেদেশে রাষ্ট্রপতি, নাবালক ও গর্ভবতী নারী রাজনৈতিক কারণে খুন হয়, সে রাজত্বে মানুষ কি প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানাতে পারে? বাঙালী জাতির বর্তমান নীরবতাকে খুনের রাজনীতি মেনে নেওয়ার প্রমাণ হিসাবে ভাবাটাও বিপজ্জনক কারণ তার অর্থ হবে খুন মারফৎ শাসক পরিবর্তন করাটা জাতি ন্যায্য পন্থা বলে গ্রহণ করেছে। সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান শাসকরা নিরাপদ নয়।

সময়ের গতি মানুষের মনে অভাবিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই অমোঘ কারণে আজকের আততায়ীদের মনে যখন ভয় শেকড় গাড়বে তখন তাদের কেউ কেউ পালিয়ে ভারতেই আশ্রয় নিতে আসবে। খোন্দকার মোস্তাক এমন কি সেনাপতি জিয়াও যদি ভারতে পালিয়ে আসেন তাহলেও আশ্চর্য হব না। কারণ, এরা মহৎচেতা নন মুজিবের মতন জীবন-মৃত্যু এদের পায়ের ভৃত্য নয়। পাকিস্তানী নিরেটদের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মুজিব স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের মায়া ত্যাগ করে এসে দাঁড়ালেন সশস্ত্র নিরেটদের সামনে। একই সময়ে মৌলানা সাহেব সস্ত্রীক ভারতে পালিয়ে গেলেন। মোস্তাক সাহেবও সেই পথে গেলেন। সেনাপতি জিয়া তখন যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। এই যুদ্ধে তিনি বীরধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি হত্যা ও গর্ভবতী নারী ও বালক হত্যার ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তিনি বীরধর্মে পতিত হয়েছেন। পৃথিবীর যেকোনও গণতান্ত্রিক দেশের অফিসারের সামনে দাঁড়ালেই সেনাপতি জিয়ার মনে এই পদস্খলনের মহাপাপ প্রকট হবে। ক্ষুদ্রমনা মানুষের কাছে প্রাণ বাঁচানও সাময়িক সিংহাসন লাভ বড় কথা, আর সিংহাসন হারালেই প্রাণ বাঁচানর কথা আগে ভাবে। সেই নিয়মে এদের কাছে প্রাণ হারানোর চেয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কলংক শ্রেয়। অস্বাভাবিক অবস্থায় নানা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে, সেই কারণে এইসব সম্ভাবনার কথা বলতে হল।

মুজিবহত্যার কিছু দিন পর তাঁর বাড়ীকে ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা যায় এবং সেই শূন্য বাসস্থানে ফুল দিয়ে আসে। আগামীকালে মানুষ টুংগীপাড়ার সমাধিতে ১৫ই আগস্ট তীর্থযাত্রা করবে।

মুজিবহত্যা জাতির সমর্থনে হয়নি, হয়েছে মুষ্টিমেয় সৈন্যের চক্রান্তে। এদের সর্বদা একটা ভয় থাকবে কে আবার জানি চক্রান্ত করে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সেনানায়করা খানাপিনার সময় কি আলোচনা করছে, কে কোথায় পুরাণো দোস্তের সংগে মতৈক্য আবিষ্কার করে আনন্দে আত্মহারা হচ্ছে তার সন্ধান রাখা কোনও সর্বাধিনায়কের পক্ষে সম্ভব নয় যেমন মুজিবের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

বর্তমান শাসকরা খুন করে ক্ষমতা নিয়েছেন, প্রকৃতির দয়ায় এবছরের মতন খাদ্যসমস্যার সমাধান

করেছেন, সাম্প্রদায়িকতার সাপ লেলিয়ে দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করেছেন। এটা স্বাধীনতাপূর্ব যুগের সাপুড়ে খোকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাপুড়ে খোকার কথা ছিল, হয় চাঁদা দাও, না হয় সাপ লেলিয়ে দেবো। বর্তমান শাসকদের কথা হল, হয় নিঃসমালোচনা আনুগত্য দাও, না হয় তোমাকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করব। শাসকরা বাংলাদেশকে ১৯৩৮এ নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭৬-এর মানুষ, ১৯৩৮এর নয়। ১৯৫২তে সাপ্তাহিক যুগবাণীতে লিখেছিলাম, ভয়ের সংগে পরিচয় হলে মানুষ আর ভীত হয় না (১৭.৫.৫২)। বাঙালী আজ নীরব কিন্তু ভীত নয়। বর্তমান নীরবতাটা সাময়িক যেমন ছিল আয়ুবের যুগে। এই হল শাসকদের দুশ্চিন্তার প্রধান উৎস। ওরা ভাবছে, মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী। এই ভাবনাটা আজ ওদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। দুঃস্বপ্নটা কবে, কি রূপ ধরে ঘুমন্ত শাসকদের মশারী তুলবে তার ঠিক নেই। তখন কে বা কারা ওদের বাঁচাবে? যদি কেউ পারে তাহলে অসাম্প্রদায়িক নেতারাই পারবেন। অথচ ওরা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নেতাদের অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে।

সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া বর্তমান বাংলা সরকারের কিছু বলার নেই। ৫০ বছরের সাম্প্রদায়িকতা ১৯৭১এ অগ্রাহ্য হয়েছে। পুনরুজ্জীবিত সম্প্রদায়িকতাও আবার অগ্রাহ্য হবে শেষবারের মতন। সাম্প্রদায়িকতা হল নিরক্ষতার বিষকন্যা। এই দুই কারণে বাঙালী জাতি মহান সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। জিয়া সরকার সব বিষয়ে বিবৃতি দেন কিন্তু এই দুটো সাপ সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। ওদের ভয়—নিরক্ষরতা দূর হলে সাম্প্রদায়িকতার ব্যবসা বন্ধ হবে। বই, সংবাদপত্র, বেতার ও রূপবাণী হল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। এই কয়েকটী মাধ্যমের সাহায্যে নিরক্ষরতার অবসান ও কুসংস্কার দূরীকরণ উভয়ই সম্ভব। এইসবের মাধ্যমে জাতি পাচ্ছে বস্তাবন্দী অন্ধকার।

প্রতিযোগিতা ছাড়া কোনও কিছুর উন্নতি হয় না। বিদ্যার্জন, ব্যবসা, সাহিত্য, অভিনয় প্রভৃতি যেকোনও ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতা না হলে জাতির মন ও অর্থনীতি উভয়ই ডোবাপুকুর হয়ে যায়। শাসক আছে, নির্বাচন নেই, সংবাদপত্র আছে, প্রতিবাদের স্তম্ভ নেই, সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রের জগৎ পাকিস্তানী যুগের বন্দী বাজার। ভীত, শৃংখলিত কয়েদীর আদালতে হাজিরা। ফলে এরগুপি ক্রমায়তে।

তবু আমি আশাবাদী। তার কারণ বাঙালী ঐতিহ্য, বাঙালীর ইতিহাস, সৃষ্টি ও কৃতিত্বের অপূর্ব কাহিনী। জার্মানী আজও বিভক্ত কিন্তু দু'জনের অতীত ইতিহাস এক। এক একাধিক হলে তাদের অতীত ইতিহাস বিভক্ত হয়না। কারণ ইতিহাস এমন একটা বস্তু যা ভাগ-বাঁটোয়ারা করা দেবতার অসাধ্য। ইতিহাস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও মতান্তর হতে পারে কিন্তু বাঁটোয়ারা সম্ভব নয়। সিরাজ সুবে বাংলার নবাব ছিলেন, সেনাপতি মিরজাফর বাংলার সৈন্যদলকে ইংরেজের সংগে যুদ্ধ করবার হুকুম দেননি, মহম্মদী বেগ সিরাজকে কোতল করে। এসব শুধু বাংলাদেশের ইতিহাস নয়, সারা উপমহাদেশের ইতিহাস। কেউ বলতে পারবে না যে মহম্মদী বেগ আমাদের ইতিহাস নয়। কারণ সে ছিল মুসলমান। অথবা জগৎশেঠ আমাদের ইতিহাস নয় কারণ সে ছিল হিন্দু। এটা হল ইতিহাস। একে ঢাকা দেওয়া যায় না, ভাগ করা সম্ভব নয়, চেষ্টা করাও মূর্খতা। কেন এই ইতিহাস ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। তার উত্তর হল

ভাষা, ভাষার শস্য, সেই ভাষাভাষী ব্যক্তিত্বের শোভাযাত্রা। এই মূল উপকরণগুলির প্রতিক্রিয়া বাংলাভাষী আবালবৃদ্ধবণিতার মনকে জড়িয়ে আছে। এই ভাষাতেই বাঙালী বলবে, লিখবে, কাঁদবে, হাসবে, হাসাবে, গাইবে, অভিনয় করবে, বক্তৃতা দেবে, বিবাদ করবে, প্রেম করবে। ইতিহাসের গতিতে যেসব বিদেশী শব্দ বাংলাভাষায় স্থান পেয়েছে সেই সমস্ত শব্দসম্ভার নিয়ে বাংলাভাষা জয়যাত্রায় বেরিয়েছে। এই ভাষা ও ঐতিহ্যের ঢেউ পৌঁছেচে গ্রামের ইস্কুলে। বাংলাদেশের ৫২ হাজার গ্রাম্য পাঠশালায় দু-এক ডজন নিষ্পলক হীরে আছে। ওরাই মহান বাঙালী ঐতিহ্যের নিশানধারী হবে। আগামী শতাব্দীর মুখে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের মতন ইতিহাস স্বয়ং রাজপুরোহিত হিসেবে ওদের হাতে রাজকীয় আংটী পরিয়ে দেবে। তখন, বাংলা আবার জগৎসভায় যোগ্য আসন লভে।

পলাশীর কলংককর পরিচ্ছেদের ১২ বছরের ভেতর রামমোহনের মতন বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। সেই থেকে বাঙালীর প্রগতি থামেনি। মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়েছে, কখনও পিছটানে গতিহীন কিন্তু প্রগতির প্রাণরস সর্বদা প্রবহমান ছিল, আছে এবং থাকবে। বাঙালীর অনুপপত্তি ছিল একটা মাত্র—বাঙালী সৈন্যবাহিনীর অভাব। তার সে অনুপপত্তি নেই। বর্তমান অনিশ্চয়তা শেষ হলেই জাতির অগ্রগতি আবার আরম্ভ হবে। বর্ত্তমান অবস্থাটা অতীব কৃত্রিম এবং ক্ষণস্থায়ী। আমরা বাংলা মাকে নির্ভয়ে বলতে পারি :

"কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

ইচ্ছা-কলম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট গল্প, যা নিয়ে বিশ্বের দরবারে বাঙালীর অহঙ্কার

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠি—

> তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লণ্ডন ২ নভেম্বর ১৯০০।

আরো একটি, ১৬ জানুয়ারি ১৯০১এর চিঠি—

> ভাষার সৌন্দর্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই।

জগদীশচন্দ্রের এই চিঠির অন্তত এক যুগ পরে মাদ্রাজের নটেশন কোম্পানি রবীন্দ্রনাথের তেরোটি গল্প ইংরেজি তর্জমা করে বের করেন Glimpses of Bengal Life নাম দিয়ে। ১৯২৬-২৭ সালের মোট পাঁচ মাসের মধ্যে বিশ্বভারতী যে তিন খণ্ড গল্পগুচ্ছ 'নূতন আকারে প্রকাশিত হইল' বলে সংকলন করলেন, আর জগদীশচন্দ্রের চিঠি লেখার প্রাক্কালে মজুমদার এজেন্সি থেকে যে বেরোতে শুরু করেছিল রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ তার অন্তর্বর্তী সময়ে লণ্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকেও তিন-তিনটি ইংরেজি গল্পগুচ্ছের সংকলন বেরিয়েছিল Hungry Stones and Other Stories ১৯১৬ Mashi and Other Stories ১৯১৮ Broken Ties and Other Stories ১৯২৫, সেই সঙ্গে স্কুলপাঠ্য একটি ছোট সংস্করণ, তার ফলে বাইরের বিশ্বে বাঙলা ছোট গল্পের কী স্ব-তন্ত্রী অর্চা-র প্রতিষ্ঠা হল, জানা যায় নি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটো-গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ, এবং এমন সময়ে লেখেন, যখন ইংরেজি সাহিত্যেও ছোটোগল্প নামক বস্তুটির চল হয় নি।' ইংরেজি 'গল্পগুচ্ছ' কিছু ছায়া-তাপ ফেলেছিল ইংরেজি ছোট গল্পের উপরে? হয়তো কখনো সেই খোঁজ কেউ নেবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের দেশে ছোটগল্পের জনপ্রিয়তা হয়েছিল নিঃসন্দেহেই, তা না হলে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় পয়লা মুদ্রণেই চার সহস্রাধিক করে ছেপে ফেলতেন না।

৭ জানুয়ারি ১৯২৭ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়-প্রকাশিত বিয়াল্লিশ শ' মুদ্রণের তৃতীয় খণ্ড গল্পগুচ্ছ বেরোবার মাত্র বর্ষকাল পরের একটি পত্রিকার জবানবন্দি তুলে দিচ্ছি যে কাগজ রবীন্দ্রপরবর্তী অনুযাত্রী গল্পলেখক-দের গুরু নিরীক্ষার কাগজ—

'মাসিক পত্রে ছোট গল্প খুব চলে। কিন্তু ছোট গল্পের বই বাজারে একেবারে চলে না। যাঁহারা ছোট গল্প লেখেন তাঁহারা এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। সাময়িক পত্র ঠিক যতখানি সমাদরে ছোট গল্প প্রকাশার্থ

গ্রহণ করেন, ঠিক ততখানি অবহেলা ভরেই আমাদের পুস্তক-প্রকাশকগণ ছোটগল্পের বই ফিরাইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, উপন্যাস হইলে বাঙলা বই তবুও কিছু কাটে কিন্তু ছোট গল্পের বই একেবারে কাটে না। অথচ দেখা যায়, সাময়িক পত্রের পাঠক যাঁহারা, তাঁহারাই উপন্যাস প্রভৃতির শ্রোতা। প্রকাশক বলেন, তাঁহারা ছোট গল্পের বই কেনেন না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইতেছে যে, ছোটগল্প না ছাপিলে সাময়িক পত্র চলে না, আর লেখক ছোট গল্প লিখিলে একবার মাত্র কোনও সাময়িক পত্রে উহা ছাপানো ছাড়া আর কোনও কাজে আসে না। এই কারণে, যাঁহারা গল্প লেখায় একটুও হাত পাকাইয়াছেন তাঁহারাই উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপন্যাস হইলে অন্তত কিছুও মূল্য পাওয়া যায় এই ভাবিয়া যাঁহাদের গল্প লেখায় এখনো হাত পাকে নাই তাঁহারাও উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।...

দেশ, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তির চিন্তার ধারা যেমন উপন্যাসে পর্যবসিত, ছোট গল্পেও তেমনি। কিন্তু ছোট গল্প পড়িতে সময় কম লাগে তাই তাহাকে সম্যক্ শ্রদ্ধা না দেওয়া আমাদের স্বভাব হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে যে পরিণতির স্থান আছে ছোটগল্পে তাহা উহ্য থাকে। সেই জন্যও ছোট গল্প ছোট বলিয়া যতটা উপেক্ষা পাইবার তাহা পায়। কিন্তু কেবলমাত্র আকারে বড় হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া অনেক অযোগ্য উপন্যাস ছোটগল্প অপেক্ষা সমাদর বেশি পায়। কিন্তু আমাদের পাঠকসমাজ যদি ছোট গল্পের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট প্রীতি ও শ্রদ্ধা না দেখান, তাহা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন অবস্থা হইবে যে, সাময়িক পত্রে ছোটগল্প ছাপিতে হইলে অতি অক্ষম রচনাই কেবল ছাপিতে হইবে অথচ সাময়িক পত্রের পাঠকবর্গের কাছে ছোট গল্পের চাহিদা কিছু কমিবে না।...'

সামান্য সাধ্য-সচেতন লেখকই আখরি সম্ভাবনার কথা ভেবে উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হলে অগত্যাই কাগজ-পুরণের অপরিহার্য গল্পগুলি হবে অক্ষম লেখা, ষোল আনা সঠিক নয় নিশ্চয় এমন আশঙ্কা। হলে, বোলপুর, বীরভূম থেকে শ্রীব্রজবল্লভ বসু প্রকাশিত 'বিনোদিনী' নামে এক টাকা দামের একখানি 'ছোটগল্পের বই কেন চলিবে না তাহা বুঝা কঠিন' বলে এই পত্রিকাই প্রত্যয় প্রকাশ করতেন না। প্রকাশকের পিঠ ফেরানোর আশঙ্কাও নিশ্চয় সবটাই সঠিক নয়। হলে, রবীন্দ্রনাথের পরেকার এত সব আদরণীয় গল্প-গল্পকারদের আমরা পেতাম না। সম্প্রতি জগদীশ গুপ্তের নতুন একখানি গল্পসংকলন উপলক্ষে নামজাদা এক কাগজে 'জগদীশ গুপ্ত ফিরে এলেন লুপ্তিবিস্মৃতি থেকে' বলে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে তাও পুরোটা ঠিক নয়। জগদীশ গুপ্ত এক দিনও লুপ্ত বিস্মৃত হতে পারেন নি— এমন কি 'অমুদ্রিত' 'ছাপা-নিঃশেষিত'-অর্থেও নয়।

এ বাদেও কথা থাকে। সবটাই লেখকের সমাদর লোভ বা স্বল্পশক্তি নয়, ভালো ছোট গল্পের পিছনে কাগজের দায়িত্ব-প্রবর্তনাও অনেকখানি। প্রায় দু-যুগ তিন যুগ পরে 'ছোট গল্প—নূতন রীতি'র যে নিরীক্ষা-পুস্তিকাগুলি পেলাম তার প্রস্তাবনায় বিমল কর এ বাবদে প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় আমাদের অবহিত করেছিলেন—

'এই পত্রিকাগুলি মূলত ব্যবসায়িক পত্রিকা। পরিচালক অথবা সম্পাদকের চোখে ক্রেতারূপ বিধাতার যে ছবিটি থাকে সেটি জনতা, অর্থাৎ সর্ব-সাধারণ। লেখা মনোনয়ন কালে ভাবতে হয় এমন লেখা প্রকাশ করতে হবে যা সাধারণ পাঠককে খুশি

করবে তৃপ্ত করবে। নাবালক স্কুলের ছাত্র থেকে কর্ম-অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় এবং নাবালিকা কার্পেট বোনা মেয়ে থেকে দিবানিদ্রা-আয়েসী গৃহিণী— এই বিচিত্র স্তরের ও রুচির একটি অদ্ভুত পাঠক সমাজকে প্রায় অদৃশ্য ভগবানের মতনই অনুভব করতে হয়। না করে উপায় নেই, পথ নেই। ফলে আমাদের পাঠকের কাছে যা সুবোধ্য সুগম্য অ-পীড়াদায়ক এবং মনোমতো হতে পারে— এমন গল্পই প্রকাশ করতে হয়। অসংখ্য এই ফরমায়েশি গল্পের ভূরিভোজ দিতে দিতে মাঝে মাঝে সম্পাদকদেরও ক্লান্তি আসে বিরক্তি আসে, হয়ত বিবেকেও লাগে, কিংবা বোধে, আর তাই মাঝে মাঝে তাঁরা এমন দু-চারটি গল্প প্রকাশ করেন যা প্রচলিত গল্পের স্রোত থেকে আলাদা, জাতে গুণে। আর বলা বাহুল্য কদাচিৎ কোনো পাঠকের প্রশংসা অথবা উৎসাহ এ-ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও প্রায়শ সম্পাদককে ধিক্কারেরও পাত্র হতে হয়।...

তা হলে উপায় ?

উপায় নিজেদের প্রকাশ-মাধ্যম নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া। বিমল করের ভাষায়—

"ছোট গল্প—নূতন রীতি'র সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা সবিনয়ে শুধু এইটুকু বলবেন : আমরা আমাদের মনোমতো করে গল্প লিখতে চাই, যে-লেখা সাধারণত চলতি পত্রিকাগুলির পক্ষে ছাপা সর্বদা সম্ভব নয়। বস্তুত এই কারণেই আমাদের এই গ্রন্থমালা, যার পাঠক স্বল্প, সহানুভূতিশীল। এবং পরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাবান।'

কেমন সে নূতন রীতি ? কারা বা সেই নূতন ? নূতন রীতি-গ্রন্থমালার প্রথম গল্পকার তখনকার হিসেবেও বয়স্ক, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। আজ পঁয়ষট্টি পোরোবার পর প্রথম গল্প-সিলেকশন প্রকাশে রাজি হবার পরেও এখনো নতুনতর হবার আশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। বরং সদ্য লেখক যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরাই অনেকে ঢের দিন হল মিশে গেছেন প্রচলিত যোগানদারদের দলে।

এই নতুনদের যাঁরা আগের আগের যুগের নতুন, সদ্য রবীন্দ্রাতিক্রমী, তাঁদের গল্প আরেকবার বিদেশীদের যাচাইদারির জন্য ইংরেজি সংস্করণে ছেপে বের করেছিলেন সিগনেট প্রেস, Best Stories of Modern Bengal এই নাম দিয়ে, বহির্বিশ্বে গ্রাহ্য হবার কোনো বিশদ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তাঁদেরও। কিন্তু একটা কথা এ দেশেও স্পষ্ট করে জানা, তাঁদের নূতনত্বে নূতন রীতির অভিধা চাপানো নয়। জগদীশ গুপ্ত কি প্রেমেন্দ্র মিত্র কি তারাশঙ্কর এমন কি বনফুল বা সুবোধ ঘোষ— শুধু দৃষ্টি-উপকরণে নয় রীতিতেও রীতিমতো নতুন, পাঠককে তা তাঁরা প্রত্যক্ষত জানতে দিতে চান নি। আর যাঁদের কথা বলছি—পঞ্চাশ দশকের এই নূতন রীতিরও পর যাঁরা এলেন, 'নূতন রীতি' এই চমকপ্রদ আখ্যার উপরেও যথেষ্ট আস্থা নেই তাঁদের। তাঁরা শাস্ত্রবিরোধী। কোন শাস্ত্রের বিরোধী ? এত লেখা হল ছোটগল্প, তার আধা-সিকি খানা-বিধি-ব্যাকরণ কেউ লিখেছেন বলেও তো জানি না। তা হলে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত যত বিহিত বিষয় রচনা-পদ্ধতি সব ভেঙে এঁরা আরো নতুন মুক্তি-সম্ভাবনা আনতে চান। এঁদের দু একটি পুস্তিকা কয়েকটি গল্প দেখেছিলাম। কিন্তু তার আগেই দেখি স্থির স্থিত অভিভাবকতায় এঁরা নিরাপদ নিরুদ্বেজিত হয়েছেন।

কিছুদিন আগে সদ্য দশকটির এক গল্প সংকলন হাতে এল। সাগ্রহে উল্টে খুঁজে পাই না কী বিশেষ বলবার ছিল সবে-যাওয়া দশকটির। কোথায় কী নতুন, এমন কি নতুন লেখক-নাম। সেই পুরোনো সব রথী

মহারথীদের সনাতন কলমের লেখা, দু-একটি অচেনা-চমকানো নাম, দেখতে গিয়ে দেখি সম্পাদকের স্নেহ-বাৎসল্যের অনুমোদন।

জয়শ্রী পত্রিকা এক ছোটগল্প প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলেন, সেও কিছু দিন হল। নতুন উন্মুখ লেখকের খোঁজ পেতে, বলা বাহুল্য। সেই প্রতিযোগিতার অনেক গল্প পড়তে পেয়েছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে। আমি কবিতা লিখি, জানি কবিতার মতো প্রতিপক্ষহীন ফলআশ্বাসহীন লেখা আর কিছুই নয়— মেনে নিয়েই কবিরা নিজের সময় নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন, লিখে জমিয়ে রাখেন তলিয়ে হারিয়ে ফেলেন, স্মৃতিস্বাদ একটুখানিক জমে থাকে হয়তো মনে মনে। গল্প লেখকরাই বলেছেন, কবিতারই সগোত্র ছোট-গল্প। হয়তো মূলত তাই, তবু নয়ও— প্রত্যক্ষ কাগজ-প্রবর্তনার মুখোপেক্ষা করে লেখা হয় ছোটগল্প। কিন্তু সে তো সভা-পর্বে। উদ্‌যোগ-অধ্যায়ের প্রায় শত-সংখ্য অভ্যাসীর লেখা পড়ে মিলতে চায় না ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধটুকু— তবে কি চাহিদা দুস্তর পাল্টে গেছে এত দিনে? তবে কি কাগজের ষড়যন্ত্র ভেঙে দিতে গোড়া থেকেই শর্তবদ্ধ গল্প লেখকেরা—ছোটগল্পের বিরুদ্ধে, অথবা একেবারে আরেক রকম কোনো ছোটগল্পের স্বপক্ষে? আমি তত বেশি তত ভালো পড়ুয়া নই গল্পের, আমার বন্ধু আশিস ঘোষ রায় বলতে পারবেন এখনকার প্রবণতা-পরিস্থিতির, তলিয়ে থাকা যদি অনুমান-অতীত কোনো তাৎপর্য থেকে থাকে, তার কথা। তাঁর অগ্রসূরি যাঁরা, হয়তো পূর্বতন নূতন রীতির প্রস্তাব রচয়িতা বিমল কর ঠিক ঠিক বলতে পারবেন যে সব গল্প তাঁরা পড়ে খুশি হয়েছেন, লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, লিখতে উৎসাহিত করেছেন তার প্রান্তপরিণাম, বা লভ্যটুকু কী, এখনকার শুদ্ধ রচনার সঙ্গে তার যোগসূত্রই বা কোন কোন জায়গায়।।

এতদিন লেখা হল, এবার একটা হিসেব নিকেশ হওয়া ভালো।

নতুন কবিতা

তিন নম্বর কবিতার বই বেরোলো রবীন সুরের ঃ 'রাবণের সিঁড়ি'। গোড়ার কবিতায় রবীন সুর লিখেছেন ঃ 'এই সব কবিতা আমি দীর্ঘ দিন ধরে প্রকাশ করে আসছি। মুদ্রিত লেখাগুলি সম্পর্কে তখন কেউই কোনো উচ্চবাচ্য করে নি।' আসলে শত কবিতার ভিড়ে হারিয়ে যায় কবিতা, কাগজের কবিদের মধ্যে আলাদা কবির মুখ চোখে পড়ে না। বিবেকবান লেখকের পক্ষে দুঃখের, যত দিন না নিজেকে একটু একটু করে কুড়িয়ে জমিয়ে তোলা যায়, অবিচার সইতে হয় অনুপায়ে।

এই জায়গা কবিতা-পর্যালোচনার নয়, কিন্তু রাবণের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বিদ্ধ কবিতা লেখকের অন্তরঙ্গ এক এক মুহূর্তের মুখ ভেসে ওঠে রবীনের কবিতায়, আপাতসপ্রতিভ তেকোণা ছুঁচোলো হরফের ওপর দিয়ে ভেসে যায় নির্ঘুম বালিশ-চাপা মগজের দিশেহারা আবেগ—একটু দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। দীর্ঘ দিন ধরে এই সব কবিতা সম্বন্ধে যদি কিছু না ভেবে থাকেন, তবে একজায়গা থেকে একদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখুন— নিঃশব্দে পত্যের লাশ ছিঁড়ে ঠুকরে খাচ্ছে পাখি, পাঠক, আপনারও হয়তো কিছু পাবার আছে এই লেখায়। সুবারবান ট্রেনের জানলা উঠিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ছে শীতের আচমকা গন্ধ, বিচুলি রঙের মাঠ, আবার মাঠো মফস্বল পার হয়ে আসা সেই কবিকে দেখছি—'বাস বন্ধ, ট্রাম নেই, সারা রাস্তা হাঁটুজল, লোড শেডিং—

জানা না-জানার সীমানা পেরোতে পারি না— আমি শালা রবীন সুর মাকুন্দ · চোখে কাউকে পুরো দেখতে পাচ্ছি না, ডাক্তার বলেছে চালশে, চশমা নিন…' এই বয়স-বিন্দুতে হঠাৎ দুই স্টেশনের মাঝখানে চলন্ত ট্রেন থামিয়ে বাড়ি চলে যেতে চাইছেন কবি। এই দোটানার স্পন্দনগুলো আরেকটু দেখতে দিন পাঠককে। এই তো সবে শুরু।

আরেকখানি নতুন কবিতার বইয়ের কথা বলি, দেবারতি মিত্রের লেখা 'যুবকের স্নান'।

মোমের নিচের আবছায়া রহস্য লাগা, বিচ্ছুরণময় সব শব্দ-ছবি দিয়ে দিয়ে কবিতা গড়েন দেবারতি, সদ্য দৃশ্য স্পন্দ তাঁর, হাতে অনতিপটু স্বভাব-সৌকুমার্যে বেজে ওঠে— তাঁর চোখ দিয়ে দেখি শিশুকিশোরীর স্বপ্নস্ফুট গাছপালানিসর্গের বাঁক, ঘুমপাড়ানী স্রোতে ভাসানো গোল নৌকোর খেলা দেখতে দেখতে, বাজনা গাছের নিচ দিয়ে লতাপাতা বাড়ির ওই ধারে, আয়নার দেশের রাস্তায় দূর্বামুখী নীলার মতো দেবী কিশোরীর জৈব সবুজে শ্বাস রোধ হতে হতে টের পেতে হয় রূপ-কথার নিচে প্রচ্ছন্ন তোলপাড় করছে সংরক্ত অবচেতন, মেয়েদের লেখায় এত পরত চোরাগলি দেখি নি বলে অবাক লাগে। শাদামাটা চুড়ি বাজানো সুন্দর লেখা মেয়েরা লেখেন, কখনো আরক্ত ঘূর্ণিত ক্রোধের মাধুরী মিলিয়ে দেন, কিন্তু দেবারতির লেখা তো তেমন সুন্দর নয়। আপাত সরলতায় ঢাকা এত ছল, এত নির্বাচিত পুরাতনী, এমন কটাক্ষময় লেখা 'যুবকের স্নান' পড়ে অন্য রকম, ভালো লাগল।

বিজ্ঞপ্তি

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ থেকে একটানা প্রেস ধর্মঘট চলার দরুণ অগ্রহায়ণ সংখ্যা জয়শ্রী প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়ে গেলো। প্রেসের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে এবং এই সংখ্যা দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মাধ্যক্ষ

২৮/১/১৯৭৯ জয়শ্রী

গাড়োয়ালী লোকগীতিতে সমাজচিত্রের একদিক

মানসী মুখোপাধ্যায়

ম্যাকসিম্ গোর্কী মন্তব্য করেছিলেন—"জনতাই সৃষ্টির প্রথম দার্শনিক এবং আদি কবি"। এই সব আদি কবিদের রচনা পড়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কারণ তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর, মুখে মুখে গান রচনা করতেন। তাঁদের সে রচিত গানে মনের অনুভূতি বা প্রকৃতির রূপ বর্ণনা ব্যতীত মানুষের জীবনের নানা দিকের চিত্র পাওয়া যায় এবং ধৈর্যের সঙ্গে অনুধাবন করলে এই সব লোকগীতের মাধ্যমে সে যুগের একাধিক ঐতিহাসিক-সামাজিক আলেখ্য আমরা দেখতে পাই। উদাহারণ স্বরূপ গাড়োয়ালী লোকগীতের কথা উল্লেখ করা যায়।

গাড়োয়ালী লোকগীত শুধু নিরক্ষর জনতা দ্বারা রচিত বললে সবটা বলা হয় না। এ গানের শতকরা আশী ভাগ রচনা করেছিলেন নিরক্ষর, নির্যাতিত গাড়োয়ালী রমণীরা। এই সব দুঃখিনী রমণীরা নিজের দুঃখই কেবল লোকগীতের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেন নি, গানের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ গাড়োয়ালী জীবন-চিত্র তুলে ধরেছেন। আমি সেই লোকগীতের ভাণ্ডার থেকে গাড়োয়ালী-জীবনের এক দিকের চিত্র এখানে তুলে ধরব যা সামাজিক এবং ঐতিহাসিকও।

গাড়োয়ালে দু ধরনের জমিতে চাষবাস হয়ে থাকে। এক, জমি নদীর নিকটে হওয়ার দরুণ জলের সাহায্যে অনায়াসে ফসল হয়ে থাকে। দুই, এ ধরনের জমি পার্বত্য অঞ্চলে সিঁড়ির ধাপের মত দেখতে হয়। এ জাতীয় জমিতে ফসল ফলান সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। তাই প্রকৃতির করুণাধারাকে আহ্বান জানাতে গাড়োয়ালীরা নানা উপায় অবলম্বন করে থাকে, জীবন-বলি দিয়ে থাকে; যে বলির জীব যেমন পশু তেমনি মানুষও এবং এই নরবলি নিয়ে নানা ধরনের ঘটনার ছবি নানা ধরনের গানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এমনি তিনটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনটি স্বাদের লোকগীত এখানে পরিবেশন করব।

গাড়োয়ালে নদী থেকে নহর কেটে জমিতে জলসেচনের একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধোসিংহ ভাণ্ডারী এই ভাবে নহর কেটে জলসেচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য আরো অনেকে এ ধরনের কাজ করেছেন। কিন্তু মাধোসিংহের নহর কাটার পেছনে প্রণয় ও নরবলি মিলিত হয়ে এ ঘটনাকে বিখ্যাত করেছে।

মাধোসিংহের পরিচয়—তিনি গাড়োয়ালের ষষ্ঠ স্বাধীন রাজা মহীপতি শাহের দ্বিতীয় বাহাদুর সেনাপতি এবং অমাত্য ছিলেন। ইনি ভোট (তিব্বত) এবং কুমায়ুনের সঙ্গে একাধিকবার যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি অসাধারণ বীর ছিলেন। তাঁর বীরত্ব সম্বন্ধে বলা হয় যে ঃ—

এক সিংহ রণ কো, এক সিংহ বন কো,
এক সিংহ মধোসিং ঔর সিংহ কাহে কো,

তিনি গাড়োয়াল ও তিব্বতের সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন। সীমান্তে তিনি যে পাকা গাঁথুনি তৈরি করিয়েছিলেন তার কিছু কিছু অবশেষ এখনো আছে।

রামপুর-বুশহরের রাজা উদয়সিংহ অথবা বিজ্জা-সিংহর সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর শেষ যুদ্ধ হয়। স্বাস্থ্য-ভঙ্গের দরুণ তিনি মৃত্যু আগত দেখতে পান। তখন তিনি নিজের সেনাদের এই অনুরোধ করেন যে, তাঁর মৃত্যু ঘটলে সে সংবাদ যেন শত্রুপক্ষের কাছে গোপন রাখা হয়। মৃত্যুর পর সেজন্য তাঁর শব যেন তেলে ভেজে কাপড়ে জড়িয়ে বাক্সবন্দী করে রাখা হয়। শত্রুরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানবে না বরং তিনি জীবিত আছেন জেনে তারা আতঙ্কগ্রস্ত থাকবে। সত্যিই, মাধোসিংহের মৃত্যু-সংবাদ বহুদিন যাবৎ সকলের অজ্ঞাত ছিল।

এই বীর মাধোসিংহ "রুকমা" নামে এক গাড়ো-য়ালী রমণীর প্রেমে পড়েন এবং তাকে নিজের গ্রাম "মলেথা"-য় আনতে চান। কিন্তু মলেথার জমি অনুর্বর বলে রুকমা তাঁর গ্রামে যেতে আপত্তি জানায়।

প্রেমিক মাধোসিংহ তখন মলেথার জমিকে উর্বর করার জন্য প্রাণাপণ চেষ্টা শুরু করলেন। নদী থেকে সুদীর্ঘ নহর কাটালেন এবং মধুর কল্পনা করলেন যে, এবার মলেথার জমি সিক্ত ও উর্বর হয়ে সবুজে ছেয়ে যাবে তখন তাঁর অন্তরলক্ষ্মী তাঁকে প্রেমধারায় ধন্য করে মলেথায় এসে বসবাস করবে।

কিন্তু মানুষের ভাবনাকে বানচাল করতে বিধাতা তখন তৎপর হলেন, পাশার দানের মত মাধোসিংহের রঙিন কল্পনাকে উল্‌টে দিয়ে তিনি রসিক ব্যক্তির মত মজা দেখতে লাগলেন। মাধোসিংহের তৈরি নহর দিয়ে কলকল ছলছল করে প্রাণদায়িনী নদীর জল আর প্রবাহিত হল না। মাধোসিংহ চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

এমনি যখন মাধোসিংহের মনের অবস্থা এক দিন রাত্রে দেবীকে স্বপ্নে দর্শন করলেন, দেবীর আদেশ শুনলেন। কিম্বদন্তী যে, দেবীকে সন্তুষ্ট করতে তিনি নিজের সন্তান গজেসিংহকে দেবীর উদ্দেশে নরবলি দিলেন। এর পর নহর বেয়ে তরতর করে নদীর জল লেথার জমিকে সিক্ত ও উর্বর করল।

মাধোসিংহ এ সুসংবাদ রুকমাকে জানিয়ে তাকে আবার মলেথায় আসতে অনুরোধ জানালেন। তাঁর সেই অনুরোধ নিয়ে দুই প্রণয়-প্রণয়িনীকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি গাড়োয়ালী লোকগীত আছে যেমন ঃ

—ভাণ্ডারী কেমন তোমার মলেথা ?
আমার মলেথায় এসে যাও রুকমা,
আমার মলেথায় মোষের গোয়াল আছে !
আমার মলেথায় ঘন্টার জমজমাট পাবে !
(অর্থাৎ গলায় ঘণ্টা বাঁধা বহু পোষ্য জীবের উপস্থিতি বোঝাচ্ছে)
আমার মলেথায় ছাগলের পাল দেখবে !
—ভাণ্ডারী.....মলেথা ?
দেখতে সুন্দর আমার মলেথা !
প্রবাহিত নহর আছে আমার মলেথায়।
আমার মলেথায় গাঁয়ের নিচে ক্ষেত,
(আর)মলেথায় গাঁয়ের ওপর জল-ঘাট।
—ভাণ্ডারী.....মলেথা ?
আমার মলেথায় রসুনের ক্ষেত আছে।
আমার মলেথায় পালং-এর কেয়ারী আছে।
আমার মলেথায় সুন্দরীদের চমক আছে।
(দেখবে) মলেথায় পুরুষদের গরব আছে।
রুকমা এসে যাও না আমার মলেথায়।

আর একটি গাড়োয়ালী লোকগীতে বলির লক্ষ্য হল বাড়ির ছোট বধু। কারণ ঐ। এক, প্রকৃতি বিরূপ, বৃষ্টিপাতের নাম-গন্ধ নেই। বাড়ির গৃহিণী তাই খুব চিন্তিত। ক্ষেতে ধানের চারা জলের অভাবে শুকিয়ে লাল হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর 'বডিয়ারী' ক্ষেতে নহর বেয়ে জীবনদায়িণী জলের ধারা এসে জমিকে সিঞ্চিত করলে ধানের চারা যেন লকলকিয়ে উঠে বাতাসের কোলে দোল খায়, সোনার ধানে ধরণীর আঁচল ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে। কিন্তু এ বছর কী হল! গৃহিণী ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন, এ অবস্থায় তিনি কি করবেন? তিনি কি দেবীকে প্রসন্ন করতে নরবলি দেবেন? গৃহিণী ও তাঁর ছেলের উৎকণ্ঠা, প্রশ্ন ও শেষে দুজনের চিন্তার উপসংহার নিয়েই এই মর্মস্পর্শী গাড়োয়ালী লোকগীতটি রচিত হয়েছে, যেমন ঃ

বডিয়ারী ক্ষেতে ধান লকলক করে ভৈ জীরি ঝুমকৌ। ('ইভ জীরি ঝুমকৌ' মানে অর্থহীন শব্দ, ছন্দ বজায় রাখতে গানের শেষে ব্যবহার করা হয়ে থাকে)

কিন্তু বডিয়ারী ক্ষেতে তো জল আসছে না,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ।
যা তো সোনা আমার জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা
করে আয়, ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'আমি কি করব, নরবলি দিতে হবে,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'ছেলের বাবা, বল এখন কি করি
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'বল আমার মা, কাকে বলি দেবে,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'বড় ভাইকে বলি দিই তো রাজ্য শূন্য হবে'
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'বাবাকে বলি দিই তো সভা শূন্য হবে,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'তোকে বলি দিলে মা চৌকা (রান্নাঘর) শূন্য হবে,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'ছোট বোনকে বলি দিলে মা দিশাহারা হব,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
(এজন্য) 'ছোট ভাই-বৌ তুমি বাপেরবাড়ি যাও
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'তখন ও বেচারি কাঁদতে কাঁদতে বাপেরবাড়ি গেল,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
(বলল) 'বাবা শেষ বারের মত বস্ত্র উপহার দাও,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'আমার মা শেষবারের মত কেশবিন্যাস করে দাও;
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
(উনি টুকলেন) 'এ অলক্ষণে কথা কেন বলছ,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
'তখন ও (ছোট বৌ) বলিরপাঁঠার মত শুয়ে পড়ল,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ'।
(শাশুড়ি ঠাকরুণ এসে বলে গেল)
'আমার বৌ কাল তোমাকে বলি দেওয়া হবে,
ভৈ জীরি ঝুমকৌ।

শেষ যেটি বর্ণনা করছি সে প্রথাকে গাড়োয়ালী ভাষায় বলে "বেডওয়ার্তা"। যাকে বলি দেওয়া হয় তাকে বলা হয় "বেডা"। হরিজনদের মধ্য থেকেই বেডাকে নির্বাচন করা হত। কারণ ঐ একই, বারি-পাতের অভাব, তাই ফসলেরও অভাব! যাতে দেবতা তুষ্ট হন, বৃষ্টি দান করেন তাই হরিজনদের মধ্য থেকে একজনকে জীবন বলি দেবার জন্য আহ্বান জানানো

হত। যে 'বেডা' হত সে যদি পাহাড়ের শিখর থেকে বিশেষ ঘাসের তৈরি দড়ির ওপর বসে একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে জীবন্ত নেমে আসতে পারতো তবে তার সম্মান ও প্রাচুর্যের সীমা থাকত না। আর যদি জীবনান্ত হত তবে সেই সম্মান ও প্রাচুর্য তার পরিবারের লোকেরা ভোগ করত।

সাধারণতঃ গরীব, বৃদ্ধ, হরিজন পরিবারের মঙ্গলের জন্য প্রাচুর্যের লোভে স্বেচ্ছায় জীবন দিতে এগিয়ে আসত। জ্যোতিষী একটি শুভ দিন স্থির করে দিলে গ্রামপ্রধান বেডাকে কাঁধে করে বলির স্থানে নিয়ে আসত। তাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে ক্ষীর খাওয়ান হত। ইতিমধ্যে খাসের দড়ি একটি পাহাড়ের শিখর থেকে তার পাদদেশ পর্যন্ত বাঁধা হত। পাহাড়ের শিখরের দিকে দড়ির ওপর একটি কাঠের তক্তা (সাইকেলের সীটের মত দেখতে) রাখা হত যার নিচে চাকা থাকত। বেডাকে এই তক্তার ওপর বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। বেশীর ভাগই অবধারিত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিত। 'বেডওয়ার্তা' বা নরবলি দেখতে দশ গ্রামের লোকে একজায়গায় ভেঙে পড়ত। গান বাজনা হত, উত্তেজনার বন্যা বয়ে যেত।

এই 'বেডওয়ার্তা' দেখতে আসা নিয়ে লোকগীতটি এইরকম ঃ

বেডার রশি তৈরি হয়েছে।
বেডার তোরণ বসান হয়েছে (বেডার সম্মানে) '
আমি বাবা মেলায় (বলির স্থানে) তামাসা দেখতে যাব
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী (জাতিরা) সব বলে গেছে ॥
বাগুড়ী, বুটোলা, (জাতিরা) সব চলে গেছে।
কেমারিয়ার (পরগণা) রাণারা (জাতি) চলে গেছে।
দে বাবা রিঙ্গালের (গাছের ছাল থেকে তৈরি) শাড়ি।
দে বাবা সুন্দর গয়না ॥
তুই বাবা পাল্‌কিবাহক ডাক।
আমি মেলায় তামাসা দেখতে যাব ॥

গাড়োয়ালে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এই নরবলি প্রথা ইংরেজ এ দেশ অধিকার করার পরও প্রচলিত ছিল। বৃটিশ আমলে প্রথম রাজা সুদর্শন শাহের দৃষ্টিকে এই কুপ্রথার প্রতি প্রথম আকর্ষণ করা হয়। তাঁর শাসনকাল ১৮১৫ থেকে ১৮৫৯। তিনি এই কুপ্রথাকে রদ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বৃটিশ গাড়োয়ালের তৎকালীন কমিশনারের সহযোগিতায় এ প্রথাকে আইন করে চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়া হয়।*

---

* শ্রদ্ধেয় ক্যাপটেন শুবরীর সিং পঁবার আমাকে কিছু কিছু সংবাদ দিয়ে প্রবন্ধ লিখতে সাহায্য করেছেন। বেডার উপর গানটি তিনিই দিয়েছেন। এ ছাড়া নিম্নলিখিত দুটি বইয়ের সাহায্য নিয়েছি :
রাহুল সংস্কৃত্যায়ন—"হিমালয়ের পরিচয়"।
গোবিন্দ্ চাতক—"গাড়োয়ালী লোকগীত এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন"।

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্যে দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন
(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২·৫০)

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

এক সূত্রে বাঁধা

তুষারমৌলী হিমালয়ের পাদত্য অঞ্চল থেকে কন্যাকুমারিকার বেলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের এই উপমহাদেশ বিচিত্র ও বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ।

এই বিচিত্রবর্ণ সংস্কৃতিকে একসূত্রে গ্রথিত করার ভূমিকায় ভারতীয় রেলপথ অনন্য।

ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মহান মন্দির, পুরী ও ওয়ালটেয়ারের মনোরম সৈকত এবং চিল্কার দিগন্ত-বিস্তারী হ্রদের সংযোগসাধক দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে এই অপরূপ দেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনে ও সুদৃঢ় ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় রেলপথেরই সহযোগী।

দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে

২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	১৮·০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পুরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/66

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Re. 1·00 with Regd. Postage Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

7 FEB 1979

জয়শ্রী

নেতাজী সংখ্যা ॥ **NETAJI NUMBER**

৪৩ বর্ষ । পৌষ ১৩৮৫

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠছে এই খণ্ডগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশ-নায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার সদম্ভ জবাব বাংলায়

৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। যাঁরা আজও গ্রাহক হননি তাঁরা এককালীন ১২০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন।

'সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা—বিশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁহার অভিভাষণ প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সাগ্রামের প্রধান সেনাপতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য 'জয়শ্রী প্রকাশন' ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ড রমেশচন্দ্র মজুমদার

'বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়—তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একসূত্রে গাঁথা। সত্যরঞ্জন বক্সী

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী

সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ পৌষ। ১৩৮৫ নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া ? ৫৩১

The Forward Movement within the Indian-National Congress
H. V. Kamath ৫৪৩

'না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথ' ৫৫৭
চারণিক

আলোচনা

আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী ও স্বাধীনতা ৫৬৩
ক্ষণেশ ঘোষাল

সেমিনার

বাংলায় সুভাষ-চর্চা ৫৭১
পবিত্রকুমার ঘোষ

স্মৃতিকথা : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ৫৭৯
গোপাললাল সান্যাল

Netaji in Burma ৫৮৭
Samarendra Kundu

Sweet Memories ৫৯১
Prabhudayal Himatsingka

কবিতাগুচ্ছ : রাজীব চক্রবর্তী ৫৯৩
নেতাজীকে প্রণাম
৮২-তম জন্মদিনে
সেদিন আসবে কবে ?

সরকারী নথিপত্র
গোপন দলিল ৫৯৫

সেমিনার
আমেরিকায় সুভাষবাদ ৫৯৭
রঞ্জন বরা

২৩শে ৬০০
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

অনিল রায় স্মৃতি-বক্তৃতামালা ৬০৩

স্মৃতি-তর্পণ ৬০৪

প্রচ্ছদ : দিল্লীতে নেতাজী মূর্তি-প্রতিষ্ঠা। আলোকচিত্র : নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক : সুনীল দাস

নিজের ভাষায় অপরের সাহিত্য পড়ুন

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কন্নড় সাহিত্যিক শিবরাম কারন্তের উপন্যাস

মাটির টানে ২০·০০

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত ওড়িয়া সাহিত্যিক গোপীনাথ মোহান্তির উপন্যাস

অমৃতের সন্তান ২০·০০

জ্ঞানদেব-বিরচিত

জ্ঞানেশ্বরী ২০·০০

রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মজীবনী

আত্মকথা ৩০.০০

মারাঠী ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপটের উপন্যাস

কিস্তু কে খবর রাখে ১৫·০০

সাহিত্য অকাদেমি। রবীন্দ্র স্টেডিয়াম। কলিকাতা-২১। 461399

With the best Compliments of :

CALCUTTA FAN WORKS (P) LTD.

30, CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA-16

MUKAND IS
STEEL TECHNOLOGY

REGD. OFFICE :

Mukand Iron & Steel Works Ltd.

LAL BAHADUR SHASTRI MARG
KURLA
BOMBAY 400 070

গণতন্ত্রের শিখা অনির্বাণ রাখুন

ছাব্বিশে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে এ দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এ রাজ্যের ভূমিকা সারা দেশের সামনেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতীতে একদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এই বাংলার মাটিই ছিল দুর্জয় ঘাঁটি। সেই ঐতিহ্যের পথ বেয়েই এই রাজ্যের মানুষ স্বাধীন দেশেও গণতন্ত্রের শত্রু স্বৈরতন্ত্র ও সন্ত্রাসের কাছে মাথা নীচু করেন নি। এক হিংস্র স্বৈরতন্ত্র এই রাজ্যকে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত করেছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পদদলিত করেছে। বিনা বিচারে বন্দী, খুন, হামলা, জেলখানায় গুলি, সন্ত্রাস —এ সবকিছুই ছিল এরাজ্যের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। জরুরী অবস্থায় সারা ভারতের মানুষ যে অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করেছেন পশ্চিমবাংলায় সেই অন্ধকার অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু গণতন্ত্রপ্রিয় এরাজ্যের মানুষ সেই অন্ধকারকেই শেষ কথা বলে মেনে নেন নি। গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের লড়াইতে শুরু হয়েছে গণতন্ত্রের।

কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়নি। জরুরী অবস্থার জঘন্য অপরাধগুলির জন্য যাঁরা এতটুকু বিচলিত নন, যাঁরা আইনের শাসন, সংবিধান, বিচারালয়ের ভূমিকা, শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী গণতান্ত্রিক মানুষের অধিকার, বিরোধী রাজনৈতিক দলের অধিকার, সংবাদপত্রের অধিকার সব কিছুকে ধ্বংস করেছিলেন, তাঁরা আবার সক্রিয় হতে চাইছেন।

কিন্তু শেষ বিচার জনগণই করবেন। স্বৈরতন্ত্র আবার মাথা তুলবে, না, গণতন্ত্রের শিখা অনির্বাণ থাকবে? সে রায় জনগণই দেবেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে আমাদের আবেদন—স্বৈরতন্ত্রের অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ হোন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

ICA523 A/79

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ জন্য দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ ঘোষেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

SMM-2/60

WE ARE SOLE DISTRIBUTORS IN EASTERN INDIA FOR :

DEPEND ON US... YOUR SOUND COMPANION

MURPHY
Radio

AHUJA
P. A. Equipment, Stereogram, Stereo Amplifier, Tape Recorder

TELEVISTA
Television

U. M. S.
Electronic Calculator

MECOM
Car Radio

ARCEY
Car Aerial, Condenser Suppressor

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

DEBSONS PRIVATE LIMITED
CALCUTTA • PATNA • JABALPUR
CUTTACK • GAUHATI

BEEVASTED

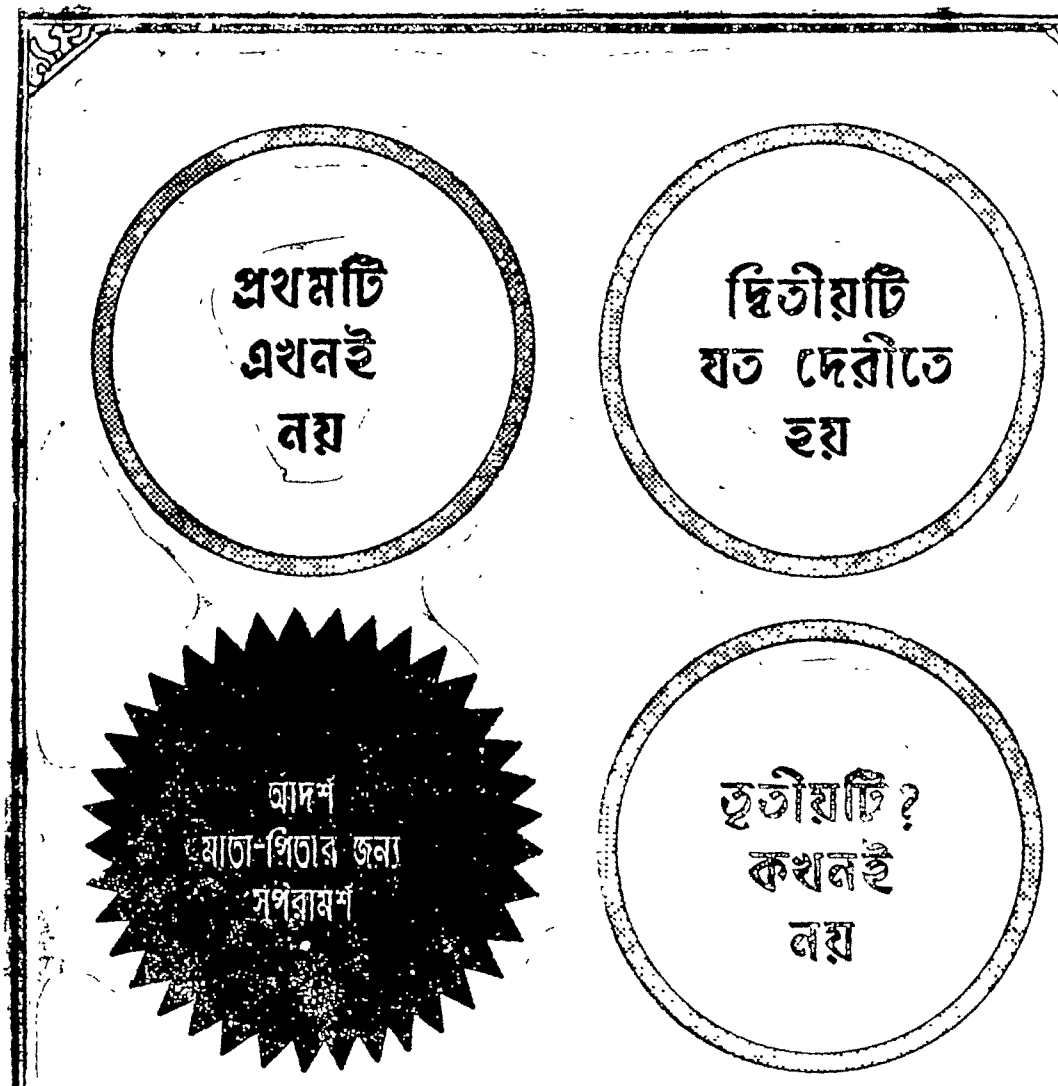

আপনার কাছাকাছি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
কিম্বা গ্রাম স্বাস্থ্য সহায়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং
সাজসরঞ্জাম দেবেন

আজই যোগাযোগ করুন

davp 78/487

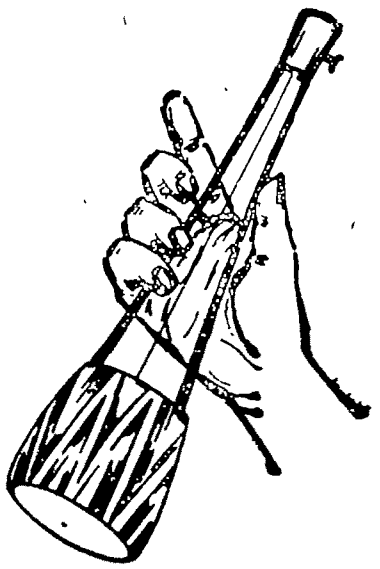

জনগণের
আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে
একসুরে বাঁধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

Skill and sporting spirit
welded together
make a true
sportsman

IOL Indian Oxygen Limited

IOX/CAS-16/78

এই প্রতীক
কী এবং কেন?

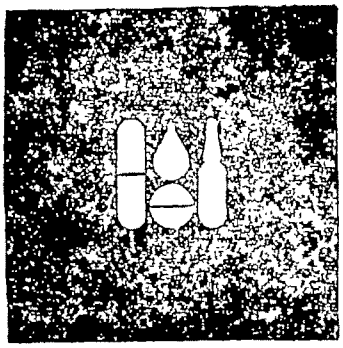

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌—
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্‌ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল্‌
ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড,
কলিকাতা-৭০০০৭১

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড
আপনাদের সেবায়

EIP/CAS-PR-1 BEN

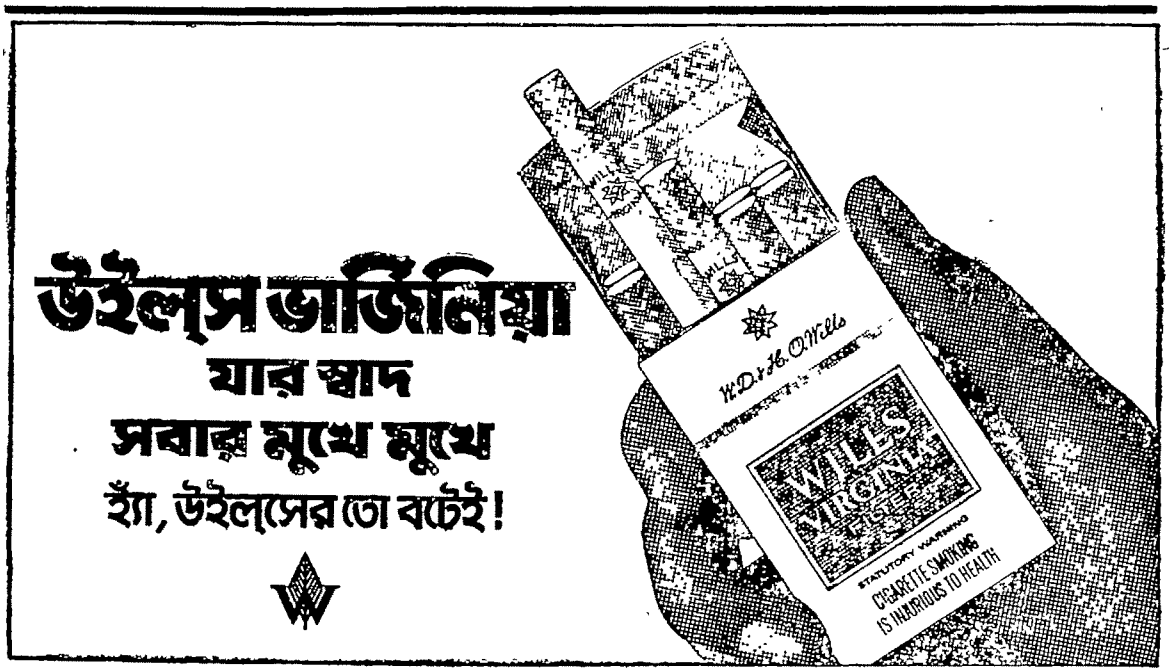

WVF 9304

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

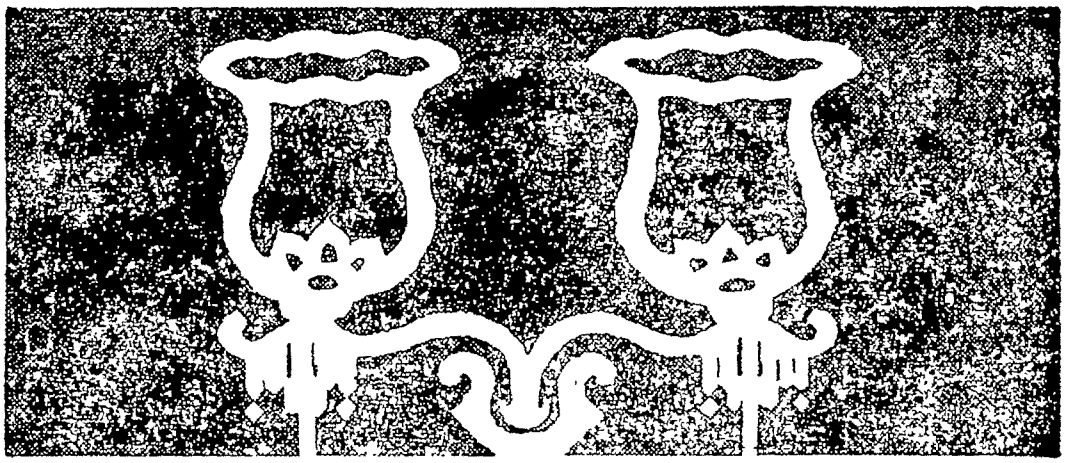

বেলগাছিয়া ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান

দু' দিকে দুই নেতা। একজন সমাজের। একজন সংস্কৃতির। প্রথম জনের নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় জনের নাম রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। দ্বারকানাথ গড়লেন বেলগাছিয়া ভিলা। সমাজের সেরা মানুষদের মেলামেশার সে যেন এক তীর্থক্ষেত্র। ইংরেজ বাঙালী ভেদাভেদ নেই। আলোয়, ফুলে, বাজনাবাদ্যিতে, নাচে, গানে, খানা-পিনায় বেলগাছিয়া ভিলা সব সময়েই সরগরম। যতীন্দ্রমোহন গড়লেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা। বাংলা নাটক নিয়ে সেইখানে শুরু হল পরীক্ষার পালা। সেইখানেই মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটক। সেইখানেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের উৎসাহী বিকাশ। একদিন বেলগাছিয়া ছিল বাঙালী সংস্কৃতির পীঠস্থান।

এই বেলগাছিয়া একদিন ছিল কলকাতা শহরের সীমান্ত অঞ্চল। এইখানেই ট্রাম লাইনের শেষ। এইখানেই গ্যাসের আলোর শেষ খুঁটি। বেলগাছিয়ার পরেই জঙ্গলাকীর্ণ মফঃস্বল। এখন দৃশ্যপট গেছে বদলিয়ে। এখন বেলগাছিয়াকে ঘিরে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তৃত জনপদ। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন কলোনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের হাট-বাজার। কিন্তু কলকাতার এত ঘনিষ্ঠ থেকেও বেলগাছিয়া যেন কত দূরে। তার কারণ যত মানুষ পাড়ি দিতে চায় শহরে, তার তুলনায় গাড়ির সংখ্যা কম। ট্রামে-বাসে তাই প্রতিদিন ঝুলন্ত ভীড়। মানুষের প্রাত্যহিক আসা-যাওয়ার পথ স্বাচ্ছন্দ্যহীনতার জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির।

ভূগর্ভ রেল সেটা জানে। জানে বলেই ভূগর্ভ রেল তার বিপুল কর্মযজ্ঞের দ্বিতীয় ঘাঁটি গড়েছে এইখানে। কাজ চলেছে দিন রাত্তির। এবং দ্রুত গতিতে। আসলে মানুষের চলা-হাঁটার জীবনে গতির দ্রুততায় জোগানোই ভূগর্ভ রেলের প্রতিজ্ঞা। বলা বাহুল্য সেই গতির সঙ্গে থাকবে ভ্রমণের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য।

ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি।

medium

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

The chosen one.

For your transistor.

Red Eveready

Red Eveready is the chosen one because it is:

The guardian for your transistor.
Red Eveready ensures guaranteed protection for your transistor through a leakproof poly-laminated tube reinforced with a special anti-corrosive jacket. Red Eveready is the only guaranteed leakproof battery in India.

The power-house for your transistor.
Red Eveready has a specially formulated EMD chemical mix which ensures super-power and clear, full-bodied sound for a longer period.

The sharpest ear for your transistor.
Red Eveready gets you even shortwave stations on your transistor extremely clear and loud. Day after day.

The tireless performer for your transistor.
Red Eveready's super-power lasts longer than any other battery in India. That means more music hours on Vividh Bharati for you without paying for it.

So power your transistor with the chosen one.
Red Eveready.

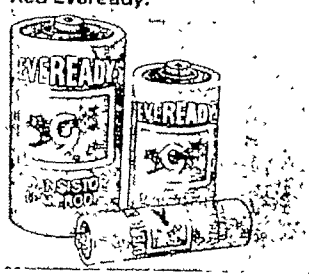

UNION CARBIDE

Registration/UC/471

চতুরঙ্গ

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ । পৌষ । নবম সংখ্যা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া ?

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া কি সুরু হয়েছে ? প্রশ্নটা উঠেছে চীন-ভিয়েৎনাম শস্ত্রসংঘাতকে ঘিরে। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯, সূর্যোদয়ের পূর্বে চীনা-বাহিনী ব্যাপকভাবে গোটা চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্তের ১২০০ কিলোমিটার জুড়ে এই সংঘাতের সূচনা করেছে। সেদিন ছিল শনিবার। চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্তের পূর্বে টনকিন উপসাগরের নিকটবর্তী ভিয়েৎনামের লংসন থেকে পশ্চিমে লাওসের সংলগ্ন লাই চাও পর্যন্ত চীনা-বাহিনী বিভিন্ন স্থানে, ভিয়েৎনামের সীমান্ত অতিক্রম করে। চীনা ট্যাঙ্ক, বিমান, ভারী ও দূর-পাল্লার কামান নিয়ে চীনা-বাহিনীর এই অভিযান সুরু হয়েছে।

চীন-ভিয়েৎনাম সংঘাত যে আসন্ন হয়ে উঠেছে, সে-সংবাদ শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজধানীগুলিতে নয়, ইউরোপ ও আমেরিকার পরাক্রান্ত শক্তিগুলির দপ্তরেও অজানা ছিলো না। শুধু তাই বা কেন ১৯৭২-এ আমেরিকার সে-সময়কার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে চীনের রাষ্ট্রনেতারা পিকিং-এ আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসে নানাভাবে আপ্যায়ন করবার পর চীন ত্যাগের পূর্বে সাংহাই থেকে চৌ-নিক্সন যৌথ-বিবৃতিতে কোনও শক্তির মুরুব্বিয়ানা-বিরোধী বা 'anti-hegemonism' সর্ত জুড়ে দিয়ে পরোক্ষে যেদিন সোভিয়েত রুশের বিরোধিতা করা হয়, সে-দিন থেকেই ভিয়েতনাম কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরোধ তপ্ত হতে থাকে। কারণ তখন মার্কিন সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট শক্তির বাঁচার তীব্র সশস্ত্র সংগ্রামে সোভিয়েত রুশের অবারিত সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য চীনের সাহায্যের চাইতেও অপরিহার্য ছিল এবং রাজ-নৈতিক তত্ত্বগত দিক থেকেও ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সমীপবর্তী ছিল। ইন্দোচীনের অপর রাষ্ট্র কাম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পর্ক ছিল ভিন্নতর। কাম্বোডিয়ার পার্টির মুরুব্বী চীনা পার্টি, যেমন ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট পার্টির মুরুব্বী সোভিয়েত রুশের কম্যুনিষ্ট পার্টি। ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট পার্টিতে সে-সময় দুই মতের সদস্য—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট পার্টির ১৪-সদস্যবিশিষ্ট পলিটব্যুরোর মধ্যে এঁরা রয়েছেন কিন্তু সংখ্যায় গরিষ্ঠ চরমপন্থীরা। ভিয়েৎনামকে আমেরিকা স্বীকৃতি দিয়ে তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করলে ভিয়েৎ-নামের নরম বা উদারপন্থীরা—যাঁরা সোভিয়েত রুশের

কুক্ষিগত হওয়ার বিরোধী ছিলেন—ক্রমশ দুর্বল না হয়ে দানা বাঁধতে পারতেন। ভিয়েতনাম-উদারপন্থীদের অন্যতম হলেন প্রধানমন্ত্রী ফাম্ ভ্যান ডাং (Pham Van Dang)। চরমপন্থীদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভো নগুইয়ান গিয়াপ (Vo Nguyan Giap), সেনাবাহিনীর প্রধান ভ্যান তিয়েন দুঙ্গ (Van Tien Dugn) এবং ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী লে ডুয়ান (Le Duan)। এরা নরমপন্থীদের কোণঠাসা করে চীনের সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮-এর ২৫ ডিসেম্বর চীনা-আশ্রিত কাম্বোডিয়ার অত্যাচারী পল পট (Pol Pot) সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান সুরু করে। কাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়া-ভিয়েতনাম সংঘাত প্রথম ঘটে ১৯৭৭-এর মে মাসে। অর্থাৎ, কাম্পুচিয়ার রাজধানী নম্ পেন্ থেকে মার্কিন সামরিক সাহায্য-আশ্রিত লন্ নল সরকারের, পল পটের নেতৃত্বে-বিদ্রোহী কাম্বোডিয়, খেমের রুজ-বাহিনীর হাতে অপসারণের এক মাসের মধ্যেই। চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের সম্পর্ক সহস্র বছর যাবৎ সন্দেহের ও অসম্প্রীতির। ভিয়েতনাম-মার্কিন যুদ্ধের সময় চীন ভিয়েতনামকে সাহায্য করেছে, এক কম্যুনিষ্ট শক্তি অন্য কম্যুনিষ্ট শক্তিকে যেমন ন্যূনতম সাহায্য করে। যুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামের পুনর্গঠনের জন্য সে-সাহায্য আরও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫-এ-ই সে-সাহায্য ধাক্কা খেয়েছে। সে-বছর ২২শে সেপ্টেম্বর পিকিং সফররত একটি ভিয়েতনামী প্রতিনিধিদল চীনা সরকারের 'মুরুব্বিয়ানা' বা 'hegemonism' সম্পর্কিত আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। 'হেজিমনিজম' বলতে চীনারা সোভিয়েত রুশের খবরদারীর ও সম্প্রসারণের বিরুদ্ধতা বোঝাতে চাইতো। ভিয়েতনামী প্রতিনিধিদলের ঐ শব্দটি প্রয়োগ সম্পর্কে প্রতিবাদের কারণও সেখানেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবাদের ফলে ভিয়েতনাম পুনর্গঠনে চীনের সাহায্যের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হল।

১৯৭৮ এর ১২ই এপ্রিল চীনা-সমর্থিত কাম্পুচিয়া বা কাম্বোডিয়ার পল পট সরকারের নম্ পেন্স্থিত বেতার থেকে ঘোষিত হয় যে ভিয়েতনামী-বাহিনী কাম্পুচিয়া আক্রমণ করেছে। এর পর ১৯৭৮এর ৩০ এপ্রিল চীন সূত্রে জানা গেলো ভিয়েতনামে চীনা বসবাসকারীদের এবং চীনাভাষী ভিয়েতনামী নাগরিকদের (ethnic Chinese) ভিয়েতনাম থেকে বহিষ্কার সুরু হয়েছে। প্রায় দুই লক্ষ মানুষ এইভাবে কয়েক মাসের মধ্যে ভিয়েতনাম থেকে চীনে বহিষ্কৃত হয়ে চীন-ভিয়েতনাম সংঘাতের ক্রম-অবনতি ঘটায়। ফলে, ২রা জুলাই চীনা সরকার ভিয়েতনামকে সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেয় এবং সেখানে পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত চীনা ইঞ্জিনীয়ারদের দেশে ফিরবার নির্দেশ দেয়। এরপর ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ কাম্বোডিয়ার ওপর ভিয়েতনামের আক্রমণ এবং ১৯৭৯-এর ৭ই জানুয়ারী ভিয়েতনাম বাহিনীর নম্ পেন্ দখল, পল পট সরকারের কাম্বোডিয়ায় বা কাম্পুচিয়ায় শাসন-ক্ষমতা থেকে বিতাড়ন, এর পশ্চাদ্ভূমিতে সোভিয়েত রুশের এবং পৃষ্ঠভূমিতে ভিয়েতনামের পক্ষপুটে-আশ্রিত হেং সাম্রিন-এর (Heng Samrin) নেতৃত্বে "The Kamuchean National United Front for National Salvation" নামধারী কাম্বোডিয়-বিদ্রোহীগোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলে—ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া সংঘাতের এক পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৭ই জানুয়ারী কাম্পুচিয়া

থেকে পল পট সরকারের বিতাড়নের ৪ দিন পর রাষ্ট্রসংঘের এক অধিবেশনে ভিয়েতনামকে কাম্পুচিয়া আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত ক'রে চীন অবিলম্বে সেই রাষ্ট্র থেকে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর অপসারণ দাবী করে। কিন্তু চীন-ভিয়েতনাম সীমান্তে এই দুই পক্ষের সীমান্ত-বিরোধ গত তিন বছর যাবৎ যে তপ্ত থেকে তপ্ততর হতে থাকে চীনের দিক থেকে গত কয়েক মাসে তার সপক্ষে প্রচুর অভিযোগ জড়ো করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ কাম্পুচিয়া আক্রমণের পূর্বে ভিয়েতনাম, সোভিয়েত রুশের সঙ্গে সে-বছর ৩ নভেম্বর তারিখে মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিতে—Treaty of Friendship and Co-operation —আবদ্ধ হয়ে আরও শক্তিমান হয়ে নেয়; এটি সামরিক, অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি।

ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে যেমন কোনো কোনো মহলে নরমপন্থী-চরমপন্থীর ভেদরেখা টানা হয়েছে, তেমনি অপর কোনো কোনো মহলের বিশ্বাস ভিয়েতনামের পলিটব্যুরোর নেতৃত্বে কোনো ভেদ নাই, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। ত্রিশ দশক থেকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছেন: (১) প্রথমে তাঁরা জাপানীদের পরাস্ত করেছেন, তারপর (২) ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পর্যুদস্ত করেছেন এবং সর্বশেষে (৩) আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুর্ধর্ষ মার্কিন-বাহিনীকে ইন্দোচীন থেকে বিতাড়িত করে স্বাধীন সার্বভৌম ভিয়েতনামের পত্তন করেছেন এবং তারই ফলশ্রুতিরূপে কাম্বোডিয়া এবং লাওসও স্বাধীনতা ফিরে পায়। চল্লিশ বৎসর যাবৎ ঐক্যবদ্ধভাবে ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের রূপায়ণে যারা অসাধ্য সাধন করেছেন, আজ তারাই মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সংঘাতের কারণ হয়ে যুদ্ধ ও শান্তির নীতি নির্ধারণে মার্ক্সবাদের চূড়ান্ত অসারতা সপ্রমাণ করলেন।

'War is a Continuation of Foreign Policy by other means'—জার্মান সমরতত্ত্ব-বিশারদ ক্লাউসভিট্‌জ-এর (Clausewitz) এই বিখ্যাত উক্তি সর্বকালের যুদ্ধের জন্যই প্রযোজ্য—মার্কসবাদীরা ক্যাপিট্যালিস্ট রাষ্ট্রশক্তি সম্বন্ধে এই তত্ত্বের উপযোগিতা কখনও বর্জন করেন নি বটে, কিন্তু মার্কসবাদী রাষ্ট্রশক্তির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কখনও স্বীকার করেন নি। ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজব্যবস্থার স্ববিরোধিতার মধ্যে নিহিত স্বার্থসংঘাত থেকেই যুদ্ধের উদ্ভব, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব এই কাঠামোর উপর তৈরী। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের শেষ ঘাঁটি। লেনিনের তত্ত্বে, 'পুঁজিবাদ নিজেদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত ভাগ-বাঁটোয়ারা' ক'রে বিশ্বকে মিলে-মিশে ভোগ করতে পারে ততদিনই তারা সকলে মিলে সুখের পায়রা উড়াতে পারবে। তারপর ভাগে টান পড়লেই তখন হয়ে দাঁড়াবে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।' বিমান-কামান-বন্দুক শস্ত্রসম্ভারের জোর যার বেশী, যুদ্ধ ক'রে সে অপরের ভাগেরটা কেড়ে নিয়ে নিজের জন্য সিংহভাগ তৈরী করবে। যুদ্ধের কারণ এইখানেই নিহিত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের পরিণতি, ঔপনিবেশিক বাজার দখলের জন্য যুদ্ধ। অর্থাৎ, প্রতিটি যুদ্ধের পশ্চাতে একটি অর্থনৈতিক কারণ নিহিত থাকবে—মার্কসবাদী সমরতত্ত্বের এটাই হোলো সার কথা। লেনিনের এই তত্ত্বই বিবৃত হয়েছে তাঁর 'Imperialism, The Highest Stage of Capitalism' নিবন্ধে। স্ট্যালিন তাঁর 'Foundations of Leninism'-এ একটি সংযোজন জুড়ে দিয়ে বললেন যে প্রথম মহাযুদ্ধ প্রলিটেরিয়ান

বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তাকে অনিবার্য ক'রে তুলেছিলো। অর্থাৎ যুদ্ধের পরিণতিতে অনিবার্য সমাজ-বিপ্লব। সুতরাং, এই মার্ক্সীয়-লেনিনীয় সূত্র অনুসরণ করেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং বন্ধন-মুক্তির সংগ্রাম মার্কসবাদীদের অন্যনিরপেক্ষ কর্মসূচীর রূপ নিয়েছিলো। মার্কসবাদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রই সমান, সেখানে উত্তম-অধম রাষ্ট্ররূপে কোনো শ্রেণীভেদ নাই, সকলের বৈপ্লবিক সংগ্রামেই তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে। শক্তিমান এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্রতর ও দুর্বলতরদের ওপর খবরদারী কিম্বা দখলদারী করবে না। তাদের সমমর্যাদার চোখে দেখবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চারটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রশক্তি পরস্পরের সঙ্গে পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধের মার্কসবাদী তত্ত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সহমর্মিতা, সহ-অবস্থান ও সমতাভিত্তিক সম্পর্কের পরিবর্তে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের পত্তন করেছে। সোভিয়েত রুশ, চীন, ভিয়েতনাম এবং কাম্পুচিয়া বা কাম্বোডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের আবর্তে পারস্পরিক সংঘাতে আকর্ষিত হয়ে মার্কসবাদেরই শ্মশান-শয্যা রচনা করছে। কারণ, চীন-ভিয়েতনাম সংঘাত কিম্বা ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া সংঘাত শেষ পর্যন্ত বন্ধন-মুক্তির সংঘাত—এক মার্কসবাদী রাষ্ট্রশক্তি অপর এক মার্কসবাদী রাষ্ট্রশক্তির শৃঙ্খল-বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে চাইছে। ভিয়েতনাম চাইছে সোভিয়েত রুশের সামরিক সাহায্যে চীনের শস্ত্র-সংঘাতের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে আর কাম্পুচিয়ার পল পট-কম্যুনিষ্ট শক্তি, চীনা সামরিক সাহায্যে গেরিলা যুদ্ধে রুশ-সমর্থিত এবং ভিয়েতনাম সেনাবাহিনীর আশ্রিত কাম্পুচিয়াকে অবরোধ মুক্ত করতে। পৃথিবীতে এক সমাজবাদী শিবির আর এক সমাজবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দুই দেশের সংগ্রাম এই তাৎপর্য বহন করছে।

অতীতে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানীতে পঞ্চাশের দশকে সে-সব রাষ্ট্রের সে-সময়কার সোভিয়েত রুশের ক্রীড়নক-শাসকদের বিরুদ্ধে জনতার বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহ দমনে রুশ সামরিক শক্তি প্রয়োগ,—ইতিহাসের ঘটনা। তারও পূর্বে ১৯৪৮-এ যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট-শাসকেরা টিটোর নেতৃত্বে স্ট্যালিনের আমলের সোভিয়েত রুশের সামরিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করবার ঝুঁকি নিয়ে সংঘাতের মধ্য দিয়ে যুগোশ্লাভিয়াকে সোভিয়েত রুশের উপগ্রহের ভূমিকা থেকে রক্ষা এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদায় স্থাপন করে ও সে-মর্যাদা রক্ষার তাত্ত্বিক, সাংগঠনিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারও অনেক পরে ১৯৬৮ সালে মানবতাবাদের উষ্ণ পরিবেশে কম্যুনিজম-এর পুনর্মূল্যায়নের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যে মৌলিক উদ্যোগ চেকোশ্লোভাক্ কম্যুনিষ্ট পার্টি ডুবচেক্-এর নেতৃত্বে সুরু ক'রে, সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে সে-বছর আগষ্ট মাসে মূল্যবোধসিক্ত যে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলো, প্রাগের রাস্তায় সোভিয়েত রুশের ট্যাঙ্কের তলায় তা গুঁড়িয়ে যায়। তারপর সব শেষ। ডুবচেক্ অবজ্ঞাত বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মার্ক্সীয় মতবাদের মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধের রেখাঙ্কনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও।

এবার অবস্থা ভিন্নতর। চারটি মার্ক্সবাদী রাষ্ট্র-শক্তি পারস্পরিক শস্ত্র-সংঘাতের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এই পরিস্থিতি থেকে উচ্চকিত

জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হচ্ছে : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন ? মহাকাল এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দেবেন। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের কথা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদীদের শস্ত্রসংঘাতের মধ্য দিয়ে নয়, এই আশঙ্কার তূর্যধ্বনি ঝন্‌ঝনিয়ে উঠেছে মার্ক্স-বাদী শক্তিগুলির পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য থেকে। কোথায় মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রের সমাজবাদে পরিণতি, আর কোথায় পরস্পর পরিখার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রশক্তিগুলির নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম। এই আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিলে বিশ্বের প্রথম মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েত রুশ এবং তারই অপর তিন তাত্ত্বিক সহযাত্রী রাষ্ট্রশক্তি—চীন, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া—মার্ক্সবাদকে নিঃসংশয়ে ইতিহাসের আবর্জনায় ফেলে দিয়ে মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সমানাধিকারবাদকে প্রতিষ্ঠা দেবে।

নির্বাসিত রুশ বিশ্ব-সাহিত্যিক সল্‌ঝেনিৎসিন্ গত ১৯ ফেব্রুয়ারী বি, বি সি বেতারে বলেছেন : 'আমরা অবিসম্বাদিতভাবে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, অথচ পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়কেরা আত্মপ্রতারণা ক'রে বলছেন, আমরা দাঁতাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি··· প্রতি বছর বহু দেশকে তাঁরা কম্যুনিজম-এর হাতে সঁপে দিচ্ছেন...কিন্তু ক'দিন এই ধরনের দেশের যোগান চলবে ?'—"We are clearly moving towards a world war, yet Western Statesmen deceive themselves that we are moving toward detente....They surrender several countries a year to communism... How long will the supply of countries last ?" সল্‌ঝেনিৎসিন আরও বলেছেন : '···কম্যুনিষ্টরা আগ্রাসী-নীতি বর্জন করতে পারবে না...এই পাগল লোকগুলি আমাদের দেশকে এবং গোটা বিশ্বকে যুদ্ধে জড়িয়ে দিতে অবশ্যই সফল হবে'—"The communists cannot renounce aggression... these mad men will clearly succeed in plunging both our country and the whole world into war."

অপর একটি মার্ক্সবাদী শক্তিকে আঘাতের সিদ্ধান্ত কতটা ক্রুর এবং নিষ্ঠুর ব্যঞ্জনায় গ্রহণ করা যেতে পারে কাম্পুচিয়ার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-শক্তিকে ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবলম্বিত পদ্ধতি থেকে অনুমান করা যেতে পারে। ভিয়েতনাম কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কাম্পুচিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে ১৯৭৮-এর জুলাই মাসে। কিন্তু আক্রমণের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ তখন মুলতুবী রাখা হয়েছিলো। কারণ, সুস্পষ্ট। ভিয়েতনামের মুরুব্বী সোভিয়েত রুশের নির্দেশ এ-সম্বন্ধে তখনও এসে পৌঁছায় নাই। তাছাড়া, ভিয়েতনামের অব্যবহিত লক্ষ্য ইন্দোচীনে ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, লাওস নিয়ে একটি 'ফেডারেশন' গঠন, যে 'ফেডারেশন'-এর মুখ্য-রাষ্ট্র হবে ভিয়েতনাম স্বয়ং। কিন্তু এই 'ফেডারেশন'-এর ওপর সোভিয়েত রুশের মুরুব্বিয়ানা চাই। পূর্ব ইউরোপে যেমন ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত (Warsaw Pact Countries) রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েত রুশ সর্বতোভাবে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে নিরন্তর প্রয়াসী হয়েছে, ইন্দোচীনের এই 'ফেডারেশন'কেও সম্ভব হ'লে ওয়ারশ চুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েত রুশ একটি তাঁবেদার ঘাঁটি দাঁড় করাবে। তাই সোভিয়েত রুশের সম্মতিসাপেক্ষে ভিয়েতনামকে কাম্পুচিয়া আক্রমণের চূড়ান্ত দিন-ক্ষণ এবং কর্মসূচী তৈরী করতে হবে। সুতরাং ১৯৭৮ ৩রা নভেম্বর রুশ-ভিয়েতনাম মৈত্রী এবং সহযোগিতার—(Friendship And Co-operation Treaty)

সামরিক এবং অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার মাসাধিক কাল পরই ভিয়েৎনাম সেনাবাহিনী চীনের আশ্রিত ক্ষমতাসীন পল পটের করায়ত্ত কাম্পুচিয়ার উপর রুশ সমর্থনে এবং ভিয়েৎনামী সেনাবাহিনীর সহায়তায় 'জাতীয় মুক্তির জন্য কাম্পুচিয় জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' তকমাধারী বিদ্রোহী কাম্পুচিয়রা ১৯৭৮ ২৫শে ডিসেম্বর কাম্পুচিয়ার শাসনক্ষমতা দখলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাম্পুচিয়ার উপর, ভিয়েৎনামের সামরিক সাহায্য ব্যতিরেকে, হেং সামরিন-এর 'জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' সরকারের পক্ষে দখল রাখা সম্ভব নয়, জাপানের কিয়োডো সংবাদ সরবরাহ সংস্থার (Kyodo News Service) খবরে তাই জানা যায়। এদের খবর, জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোনাডা ২০শে ফেব্রুয়ারী জাপানের পরিষদে বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কমিটিতে বলেছেন হেং সামরিন-এর সঙ্গে মাত্র ৫০০০ থেকে ১০,০০০ সেনাবাহিনী রয়েছে। এতো সামান্য সামরিক শক্তি দিয়ে ক্ষমতা দখলে রাখা অসম্ভব ছিল, যদি ভিয়েতনামী সামরিক বাহিনীই হেং সামরিনের ক্রীড়নক কাম্পুচিয়-সরকারের রক্ষক না হোতো। তাঁবেদার 'ইন্দোচীন ফেডারেশন' গঠনের জন্য ভিয়েতনাম কাম্পুচিয়াতে ১০০,০০০ এবং লাওস এ ৬০,০০০ ভিয়েতনামী সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করেছিলো। চীনা আক্রমণের পর কাম্পুচিয়া থেকে ৩০,০০০ ভিয়েৎনামী-বাহিনী এবং লাওস থেকে ভিয়েৎনামী বাহিনীগুলি সরিয়ে এনে হানয় প্রতিরক্ষার অয়োজন করা হয়েছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী থেকেই চীন-ভিয়েতনাম সংঘাতের আসন্ন সম্ভাবনায় ওয়াশিংটন এবং মস্কোতে চাঞ্চল্য দেখা গেছে। এ-সংবাদ এখন জানা গেছে। বি. বি. সি সংবাদ ভাষ্যকার ফিলিপ্‌স শর্ট ২১শে ফেব্রুয়ারী পিকিং থেকে জানান যে ২৮শে জানুয়ারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মার্কিন সফরের পর চীনের উপপ্রধান মন্ত্রী তেং সিয়াত পিং জাপান সফর করে ৮ই ফেব্রুয়ারী চীনে ফিরে আসবার পরদিন ৯ই ফেব্রুয়ারী চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির মিলিটারী কমিশন ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়ে তার কর্মসূচীও স্থির করে ফেলে। ১০ই ফেব্রুয়ারী চীনা-সরকার চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্ত লঙ্ঘন ক'রে ভিয়েতনাম সরকারকে চীনা-ভূখণ্ডে প্রবেশ ক'রে আগ্রাসন নীতি অনুসরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেয়; ১০ই ফেব্রুয়ারী চীনের অপর এক উপ-প্রধানমন্ত্রী লি জিয়ান ইয়ান (Li Hsien-nien) কঠোরভাবে ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে চীনা-সতর্কবাণী কান না দেবার পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। লি জিয়ান ইয়ান বলেন: "Backed by the Soviet hegemonists, Viet Nam has launched wanton aggression against Kampuchea and at the same time has stepped up its military provocations along the Sino-Vietnamese border and some Chinese places. The Chinese people are very indignant at this : We have time and again warned the Vietnamese not to turn a deaf ear to what we have said". তারও পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্র সফরকালে তেং সিয়াও-পিং বলেছেন ভিয়েতনামকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে; 'to teach them a lesson', কিম্বা জাপানে বলেছেন 'তাদের সাজা দিতে হবে' 'punish them' ইত্যাদি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের সামরিক অভিযানের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হয় বুধবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, অধস্তন সামরিক সংগঠনগুলির কাছে

পরদিন বৃহস্পতিবার ১৫ই এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাহিনীগুলির সমরসজ্জার উদ্যোগ সম্পূর্ণ হয় এবং সীমান্ত অতিক্রম করে যথারীতি অভিযান সুরু হ'ল পূর্ব-নির্ধারিত ১৭ই ফেব্রুয়ারী। কাম্পুচিয়ার হেং সাম্‌রিন-সরকারের সঙ্গে ভিয়েতনামের চুক্তি হবার পূর্বেই এই অভিযান, হয়তো বা ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া চুক্তির পথ অবরোধ করবার জন্যই চীনের এই সময় নির্বাচন। জাপানী কিয়োডো সংবাদ সংস্থা এই সংবাদ পরিবেশন করেছে।

চীন এই সামরিক অভিযানকে আত্মরক্ষামূলকরূপে 'defensive' ব্যাখ্যা করেছে, বলেছে—'limited'—সীমিত উদ্দেশ্য সমন্বিত। চীনা সরকারী মুখপত্র সিনহুয়া,—'Hsinhua'—১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিবৃতি বিলি করে উভয় পক্ষকেই দ্রুত আপস-রফার আলোচনা—"Speedily hold negotiations" আরম্ভের জন্য তাড়া দিয়ে আরও জানিয়ে দিয়েছে চীনা বাহিনী সংযমের সঙ্গে তাদের কাজ সীমান্ত প্রতিরক্ষার মধ্যেই—"Strictly keep to defending" সীমিত রাখবে। সেই বিবৃতিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত চীনের নীতি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে চীনা সরকারের এবং জনগণের অপরিবর্তিত সূত্রই হোলো "We will not attack unless we are attacked; if we are attacked we will certainty counter-attack. মাও সে-তুং-এর এই সূত্রটি, তার নাম উল্লেখ না করলেও, সঙ্গতভাবেই ক্ষেত্র-বিশেষে চীন এবং প্রতিরক্ষায় চিরায়ত সূত্ররূপে শান্তি-বলে বিশ্বাসী যে-কোনো অনাগ্রাসী আত্মরক্ষাকামী রাষ্ট্র প্রয়োগ করবার অধিকারী। এজন্য ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পিকিং থেকে প্রকাশিত চীনা সরকারী মুখপত্র 'পিপল্‌স ডেইলী'র—'Peoples' Daily'র সম্পাদকীয়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে "Rise in Counter-Attack in Defence of Frontiers"—'সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্য জেগে ওঠো'।

এদিকে, ৯ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকা এবং সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীন-ভিয়েতনাম সীমান্তে সমর অভিযানের প্রস্তুতির জন্য চীনকে দায়ী করে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়। ওয়াশিংটন থেকে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেণ্টের মুখপাত্র টমাস রেসটন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শস্ত্র-সংঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ করে এই প্রথম চীনকে ভিয়েতনাম আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে অনুরূপ অভিযোগের পরই যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। প্রাভদা পত্রিকার ভাষ্যকার বলেছেন ভিয়েতনামের জনগণ বার বার সপ্রমাণ করেছেন তাদের মাতৃভূমি প্রতিরক্ষায় তারা সক্ষম। আবার তারা তা সপ্রমাণ করবেন: "They will prove it again"।

২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে পিকিং-এ চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বলে দিয়েছেন চীনাবাহিনী ভিয়েতনামের সমতল ভূমিতে নামবে না। ভিয়েত-নামকে শিক্ষা দিতে ক'দিন লাগবে। এই প্রশ্নের উত্তরে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তেং সিয়াও পিং বলেন—'১৯৬২তে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ স্থায়ী ছিল ৩৩ দিন। এবার চীনের 'শাস্তিমূলক অভিযান'-এ তার চাইতে অনেক কম দিন লাগবে। তবে অপর পক্ষ কি করবে সেটাই প্রশ্ন।' "But the other side is the problem."। কারণ ভিয়েতনাম হচ্ছে 'Cuba of Asia'.

ভিয়েতনাম সীমান্ত সুনির্ধারিত হয়ে গেছে, প্রায়

এক'শ বছর আগে। অন্তত ভিয়েতনামীদের তাই মত। ভিয়েতনামের উপ-প্রধানমন্ত্রী নগুইয়েন ডুই ট্রিন (Nauyan Duy Trinh) ৯ই ফেব্রুয়ারী হ্যানয়-এ বলেছেন সীমান্তের সমস্যাটি ১৮৮৭ এবং ১৮৯৫-এ ফরাসী এবং চীনা সম্রাটদের স্বাক্ষরিত দুই পৃথক চুক্তিতে মীমাংসা হয়ে গেছে। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে ভিয়েৎনামী ওয়ার্কার্স পার্টি এবং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি এই ইতিহাস-নির্দিষ্ট সীমান্ত ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেন এবং তারা মনে করেন ভবিষ্যতে কোনো সীমান্ত-বিরোধ দেখা দিলে আলোচনার মধ্য দিয়ে তার মীমাংসা হবে। কিন্তু ভিয়েতনামের উপ-প্রধানমন্ত্রীর মতে ১৯৭৪ থেকে, বিশেষভাবে ১৯৭৫ এর বসন্তকাল থেকে, চীনাদের দিক থেকে সীমান্তে হিংস্র সংঘাত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ১৭ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বে চীন যেমন ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সীমান্ত লঙ্ঘন করে ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ এনেছে, ভিয়েতনামও চীনের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেছে। কিন্তু যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই চীনের পক্ষ থেকে আপস-আলোচনার ডাক দেওয়া হয়েছে উভয় পক্ষকেই। জাপানী কিয়োডো সংবাদ সংস্থার সংবাদে জানা যায় ২৬শে ফেব্রুয়ারী চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী তেং সিআও পিং ভিয়েতনাম থেকে চীনা বাহিনীর এবং কাম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামবাহিনীর অপসারণের যে প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হচ্ছে, তাকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানিয়েছেন, ভিয়েতনাম বা সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো আপসের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত রুশ চীনকে সতর্ক করে দিয়ে বেশী বিলম্ব হবার পূর্বে—"before it is too late',—ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ বন্ধের দাবী জানিয়ে জানিয়ে বলেছে মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি অনুযায়ী হ্যানয়ের প্রতি সোভিয়েত রুশের সর্বপ্রকার সাহায্য প্রসারিত হবেই। বিমানযোগে রুশ সামরিক সাহায্য হ্যানয়ে পৌঁছে গেছে, রুশ নৌবাহিনীও চীনা সাগরের দিকে এগিয়ে গেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত টেলিভিশনের ভাষ্যকার বলছেন চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণের জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে…"will not remain unpunished." ২৬শে ফেব্রুয়ারী বাইলোরুশিয়ার রাজধানী মিনস্ক্ সহরে নির্বাচনী সভায় সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে হ্যানয় বেতারে যা বলা হয় তা খুবই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে—"The Conflict could lead to an all-out war endangering other countries.

চীন-রুশ সশস্ত্র সংঘাত কি হবে? এটাই আজকের দিগন্ত জোড়া প্রশ্ন। এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব কেউ জানেনা। অথচ এই প্রশ্নটাকে ঘিরেই যত আশঙ্কা, যত প্রস্তুতি। এই প্রশ্নের উত্তর না জানেন চীনের রাষ্ট্র-নায়করা, না জানেন সোভিয়েত রুশেরা। আমেরিকার জানবার সুযোগ রয়েছে, অনিবার্যতা রয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত রুশ তো সর্বাগ্রে সিদ্ধান্ত নেবে তারপর তো অঙ্ককথা। ৬,৪০০ কিলোমিটারব্যাপী চীন-রুশ সীমান্তে ৪৩ ডিভিসন সোভিয়েত সেনবাহিনী ৭/৮ বছর যাবৎ ঘাঁটি বানিয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে দুইটি ডিভিশন আণবিক অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত। এই দশ লক্ষ সেনাবাহিনীর শিবির স্থায়ী হয়ে গেছে। এই সীমান্তে এখনও খুব তৎপরতা লক্ষ্য না করা গেলেও ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদে জানা যায় এই সীমান্ত

সংলগ্ন কোনো কোনো চীনা এলাকা থেকে বেসামরিক বসবাসকারীদের অপসারণ করা হয়েছে। জনৈক চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষায় তারা চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত : "Prepared for the worst"। তেং-সিয়াও-পিং-কে কিয়োডোর সাংবাদিকরা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দশদিন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হবার পর। তাঁর উত্তরও অস্পষ্ট। সোভিয়েত রুশের হস্তক্ষেপ হতেও পারে, না-ও পারে : "I cannot forsee any such action although I cannot preclude totally such risks"। সোভিয়েত রুশের সরকারী মুখপাত্র প্রাভদা অবশ্যি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণ গোটা পৃথিবীর শান্তির পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক—'to the cause of peace throughout the world"। এটা ১৮ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদ। ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রাভদা আমেরিকার সমালোচনায় মুখর। কারণ ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে চীনাবাহিনীর এবং কাম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনাম বাহিনীর প্রত্যাহার দাবী করে উভয়-পক্ষকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সংযত হবার পরামর্শ দেয়। 'প্রাভদার' এই মার্কিণী উপদেশ ভালো লাগে নি। চীন, সোভিয়েত রুশের চোখে আক্রমণকারী, ভিয়েতনাম আক্রমণের শিকার। অথচ কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনামী আক্রমণের শিকার। সোভিয়েত রুশের চোখে তা নৈব নৈব চ। সোভিয়েত রুশ যে ভিয়েৎনামের বন্ধু, সহায়ক,—চীনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের সামরিক প্রতিপালক। আর কাম্পুচিয়া ? সেখানে তো সোভিয়েত রুশের চোখে গৃহযুদ্ধ চলছে। সোভিয়েত সমর্থনে এবং সহযোগিতায় ভিয়েতনামী সামরিক আক্রমণে কাম্পুচিয়ার শাসনক্ষমতা থেকে উৎসাদিত ও নির্বাসিত ও বর্তমানে গেরিলাযুদ্ধে নিয়োজিত অত্যাচারী পল পট সরকার এক দিকে, তার সহযোগী চীন। অপর দিকে ভিয়েতনামের সামরিক শক্তির সাহায্যে কাম্পুচিয়ার শাসনক্ষমতা দখলকারী হেং সাম্‌রিন সরকার, তার সহযোগী সোভিয়েত রুশ। সুতরাং চীন ও ভিয়েতনাম—উভয়কেই সংযমের উপদেশে সোভিয়েত রুশ রুষ্ট হবে না কেন !

এদিকে নিউ ইয়র্ক থেকে সংবাদে জানা যায় যুদ্ধের প্রায় গোড়া থেকেই সোভিয়েত বিমান হানয়ে সামরিক সাহায্য পৌছে দিচ্ছে। সোভিয়েত সেনা ও নৌ-বাহিনীর ৬১-তম বার্ষিকীতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল উসটিনভ্ বলছেন মাও-এর উত্তরাধিকারীরা যে গোটা বিশ্বকে যুদ্ধে জড়িয়ে দিতে চাইছে চীনা আক্রমণ তারই প্রমাণ—"...testifies to unceasing attempts by Mao's heirs to plunge the world into a war".।

আমেরিকা চেয়েছে ভিয়েতনাম থেকে চীনের সেনাবাহিনী এবং কাম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী অবিলম্বে প্রত্যাহার করে যুদ্ধ-বিরতি স্থাপন করা হোক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই মর্মে প্রস্তাব এসেছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সের ও এই মত। প্রেসিডেন্ট কার্টার ২০শে ফেব্রুয়ারী জর্জিয়ার ইনষ্টিটিউট অফ্ টেক্‌নলজিতে বক্তৃতায় চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণকে ব্যাখ্যা করেছেন : 'ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে চীনা প্রবেশরূপে'—"Chinese Frontier Penetration into Vietnam" এবং সেটাও ভিয়েতনামের কাম্বোডিয়া আক্রমণের ফলশ্রুতি—"Vietnam's invasion of Cambodia। আমেরিকা এই দুই ধরণের অভিযানেরই বিরোধী। কারণ তার ফলে পৃথিবীর একটি

নূতন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অঞ্চলের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। তাই সংশ্লিষ্ট দুই দেশ থেকে দুই আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে সরে যেতে হবে। প্রেসিডেন্ট কার্টার খোলাখুলি বলছেন এশিয়ার দুই কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রশক্তির সংগ্রামে—'conflict between Asian Communist Nations"—আমেরিকা জড়াবে না। জর্জিয়া ইনস্টিটিউটের সেই ভাষণে কার্টার আরও জানিয়ে দিলেন ইরান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কটের পটভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত শস্ত্রচুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছে : "Turmol in Iran and S.E Asia dramatically demonstrates the need for a new U.S.-Soviet Arms Treaty"। আরও এগিয়ে কার্টার সোভিয়েত রুশকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন : সাবধান! ইরানের গৃহযুদ্ধে কিম্বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংগ্রামে যেন তারা কোনো রকম গোলোযোগ সৃষ্টি না করে!

১৮ই ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-ঘোষণায় বলা হয়েছিলো কাম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর অপসারণ ও ভিয়েতনাম থেকে চীনাবাহিনীর অপসারণ পাশাপাশি একই সঙ্গে চলবে; দ্বিতীয়টির সর্ত প্রথমটির পূরণ। কিন্তু পরবর্তী এক ঘোষণায় ২২শে ফেব্রুয়ারী এই সর্তসাপেক্ষতা দূর করে বলা হয় দুই দেশ থেকেই বিদেশী সেনাবাহিনীর অপসারণ চাই। তবে একটি আর একটির ওপর নির্ভর করবে না। এই 'delinking' বা নিঃসর্ত সৈন্য অপসারণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কার্টার আবার জানিয়েছেন—"Communists of Asia"—এশিয়ার দুই কম্যুনিষ্ট শক্তির সংগ্রামে আমেরিকা জড়াবে না। কিন্তু যদি বা সোভিয়েত রুশ ভিয়েতনামের সপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সেজন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন : 'আমাদের সেনাবাহিনী তৈরী আছে। প্রয়োজন হলে তাদের নিয়োগ করা হবে। কিন্তু আমি আশা করি সে-প্রয়োজন কখনও দেখা দেবে না'—"We have forces in readiness as you all know which we will use if necesary. I hope that need will never arise." তার একদিন পর ২৩শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব সাইরাস ভান্স-এর সোভিয়েত-বিষয়ক বিশেষ পরামর্শদাতা শূলম্যান (Schulman) বলেছেন—"There are no indications of preparations"—সোভিয়েত রুশের দিক থেকে চীন আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগের অপর এক মুখপাত্র হোড্ডিং কার্টার (Hodding Carter) ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই বলেছেন : ওটা আমাদের যুদ্ধ নয়। আমরা ওটাতে জড়াতে চাই না—"This is not our war. We donot want to get involved", চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ সত্ত্বেও আমেরিকার সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ১লা মার্চ ১৯৭৯ থেকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকার বাণিজ্য-সচিব ব্লুমেনথাল সেজন্য যুদ্ধের মধ্যেই পিকিং গেছেন। অপর পক্ষে ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত গত বছর শরৎকালে নেওয়া হয়েছিলো, আমেরিকা আপাতত তা কার্যকর করছে না। দুই সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আমেরিকার দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। স্পষ্টতই আমেরিকার মনোভাব চীনের অনুকূল। রাষ্ট্রসঙ্ঘে দুই পক্ষের সেনাবাহিনীর অপসারণের এবং যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পর্তুগাল, নরওয়ে উত্থাপন করেছে,

সে প্রস্তাব সোভিয়েত রুশ ভেটো দিয়ে বাতিল করে দিলে অবাক হবার কিছু নাই। চীন এই প্রস্তাব সমর্থন করেছে বলেই মনে হয় তেং-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর মতপ্রকাশে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী চীন একই সঙ্গে দুই পক্ষের সেনা অপসারণের (Simultaneous withdrawal) যে প্রস্তাব দিয়েছিলে ভিয়েতনাম তা বাতিল করে দিয়েছে।

যুদ্ধের মধ্যে পিকিং গেছে ব্রিটেনের বাণিজ্য-সচিব এরিক ভারলে। উদ্দেশ্য সাড়ে সাত হাজার পাউণ্ড মূল্যের হ্যারিয়ার জেট বিমান বিক্রয়ের। ইউরোপীয় ইকনমিক কম্যুনিটির সভাপতি রয় জেঙ্কিন্‌সও ব্যবসার জন্য এই সময়ের মধ্যে পিকিং যাবেন, সংবাদ পাওয়া গেছে। এদের পক্ষে যুদ্ধ আর ব্যবসা চাকৃতির এপিঠ আর ওপিঠ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। তারা কাম্পুচিয়ায়, ভিয়েতনামী আক্রমণের কড়া সমালোচনা করলেও, চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণের পর তারা সতর্ক, সন্ত্রস্ত। তারা চাইছে ষোল আনা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে। এদিকে ভিয়েতনামের সরকারী মুখপাত্র নাহান ডান (Nhan Dan) সম্পাদকীয় স্তম্ভে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির নিরপেক্ষভঙ্গির সমালোচনা করে ভিয়েতনামের প্রতি তাদের সমর্থন প্রসারিত করতে বলেছে। জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি চাইছে দ্রুত এই সংঘাতের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হৌক। এ-বিষয়ে থাইল্যাণ্ডই সকলের মনের কথা বলেছে: 'দোহাই তোমাদের। আমাদের নিয়ে টানাটানি ক'রোনা',—"we only want to ask one thing—just do not get us involved"। ভারতবর্ষও দুই পক্ষেরই সেনা অপসারণ চেয়েছে। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীনকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারী বা aggressor সাব্যস্ত করেছেন।

যুদ্ধের দশদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। চীনের ২৫টি ডিভিশন এ-যাবৎ যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে। পিকিং-এ অবস্থিত ভিয়েতনামী কূটনীতিবিদ্ ত্রাণ ক্রুঙ্গ (Tran Trung) ২৭শে ফেব্রুয়ারী বলেই দিয়েছেন চীনের সীমিত যুদ্ধের পরিকল্পনায় তাদের বিশ্বাস নেই। তারই ভাষায় "...the so-called limited war can lead to large-scale war in the future"। ব্যাপকতর যুদ্ধের প্রসঙ্গের আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। বিশ্বের পক্ষে এই ধরনের মানসিকতা অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে। এই ইঙ্গিতের সুস্পষ্ট অর্থ চীন-রুশ শস্ত্র-সংগ্রাম। চীনের সীমান্তে সোভিয়েতের যে দশ লক্ষ সেনাবাহিনী সাজানো আছে তার মধ্যে অন্তত দুই ডিভিশন আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত। চীনের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর ঘাঁটি লপ্ নড় (Lop Nor) থেকে সেটি সরিয়ে এভারেষ্টের উত্তরাংশে পাহাড়ের ছাদের তলায় সুরক্ষিত করা আছে। সুতরাং রুশ আণবিক বোমার অগ্রিম আঘাতে (Pre-emptive Strike) চীনের পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার ধ্বংস করা যাবে না। ১৯৭২-এর সেপ্টেম্বরে চীন সীমান্তে মোট সোভিয়েত ডিভিশনের সংখ্যা ছিল ৪৯, চীনবাহিনীর সংখ্যা ছিল তার এক তৃতীয়াংশ। বর্তমানে লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অফ ষ্ট্র্যাটেজিক্ ষ্টাডিজ-এর সূত্রে জানা যায় চীন ও ভিয়েতনামের সৈন্য সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৬২৫,০০০ এবং ৬০০,০০০। কিন্তু লণ্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফের যুদ্ধের সংবাদদাতা বলছেন গত দুই তিন বছরে ভিয়েতনামের সৈন্য সংখ্যা৮৫০,০০০ এ পৌঁচেছে এবং ভিয়েতনাম পৃথিবীর সর্বোত্তম অস্ত্র-সজ্জায়

সজ্জিত রাষ্ট্রদের অন্যতম। "মিলিটারী ব্যালান্স" পত্রিকা চীন ও ভিয়েতনামের সমর-সম্ভার সম্পর্কে জানাচ্ছে ঃ

	চীন	ভিয়েতনাম
ট্যাঙ্ক	১০,০০০	১,৪৫০
ভারী কামান	১৮,০০০	জানা নেই
সশস্ত্র মিলিশিয়া	৭০ লক্ষ (পিপ্‌ল্‌স লিবারেশন আর্মি বাদে)	১৫ লক্ষ (মিলিশিয়া)
নৌবাহিনী	৩,০০,০০০	৩০০০
জলেভাসা যুদ্ধ-জাহাজ (বড়)	২৩	নানা ছোট কিন্তু অস্ত্রেসজ্জিত নৌযান
বৈমানিক	৪০০,০০০	১২,০০০
সামরিক বিমান	৫০০০ (প্রায়)	৩০০

চীনের অস্ত্র-শস্ত্র ১০ থেকে ২০ বছরের পুরানো। চীনের সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে লোকবলের সঙ্গতি মিলিয়ে বিপুল শক্তির অধিকারী হলেও, তিনহাজার বছরের মধ্যে ১৯৫১ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময় চীন নিজ সীমান্তের বাইরে এসে যুদ্ধ করেছে, এবারও তাই। ১৯৫১ কোরিয়ার যুদ্ধে জেনারেল পেং টে-হু-আই-এর (Peng-Te-Huai) ডেপুটি কম্যাণ্ডার ছিলেন জেনারেল ইয়াং (Yang)। ১৯৫৪ তিনি কম্যাণ্ডারের পদে উন্নীত হ'ন। চীন-ভিয়েনাম সীমান্তে অবস্থিত চীনা সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডারক্রপে জেনারেল ইয়াং নিযুক্ত হয়েছেন, হয়তো চীন সীমান্তের বাইরে আধুনিক যুদ্ধ-পরিচালনার অভিজ্ঞতার দরুন। ভিয়েৎনামের প্রতি-রক্ষামন্ত্রী গিয়াপ বহু যুদ্ধের বিজয়ী জেনারেল। অতীতে ভিয়েৎনামের আক্রমণকারীরা সীমান্তের পাহাড় অঞ্চল থেকে হ্যানয়ের সমতলে নেমে এসে পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। ১৯৫৪ সালের মে মাসে ফরাসী-বাহিনীর পরাজয় এমনি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং সেদিক থেকে চীনের সেনাবাহিনীকে সাবধানতার সঙ্গে ভিয়েৎনামের অভ্যন্তরভাগে অগ্রসর হতে হবে।

১৯৬৯-এর মার্চে উসুরী নদীর তীরে চীন-রুশ সংঘাত প্রথম বেধেছিলো, তার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৬৯-র সেপ্টেম্বরে চীনের ওপর সোভিয়েত রুশের আণবিক আক্রমণ অনিবার্য হয়ে উঠলে হো চি-মিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য হ্যানয়ে উপস্থিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট নেতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে রুশ-চীন সংঘাতের মীমাংসায় ১৯৬৯-র অক্টোবর থেকে রুশ-চীন বৈঠক হয়। ১৯৭৯-এ সে-পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলশ্রুতি চীন-ভিয়েৎনাম যুদ্ধ এবং রুশ-চীনের কয়েক বর্ষব্যাপী সামগ্রিক বিরোধ। এবার কম্যুনিষ্ট দেশগুলি জাতীয় স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন বোধ করলে আপস করবে নয়তো চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বর্তমান সংগ্রামের পরিণতি দেবে। হয়তো সাময়িকভাবে বর্তমান বিরোধ মীমাংসা হলেও স্থায়ী মীমাংসা সুদূরপরাহত। ভারতবর্ষ শান্তি চাইবে, সমাজতন্ত্রের দিকে অব্যাহত গতি চাইবে। কিন্তু সব চাইতে বড়ো চাওয়া হবে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা। বিশ্বযুদ্ধ যদি প্রত্যাসন্ন হয়ে ওঠে, ভারতীয়দের কর্তব্যের নিরিখ হবে জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা। শীর্ষতম কর্তব্য হবে ভারতীয়ত্বের শিবির শক্তিশালী করা এবং যারা এই শিবিরে বেগবান শক্তি প্রবাহে সহায়তা করবেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় আবদ্ধ হওয়া। আগামী সঙ্কটের দিনগুলিতে এই হবে ভারতের পথনির্দেশ।

How fast can your money grow ?

Come to us, and you'll know !

1. FAMILY BENEFIT DEPOSIT :
Rs. 152/- only per month brings you
after 10 years Rs. 19,423/-

2. MONTHLY INCOME CERTIFICATE :
Rs. 13,334/- only for 3 months brings you
Rs. 100/- every month while your deposit remains intact.

3. CASH CERTIFICATE :
Rs, 5,000/- only brings you after 10 years
Rs. 12,177.50 p.

4. RECURRING DEPOSIT ACCOUNT :
Deposit only Rs. 10/- per month to get after
7 years Rs. 1,170/-

We have also many other attractive
investment schemes

For details, please contact our Head Office
or any of our branches

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001
Chairman : J. N Biswas

H. V. KAMATH

The Last days of Jawaharlal Nehru

15·00

The book has been written in the back-drop of the Chinese Policy of Jawaharlal Nehru which gave him the biggest shock of his life and ended in his passing away within less than two years of the massive Chinese attack on October 20, 1962. The author prophetically commenting on this policy in July 1959 said : 'His supine policy will, if unaltered, bring disaster to India'.

SOME COMMENTS ABOUT THE BOOK

At a time when it is fashionable to denegrate Nehru, it is refreshing to read this book by one of the ablest and outstanding of our parliamentarians, making a scientific assessment. **Himmat**

Kamath has shown Nehru as a man. He highlights Nehru's foibles and failures but he also gives laudible tributes. **Nagpur Times**

"Shri Kamath recounted the last days of Shri Nehru quite competently, having observed him from a close range and waged a relentless attack on him as a parliamentarian.....On the whole, Shri Kamath was dispassionate and objective and did justice to his work."

Charan Singh, *Deputi Prime Monister*

THE FORWARD MOVEMENT WITHIN THE INDIAN NATIONAL CONGRESS

H. V. Kamath

Of Netaji, the intrepid warrior-statesman, much has been told and more has been written, to the ever-increasing delight, wonder and admiration of an incredulous and sceptical world. Netaji, the romance of whose army is redolent of the heroism which Shivaji, Washington, Garibaldi and Kemal Ataturk infused into their ill-clad, ill-fed and ill-epuipped followers, has attained to an eminence among the leaders of the Liberation War of Humanity and secured an abiding place in the Pantheon of History. The story of how Indian men, women, and even children, quite ignorant of modern warfare, flocked to his banner in their thousands, heedless of consequence, inspired by the effulgent light of a deathless ideal, does not lose interest in the telling. We know very well how, with the clarion call for Unity, Faith and Sacrifice, Netaji, in the face of heavy odds that at times seemed almost insuperable, led the civilians as well as the soldiers of the Azad Hind Fauj, along the arduous path of starvation, forced marches and death, towards the promised land of Hindustan exhorting them in the name of the Goddess of Liberty, in the name of Mahashakti (Primal Energy), with the ringing words—'Give me blood, I will give you freedom'. He thus powerfully reinforced the 'Quit India' struggle of the Congress by his 'Chalo Delhi' Campaign. We have read and heard of it in adequate measure. But the hardly less tempestuous career of Subhas Chandra Bose, who, along with a few other dauntless spirits, worked ceaselessly to inspire, guide and mould the Forward Movement within the Congress in the twenties and thirties of this century, is not so very well known. It shall be my endeavour to trace briefly the growth and evolution of this movement and to season the narrative with a few personal reminiscences of the great leader, whom I was privileged to know fairly intimately for three years before he left India on his high mission.

What made Netaji a grand creative rebel, ever pressing forward, ever discontented and ever at war with his milieu ? Fundamentally, he lived, moved and had his being in the vast expanse of the Spirit, and the environment of a slave country accorded ill with such an ardent nature. A spiritual quality, indefinable and intangible, pervaded all his actions. Like unto the ocean, he was always restless, yet ever at peace, which flowed from the poise and tranquillity of his inner being. This was reflected in the invincible calm of his face and his disarming smile : to know him was to love him. From his early boyhood, when he journeyed alone to the Himalayas in search of spiritual salvation up to the years of his mature manhood, when he journeyed beyond the borders of India in search of political salvation, his life has been all of one piece, the life of a born rebel, whom the call of the suffering millions of a slave nation turned into an uncompromising political revolutionary. He regarded his entire life as a spiritual mission in the highest and noblest sense of the word and this was

clearly brought out in the title 'An Indian Pilgrim', which he had adopted for his unfinished autobiography. He was not a mere politician, but one of the greatest revolutionary leaders that have figured on the world stage in recent times. He was endowed with dauntless courage, lofty ideals, a clear vision, farsighted statesmanship and tremendous powers of organisation. Not infrequently described as the stormy petrel of Indian politics, his meteoric career showed that he was in his element during times of strenuous conflict and struggle and that he was animated and inspired by an 'Idee Fixe', the sublime idea of India's emancipation.

The time and manner in which Subhas Chandra Bose made his debut in Indian politics is significant of the man. Resigning the Indian Civil Service in England itself, not long after passing the competitive examination with flying colours, he returned to India and went straight to Mahatma Gandhi, who, launching the barque of Congress on the stormy uncharted sea of mass resistance, and thus initiating a bold, forward movement, had called the nation to suffering and sacrifice and was preaching, with religious zeal, the gospel of non-co-operation with a Satanic Government. "Sedition is my religion" declared Gandhiji, and the tense atmosphere in the country in those stormy days of 1920-22 was akin to that of a religious revival. The message of the Mahatma spread like wild fire to the remotest nook and corner of India, quickening the pulse of an oppressed nation struggling to be free, and raising its tempo to fever heat. The movement engulfed the whole country, drawing all, intellectuals, educated and the professional classes no less than the broad masses within its vortex, so much so that the then Governor of Bombay was constrained later to admit that "it came within an ace of success". At such a time, Subhas, a young man of twenty-four, moved by a flaming patriotism and a supreme abandon that stakes all at the altar of an Ideal, approached Gandhiji, praying for guidance. The Mahatma was not slow to perceive the passion for freedom that consumed Subhas and accordingly directed him to Deshbandhu Chittaranjan Das, who had, in the meantime, flashed on the Indian political firmament and become the undisputed leader, the uncrowned King of Bengal. Subhas, whose inner spiritual being had already been nurtured on the fiery genius of Swami Vivekananda, soon came under the spell of C. R Das and readily accepted him as his political 'guru'. The latter, who discerned his sagacity and his fortitude much beyond his years, often used to jocularly refer to him as 'the young old man'. Later in life, Subhas's militant nature was profoundly impressed by the redoubtable valour and the consummate political skill and strategy of Eamon de Valera, Lenin and Kemal. Thus, by the time he attained the maturity of manhood, he had achieved the difficult and rare synthesis of the saint and the warrior—a 'Kshatra (warrior) Sadhu', in fact. It was this that enabled him to preserve a stoic tranquility, even while engaged in ceaseless action and struggle, and it was this unique harmony which enabled him to live serenely in the face of danger, opposition and even persecution. He toiled and laboured joyously, albeit without respite, in the material, work-a-day world, because at heart he was an indomitable Soldier of the Spirit and bathed his inner being, his mind and soul, ever and anon, in the life-giving waters of the Eternal.

Subhas Chandra Bose first proved his mettle in the thorough manner in which he worked for the total boycott of the Prince of Wales in Calcutta in 1921. Government, perturbed and frightened by his activities, clapped him behind the bars in distant Mandalay on

the trumped-up charge that he was actively sympathetic to the terrorists of Bengal.

His body wasted away, the fell disease of tuberculosis was eating into his vitals, yet his resolute spirit and stupendous power of will never gave way. This was evinced in the letters he wrote from jail.

Prolonged incarceration and enforced seclusion, however, enabled him to ponder deeply over the political problems of the country and the development of our freedom struggle. When ultimately, late in 1927, his unconditional release was ordered on medieal grounds, he soon began to take an active part in political life despite his shattered health. He devoted his time and attention to the organisation of youth and to the Trade Union Movement.

When in 1928 the Motilal Nehru Committee declared in favour of Dominion Status, Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose stoutly opposed it and asserted that they would be satisfied with nothing short of complete independence for India. The formation of an Independence League was also announced and agitation began in full swing for basing the future Constitution of India on complete independence. At the Calcutta Congress in 1928, presided over by Motilal Nehru, where Subhas Chandra Bose was G.O.C. of Congress Volunteers, to the main resolution generally approving of the recommendations of the Nehru Committee, amendments of an identical nature were moved by Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose Their aim was not to accept, even by implication, Dominion Status for India, as contemplated in the Constitution drawn up by the All-Parties' Conference. They did not, however, succeed, but, undaunted, they pursued their efforts after the Congress Session. The youth movement received a tremendous impetus ; Naujawan Sabhas and Students' Organisations were formed all over the country. The youth movement was especially strong in Bombay and Bengal, and young men took a very prominent part in the country-wide demonstrations against the Simon Commission. Feeling in the country ran high on account of the one year's ultimatum that had been delivered to the British Government at the Calcutta Congress, and the Lahore Congress, held on the banks of the Ravi in 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru adopted a resolution declaring that the goal of the Congress was complete independence or Poorna Swaraj, involving severance of the British connection. Thus, the campaign in which Subhas Chandra Bose had played an important part, bore fruit at Lahore and soon after this, the Independence League was dissolved, as its object had been accomplished. Thus, we see Subhas Chandra Bose working in thc twenties of this century for the radicalisation of the Congress, the organisation of youth, and a strong Trade Union movement, so as to broadbase the Congress on the strength of India's manhood and on the toilers in India's fields and factories, a step which carried the Congress forward on the path of struggle.

It will be interesting to recall here that Subhas desired to move an amendment to the Independence Resolution at Lahore to the effect that independence should be defined in terms of political and economic freedom of the masses in order that they might be enthused to make the requisite sacrifices in the freedom struggle ; but the amendment was put aside. Nevertheless, this showed in which direction the mind of Subhas was working.

Gandhiji's Satyagraha Movement of 1930 again found Subhas in the thick of the fight, and Government soon arrested him and lodged him safely in jail. When the movement was called off in March 1931 upon the conclusion

of the Gandhi-Irwin pact, Subhas, who along with others found himself also at liberty, raised his voice in protest against the Pact and the suspension of the movement, especially when patriots like Bhagat Singh and his associates were not saved from the gallows. He presided over the Conference of the All-India Naujawan Sabha at Karachi in 1931 and his subsequent activities brought him into conflict with the law very soon, with the result that he was once again detained under the infamous Bengal Regulation. In a year or two, his physical condition became so alarming that he was allowed to proceed to Europe for the purpose of recouping his shattered health. Abroad, he took a forward step by establishing centres in different European capitals with a view to promoting politico-cultural contacts between India and Europe. The Congress had so far not paid much attention to this type of work, and Subhas was among the first to stress the necessity of such propaganda in our fast-changing interdependent world.

Returning to India in 1936 in defiance of a State ban on his entry, he was arrested and imprisoned for a year ; a Government spokesman stated that 'a man with Subhas Bose's intellect and his powers of organization would be a danger to any State'. But soon after the General Elections of 1937 and the accession of the Congress to power in several Provinces, Subhas was set at liberty, and shortly after unanimously elected President of the Haripura Congress, 1938.

At this point. it is as well that we should note the strategic and tactical skill of Subhas, the hard-headed political realist, but free from the cynicism of 'Realpolitic'. Though an unbending and uncompromising revolutionary, with his heart, mind and soul set upon one goal and one alone, he was no rigid doctrinaire as regards the means to be adopted for the attainment of that goal. For him solid organization was the first essential of success, and disciplined unity of action the path to the goal. Given these two, the effectiveness of a particular method at any particular time was weighed by him in the historical context of the situation—internal and international. This was amply demonstrated by his policy and programme during World War II, within India and without.

With the fait accompli of office acceptance by the Congress in the Provinces under the scheme of truncated provincial autonomy, Subhas Chandra Bose as Congress President attempted to devise ways and means of utilizing office and power for a revolutionary purpose In a masterly dissertation on 'The Pros and Cons of Office Acceptance' written in August, 1937, he discussed the militant role of Congress Ministries in the furtherance of our freedom struggle. With flexibility and elasticity of tactics which characterizes a revolutionary of clear vision, he brushed aside the tendency to make a fetish of the oath of allegiance incumbent on all members of the Assemblies and Ministers He observed that the matter was merely in the nature of a constitutional formality, and cited the example of de-Valera who after having taken the oath moved for the abolition of the oath. The revolutionary potentialities of Congress Ministries he stressed in his Presidential address at Haripura in February, 1938. It was notable for its clarity with regard to what should be Congress policy in the new epoch, and to a certain extent it foreshadowed the emergence of the Forward Bloc in the Congress a year later.

The address is remarkable for its perspicacity, for its political insight and acumen, and enables us to understand clearly the 'Weltanschaung' of Netaji. Some of the ideas he enunciated might have sounded unorthodox at the time, but on the whole, his stand has been vin-

dicated by the subsequent development of the International situation and the ultimate formulation of Congress policy. Much of what he said and did later on, inside India and outside, can be better appreciated in the light of the Haripura Address. The year that followed in the wake of Haripura saw the steady worsening of international relations, and clouds of war gathering on the European horizon. As regards the internal situation, Congress Ministries tried to make the best of their job, in the face of Imperialist obstruction and communal obscurantism. The Viceroy announced the decision of the British Government to inaugurate the Federal Scheme at the centre at an early date : against this Subhas thundered and threatened to launch a raging and tearing campaign throughout the country in the event of any attempt at the introduction of Federation. The year drew to its close, and the Presidential election to the Tripuri Congress took place early in 1939. For the first time in the history of the Congress the election was openly contested ; the candidates were Subhas Chandra Bose and Dr. Pattabhi Sitaramyya, the latter being backed up by Mahatmaji and the Congress High Command. The fight appeared to be on the issue of a compromise with British Imperialism as envisaged in the Federal Scheme, and this was deprecated by Subhas in view of the fast deteriorating international situation and the certainly of another war. He declared that Congress and the nation had to be fully prepared for the final onslaught on British Imperialism, when the opportunity would present itself in the near future. He was re-elected to the Congress Presidentship, but unfortunately the event, unique in the annals of Congress, provoked a crisis within the organisation. Subhas, however, kept his head cool in the midst of the gathering storm and from his sick-bed at Tripuri, he declared in March, 1939 with amazing, almost prophetic foresight, that an Imperialist war would break-out in Europe within the next six months, that Congress should deliver a six months' ultimatum to Britain, and in the event of its rejection, they should launch a country-wide struggle for Poorna Swaraj, taking full advantage of the entanglement of Britain in the international imbroglio. This warning and advice however went unheeded, and further the constitutional right of the President to nominate his own Working Committee was sought to be curtailed through a resolution asking the duly and democratically elected President to nominate his colleagues on the advice of Mahatma Gandhi. Subhas decided it was futile in the circumstances to continue as Congress President, while unable to carry his point of view or implement his policy and programme. He, therefore, resigned his high office in April at the Calcutta Session of the A I C.C. For the democratization, radicalization and the reorientation of the Congres into a sharp instrument of the people's will to freedom he announced the formation of the Forward Bloc within the Congress early in May, 1939. Its advent was not surprising in the light of the pronouncements that Subhas had made the previous year at Haripura.

Subhas Chandra Bose declared that the Forward Bloc came into being to fulfil a historic necessity, the necessity of consolidating all the anti-Imperialist forces in the country for the inevitable struggle. He said that "it was desirable that the internal crisis in the Congress should come and should be transcended before the international crisis overtook us." Contrary to hostile propaganda, the Forward Bloc was intended to strengthen the Congress as an organ of the people's struggle against the impending Imperialist war and was accordingly

conceived as a platform for all the progressive, radical and anti-Imperialist elements within the Congress. "Left consolidation, winning over the majority in the Congress, and the resumption of the National struggle, these represented the three-fold task before the Forward Bloc in the Congress." Accordingly, early in June, 1939 a Left Consolidation Committee was formed under the leadership of Subhas Bose and in it were represented the Congress Socialist Party, the Communist Party (National Front), the Radical Democratic Party (of M N. Roy), the Trade Unionists, the Kisan Sabha as well as the newly-born Forward Bloc. The first All-India Forward Bloc Conference convened in Bombay was addressed by representatives of all these groups, and they unanimously adopted as their goal—the attainment of complete political independence for India and the establishment of a free Socialist State. A resolution advocating country-wide preparation for an anti-Imperialist struggle to be launched in British India as well as the Indian States, so as to take advantage of the rapidly gathering clouds of war for the overthrow of foreign rule was also carried.

A few days later, the All-India Congress Committee at its session in Bombay adopted a resolution prohibiting Congressmen from offering Satyagraha without the previous sanction of the Provincial Congress Committee concerned. This resolution was interpreted as a direct challenge to the growing militant forces within the Congress, who, at the time, were concentrating their energies on the development of local Kisan-mazdoor struggles and the starting of new local offensives, which were to culminate in an India-wide offensive at the opportune moment. The fighting forces in the Congress were not to be curbed and checkmated in this fashion, and so the Left Consolidation Committee decided to organise protest meetings all over the country on July 9, with a view to asserting the inherent democratic rights of Congressmen. Rajendra Babu, who had been elected Congress President on the resignation of Subhas Bose warned Congressmen against participation in the intended demonstrations, but nevertheless, meetings were held in numerous places recording the protest of Congressmen and appealing to the A.I.C.C. to rescind the resolution. On the eve of July 9 the Royists precipitately retreated and permanently withdrew from the Left Consolidation Committee. The Congress High Command directed that disciplinary action be taken against all Congress office-bearers who had joined the 9th July demonstrations, and in August Subhas Babu himself was removed from the Presidentship of the Bengal Provincial Congress Committee and further debarred from holding any elective office in the Congress for a period of three years.

Subhas Bose accepted the result unperturbed, without the least trace of wrath or malice and in a mood of philosophic calm, declaring that Congress had become to him dearer than ever. He appealed to all fellow-fighters to go ahead undeterred and to be ready for the final assault on the Imperialist citadel, and expressed his confidence that sooner or later the entire Congress would have to come on the path of struggle.

In September, 1939 the Fascist-Imperialist-War broke out in Europe, Hitler having invaded Poland on September 1, and Britain and France having declared war on Germany two days later. The prophecy that Subhas Bose had made at Tripuri came true, almost to the very day. The Governor-General by a special Ordinance, declared India a belligerent country, and India was thus dragged into the Imperialist war without even so much as a formal consultation with her leaders and elected represen-

tatives in the Central and Provincial Legislatures. Congress by its previous resolutions on the subject was committed to resisting exploitation of her resources for the predatory Imperialist war. Yet the Congress High Command marked time by demanding of the British Government a clear enunciation of its war and peace aims and carrying on fruitless negotiations with British Imperialism Even after the resignation of the Congress Ministries in October, 1939, consequent upon the unsatisfactory pronouncement of the Viceroy in answer to the Congress demand, no bold forward step was taken with a view to forging the necessary sanction behind the national demand for freedom and independence.

It cannot be gainsaid that it was Netaji, almost alone among Indian leaders, who consistently preached a relentless opposition to the war and with remarkable clarity of vision saw through the tangled skein of world events, and moulding his policy and strategy accordingly, executed it with consummate skill, tireless industry and superb valour.

When, even after meeting with a rebuff at the hands of the British Government, Congress leadership refused to embark on the path of direct action, Mahatma Gandhi even declaring that he would not embarrass the British Government during the war, Subhas Bose convened an Anti-Imperialist Conference at Nagpur in October 1939, and there reminded the Congress and the nation of their historic task of consolidating all anti-Imperialist forces in the country against war and for storming the Imperialist citadel. The militant forces in the country, under the leadership of Subhas Bose and the Forward Bloc, fast gathered strength and momentum, and almost simultaneously with the invasion of Norway and Denmark by Hitler in April, 1940, the Forward Bloc launched a country-wide Satyagraha struggle, calling upon the people not to help the Imperialist war with men, money or materials, and to resist by all means and at all costs the exploitation of Indian resources for the preservation of the British Empire.

Earlier, in March, an Anti-Compromise Conference was held at Ramgarh, in Bihar, under the joint auspices of the Forward Bloc and the Kisan Sabha. Subhas Bose presided over the Conference, and at the same time and place, Congress too held its plenary session. The stand taken by the Anti-Compromise Conference at Ramgarh was truly worthy of a revolutionary party pledged to complete independence and socialism The Conference resolved that "the sixth of April, the first day of the National Week, should mark the commencement of country-wide Satyagraha against the war effort and the nefarious designs of British Imperialism ; that the day should symbolize the resolve of the Indian people to withdraw themselves from forcible participation in the war and to make the final effort for the achievement of India's independence. Once the struggle began, there was to be no rest, no break, no Chauri Chaura as in 1922, no Delhi Pact as in 1931, no side-tracking of the struggle as happened in 1933, when the Harijan movement was launched."

At Ramgarh the Congress Socialist Party deserted the Forward Bloc and left Consolidation Committee on the ground that a country-wide anti-Imperialist struggle, as contemplated by the Forward Bloc, was inadvisable : it sounded strange in the mouth of professedly militant socialists ! The National Front Group (Communist Party) behind the comouflage of anxiety for a United Front also refused to join the struggle, though clamouring all the while for mass action. A year later, on the invasion of Russia by Hitler, they were to perform a disgraceful 'volte face', asserting that the Imperia-

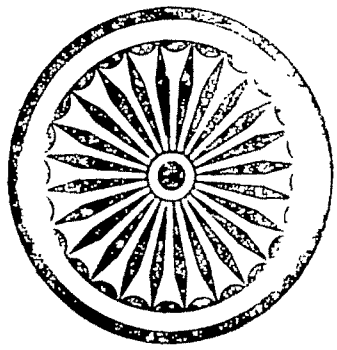

২৬শে জানুয়ারী

তিনটি স্মৃতিপূত দিনের বার্ষিকীর স্মারক

এই দিনটিতে, ৪৯ বছর আগে, আমরা পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের সংকল্প ঘোষণা করেছিলাম।

—এই দিনটিতে, ১৯৫০ সালে, আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করেছিলাম এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সম-অধিকার ও সৌভ্রাত্বের আদর্শে মহান এক সংবিধান নিজেদের হাতে অর্পণ করেছিলাম।

—দু বছর আগে প্রায় এই দিনটিতেই, আমরা সংবিধানে প্রতিশ্রুত গণতন্ত্রের পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা শুরু করেছিলাম।

আসুন এই বার্ষিকী অর্থবহ করে তুলতে—

আমাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুক্তি ও সাম্যের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন
তাঁদের স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী হই।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়
যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তব করে তোলার জন্য
নিজেদের আবার উৎসর্গ করি।

davp-78/408

list war had been transformed into a People's War even for India groaning under the heel of of an alien Imperialism, and deliberately setting at naught the Marxist-Leninist thesis about the revolutionary utilization of an Imperialist war for the freedom movement of slave peoples in colonial countries. Instead of converting the war into a war of Indian liberation, they aligned themselves brazen-facedly with British Imperialism, and stabbing in the back the Indian freedom struggle, they maligned and calumniated Congress, and slandered and traduced the Forward Bloc as the Fascist Fifth Column, calling Netaji. 'traitor, hangman and puppet of the Axis Power.' History has shown indubitably who played the freedom-saboteur's ignoble role in India during the critical war years.

The Indian people, hungry for freedom, participated in their thousands in the struggle launched throughout the country by the Forward Bloc on 6th April, 1940. Hundreds were gaoled, many more were beaten and harassed, civil liberties curtailed and the heavy hand of repression descended on the people. The tremendous response heartened Subhas Babu and at the Nagpur Session of the All-India Forward Bloc held in June 1940 and presided over by him, the Ramgarh stand was reiterated and further clarified in the context of the rising tempo of the Indian struggle. It was at Nagpur that the Forward Bloc decided to function in future as a party, and not as a platform, in view of the defections from the Left Consolidation Committee. In view of the fast-developing war situation in Europe, and the near certainty of other continents being drawn into the maelstrom, the Forward Bloc demanded the immediate establishment of a Provisional National Government in India, and under its aegis, the formation of a National Defence Brigade for the effective defence of India against foreign invasion. The nation was advised to march under the slogan of 'All Power to the Indian People' for the final conquest of power. Further, with regard to the organs of struggle and of seizure of power, the Conference resolved that :

"in order to carry on the struggle efficiently and also to take over the responsibility of administration when the necessity arises, People's Panchayats should be set up in every village as well as in every factory. It is desirable that the Panchayats should be the product of local initiative and as far as possible, endeavour to develop the initiative of the masses who have long been in the habit of taking orders from above. These People's Panchayats, backed by volunteer organizations, should be the bulwark and the popular sanction behind the demand for a Provisional National Government of the Indian people to whom all power should immediately be transferred"

Soon after Nagpur, Subhas Bose was arrested in July by the Bengal Government on the eve of the anti-Holwell monument Satyagraha in Calcutta, and sent to jail. Two cases were started against him, but during the prosecution he resorted to hunger-strike in jail, whereupon he was released early in December, 1940. In the following month, on the historic Independence Day, January 26, 1941, an astounded world heard the news that Subhas Bose had suddenly disappeared from his house under the very nose of the C.I.D., who were on guard day and night. It was not until many months later that news trickled in from abroad that he had gone out of India with the avowed intention of furthering India's freedom struggle. He made a pointed reference to this in one of his broadcasts, saying—"My object in leaving India was to supplement from outside the struggle going on at home." He strategically concluded a politico-military alliance with the

enemies of our enemy, Germany and Italy, on terms of complete equality ; later he was to strike a similar alliance with Britain's mortal foe in the East. Japan Thus was a new, glorious and thrilling chapter opened in our protracted freedom's battle, and history will record how, "recognizing Britain's difficulty as our opportunity," Netaji made a bold bid for freedom, whose repercussions are felt today not only in India but over all Asia as well. Netaji has thus played a distinctive role in our struggle for national emancipation, and if the British Government has today visibly relaxed its grip over India, it is due to Netaji's magnificent endeavours outside India, no less than to the struggle waged by us inside her borders.

The phenomental success of Japanese arms alarmed the Churchill Government and Sir Stafford Cripps was commissioned to win over India to help prosecute the Imperialist War Against Germany and Japan. Again the Forward Bloc within India, and Netaji without, entreated Congress leadership to reject the Cripps' offer summarily, and it was fortunate for our freedom movement that the Congress ultimately decided against acceptance. The same thing was repeated in June, 1945 when on the collapse of Germany, Lord Wavell, the Viceroy, invited the Congress to form a Government explicitiy with a view to vigoroudy carrying on the war against Japan. But luckily the Wavell Conference also ended in fiasco, and the Congress was saved from the ignominy of bolstering up British Imperialism at the fag-end of the war. Netaji and the Forward Bloc can rightly claim to have enabled the Congress to stand firmly on the anti-war path, and to have been the vanguard of the struggle waged by the Congress and the nation in 1942 and after, against the mightiest Imperialism in history.

Gandhiji saw, as in a flash, that the only salutary solution of the crisis was for the British to "Quit India". He began preaching this idea in the columns of the Harijan, and thus helped to re-create a militant atmosphere throughout the country. In the meantime, Netaji from abroad and the Forward Bloc at home were indefatigably summoning the nation to battle, with the result that the Forward Bloc was declared an illegal organization on 22nd June, 1942.

On the fateful night of August 8, 1942, a clarion call to Britain to "Quit India" was given by the All-India Congress Committee at Bombay. For many weeks leading up that day, the emotions of the people had been worked up to a high pitch by the passionate writings of Gandhiji, the fervid speeches of leaders like Sardar Patel and most of all, by the fiery broadcasts of Netaji appealing to the people to rise and throw the British out of India. To an American journalist who asked Gandhiji why he could not wait for Indian freedom till the end of the war, he replied, calmly but significantly : "Go and ask Subhas. Such a passion for freedom animates us all today." The All-India Congress Committee, on August 8, demanded the withdrawal of British power from India : "The Committee, therefore, resolves to sanction, for the vindication of India's inalienable right to freedom and independence, the starting of a mass struggle on non-violent lines on the widest possible scale, so that the country might utilize all the non-violent strength it has gathered during the last 22 years of peaceful struggle." Still further, the Committee envisaged the form of Government that would be ushered in after the exit of British authority, when essentially all power and authority must belong to the toilers in fields, factories and elsewhere. The stand thus taken by All-India Congress Committee in August,

1942, was a complete vindication of the policy and programme that the Forward Bloc had consistently advocated ever since the commencement of the war.

The course of events that followed in the wake of the August resolution is too recent to recapitulate in any great detail. Suffice it to say that no sooner were the Congress leaders arrested, than the people rose up in fury, and though devoid of preparation and deprived of leadership, spontaneously revolted against foreign tyranny. The rebellion showed what reservoirs of initiative and energy lie hidden in the common man, and how on crucial occasions they come to the surface. In many tracts of the country, the British Raj was liquidated, and People's Raj proclaimed as a result of the heroic assault of an unarmed people fighting with their backs to the wall. Imperialist vengeance and repression knews no bounds : hundreds of thousands paid with their lives for resisting British authority and for espousing the cause of freedom, suffering indignities, insults, imprisonment, torture, the lathi, the gallows, the bullet, the machine gun, and all other weapous in the armoury of a repression that defied description. Though we failed to achieve Poorna Swaraj the stupendous sacrifice was not in vain.

The August revolution and the "Chalo Delhi" campaign were the twin facets of a total struggle for India's liberation. We may have failed to win our immediate objective, but the struggle has bequeathed to us a glorious heritage which has carried the Indian nation tremendously forward on the road to freedom.

The war has closed an epoch, and we in India have entered the new era enriched by the precious legacy of the August revolution and of the Azad Hind Fouz. Though the war has ended, yet over vast tracts of the globe there is no peace. but only a precarious truce, further confounded by the grisly terror of the atom bomb. But we are determined to administer the coup de grace to a decaying, moribund imperialism, and the armed forces of India are now at one with the civilian population on this vital issue. Our failure in the last battle has been only apparent ; out of such a seeming failure we shall forge a resounding victory in the near future Netaji said in his final broadcast :

"There can be no room for pessimism ; we have lost only the first round, but we shall win the war."

Life springs from death, even so from the graves of patriotic men and women spring living nations. By a heroic endurance in suffering, India has gained the position she holds.

The Immortal Spirit brooding, from years sempiternal, at the heart of Creation, ever urges us forward, ever onward, ever upward ! May God endow us with courage and fortitude to plant our feet firmly on the steep path of revolution and to march forward to victory ! To dare, again to dare and without end to dare !! Let us all strive for that happy day when a free India will gather the peoples of the world under her spacious banner and preach to them the old, but ever new, gospel of peace and harmony, firmly rooted in a wide spiritual democracy and bathed in the refulgent light of a Himalayan dawn ! It shall be the noble task of a free India to lift this machine-driven, money-ridden age to a higher level of social justice and spiritual grandeur. Let it be our proud privilege to usher in the great Asiatic Federation, and as the crown and glory of our labours, let us dare to build the Super Parliament of man, the Socialist Federation of one Free World—the vision and the heart's desire of sages, seers and prophets ! Then shall Man have Life, and have it more abundantly.

Let us have faith in our historic mission. Let us be strong in that faith, and move forward into the future, stout of heart and clear of vision. The spirit of empire must give place to the Empire of the Spirit, before Man can finally break the bonds that bind him, and come into his own, his Divine heritage !*

JAI HIND,

* Abridged version of an article written on October 10, 1946.

the changing landscape of india

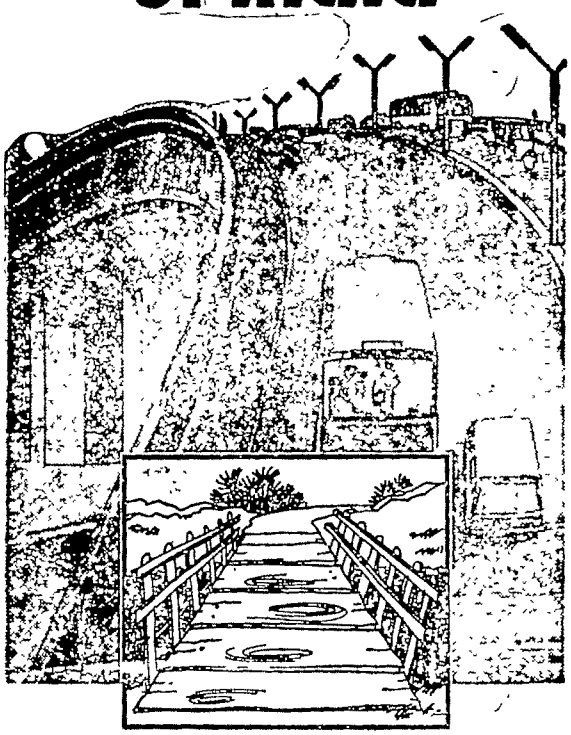

Planks of wood rivited together. Makeshift bridges creaking in the wind.

Today.

Floodlit highways arching over rivers and railway tracks. Bearing the load of vehicular traffic every day, for years and years.

It's the changing landscape of India With Orissa Cement playing a key role with its famous Konark brand of cement.

In dams, bridges, buildings and skyscrapers— anywhere that cement is used.

Cement that can withstand the ravages of time Cement of a high quality backed by 25 years of Know-how aimed at perfecting its worth.

Choose a cement that won't let you down- KONARK

better cement for a better living

OCL

ORISSA CEMENT LIMITED RAJGANGPUR ORISSA

With Compliments of :

PRINTOO ART

49E, PURNA DAS ROAD
CALCUTTA-29

With Best Compliments of :

MILKOS

THE STERILISED FLAVOURED MILK DRINK BRIDGES THE ENERGY GAP

EASTERN MILK FOODS

35-3634

'না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে'

চারণিক

একটা দিনের কথা মনে পড়ে, মহাকাল কোনো কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন, চারণ গাইল, 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা আমাদেরই বসুন্ধরা'—মহাকাল গভীর উদাসীন কণ্ঠে যেন স্বগতোক্তি করলেন : 'you must translate these ideas in your life not as a show-piece for parading but following your own inner garden in its splendour and heavenly beauty.'

তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ এত বেশী, তোমাদের, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ, তোমাদের জাগতিক, সাংসারিক কর্তব্য পালন এতো unalterable যে you cannot spare a period for whom you profess unalterable allegiance, everlasting devotion and unquestionable faith—যখন তোমরা এতটা পার না—আমিও তো in the same token বলতে পারি 'I cannot spare a single moment to waste my life's time outside my horizon's works. That's the only, I repeat only one, for which I am.'

'As you donot need me vitally I donot need you casually.'

কথা ক'টি নিয়ত কানে বাজে। চারিদিকের নানা ঘটনাবলী নানা কথার পৃষ্ঠে সেদিনের উদাসী মহাকালের স্নিগ্ধ মমতা মাখানো ক'টি কথা আর সেই সঙ্গে স্বার্থান্বেষী, প্রতিপদক্ষেপে সংসারী হিসেবী মানুষের প্রতি শাণিত শ্লেষ, চারণকে মহাকাল মণ্ডলের দায়িত্ব ও কর্মের নিশানা দেয়।

'তোমাদের যে যে অবশ্য করণীয় কাজগুলির দাম বেশী, আমার একমাত্র মাতৃসাধনার দাম তার চেয়ে অনন্তগুণ মহান মনে করি এবং আমার প্রাণের শেষ নিঃশ্বাসটাও যেন দিতে পারি এই জন্য, তোমাদের জন্য 'দিগন্তে'র বাইরে I have no time।'

আজ শুধু মহাকালের কথা, মহাকালের কণ্ঠে বেশী করে বলতে চাই। বার বার তিনি চারণ এবং তার সমদর্শীদের Ego-র বিষময় ফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন মহৎ প্রচেষ্টা শুধু ব্যক্তিগত Ego এবং স্বভাবজ পরশ্রীকাতরতায় কী ভাবে বিনষ্ট হয় তার বহু উদাহরণ, যুক্তি উত্থাপন করেছেন। যারা জীবনের চাওয়া-পাওয়া তুল্য মূল্যে বিচার করে, তাদের কাছে এসব কথা তত্ত্ব বস্তু হয়ে সিন্দুকে আশ্রয় নেয়, প্রাণে স্পর্শ করে না।

কিন্তু মহাকালের কোনো বক্তব্যে জাগতিক, সাংসারিক attachment নেই, তাঁর সব বক্তব্যে বন্ধনহীনতা মুক্ত সরলতা রয়েছে।

'Observing a particular so-called day is immaterial, you have your own life to lead, but I have no life, I have only life to perform, a command performance, that performance have not been written by me. I have only been given the role as a stage actor on the complete direction by the director.

If you have time I might persuade some bit of mine. Let the play may entirely overgo.

"কর্মবীজ এবং কর্মরহস্য তোমরা কিছুই জানো না। মনুষ্যমাত্রেই কর্মবীজ ও কর্মরহস্যের অধীন। শত সহস্রজন্মের সংস্কার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে। এই যে সংস্কার এই হল কর্মবীজ। সংস্কার তোমাকে ছাড়বে না, তুমি চালাকি করে তোমার কর্মের চোখে ধূলো দিতে পারবেনা। তোমার কর্ম তোমায় চালিত করবে। মানুষের by nature খারাপ কর্মগুলি তাকে goad করবে। এই খারাপ কর্ম বা সংস্কারগুলি যা নীচের দিকে টানে তাকে কর্ম বিপাক বলে।

কর্মরহস্যই কর্মবীজ। তুমি তাকে ত্যাগ করতে পার না সেও তোমাকে ছাড়বে না, কারণ কর্ম তোমাকে জড়িয়ে ধরেন, তোমার মধ্যে যে শুভ ও অশুভ কর্মসংস্কার আছে সেটা তোমায় ভোগ করতেই হবে, যে কর্মবীজ তুমি ভোগ করতে পারনি তা তোমার মধ্যেই থেকে যাবে। তুমি যদি সেই balance-টিকে রগড়ারগড়ি ক'রে খতম করতে না পার, তাহলে শত সহস্র বৎসর তোমার মধ্যেই তা থেকে যাবে। হাজারটি গাভী ও একটি বাছুর তার মাকে চিনে ঠিক তার কাছেই যাবে, ঠিক তেমনি পূর্ব কৃত যে কর্ম তা তার কর্মকর্তার দিকে যথা নিয়মে চালিত হবে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন। কামনা-বাসনা-ইচ্ছা, নদীর মত, নদীর স্রোতের মত চলেছে; তার দুটি রাস্তা, শুভ ও অশুভ। আর সংস্কার এমন সে অশুভ রাস্তায় চলে বেশী, কারণ সে উপর থেকে নীচে নামছে, সেই জন্য তোমার একমাত্র কর্তব্য হল নিজের পৌরুষ, বিক্রম, দেখিয়ে অশুভ স্রোত থেকে শুভ রাস্তায় নিজেকে চালনা করা।

একদিন মহাকাল বার্তা পাঠালেন—দিনটি মায়ের আগমনীর আনন্দ দিন—

'Love in its purest quality means total negation of ego. Thus elavating him to the sublime state of sacrifiice.'

কতবার বলেছি একবার নয় দু'বার নয়। সেকথা যদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করো, তবে অনোয়াস্তি বোধ করি।.....সব চাইতে বড়ো গুণ—পরের শক্তিতে শক্তিমান নয়, যত বড়ো sacrifice-ই দিয়ে আমরা দেবো, কিন্তু বড়ো হতে হবে নিজের শক্তিতে, শক্তিমান অপরের শক্তিতে বলীয়ান হয় না।.....

একটি আলোচনার অংশত চারণ উদ্ধার করেছিল আজ সেই কথোপকথনের খানিক আবার উদ্ধার করেছে,—"একজন স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ কিছু বলবো, তোমাদের প্রশস্তি, অবাক হয়ে দেখলুম এই cityর ১৫ লক্ষ নিবাসীদের জন্য deep underground-এ একটা পুরো city with all modern amenities হাট বাজার দোকান বাসগৃহাদি সব এত সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছে যা ১০০টা atom bombও নষ্ট করতে পারে না, আমি অবাক হই এবং সত্য কথা আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করি, তারপর দেখচি

হিসেব করে বিশবছর আগে জীবনের যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের যা দাম ছিল এখনো সেই একই দাম রয়েছে, অথচ সাধারণ মানুষের উপার্জন ২৫গুণ বেড়েছে। সেদিন একটা Public Hotel-এ দেখলুম ৩০ পয়সায় তিন course খানা পেটভরে খেয়ে চলে যাচ্ছে। আমার চোখে জল এল, আমার দেশের কথা ভেবে। আপনি আমার.....। হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন তা নয় তা নয়, যে উপকার এদেশ পেয়েছে যা বারবার ১০।১২ বার চেষ্টা করেও আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হয়েছিল, সেই অসম্ভবকে সম্ভব কর্তে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতার ঋণের শেকড়ে আমরা বাঁধা। সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, নির্ভর করি এবং পরামর্শ করি ও সহায়তা পাই। তবুও একটা শঙ্কার ছায়া সব সময়ই থাকে একটা কঙ্কালের মত spartan জীবনযাপন আপনার দেখে।'

দু'জনের একজন মহাকাল অন্যজন এ জগতের মায়া ত্যাগ করেছেন।

'তিনি যেচে বল্লেন ওদেশটা তোমাদের। ইংরেজদের বুদ্ধি ছিল—প্লেটে যদি সুখাদ্য পরিবেশন করা হয় তা যে ঠুকরে ঠেলে দেয় সে বোকা। তারপরের stage টা হোল কেবল মাত্র একটা corollary। শাসকের বৈদিশিক নীতিজ্ঞান তথা Strategic Horizon fix করবার কুশাগ্র বুদ্ধি থাকা দরকার। এতবড় মহামূর্খ শাসক কে হবে যার নিজের দেশের geographical সীমা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই, সে শাসক সর্বনাশা শাসক যে নিজের frontier manned করতে ভুলে যায়। unmanned খালি frontier পাশের দেশকে ডাক দিয়ে বলে আমি খালি পড়ে আছি, আমি নিঃসঙ্গ তোমরা এসো, আমাকে ভরে তোল, আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দাও। তোমাকে বোধহয় মনে করিয়ে দিতে হবে না তেত্রিশ হাজার মাইল যখন আমায় নিয়ে ঐ দুরন্ত দুর্গম জনমানবহীন এলাকা Sixth Lane রাস্তায় পরিণত করে দিলুম তা তোমাদের সে সময়কার দেশের কর্ণধার জানতেনই না। জানলেন ৬ বছর পরে Tradersদের কাছ থেকে খবর পেয়ে। আর নিজের অকর্মন্যতার লজ্জা লজ্জাহীন হয়ে ঢাকবার জন্য তোমাদের Parliament এ দাঁড়িয়ে বল্লেন, এসব দেশে কেউ যায় না, যেতে পারে না, থাকতে পারেনা, কারণ ওখানে একটা দুব্বো ঘাসও নেই। সোজা কথায় এর অর্থ হোল এ জিনিষটা গেলে আমাদের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আর তোমাদের Parliament-এর সদস্যরাও হাততালি দিয়ে বাহবা দিলেন।'

এসব প্রসঙ্গ এখানে চারণ উদ্ধার করছে এজন্য যে মহাকাল কীভাবে কত নিকটে কাদের সঙ্গে সময়ে অসময়ে রয়েছেন তার সামান্য ইশারা। বিশ্বের নানা ঘটনায় মহাকাল স্পষ্টতঃ অথবা ছায়ারূপে বিরাজ করেছেন তার নানা নজীর নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী চারণ শুনেছে। সবই যে তার বোধগম্য হয়েছে বলা যাবে না, কারণ এই আন্তর্জাতিক টানা পোড়েন, Strategy ইত্যাদি প্রসঙ্গ গভীর ইতিহাস ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, যা চারণের বুদ্ধির ও বোধের অগম্য।

চারণের ব্যস্ততা রয়েছে, বসে লিপিবদ্ধ করার ফুরসৎ নেই। মহাকালের ডাক বার বার তাকে আন্দোলিত চঞ্চল করে তুলছে, অথচ মহাকালের ক'টি কথা লিখতে হবে। নানা সময়ে নানা চক্রে বৈঠকে একজন অংশীদার নয়, একজন দর্শক হিসেবে কেবল শুনে যায়, কেউ দাবি করেন তাঁর মত এত ভাল 'তাঁকে'

কেউ জানেন না'। কেউ বলেন, একথা আপনি কি করে জানলেন, হতে পারে না কারণ আমিই একমাত্র Trusted। খেলা চলেছে সর্বত্র। ঘুমন্ত দেশ ঘুমন্তজাতি মাঝে মাঝে গরম লোহার আঁচে চমকে ওঠে, আবার ঘুমিয়ে পরে। তার ইন্দ্রিয়াতীত সকল শিল্পকর্ম আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে, জাগতিক ভোগের লিপ্সায় বুঁদ এ জাতি কেবল রসগোল্লা পান্তুয়া খেয়ে পরের কাঁধে চড়ে জীবন কাটাতে চায়, কিন্তু মহাকালের আগামী দিনের ঘটনার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। যত কথা কাহিনী যা রচনা চলেছে, বা এতদিন রচনা হয়েছে সবই কোথাও না কোথাও সঞ্চিত রয়েছে, কারণ মহাকাল চারণ ও তার সহযাত্রীদের বৈঠকে বলেছেন, ওসব বই এনো না, ওসব সংবাদ, তথ্য আমার কাছে পরিবেশন কোরো না, আমার ঘেন্না হয়, ওগুলো preserve কর, আমার messenger তোমাদের কাছে যাবে তখন ওসব handover করো এবং প্রতি কর্মে জবাব কর্মকর্তাদের দিতে হবে।

ইতিহাসও পাল্টায়, ইতিহাস লেখা হয়, মহাকালের নির্দেশে,—কারণ জীবন একটি আংশিক, হঠাৎ করে গড়ে তোলা বিষয় নয়,—তাঁর সকল কর্মর ও ভাবনা একটি অখণ্ড, সার্বিক রূপ।

লুকিয়ে যেবার গেলুম একটা দেশে একটা খবর পেয়েছিলুম সেজন্য, বর্তমানে যাঁকে তোমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বল অর্থাৎ তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। একটি মাত্র তাঁদের কন্যা 'দরজা খুলে দিলে'। কে আপনারা ? একজন আমার দল থেকে গিয়ে তাকে বল্লো, আপনার বাবাকে গিয়ে বলুন, আধ মিনিটও দেরী হল না, মুখ্য কথাকটি বল্লুম, আপনি যে Compile করছেন, আপনিও কি নিজের দেশ, নিজেদেরই জাতির জয়গান করবেন সত্যকে আপনিও কি ঢাকবেন, আপনি সত্য বলবেন এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। ততক্ষণে তাঁর স্ত্রীও এসে গেছেন। স্বামীর আগেই উনি এগিয়ে এসে বল্লেন, তুমি ওমুক ? বুড়ী হয়ে গেছি। I knelt down there and wept. তাঁর স্বামী তাড়াতাড়ি এসে তুলে নিলেন, সামলাবার পর বুঝলুম মেয়েটি বিদ্যুতের মত দৌড়ে দরজা জানলা ভেতর থেকে Lock করছে। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করে বলে দিলেন। আমার আহ্লাদে হৃদয় গলে গেল। একটি অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী প্রশ্ন করে বসলেন সেই দুহিতা, বাবাকে এই নিষেধটুকু করতে আপনি নিজের জীবনটাকে বিপদের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এলেন। এটা করেছেন কি ? জবাব দিলেন তার বাবা, দেশের জন্য হাজার বার হাজার জীবন তিনি দিতে প্রস্তুত। আমাদের আশারও অতীত নিষ্কলুষ সত্য কথা তিনি তাঁর প্রকাশিত বইয়েতে বলেছেন। তোমরা কি বুঝবে এই হৃদয়ের কথা।

এবার আমি যাচ্ছি পরপর এতগুলি ব্যাপার যা ঘটাচ্ছেন তার মধ্যে। এতগুলি ব্যাপারের মধ্যেও মনের চোখের ওপর একটিই ছবি ভেসে থাকে—তা হ'ল জননী জন্মভূমির।

জানুয়ারি ১৯৭৯।

অনিল রায়

বাংলা দেশের মননশীল রচনার ক্ষেত্রে অনিল রায় একটি স্মরণীয় নাম। ত্রিশ দশকে যখন মার্ক্সের সমালোচনার কথা এদেশে কেউ কল্পনাই করতে পারেন নি, সেই সময় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ভারতপন্থী অনিল রায় পরাধীন ভারতের কারাকক্ষে মার্ক্সীয় মতবাদ খণ্ডন করে কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন। সেদিন শিক্ষিত তরুণদের এই বিদেশী বিজাতীয় ভাবাদর্শের জোয়ার থেকে অনিল রায় তাঁর গভীর মনন দ্বারা রুখে ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'নেতাজীর পথই ভারতের পথ'। আজ তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

নেতাজীর জীবনবাদ

৪·৫০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কস্‌বাদ

৬·০০

গান্ধীবাদ অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ

১·০০

ধর্ম ও বিজ্ঞান

২·০০

আজকাল আমরা ধর্ম বলতে বুঝি অজ্ঞেয় অলৌকিক শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস আর বিজ্ঞান বলতে বুঝি প্রত্যক্ষ বস্তুর শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস কি যথার্থ? বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রধান সহায় অথচ ধর্মের কাছ থেকে যে-শিক্ষা পাই তার সঙ্গে আমাদের ওই জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য নেই। তবে কি ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী? আমরা কি জানি ধর্ম কাকে বলে আর বিজ্ঞান কাকে বলে? ধার্মিকদের সাধনা কি আর বিজ্ঞানীদের সাধনাই বা কী? ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের ইতিহাস কী, তার কারণ কী, তার মূল কোথায়? আমরা কি জানি এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভব কিনা? সম্ভব যদি হয় তাহলে কোন পথে সেই মীমাংসা সম্ভব? এই বই একালের এই বিশেষ সংকটের স্বরূপ ব্যাখ্যা।

পবিত্রকুমার ঘোষ

সুভাষচন্দ্র

সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী

১ম খণ্ড ৯·০০/২য় খণ্ড ১০·০০/৩য় খণ্ড ১৩·৫০/৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত। নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সত্যরঞ্জন বক্সী

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

...তাঁর থেকে প্রস্তুতি ও শক্তি নিয়ে বাংলা ভাষায় সুভাষচন্দ্রের জীবনী রচনায় আর কেউ এগিয়ে আসেননি শংকরীপ্রসাদ বসু

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনী-কারদের মধ্যে শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ অন্যতম। দেশ

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে। যুগান্তর

আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী ও স্বাধীনতা

ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আজাদহিন্দ বাহিনীর সংগঠন এক অনন্য ঘটনা, ইতিহাসে যার নজীর নেই। এই বিপ্লবী-বাহিনী একটি সুসংগঠিত সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়েছে—যে সরকার নয়টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। এই সরকারের আশু লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির অপসারণ। আজাদহিন্দ বাহিনী ছিল আজাদহিন্দ আন্দোলনের অঙ্গ এবং এই আন্দোলন ভারতের বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিল। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের প্রথম ফ্রন্টের সঙ্গে ভারতের বাইরে থেকে তাঁর সশস্ত্র আজাদহিন্দ আন্দোলনের দ্বিতীয় ফ্রন্টকে সংহত ক'রে বৃটিশ বাহিনীর বিপর্যয় ঘটিয়ে তাকে ভারত ভূমি থেকে বিতাড়িত করবেন এবং পরে নূতন ভারতবর্ষ গঠনে সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন—এই ছিল নেতাজীর উদ্দেশ্য। আজাদহিন্দ বাহিনী ও আজাদহিন্দ সরকার গঠনের পটভূমি সম্পর্কে যাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন এবং সুভাষচন্দ্রের জীবন-দর্শন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং যাঁরা ভারতের জাতীয়তা বিরোধী উৎকট আন্তর্জাতিকতা-বাদী বলে খ্যাত তাঁরা সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে ছোট ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেন এবং অনেক সময় তাঁর এই আন্দোলনকে ভুল ব'লে প্রচার ক'রে তাঁর ঐতিহাসিক সংগ্রামের ভূমিকা সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। ভারতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, তার জাতীয়তাবোধের নিরিখে এই আন্দোলনের পূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। ভারতীয় জনগণের মনে সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও এই আন্দোলনের সঠিক সমীক্ষা স্বাধীনতা আন্দোলনের সরকারী ইতিহাসেও স্থান পায়নি। আবার এক শ্রেণীর চতুর রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্রকে কেবল যুদ্ধের নায়ক হিসাবে প্রচার ক'রে নেতাজী-মূর্তির গলায় মাল্যার্পণ দ্বারাই ইতিহাসের ছেদ টেনেছেন। এঁরাও আমাদের যুব-সমাজের কাছে বিকৃত তথ্য উপস্থাপিত করে তাঁদের মনকে একপেশে করে দিতে সাহায্য করেন। কিন্তু বিপ্লবী নায়ক নেতাজী আর বীর সুভাষের দুস্তর ব্যবধান চালাকীর দ্বারা গোপন করা সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রবেশের সময় থেকে নানা ঝঞ্ঝা, বিদ্বেষ, বিদ্রুপ কারাবরণ ও নির্বাসনের ক্লেশ উপেক্ষা করে ত্রিপুরী কংগ্রেস পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন ও পরে নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করে কংগ্রেসের সে আন্দোলনে নূতন জোয়ার সৃষ্টির নিদ্রাহীন প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রয়েছে একটি স্থির নির্বাত সংগ্রামী শিখা যা রূপান্তরিত হয়েছে নেতাজী সুভাষে। জীবন একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, ভারতদর্শন-সিঞ্চিত ভারত-পথিকের সংগ্রাম।

ভারতের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে শুধু অহিংস আন্দোলনের দ্বারা বিতাড়িত করা যাবে না। অহিংস আত্মপীড়নের মধ্যে আমাদের

নৈতিকশক্তি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তা বৃটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে কিছু রাজনৈতিক দাক্ষিণ্য বা দাবী আদায়ে কৃতকার্য হতে পারে কিন্তু তাতে হিংস্র বৃটিশের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে না এবং তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে না। তারা যে কোন উপায়ে ভারতের অহিংস আন্দোলনের মোকাবিলা করতে দ্বিধা করবে না কারণ ভারতবর্ষ তাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক শক্তির জীয়নকাঠি কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে বৃটিশের শ্যেন দৃষ্টির অন্তরালে কোন বৃহৎ সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে না—যা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করে বিতাড়িত করতে পারে। ভারতের বহিরে থেকে বৃটিশের শত্রু-শক্তির সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনী গঠন ক'রে বৃটিশকে আঘাত হানতে হবে। ভিতরের সংগ্রামী আন্দোলন ও বাইরের মুক্তি-বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ একত্রিত হ'লেই তবে সাম্রাজ্যশাহী বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়ন করা সম্ভব। সুভাষচন্দ্র এরূপ একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে সেই সুযোগ এনে দেয়। একটি সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১ তারিখে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে আফগানিস্তান, রাশিয়া হয়ে ২৮শে মার্চ, ১৯৪১-এ বার্লিনে উপনীত হন। তখন জার্মানী বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানীর আক্রমণ-চুক্তি বহাল রয়েছে। জাপান ও সে-সময় আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। ইটালী জার্মানীর মিত্রশক্তি।

সুভাষচন্দ্রের সময়ে তখন বৃটিশ-বিরোধী শক্তি-শালী জার্মানীর বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণই ছিল সশস্ত্র আন্দোলনের পন্থা। সেখানেই তিনি বন্দী বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর লোকদের নিয়ে স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। রাশিয়া ছিল জার্মানীর মিত্রশক্তি, সেজন্য সুভাষচন্দ্র রুশীয় ভূখণ্ডের উপর দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ভারত-বর্ষ প্রবেশের প্রধান পরিকল্পনা রচনা করেন এবং পরিকল্পনার সমগ্র বিষয় ব্যাখ্যা করে ৯ এপ্রিল ১৯৪১ তারিখে জার্মান সরকারের কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করেন। এর মধ্যে তিনি দাবী করেন, বার্লিনে একটি 'স্বাধীন ভারতীয় সরকার' গঠন করতে হবে এবং সেই স্বাধীন সরকারের সঙ্গে অক্ষশক্তির চুক্তি হবে যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। সম্ভবমত বন্ধু দেশগুলিতে ভারতীয় বাহিনী গঠিত হবে। স্বাধীনভারত রেডিও ষ্টেশনের নামে বেতার প্রচার হবে। আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে বিপ্লব পরিচালনায় সহায়তা করতে হবে। আপাততঃ ঋণ হিসাবে আর্থিক খরচ দেবেন জার্মান সরকার। ভারত স্বাধীনতার পর সে ঋণ শোধ করা হবে। ভারতে আছে মাত্র সত্তর হাজার বৃটিশ সৈন্য যার উপর তারা নির্ভর করতে পারে। পঞ্চাশ হাজারের মত সৈনিক নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী ভারতের সহায়তা করলে বৃটিশকে ভারত থেকে নির্মূল করা যেতে পারে। ১৯৪০-এ ফ্রান্সের পতনের পর বৃটিশের সম্মান লুণ্ঠিত হয় এবং বৃটিশের ভারতীয় সৈনিকরা তার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ভারতীয়রা সে সময় বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। অক্ষশক্তির হাতে বৃটিশ শক্তি প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেলে সে সুযোগ আবার আসবে। বৃটিশ অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হ'লেও তখন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানো যাবে যদি সে সুযোগের সঠিক ব্যবহার করা যায়। ....যদি জাপান

বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় তবে প্রাচ্যে বৃটিশ নৌ-বাহিনী জাপানী নৌবাহিনী সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। জাপানের হাতে বৃটিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটলে এবং সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে ভারতে বৃটিশের সম্মান লুণ্ঠিত হবে। এর জন্য চাই জাপান-রুশ চুক্তি এবং চীনের ব্যাপারের ফয়সালা। একটি অতিরিক্ত স্মারক পেশ করে বলেন—জার্মনী ও সোভিয়েৎ রাশিয়ার মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে ...ভারতে যাবার পথের জন্য রাশিয়া বা টার্কির পরোক্ষ সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

সুভাষচন্দ্র জার্মানীর কাছে যে প্রধান তিনটি প্রস্তাব করেন তার মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে বার্লিন থেকে প্রচার ও যুদ্ধবন্দী ভারতের সৈনিকদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব জার্মানী স্বীকার করে নেয়। কিন্তু অক্ষ-শক্তি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার তৃতীয় প্রস্তাব গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। শ্বেত-কায় বৃটিশ-জাতির প্রতি হিটলারের দুর্বলতার বিষয় গোপন ছিল না। উপরন্তু সোভিয়েৎ-জার্মান গোপন চুক্তিও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে-চুক্তির বয়ানে বৃটিশ শক্তির পতনের পর ভারতবর্ষ সোভিয়েৎ প্রভাবে যাবে এরূপ নির্ধারিত ছিল।[১] জার্মানীর পক্ষে সেজন্য সে-সময় ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিলনা। যাই হ'ক জার্মানী ২২শে জুন, ১৯৪১ তারিখে হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করলে সুভাষচন্দ্রের রণকৌশলগত অনেক চিন্তায় প্রচণ্ড আঘাত আসে। তিনি তখন ইটালীতে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি ডঃ ওয়ার-ম্যানকে (জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী অব ষ্টেট) লেখেন, '...পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমার পরিকল্পনা ফলবতী হওয়ার প্রত্যাশা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এখন শীঘ্র বার্লিন ফিরে লাভ নাই।..... ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের এই নূতন পরিস্থিতিতে আমার দেশের জনগণের প্রতিক্রিয়া জার্মান সরকারের প্রতি অনুকূল নয়।" ১৯৪২-এর বসন্তে সুভাষচন্দ্র এডমিরাল ক্যানারিসকে বলেন, 'আপনি যেমন জানেন সেরূপ আমিও জানি, জার্মানী এ যুদ্ধ জিততে পারবেনা। কিন্তু এবার বিজয়ী বৃটিশ ভারতবর্ষ হারাবে।'[২]

যাই হ'ক নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সুভাষ-চন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ৩০০০ ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছিল। এঁরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের পারদর্শিতা জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ রোমেলের প্রশংসা অর্জন করে। জার্মানীতেই 'নেতাজী' ও 'জয়হিন্দ,' শব্দ দুটির উৎপত্তি হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই শব্দ-দু'টির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নাই। দুঃখের বিষয় ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে জার্মানীর সাহায্য গ্রহণের পরিকল্পনার জন্য বিদেশের বহু গণ্য ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রকে অন্যায়ভাবে ফ্যাসীবাদী ব'লে আখ্যাত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ-সম্পর্কে গিরিজা মুখার্জি লিখেছেন, 'নাজী জার্মানীকে ধ্বংস করার জন্যে চার্চিল ও রুজভেল্টের পক্ষে স্টালিনের সঙ্গে মিত্রতা যদি সঠিক ব'লে গণ্য হয় তাহলে ভারত থেকে বৃটিশ-রাজকে বহিষ্কার করার জন্য হিটলারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মিত্রতাকে নিন্দনীয় ও অনৈতিক বলা হবে কেন? যদি রাশিয়ার সঙ্গে এ্যাংলো-আমেরিকান মিত্রতা চার্চিল এবং রুজভেল্টের পক্ষে কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ না বোঝায়, তাহ'লে জার্মানী ও ইটালীর সঙ্গে মিত্রতার জন্য সুভাষচন্দ্রকে নাৎসী বলে আখ্যাত করা হবে কেন? ব্রিটেন ও ফ্রান্স যেহেতু নাজীদের সঙ্গে যুদ্ধ-

রত সেই হেতু স্টালিনের সঙ্গে এই দুই দেশের মৈত্রী সম্পর্ককে নৈতিক বলা হ'লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য সুভাষচন্দ্রের ভারত-জার্মান সহযোগিতার প্রস্তাবকে নিন্দা করা হবে কেন ?[৩]

সুভাষচন্দ্র গিরিজা মুখার্জীকে লিখেছেন : 'নাৎসীদের সঙ্গে আমাদের মিল মোটেই নাই—তা সত্য। কিন্তু যদি তারা আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে এবং আমাদের মতাদর্শকে প্রভাবান্বিত করতে সচেষ্ট না হয় তবে তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণে বাধা কোথায় !'[৪]

শ্রী মুখার্জী তাঁর পুস্তকের (This Europe) অন্যত্র সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন—তিনি জার্মান সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতবাসীরা জার্মানীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের (ব্রিটিশ ব্যতিরেকে) বিরোধ ও জার্মানীর কোন প্রকার অন্তর্বিরোধে নিজেদের জড়াতে অনিচ্ছুক। জার্মানীও সুভাষচন্দ্রের এই মত স্বীকার করে নেয় এবং জার্মানী কখনও তাদের সঙ্গে অন্য দেশের বিরোধ সুভাষচন্দ্রের সমর্থন প্রার্থনা করে নাই। আজাদহিন্দ রেডিও (বার্লিন) থেকে কোনদিন নাৎসীদলের কার্যক্রমের সমর্থনে কিছু প্রচার করা হয় নাই।

হরিপুরা ভাষণে (১৯. ২. ৩৮) সুভাষচন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধান করতে হবে : 'সোভিয়েত রাশিয়া কম্যুনিষ্ট দেশ হ'লেও তার রাষ্ট্রনেতাগণ অন্যান্য অ-সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে মিত্রতা করতে ইতঃস্তত করেনি।' বার্লিন থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৪২ এর এক বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'আমি ত্রি-শক্তির সমর্থনে যুক্তি প্রচার করি না—তা আমার কাজ নয়—আমার একমাত্র ভাবনা ভারতবর্ষ।' জার্মানী থেকে আর এক বেতার ভাষণে (১. ৩. ৪৩) বলেছেন; 'ভারতের আভ্যন্তরীণ নীতি ভারতবাসীরই নিজস্ব বিষয় আর তার বৈদেশিক নীতি হবে ব্রিটিশের শত্রু-শক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা।.....স্বাধীন ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ কখনই সহ্য করব না। আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে আমার ধ্যান-ধারণা ঠিক পূর্বের মতই আছে—অর্থাৎ আমার স্বদেশে অবস্থানকালে যেমন ছিল তেমনই আছে এবং কেউ যেন এই ভুল সিদ্ধান্ত না নেন যে ত্রি-শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ হ'ল আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের আধিপত্য বা তাদের মতাদর্শ স্বীকার ক'রে নেওয়া। .....ধূর্ত, নীতিজ্ঞানবর্জিত, সম্পদ-শালী ব্রিটিশ আমাকে প্রলোভিত করতে পারেনি এবং পৃথিবীর কোন শক্তিও তা করতে সমর্থ হবে না। যাই হ'ক আমার একমাত্র দায়িত্ব ভারতের প্রতি··· ।'[৫] এই ভাষণেই তিনি B. B. C কে Bluff & Bluster Corporation (মিথ্যা আর গর্জন করপোরেশন) আখ্যা দেন।

উপরোক্ত আলোচনায় পরিস্ফুট হয়—সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে জটিল রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও সুনিপুণভাবে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর চিন্তার পারম্পর্য যে অটুট সে বিষয়ে সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের পর ইউরোপে সমর পরিস্থিতির অবনতি হয় এবং সুভাষচন্দ্রের পূর্বরচিত পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে দুস্তর বাধা দেখা দেয়। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১ এ জাপান যুদ্ধে যোগদান করলে পূর্বপ্রাচ্যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ এ সিঙ্গাপুরের ও ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটে। সুভাষ-চন্দ্র যে এরূপ এক পরিস্থিতির কথা ভেবেছিলেন এই প্রবন্ধে জার্মান সরকারকে লেখা সুভাষচন্দ্রের ৯ই

এপ্রিল ১৯৪১-এর স্মারকপত্রে উদ্ধৃত অংশবিশেষ অনুধাবন করলেই তা বোঝা যাবে। ইউরোপের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে সুভাষচন্দ্র বুঝলেন জার্মানীতে থেকে তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা নাই। তিনি তখন জাপান ও দূরপ্রাচ্যের ভারতবাসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা চালাতে লাগলেন যাতে তিনি প্রাচ্যের রাজনৈতিক, সামরিকক্ষেত্রে উপনীত হতে পারেন।

এদিকে ভারতের অভ্যন্তরে ৯ই আগষ্ট ১৯৪১ এ আগষ্ট আন্দোলন সুরু হ'লে সুভাষচন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বার্লিন রেডিও থেকে এর সমর্থনে প্রচার চালিয়ে ভারতবাসীগণকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হ'ন। ভারতের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক আন্দোলনই সুভাষচন্দ্রের ইপ্সিত প্রথম ফ্রন্টের সংগ্রাম। এর সঙ্গেই তিনি তাঁর রচিত দ্বিতীয় ফ্রন্টের সংগ্রাম যুক্ত ক'রে ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। নেতাজী তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রচারের কথা স্মরণ রেখে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার সমস্যা জীবনভর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন, আপসহীন, সংগ্রামই আমার সততার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।'[৬] ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কাছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চরমপত্র দানের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তা গৃহীত হয়নি! ১৯৪২ এ কংগ্রেসের সে মনোভাবের পরিবর্তন হয়। গান্ধীজী বলেন, জাপানী-বাহিনী যদি ভারতে আসে সে শত্রু হিসাবে নয় বৃটিশের শত্রু হিসাবে আসবে। যদি বৃটিশ এখনই ভারত ত্যাগ করে, তিনি বিশ্বাস করেন তাহলে জাপানের ভারত আক্রমণের কোন কারণ থাকবে না।'[৭]

জওহরলালজী প্রথমে ফ্যাসীবাদী আক্রমণে বিরুদ্ধে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতেন, পরে তা পরিবর্তিত হয়। ১৪ই জুলাই '৪২এ ওয়ার্কিং কমিটির ভারতছাড়ো প্রস্তাব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেন, এই প্রস্তাব ভারতীয় জনগণের অধিকাংশের ইচ্ছার অভিপ্রকাশ। বৃটিশ শক্তির ধ্বংস সাধনের উপর ভারতের সমস্যার সমাধান নির্ভর করে এবং ভারতবাসীগণকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রাম করতে হবে। বর্তমান কংগ্রেস প্রস্তাব তাঁর মতের প্রায় সদৃশ।...গান্ধীজী যদিও একে খোলাখুলি বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছেন তবুও কিছু কংগ্রেস নেতার মনে বৃটিশের সঙ্গে একটি বোঝাপাড়ার মনোভাব বিদ্যমান।'[৮] গান্ধীজী বলেন, ভারতবর্ষকে মুক্ত করবো নয়ত মৃত্যু বরণ করবো।" তিনি 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-এর ডাক দিলেন। কিন্তু ৮ই আগষ্ট '৪২ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশের পরই ৯ই আগষ্ট ভোর না হ'তেই অধিকাংশ মুখ্য কংগ্রেস নেতা জেলে বন্দী হন। জনতা নেতৃত্বহীন হ'য়েও আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন—বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন অহিংস আচরণের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সহিংস আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ তদানীন্তন সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ সে সহিংস আন্দোলনের শরিক হন এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 'আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং বৃটিশকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়েছি। সেজন্য বম্বে প্রস্তাব অনুযায়ী বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করা ন্যায় সঙ্গত। যদি তা গান্ধীজীর নীতির সঙ্গে গরমিল হয় তা হ'লে আমার দোষ নাই।' সরকারী হিসাব মত সহিংস আন্দোলনে ২৫০টি রেলষ্টেশন, ২৫০টি

পোষ্ট অফিস ৭০টি পুলিশ স্টেশন, ৮৫টি সরকারী ভবন পোড়ানো বা বিধ্বস্ত হয়। ৩৫০০টি স্থানে টেলিফোন, টেলিগ্রাম লাইন ছিন্ন করা হয়। পুলিসের লাঠি ও গুলিতে '৪২ এর শেষ পর্যন্ত ৯৪০ জন নিহত ও ১৮৩০ জন আহত হন। ক'লকাতা, চট্টগ্রাম, ফেণী অঞ্চলে বিমান আক্রমণে ১৬. ৯. ৪২ থেকে ১০. ২. ৪৩ পর্যন্ত ৩৪৮ জন নিহত, ৪৫৯ জন আহত হন। জওহরলালজীর মতে সরকারী সূত্রে মৃত্যুর সংখ্যা কম করে ধরা হয়েছে। সে সংখ্যা ১০,০০০০ এর কম নয়। এই আন্দোলন দমনে ১১২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এই আন্দোলন চূড়ান্তরূপ নিতে পারেনি। বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে জয়প্রকাশজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হ'বার চেষ্টা করেন কিন্তু পথে ১৮. ১২. ৪৩ এ আবার ধৃত হন। ভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আঃ হিঃ আন্দোলনের সংযুক্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গান্ধীজী পরবর্তীকালে আগষ্ট আন্দোলনের হিংসাত্মক অভিপ্রকাশের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং নিজেকে এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন। কিন্তু ১৯৪২ থেকে '৪৫ পর্যন্ত ঘটনায় ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার উত্তাল আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে কম্যুনিস্টদের আচরণও ছিল অদ্ভুত। তাঁরা তখন কট্টর আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট। ভারতবর্ষে যখন জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতার প্রশ্ন জ্বলন্ত তখন তাঁদের কাছে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বার্থ ছিল রাশিয়ার সর্বৈব স্বার্থের নীচে। যতদিন জার্মান-রুশ মৈত্রী অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন তাঁরা ছিলেন বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলে সে যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত হলো। ১৫ ডিসেম্বর '৪১-এ তাঁরা প্রস্তাব নিলেন—'এখন আমাদের প্রধান শ্লোগান হবে—জনযুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে জনতার আন্দোলনে সামিল করা।" বৃটিশ সরকার কম্যুনিষ্ট নেতাদের মুক্তি দিলেন এবং কম্যুনিষ্ট-দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে সদ্যমুক্ত ও গোপনতা থেকে বেরিয়ে আসা কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দকে সামরিক, বে-সামরিক নানা উচ্চপদে নিয়োগ করে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি বাধা-সৃষ্টির উদ্যোগ করলেন। পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টি ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে যে সব পত্র বিনিময় হয়েছিল তা প্রকাশিত হ'লে জানা যায় সি. পি. আই-এর কর্মীরা বৃটিশের সামরিক ও বে-সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরগুলিকে ১৯৪২-এর আন্দোলনে জড়িত জাতীয় কর্মীদের ও আঃ হিঃ বাহিনীর যে সব ব্যক্তি ভারতে এসেছিলেন তাদের সম্পর্কে গোপনতথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

ওদিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকে সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব রণাঙ্গনে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে আহ্বান জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু জার্মানী থেকে শত্রু অধ্যুষিত বিপদসঙ্কুল সমুদ্র পেরিয়ে দূরপ্রাচ্যে আসা প্রায় অসম্ভব বিবেচিত হ'চ্ছিল। জাপানী রাষ্ট্রদূত ওশিমা নেতাজীর পূর্বপ্রাচ্য-গমনে জার্মানীর সম্মতি আদায়ে সহায়তা করেন। জার্মান সরকার দীর্ঘ সময় এবিষয়ে সাহায্য করতে টালবাহানা করছিলেন। অবশেষে ৮-২-৪৩ তারিখে আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জার্মান U-Boat U-190তে কিয়েল থেকে রওনা হন; বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে আফ্রিকার উপকূল পেরিয়ে মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের একস্থানে জাপানী সাবমেরিন ১২৯-এ আরোহণ করেন। তারপর ভারতমহাসাগর পাড়ি দিয়ে সাবাং-এ উপনীত হ'ন।

পরে বিমানে ১৬-৫-৪৩ এ টোকিয়ো পৌছান। ১৮ই জুন তাঁর আগমন টোকিয়ো বেতারে ঘোষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে নানা আলোচনার পর জাপান অস্থায়ী সরকার গঠনে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় এবং জাপান পার্লামেণ্টে (Diet-এ) এই প্রস্তাব গৃহীত হয়—'জাপান ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় জনগণের শত্রু এ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভাব নির্মূল ও বিতাড়ন করতে এবং ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের দৃঢ় প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।' ১৯.৬.৪৩এ টোকিয়োতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বলেন, "স্বাধীনতা কেউ দান করবেনা, ভারতবাসীকে তা সংগ্রাম ও বলিদানের মাধ্য দিয়ে অর্জন করতে হবে।' তিনি এক জাপানী সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডারকে বলেছেন, জাপানীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ভারতের যে কোন প্রকার মুক্তি দাসত্বের থেকে অধম হবে।'[১] ২৪শে জুন, '৪৩এ টোকিয়ো বেতার থেকে ভারতবাসীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি আপনাদিগকে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলবো। যে বৃটিশ-সরকার আমার উপর জীবনভর অত্যাচার চালিয়েছে, আমাকে এগারবার জেলে নিক্ষেপ করেছে তারা আমাকে নীতিভ্রষ্ট করতে পারেনি। পৃথিবীর কোনওশক্তি তা আশা করতে পারে না।.....কেউ তা করতে পারবে না।' এদিকে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ২২,৩০০ জন ভারতীয় সৈনিক নিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি বা আই. এন. এ. গঠিত হয়েছিল। তা তখন ভগ্নপ্রায়। তাঁর আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র ২রা জুলাই ১৯৪৩ এ সিঙ্গাপুরে আসেন এবং ৪ঠা জুলাই ১৯৪৩ এ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতিত্বের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই দিনকার বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং-এ সমবেত ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বলেন, '...সামনের মরণপণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'ন। আপনাদের আমি আবার বলতে চাই এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি ভবিষ্যতে যা করব তা ভারতের স্বাধীনতার জন্য করব। ভারতের স্বার্থবিরোধী বা ভারতীয় জনগণের ইচ্ছার অনুকূল নয় এমন কোন কাজ আমরা করব না। কার্যকরভাবে সমস্ত শক্তিকে সংহত করবার জন্য আমি একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করতে চাই।' আই. এন. এ'র অভিবাদন গ্রহণ ক'রে ৫ই জুলাই-এর ভাষণে তিনি বললেন, 'ভারতের মুক্তি সেনানীবৃন্দ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজ আমার সৌভাগ্য যে বিশ্ববাসীকে জানাতে পারছি, ভারতেয় মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হয়েছে। ....এই বাহিনী ভারতের নিজস্ব বাহিনী এবং ভারতীয় নেতৃত্বেই এই বাহিনী গঠিত। আপনাদের আদর্শ হবে—বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা ও বলিদান। প্রকৃত সৈনিক হ'তে হলে সামরিক ও আত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন। ...বর্তমানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথক্লেশ আর মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই আমার দেবার নাই। কিন্তু জীবনে-মরণে আপনারা আমাকে অনুসরণ করলে মুক্তির বিজয় পথে আপনাদের নিয়ে যাব... প্রার্থনা করি ঈশ্বর আমাদের জয়ী করুন।'[২] ৬ই জুলাই ১৯৪৩ সিঙ্গাপুরে জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো এক সভায় ঘোষণা করলেন, 'ভারতের উপর জাপানের কোন আঞ্চলিক, সামরিক বা আর্থিক আকাঙ্ক্ষা নাই, যে কোন বৈদেশিক শাসন থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জাপান মুক্তি আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।' ৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে জনতা ও আজাদী বাহিনীর যুক্ত সভায় সুভাষচন্দ্র তাঁর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন,

'ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলনের দ্বারা যদি আদৌ স্বাধীনতা লাভ করা যেত, তাহ'লে এই বন্ধুর পথ বেছে নিতাম না। সংক্ষেপে বলতে পারি, আমার ভারতত্যাগের উদ্দেশ্য হ'ল ভারতের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে সাহায্য করা। ...ব্রিটিশ সরকারই যখন আমার সংকল্পকে ধ্বংস করতে পারেনি, আমাকে প্রতারিত বা প্রলোভিত করতে পারেনি তখন অন্য কেউই তা পারবে না। .....পূর্ব এশীয় ভারতীয়গণ এমন একটি সাগ্রামী বাহিনী গঠন করেছেন যে বাহিনী ভারতের ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণের স্পর্ধা রাখে। আমরা যখন এই আক্রমণ পরিচালনা করব তখন যে বিপ্লব সুরু হবে তা শুধু দেশের অসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমিত থাকবে না ব্রিটিশের বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও তা পরিব্যাপ্ত হবে। ব্রিটিশ সরকার এইভাবে ভিতরে বাইরে আক্রান্ত হ'য়ে ধ্বসে পড়বে এবং ভারতবর্ষ অর্জন করবে স্বাধীনতা। ...আজ থেকে ত্রিশ লক্ষ পূর্ব-এশীয় ভারতীয়গণের শ্লোগান হ'ক 'সার্বিক যুদ্ধের জন্য সর্বস্বপণ।' .... .. আমি একটি ভারতীয় নারীবাহিনীও গড়ে তুলতে চাই। ...স্বদেশবাসী ভারতীয়গণ দ্বিতীয় রণাঙ্গন বাসনা-কামনা করছেন। আপনারা সমগ্র ধনবল জনবল আমার হাতে অর্পণ করুন আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করব—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।.....[৯]

২৬শে জুলাই সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের শেষ সংগ্রামী শাসক বাহাদুর শাহের সমাধিতে মাল্য অর্পণ করেন। ২৫শে আগস্ট '৪৩ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আই. এন. এ'র সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মুক্তি-বাহিনীর নাম দেন—আজাদ হিন্দ ফৌজ। এই উপলক্ষ্যে নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, '...আজ আমি নিজেকে ৩৮ কোটি ভারতবাসীর সেবক ব'লে মনে করি। অনাবিল জাতীয়তাবোধ, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই কেবল সত্যকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে। ...আসুন 'দিল্লী চলো' হুঙ্কারে আমরা যুদ্ধযাত্রা সুরু করি—রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লায় আঃ হিঃ ফৌজের দীপ্ত বিজয় প্রদর্শনী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিরাম নাই।' এই বৎসরই ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন পালিত হয় এবং ব্যাঙ্কক রেডিও থেকে নেতাজী মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষণ দান করেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

Vide P 703 R. C. M : Vol. III

১— History of Freedom Movement by R. C. Majumdar.

Gunpulay :

২—P. 182 Netaji in Germany—Gunpulay (Bhavan's pub.)

৩—Vide : Netaji : The Great Resistance Leader : Bulletin of Netaji Research Bureau

৪—P. 118 This Europe : Girija Mukherjee

৫—P. 156 Selected Speeches : Publication Divn.

৬—P. 180 Gunpuley

৭—P. 636 RCM

৮—P. 643 ibid

৯—Vide P. 138 K. K. G. (The Indian National Army—K. K. Ghosh)

৯—ক P. 72-75 A. C. C. : India's Struggle for Freedom by A. C. Chatterjee

৯—ঘ 76—78—ibid

বাংলায় নেতাজী-চর্চা

পবিত্রকুমার ঘোষ

বাংলা ভাষায় ও বাংলা প্রদেশে সুভাষ-চর্চার বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাতেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি শরৎচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক ছিলেন না, তাঁর রচনার পরিমাণ বেশি নয়, তাঁর রচনার যে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তাতে বক্তৃতা ও বিবৃতির অংশই বেশি—সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধও তিনি কিছু রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভাষার প্রয়োগ দ্বিবিধ—লেখ্য ও কথ্য ভাষা। শরৎচন্দ্র বসুর রচনা-সংকলন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত, অতএব আমার আলোচনার গণ্ডীর বাইরে সে গ্রন্থ। কিন্তু ভাষার কথ্য রূপে ও অপরাপর আয়োজনে বাংলা প্রদেশে সুভাষচ-চার প্রথম সম্মান শরৎচন্দ্রেরই প্রাপ্য।

বস্তুত সুভাষচন্দ্রের আদর্শের ধারক ও বাহকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বলিষ্ঠতম ব্যক্তি। তাঁর উদার ব্যক্তিত্ব জনজীবনে সুভাষচন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশের দিন থেকে সুভাষের আদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিপুষ্টি সাধনে নিযুক্ত হয়েছিল। যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেন-সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকেই সংবাদপত্রের শিরোনামায় ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র আলোচিত হয়েছিলেন। আর তখন থেকেই শরৎচন্দ্র বসু সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে খাটো করার উপদেশ দেননি তিনি, সমর্থন করেছেন, সাহস দিয়েছেন, সহযোগিতা দান করেছেন। ফলে সুভাষচন্দ্র আই.সি.এস চাকরি থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেবার আগে ইংলণ্ড থেকে শরৎচন্দ্রকে নিজের আসন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেছেন, ভাব-বিনিময় করেছেন, যুক্তি-পরামর্শ করেছেন এবং ভারতের জাতীয় জীবনের মহৎ কর্তব্যভার তুলে নেবার আপসহীন ব্রতে শরৎচন্দ্রের প্রসন্ন ও বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন। সে সময়ে তাঁদের মধ্যে যে পত্রাবলী বিনিময় হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ নির্ণয়ে তার গুরুত্ব কম নয়।

বস্তুত সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সেই প্রত্যূষকাল থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক ও সহযোদ্ধা। এই বৃহৎ পুরুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে সুভাষচন্দ্রের ক্ষতবিক্ষত চরণ আরোও রক্তাক্ত হত, আরো দুরূহ হত তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণের পথ। শরৎচন্দ্র জীবনে আপস করেননি তা বলব না; করেছিলেন; কিন্তু সে একবার মাত্র এবং তাও হয়তো আপস ছিল না, ছিল ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি বুঝতে তাঁর ভ্রান্তি। ১৯৩৬ সালে সুভাষচন্দ্রেরই সংগ্রামী অবদানের ফলশ্রুতি রূপে ভারতবর্ষ যখন চূড়ান্ত বৈপ্লবিক সম্ভাবনার দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই ক্ষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য শরৎচন্দ্র অনুধাবন করতে পারেননি—নতুবা সেই তুঙ্গ মুহূর্তে তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত একক কণ্ঠে বিপ্লবের আহ্বান উচ্চারিত হলে, গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেতাজীর আহ্বান সারা ভারতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে তোলার দায় নিলে—সুভাষচন্দ্রের আদর্শ সেই সময়ই জয়যুক্ত হত, ক্ষমতা জনগণের করায়ত্ত হত,

পূর্ণ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ব্রিটিশ সিংহ পলায়নপর হত, চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা আসত না, দেশবিভাগ হত না, প্রজাতন্ত্রের আদর্শের নামাবলীতে বৃহৎ পুঁজির কঠোর শোষণ ও শাসন প্রবর্তিত হত না—ভারতের জনজীবনের স্তরে স্তরে বৈপ্লবিক শক্তির যে কত দৃঢ় সমাবেশ সেদিন ঘটেছিল তা ইদানীং প্রকাশিত ইংরেজ সরকারের গোপন নথিপত্র থেকেই বোঝা যায়।

শরৎচন্দ্র পরিস্থিতি বিচারে ও কর্তব্য নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন। মহতের এ ভ্রান্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বনাশা পরিণাম ডেকে এনেছে। সুভাষচন্দ্রের আদর্শ সেই দিন অবনমিত হয়েছে ভারতবর্ষে, আপাত-ব্যর্থ হয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ তপস্যা ও কঠোর সংগ্রাম, জয়যুক্ত হয়েছে তাঁর বিরোধী শক্তি; যে শক্তি বিপ্লব-বিরোধী, গণ-বিরোধী, মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীর বিরোধী—যে শক্তি কতিপয়ের স্বার্থ রক্ষায় আত্মনিয়োজিত, যে শক্তি আপসের চোরাবালিতে জনগণের সংগ্রামকে ডুবিয়ে দেয়। ভ্রান্তি বশে ক্ষণ তরেও এই শক্তির সঙ্গে শরৎচন্দ্র হাত মিলিয়েছিলেন এবং এ দেশের ইতিহাসে তার ফল হয়েছে যেমন বিপর্যয়কর, তেমনি সুভাষচন্দ্রের আদর্শেরও ভরাডুবি ঘটেছে তাতে।

কিন্তু সেই একবার মাত্র। ভ্রান্তির ভস্মশয্যা থেকে মহান বীরের মতোই শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়েছিলেন অবিলম্বে, সুভাষচন্দ্রের আদর্শের পতাকা তুলে ভারত-উপমহাদেশের জনসাধারণকে আবার সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, ছুটে গিয়েছিলেন তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে পর্যন্ত। জওহর-প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ গোষ্ঠীর কুক্ষিগত জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি পুরোপুরি সুভাষচন্দ্রের আদর্শের ভিত্তিতেই নতুন দল গড়েছিলেন, ব্যাঘ্রলাঞ্ছন-যুক্ত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন, সকল বাম ও বৈপ্লবিক শক্তিকে সংহত করতে, গড়ে-ছিলেন সুভাষ ইনস্টিট্যুট অফ কালচার আর অসংখ্য জনসভায় প্রচার করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের বাণী ও আদর্শ। তাঁর সেকালের সভাগুলিতে আমি নিয়মিত হাজির হয়েছি, তাঁর সে কণ্ঠস্বর আজও কানে বাজে। সে কালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দু'খানি পত্রিকা, ইংরেজি ও বাংলায়, দৈনিক Nation ও সাপ্তাহিক 'মহাজাতি'। জনসাধারণের সংগ্রামকে উদ্বোধিত করার ও সুভাষচন্দ্রের আদর্শ প্রচার করার শক্তিশালী বাহনরূপে আবির্ভূত সেই পত্রিকা দুটি স্বাধীন ভারতে সুভাষ-চর্চার অম্লান কীর্তি রেখে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রশক্তি যখন সকল উপায়ে গান্ধীমহিমা প্রচারে ব্যাপৃত ছিল, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত ব্যাখ্যার আতিশয্যে বিড়ম্বিত করে তুলছিল, গান্ধী ও গান্ধীগোষ্ঠীর অবদান-কেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের একমাত্র নিয়ামক শক্তি রূপে উপস্থাপিত করছিল, তখন এই দু'টি পত্রিকা—শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন উভয়েরই সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—ভারত সরকার ও তার পৃষ্ঠপোষিত শক্তিগুলির সেই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করেছে, ইতিহাসের সত্য কাহিনী পরিবেশন করেছে, সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করার ব্যাপক সঙ্ঘবদ্ধ দূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। স্বাধীন ভারতে সুভাষ-চর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন ফরোয়ার্ড-লিবার্টি-বাংলার কথা-বঙ্গবাণী-আত্ম-শক্তির সমগোত্রীয় 'The Nation'—'মহাজাতির' অবদান বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।

যে পত্রিকাগুলির নাম করলাম সুভাষ-চর্চার ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদকদের অবদানও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির দাবী রাখে। প্রথমেই মনে আসে শ্রীসত্যরঞ্জন বকশীর কথা। প্রথম যুগ থেকেই তিনি সুভাষচন্দ্রের সহযোগী-সহকর্মী

টিকিট কাটলে সাতই সস্তা পড়ে

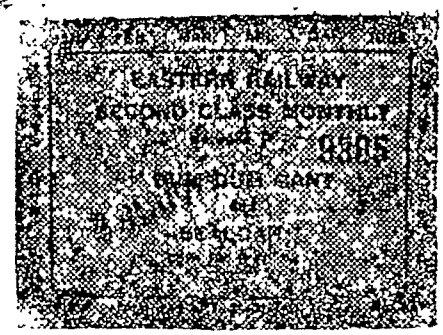

সারা মাসের টিকিটের দাম কয়েকদিনের ভাড়ার সমান

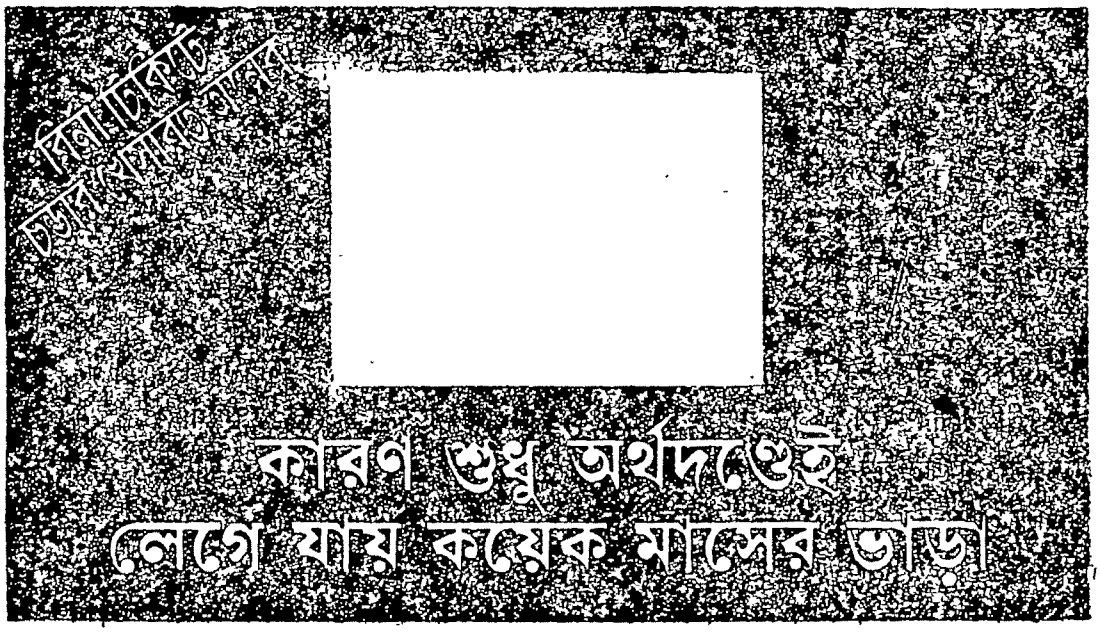

বিনা টিকিটের যাত্রীকে দিতে হয় ভাড়া ছাড়াও কমপক্ষে ১০ টাকা জরিমানা।
তাছাড়া বিচারে জেল এবং ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হ'তে পারে।

পূর্ব রেলওয়ে

বন্ধু : তাঁর রচনাসম্ভার সংগৃহীত হলে তার পরিমাণ কম হবে না। যদিও ইংরেজি ভাষাই ছিল তাঁর প্রধান বাহন। কিন্তু আজও পর্যন্ত ক্লান্তিহীন ভাবে ভাষণে ও আলাপচারিতে কথ্য বাংলায় সুভাষচন্দ্রের বাণী, আদর্শ ও কর্মজীবনের কথা পরিবেশন করে চলেছেন তিনি, বাংলা প্রদেশে সুভাষ-চর্চার ইন্ধন জ্বালিয়ে রাখছেন। ভগ্নস্বাস্থ্য ও গুরুভার সমস্যার মধ্যে বসেও সাধারণ দর্শনার্থীদের কাছেও অবারিত দ্বার এই ঐতিহাসিক মানুষটি, সুভাষ প্রসঙ্গে তাঁর উৎসাহে কখনো ভাঁটা নেই। এখনো জীবিত আছেন গোপাললাল সান্যাল, যিনি নতুন করে তাঁর স্মৃতি-চারণে সুভাষজীবনের অনেক অনালোকিত অংশে আলোকপাত করছেন। দেহরক্ষা করেছেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমল হোম, যাঁরা সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর ভাব বুঝতেন ও সমর্থন করতেন। এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি তাঁর মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীর পাতায় সুভাষচন্দ্রের বহু বক্তব্য পেশ করতে দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন তাঁর ভাবধারা ও কর্মসূচীকে। সুভাষ-চর্চার ইতিহাসে এই সব প্রতিষ্ঠাবান সম্পাদকদের নাম চিরদিনই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক কর্মের সহযোগীরাই সুভাষ-চর্চায়ও প্রধান অংশ নেবেন এটাই প্রত্যাশিত ছিল। তাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর চিন্তা ও কর্মের গতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে তেমন উদ্যোগ তাঁরা বিশেষ দেখাননি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে বামপন্থী শক্তি একদা সম্মিলিত হয়েছিল ক্রমে ক্রমে তারা বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। অনেকেই অন্যান্য মতবাদ-আশ্রয়ী হয়ে পড়ে— সুভাষচন্দ্রের মহৎ কীর্তিকে স্বীকার করেও তাঁর মতাদর্শ যে স্বাধীন ভারতের ধ্রুব লক্ষ্য হতে পারে এ প্রত্যয় অনেকেই গ্রহণ করেনি। যাঁরা এ প্রত্যয়ে স্থির ছিলেন তাঁরাও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি, নানা দল-উপদলে তাঁরা বিভক্ত হয়ে পড়েন ও নিজেদের ক্ষীয়মান শক্তিবশত হয় জনজীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে দূরে সরে যান নতুবা ভিন্ন আদর্শযুক্ত বৃহৎ দলে আশ্রয় নেন। নতুন প্রজন্মের কাছে সুভাষচন্দ্রের জীবন-সাধনাকে পরিচিত করাবার কিংবা তাঁর আদর্শকে জীবন্তভাবে প্রচার করার প্রয়াস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। তবু তারই মধ্যে কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল।

বিশ্বের প্রচলিত বৈপ্লবিক আদর্শগুলি থেকে যে একটি পৃথক, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ সুভাষচন্দ্রের জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছিল এ দাবী প্রথম জানিয়েছিলেন অনিল রায়। এই মনস্বী বিপ্লবী প্রখর যুক্তির আলোয় মার্ক্সবাদের বিচার করেছিলেন ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাগুলির আলোচনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ সমার্থক নয় বরং বিপরীত। ভারতবর্ষের জন্য ও বৃহত্তর মানবতারও জন্য তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের সার্থকতা ও উপযোগিতায় আস্থাশীল হয়েছিলেন। প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : "নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে Ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। নেতাজীর

মতবাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে অনিল রায় বলেছিলেন : "নেতাজীর মতবাদ হল একটা সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়। দৈহিকের সহিত আত্মিকের, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, আর্থিকের সহিত মানবিক মূল্যের, প্রাচ্যের ও ভারতীয়ের সহিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির, একটা সুষমাময় সামঞ্জস্য নেতাজী স্থাপন করবার পক্ষপাতী। সেই সামঞ্জস্যের দৃষ্টি নিয়েই জীবনকে তিনি বিচার করেছেন। তাই মতবাদ নিয়ে কোন একদেশদর্শিতা ও গোড়ামি তাঁর নেই। সকল মতবাদকেই নিরপেক্ষ মন নিয়ে তিনি দেখেছেন এবং যেটুকু বর্জনীয় তাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতেও কোন শিথিলতা তিনি দেখাননি।"

প্রচলিত মতবাদগুলি থেকে নেতাজীর মতবাদের পার্থক্য স্পষ্ট চিহ্নিত করে অনিলচন্দ্র বলেছিলেন : "গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ ও ফ্যাসিবাদ—এই তিনটি মতবাদ থেকেই নেতাজীর 'সমাজতন্ত্রবাদ' বা 'সাম্যবাদ' পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে আজ স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। ভারতবর্ষ আজ নতুন যুগের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে; সমাজগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করবার অধিকারও ভারতবর্ষ আজ অনেকাংশেই পেয়েছে। তাই সমাজগঠন করবার দায়িত্ব যাঁরা নেবেন তাঁদের আজ নেতাজীর সমাজদর্শন বা Social philosophy বুঝতে হবে, নেতাজীর জীবনবাদ Theory of life-কে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।" সুভাষচন্দ্রের মতবাদ যে শুধু একজন ব্যক্তির মতবাদ নয়, যুগ মুক্তির অনন্য পাথেয়। সে কথা বোঝাতে গিয়ে অনিল রায় বলেছিলেন : "সুভাষচন্দ্র শুধু ব্যক্তি নন, তিনি সঞ্চিত ঐতিহাসিক প্রয়োজনের যুগমূর্তি।"

অনিল রায়ের অনুসরণক্রমে জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার লিখেছিলেন 'সুভাষবাদ' ও সমর গুহ লিখেছেন 'নেতাজীর মত ও পথ।' এঁরা উভয়েই রাজনৈতিক নেতা। মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদের মতো সুভাষবাদ ও যে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন একথা অনেকেই স্বীকার করতে চান না। বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডন করে ও সুভাষবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিস্তৃত-ভাবে লেখার প্রয়োজন তাই থেকেই গিয়েছে। অনিল রায় তাঁর প্রতিপাদ্যের একটা কাঠামো মাত্র করে গিয়েছিলেন, অকাল মৃত্যুর দরুণ তাঁর বক্তব্যের বিস্তৃত ও পূর্ণ রূপ দিয়ে যেতে পারেননি। তবু উত্তর-কালের গবেষক ও ভাবুকদের জন্য তিনি বলিষ্ঠ পথ-নির্দেশ করে গিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ 'নেতাজীর জীবন-বাদ' একটি দিক-নির্দেশক গ্রন্থ রূপে বিরাজ করবে।

জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদারের পুস্তকও স্বল্পায়তনিক, দ্রুতলিখিত, আবেগপূর্ণ। বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধীর চিন্তা, তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন তাঁর পুস্তকে তার অভাব ঘটেছে, সম্ভবত আশু প্রয়োজন মেটাতে গ্রন্থখানি লিখিত হয়েছিল বলে। সমর গুহ বস্তুত পক্ষে বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকার দাবী মেটাতে লিখিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির সংগ্রহ করেছেন তাঁর গ্রন্থে—একটি বড় পরিকল্পনা নিয়ে গ্রন্থ রচনার অবকাশ তিনি পাননি। সেদিক থেকে সুভাষ-অনুগামী কোনো রাজনৈতিক নেতাই সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে বিশদ ও সমগ্রভাবে আলোচনা করেননি।

রাজনৈতিক নেতারা যা করেননি তার দায় মেটাতে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি ও সমালোচক— মোহিতলাল মজুমদার— অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর 'জয়তু নেতাজী' গ্রন্থ অন্তর্দৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তার গুণে, বক্তব্য প্রকাশের বলিষ্ঠতা ও ভাষার সম্পদে বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণযোগ্য কীর্তি রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু মোহিতলালের অসহিষ্ণুতা ও সাময়িক উত্তেজনাকর ঘটনায় তাঁর চিত্তক্ষোভ,

বাঙালীর জীবনের ঘনায়মান দুর্যোগে তাঁর বেদনা ও ক্রন্দন তাঁর মানসিক ভারসাম্যকে বিচলিত করেছিল—সে কারণে তাঁর মহৎ গ্রন্থ কালস্পর্শদোষ দুষ্ট হয়ে পড়েছে, কালোত্তীর্ণ হবার পক্ষে সেটাই প্রধান বাধা। তবু স্বীকার করতেই হবে যে সুভাষচন্দ্রের জীবন-সাধনার অন্তর্বস্তু নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন মোহিতলাল। সুভাষ-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থও দিক নির্দেশক।

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্যে সুভাষজীবনকে বরণ করে গিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র যে গোলযোগে জড়িয়ে পড়ে বহিষ্কৃত হন, রবীন্দ্রনাথ সেদিন ছাত্রপক্ষকেই সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ছাত্রশাসনতন্ত্র'। দীর্ঘকাল পর তিনি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন 'তাসের দেশ' গ্রন্থ, শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানিয়ে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ এবং ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর রচনা করেন বিখ্যাত গল্প 'বদনাম'। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পাঁচ মাস পর। গল্পের শেষে বিপ্লবী অনিল বলছে ঃ

> আমি অন্য দিক থেকে পুলিসের হাতে এখুনি ধরা দিচ্ছি। এই সঙ্গে একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবি ঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ—'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।' হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টরবাবু। "এই গান অনেকবার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্তানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনর দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রকে নিবিড়তর ভাবে ভালোবেসেছিলেন কিন্তু অকাল মৃত্যু ঘটায় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বড় রকম কিছু লিখে যেতে পারেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকলে সুভাষচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য জীবন নিয়ে তিনি 'পথের দাবীর' চেয়েও মহত্তর উপন্যাস হয়তো লিখতেন।

বস্তুত সুভাষচন্দ্রের জীবন সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ হতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা অধ্যয়ন করেন তাঁরাই জানেন যে শ্রীচৈতন্যের জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য একদিন শতধারে বিকাশ লাভ করেছিল; পদাবলী কাব্যে, দর্শনগ্রন্থে ও চরিত সাহিত্যে বাংলা ভাষা যৌবন সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সাহিত্যে মহৎ জীবনের এই প্রবর্তনা এ যুগেও ঘটবে এই আমার বিশ্বাস। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শিল্পলিপি' গ্রন্থে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের জীবন নিয়ে কি মহৎ নাটক রচনা সম্ভব নয়? হ্যামলেট নাটকে বীর-হৃদয়ের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অঙ্কিত হয়েছে, গৃহত্যাগের পূর্ব নিশীথে একা শয়নকক্ষে সুভাষচন্দ্রের হৃদয়েও কি তেমন কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি? যাবেন কি যাবেন না? সত্যই দেখা দিয়েছিল কিনা শিল্পীর দৃষ্টিতে সে প্রশ্ন অবান্তর। শিল্পীর কল্পনায় যা সত্য তা-ই প্রকাশিত হবে তাঁর শিল্পে—কিন্তু মহৎ কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য আলম্বন রূপে মহৎ জীবন তো চাই।

আমার সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে চিরজীবী মহাকাব্য দুটি—রামায়ণ ও মহাভারত।

লোকজীবনের প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন দুই সভ্যতার দ্বন্দ্বে, নীতি ও আদর্শের সংঘাতে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মহৎ জীবনের যে আত্মপ্রকাশ তাকে কেন্দ্র করেই এ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। কোনো ব্যক্তির একক অন্তর্জীবনের সংগ্রাম নিয়েও এ যুগে মহাকাব্য রচিত হয়েছে, যেমন শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'। কিন্তু তার আবেদন স্বল্পসংখ্যক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও রসিকের কাছে। রামায়ণ-মহাভারতের আবেদন বিশ্বের সর্বশ্রেণীর লোক সাধারণের কাছে। কেননা রামচন্দ্রের অন্তঃসংগ্রাম ও বহিঃসংগ্রাম উভয়ই সে কাব্যের বিষয়বস্তু—এবং তিনি একক নন, বিশাল জনপদ তাঁর চঞ্চল চরণের সঙ্গী। এক যুগের ও জাতির জীবনের এক মহাসঙ্কটের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন রামচন্দ্র ও মহাভারতের নায়কগণ। এক মহাজাতির জীবন আবর্তিত হয়েছে এই নায়কদের জীবনকে কেন্দ্র করে—তাই তাঁদের অবলম্বন করে রচিত হতে পেরেছিল অমর মহাকাব্য।*

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

* ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, নেতাজী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎ বসু একাদেমী ও জয়শ্রী প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে আয়োজিত 'ভারতীয় ভাষা সমূহে সুভাষ-চর্চা' বিষয়ক আলোচনা সভায় পঠিত।

With Best Compliments of :

Bijoynagar Tea Company Limited

11, GOVERNMENT PLACE EAST

CALCUTTA-700 069

ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে... কি পড়বে না...

বর্তমানে একটি জীবন বীমার পলিসি পূর্ণ মাত্রায় নিরাপত্তা আনে। এমন একদিন ছিল, যখন একথা জোর দিয়ে বলা যেত না। স্বাধীনতার প্রথম দশ বছরে ২৫টি বীমা কোম্পানী কারবার গুটিয়ে ফেলে। অন্য আরো পঁচিশটি কোম্পানীর পরিচালনায় এত গলদ ছিল যে তাদের কাজ কারবার দেখা-শোনার কাজ অন্য কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে হয়। বীমাপত্রের মালিক দের এতে ক্ষতি হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে জীবন বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা হ'ল এবং লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হল। ২৪৩টি জীবন বীমা কোম্পানীর কাজ একত্রিত করা হল। এদের মধ্যে কতকগুলি কোম্পানীর অবস্থা খুবই সঙ্গীন ছিল—তবুও সরকার তাদেরও দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যাতে সেই সব কোম্পানীর বীমাপত্রের মালিকেরা বীমাকৃত পুরো টাকাটাই পান।

এল.আই.সি.-র প্রিমিয়াম থেকে অর্জিত আয় বীমাপত্রের মালিকদের এবং জনসাধারণের স্বার্থে কিভাবে বিনিয়োগ করা যেতে পারে সরকার এটাও স্থির করে দেন।

এল.আই.সি. তার কর্মপদ্ধতিকে সুচিন্তিতভাবে লগ্নী করেছে। বেশী ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আগ্রহী হয়নি কেননা তাতে দ্বায়িত্বের ভিত নড়ে উঠতে পারত আর খুব রক্ষণশীলও হয়নি কেননা তাতে বীমা-পত্রের মালিকদের লাভের দিক থেকে ক্ষতি হতে পারত।

ধীরে ধীরে এল.আই.সি. একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে। মাঝে মধ্যে এল.আই.সি.র বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু এটি যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

বর্তমানে বীমাপত্রের মালিকেরা অধিক হারে লাভের অংশীদার হচ্ছেন। ১৯৫২ সালের ঠিক পূর্ববর্তী দশকে প্রাক্তন বীমা কোম্পানীগুলির আমলে সর্বোচ্চ লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল প্রতি হাজার বীমাকৃত টাকায় ১২ টাকা। ২৪৩টি বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১১৮টি কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত হবার ঠিক আগেই যে হিসাব দেখায়, তাতে দেখা যায় তারা কোন লভ্যাংশ দেয়নি। ১৯৭৫-৭৬ এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে এল আই সি. প্রতি হাজার বীমাকৃত টাকায় প্রতি বছরে মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে ৯০ টাকা এবং আজীবন বীমার ক্ষেত্রে ২৫ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করে।

বর্তমানে অনেকে চান এল.আই.সি. ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আগ্রহী হোক। তাঁদের মতে, "এত রক্ষণশীল হবার কোন মানে হয় না। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জীবন বীমা কোম্পানীতে অধিক হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। এখন ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হয়। প্রিমিয়ামের হার কমানো যেতে পারে। বিনিয়োগ-নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার, তাতে আয় বৃদ্ধি পাবে এবং বীমাপত্রের মালিকদের আরো বেশী হারে লভ্যাংশ দেওয়া যেতে পারে। এই রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যই বীমা-পত্রের মালিকেরা প্রতারিত হচ্ছেন।'

যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বীমা কোম্পানী অধিক হারে লভ্যাংশ দিচ্ছে একথা সত্য। আবার একথাও সত্য যে যুক্তরাজ্যে গত দুই দশকে বেশ কয়েকটি বীমা কোম্পানী তাদের কার-বার গুটিয়ে ফেলেছে। বীমাপত্রের মালিকদের প্রতারণায় এটাই তো শেষ কথা।

এল.আই.সি. যথেষ্ট রক্ষণশীলও নয় আবার বেশী মাত্রায় ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আগ্রহীও নয়—একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেছে—যার ফলে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থায় পরিণত হতে পেরেছে। তাছাড়া বীমা-পত্রের মালিকদের কাছে এটাই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

যে কথার শেষ নাই

গোপাললাল সান্যাল

খানাতল্লাসীর পর একই রিভলভার দু'বাড়ী থেকে আবিষ্কার ; বহু নির্দোষ যুবকের প্রতি নির্মম ব্যবহার ; অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবাসের ব্যবস্থা—স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন এই কেরামতি ধরে ফেলার পর পুলিশের, তথা তদানীন্তন বাঙ্গলা সরকারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, চার্লস টেগার্টের আর মুখ দেখাবার পথ রইল না।

তিনি লম্বা ছুটি নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। টেগার্টের ছুটি নিয়েও শান্তি নেই, বিশেষতঃ তার স্বদেশে, আয়র্ল্যাণ্ডে। সে দেশেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের, বাঙ্গলার বিপ্লববাদীদের সমর্থক, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং নানা সংঘ-সমিতির সংখ্যাও কম ছিল না।

আয়র্ল্যাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন পুরোদমে চলছে। ডি-ভ্যালেরা এবং তাঁর সিন্-ফিন্ দল আধুনিক ধরণের 'গেরিলা যুদ্ধে' বৃটিশ কর্তাদের নানাভাবে পর্যুদস্ত করে চলেছেন।

এ-আন্দোলনে আমেরিকার প্রবাসী আইরিশদের কাছ থেকেও নানাভাবে সাহায্য আসছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষতঃ মিশর ও ভারতে, স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করতে, আইরিশ কর্মীগণ এবং তাদের সহায়ক বিদেশী সংসদ-গুলি নানাভাবে প্রচারকার্য ত' চালাচ্ছেই, হিংসাপন্থী দলগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র ও নানা গোপন খবর প্রচার করে দিয়েও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করবার চেষ্টা করছে।

টেগার্টের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিপদ-সংকুলস্থানে বেশীদিন থাকা সম্ভব হল না। এখানে থাকা আর কলকাতায় থাকা একই কথা—সর্বদা প্রাণ হাতে করে চলতে হয় ; অতর্কিতে কখন, কোন দিক থেকে গুলি এসে যে বক্ষভেদ করবে, বলা যায় না। টেগার্টের কীর্তি ডাবলিনের যুবকদের অজানা ছিল না। যারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, তারা তাদের প্রধান শত্রু টেগার্টের বিরোধী। হোক সে আইরিশ, তবু বিপ্লববাদীদের কাছে কারও ক্ষমা নেই।

আয়র্ল্যাণ্ডে বিপদের সম্ভাবনা দেখে তিনি অবশিষ্ট ছুটির দিনগুলি লণ্ডনে কাটাবেন স্থির করলেন।

এ-সব সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরখানায় আইরিশ যুবকদের নিয়োগে কিন্তু বিশেষ বাধা ছিল না। শুধু পুলিশ-বিভাগে নয়, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বহু আইরিশ যুবক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, সরকারী নানা বিভাগে কাজে লিপ্ত ছিল।

এই সব যুবকের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ও

বন্ধু-স্থানীয় অনেকেই ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় বিলাতে থাকাকালে এরা সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্র, আন্তরিকতা এবং আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ ও অনুগত হয়েছিলেন। এদেশে সরকারী কর্মরত হয়েও তাঁরা ঐ আনুগত্য ত্যাগ করেননি। সুভাষচন্দ্রের সকল প্রয়াসের সাফল্য কামনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সরকারী নীতি, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং বিভিন্ন প্রধান প্রধান সরকারী কর্তার প্রকৃত মনোভাবও তাঁরা জানিয়ে দিতেন সুভাষচন্দ্রকে।

আইরিশ ছাড়া, স্কটল্যাণ্ডের অনেক অধিবাসী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এরূপ ব্যক্তির সংখ্যাও বেশ ছিল। তাদের অনেকেরই হয়ত কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। আইরিশ সহকর্মী বা অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তি মারফৎ সরকারী কার্যকলাপ বনাম ব্যক্তিগত মনোভাব সম্বন্ধে ওদের প্রকৃত পরিচয় সুভাষচন্দ্র এবং অন্য কোন কোন নেতার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর অবদান ছিল অসামান্য।

ইংলণ্ড এবং ফরাসী দেশের রাজনীতিক মহলে শ্রীযুক্ত গোস্বামীর যাতায়াত ত' ছিলই, শুধু বিদ্যাবত্তায় নয় আভিজাত্যেও বটে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অন্যতম প্রধান রাজনীতিকদলের নেতা-হিসেবে ইয়োরোপের বহু উচ্চমহলে তাঁর প্রভাব ছিল সংশয়হীন। নানা ক্লাব ও সমিতিসূত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। 'ফরওয়ার্ড'-এর বৈদেশিক সংবাদদাতা ও প্রতিনিধি নির্বাচন ও নিয়োগ, তাঁদের কাজে সাহায্যদান এবং ও-সব দেশের বিশিষ্ট মহলে তাঁদের গতিবিধি ও সংবাদপত্রের সুব্যবস্থা সাধন—শ্রীযুক্ত গোস্বামীর প্রতি বছর বিদেশে যাওয়ার এ-ও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

এইভাবে বহু সরকারী গোপন সংবাদ—ভারত সরকারে পৌঁছিবার পূর্বেই "ফরওয়ার্ড"-এ প্রকাশিত হত।

এদেশে শাসনকার্যে রত অ-ভারতীয় কোনও কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি গোপনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পরবর্তী-কালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

১৯৩১ সালের প্রথমে ২৬শে জানুয়ারীর প্রত্যুষে কংগ্রেসের আরও কয়েকজন নেতাসহ মেয়র সুভাষ-চন্দ্রকেও স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হবে, কোনও সভা-সমিতিতে যোগদান করতে দেওয়া হবে না,—পুলিশের এই গোপন সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্র পূর্বেই জানতে পেরে পূর্ব রাত্রে আর বাড়ী ফেরেন নি। পরদিন সন্ধ্যায় মেয়র সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশন আপিস থেকে সরাসরি ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার সংকল্প পাঠের জন্য পূর্বনির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হন এবং ক্রুদ্ধ পুলিস সার্জেন্টদের রুলের আঘাতে আহত অবস্থায় তাঁকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কারাগারে পৌঁছলে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয়। আই-এম-এস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, কর্ণেল সিং, সেণ্ট্রাল জেলের দ্বিতলের নির্দিষ্ট কক্ষে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যান এবং তিনিই সর্বপ্রথম ওখানে সুভাষচন্দ্রকে প্রণাম করেন।

তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যারাও প্রণাম করেন সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর আসেন জেলের সাধারণ কয়েদীগণ। সে এক বিরাট লাইন। দু'জন করে কয়েদী, ফুলের

গুচ্ছ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে; সুভাষচন্দ্র তাঁর ছোট কক্ষের সামনে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; কয়েদীরা ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে, কেউ বা পায়ের কাছে রেখে, হাত জোড় করে, প্রণাম করে সরে যাচ্ছে; আর একদল এসে অনুরূপ-ভাবে প্রণাম করে চলেছে।

এই মনোরম ব্যবস্থা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিজেই করেছিলেন। সাধারণ কয়েদীদের সন্ধ্যায় সেল-এর দরজা বন্ধ হবার নিয়ম। তিনিই তা স্থগিত রেখে এ ব্যবস্থা করেন। জেলের বাগানের ফুল আহরণের ব্যবস্থা ও সুভাষচন্দ্রকে দর্শন ও প্রণামের ব্যবস্থা তিনিই করেন।

জেলখানার শাসন-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট-এর এক্তিয়ার।

পুলিশ যাকে প্রহার করে জেলে ঠেলে দিল, জেলখানা তাকেই মালা দিয়ে বরণ করে নিল।

ঐ সময়েরই আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিকে লবণ-সত্যাগ্রহ, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের হিংসাত্মক অভিযান—দুই একসঙ্গে চলছে। সত্যাগ্রহী ছেলে ও মেয়ের দলে সব জেল ভর্তি হয়ে গেছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সী ও সেণ্ট্রাল জেল ছাড়াও দমদমের বিশেষ জেল, পুরাণো জেল,—সব রাজবন্দী-ভর্তি।

এদের নিয়ে শুধু যে জেলার, জেল সুপারিন-টেণ্ডেণ্টরাই হিম্‌সিম্‌ খাচ্ছেন তাই নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদলের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে, কোন কোনও ক্ষেত্রে একই সেল-এ রাখার ফলে, দলগত রেষারেষি ও কলহ জেলের ঘরে ঘরে নানা গোলমাল লেগেই আছে। একদলের ছেলে বা মেয়েদের আর একদলের সঙ্গে থাকায় আপত্তি—ওদলের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার, সহজ ইনটারভিউ বা চিঠি কিংবা জিনিষপত্র চালা-চালির সুবিধা দান, অপরপক্ষের ছেলেদের প্রতি অকারণ কঠোর ব্যবহার ইত্যাদি নানা অভিযোগ প্রত্যভিযোগে জেলার বা জেল-সুপার অতিষ্ঠ। তারা কি করবেন? তারা কোনও দলেরই ন'ন। দলে দলে চুল-চেরা পার্থক্যের ব্যাপারও তারা তেমন অবগত ন'ন। এ অবস্থায় তাদের আচরণ কিরূপ হবে, সে সম্বন্ধে আদেশ বা অনুরোধ বা পরামর্শ কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে?

অবশেষে প্রেসিডেন্সী জেলের জেলর মিঃ রায়ান্‌ স্থির করলেন, এ-ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের শরণ নেওয়াই সঙ্গত।

অবশ্য একাজ অতি সংকটময়। কেউ যেন না জানতে পারে; নইলে সমূহ বিপদ।

রায়ান জাতিতে আইরিশ। সুদূর আয়র্ল্যাণ্ড থেকে কি ভাবে তিনি কলকাতার অন্যতম প্রধান জেলখানার জেলররূপে অধিষ্ঠিত হলেন, তার বিচিত্র ইতিহাস তিনিই সুভাষচন্দ্রকে পত্র মারফৎ জানিয়ে-ছিলেন। অবশ্য ঐ পত্র সোজাপথে আসে নি।

সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতার মেয়র ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। সত্যাগ্রহ আন্দোলন তখন পূর্ণ উদ্যমে চালিত হচ্ছে। ওদিকের বিপ্লব-বাদীরাও বসে নেই। টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা; রাইটার্স বিল্ডিং-এ কর্ণেল সিম্পসনের প্রাণনাশ; মেদিনীপুরে একজনের পর আর একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লায় বিপ্লববাদী-দের নিরন্তর হিংসাত্মক কার্যকলাপ, তার ফলে বিনা-বিচারে দলে দলে যুবকদের গ্রেপ্তার ও কারাবাস অব্যাহত চলছে।

এইরূপ সময়ে, এক দুপুরে, সুভাষচন্দ্রের বসবার ঘরে, খাকীসার্ট-প্যান্ট, বুট-পট্টি-পাগড়ীধারী এক ব্যক্তি সেলাম করে দাঁড়িয়ে জানালো, হুজুরের একঠো চিঠ্‌ঠি আছে।

সে তার পায়ের পট্টির ভিতর থেকে ছোট্ট এক-টুকরো ভাঁজ করা চিরকুট সুভাষচন্দ্রের হাতে দিল।

কাগজখানা ছোট; কিন্তু দু'পিঠে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে অনেক কিছু লেখা। কোথা থেকে সে এসেছে কেনই বা এ চিঠি কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না।

পরে অবশ্য সব জানা গেল। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে মিঃ রায়ান লিখেছেন। বিভিন্ন দলের বিরোধী সভ্যদের কথা, কে কি করেছেন, পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বা কলহই বা কেন, সব কিছু জানিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ চেয়েছেন। জানিয়েছেন, অন্য সব জেলের পক্ষ থেকেই তিনি একাজ করেছেন। তাঁর নির্দেশ অন্য সকলকে মিঃ রায়ান জানিয়ে দেবেন। বিভিন্ন জেলকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের কোনও প্রয়োজন নেই, তাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। নিজের সততা, আনুগত্য এবং দেশপ্রীতি সম্বন্ধে মিঃ রায়ান সব কথা অকপটে লিখেছেন।

কৈশোরেই তিনি আইরিশ সিন-ফিন দলে যোগ দেন; যৌবনে তার দলীয় কাজকর্ম প্রসারলাভ করে। বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তিনি ছেলের মতি-গতিতে ভয় পেয়ে নানা চেষ্টার পর ভারত সরকারের বন-বিভাগে এক চাকরী জোগাড় করে—ছেলেকে সরাসরি কলকাতা পাঠিয়ে দেন।

বন-বিভাগ থেকে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে প্রেসিডেন্সী জেলের ডেপুটি জেলর, জেলর ও বর্তমানে অস্থায়ী সুপারিনটেণ্ডেন্টের পদে উন্নীত হন। অবসর নেবার সময় প্রায় সমাগত। এই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কিঞ্চিৎ সেবার সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য ও গর্বিতবোধ করছেন।

এখন তিনি ভারতীয় বিপ্লবী নায়কের নির্দেশমত কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। বন্দেমাতরম্।

এ চিঠির জবাব সুভাষচন্দ্র দিয়েছিলেন কি না, কি ভাবেই বা দিয়েছিলেন, তা জানা নেই। তবে ঐ পট্টিধারী জমাদার যে প্রতি সপ্তাহেই অন্ততঃ একদিন দুপুরে, নির্দিষ্ট সময়ে এসে, পায়ের পট্টির ভিতর থেকে জেল-সুপারের চিরকুটে, খুদে-খুদে অক্ষরে লেখা জেলখানার 'ডাইরী' দিয়ে যেত, তা ত' এখন জানা-কথা।

অথচ, ভাগ্যের কি দুর্দৈব! যে মিঃ রায়ান রাজবন্দীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এত আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল ছিলেন; যিনি তাদের খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা-সাধনে যে কোনও আইনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁকেই শেষে এই রাজবন্দী-দের নান্য আচরণে বিব্রত হয়ে ছুটি নিতে এবং অবশেষে চাকরী ত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হতে হয়।

রাজনীতির দলাদলির খেলা এমন জটিল যে শুধু সাধুতা বা সদিচ্ছা সম্বল করে তার হাত থেকে পরিত্রাণ তেমন সহজ নয়।

• • •

টেগার্ট লণ্ডনে এসে ভারতের সেক্রেটারী অফ-ষ্টেটের আপিসে আনা-গোনা শুরু করলেন এবং বাঙ্গলাদেশে যে একজন জবরদস্ত শাসনকর্তা অবিলম্বে পাঠানো প্রয়োজন, সে বিষয়ে নানাভাবে বড়কর্তাদের সঙ্গে তদ্বির সুরু করলেন। যে করেই হোক, সার স্ট্যানলিকে সত্বর বাঙ্গলা থেকে না সরালে টেগার্টের

আর মান থাকে না। পুলিশের কাজে বাধা দিলে দু'দিনে শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে। তাহলেই ত' বৃটিশ-প্রেষ্টিজ পাঞ্চার, সাম্রাজ্য ধূলোয় মিশতে আর কতদিন?

শোনা যায়; এই সময় তিনিই সার জন এণ্ডারসনকে পরবর্তী লাটরূপে নিয়োগের তদ্বির করেন। সার জন ইতিপূর্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে পুলিশী নির্যাতন ও কঠোর শাসনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ওদিকে প্রেসিডেন্সী জেলের মিঃ রায়ানকে যেমন রাজনৈতিক দলাদলির ফলশ্রুতি হিসেবে চাকরী ত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কর্ণেল প্রীতম সিং-এর ভাগ্যেও জেল-বিভাগের চরম পুরস্কার—ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল-এর পদে উন্নতি—বার বার চেষ্টা করে না পেয়ে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বোধ হয় সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ও আনুগত্যই অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁর শেষ পদোন্নতির চরম বাধা হয়েছিল।

সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি সরকার-বিরোধী দেশনায়কের প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন তা কখনও ভুলবার নয়।

এ প্রসঙ্গে ১৯২৭-২৮ সালে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত সিভিলিয়ন মিঃ রকস্‌বার্গের অবদান উল্লেখযোগ্য।

মিঃ রকস্‌বার্গ জাতিতে স্কচ্। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা শেষে তিনি বাঙ্গলা দেশকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র মনোনীত করেন এবং দেশ স্বাধীন হবার পরও তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন নি। সরকারী চাকরী ত্যাগ করে প্রচুর খেসারতের প্রলোভনে এদেশ ছেড়ে স্বদেশে বা পাকিস্তানেও চলে যান নি।

সহরের প্রধান বিচারক হিসেবে অধিকাংশ পুলিশী মামলা করতে হত মিঃ রকস্‌বার্গকে। যে সময় তিনি কার্যরত ছিলেন, সে সময় দেশময় সরকার-বিরোধী আন্দোলন, আইন-অমান্য, বিদেশী বস্ত্র-বর্জন বা বহ্ন্যুৎসব ইত্যাদি রাজদ্রোহমূলক গ্রেপ্তার, মামলা বা কারাবরণ চলছে অব্যাহতগতিতে।

এ সব মামলায়ই বাদী পক্ষে পুলিশ অর্থাৎ টেগার্টের দল, বিচারক সিভিলিয়ন মিঃ রকস্‌বার্গ। একজন আইরিশ আর একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী।

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীর কি অদ্ভুত পার্থক্য। টেগার্ট এ-আন্দোলন ও বিপ্লববাদীদের বিনাশে ব্যগ্র—রকস্‌বার্গ পুলিশী নিগ্রহের হাত থেকে বন্দীদের রক্ষা করতে আগ্রহী।

রাজনীতিক মতবাদের পার্থক্য বা নীতিবোধের তারতম্য ছাড়া ঐ দুই ব্যক্তির কার্যধারার আরও একটি গূঢ়, ব্যক্তিগত কারণ সুপ্ত বা গুপ্ত ছিল—যা কার্যক্ষেত্রে বিরোধিতায় রূপান্তরিত হত।

টেগার্টের চরিত্র-দোষের কথা কলকাতার জন-সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। একে ত' পুলিশ-বিভাগের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, তার উপর খোদ বড় কর্তার নানা দুর্বলতার কাহিনী যদি প্রচারিত থাকে, তবে ত' সোনায় সোহাগা। টেগার্টের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যে-সব দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকবেন, অধস্তনরা সেগুলিকেই 'গুণ' বলে গ্রহণ করে, বড় কর্তার পদাঙ্ক অনুসরণে আগ্রহী হবে—এতে আর আশ্চর্য কি?

এতকাল শহরের প্রধান বিচারকের দপ্তর ছিল পুলিশ কমিশনারের খাস তালুক। পুলিশের পক্ষাবলম্বনকারী সরকারী উকীল যে-মামলা যে-ভাবে সাজিয়ে

উপস্থাপিত করবেন, বিচারক মশায় সেইভাবে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং কম বা বেশী শাস্তির নির্দেশ দেবেন পুলিশী আদালতে এই ছিল অলিখিত রীতি।

সাধারণতঃ কোন না কোন গৌরাঙ্গ সিভিলিয়নই সেকালে কলকাতার প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন। মিঃ রকস্‌বার্গের পর যেমন ছিলেন, মিঃ টাইসন, তাঁর পূর্বে মিঃ সুইনহো ইত্যাদি।

এ-সব বিচারক জানতেন তাঁদের আদালত পুলিশের মামলার জন্যই নির্দিষ্ট এবং 'আইন ও শৃংখলা' রক্ষার জন্য পুলিশ যে সব মামলা রুজু করবে, বৃটিশ শাসন সুরক্ষিত করবার জন্য সেগুলির বিচারও পুলিশের প্রয়োজন মাফিক হওয়া চাই। অর্থাৎ, পুলিশ পক্ষের উকীল, (ঐ সময়ে ছিলেন রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু মহাশয়) যে রকম প্রস্তাব করবেন, কিছু কম বেশী সেই ধরণের শাস্তিদানের নির্দেশ দিলেই আসামীর উপযুক্ত দণ্ড হবে, বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাও অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

মিঃ রকস্‌বার্গও হয়ত ঐ অলিখিত পুলিশী নিয়ম বা নির্দেশ পালন করেই তাঁর চাকরী চালিয়ে যেতে পারতেন।

কিন্তু বাধা হল তাঁর একমাত্র কন্যার প্রতি টেগার্টের দুর্নীতিমূলক ব্যবহার।

প্রতিদিন প্রাতে ঐ কন্যাই নিজে মোটর চালিয়ে বাবাকে আদালতে পৌঁছে দিয়ে, মার্কেটে একটু-আধটু বাজার সেরে, বাড়ী ফিরতেন।

সেদিন ফেরবার সময় গাড়ীর ছোট্ট আয়নায় মেয়ে দেখলেন, পশ্চাতের এক গাড়ীতে কে-যেন তাকে অনুসরণ করছে।

পরে আরও ভাল করে লক্ষ্য করলেন, পেছনের গাড়ীতে আর কেউ নয় স্বয়ং পুলিশকর্তা টেগার্ট। সকালবেলা ময়দানের সুবিস্তীর্ণ রেড রোডে তখনও আপিস-যাত্রীদের গাড়ীর ভীর সুরু হয়নি—রকস্‌বার্গ ঠিক ন'টায় কোর্টে চেম্বারের কাজ সুরু করতেন আপিসে পৌঁছতেন তারও পূর্বে, এ ছিল তাঁর নিত্য-কার নীতি।

এত সকালে লালবাজার থানা থেকে টেগার্টও ফিরছিলেন তার কিড ষ্ট্রীটের প্রাসাদে। সেকালে কিড ষ্ট্রীটে পুলিশ কমিশনারের বাড়ীর জেলুস লাট-ভবনকেও হার মানাতো।

পথে দেখলেন এক ফুটফুটে মেয়ে ঐ সাত সকালে, একাকী গাড়ী চালিয়ে চলেছে, ময়দানের বিস্তীর্ণ, নির্জন মাঠের বুক চিড়ে, লম্বা লালপথ দিয়ে। পেছনের গাড়ী থেকে মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কে এই মেয়ে?

ড্রাইভার, ফলো করো—এগিয়ে যেয়ো না, দেখো, গাড়ী কোথায় যায়।

গাড়ীতে টেগার্টের মুখচ্ছবি দেখে মিস্ রকস্‌বার্গের যেমন রাগ হল ভয়ও কম হল না।

স্থানীয় ইয়োরোপীয় মহলে, বিশেষতঃ মহিলাদের মজলিশে, টেগার্টের পরিচয় অজানা ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে টেগার্ট ঐ মহলে ছিলেন অপাংক্তেয়।

কুমারী রকস্‌বার্গ ঐ ক'দিন পুলিশের থাবার ভয়ে আতঙ্কিত চিত্তেই তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফিরলেন। টেগার্টও মেয়ের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে পালাতে দ্বিধা করলেন না।

এ ঘটনার ফল হল সুদূরপ্রসারী।

বাবা বাড়ী ফিরলেই কন্যা তাকে টেগার্টের কীর্তির কথা সব জানাল।

মিঃ রক্‌সবার্গ সব শুনে নিরুত্তর ঃ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এরপর থেকেই পুলিশের সব মামলায় তিনি হলেন খড়্গহস্ত। যে মামলাই আসে, বিচারক আসামীকে হয় খালাস দেন, নয়ত, অতি সামান্য সাজা দিয়ে আইনরক্ষা করেন।

পুলিশ বিপদে পড়ল। কিন্তু কে এর প্রতিবাদ করবে? আইনতঃ তাদের কিছুই করবার নেই।

অন্যান্যদের যাই হোক, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী ও নানা আইনভঙ্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের এ সময়ে কিছু সুখ-সুবিধে হয়েছিল বৈ কি! পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও সাধারণ চোর-ডাকাত-খুনে কয়েদীদের সঙ্গে বসবাসের দুশ্চিন্তা তাদের দূর হল।

রক্‌সবার্গের কোর্টে পুলিশের মামলা এলেই তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হয়। অধিকাংশ মামলাই পাঁচমিনিটে শেষ হয়—আসামী খালাস, নয় ত' নামমাত্র-সাজা।

কখনো এমন হয়, ম্যাজিস্ট্রেট যথাসময়ে কোর্টে হাজির, আসামীরাও ডকে উপস্থিত, পেশকার আসামীর নাম ডাকলেন। কিন্তু বাদী পুলিশপক্ষের উকীল তখনো আসেন নি।

মিঃ রক্‌স্‌বার্গ একমিনিট অপেক্ষা করলেন; উকীল তখনো অনুপস্থিত। তা দেখে মামলা খারিজ করে দিলেন। (ক্রমশঃ)

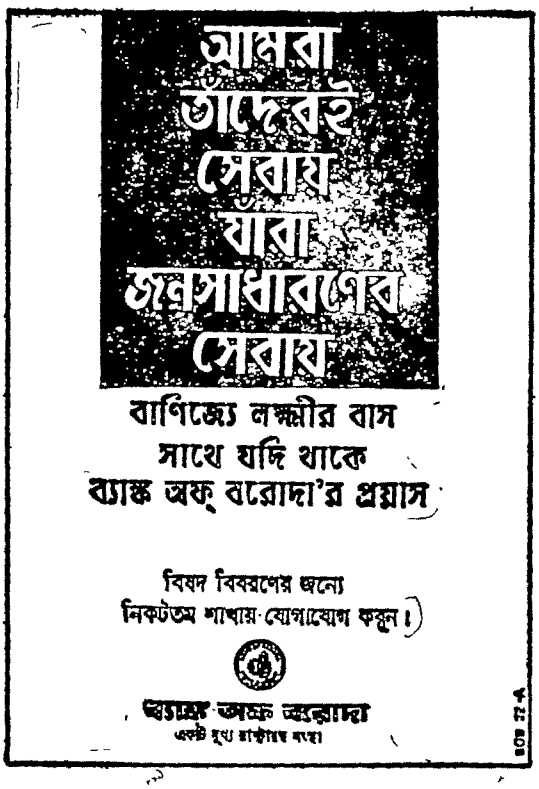

কলকাতার কড়চা

আমরা তো সবাই প্রেমে পড়েছি।

কিন্তু একসাথে সকলের একইজনের প্রেমে পড়ার অমোঘ দৃষ্টান্ত শুধু কলকাতাবাসীর কুষ্ঠিতেই রয়েছে।

মহীয়সী কলকাতা নগরী।

কলকাতার প্রত্যেকটি মানুষেরই এই নোংরা-পরিষ্কার, ধনী-দরিদ্র, সচল-অচল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত দোফলা নগরীটির প্রতি এক অবোধ্য ভালবাসা, নাড়ীর বন্ধন রয়েছে।

অথচ এই সংখ্যার ক'জনই বা আর খাস কলকাতার মানুষ। পূর্ববঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাত, বোম্বাই, ইউ পি, দক্ষিণ ভারত ও রাজ্যের সমস্ত কোণ থেকে মানুষ এসে জুটেছে এই শহরের বুকে ও নানান্ আনাচে কানাচে।

এসেছে সেই সাহেবদের সময় থেকে। দেশ ভাগের আগ থেকে। বছরে বছরে। আবার এখনও আসছে।

এত লোক। এত ভাষা। এত ভাব। সব জোড়া লেগে কলকাতার নিঃশ্বাসকে করেছে ভারী। তাই এই বাতাসে শ্বাস নেওয়ার অভ্যাস যার একবার হয়েছে, সে আর কোথাও গিয়ে, শত বিশুদ্ধ বায়ুতেও শ্বাস নিয়ে সুখ পায় না।

দুদিনের জন্যও বাইরে যাওয়া-কলকাতাবাসী তাই হাওড়া স্টেশনের ভিড়ে পা দিয়েই আরামের শ্বাস টানে। অসুখেরও ?

কিমাশ্চর্যম্!

ফুটপাথের ও বস্তীর ক্লিষ্ট জীবনধারণের গা ঘেঁষে বিত্তবানের নিশ্চিন্তির পরম আভাস। পাশাপাশি মাখামাখি।

এরকম একটা শহরের ভাঙ্গাগড়ার কাজও তো সহজ নয়। অথচ, পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতেও তো হবে। শহরটার সংগ্রামী ইতিহাস, কু-শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ, এসব মনে রেখে শুধু শহরের জল-নর্দমা নয়, শহরের মানুষের চিন্তাকেও সঠিক পথে উন্নয়নমুখী করতে হবে।

পাথেয় ? পুরস্কার ?

একটা কাজে হাত দিলেই কেউ বলে "ভাল", আবার দশজন হয়তো হৈ হৈ করে নিন্দেয়। তবে যে যাই করুক কাজটা হয়ে গেলে সকলেই খুশী হয়ে ব্যবহার করে সেটা। আর তারপর ভুলেও যায় নিজেদের অতীত বিরোধিতার কথা। পঁচমুখে লোকের কাছে প্রশংসা করে আঙুল দেখায়, "ঐ দেখ ব্রোব্রোর্ণ রোডের ফ্লাইওভার, বিজন সেতু, যাদবপুরের রাস্তাটা কি চওড়া, মার্কেটটা কত ভাল, উল্টোডাঙ্গার ব্রীজ, কালীঘাট আর চেতলার সেতু, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, ভূগর্ভস্থ জলাধার বা ২০টি চওড়া রাস্তা, কিংবা উন্নত বস্তী"র কথা। এছাড়াও আরও কত কি।

সি, এম, ডি, এ-র প্রোপাগাণ্ডা ?

নিশ্চয়-ই। তবে ভালবাসার শহরটার কিছু উন্নতিও তো বটে।

NETAJI IN BURMA

Samarendra Kundu

I consider it a proud privilege to be here in Rangoon to inaugurate the celebrations of 'India Week' beginning from today. Today is the birthday of one of India's greatest sons—Netaji Subhas Chandra Bose. Being here in Rangoon on Netaji's birthday, the whole panorama of India's freedom struggle, the sacrifices made by Netaji Subhas Chandra Bose and the dedicated band of his supporters, the active support for the cause of India's Independence received from people and the leaders of Burma, appears vividly before my eyes. I, therefore, feel that it is my proud privilege to be in Burma, a great country with proud people and a country with which we have friendly and cordial relations.

The histories of our two countries are interlinked. Culturally our two countries have an affinity that goes back to many years and in the case of freedom of India the people of Burma and their leaders have also made their valiant contributions. We shall remember with gratitude their moral support to the cause of our freedom movement. In fact, since both these countries had suffered in the colonial rule under the British and both fought together against the British, the freedom movements of these two countries have complimentary linkages Particularly in connection with Netaji's contribution to the cause of India's freedom movement, we can never forget the support that he received from General Aung San. Netaji himself, when he left Rangoon for Bangkok on 24th April, 1945, had expressed this gratitude when he stated "I cannot conclude this message without publicly acknowledging once again my heart-felt gratitude to the Government and people of Burma for all the help that I have received at their hands in carrying on the struggle. The day will come when Free India will repay the debt of gratitude in a generous manner".

When the news that the Azad Hind Fauz had crossed Indo-Burma border into India, reached Major General Aung San, the then Defence Minister of Burma, he declared joyfully, "that is the news I have been waiting for. For the Burmese this indeed must be happy news. The carrying of the battle of forces of the Indian National Army into the soil of India means the dawn of India's independence".

This morning when I placed wreath at the Aung San Mausoleum at the Martyr's Memorial, the love and compassion shown by the leaders of the Burmese freedom movement towards the freedom of India thrilled me.

I also thank the Government of the Socialist Republic of the Union of Burma led by President Ne Win which have rendered all possible assistance to make the celebrations of 'India Week' a success

Netaji had a fondenss for Burma. For Netaji Burma and its capital Rangoon as well as Mandalay had special bearing. But his first acquaintance with Burma was as a prisoner of the British. In January 1925 he was brought to the Mandalay jail. Mandalay has a special place in the history of our freedom movement as well. It ls in this jail that Lok Manya Tilak was imprisoned for nearly 6 years and later on

Lala Lajpat Rai was also imprisoned for about a year. Netaji remained in the Mandalay jail for about two years.

Seeing the beautiful structures of the Palace and the State building of Mandalay, Netaji's thoughts were on the independence of Burma as well. In his own words, "the memory of the good old days that were no more, produced a pang in our hearts and we began to wonder when Burma would once more be able to fly the flag of independence". He started learning Burmese in the prison from another co-prisoner Mr. Jivan Lal Chatterjee. As he came into contact with the Burmese people, his love and admiration for them and their culture and philosophy grew.

He had described the Burmese as "exceedingly warmhearted, frank and jovial in temperament", and what struck him more was their "innate artistic sense which every Burmese has". In the jail he met the 'hypongyis' (the Buddhist priests) whom he described as some of the finest specimen of humanity he had ever met. He had a great regard for their unflinching nationalism and the sacrifices that they had made to keep it up while opposing the British. Netaji had also a high regard for structure of society in Burma as he himself says "Burma is a land where there is no caste and no class". It is, therefore, a fitting tribute to Netaji that we are celebrating the 'India Week' today here in Rangoon.

Netaji's contribution to India's freedom movement has been outstanding. His legendary bravery, unflinching patriotism and unimpeachable nationalism have continued to inspire us even today His life has been a life of sacrifices. He gave up the coveted job in the I.C.S. as he could not withstand dishonour to India even in the slightest form. He chose a life of hardship.

In his own words "I have been a dreamer of dreams but the dream of all my dreams, the dearest dream of my life has been the dream of freedom for India".

He was a brilliant student and also a rebel. From his school days his love for motherland was known. I had the privilege of staying close to his ancestral house at Cuttack for some years. He was born and brought up in Cuttack —a city of Orissa from which I come. In his college days at Calcutta a British teacher was slapped because the teacher did not speak kind words about India. He took the entire responsibility for the incident and suffered expulsion from the Presidency College, Calcutta, where he was reading His entire life is replete with many such stories where he has carried on uncompromising and relentless struggle against British colonialism.

He was influenced by the teachings of great Indians like Keshav Chandra Sen, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Vivekananda and Aurobindo Ghosh The teachings of Vivekananda based on rational philosophy and Vedanta had a deep influence on Netaji's thinking. It is from the study of Vivekananda that he emerged with a vivid idea of "Atmano Mokshartham Jagaddhitaya", that is, for one's own salvation the service of humanity should be the goal of life He was convinced that neither the slavish monasticism of the middle ages nor the modern utilitarianism of Bentham and Mill could be a perfect ideal. The service of mankind, who could be the real master of their destiny being free from all dishonour and subjugation, was the goal of his life.

His life, dedication to the cause of freedom, is a great inspiration to the youth of my country. Hundreds of youths were inspired in India and came forward prepared to sacrifice their lives for the cause of the Motherland being inspired by the revolutionary and dynamic leadership of Netaji.

With Compliments of :

SHAW WALLACE & COMPANY LIMITED

SHIPPING AND CREW RECRUITMENT AGENTS

CHARTERING SALE AND PURCHASE BROKERS

REGD. OFFICE :

4, BANKSHALL STREET

CALCUTTA-700001

Telegram : "SHAWPORT" **Telephone : 23-6551, (5 LINES)**

TELEX : 021-7232

Netaji had the greatest regard for the Father of Nation, Mahatma Gandhi and Gandhiji had also deep love for Netaji. Although in their approach to the methods for achieving India's freedom they were different, but their goal was the same and Netaji himself had acknowledged Mahatma Gandhi as the Father of the Nation in his radio broadcast over the Rangoon Radio on July 6, 1944 when he said "Father of our Nation ! In this holy war for India's liberation we seek for your blessings and good wishes. Jai Hind."

History, I am sure, will record that Indian independence was won as the ultimate result of freeeom struggle under the leadership of Mahatma Gandhi and of Netaji Subhas Chandra Bose and of our other great leaders.*

*An Extract of the Speech by Sri Samarendra Kundu, Minister of State for External Affairs, Government of India on the occasion of the inauguration of INDIA WEEK celebrations in Rangoon (23 January, 1979).

"...REMEMBER THAT I AM PRESENT IN THEE
AND LOSE NOT HOPE ;
EACH EFFORT, EACH GRIEF,
EACH JOY AND EACH PANG,
EACH CALL OF THY HEART,
EACH ASPIRATION OF THY SOUL,...
ALL, ALL WITHOUT EXCEPTION,...
LEAD THEE TOWARDS ME,..."

—THE MOTHER

SWEET MEMORIES

Prabhudayal Himatsingka

I came in close contact with Netaji Subhas Chandra Bose sometime about in 1923-24. In my professional work I had to go to his elder brother Late Sarat Chandra Bose almost everyday, and therefore I had many occasions to meet Subhas Babu also.

In March, 1924, I was elected to the Corporation as a Councillor on behalf of the Congress Party, and Subhas Babu was appointed as the Chief Executive Officer. There were many more occasions to come in contact with him. Throughout 1924 onwards upto the time he left the country during the 2nd World War we were very closely connected.

Sometime in 1929-30 or a little earlier, Subhas Babu went to Switzerland for treatment. I had correspondence with him as I used to collect some money from friends for being sent to him to meet the expenses of his treatment. Unfortunately, those valuable correspondences are no more available from my records.

I met Netaji Subhas Chandra Bose only 4 or 5 days before he disappeared from this country from his residence in Elgin Road and we had a very hearty talk .

There was only one occasion wherein I differed from him and that was sometime in late nineteen thirties. I was the Chairman of the Estates Committee (in-charge of parks and other properties of the Corporation) and when the land under the park on which Mahajati Sadan has been constructed was leased out to the Trustees of the Mahajati Sadan on a nominal rent. It was one of the conditions of the Grant that no further financial assistance would be asked from the Corporation by the Trustees. We raised certain funds amongst ourselves for the building, but within a year of the Grant, an application was received by the Corporation for a grant of Rs. 1 lac towards building fund. I was the Chairman of the Committee that year also. The Committee had 12 members and that request for Rs. 1 lac was not agreed to. Subhas Babu was very angry with me. I explained to him that I could not possibly agree to go against the agreement entered into and my own decision taken only 12 months ago and against the condition expressly agreed to. That difference was subsequently made up and we continued to be close friends.

Later in 1960's it was rumoured that Sholmari Sanyasi who was said to be Netaji Subhas Chandra Bose had moved to Dehra Dun. A friend of mine wrote to me from Delhi that Netaji was living in Dehra Dun and as I knew him, he would be glad if I visited Netaji. I went to Dehra Dun, met the Sanyasi. The moment I saw him, I told my friend that there was not the slightest similarity between Netaji and the Sanyasi. The Sanyasi was quite young. His pronunciation of the Bengali and Hindi was different, appearance was quite different. I came disappointed.

Lastly, I cherish the sweet memories of Netaji in those days when we lived together and worked together.

ক্রেতাদের জ্ঞাতার্থে

পূর্বে প্যাক করা কোনও জিনিষ কেনার সময়ে অবশ্যই দেখে নেবেন—

১) বস্তুটির নাম

২) প্রস্তুতকারক বা প্যাকারের নাম ও ঠিকানা

৩) প্রস্তুত বা প্যাক করার মাস ও বছর

৪) মোট কতটা (অর্থাৎ ওজন, মাপ বা সংখ্যা) এবং

৫) মূল্য

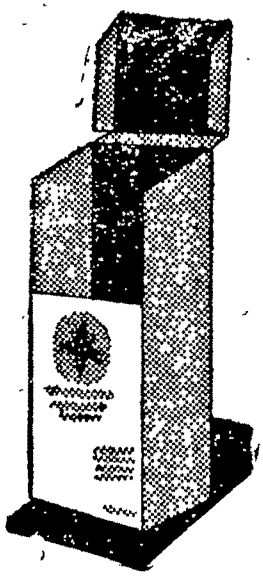

ব্যবসায়ীদের জ্ঞাতার্থে

পূর্বেই প্যাক করা কোনও জিনিষের মোড়কের ওপর উপরিউক্ত বিষয়ের উল্লেখ না থাকলে তা খুচরা বা পাইকারী ব্যবসায়ীর পক্ষে বিক্রী বা বিক্রীর জন্য সাজানো ১৯৭৭ সালের মোড়কবন্দি সামগ্রীর ওজন ও মাপের মান সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধ।

ডিরেকটোরেট অফ ওয়েট্‌স্ অ্যান্ড মেজার্স,
মিনিস্ট্রি অফ সিভিল সাপ্লাইজ অ্যান্ড
কো-অপারেশন, গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া,
নতুন দিল্লী

davp 18/253/Bengali

নেতাজীকে প্রণাম

বাংলার যত দুষ্টু ছেলে
তুমি তো তাদেরই দলে।
নিশ্চয় ছোটবেলায় মা তোমায় কত ব'কেছে ;
তোমার জন্যেই তো দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে।
যদিও তুমি একা না, একাজ একা হয় না।
তাই তো আমি বলি মাকে,
ছোটোতে সবাই দুষ্টু থাকে।
নেতাজী যদি মায়ের কথা শুনতো,
তবে কি দেশ স্বাধীনতা পেত ?
যত ছেলে আছে লক্ষ্মী
তারাও আজ সব সাক্ষী
হে মহান্ বিপ্লবী—
তুমি তো দিয়েছো সবই
তোমায় করি প্রণাম
চিরদিন থাকবে তোমার নাম
লেখা থাকবে রক্তের অক্ষরে
ছবি থাকবে প্রত্যেক ঘরে ঘরে।

নেতাজীর ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে

তোমার শুভ জন্মদিনে
তোমার কথা প'ড়ছে মনে।
দেশের জন্য করেছ সংগ্রাম,
তাইতো তোমার এতই নাম।
তুমি বাংলার মাথার মণি
অন্যায়ের সাথে, আপোষ করনি।
আমাদের শাস্ত্রে আছে
ঈশ্বর মানব দেহ নিয়ে
অবতীর্ণ হন মাঝে মাঝে,
তুমি কোন্ ঈশ্বর ?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু না মহেশ্বর ?
তোমার গৌরব কত—
রণনীতি তোমার কৃষ্ণের মতো।
এবার পাণ্ডবদের সাথে ;
তুমিও রয়েছো অজ্ঞাতে।
যোগ সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে
আসবে, আরও বেশী শক্তি নিয়ে।
ধরবে এমন অবতার,
দুর্যোধনের সৃষ্টি যেন না হয় আর।

সেদিন আসবে কবে ?

রেডিওতে খবর শুনে
তোমার জন্মদিনে,
বার্মা দিল উপহার
তোমার চেয়ার।
দিল্লীতে রাজ সিংহাসনে
ভাবছি কবে বসবে ওই আসনে।
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
ঘুমিয়ে পড়েছি রাতে।
ভাবছি ভরত হ'য়ে
কে পাদুকা আনবে বয়ে ?
কাল রাতে তোমায় স্বপ্ন দেখেছি।
সত্যি তোমায় নেতাজী।
পেলাম আর একটি উপহার,
জন্মদিনে ছবি তোমার।
তুমি আমাদের দেবতা—
তুমি জান না কি তা ?
সত্যি যদি আমাদের ভালবাস ;
একবার তুমি এস।
বলেছিলে তুমি, "আবার দেখা হবে",
বল না ; সে দিন আসবে কবে ?

* শ্রীমান রাজীবের জন্ম ১৯৭০-এর মে মাসে। 'নেতাজীকে প্রণাম' কবিতাটি তার ৭ বছর বয়সের রচনা। জঃ সঃ

With Best Compliments of :

Everest Welding Works

Repairing Shop and General Order Suppliers. All Kinds of Oxygen, Acetylene regulators, Gas cutters & Welding Sets Repairers.

147/1, ANDUL ROAD

HOWRAH-3

With Best Compliments from :

TRANSPORT CORPORATION OF INDIA LIMITED

TRANSPORT HOUSE

P-4 NEW C. I. T. ROAD

CALCUTTA-700073

Phone : 34-8255/5 lines Gram : YATAYAT

With best Compliments from :

UNITED CONSTRUCTION

ENGINEERS, BUILDERS & CONTRACTORS

3, Central Road, Jadavpur

Calcutta-32

দুইটি গোপন দলিল

ঘটনা দুইটি অর্ধ শতাব্দী পূর্বেকার। একটি বিশ দশকের শেষের দিকের আর একটি ত্রিশ দশকের গোড়াকার। ১৯২৮ সালের ক'লকাতা কংগ্রেসেই ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিলো, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেছে এবং সেই সংগ্রামের নেতা ক'লকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে'র রাজনৈতিক প্রস্তাবের বিকল্প, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল প্রকার বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র সংশোধনী প্রস্তাবের উত্থাপক সুভাষচন্দ্র। জহরলাল নেহেরু গোড়ায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে এবং 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গঠনে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন বটে কিন্তু ক'লকাতা কংগ্রেসের পরবর্তী লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী জহরলাল নেহেরুর নাম সভাপতির জন্য মনোনীত ক'রে কংগ্রেসের সেদিনকার বামপন্থী মহলে ভাঙন ধরিয়ে জহরলালকে স্বমতে টেনে নিয়ে এলেন। কংগ্রেসের তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিপদের জন্য গান্ধীজীর নাম প্রস্তাব করে পাঠালে গান্ধীজী সে প্রস্তাবে অসম্মত হন। সেই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করতে চাইলে গান্ধীজী তাদের এই এই মতকে আমল না দিয়ে জহরলাল নেহেরুকেই মনোনীত করে নিলেন।

তারপর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও যে সুভাষ-

চন্দ্রকে তাঁর বৈপ্লবিক স্পর্ধার জন্য তাদের চূড়ান্ত দমননীতির লক্ষ্যস্থল ক'রে তুলেছিলেন, সেদিনকার কয়েকটি গোপন দলিলে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার বৈপ্লবিক সংগ্রামের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত ভারত সরকার, এই সংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতা সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দেবার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলো। এই মর্মে ভারত সরকার সেদিনকার বাংলা সরকারের কাছে একটি তারবার্তাও পাঠিয়েছিলো ১৯২৯-এর ৯ই জানুয়ারী। পুরানো দলিলে পাওয়া তারবার্তাটি এখানে দেওয়া হ'লো :

Secret

Home Department

File No. 179/29— Political

Question of prosecuting Subhas Bose... for speeches or statements advocating independence and severance of the British connection.

Telegram P. to Bengal. Calcutta, No. 109-5, Dated 9th January, 1929.

EXPRESS :— Kindly report whether question of prosecuting Subhas Chandra Bose or any other political leader in Bengal in connection with speeches or statements advocating independence and severance of British connection as an immediate objective

has been considered by the Bengal Govt. Govt. of India have not yet reached any conclusion as to desirability of such prosecution if feasible, bu' as the question raises All-India Issues, they would be glad to have full material for considering it, including opinion of Advocate-General on any particular speech or statement that might be selected and views of Bengal Govt. In view of tendency of courts in Bengal to impose light sentences under Section 124-A, importance of proceeding if possible under Section 121-A, will no doubt be borne in mind.

...Govt. of India are inclined to view that if action is taken against one or two active leaders it should, if possible, be in respect of quite individual utterances such as statement to Press of Subhas Bose published in Forward on 30th December, 1928...

লাহোর কংগ্রেসের পর থেকে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে, ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস' ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত। ১৯৩১-এর ২৬শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ করে কলকাতা ময়দানের মনুমেন্টের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র কলকাতার মেয়র। করপোরেশন থেকে শোভাযাত্রা সহকারে তিনি আসছেন, 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য। ময়দানে এলেই তাঁর মাথায় লাঠির আঘাত পড়লো, লাঠির ঘায়ে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হোলো। রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর আহত হয়ে সুভাষচন্দ্র লালবাজারে ও পরে প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরিত হন। তাঁকে লাঠির ঘায়ে জখম করে গ্রেপ্তারের ঘটনা চাপা দেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে সেদিন বাংলা সরকার যে গোপন টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলো, তার অনুলিপি ছিল এরূপ :

Indian Posts and Telegraphs Department

File No. 271
Date 26 Jan 193
Received here at 20 H. 25 M

000 VC CALCUTTA 26 STATE 118 CLEAR LINE HOME NEW DELHI SUBHAS BOSE LED PROCESSION FROM CORPORATION OFFICE AT 2 30 P. M TODAY TO HOLD PROHIBITED INDEPENDENCE-DAY MEETING AT OCTERLONY MONUMENT ORDER OF PROHIBITION WAS SERVED ON HIM HE WAS ARRESTED HIS FOLLOWERS RESISTED AND WERE DISPERSED BY FORCE STOP. ON ARRIVAL LALBAZAR HE COMPLAINED OF INJURY WOULD NOT ALLOW MEDICAL ATTENDANT THERE TO EXAMINE HIM SINCE EXAMINED BY POLICE SURGEON FEW SLIGHT INJURIES FOUND STOP. CROWD THREW STONES BRICKS SIX PERSONS ARRESTED STOP PROCESSION IN LALBAZAR DISPERSED AND TWO MEETINGS IN CORNWALLIS SQ. BROKEN UP STOP, ABOUT 26 CASES SO FAR REPORTED IN HOSPITAL. NONE SERIOUS STOP SITUATION NOW APPEARS TO BE RETURNING TO NORMAL.

—Bengal 260 X

[Home (Political) 1931, File No. 38 Telegram from Govt of Bengal No 260-J of the 26th January, 1931.]

আমেরিকায় সুভাষবাদ

রঞ্জন বরা

কিছুদিন পূর্বে একরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই, ওয়াশিংটনে জার্মান জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার হয়েছিল। এঁর নাম ম্যানফ্রেড রোডার (Manfred Roeder)। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির প্রভাবান্বিত বর্তমান পশ্চিম জার্মান সরকার, রোডারের দল, 'LIBERATION MOVEMENT FOR THE REICH'কে বেআইনী ঘোষণা করেন, কারণ ঐ দলের দাবী ছিল বর্তমান পশ্চিম জার্মান সরকারকে পশ্চিমী তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে তার অবৈধকরণ, গত বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মান সরকারের প্রতিভূকে জার্মান জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার হিসেবে স্বীকৃতিদান, পশ্চিম জার্মানীর মাটি থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, এবং দ্বিখণ্ডিত জার্মানীর পুনরেকীকরণ। যে ভদ্রলোক আমাকে ম্যানফ্রেড রোডারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন, তিনি আমার পরিচয় দেন নেতাজীর একজন অনুগামী হিসেবে। নেতাজীর নাম শুনেই মিঃ রোডার দাঁড়িয়ে উঠে আমার করমর্দন করে বলেন '—Netaji, a great man, a great man'. সমগ্র জাতীয়তাবাদী জার্মানরা তাঁকে আজো গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

মিঃ রোডারের মতে নেতাজী যেমন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ সাধন ও ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, জার্মান প্রতিরোধ আন্দোলনকারী LIBERATION MOVEMENT FOR THE REICH'ও তেমনি ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবান্বিত এক তাঁবেদার রাষ্ট্রের উচ্ছেদ চায়। নেতাজীর মতো এদেরও কাম্য এক প্রকৃত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। নেতাজীর মতো এরাও দেশের দ্বিখণ্ডীকরণের বিরোধী এবং তার পুনরেকীকরণের প্রয়াসী। নেতাজীর আজাদ হিন্দের সঙ্গে যুদ্ধকালীন জার্মানীর মৈত্রীর প্রতি এই দল গভীর শ্রদ্ধাশীল।

ওয়াশিংটনে ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর নেতাজী সেমিনার করা হচ্ছে। গত ডিসেম্বরে নবম বার্ষিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হ'লো। এ পর্যন্ত বহু ইতিহাসবিদ্ রাজনীতিবিদ্, বিচারক, সমাজ-বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও অধ্যাপক এই সব সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সারগর্ভ নিবন্ধ বিদেশে নেতাজী-আদর্শের প্রচার-প্রচেষ্টাকে ফলবতী করে তুলেছে। কিন্তু এদের কাউকেই বলতে শুনি নি ম্যানফ্রেড রোডারের মত গভীর ভক্তি সহকারে—'Netaji a great man'. একজন সহ-সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বীরত্বেরই পরিচায়ক, এবং তা একমাত্র বীরেরই কাছ থেকে আশা করা যায়।

বিদেশে নেতাজীর প্রভাব কতখানি ছিল, সে প্রভাবের অবশিষ্ট আজ কতখানি সে-কথা এ ধরনের

ছোটখাট দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। পশ্চিমী জগতে বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিন বিশ্বে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও মহত্বের এবং তাঁর বলিষ্ঠ বিকল্প নেতৃত্বের কথা চাপা পরে গিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন তাঁর অক্ষশক্তির সহযোগিতা হেতু। নেতাজীর 'ইমেজ রিহ্যাবিলিটেশন' (image rehabilitation) অথবা প্রকৃত স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে ভারত সরকারের একমাত্র নেহেরু-আদর্শের প্রচারও এক প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে এসেছে। ভারত ১৯৪৭ সাল সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় দূতাবাস নেতাজীর জন্মদিন পালন তো দূরের কথা, এদেশে এই মহান নেতার তথাকথিত কলঙ্ক অপনোদনেরও কোনোরকম চেষ্টা করেন নি। আমরা যখন বার্ষিক সেমিনার সুরু করলাম, তারপরও দূতাবাস মহল থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি আজ পর্যন্ত। দূতাবাসের কর্মচারীদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ওয়াশিংটনের ভারতীয় অধিবাসীগণ, বিশেষ করে বাঙালী সম্প্রদায়ও বা উৎসাহ দেখিয়েছেন কতটুকু? সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারে এখানে যেন তাঁদের মনে এক ভীতি ও ত্রাসের মনোবৃত্তি বিদ্যমান, যেন এহেন প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হলে তাঁদের মার্কিন দেশে অবস্থান বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সরকারী ও বেসরকারীভাবে ভারতীয়দের তরফ থেকে নেতাজীর জীবন-কাহিনী, নেতৃত্বের মর্মবাণী ও আদর্শ প্রচারের কোনো চেষ্টাই আজ পর্যন্ত আমেরিকায় হয় নি। আমাদের বার্ষিক সেমিনার বিশাল এক মরুভূমিতে এক ক্ষুদ্র জলসিঞ্চন প্রচেষ্টার সুরুর সংগেই তুলনা করা যেতে পারে।

একাদিক্রমে পর পর ন'বছর সুভাষ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত করে আজ অন্তত এটুকু নজরে পড়ছে যে দক্ষিণ-এশিয়া বিষয়ে মার্কিন বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নেতাজীর জীবন ও অবদান সম্পর্কে এক নতুন অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছে। সুভাষ যে কেবল একজন দুঃসাহসী অক্ষশক্তি সহযোগী নন, তাঁর যে এক স্বকীয় ও বিশিষ্ট জীবন-দর্শন রয়েছে, তিনি যে এক বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারার পুরোধা, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে যে তাঁর এক অসামান্য, অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে সে কথা আজ এই আমেরিকান পণ্ডিতদের বর্তমানের ক্ষুদ্র দলটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এঁরাই হ'লেন আমেরিকায় নেতাজী-প্রচারের 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) এবং আমরা আশা করি এদের রচনা, আলোচনা ও ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে এই ভিত্তির উত্তরোত্তর পরিব্যাপ্তি ঘটবে—এবং এই ধারার মাধ্যমেই ভাবীকালে মার্কিন জনমানসে এই মহান নেতা ও তাঁর নেতৃত্বের যথাযথ প্রতিফলন হ'বে। ওয়াশিংটনের সুভাষ-সেমিনার বা আলোচনা-চক্রের উদ্বোধকরা আজ সেই চেষ্টায় স্থির।

আজ ইউরোপে, দূর প্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর কথা জনমানসে যতখানি ক্রিয়মান, আমেরিকায় কিন্তু তা নয়। কেন নয়, তার মুখ্য কারণগুলি এর পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখন প্রয়োজন নেতাজীর জীবন-দর্শন ও আদর্শ সম্পর্কে সাহিত্যের প্রচার। আমেরিকায় অগ্রণী হয়ে এ কাজ করার দায়িত্ব কাদের নেওয়া উচিত? আমাদের বার্ষিক আলোচনা-চক্র এক সামান্য বুদ্‌বুদ্ মাত্র। বৃহত্তর আকারে এবং জাতীয় পরিব্যাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে সক্রিয় সুভাষপন্থীদের। মার্কিন প্রকাশকদের প্রবুদ্ধ করতে হবে নেতাজীর

জীবনী ও জীবনবাদমূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পশ্চিমী জগতে এক Hugh Toye লিখিত The Springing Tiger ছাড়া অন্য কোনো সুভাষ-জীবনী প্রকাশিত হ'লো না আজ পর্যন্ত, এটা পরিতাপের বিষয়। আর একটি সাম্প্রতিক পশ্চিমী প্রকাশন হলো আজাদ-হিন্দের সংগ্রাম-ভিত্তিক। লিখেছেন Geraed Carr বই-এর নাম The war of the Springing Tigers. সুভাষ সম্পর্কে যে সব ইংরেজী গ্রন্থ এদেশে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির কোনো মার্কিন সংস্করণ প্রকাশ করার জন্যেও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য অবশ্য উপযুক্ত একজন কর্মীর দরকার যাঁরা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে কাজকর্ম করবেন।

আমেরিকায় এজাতীয় কর্মীর দল গড়ে তোলা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। ভারতীয় মহল, বিশেষ করে বাঙালী সম্প্রদায়ের নিপুণতার কথা পূর্বেই বলেছি। চাকুরী এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র, তাছাড়া ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যাঁরা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দিতে রাজী নন—অবশ্য আজ আর কোনোদিক দিয়েই সে প্রশ্ন উঠতে পারে না—তাঁদের দ্বারা কোনো প্রকার আদর্শগত কাজ চলতে পারে না। অতএব ব্রতী হতে হবে ভারতের ভারতীয়দেরই। একটি 'সুভাষ কাডার' গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই 'কাডারের' মাধ্যমেই সংগঠিত হবে যুবশক্তি নেতাজী-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। এই কাডারের কর্মীরাই বিদেশে প্রকাশকদের সংগে যোগাযোগ করবেন সুভাষ-সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের মধ্যে। আমরা যারা বিদেশে আছি, সর্বতোভাবেই এই যুবশক্তির প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবো। একাজ যে অত্যন্ত দুরূহ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দুরূহ কাজেই তো দিতে হবে নিজের কঠিন পরিচয়।

সেমিনার বা আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে আমরা আমেরিকায় এক সুভাষ-আগ্রহী ও সুভাষ-সচেতন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী রচনার প্রয়াস পাচ্ছি। আমাদের ইচ্ছা এই সব আলোচনা-চক্রে পঠিত নির্বাচিত নিবন্ধও এক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা। আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে, অভাব লোকজনের। 'সুভাষ কাডার' যদি এই লোকবল যোগায় তাহলে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা ফলবতী হ'তে পারে।

এবছর ১৯৭৯ সালে ওয়াশিংটন সুভাষ-সেমিনারের দশবছর পূর্ণ হবে। দশম বার্ষিক সেমিনার বৃহত্তর আকারে এবং পরিবর্ধমান কলেবরে রূপদানের ইচ্ছা উদ্যোক্তাদের। স্থানীয় আলোচনা-চক্রকে আন্তর্জাতিক রূপদান করতে হলে এখন থেকেই সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার প্রয়োজন। এই আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে যোগদানে ইচ্ছুক কোনো সুধী, পণ্ডিত ও ছাত্রদের ওয়াশিংটনে যাওয়া আসার ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা বর্তমানে উদ্যোক্তাদের নেই। কিন্তু ওয়াশিংটনে অবস্থানকালীন তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা বিভিন্ন পরিবারের সংগে করা সম্ভবপর হবে বলে উদ্যোক্তাগণ মনে করেন। আগামী অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কোনো এক সময়ে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। যাঁরা এতে অংশগ্রহণে এবং নিবন্ধ পাঠে আগ্রহী তাঁরা এই ঠিকানায় পত্রালাপ করুন : SUBHAS SOCIETY 2705 EASTON STREET, WASHINGTON DC 20031 U.S.A.

বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, ভারতের বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে সুভাষবাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রচারের পথ প্রশস্ততর হোক, এই আমাদের সর্বাঙ্গীণ কামনা।

২৩শে

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

পুরোণো দিল্লীর নেতাজী বাগ সূর্যপ্লাবিত। চতুর্দিকে মলিন পাগড়ী আর ছিন্ন পোষাক পরা মানুষের ভিড়। এরা সবাই বার্দ্ধক্যের কবলে। '৪৪ সালে এরা ছিলেন জোয়ান পাট্‌কা বীর সৈনিক; চরকা-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা ঘিরে এরা মণিপুরে যুদ্ধ করেছে। এদের রণধ্বনি ছিল জয়হিন্দ্‌। সর্বাধিনায়ক নেতাজী, লক্ষ্য দিল্লীর লালকেল্লা। এদের সবাই ভারতে পৌঁছেছিলেন;—বন্দী হিসেবে; এদের অধিনায়করা লাল কেল্লায় দাঁড়িয়েছিলেন,—আসামী হিসেবে। তবু এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এল জয়। নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীতে বিদ্রোহ। ইংরেজ, কংগ্রেস ও লীগ নেতারা ভীত; যদি পদাতিক বাহিনী এই—"মহাবরষার রাঙা জলে" নামে!

ঘড়ি ঘণ্টা ধরে ১২টায় এক অতিবৃদ্ধ সৈনিককে আনা হল চরখা-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকার দণ্ডটার গোড়ায়। এই পতাকাটী একদিন পালেল-তামুতে উড়েছিল; আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন তালওয়ার পতাকাটী মুড়ে গোপনে উর্দির ভেতর জড়িয়ে ভারতে আনেন। বৃদ্ধ সৈনিকটী পতাকা তুল্লেন; সঙ্গে সঙ্গে একরাশ গাঁদা ফুল ঝরে পড়ল, এক ঝাঁক গ্যাস ভরা বেলুন আকাশে উড়ল। ব্যাণ্ড বাজল "জন গণ মন"। বৃদ্ধ সৈনিকরা দাঁড়িয়ে স্যালিউট করলেন। সবার দৃষ্টি সুরকী রঙের বিশ ফুট উঁচু পাথরের বেদীর ওপর নেতাজীর প্রতিমূর্তির দিকে; মূর্তিটির তিন দিকে তিনজন সৈনিক। নেতাজীর বাঁ হাতের অনামিকা ২০০ গজ দূরে লালকেল্লার দিকে নির্দেশিত।

* * *

নেতাজীর মূল কথা ছিল ভারতে স্বাধীনতা যে ভারত কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অবধি, বেলুচিস্তান থেকে সৈদিয়া অবধি। এই ধারণার বিরুদ্ধে যা কিছু তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। যেজন্যে তিনি জিন্নার ১৪ দফা মেনে নিয়ে গান্ধীজীকে বলেছিলেন, "১৪ দফা মেনে নিন, না হলে পাকিস্তান মেনে নিতে হবে।"

* * *

নেহেরু একটা অসত্য প্রচার করতেন যাতে তিনি কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, লীগ নেতা, ইংরেজের এবং তাঁর পোষা সাপ মেননের সহায়তা পেয়েছিলেন। সেটা হল নেতাজীর জোর জাপানীর জোর। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি বা লেখেন নি। তিনি যে নিজে ইংরেজ-আমেরিকান সৈন্যের ও সরকারের জোরে নেতাজী-বিরোধী বিবৃতি দিতেন সেটা বলেন নি। তাঁর চূড়ান্ত অশোভন ব্যবহার ব্রিটিশ সূত্রে নেতাজীর "মৃত্যু সংবাদ" আগাম নেয়ে আসামে, ১৯৪৫-এর আগষ্টে নেতাজী-বিরোধী বক্তৃতা। এ যেন ভীম হস্তে গদার প্রবেশ। আজ বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসেবে গান্ধী ও নেহেরু বেঁচে। নিজের কৃতিত্বে জীবন্ত নেতাজী। শানওয়াজ কমিশন, খোসলা কমিশান, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ও ভারত সরকারের চক্রান্ত ভেদ করে নামটা পৌনঃপৌনিক

ভূমিকম্পের মতন বারবার ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হচ্ছে। "কানাদানবের মানা দেওয়া দ্বার, আজ সব গেল টুটে।"

* * *

বৈকালে লালকেল্লার দেওয়ানী-আমে আলাদা নেতাজী-দিবস উদ্‌যাপিত হল। উপরাষ্ট্রপতি যাত্তি ও মন্ত্রী জগজীবন রাম এলেন। রাষ্ট্রপতি রেড্ডি, প্রধানমন্ত্রী দেশাই বা বিরোধী দলের নেত্রী ইন্দিরাজী আসেন নি।

* * *

সভার পেছনে এক পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ সৈনিক মাঝে মাঝে চীৎকার করছিল, "নেতাজী জিন্দা হায়।" আমি ফিস্‌ফিস্ করে দাদাকে প্রশ্ন করলুম, "লোকটা কে?" দাদা নির্লিপ্তভাবে বল্লেন, "বোধ ময়, মেহের আলী।" মনটা ছাঁৎ করে উঠল। শতাব্দীর স্রোত সাঁতরে পাগলটা এল কি করে? কেন?

রাত্তিরে প্রশ্নটা মগজে হুরমুজের মতন ঘা দিতে লাগল। ভদ্রতা ভুলে ক্যাপ্টেন তালওয়ারকে ফোন করলুম। ক্যাপ্টেন বল্লেন, "ও আমারই ব্যাটালিয়ানের সৈনিক। মণিপুরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শেলসক পায়; তারপর আর সম্বিৎ ফিরে পায় নি।"

—নাম কি?

—হাবিলদার মেহের আলী।

With Best Compliments

From :

CENTURY RAYON

(Props : The Century Spg & Mfg. Co. Ltd.)

INDUSTRY HOUSE

159, CHURCHGATE RECLAMATION

BOMBAY-4000 20

With Best Compliments of :

Wallem Shipmanagement Limited

HONGKONG

PART OF THE WALLEM

GROUP OF COMPANIES

SITUATED AT

GAMMON HOUSE

34th—36th FLOORS

HARCOURT ROAD

HONGKONG

SHIPMANAGERS ● SHIPOWNERS ● AVIATION AND TRAVEL ●

OFFSHORE RIGS ● TOWAGE AND SALVAGE

WE SPAN THE GLOBE

অনিল রায় স্মৃতি-বক্তৃতামালা

শনিবার ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৯, সন্ধ্যা ৬ টা বালীগঞ্জ মুরলীধর কলেজ হলে বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায়-এর ২৭-তম স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অনিল রায় স্মৃতি-বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বর্ষের ভাষণ দেন শ্রীপুলকেশ দে সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার।

শ্রীপুলকেশ দে সরকার লিখিতভাব "অনিলচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা" শীর্ষক সুদীর্ঘ আলোচনা পাঠ করেন। শ্রী দে সরকার অনিলচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার বিশ্লেষণ করে তার গভীরে প্রবেশ করে বলেছেন : "বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের লেখা বিশ্লেষণাত্মক। উল্টে-দেওয়া হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্‌-নির্ভর মার্ক্সবাদকে প্রতিশব্দে যাচাই ক'রে ক'রে পড়েছেন এবং কোন মৌলিকতার ঝোঁকে প্রলুব্ধ না হ'য়ে বিশ্বের সমগ্র দর্শনের কষ্টিপাথর দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। প্রত্যয়িত করেছেন"। পুলকেশবাবুর নিবন্ধটি জয়শ্রীর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সভাপতি অধ্যাপক মজুমদার তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেছেন : একের সঙ্গে বহু, বহুর সঙ্গে এক ; এই সমন্বয়বাদই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের ভাবধারা। এই ধারায়ই সুভাষচন্দ্র ও অনিল রায় অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন। মার্ক্সবাদ সমাজকে রোমাঞ্চিত করেছে কিন্তু মাটির ওপর দাঁড়ায় নি। রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'গাছ যখন গগনচুম্বী হয় তখনই সে মাটি থেকে প্রচুর রস আহরণ করতে পারে।' আজকের তরুণরা ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে উদাসীন। "Adwaita must become practical and poetic in every day life।" দর্শন চর্চা নয়, চর্যা। আচরণে গ্রহণ করা যায়, জীবনকে উদ্দীপ্ত করা যায়। সমাজের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ, পরিবেশ নয়। পরিবর্তন ও বিলুপ্তিও এক নয়। অনিলচন্দ্র বলেছেন। অনিল রায় রচিত দীপালী সঙ্ঘের বিখ্যাত সঙ্গীত 'জ্বেলে দাও আলো…' উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুস্মি সেনগুপ্তা, শ্রীমতী দীপিতা রায়, শ্রীমতী শর্মি দাসগুপ্তা ; রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী কুমার।

জ্যোৎস্নাময় সরকার

১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৯, সাতষট্টি বছর বয়সে বিপ্লবী জ্যোৎস্নাময় সরকার লোকান্তরিত হয়েছেন। জ্যোৎস্নাময় ঢাকা শহরের গেণ্ডারিয়ার প্রসিদ্ধ সরকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা, ঢাকা ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ৺সতীশচন্দ্র সরকার। বিশ দশকে ক'লকাতায় ছাত্রজীবনে জ্যোৎস্নাময় বিপ্লবী দল শ্রীসঙ্ঘে যোগ দেন এবং সেদিনকার ছাত্রনেতা বিপ্লবী রেবতী বর্মন, অতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং 'বেণু' পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সময় রেবতী বর্মনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহায়ক ছিলেন। জ্যোৎস্নাময় শ্রীসঙ্ঘের অন্যতম বিপ্লবী নেতা বীরেন্দ্র পোদ্দারের খুবই আস্থাভাজন ছিলেন এবং গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে গেছেন। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর-এ বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদলের কর্মীদের সঙ্গে শ্রীসঙ্ঘ-এর কর্মীরাও যোগ দেন। জ্যোৎস্নাময় মেজর সত্য গুপ্তের নেতৃত্বে পরিচালিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর-এর বি-কোম্পানীর ভলান্টিয়ার ছিলেন। জ্যোৎস্নাময় ত্রিশ দশকে বন্দীশালায় আটক ও অন্তরীণ থাকার পর মুক্ত হন। আমাদের এই লোকান্তরিত সতীর্থের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সর্বান্তঃকরণের সমবেদনা জানাচ্ছি।

হরিদাস সেন

আমাদের অপর এক সতীর্থ, বিপ্লবী হরিদাস সেন ৬৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ছাত্রাবস্থায় ঢাকার উয়ারী-পল্লীতে বাস করা কালীন হরিদাস সেন শ্রীসঙ্ঘ-এর তরুণ নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন এবং সমবয়সীদের উপর অল্পসময়ের মধ্যেই বিপ্লবী সংগঠনের প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯২৯-এ শ্রীসঙ্ঘের দ্বিধাবিভক্তির পর 'বি, ভি,' গঠিত হ'লে তিনি 'বি ভি' দলে যোগ দেন। আমরা এই লোকান্তরিত সতীর্থের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

Space
Donated
by :

A
WELL-WISHER

২০৯, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, এড্‌ভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	২০ ০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১২ ০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২ ৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১ ৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

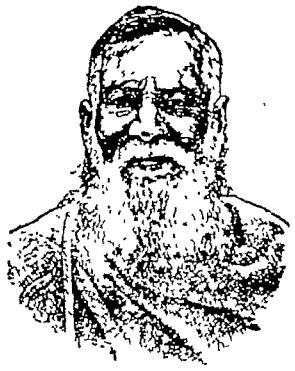

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

JAYASREE : Estd. 1931 : POUSH 1385 : JANUARY Reg. No. WB/SC-18

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

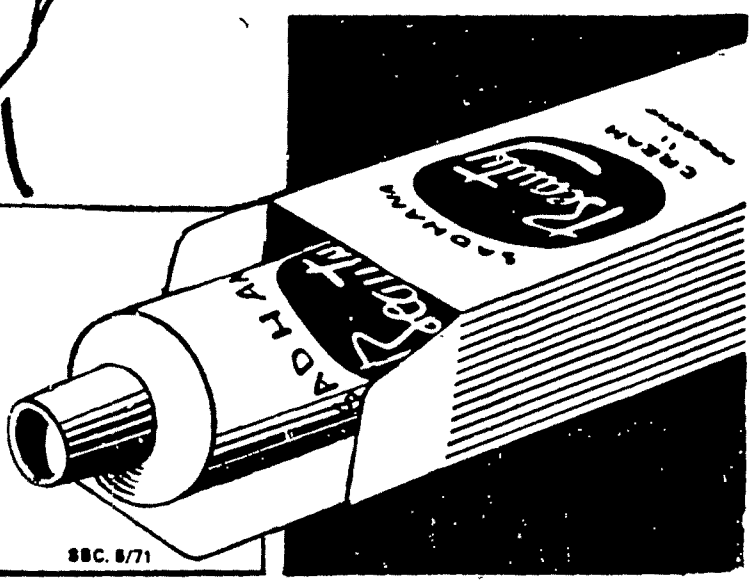

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 8/71

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 4·00 with Regd. Postage Rs. 7·00 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

মাঘ সংখ্যা ঃ ১৩৮৫

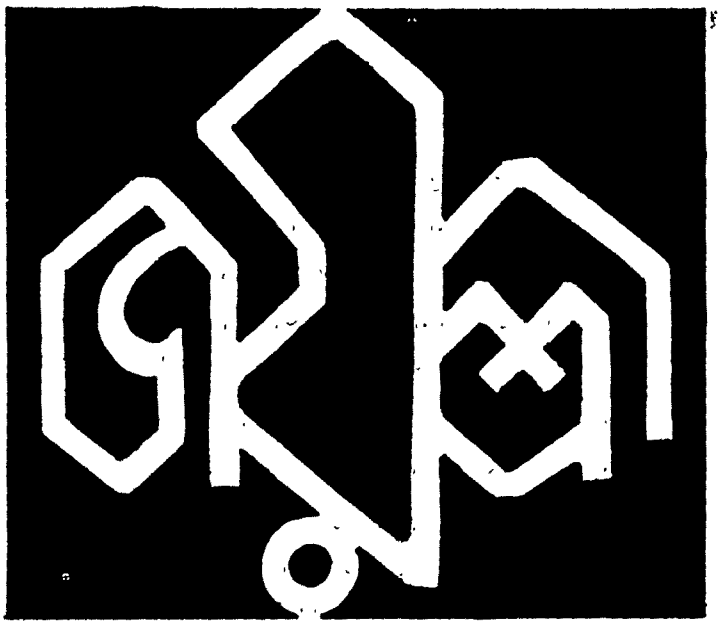

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

লীলা রায়

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠছে এই খণ্ডগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশ-নায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার সদম্ভ জবাব বাংলায় ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। যাঁরা আজও গ্রাহক হননি তাঁরা এককালীন ১২০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন।

'সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা—বিশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁহার অভিভাষণ প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সাগ্রামের প্রধান সেনাপতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য 'জয়শ্রী প্রকাশন' ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

'বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়—তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একসূত্রে গাঁথা। সত্যরঞ্জন বক্সী

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী

সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ মাঘ। ১৩৮৫ দশম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ঝড়-তুফান ৬০৫

স্মৃতিকথা ঃ ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ৬১৩

গোপাললাল সান্যাল

স্মারক-বক্তৃতা

অনিলচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ৬১৮

পুলকেশ দে সরকার

সেমিনার

বাংলায় সুভাষ-চর্চা ৬৩৩

পবিত্রকুমার ঘোষ

আলোচনা

আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী ও স্বাধীনতা ৬৩৯

ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

প্রচ্ছদ ঃ খালেদ চৌধুরী

সম্পাদক ঃ সুনীল দাস

জয়শ্রী

৪৪ তম বার্ষিক সংখ্যা

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ষাট দশক থেকে
ছোটগল্পের গতি-প্রকৃতির আলোচনা-সমৃদ্ধ প্রবন্ধসমূহ
এবারকার বার্ষিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। বিস্তারিত বিবরণ
ফাল্গুন সংখ্যায় থাকবে।

মে মাসে প্রকাশিত হবে

প্রতি সংখ্যা চার টাকা।

'জয়শ্রী কার্যালয়'

২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬।

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

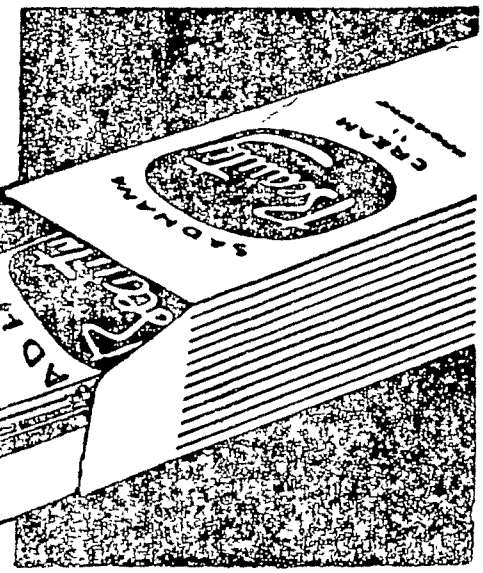

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC 5/71

জয়শ্রী

৪৩ বর্ষ। মাঘ। দশম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ঝড়-তুফান

ইরানের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধূমায়িত জন-বিক্ষোভ বংসারাধিকাল রেজা শাহ্ পল্‌হবীর বজ্র-কঠিন অত্যাচারের অবসানের জন্য সংগ্রাম ক'রে অতঃপর বৈপ্লবিক সাফল্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৭৮-এ আফগানিস্থানের বিপ্লবে দাউদের শাসনকে সশস্ত্র সংঘাতে অপসারণ ক'রে তারাকীর সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আফগানিস্থানের নিহত শাসক দাউদও অতর্কিত বিদ্রোহে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে আফগানিস্থানের শাসনভার করায়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু দাউদ-সরকার প্রতিবেশী পরাক্রান্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট শাসকদের প্রভাবকে অস্বীকার ক'রে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত থাকায় এই অঞ্চলে সোভিয়েত রুশের প্রভাব বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক ক'রবার উদ্দেশ্যে মহম্মদ তারাকীর ডাক পড়েছিলো। মহম্মদ তারাকীও সম্প্রতি আফগানিস্থানের শীর্ষস্থানের অধিকার ছেড়ে ক্ষমতার আর এক হুস্ব-শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তারাকীর পদ বদল, ক্ষমতার অবরোহণ, বা ভবিষ্যতের অন্য কোনো দায়িত্বে নিযুক্তির প্রথম পদক্ষেপ কিনা তা সুস্পষ্টভাবে বলা মুস্কিল। তবে কালাতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে চীন-ভিয়েৎনাম এবং ভিয়েৎনাম-কাম্পুচিয়া সংঘাত যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঝড় তুফানের আবর্ত সৃষ্টি করেছে, তেমনি পশ্চিম এশিয়ায় আফগানিস্থানের বিপ্লব, ইরানের দীর্ঘ বছর ব্যাপী সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ইরানীয় বিপ্লবের বিভিন্ন-পর্যায়ে উত্তরণ, আরব-ইসরাইল সংঘাতের মধ্যে মিশর-ইসরাইল বোঝাপড়ার ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তারই চারপাশে নূতন এক ভয়ঙ্কর আবর্তের ইশারা, পাকিস্থানে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থৈর্য এবং সর্বশেষে চীন-সোভিয়েত সংঘাতে ক্রমবর্ধমান উত্তাপ সমগ্র এশিয়ায় ঝড়-তুফানের প্রলয়ঙ্কর আলোড়নকে নিকট-ভবিষ্যতের বাস্তবময়তায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

গোটা ১৯৭৮ সাল শাহ্‌কে দুরন্ত বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শাহ্-র ৪,৩০,০০০ বাছাই করা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী, তার ব্যক্তিগত 'অমর বাহিনী' তার গোয়েন্দাবাহিনী সাভাক্ (SAVAK), উপকথার মত তার বিপুল ধনসম্পদ, মার্কিণ শাসকদের ঢালাও সহযোগিতা, পশ্চিমী ঢং-এ ইরানের সামাজিক জীবনের প্রবর্তনে তার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, সোভিয়েত রুশের আণবিক অস্ত্রসম্ভাবের গোপন পরীক্ষা-নিরীক্ষা গোপনে অনুসরণের জন্য মার্কিনী রাষ্ট্রকে ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে গোপনে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগ দান—এই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা ইরানের পলহ্‌বী বংশের রাজাকে ৩৭ বছর রাজত্ব করবার পরও ইরানীয় বিপ্লবের সংঘাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হ'লো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইরানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইরানের অফুরন্ত তৈল সম্পদ জাতীয়করণ নিয়ে বিরোধ বাধলে রেজা শাহ্ দেশত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৫৩ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাহায্য নিয়ে রেজা শাহ্ ইরানে প্রত্যাবর্তন করে ; বলাই বাহুল্য মোসাদ্দেকের চূড়ান্তভাবে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। সাইত্রিশ বছর বাদে আবার চাকা ঘুরলো। ১৯৭৮-এর শেষার্ধে তেল-শিল্পে এবং অন্যান্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্মঘটের ফলে ইরানের অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে, আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অরাজকতা দেখা দেয়। বলতে গেলে ছয়মাস প্রায় কোনো আইনের বন্ধনই দেশে রয়েছে বলে মনে করার কারণ ছিল না। ইরানের সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ শিয়া মুসলিম। সীমান্তের কুর্দ উপজাতি, যাদের জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। এ-ছাড়া আর্মেনীয় ও ইহুদীরা রয়েছেন। বাহাই সম্প্রদায়ের এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে মাত্রাহীন জনবিক্ষোভের কারণ এরা বেশীর ভাগ সরকারী কাজ এবং গোয়েন্দা বাহিনী 'সাভাক'-এর পদগুলি দখল ক'রে ছিল। সুতরাং শাহ্-এর পশ্চিমী ঢং-এর সামাজিক জীবন প্রবর্তনের এবং তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরান অধিবাসী শিয়াদের ধৈর্যহারা-বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কী! ১৯৭৮-এর ১১ই ডিসেম্বর উত্তাল শাহ্-বিরোধী মিছিল তেহেরাণের রাজপথ দিয়ে শাহ্ এর বুক কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। শাহ্-এর বুঝতে বাকী রইলো না, ইরান থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে—হয়তো চিরকালের জন্য। শাহ্-এর সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্রও সমঝে নিলো, শাহ্কে দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় তাদের ঘাঁটি আর আগ্লানো যাবে না। সেজন্য নূতন মানুষ, নূতন ব্যবস্থার অবিলম্বে সন্ধান চাই। পনের বছর যাবৎ ইরান থেকে নির্বাসিত আটাত্তর বছরের ধর্মীয় শিয়া নেতা আয়াতুল্লা রোহুল্লা খৈইমিনি প্যারিস থেকে ইরানীয় বিপ্লবকে পথনির্দেশের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ক্রমে তিনি এই বিপ্লবের অবিসম্বাদী নেতা হয়ে উঠলেন। একবিংশ শতাব্দীর উপান্তে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত রুশের সমীপবর্তী এবং শাহ্-এর পশ্চিমী জীবনদর্শনে পরিপুষ্ট ইরানের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব, ধর্মীয় বিপ্লবের দিকে মোড় নেবে, সে-ও এক পরম বিস্ময়! সে-সময় ইরানের জনমানসে শাহ্-এর বিরুদ্ধে ধিক্কার ও, ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। মার্কিনী নিয়ন্ত্রণে ইরান পরিচালিত হবে এও তাদের কাছে এক অসহনীয় ঘটনা। তাই তাদের সম্মুখে অগ্রাধিকার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শাহ্-বিতাড়ন সমস্যা। যত শীঘ্র শাহ্-এর শাসন থেকে ইরানকে মুক্ত করা যায়—সেদিকেই ইরানীয় বিপ্লবের লক্ষ্য। এবং এই কর্মসাধনে আয়াতুল্লা খৈইমিনির নেতৃত্ব ইরানীয় বিপ্লবীরা অপরিহার্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং এই ধর্মীয় বিপ্লবী নেতা ইরানীয় বিপ্লবকে যখন যে নির্দেশ দিচ্ছেন, নির্বিচারে বিপ্লবীরা তা মেনে নিয়ে সে-ভাবেই পথ চলবার জন্য তৈরী হয়েছেন।

শাহ্-এর-ও শেষ চেষ্টা চলেছে ক্ষমতায় টিঁকে থাকা যায় কিনা ; অন্ততপক্ষে নামেমাত্র শাসনকর্তারূপে, সাংবিধানিক শাসক-রাজারূপে—যেমন রয়েছেন ইংল্যাণ্ডের রাণী-শাসক। সুতরাং শাহ্ দুই মাসের সামরিক প্রশাসন বাতিল করে বেসামরিক প্রশাসনে প্রত্যাবর্তন করে সাপুর বক্তিয়ারকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করলেন। ৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ সাপুর বক্তিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে বেসামরিক মন্ত্রীসভা গঠন করে নানা প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন তার মধ্যে ইসরাইল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে তেল সরবরাহ বন্ধের উল্লেখ অন্যতম।

ইসরাইল তার প্রয়োজনের শতকরা ৬০ ভাগ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা শতকরা ৯০ ভাগ তেল ইরানের তেল-সরবরাহ থেকে কিনে থাকে। সাপুর, বিরোধী ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। তার এই নিয়োগকে ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের নেতা সঞ্জাবী ধিক্কার দেন এবং আয়াতুল্লা খৈইমিনি সাপুর-সরকারকে 'বেইআইনী' ছাপ দিয়ে চিহ্নিত করেন। সেই দিনই পবিত্র শহর কোম্-এ এক লক্ষ লোক পদযাত্রা ক'রে শাহ্-এর ইরানের শাসনক্ষমতা ত্যাগ ও সেখানে ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। সাপুর পঞ্চাশ দশকে মোসাদ্দেকের শাসনের সময় কিছুকাল মন্ত্রী ছিলেন। গত পঁচিশ বছর সাপুর কোনো মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব বহন করেন নাই। বক্তিয়ার সরকার গঠনের ফলে ৬২ দিন পর ইরানে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তেল খনিগুলিতে পেট্রোলিয়াম সংগ্রহের কাজও সুরু হয় এবং ইরানেব বিমানকর্মীরাও কাজে যোগ দেন।

কিন্তু ১৬ই জানুয়ারী ১৯৭৯ শাহ্কে সপরিবারে ইরান থেকে বিদায় নিতে হোলো। শাহ্ মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের অতিথি হয়ে আসোয়ান বাঁধ এলাকায় সরকারী অতিথিশালায় কয়েকদিন বাস করে রাজা হাসানের অতিথি হয়ে মরোক্কোয় চলে যান। শাহ্-এর বিদায়ে আয়াতুল্লা খৈইমিনি ইরানীয় অধিবাসীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন পঞ্চাশ বছরের পলহ্বী-শাসন অবসানের এটা প্রথম পদক্ষেপ। সেই একই সময়ে তিনি ইরানে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্পও ঘোষণা করলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যে তিনি অস্থায়ী সরকার গঠন করবেন এবং রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য একটি ঐশ্লামিক বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেছেন—খৈইমিনি এই প্রসঙ্গে সে-তথ্যও পরিবেশন করলেন। আয়াতুল্লা খৈইমিনির সঙ্গে সাপুর বক্তিয়ার রফা করবার চেষ্টা করেছিলেন। আয়াতুল্লার তেহেরানে প্রত্যাবর্তনের পথে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য তেহেরান বিমান বন্দর ইরানীয় সেনা-বাহিনী ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৯-এ বন্ধ করে দেয়। ইরানীয় বিমান-বাহিনীর নাবিকরা অবশ্য ইরানীয় সামরিক বাহিনীর কর্তৃপক্ষের উপর আয়াতুল্লার দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট বিমানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার দায় চাপিয়ে দেয়। আয়াতুল্লার ফেরার দিন স্থির ছিল ২৬শে জানুয়ারী। অপর এক আয়াতুল্লা তেলেধানী বল্লেন সাপুরের 'বেআইনী' সরকার আয়াতুল্লা খৈমিনির প্রত্যাবর্তন চায় না, তাই তারা নানা বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। ইরানের বিমান-চালকরা দুই মাস যাবৎ ধর্মঘট করছিলেন আয়াতুল্লার প্রত্যাবর্তনে সহায়তার উদ্দেশ্যে তাদের বিমান-বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

ইসলামিক রিপাবলিক গঠনের বিরুদ্ধে ঘোষণায় সাপুর বলেন 'সংবিধানকে অস্বীকার করা চলবে না। এদিকে শাহ্-এর বাছাই করা হাজার সেনাবাহিনী দিয়ে শাহ্-এর সপক্ষে মহড়া দেওয়া হলো। সাপুরের সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করলেন; সংবিধান-বিরোধী কোনো কাজ বরদাস্ত করা হবেনা। এরকম কিছু করা হ'লে, রক্তগঙ্গা বইবে। সাপুর বক্তিয়ারের হুমকিতে আয়াতুল্লা খোলাখুলি উত্তর দিয়ে বল্লেন: 'যদি রক্তপাতই হয়, দেশের জন্য আমিই প্রথম রক্ত দিতে চাই'···। আমি সশস্ত্র সংগ্রাম এখনই চাইনা। প্রয়োজন হলে সেজন্য ডাক দেবো।' এদিকে বক্তিয়ারের গোপন অনুরোধ আয়াতুল্লার কাছে: 'অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য আপনার ইরান প্রত্যাবর্তন পিছিয়ে দিন।' সাপুর বক্তিয়ার প্যারিসে গিয়ে খৈইমিনির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরী হ'লে আয়াতুল্লা তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করে ২৮শে জানুয়ারী প্যারিসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন: 'পদচ্যুত শাহ্ বেইআইনী ছিল, বর্তমান পার্লামেণ্ট এবং

বক্তিয়ার সরকারও বেআইনী'। সুতরাং বক্তিয়ারের প্যারিসে যাওয়া বাতিল হলো। শেষ পর্যন্ত বক্তিয়ার সরকারের ক্যাবিনেট '৩০ শে জানুয়ারী আয়াতুল্লার পনের বছর নির্বাসনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে সম্মতি দেয়। খৈইমিনি শাহ্-এর সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বিনাশের এবং ইস্লামিক রিপাবলিক পত্তনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশে ফিরবেন। এদিকে ইরানীয় বিদ্রোহ সুরু হবার পর ২৮শে জানুয়ারী তারিখে তেহেরাণে সরকার-বিরোধী দাঙ্গায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ২২ জন নিহত, শত শত লোক আহত হয়ে ঐ দিনটিকে তেহেরাণের অন্যতম প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী দিবসরূপে চিহ্নিত করে দেয়। আর সেই ৩০শে জানুয়ারীতেই তেহেরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে শত শত মোল্লা অবস্থান ধর্মঘট করে তাদের নেতা আয়াতুল্লা খৈমিনির অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দাবী জানাচ্ছেন। মোল্লাতন্ত্রের সঙ্গে রাজনীতির এই অপূর্ব যোগাযোগ ইরানের ইসলামিক বিপ্লবকে এক অভূতপূর্ব স্বকীয়তা দান করেছে।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ আয়াতুল্লা ১৫ বছর নির্বাসনের পর বিপুল উৎসাহের মধ্যে তেহরাণে ফিরে এসে ইরানের ওপর মার্কিণী খবরদারী উৎসাদনের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। সাপুর বক্তিয়ার নানাভাবে আয়াতুল্লার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ খুঁজলেও একমাত্র বক্তিয়ারের পদত্যাগের সর্তে আয়াতুল্লা তার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হন। ৫ই ফেব্রুয়ারী আয়াতুল্লা মেহেদি বাজারগানকে ইরানের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করে বিপ্লবী সরকার গঠনের উদ্যোগ করলেন। বাজারগান তেলখনির নামী ইঞ্জিনিয়ার এবং নিষ্ঠাবান শিয়া মুসলমান। বাজারগান গোঁড়া ধর্মীয় নন, অনেকটা উদারপন্থী। তবে ঐস্লামিক রিপাবলিক গঠনে আয়াতুল্লার মতই প্রতিশ্রুত। এ-সম্পর্কে বাজারগান সরকার জনমত বা রেফারেণ্ডাম নেবেন। তারপর সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠন করবেন এবং নূতন সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নূতন সরকার গঠিত হবে।

কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিকের অন্যান্য সর্তগুলি কী? তা নিয়ে মতভেদ আছে। আয়াতুল্লা খৈমিনি ইরানের মহিলাদের জন্য আবু বা 'চাদর' প্রবর্তনের সুপারিশ করলে সেই বিধানের বিরুদ্ধে ইরানের মহিলারা তেহেরাণের রাজপথে বিক্ষোভ-মিছিল পরিচালনা ক'রে তাদের স্বাধীনতা খর্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। গোঁড়া ধর্মীয় ভাবাপন্নদের হাতে মহিলারা লাঞ্ছিত হ'লে আয়াতুল্লা মহিলাদের আক্রমণকারীদের তীব্র তিরস্কারে দহন করেন। সাপুর বক্তিয়ারের সঙ্গে খৈমিনির অনুগামীদের বিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বক্তিয়ারের জিজ্ঞাস্য : 'ইসলামিক রিপাবলিক কি? কোনো বইতে এ-সম্বন্ধে কিছু দেখি নাই'। বক্তিয়ার পরিষদীয় গণতন্ত্র বোঝেন, শাহ্-এর স্বৈরাচার কিম্বা লিবিয়া ও পাকিস্থানের ইসলামিক রিপাবলিক-এর পথ তার নয়। কিন্তু খৈমিনি তেহেরাণে এসে পৌছাবার পর থেকেই পথে পথে বক্তিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বক্তিয়ার সরকারের দপ্তরের কর্মচারীদের অবস্থান ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ করে। এ-সব বিক্ষোভের লক্ষ্য একটিই : খৈমিনির সমর্থন ও বক্তিয়ার সরকারের পতন। শাহ্-এর সমর্থকরা বৃথাই ৭ই ফেব্রুয়ারী তেহেরাণে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ন্যাশনাল ইউনিটি ফ্রন্ট গঠন করলেন। আর এদিকে শহরে শহরে মিউনিসিপ্যাল কমিটির পরিচালনার দায়িত্ব খৈমিনির সমর্থকদল হাতে তুলে নিলেন, তেহেরানের বিভিন্ন সড়কে ইসলামিক পুলিশ নামধারী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সড়ক পরিবহন নিয়ন্ত্রণ এবং

আইন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে এলো। এরই মধ্যে বেসামরিক প্রশাসক ও সামরিক-বাহিনীর অধিনায়করা খৈমিনির দলে যোগদান শুরু করে দিয়েছেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী খৈইমিনির 'দর্শন দরবারে' শাহ্-এর শীর্ষ-বাছাই 'অমর ব্রিগেড'-এর সদস্যদের দেখা গেছে। ইরানীয় 'ইসলামিক বিপ্লব' দ্রুত সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তারই প্রতীক্ স্বরূপ ৬ই ফেব্রুয়ারী ইরানের দ্বিতীয় পবিত্র শহর 'কোম্-,' ইসলামিক রিপাবলিক-এর সকল লক্ষণগুলি আয়ত্ব করে ক্ষুদ্রাকৃতি ইসলামিক রিপাবলিকের প্রকৃতি গ্রহণ করেছে। আয়াতুল্লার সপক্ষে ৮ই ফেব্রুয়ারীর মিছিলে প্রায় একহাজার বিমান সেনা ও সেনাবাহিনীর যোগদান বক্তিয়ারের দিন ঘনিয়ে আনলো।

চূড়ান্ত পর্যায় উপস্থিত হল ইরানীয় বিমান-বাহিনীর ব্যাপক বিদ্রোহে। ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী তেহেরাণের এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইরানীয় শহরের পথে পথে সশস্ত্র খৈমিনি-সমর্থকদের পাশাপাশি বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ইরানীয় রাজকীয় সেনাবাহিনীর সর্বোত্তম অংশের প্রচণ্ড রক্তাক্ত সংগ্রামে ইরানীয় বিপ্লব চূড়ান্ত পরিণতি পেলো। বহু সামরিক এবং বেসামরিক ইরানীয় হতাহত হবার পর দুরন্ত বৈপ্লবিক সংঘাতের মধ্যে ১১ই ফেব্রুয়ারী, বেলা ২টায় শাহ্-এর প্রায় সাড়ে চার লক্ষ দুর্ধর্ষ রাজকীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, 'সেনাবাহিনীর কমাণ্ডারগণ সকাল ১০টা ২০ মিনিটে সমবেত হয়ে অধিকতর অরাজকতা এবং রক্তমোক্ষণ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে দেশের বর্তমান আভ্যন্তরীণ সংঘাতে সেনাবাহিনী তাদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করছে। সুতরাং, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

'সেনাবাহিনী নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছে।'

১১ই ফেব্রুয়ারী পাঁচটি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি থেকে জনসাধারণ ৭৫,০০০ রাইফেল, মেসিনগান, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী অস্ত্র লুঠ করে নিয়ে যায়। ইরানে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর, ইরানীয় সেনাবাহিনী শস্ত্রসংঘাত থেকে বিরতি ঘোষণা করলে, খৈমিনি এই লুণ্ঠিত অস্ত্র জমা দেবার আবেদন জানালে, তা দ্রুত জমা পড়তে লাগলো। ইরানীয় বিপ্লবের জনক আয়াতুল্লা খৈমিনি জনসাধারণের আস্থা, শ্রদ্ধা, আশা আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

সাপুর বক্তিয়ার সেনাবাহিনীর সমর্থন হারিয়ে পদত্যাগ ও আত্মগোপন করলেন। তিনদিন গৃহযুদ্ধের পর ১২ই ফেব্রুয়ারী রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিলোপ এবং ইসলামিক বিপ্লবী পরিষদের (Revolutionary-Council) ক্ষমতা গ্রহণ সম্ভব হোলো। কিন্তু বাজারগান সরকার ও বিপ্লবী পরিষদগুলির মধ্যে বিরোধও অনতিবিলম্বে দেখা দিল। অভিযোগ উঠলো বাজারগান সরকারের অজান্তে, গ্রেপ্তার, বিচার, কারাদণ্ড কিম্বা প্রাণদণ্ড এবং অব্যবহিত পরেই ঘাতকের হাতে ত্বরিত-মৃত্যুর বিধান কার্যকরী করা হচ্ছে। এই বিপ্লবী কমিটিগুলি লুপ্ত ক'রে বাজারগান সরকারের হাতে সর্বময় ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হলে ইরানীয় বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মত আত্মঘাতী পথে অগ্রসর হতে পারে।

আয়াতুল্লার নূতন বাসস্থান কোম্ শহরে বিপ্লবী-পরিষদ বিপ্লবী পদ্ধতিতে বিচার সুরু ক'রে শাহ্-এর আমলের বহু সেনাধ্যক্ষদের, ঘৃণিত গোয়েন্দা বাহিনী 'সাভাক'-এর ('SAVAK') ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের, পুলিশ বাহিনীর কর্তৃপক্ষদের, শাহ্-এর সমর্থক রাজনীতি-বিদদের পাইকারী হারে গ্রেপ্তার ও গোপন ত্বরিত-বিচারের পর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন;

শাহ্-এর প্রাসাদসমূহ, বিষয়সম্পত্তি সবই বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন এবং বিচারের জন্য শাহ্‌কে ইরানের নূতন বিপ্লবী সরকারের হাতে সমর্পণ করতে মরোক্কোর রাজার কাছে দাবীও জানানো হয়। মরোক্কোর রাজা হাসান সেই দাবী অগ্রাহ্য করে বলেন তার দেশের সঙ্গে অন্য কোনো দেশের আশ্রিতকে বহিষ্কারের চুক্তি নাই। কিন্তু এই বিচার ও প্রাণদণ্ড নিয়ে বিরোধ বাধে বাজারগান সরকারের সঙ্গে খৈমিনির স্বীকৃত বিপ্লবী-পরিষদগুলির সঙ্গে—ইসলামিক রিভলিউসনারী কমিটিগুলির সঙ্গে। বাজারগান প্রকাশ্যেই এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। পনেরটি বিপ্লবী পরিষদের সঙ্গে বাজারগান সরকারের বোঝাপড়া কিভাবে হয়, কিভাবে অন্যান্য আয়াতুল্লার সঙ্গে খৈমিনির মতভেদের নিষ্পত্তি হয়, তার উপর ইরানীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বাজারগান সরকারের অজান্তে বিপ্লবী-পরিষদ কর্তৃক আইন হাতে তুলে নেবার পদ্ধতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কারণ বিপ্লবী শক্তি যদি কেন্দ্রীভূত না থেকে বিচ্ছিন্ন-কেন্দ্রে বিন্যস্ত হয়ে পড়ে, বহুধা বিভক্তিতে রূপ নিজে ফরাসী বিপ্লবের মত নির্বিচার হত্যা ও নির্বিবেক ধ্বংস ইরানীয় বিপ্লবকে প্রতিবিপ্লবে পথান্তরিত করবে। সে-ক্ষেত্রে দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগে ইরানীয় বিপ্লবের, ফরাসী বিপ্লবের পরিণতির অনুকরণে বোনাপার্টিজ্‌ম এর প্রতিক্রিয়ায় পরিণতি অসম্ভব না-ও হতে পারে। আয়াতুল্লা রোহুল্লা খৈমিনির ইসলামিক বিপ্লব যদি ধর্মীয় প্রভুত্বের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে, যদি ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির সংহতি সাধনের ইসলামমুখী রাষ্ট্রীয় প্রবণতাকে উৎসাহ দেয়, সে-রাষ্ট্রনৈতিক ইসলামী প্রবাহ অনিবার্যভাবে প্রতিহত হবে—বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের বন্দীশালায় আবদ্ধ হবে। ইরানীয় বিপ্লবে ইতিমধ্যেই আয়াতুল্লা খৈমিনির প্রতিপক্ষের দেখা পাওয়া গেছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী ফেদাঈন খালক্ (Fedayeen-C-khalq-People's Warriors) নামধারী মার্ক্সবাদী গেরিলাবাহিনী গোষ্ঠি ইরানীয় বিপ্লবের ত্বরায়ন এবং তাকে অধিকতর বৈপ্লবিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করবার জন্য তেহেরাণে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিলো। আয়াতুল্লা খৈমিনি এই মিছিলের বিরোধিতা ক'রে তার অনুসারীদের এই ধর্মবিরোধী কম্যুনিষ্ট সমাবেশে যোগদানে নিষেধ করেন। সেদিন বিক্ষোভ মিছিলে বিরত থেকে মার্ক্সবাদীরা ২৩শে ফেব্রুয়ারী তেহেরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে পঞ্চাশ হাজার থেকে একলক্ষ লোকের জমায়েত করে ইরানকে দ্রুত একটি শ্রমজীবী রাষ্ট্রে পরিণতির দাবী জানাল। এই বৃহৎ সমাবেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রেরিত কৃষক ও শ্রমিকদের পত্র পড়ে শোনানো হয়।

মার্ক্সবাদী ফেদাঈন গেরিলারা রুশপন্থীরূপে পরিচিত। আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। যদিও আয়াতুল্লা এবং প্রেসিডেন্ট কার্টার সোভিয়েত রুশকে সতর্ক করে দিয়ে ইরানীয় বিপ্লব থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, তা সত্ত্বেও তারা দীর্ঘকাল এই বিপ্লব সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় থাকবে না। তখন এক নূতন পরিস্থিতি দেখা দিবে। সুতরাং এই শক্তি ইসলামিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। ইসলাম ও বিপ্লবের সংহতির প্রচেষ্টায় ইসলাম ও বিপ্লব পৃথক পৃথক পথ গ্রহণ করবে না, ইসলাম ও বিপ্লবের সমন্বয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে সমাজ ও রাষ্ট্রসত্ত্বা গড়ে উঠবে না, ইসলাম ও বিপ্লব একে অপরকে গ্রাস করবে,—জোর ক'রে সে-সম্পর্কে চূড়ান্ত সমাধান না দেওয়া গেলেও এ-কথা সহজেই বলা যায় যে সামাজিক-আর্থিক বৈষম্যের

মীমাংসা না করে কোনো বিপ্লবই স্তব্ধ হতে পারে না। আর যদি তা হয়, তাহলে বুঝতে হবে ইসলামের ধর্মীয় আবেগ বিপ্লবের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ধর্মীয় আবেগকে সংযত করতে সক্ষম হবে মনে হয়। ইরানে বেকার সমস্যা মাত্রাহীন সঙ্কটে পৌঁছেছে। তিনমাসের ধর্মঘটে ইরানীয় অর্থনীতির নাভিশ্বাস উঠেছে। তিনমাস কারখানা বন্ধ ছিল। তেল-উৎপাদনের স্রোত শীর্ণতম প্রবাহে পৌঁছেছিল আর বেসামরিক প্রশাসকরা তো হাত গুটিয়ে বসেছিলো এই দীর্ঘ মাসগুলিতে। ইরানের সমৃদ্ধির মাপ-জোখ ছিল না। একসময় ইরানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সম্পন্নদের হা-হুতাশ ছিল, এতো বিত্ত দিয়ে তারা করবেটা কি? কিন্তু ইরানীয় অর্থনীতির দুর্দিন শাহ্ এর বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের পূর্ব থেকেই আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্ব-আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে, মাত্রাহীন পরিকল্পনায় ব্যয় এবং সামরিক খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়, দুর্নীতি, অপচয়—সব মিলিয়ে এই সঙ্কট। ১৯৭৪-৭৫-এ ইরানের আর্থিক বিবৃদ্ধির হার শতকরা ৪১·৬ থেকে শতকরা ১৯৭৭-৭৮-এ ২·৮-এ নেমে আসে। ১৯৭৮-এর অক্টোবর থেকে তেল-খনির শ্রমিকদের ধর্মঘটে পাঁচশ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। অথচ ইরানের আয়ের শতকরা ৮৭ ভাগ তার তৈল সম্পদ থেকে অর্জিত হয়। এর উপর কয়েকসালের মধ্যেই ইরান সরকার বাধ্য হয় তার তেল-খনির শ্রমিকদের শতকরা ৬০ ভাগ এবং কোনো কোনো স্তরের বেসামরিক প্রশাসনের শতকরা ৬৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধিতে।

বেকারের সংখ্যা এ-বছর (১৯৭৯) জানুয়ারীর শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৩৫ লক্ষেরও বেশী। শতকর ২৫ ভাগ মানুষ এবং ব্যাঙ্কগুলির হাতে কোনো নগদ অর্থ ছিলো না। ব্যাঙ্ক থেকে বহু আমানতকারী টাকা তুলে নিয়েছেন। ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি শ্রমিকদের কিম্বা মালসরবরাহকারীদের পাওনা মেটাতে অক্ষম হ'লো। যন্ত্রাংশের আমদানীর এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের অভাবে শিল্প-সংস্থাগুলি অচল হয়ে গেছে। কারিগরী-দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশীরা এবং ইরানের ব্যবসায়ীরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় অর্থনৈতিক সঙ্কট দৃঢ়মূল হয়েছে। শাহ-এর আমলে নির্বাসিত ৪ লক্ষ কারীগরীদক্ষতা-সম্পন্নদের দেশে ফিরবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। তারা ফিরবেন কিনা, ফিরলে ইসলামী রিপাবলিকের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ। ইরানীয় বিপ্লবের বহুমুখী সঙ্কটের উত্তরণ চাই। তবেই সে-বিপ্লব সার্থক হবে।

ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। ১৯৭৭-এর ৫ই জুলাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জিয়া-উল হকের নেতৃত্বে সামরিক শাসন প্রবর্তন এবং ভুট্টোর গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর পাকিস্তানে সব চাইতে শক্তিশালী রাজনীতিবিদ পরাক্রান্ত ভুট্টোর ক্রমান্বয়ে দিন ফুরিয়ে আসছে। সাতজন সামরিক পদাধিকারীকে ডিঙিয়ে ভুট্টো যাকে সেনাবাহিনীর প্রধানরূপে নিযুক্ত করলেন, সেই জেনারেল জিয়াউল হকের হাতেই ভুট্টোর চরম লাঞ্ছনা ও রাজনৈতিক অস্তাচল সুরু হয়।

১৯৭৪-এ ভুট্টোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আমেদ রাজা কাসুরীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে ভুট্টোর বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে পাকিস্তান সরকার মামলা সুরু করে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ভুট্টোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাসুরীকে হত্যার জন্য ১৯৭৪-এর ১১ই নভেম্বরে অতর্কিতে তিনি গুলিগোলায় আক্রান্ত হন।

কাসুরীর প্রাণরক্ষা পায় কিন্তু ক সুরীর পিতা নিহত হন। ভুট্টোর সৃষ্ট, পাকিস্থান ফেডারেল সিকিউরিটি ফোর্সের প্রধান, মাসুর মহম্মদ রাজসাক্ষী হয়ে এই হত্যার জন্য উপরোক্ত বাহিনীকে ভুট্টো কর্তৃক নিয়োগের স্বীকারোক্তির ফলেই মূলত লাহোর হাইকোর্টের তিন-সদস্যবিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলী ঐক্যমতে ভুট্টোকে এবং ফেডারেল সিকিউরিটি ফোর্সের অপর চারজনকে অভিযুক্ত করে ১৯৭৮-এর ১৮ই মার্চ এই পাঁচজনেরই মৃত্যুদণ্ডের আ দশ দেন। ১৯৭৯-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সমেত ৭-সদস্যবিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলী ৪-৩ ভোটে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন এবং অপর তিনজন তাদের নির্দোষ সাব্যস্ত করে মুক্তি দিতে বলেন। সুপ্রিম কোর্টে ভুট্টোর প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর পাকিস্তানে তোলপাড় শুরু হয়। ভুট্টোর এই দণ্ডাজ্ঞার পর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও অন্যান্য ভুট্টো-সমর্থকদের পক্ষ থেকে প্রবল আন্দোলন সুরু হতে পারে এই আশঙ্কায় শত শত ভুট্টো-সমর্থকদের বন্দী করা হয়েছে। ভুট্টোর স্ত্রী ও কন্যা গৃহবন্দী হয়েছেন। ভুট্টো তার পরিজনদের দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যেন সামরিক শাসকের কাছে তার প্রাণভিক্ষা না চাওয়া হয়। এ-ছাড়া বিভিন্ন-বিদেশের প্রধানগণ, বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, সামরিক শাসকের কাছে ভুট্টোর প্রাণ-ভিক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। ভুট্টোর আইনজীবীদের পক্ষ থেকে এই আদেশ পুনর্মূল্যায়নের জন্য সুনিশ্চিত ভাবে সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করা হবে। তবে তার ফলাফল সম্বন্ধে আইনজীবীদেরই সংশয় রয়ে গেছে। সে-পরিস্থিতিতে ভুট্টোর জীবনের উপর অনিবার্যভাবে যবনিকা নেমে আসবে এবং পাকিস্তানের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে নির্মম হাতে পাকিস্তানের অন্যতম বেসামরিক প্রাক্তন শাসনকর্তা অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন।

'বনফুল'

২৬শে মাঘ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯—ভোরবেলা বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা কথাশিল্পী 'বনফুল' বা ডাঃ বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় অল্প কিছুদিন রোগভোগের পর প্রায় আশি বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। প্রায় শ'খানেক গ্রন্থের লেখক, বনফুল—উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই অবাধে চলাফেরা করে গেছেন। ব্যঙ্গ-কবিতায় তাঁর অদ্ভুত দখল ছিল। এ-ছাড়া প্রবন্ধও তিনি লিখে গেছেন। তাঁর 'হাটে-বাজারে' উপন্যাস রবীন্দ্র-পুরস্কার এনে দেয়। 'হাটে বাজারে', 'ভুবন সোম' ও 'আরোহী' সিনেমার বিষয়বস্তু হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। গ্রামীণ পরিবেশেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাহিত্যের উপাদানরূপে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যায় তাঁর নানা রচনা আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। যাকে আমরা 'মধ্যযুগীয়' মূল্যবোধ বলি বনফুলের রচনায় সে-মূল্যবোধ অনায়াসে আধুনিক মূল্যবোধের সঙ্গে মিশে গেছে। বনফুলের লোকান্তরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের ওপর যবনিকা নেমে এলো।

বহু সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ তার অন্যতম।

আমরা এই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করছি এবং তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

যে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

রাজনৈতিক মামলায়ও এ ব্যবস্থার তারতম্য নেই। রাজদ্রোহের মামলার ক্ষেত্রে পুলিশের আবেদন মেনে নিয়েই সরাসরি শাস্তির আদেশ দান—এই ছিল এতদিনের সাধারণ রীতি।

কিন্তু রক্‌স্‌বার্গের বেলায় তা নয়। তাঁর কাছে শাস্তি দুই বা তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় আসামীকে "বিশেষ শ্রেণীর" গণ্য করে "বিশিষ্ট ব্যবহারের" প্রস্তাব অনুমোদন।

তখনও জেল-কয়েদীদের শ্রেণী-বিভাগ পাকাপাকি-ভাবে হয়নি, সেজন্য রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ চোর-ডাকাতের সঙ্গে একই ওয়ার্ডে রাখার বাধা ছিল না।

কিন্তু রক্‌স্‌বার্গ তা অনুমোদন করেন নি। সাজা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ থাকা খাওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।

এ সম্বন্ধে সাপ্তাহিক আত্মশক্তির বিরুদ্ধে বিখ্যাত মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯২৬।২৭ সালে কলকাতা ও মফঃস্বলের অনেক জেলায় ক্রমান্বয়ে বেশ কিছুদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, খুন-জখম ইত্যাদি হ'তে থাকে। এ দাঙ্গা নিরসনে শাসকদলের ঔদাসীন্য বা অবহেলা, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় দুর্নীতিবাজ গুণ্ডা-বদমাইসকে উৎসাহ দান, বাইরের চোর-ডাকাতদের সহরে আনবার বা আনাবার ব্যবস্থা-সাধন ইত্যাদি নানা অভিযোগ সরকার-পক্ষ, বিশেষতঃ পুলিশ-বিভাগের বিরুদ্ধে করা হয়।

এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে "প্রাথমিক শিক্ষা ও হিন্দু-মুসলমান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দুই অংশে দু' সপ্তাহের আত্মশক্তিতে ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়।

ওতে বলা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার-পক্ষের উস্কানীতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়—একথা স্মরণ রেখে দেশবাসী যদি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একমন একপ্রাণ হয়ে শিক্ষা ও সমাজ-সেবায় আগ্রহী হন তবেই সরকার পক্ষের অপকর্মের সমুচিত জবাব হয়।

প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয় মূলতঃ যাই হোক্, সরকারপক্ষ এতে রাজদ্রোহের গন্ধ পেলেন। রাজ-দ্রোহ অর্থাৎ—"বৃটিশভারতে আইনানুগভাবে গঠিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য সৃষ্টি"।

এ মামলায় বাদীপক্ষের ঐরূপ অভিযোগ থাকলেও বিবাদীপক্ষ স্থির করলেন, সরকারের এই যথেচ্ছ ধর-পাকড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে। এর জন্য 'রাজদ্রোহ'-মূলক অ্যাইনের স্পষ্ট সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পুলিশী মামলা প্রধানতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা সংক্রান্ত। সেজন্য পুলিশের আবেদন ও বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েই মামলা পরি-চালন করা ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট ও আদালতগুলির রীতি। তাই পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে বিশেষতঃ রাজ-দ্রোহের মামলায়—সুবিচারের আশা কম জেনে

বিবাদীপক্ষ আপীল-আবেদনের পরিবর্তে বিচারকের নির্দেশ মেনে নেওয়াই সহজ মনে করতেন।

কিন্তু আত্মশক্তির মামলায় স্থির করা হল, এ নিয়ে লড়াই করতেই হবে। ভারতের আইনবিধির "Govt. established by law" মানে কি, বাঙ্গালায় 'সরকার', 'সরকার-পক্ষ', 'আমলাতন্ত্র', "নায়েবতন্ত্র" কথাগুলি সমার্থবোধক কিনা; তাছাড়া একটি প্রবন্ধ সমগ্রভাবে পাঠে মনে যে ধারণা হয়, বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড খণ্ডভাবে, লাইনের পর লাইন ধরে পাঠে ও অর্থোদ্ধার করলে যদি ভিন্নরূপ ধারণা হয়, তবে কোন্ ধারণাটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের ধারক বা পরিবাহক বলে গণ্য হবে—এসব প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে বিচারকের নির্দেশ না পাওয়া গেলে যদৃচ্ছভাবে পুলিশের গ্রেপ্তার, খানাতল্লাস ইত্যাদি বন্ধ হবে না, স্বাধীন মত-প্রকাশের অধিকার চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে, দেশে স্বৈরাচারের জয় হবে।

এই সব বিবেচনায় আত্মশক্তি পরিচালক ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, এই মামলাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে পরিচালনা করতে হবে। 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার অজুহাতে পুলিশী স্বৈরাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকলে দেশের জনমত প্রকাশের কোনও পথই আর নিষ্কণ্টক থাকবে না।

মামলা সুরু হবে ঐ মিঃ রক্‌স্‌বার্গের এজলাসে।

শোনা যায়, পুলিশ কর্তাদের এ মামলা রুজু করবার প্রস্তাবে প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট আপত্তি করেন। এ সময় টেগার্ট ছুটিতে ছিলেন; তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই অনুগত, গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা মিঃ আর্মষ্ট্রং।

মিঃ রক্‌স্‌বার্গের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেড পরিচালিত দুইখানা পত্রিকা দৈনিক ফরওয়ার্ড ও সাপ্তাহিক আত্মশক্তির বিরুদ্ধে একই সঙ্গে এবং অনুরূপ রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা রুজু করা স্থির হয়।

এর প্রতিবাদে অন্যত্র জেলাজজের পদ গ্রহণ করে মিঃ রক্‌স্‌বার্গ কলকাতা ত্যাগ করেন।

তাঁর পরিবর্তে প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কলকাতায় আসেন নবীন সিভিলিয়ান মিঃ টাইসন।

নির্দিষ্ট দিনে মামলা সুরু হল। সরকার পক্ষের উকীল রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু ও সহকারীবৃন্দ। বিবাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বসু ও প্রভাসচন্দ্র বসু; এডভোকেট সন্তোষকুমার বসু, সুরেশচন্দ্র তালুকদার, সুরেশচন্দ্র রায়, চুনীলাল দত্ত ও আরও অনেকে; এছাড়া মামলা সংক্রান্ত বাদীপক্ষের সকল ব্যবস্থা সাধনের জন্য রইলেন এটর্নী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'রাজদ্রোহ অর্থ কি?' 'সরকার', 'সরকার-পক্ষ', 'আমলাতন্ত্র', 'নায়েবতন্ত্র' কথাগুলি সমার্থবোধক কি না এবং আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত গভর্মেণ্ট সম্বন্ধে ঐ বাক্যগুলি প্রযোজ্য কি না; সর্বশেষ জিজ্ঞাস্য: একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশের অর্থ যদি একরূপ হয় এবং সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠে যদি মনে অন্যরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়, তবে কোন ধারণাটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্যরূপে গ্রাহ্য হবে, বিচ্ছিন্ন অংশগুলির ধারণা, না সমগ্র প্রবন্ধটির বক্তব্য?

দীর্ঘকাল ধরে, দিনের পর দিন, এ মামলা চলতে থাকে। প্রথমে মিঃ টাইসন পরে মিঃ রক্‌স্‌বার্গ নিয়মিত, নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে বসেন, সম্মুখে একটি টাইপরাইটার নিয়ে।

বাদী ও প্রতিবাদী—উভয়পক্ষের উকীল, ব্যারিষ্টার ও সাক্ষীদের বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গে বিচারক নিজেই টক্‌টক্ করে টাইপ করেন।

সাক্ষীরা কেউ সামান্য নন, বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও পণ্ডিতব্যক্তি থেকে সুরু করে সাধারণ পাঠক ও সাংবাদিকদের ডাকা হয়, প্রবন্ধ পাঠে তাঁদের মনে কি ধারণা হয়েছে, সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে কি না, জানবার জন্য।

বাদীপক্ষের সাক্ষী মামুলী—সরকারী বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী, প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদক ইত্যাদি। তাদের বিদ্যাবত্তা, ভাষাজ্ঞান, বিভিন্ন অর্থে একই শব্দপ্রয়োগের কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিবাদীপক্ষের আইনজীবীদের জেরায় নাজেহাল হয়ে সরকারী বিভাগীয় সাক্ষীগণ সভাকক্ষে হাসা-কৌতুকের সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে বিবাদীপক্ষ বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু প্রবীণ অধ্যাপক; এছাড়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেন, আলোচ্য বাক্যগুলি বিভিন্ন অর্থবোধক এবং সমগ্র প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক ত' নয়ই বরং ঠিক বিপরীত। সাময়িক বিপদের সময় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশবাসীকে একতাবদ্ধ হয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করবার আকুল আহ্বান বলেই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য। এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু রাজদ্রোহের মামলায় জ্ঞানী-গুণীদের সাক্ষ্য বা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও সরকারী সিদ্ধান্তের রদবদল করতে পারে না।

রাজদ্রোহের সন্দেহে গ্রেপ্তার, বা মামলা রুজু করা হলে নীতি বজায় রাখতেই হবে, আসামীকে দণ্ড দিতেই হবে। নইলে সরকারের 'প্রেষ্টিজ' নষ্ট হয়।

এ দুই মামলার ক্ষেত্রেও নীতির ব্যতিক্রম হল না।

উভয় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধ বহাল রইল।

শাস্তি প্রদানের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য দেখা গেল।

ফরওয়ার্ড সম্পাদকের হল তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুমাস সশ্রম।

আত্মশক্তি-সম্পাদকের দণ্ড হ'ল দুমাস বিনাশ্রম ও সাড়ে তিনশ' টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দু'মাস বিনাশ্রম।

ফরওয়ার্ড-প্রকাশকের হল দুমাস সশ্রম, অন্যথায় দুশটাকা জরীমানা;

আত্মশক্তি-প্রকাশকের একমাস বিনাশ্রম অন্যথায় একশত টাকা জরিমানা।

বিচারক তাঁর রায়ে জানালেন, যে-কোনও প্রবন্ধের, যে-কোনও অংশে "আইনানুসারে স্থাপিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপভাব"-মূলক সামান্য বাক্য প্রয়োগ করলেও তা রাজদ্রোহসূচক গণ্য হবে। সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠে মনে যে-ভাবই আসুক না কেন, প্রবন্ধের অন্তর্বর্তী একটি বাক্য বা পদ বিচ্ছিন্নভাবে পাঠে যদি চলতি শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ সূচিত হয়, তবে সমগ্র প্রবন্ধটিই রাজদ্রোহমূলক বলে গণ্য হবে।

রাজদ্রোহ নির্দ্ধারণের এরূপ অভিনব সিদ্ধান্ত পূর্বে আর ঘোষিত হয় নি।

ফরওয়ার্ড পাবলিশিং-এর পরিচালকবর্গ সেজন্য

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলেন।

সমগ্র প্রবন্ধের বক্তব্য ও ওর অন্তর্ভুক্ত একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য বা পদের অর্থ যে একইরূপ হওয়া কখনো সম্ভব নয়, একটি বাক্যের অর্থও যে প্রয়োগ-পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবহন করতে পারে, তা কে না জানে ?

কিন্তু এ সব তথ্য অস্বীকার করে বিচারক আরও নির্দেশ দিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধে 'সরকার', 'সরকার-পক্ষ', 'আমলাতন্ত্র'. 'নায়েবতন্ত্র' ইত্যাদি সব একই মূল উদ্দেশ্যের ধারক ও বাহক—তা হল আইনানুসারে গঠিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি।

হাইকোর্টের বিচারে পূর্বতন সিদ্ধান্তই বহাল রইল।

সম্পাদক ও প্রকাশকদের দণ্ডের কোনও পরিবর্তন হল না—পুলিশের আইন ও শৃংখলা রক্ষার সংকল্প প্রতিপালিত হল।

অথচ অনুরূপ অপরাধে দুই সম্পাদকের ভিন্ন ধরণের শাস্তি দেওয়া হল কেন ? একজনের সশ্রম আর একজনের বিনাশ্রম ; একজনের তিন মাস আর একজনের দুই মাস। একজনের তিনশ' টাকা, আর এক জনের সাড়ে তিনশ' টাকাই বা হল কেন ?

এ বৈষম্য দূর করবার কিছু চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন মিঃ রক্‌স্‌বার্গ।

মামলা প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে শেষ হয়ে গেলেই মিঃ রক্‌স্‌বার্গ আবার তার পদে ফিরে আসেন।

সম্পাদকদ্বয়ের কারাদণ্ড অপরিবর্তিত রাখবার নির্দেশসহ পুনরায় ফিরে আসে নিম্ন-আদালতে।

মিঃ রক্‌সবার্গ আসামীদের জেলে চালান দেবার সঙ্গে সঙ্গে জেল-সুপারকে জানিয়ে দিলেন, এদের যেন 'বিশেষ শ্রেণী'র কয়েদীরূপে গণ্য করা হয়। 'সশ্রম' ও 'বিনাশ্রমে' কোনও বৈষম্য না রেখে তাদের যেন পদোচিত সুব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু জেলখানার সরকারী মহলেও যে জাতিভেদ প্রবল, তা বোধ হয় রক্‌স্‌বার্গেরও জানা ছিল না।

ও-সময় কর্ণেল সিম্পসন ছিলেন প্রেসিডেন্সী জেলের সুপার। তিনি খাস বৃটিশ, সুতরাং স্কচ্‌ ম্যাজিষ্ট্রেটের এ নির্দেশ পাঠে তার মুখ আরও রক্তিম হয়ে উঠ্‌লো।

নির্দেশনামা হাতে নিয়ে, সেটিকে একটু নাচাতে নাচাতে, মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে সিম্পসন বল্‌লেন ঃ

'জেলখানার আসামীর প্রতি কি ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ দেবার অধিকার কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের নেই। যেই মুহূর্তে আসামী জেল-গেট পেরিয়ে এল, সেই মুহূর্তে ম্যাজিষ্ট্রেটের এক্তিয়ার শেষ হল।'

'এখানে আমি যা ভাল বুঝবো তাই ক'রব, তাই হবে আইনানুগ ব্যবস্থা। আর কারও নির্দেশ এখানে চলবে না।'

এর পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এক সম্পাদককে রাখা হল একটি নির্জন কারাকক্ষে; আর একজনের জন্য ব্যবস্থাও অনুরূপ। কিন্তু জেলখানার সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক অঞ্চলে।

পুলিশী নির্যাতন প্রতিকারের যে সামান্য চেষ্টা মিঃ রক্‌স্‌বার্গ করেছিলেন, সিম্পসনের বৃটিশ অহমিকার ধাক্কায় তা ধূলিসাৎ হয়েছিল।

অবশ্য এ ধাক্কা ছিল সাময়িক। অল্প কিছুদিন পরের ঘটনায় ঐ সিম্পসনের দেহই চিরতরে ধূলোয় লুটিয়েছিল।

এ কথা মনে হতে পারে, এত তোড়-জোড় করে,

একই পরিচালক-গোষ্ঠীর দু'খানা পত্রিকাকে একই সঙ্গে চরম রাজদ্রোহের 'অপরাধে' অভিযুক্ত করে সরকারের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল ?

হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, মামলা দুটি দীর্ঘদিন পরিচালনে বাদী পক্ষের লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছে।

অথচ তার পরিবর্তে এক সম্পাদকের তিন মাস, আর একজনের মাত্র দু'মাস কারাবাসের আদেশ? সামান্য মুর্গীচোরের ভাগ্যেও ত' এর চেয়ে বেশী সাজা জোটে !

মুর্গীচুরির প্রসঙ্গে আর একটি মামলার উল্লেখ করতে হয়।

১৯২১ সালের নবেম্বর মাস। কলকাতায় প্রতিদিন হাজার হাজার আইন অমান্যকারীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রও কারাগারে গেলেন। মিঃ সুইনহোর আদালতে তাঁর মামলা।

কয়েকদিন মামলা চলবার পর বিচারক রায় দিলেন। সুভাষচন্দ্রের কারাবাস, ছ' মাসের জন্য।

সে কি, মাত্র ছ' মাস ?

আমি কি মুর্গী চুরি করেছি নাকি, বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র।

(ক্রমশঃ

বৃক্ষরোপণ উৎসব
ও
৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

অনিলচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা

পুলকেশ দে সরকার

এই সভাকক্ষের অদূরে হাওড়ায় সদ্য অনুষ্ঠিত মার্কসিষ্টদের প্লিনামের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের জীবন ও দর্শন পর্যালোচনা করতে করতে বার বার একটা কথা আমাকে কিছুটা উত্তেজিত করে তুলেছিল। এত তথ্য এত যুক্তি এত উপযুক্ত পরিবেশ সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র কখনো জঙ্গী, আগ্রাসী বা মিলিটান্ট হ'য়ে উঠতে পারে নি কেন? প্রথম কোমিন্টার্ন স্বয়ং কার্ল মার্কস-বাকুনিন বিবাদে সুদূর আমেরিকায় মাটি নিয়েছে; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ১৯১৪-১৮-র ইউরো-আমেরিকার মহা-আহবে 'পিতৃভূমি রক্ষা কর'র শ্লোগানে শেষ হয়ে গেছে। সে কবর খুঁড়ে নয়, রুশ নেতা লেনিনের উদ্যোগে নতুন ক'রে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সৃষ্টি হয়েছিল। স্ট্যালিন নামে মার্কসবাদের নব ভাষ্যকার লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের অখণ্ড আধিপত্যের তাড়নায় লেনিনের নিত্যসঙ্গী ট্রটস্কি বিতাড়িত হ'লে চতুর্থ আন্তর্জাতিকতার উদয় হয়। কিন্তু স্ট্যালিনের কাস্তে-হাতুড়ির হাতুড়িটা পড়েছিল ট্রটস্কির মাথায় আর কাস্তেটা পড়েছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মাথায়; আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নিয়ে যে গ্র্যাণ্ড এলায়েন্স, তাকে তুষ্ট করতে। প্রথমে নির্ভেজাল মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট স্ট্যালিন নিজস্ব ন্যাশনাল সোস্যালিজম রক্ষায় আঁতাত করেছিলেন আর এক ন্যাশানাল সোস্যালিষ্ট হিটলারের সঙ্গে। তাতেও যখন শেষরক্ষা হ'ল না তখন দুই নেশন— জার্মানী ও রুশিয়া—স্ব স্ব পিতৃভূমি রক্ষায়, 'Save the Fatherland' হাঁক দিল, একদিকে নাৎসীর সোস্যালিজম আর একদিকে কম্যুনিষ্টদের কম্যুনিজম কবরস্থ, যার যার ভৌগোলিক সত্তা রক্ষার চীৎকারে জার্মানীতে পিতৃপুরুষদের যেমন রুশিয়ায়ও তেমনি জার পিটার দি গ্রেটের নামের শপথ উচ্চারিত হ'ল। নাৎসীবাদ বা ফ্যাসিবাদও নয়, পুরোপুরি জাতীয়তাবাদ। ভারতের কম্যুনিষ্টরা বৃথাই জাপানকে রোখবার নামে দাপাদপি করেছেন। কোথায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক? চতুর্থ আন্তর্জাতিক?

তবু মার্কসিজম বা মার্কসবাদ পৃথিবীর বহু স্থানে আছে এবং প্রাধান্য বিস্তার করেই আছে; কিন্তু ১৯৩৯-৪৫ যুদ্ধশেষে বিভ্রান্ত, বিব্রত, বিবশ কম্যুনিষ্ট জগতের পাশে—সমাজতন্ত্র শক্তিমত্তায় তার অস্তিত্ব জাহির, প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করতে পারল না কেন? সর্বত্র পর্যুদস্ত হয়েও কী সেই প্রাণশক্তি যার জন্য মার্কসবাদ বা মার্কসবাদীরা আবার যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে বা উঠেছেন?

মার্কসবাদ ও মার্কসবাদীরা এখন বহুধাবিভক্ত। রুশিয়া ও রুশানুগত কয়েকটি রাষ্ট্র মিলিয়ে এক গোষ্ঠী; চীনানুগত এক গোষ্ঠি, রোমানিয়া চীনের ও রুশিয়া থেকে সমদূরত্বে একক, যুগোশ্লাভিয়া একক। কিউবা, ভিয়েৎনামও মোটামুটি একক। অন্যান্য দেশে দল আছে রাষ্ট্রাধিপত্য নেই তাদের।

মার্কসবাদীরা এককালে জোর দিয়ে এই কথাটা বলতেন যে, কোন কম্যুনিষ্ট (সোস্যালিষ্ট) দেশ কোন

দেশ আক্রমণ করতে পারে না। রুশ-জার্মান চুক্তির পর তারা যে কেবল পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাই নয়, রুশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ ও দখল মার্কসিষ্টরা এই ব'লে সমর্থন করেছেন, ওটা আত্ম-রক্ষার ষ্ট্র্যাটেজি ; আগ্রাসন নয় ; আমাদের দেশে সেই মাকড়-ধোকরের গল্প। যুদ্ধকালে জার্মানীর একাংশ দখল, যার নাম এখন পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরীর ওপর বলাৎকার আদৌ আগ্রাসন নয়। মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট মাও-চীন যখন তিব্বত গ্রাস করল তখনও তা আগ্রাসন নয়, জবরদখল নয়, চীনের স্বরাজ্য। তারপর চীন যখন খোদ ভারতবর্ষই আক্রমণ করল তখনও কম্যুনিষ্ট মহলে সেই শ্লোগান, কিছুতেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র অপর দেশকে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু অতটা বোধ হয় সকলের হজম হ'ল না; সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে চোখ রেখে তালে তাল রেখে এক গোষ্ঠি সি পি আই থেকে গেল, আরও এক গোষ্ঠি হ'ল ব্র্যাকেটে এম, অর্থাৎ কেবল কম্যুনিষ্ট পার্টি নয়, মার্কসিষ্ট পার্টিও বটে। কম্যুনিষ্ট মার্কসিষ্টে কি পার্থক্য তাঁরা জানেন।

এতো গেল একই দলে দুই মত। কিন্তু যেটি একেবারে সর্বসংহারী কাণ্ড তা হ'ল দুই পারমাণবিক বোমা সজ্জিত কম্যুনিষ্ট-লেনিনিষ্ট ধ্রাষ্ট্রচীন ও রুশিয়ার সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ। পরিষ্কার দু'টি জাতি— আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম নয়। নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদ। যার যার দেশ-সীমানা নিয়ে ঝগড়া এবং সবচাইতে বিস্ময়-কর চীন পেপার-টাইগার আমেরিকার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে, রুশিয়া আফগানিস্থানে-ইরাণে-আমেরিকার মতই হাত বাড়াচ্ছে, আর এদিকে, খেলা চলছে কেজিবি-সিআইএতে। অর্থাৎ, কম্যুনিষ্ট জগতে এত যে ধুন্ধুমার কাণ্ড জাতিতে জাতিতে, তবু সেই মৃত গলিত আন্তর্জাতিকতার ছায়ারৌদ্রে মার্কসবাদ সঞ্জীব।

ভারতবর্ষের কথাই ধরি। বন্দীশালায় মার্কসিষ্ট সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে মুক্তির পর বিকল্প কোন পার্টির অভাবে বিপ্লবীরা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পরম বিস্ময়ের বিষয় যে-বঙ্গ-বিপ্লবীরা স্বাধীনতার জন্য অজস্র রক্ত ঢেলেছেন, অকথ্য লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা ও উৎপীড়নে পঙ্গু অথবা মৃতপ্রায় হয়েছেন অথবা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রান্তে ধুঁকছিলেন তাঁরা, আমি বলব, আবেগভরে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনে এসেছিলেন কিন্তু যথার্থ দর্শনের অভাবে দিশেহারা হ'য়ে নিঃশেষ হয়েছেন ঠিক তেমনি নির্বিচারে এক উদ্ভট জনযুদ্ধে সামিল হ'লেন, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অর্থ-হীন ভেদ সৃষ্টি ক'রে সাম্রাজ্যবাদীদের সখ্যতা বরণ করলেন, রুশিয়ার স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিরোধিতা করার সুযোগ ছেড়ে দিলেন। স্পষ্ট করে বলতে গেলে দেশের প্রতি অমার্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। পরে তাঁরা এ ভুল স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। শুধু এই দল ব্রহ্মদেশে নেতাজীর সফল সংগ্রাম-প্রচেষ্টাকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর মেঘে ঢেকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। বন্দরে বন্দরে লস্কর বিদ্রোহ, দেশে গণ-অভ্যুত্থান, কোন সুযোগই নিলেন না, এ ঔদাসীন্য নয়, চরম দেশদ্রোহিতা, নেতাজী তাঁদের চোখে কুইসলিং বা বিভীষণ। তাঁদের পিতৃভূমি সোভিয়েট রাশিয়া অবশ্যই রক্ষা পেল ; কিন্তু ভারত-বর্ষে যুদ্ধান্তের সুযোগ নিলেন কারা? ভারতীয় পুঁজিপতি শিল্পপতি ধনীসম্প্রদায়ের প্রতিভূ কংগ্রেস ও অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ। কম্যুনিষ্ট পার্টি লীগের দেশবিভাগের দাবীকে local culture

and self-determinationএর অজুহাতে সমর্থন করলেন, কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, মুসলিম লীগ মুসলমানদের সংস্থা মেনে নিয়ে দেশ বিভাগ হ'ল, কোন বিরোধিতা করলেন না। কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসেই ছিলেন। এত কাণ্ডের পরও কম্যুনিষ্ট পার্টি নিশ্চিহ্ন হয়নি।

কিন্তু জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীরাও এর কোন সুযোগ নিতে পারলেন না, পক্ষান্তরে, নিজেরা বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হয়ে রইলেন। কংগ্রেস থেকে অনেক মহারথী বেরিয়ে এলেন; ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতাই কংগ্রেসকে রক্ষা করল। যে পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের অভিযান বা অভিমান, তাঁরা স্ফীততর হ'য়ে উঠে এক গোপন পাল্টা সরকার গড়েছে এবং আজকের বাহ্যিক মুখ পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। কেননা, এই সরকার তাঁদের নিয়েই গঠিত যাঁরা এককালে কংগ্রেসেই ছিলেন: সুতরাং মৌলিক প্রকৃতির দিক থেকে পার্থক্য নেই।

জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীরা শক্তি সঞ্চার করতে পারলেন না কেন? তাঁরা কি ক'রে ছিন্নভিন্ন হলেন এবং কেন? সে ইতিহাস বলতে গেলে ১৯২৮এ কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পরাজয়, ১৯২৯এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ, ১৯৩৯এ ত্রিপুরীতে কংগ্রেসী বিরোধিতায় সোস্যালিষ্ট-কম্যুনিষ্টদের সুভাষ-বর্জন, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন, ভীত কম্পিত সমাজতন্ত্রীদের বিহ্বল অবস্থা উল্লেখ করতে হয়।

তাই প্রশ্ন, কি সেই প্রাণশক্তি যার অভাবে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীদের শিবিরগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল, কেউ কংগ্রেসে ফিরে গেল, কেউ মার্কসবাদী হ'ল, কেউ ভূদান, সর্বোদয় ইত্যাদি আশ্রমবাসী হ'ল, পক্ষান্তরে, কি সেই প্রাণশক্তি যার প্রভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখা নয়, বিস্তারলাভ করে চলেছে, কোথাও কোথাও ক্ষমতাসীন হ'তে পেরেছে। অনেকেই আর্থিক সঙ্গতি ও সংগঠনের কথা বলবেন, অনেক ভুল-ভ্রান্তি পাপাচার করলেও কংগ্রেস যেমন টিঁকে আছে, কম্যুনিষ্ট পার্টিও যে-জোরে টিঁকে আছে। কিন্তু আমি এমন একটি মৌলিক কারণ বলব যা অনেকের মনঃপূত হবে না, তাচ্ছিল্য করবেন, হয়তো বুদ্ধিদৈন্যে হাসবেনও। কিন্তু বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের সাহিত্য বা দর্শন চর্চায় এবং আমার নিজের ব্যর্থ বৈপ্লবিক জীবনের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। সোজা এবং সরল কথায় তা হ'ল অঢেল মার্কসীয় সাহিত্য, জাহাজ থেকে দোকানে দোকানে ফুটপাথে ফুটপাথে। এ যদি শুধু সুদৃশ্য, চিত্তাকর্ষক ও সুলভ হ'ত তবে এর সমাদর এত সর্বজনীন হ'ত না।

আজ অকপটে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, বিপ্লবী-জীবনে ব্রহ্মচর্য, শুশ্রূষা শিক্ষার পর সিডিসান কমিটি যে-রোমাঞ্চের, যে ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছিল, ম্যাটাসিনি-গ্যারিবল্ডির চাইতেও ড্যানব্রিনের 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রিডম' যেরকম মাতিয়েছিল, তার চাইতেও বেশি মাতাল হয়েছিলাম একটার পর আর একটা মার্কসিষ্ট সাহিত্য পড়ে। ১৯২৬-২৮ সাল থেকে—তখন বই প্রায় পাওয়াই যেত না, মার্ক্স-এঙ্গেলসের কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো, গোর্কির মাদার, যা পেতাম তাই পড়তাম, থ্রু দ্য রাশ্যান রিভলিউসান, টেন ডেজ্ দ্যাট সুক দ্য ওয়ার্লড; ট্রট্স্কির বই তখনও পাওয়া যেত, গোগ্রাসে গিলেছি, এমন কি, রিনি ফুলপ মিলারের Mind and Face of Bolshevism ইত্যাদি একেবারে মুগ্ধ হয়েছিলাম মার্কসের

ক্যাপিটাল পড়ে, প্লিখানভের বই পড়ে, বাকুনিনের গড এণ্ড দ্য স্টেট, লেনিনের ইম্পিরিয়ালিজম, দ্য লাস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম ইত্যাদি ইত্যাদি। লেনিনের কাউট্স্কি দি রেনিগেড, বোহাম বোয়ার্কের থিওরি অব দ্য লিজার ক্লাশ, ল্যাপিডাস বুখারিনের এ বি সি অব কম্যুনিজম অপূর্ব স্বাদে পড়েছি। হ্যাঁ, একেবারে সূচনায়, সৌভাগ্যবশত লাভপুরে অন্তরীণ এক পুরোনো বিপ্লবীর প্রসাদে '২৯-এই স্ট্যালিনের লেনিনিজম পড়েছি, অকাট্য যুক্তি অপরের কাছে আওড়েছি। যখন হিজলী বন্দীনিবাসে তখন বই যেমন বিস্তর, ছাত্র যেমন বিস্তর তখন আঘাতও পেলাম বিস্তর। ওদের পাঠ শেষ হয়নি, কিন্তু তাতে তাদের ট্রট্স্কি-বিরোধী ক্ষুদে ক্ষুদে স্ট্যালিন হতে বাধা হয়নি, এমন কি, স্ট্যালিনের মিথ্যাচক্র সৃষ্টি ক'রে ট্রটস্কি বহিষ্কারের পথও অনুকরণ করেছিল। পাশাপাশি দেখতাম মুসোলিনীর অটোবায়োগ্রাফি অব বেনিটো মুসোলিনী ও বার্ণসের ফ্যাসিজম্-পড়া ব্ল্যাকসার্ট পরা ড্রিল—যারা পরে কম্যুনিষ্ট দলে ভিড় করেছেন এবং জনযুদ্ধের বিজাতীয় ঝাণ্ডা তুলেছেন। মার্কসবাদী সাহিত্য আমার মগজকে সর্বতোভাবে গ্রাস করা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ-সহযোগী জনযুদ্ধের হুঙ্কার আমাকে বাঁচিয়েছে। এজন্য লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে কিন্তু স্বদেশী ভাবনার বিপ্লবী ট্রেনিং আমার মেরুদণ্ডকে ওরা বাঁকাতে পারেনি।

বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের লেখা বিশ্লেষণাত্মক লেখাগুলো পড়তে পড়তে আফসোস হয় আজও এরা গ্রন্থাকার পায়নি। অনিলচন্দ্র রায় অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন উল্টে-দেওয়া হেগেলের ডায়েলেকটিক্স-নির্ভর মার্কসবাদকে প্রতিশব্দে যাচাই ক'রে ক'রে পড়েছেন এবং কোন মৌলিকতার ঝোঁকে প্রলুব্ধ না হয়ে বিশ্বের সমগ্র দর্শনের কষ্টিপাথর দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন, প্রত্যয়িত করেছেন। তাঁর লেখা বইয়ের আকার পেয়েছে 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', 'নেতাজীর জীবন-বাদ', 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ'। কিন্তু যে দর্শন বা ভাষ্য মানুষের জীবনকে দৃঢ়মূল করে, বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের সে দুটি অসাধারণ লেখা আজও পাণ্ডুলিপির আকারে, মানে জয়শ্রীতে ধারাবাহিক প্রকাশের আকারে আছে। লেখা দুটির একটি 'বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ' ও অপরটি 'হেগলীয় দর্শন'।

এই জাতীয়তা সমাজতন্ত্রীদের সাহিত্যে অপরিসীম দৈন্য। সোভিয়েট রুশিয়ার বিনামূল্যে ঢেলে দেওয়া অগুণতি সাহিত্যের মতো যাদের সাহিত্য নেই তাদের অতি সামান্য সাহিত্য যদি গ্রন্থালোকে উজ্জ্বলিত হয়ে সাধারণের দৃষ্টিগোচরে না আসে তবে আগ্রহী পাঠকের চিন্তা উদ্বেলিত হবে কি করে? সি আই এ'র কথা ঢের শুনেছি, কেজিবির কথাও সমান শুনেছি, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার মতো অবিরাম বিতরণের সঙ্গে পাল্লা দিতে বিশ্বের আর কোন শক্তি পারেনি, কেননা, মানুষকে আকর্ষণ করবার মতো সমাজতন্ত্রী সাহিত্য তারা সস্তায়ও বেচবে না; কেননা ওগুলো নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্র-বিরোধী রাষ্ট্র। এদেশের পুঁজি-বাদী শিল্পপতি এবং তাদের অঙ্গুলি-হেলনে এযাবৎ কোন ভারত সরকারই এদিকে দৃষ্টি দেননি; গান্ধীবাদী সাহিত্যের মহিমায় অহিংসতত্ত্বেরই প্রাধান্য, ওতে বিদ্রোহী মনোভাব স্তিমিত হয় এই তাঁদের লাভ। নইলে সমাজতন্ত্র প্রচারণায় ওটি অনাবশ্যক, যেমন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঐ প্রশ্নটি ছিল অবান্তর ও অনাবশ্যক। বিপ্লবীদের দলন তো শুধু সরকারী তরফে হয়নি, আধুনিক সশস্ত্রসজ্জিত তথাকথিত অহিংস রাষ্ট্রেরও বিদেশীদের মত সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের সতত শঙ্কা; কেননা, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ক্ষমতার মধ্যেই

নিহিত : ইন্দিরা দেবীর ইমার্জেন্সির দাপট 'গুলাগ আর্কিপেলেগোরই প্রতিচ্ছবি।'

আর একটি পরমাশ্চর্য ঘটনা এই যে, আমাদের দেশের তাবৎ রাজনৈতিক চিন্তানায়ক বা পণ্ডিত কখনো ভারতীয় দর্শনের মলাট উল্টেও দেখেন নি, ভেতরের বস্তু পড়া, বোঝা, বোঝানোর ব্রত নেওয়া তো দূরের কথা। অথচ একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি চিকাগো বিশ্বধর্মসভা-কাঁপানো ঐ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মতো সমাজবাদী ক'টি ছিল বা আছে এই ভারতবর্ষে? প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এমন নিপুণ বিশ্লেষণে কে হাত ধরে তুলেছেন দেশবাসীকে? কে প্রেরণা দিয়েছেন দেশহিতৈষণায়? কে দরিদ্র-নারায়ণের কথা বলেছেন? কে অনুপ্রাণিত ক'রেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে? ঐ মুক্তপুরুষ বীর্যের প্রতীকই তো?

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর অসাধারণ মেধাবলে 'পজিটিভ সায়েন্সেস্ অভ দ্য এনসেন্ট হিন্দুজ'এ তুলনামূলক দর্শনালোচনায় দেখিয়েছেন বহু পাশ্চাত্য দর্শনের চাইতেও ভারতীয় দর্শন কত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সার্থক হয়েছেন নেতি নেতির পথ পরিক্রমা করে। এক কালে আর কিছু না হোক হিন্দুদের ষড়দর্শন মুখস্থ করানো হ'ত। চার্বাক নিয়ে ঠাট্টা হয়েছে, জৈনদর্শন সীমাবদ্ধ, বৌদ্ধদর্শন বৌদ্ধধর্মের মঠে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ঐ যে ঐশ্বর্যময় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, গৌতমের ন্যায়দর্শন, জৈমিনির মীমাংসা, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র তা আমরা গণ্যের মধ্যে আনিনি। অর্থাৎ দর্শন যে ব্যবহারিক জীবনেও প্রযোজ্য, নিছক ফোঁটাকাটা ধর্মকার্যের অবলম্বন নয় এটি আমরা ঘুলিয়ে ফেলেছি, হারিয়ে ফেলেছি। আমরা কোপার্নিকাসকে জানি অথচ তাঁরও হাজার বছর আগে আহ্নিক গতির আর্যভট্টকে জানিনি ; অতি সম্প্রতি তাঁর পুনর্বাসন ঘটেছে। আমরা সক্রেটিস-প্লেটোর বিতর্কের খবর রাখি, যাজ্ঞবল্ক্যগার্গীর তর্করীতির কথা স্মরণ করিনে।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, জীবনাচরণে এসব তত্ত্বকথার প্রয়োগ আমরা স্বীকার করিনি বলেই আমরা সর্বদাই পাশ্চাত্য দর্শন, ভাবনা চিন্তা আমাদের সামগ্রিক জীবনে আহরণ ও সংযোজন করেছি। আমাদের চিন্তাধারা যদি প্রাচ্য দর্শন অনুসারী হ'ত, কিংবা একদেশদর্শী না হ'ত, অন্তত তুলনামূলকও হ'ত (যেমন আচার্য শীল করেছেন) তাহলে আমরা পুরোপুরি ধর্মান্তরিত বা জাতিচ্যুত হতাম না, আমাদের চিন্তাধারায় একটা জাতীয় ছাপ থাকত, অর্থাৎ একান্তভাবে পাশ্চাত্যদর্শী না হ'য়ে একটা সমন্বিত ভাবনা আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত। ভারতবর্ষে বহু বাদবিতণ্ডা হয়েছে, সবই আত্মস্থ হয়েছে, আজও তারা সহাবস্থান করছে। তার কারণ, ভারতবর্ষের মাটিকেই সবাই অস্তিত্বের ভিত্তি করেছে। যারা করেনি তারা এ মাটিতে শেকড়ও ছড়াতে পারেনি, তাদের দৃষ্টি বহুমুখী, পরদেশ-নির্ভর ; তাদের সমগ্র ভাবনা-চিন্তা-আদর্শ বিদেশী।

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী অনিলচন্দ্র রায়কে এই একদেশদর্শিতা পীড়িত করেছে। তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যানুসারী সমন্বয়কেই সন্ধান করেছেন। যে যুক্তিবাদের ওপর মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত তা খণ্ডিত করেছেন এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই সহমত পোষণ করেছেন যে, "ভারতে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদগুলোর একটা সমন্বয় গড়ে তুলবো এবং দুইয়েরই ভাল দিকগুলো নেবো।" (নেতাজীর জীবনবাদ, পৃঃ ৯১)

অনিলচন্দ্র রায়ের 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' বইখানি কাব্য-ধর্মী; হেগেলের দর্শন আলোচনায় যেখানে তিনি শুষ্ক যুক্তিবাদী, সেখানে 'ধর্ম ও বিজ্ঞানে' তিনি সরস সাহিত্যিক। তিনি বলেছেন ঃ

"মানুষের জীবনকে আজ মানুষের "বুদ্ধি" যুদ্ধে আহ্বান (challenge) করিয়াছে।.....পুরাতনের রাজ্য ভরিযা তাই সামাল্ সামাল্ পড়িযা গিয়াছে,—কে থাকে কে যায়।...মহাকাল আজ গা ঝাড়া দিযাছেন, দিকে দিকে ভূমিকম্প সুরু হইয়া গিযাছে। ..

"এখন কর্ত্তব্য কি! ঘুমাইলে তো চলিবেই না, মহারুদ্রের বেশে তুফান আসিয়া আকস্মিক সর্বনাশের সূচনা করিবে তখন মাথায় করাঘাত করিবারও সময় থাকিবে না। তবে কি চুপ করিয়া আকাশে তাকাইয়া হিসাব করিবো যে তুফান কবে আসিবে, কখন পৌঁছিবে? অথবা জল্পনা করিয়া রাত্রি ভোর করিবো যে তুফান আসিলেও আমাদের সনাতন পবিত্র উঠানে হস্তক্ষেপ করিবে না, প্রতিবেশীর বাগান ভাঙ্গিয়া, পাকাধানের গোলা উজাড় করিয়া চলিয়া যাইবে। যাঁহারা আজ জাগিয়া আছেন, সেই "যামিনীর জাগরূক দল"কে বলিবার সময় আসিয়াছে, "যাঁহারা আজো নিশ্চিন্তে লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছেন, স্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, বক্তৃতা দিতেছেন তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিন্। "তাঁহারাও কান পাতিয়া শুনুন যে পশ্চিমে ঝড় উঠিয়াছে এখানে আসিবার দেরী নাই"—ইত্যাদি

'ধর্ম ও বিজ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মৌলিকতার দাবি করেন নি। বলেছেন এ প্রবন্ধ শুধু আলোচনা— এখানে শেষ কথা নাই, কারণ শেষ কথা বলিবার দিন আজও আসে নাই বলিয়া মানি।...(পৃঃ ১২) ধর্মকে বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিয়াও পক্ষে বা বিপক্ষে অন্তিম কথা (last word) না হইলেও উপান্তিম কথা (penultimate word) গোছের কিছু বলা যায় কিনা তাহাও দেখা যাইবে। কিন্তু এ বলাও আমার নিজস্ব বলা হইবে না। বুদ্ধির রাজ্যে যাঁহারা কর্ণধার বলিয়া গণ্য এমনই দুই চারিজন যাহা বলিয়াছেন; তাহাই চয়ন করিয়া এখানে ধরিয়া দিব।" সেই চয়নিকা উদ্দেশ্যহীন নয়, সে সব উদ্ধৃতি সাধারণ জড় জগৎ থেকে পৃথক জগৎ, চেতনার জগৎ এবং ধর্মের স্বপক্ষ।

তিনি ডারুইন, হোয়াইটহেড, এডিংটন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, রোমাঁ রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথকে এই আলোচনায় স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ বিংশ শতকে বিজ্ঞান তাহার পূর্বসীমানা ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। যে দেশে আসিয়া বিজ্ঞান পদার্পণ করিয়াছে তাহা পূর্বেকার জগতের একেবারে অপরিচিত, অকল্পিত।" (পৃঃ ৩২) ডারুইন বলেছেন, "পূর্বে একটা কিংবা সামান্য কয়েকটা জড়বস্তু ছিল। সেই জড়বস্তুগুলির মধ্যে ভগবান আদিতে তাঁর পূর্ণ শক্তিকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৩৪) তাই আবর্তিত ও বিকশিত হয়ে দৃশ্যমান বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। এরই মধ্যে রাদারফোর্ড অণু-পরমাণু জগতে এক প্রলয় কাণ্ড ঘটালেন, "কোথা হইতে ইলেকট্রন নামক অপূর্ব চীজকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন—" (পৃঃ ৪১) এডিংটন বলেছেন, "ইলেকট্রন সত্যি সত্যি কি বস্তু একথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা শুধু জবাব দিব যে ইহা পদার্থবিজ্ঞানের 'ক খ' মাত্র।" (পৃঃ ৪৩) রাসেল বলেন ঃ "ইলেকট্রন হইল শুধু একটা ক্ষেত্র যেখান হইতে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়।" (পৃঃ ৪৩) "এক কথায়, জড়বস্তু আর নাই; জড়বস্তু বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। (পৃঃ ৪৪) একদিকে

রাদারফোর্ড-পরমাণু অন্যদিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ.....আমাদের সমস্ত পূর্বাপর জ্ঞানকে চিন্তাকে, গণনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিধ্বস্ত করিয়া নূতন পথে অভিনব প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।" (পৃঃ ৪৬)

ম্যাক্স প্লাঙ্ক বলেছেন, "বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোনো সত্যিকার বিরোধই থাকিতে পারে না ; কারণ ইহারা একে অন্যের পরিপূরক ও সহায়ক।" (পৃঃ ৭০) রোমাঁ রোলাঁর দুঃখ, যাঁরা ধর্মকে আক্রমণ করেন তাঁরা এমন কিছুকে আক্রমণ করেন যা তাঁরা মোটেও বুঝতে পারেন নি।

অনিল রায়ের মোটামুটি উপসংহার হোয়াইট্‌হেডের ভাষায় "জীবনের এমন একটা অপরূপ ধর্ম আছে যাহা কেবল নিছক জীবিত-থাকার অতীতে চিরকাল ধরিয়া অবস্থান করিতেছে।" (পৃঃ ৭৬) বিপ্লবী অনিলচন্দ্র অনায়াসে জেমস জীন্‌স আভাষিত The Great Mathematician-এর (মহত্তম গাণিতিকের) কথাও বলতে পারতেন।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের পর আর একখানি কাব্যধর্মী বই "নেতাজীর জীবনবাদ"। প্রসঙ্গত আফসোস ক'রে বলি, এই ভারতে বা জগতে বহু সুভাষবাদী আছেন, তাঁরা নানা রকমে বিভক্ত, কিন্তু সুভাষবাদ প্রচার-কুণ্ঠিত রইল কেন ? কার্ল মার্কস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো সার্থক বিপ্লবী নন ; তিনি অবশ্যই যুগান্তকারী এক তত্ত্ব দিয়েছেন এবং নিপীড়িত মানব নিরাপদ অবলম্বনরূপে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। প্যারী কম্যুনের ব্যর্থতা তাঁকে বিব্রত করেছিল, বহু দুঃখ কষ্ট উত্তীর্ণ হয়ে তিনি নিঃসন্দেহে অমর কিন্তু সুভাষচন্দ্র রক্তরেখায় যে মহাকাব্য রচনা করে গেছেন তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাও তো চিরঞ্জীব এবং তাঁর চিন্তাধারা ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল' টোকিও বক্তৃতা ইত্যাদিতে বিধৃত হ'য়ে আছে। মার্কসবাদের মতো তা একটা প্রামাণিক গ্রন্থাকারে জনসাধারণ্যে বহুল প্রচারিত হ'ল না কেন ? নানা ভাষ্য হ'তে পারত, প্লিকানভ, কাউটস্কি এমন কি বার্ণস্টিনও, আবার লেনিন, স্টালিন, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, এমনি অনেকে কিন্তু মূল সুভাষবাদ তো তর্কে-বিতর্কে পল্লবিত হ'য়ে উঠতে পারত, হ'ল না কেন ? এ আত্মজিজ্ঞাসা সকল সুভাষবাদীর চিত্তকেই আলোড়িত করা উচিত।

কিন্তু অনিলচন্দ্র যা বা যতটুকু করেছেন সেই ভিত্তিতেই একটা মজবুত ইমারত গড়ে উঠতে পারে। তিনি পটভূমিকায় রেখেছেন ৪৪-৪৫ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় "উদয়পথে সূর্যের মতো নেতাজীর আবির্ভাব" এবং যুদ্ধোত্তর যুগকে বলেছেন "নেতাজীর যুগ।" কিন্তু এই আবির্ভাবের পটভূমিকায় রাখতে পারতেন সেই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দর বিশ্বজয়ের উদাত্তবাণী, ভারতীয় বিপ্লবীদের, বিশেষ করে বিবেকবাণীবাহী বাঙলার বিপ্লবীদের অকাতরে আত্মদান। বাঙলার স্বদেশী-বয়কটে পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের নবজাতক বুর্জোয়-প্রতিভূ গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ তা কেবল যুদ্ধকালেই সীমাবদ্ধ নয় ; '২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের, লাহোর কংগ্রেসের, হরিপুরা-ত্রিপুরী কংগ্রেসে তা সম্প্রসারিত এবং তারই নীটফল বৃটিশ বা এলায়েড শত্রুর সঙ্গে তাঁর মৈত্রী, আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং অস্ত্রে-অস্ত্রে মোকাবিলা। আমার সন্দেহ, নেতাজী ভারতে যদি বৃটিশরাজের ঐ ওয়ানম্যান পুলিশের ভূমিকা যথাযথ ব্যক্ত করতেন ভবিষ্যৎ ভারতের এক মহদুপকার সাধিত হ'ত। তা হয়নি বলেই যে দুর্নীতির

পাঁকে আজ ভারত পড়েছে তা থেকে এর সহসা উদ্ধার নেই।

অনিলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছেন : "নেতাজীর নামে এই উন্মাদনা কেন?" বিবেকানন্দর যা সুভাষচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত ক'রে নেতাজীতে উত্তীর্ণ করেছিল তা স্বার্থলেশহীন দেশপ্রেম, বেনিয়াবুদ্ধিতে তার স্থান নেই; সেখানে পণ্য বেচাকেনার বাজারে লাভ লোকসানের তৌলদণ্ড। অনিলচন্দ্র তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "নেতাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ভারতবর্ষের মর্মবাণী।" কিন্তু কি সেই মর্মবাণী যা বানরের পিঠাভাগের মতো বেনিয়াদের তৌলদণ্ড থেকে তাদেরই উদরস্থ হ'ল? যাঁরা জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী তাঁরাও তো ভারতবর্ষের মর্মবাণী বুঝেছেন গান্ধীবাণীতে—যা এখন ভারত সরকার মাত্রেরই উচ্চারিত শপথ! কোথায় নেতাজীর মর্মবাণী—দেশপ্রেম? এত উত্থান, এত অভ্যুত্থান, ওয়ান ম্যান পুলিশের নিন্দিত লস্কর বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে তা খড়ের গাদার মত ভস্ম হয়ে গেল কেন? কেবল তো কম্যুনিষ্ট নয়, বৃটিশ শক্তি নয়, গান্ধী-আজ্ঞাবাহী প্যাটেল নয়, কোথায় ছিলেন জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীরা? নেতাজীর দেশপ্রেমের ডাকে তাঁরাও তো ব্যর্থ হয়ে গেলেন!

অবশ্য কোন ব্যর্থতাই কোন মন্ত্রশক্তিকে বাতিল করতে পারে না। গান্ধীবাদ সহস্র খণ্ডে প্রকাশিত হয়েও তা ভারতের মর্মবাণী হয়নি, একদল রাজপাট বিলাসীর ছদ্মাবরণ হয়েছে মাত্র; আবার সুভাষবাদ প্রচারের পাথায় অবিশ্রান্ত ভারতীয়দের মনে মনে ঝাপ্‌টা মারতে পারে নি বলেও ব্যর্থ হয়নি; বরং, যতই বেনিয়াপ্রতিভূ নেতৃবৃন্দের কাদামাটির পা গুলো উদ্ঘাটিত নানা স্বদেশী-বিদেশী-সাহিত্যে, ততই নেতাজীর অক্ষয় স্বর্ণপদযুগল উজ্জ্বলতর, তাঁর বাণী-কুঞ্জ পুষ্পিত সুরভিত হ'য়ে উঠেছে।

সুতরাং, এই সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ, সুভাষবাদকে এই পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতারিত ভারতবাসীর সামনে যথাযথ পরিবেশন করে তাকে জীবন্ত করে তোলার। জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীরা কতবার এ সুযোগ পাবেন জানিনে; ইতিহাসে দেখা গেছে সোস্যাল ডিমক্রাটদের ব্যর্থতায় দেশে স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসীবাদের উদ্ভব হয় এবং বুর্জোয়া ডিমক্রাসির আচ্ছাদনটুকুও চলে যায়।

নেতাজী কিসের ডাক দিয়েছিলেন? "বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে সমন্বয়, এই হল চিরন্তন ভারতের স্বধর্ম। এই স্বধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নেতাজী ডাক দিয়েছেন।" অনিলচন্দ্র বলেছেন, "নেতাজীর জীবনবাদ এই ভারতধর্মের ও সমন্বয়-তত্ত্বেরই একটা ঐতিহাসিক রূপায়ণ।" (পৃঃ ৬) নেতাজী বলেছেন, "ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ সভায় শোনাতে হবে।" রবীন্দ্রনাথও এই কথা বলেছেন এবং জগৎ কে জানিয়েছেনও। "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে এই কথাটাই বলেছেন; "শিক্ষার বিরোধ"-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কথাটাই ব্যঙ্গ করেছেন। সবার আগে স্বামী বিবেকানন্দ সবল কণ্ঠে ভারতের বাণী শুনিয়ে একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। নেতাজী তাঁদেরই উত্তরসূরী।

অনিলচন্দ্র বলেছেন, "পাশ্চাত্য আজ ঐহিকতার প্রাণকেন্দ্র। সেখানে ঘটেছে জড়বাদের আতিশয্য। "এই থেকে সেখানে যে মার্কসবাদের উদ্ভব হয়েছে এবং এদেশে গান্ধীবাদের উদয় হয়েছে অনিলচন্দ্র এ দুটোকেই বলেছেন একদেশদর্শী।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে।

……তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল।……বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয় সে কোনো একটা সত্যের জোরে।" (শিক্ষার মিলন)

বিবেকানন্দ বলেছেন, যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট। 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢণ্ডে ফেলে নিতে হবে, এই মাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

সুভাষচন্দ্র স্পষ্টভাষায় বলেছেন, "আধ্যাত্মিক দিকের ওপরে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ হতে পারেনি। ঐহিক জীবনে, প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে রয়েছে।…… আমাদের গৌরবোজ্জ্বল যুগগুলিতে আত্মা ও দেহের, চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে একটা মধ্যপথ বা সমন্বয় বের করা হয়েছিল।……যদি আবার আমাদের আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে হয় তবে দৈহিক ও আত্মিক দুই ক্ষেত্রেই আমাদের একই সঙ্গে এগুতে হবে।" (নেতাজীর জীবনবাদ-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ১৩)

পক্ষান্তরে, "গান্ধীবাদ পুরোনো ভারতকেই শাশ্বত করে রাখতে চায়। নবজাত পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর একান্ত বিতৃষ্ণা।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর টোকিও বক্তৃতায় কি বলেছেন? "নব ভাবধারার বাহন হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশক্তি ও যান্ত্রিক কৌশলকে আজ আয়ত্ত করতে হবে।" তিনি আরও বলেছেন, "অতীত সংস্কৃতি, প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তির উপরেই গড়বো আমরা আধুনিক ভারতের ইমারত।"

অনিলচন্দ্র বলেছেন, "এই সমন্বয়ের আদর্শই সুভাষ তুলে ধরেছেন আজিকার বিভ্রান্ত যুগের সম্মুখে। তাই গান্ধীবাদের দুটি আতিশয্যকে সুভাষচন্দ্রের জীবনবাদ বর্জন করেছে। গান্ধীবাদের প্রবল প্রাচীন পন্থা এবং চরম অহিংসাবাদ।" (পৃঃ১৬) অনিলচন্দ্র বলেছেন ঃ "বিবেকানন্দের সমন্বয়ই সুভাষের জীবনবাদের ভিত্তি। বিবেকানন্দের শক্তিবাদই সুভাষের জীবনের মূল প্রেরণা।…… অহিংসাতত্ত্বকে বিবেকানন্দ ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তি করেন নাই।"(পৃঃ ২৯)

মার্কসবাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রবল মতভেদ উল্লেখ ক'রে সুভাষচন্দ্রের এই কথা উদ্ধৃত করেন যে, "সমাজতন্ত্র ব্যতীত ভারতের অন্য মুক্তিপথ নেই কিন্তু ভারতকে পরিবেশ অনুযায়ী নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করতে হবে।"

কিন্তু "সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ হলো এই ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নব সমাজতন্ত্রবাদ। একদিকে গান্ধীবাদের আতিশয্য, অন্যদিকে মার্কসবাদের আতিশয্য। এই দুই মতবাদের বাইরে তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রও ভারতবর্ষের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে।"

এইখানেই সুভাষচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি কখনও ভারতবর্ষ থেকে তাঁর দৃষ্টি ফেরাননি, নির্বিচারে বিদেশে উদ্ভূত কোন তত্ত্বকে আবাহন করেন নি, প্রত্যেকটি জিনিস ভারতের স্বকীয়তার ও সমন্বয়শক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিয়েছেন। কেননা, "সুভাষচন্দ্রের আদর্শে জাতীয়তাবাদ জীবন্ত-সত্য এবং দেশপ্রেম একটা বাস্তব।" পক্ষান্তরে, "মার্কসবাদ হলো আন্তর্জাতিক ও জাতীয়তাবাদ-বিরোধী।"

সুভাষচন্দ্র যে যে কারণে কম্যুনিজম্ অগ্রাহ্য করেছেন তার প্রথম কথাই হ'ল "কম্যুনিজম জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করে না। অথচ

ভারতীয় সংগ্রামই হলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ভারতবাসীর স্বাধীনতার আন্দোলন"

এটি বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। কম্যুনিষ্টরা স্বাধীনতাকামী ভারতীয় বিপ্লবীদের বৃটিশ শাসকদের ভাষায় টেররিষ্ট বা এনার্কিষ্ট বলেছেন যদ্দিন-না তাঁরা ওদের দলে ভিড়েছেন, বলতে গেলে কোন জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন নি (কোনো কোন মার্কসিষ্ট-কম্যুনিষ্ট একথা গর্বভরে স্বীকারও করেছেন) সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত লেফট কনসোলিডেশন কমিটি বানচাল করে দিয়েছেন, গান্ধীজীর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছেন, ১৯৪২-এ জাতীয় আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করেছেন একটি বিদেশী রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থে। কোমিন্টার্ণ বিলোপে কিছুমাত্র প্রতিবাদ না ক'রে রুশিয়া যখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও করেনি তখন ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা বৃটিশ শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাপানকে ওরফে নেতাজীর আজাদহিন্দ বাহিনীকে রুখতে হবে ব'লে আস্ফালন করেছেন। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার চাইতে মার্কিণ-বৃটিশ-রুশ রাষ্ট্ররক্ষা করাই মহত্তর ব্রত করেছেন।

আর দুটি আপত্তির মধ্যে আছে কম্যুনিষ্টদের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা। যদি অবকাশ পাই তবে এটি অনিলচন্দ্র রায়ের সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ অথবা হেগেল দর্শন আলোচনাকালে বলব। "জড়" শব্দটি আমার একেবারেই মনঃপুত নয়, এই কারণে ঐ শব্দার্থে কেমন একটা জড়তার-স্থবিরতার ইঙ্গিত আছে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানমতে কোন জিনিসই জড়পিণ্ডমাত্র নয়, ওর মধ্যে চঞ্চল ইলেকট্রন আছে, তাদের গতি রহস্যময়, তারাই বস্তুর ক্ষতিবৃদ্ধির হেতু। আমার মতে বস্তু এবং তা থেকে বাস্তব কথাটা সমীচীন মনে হয়। Thing ও Being এই দুটি সম্বন্ধ।

যাই হোক্, সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদীদের জড়বাদী বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা না মানলেও সুভাষচন্দ্রের আদর্শ হ'ল জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমন্বয়। .. মার্কসবাদের মৌলিক তত্ত্ব জড়বাদ ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে বর্জন ক'রে মার্কসবাদী কর্মকৌশল, সংগঠনপদ্ধতি ও রাষ্ট্র-পরিচালনার রীতি প্রভৃতি থেকে কার্যকরী-শিক্ষা গ্রহণে বাধা নেই। কর্মকৌশলের দিক থেকে সুভাষও মার্ক্সীয় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মৌলিক আদর্শ ও জীবনদর্শন হিসেবে মার্কসবাদ আজ গ্রহণযোগ্য নয় এই হ'ল সুভাষের মত। সুভাষ প্রতিষ্ঠা করতে চান সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র নয়। এ সমাজতন্ত্র 'হল জড়বাদ-বিবর্জিত নিছক অর্থনৈতিক সমষ্টিবাদ" (পৃঃ ৫৮)

সুভাষচন্দ্রের শেষ কথা—"এখন আমরা মিথ্যা ও সত্যিকার আন্তর্জাতিকতাবাদের পার্থক্য বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা জানি, সেই আন্তর্জাতিকতাই সত্য যা জাতীয়তাকে উপেক্ষা করে না, বরং জাতীয়তার মধ্যে যার মূল রয়েছে।" (পৃঃ ১০২) এই উপসংহারটি আজ খাস রুশিয়া ও চীনে যেমন সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে, যে সব দেশে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে সব জায়গার কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোর মধ্যেও তা পরিস্ফুট। কেউ কেউ তো রুশদেশে আমলতান্ত্রিক প্রাবল্য ও প্রাধান্য দেখে সর্বহারার নিয়ন্ত্রণ-নেতৃত্বও বর্জন করছেন। আজ একমেবাদ্বিতীয়ম বা মনিজম বা এক-বাদের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে সবাই আঁৎকে উঠছেন, গোষ্ঠিচক্র বীভৎসতর ব্যক্তিপূজায় এবং তারপর 'গুলাগ আর্কিপেলেগোর' বীভৎসতম পরিণতিতে নিয়ে যায়। এক ইন্দিরা তো তুচ্ছ, আমাদের দেশেই কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকগুলো পার্টি-

প্রাধান্যবিস্তারের হীন জঘন্যাদী বৃত্তিতে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না তা কি প্রত্যক্ষ করছিনে ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্ হবার লালসায় ? এবং সবই মার্কসবাদের নামে ?

এই মার্ক্সবাদ কি বস্তু ? অনিল রায় তাঁর 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ' গ্রন্থে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা বিশ্লেষণ করেছেন। অনিলচন্দ্রের নৈপুণ্যের আর এক পরিচয় তাঁর ইংরাজি বা বিদেশী শব্দের যথার্থ বাংলা পরিভাষা , রীতিমত সৃষ্টি !

অনিল রায় বলেছেন, "সমাজতন্ত্রবাদের সহিত মার্ক্স আরও তিনটি মতবাদ যোগ করিয়া একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শন গঠন করিয়াছেন। এই মার্ক্সীয় দর্শনকে মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজম বলা হইয়া থাকে।" যেমন কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো, কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানাল বা কোমিণ্টার্ণ। সুতরাং, এর পর কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ এবং সোস্যালিজম বা সমাজবাদ দুটিকে পৃথক করাই ভালো, তাতে অন্ততঃ ওদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে সুবিধে হয়।

অনিল রায়ের সংজ্ঞানুসারে 'সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমষ্টিবাদকেই বোঝায়। সম্পত্তিকে ব্যক্তির হাতে না রাখিয়া সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করাই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য।"

কার্ল মার্ক্স, ফ্রিডারিশ এঙ্গেলসের সহযোগে কি করলেন ? "সমাজের ও পৃথিবীর মূলে কোন্ শক্তি কাজ করিতেছে, ঐ শক্তি কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করিতেছে, পৃথিবীতে ও সমাজে পরিবর্তন কেন হয় এবং কিরূপে হয় ইত্যাদি রহস্য নির্ণয় করিবার চেষ্টায় পৃথিবীর ও সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা সমস্ত একটি বিস্তৃত মতবাদে দাঁড় করাইয়াছেন।"

প্রসঙ্গত বলা উচিত, কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো এমনিতেই রোমাঞ্চকর, তারপর এটি অপূর্ব সাহিত্যও বটে ; এরকম সুলিখিত অথচ সংক্ষিপ্ত ইস্তাহার জগৎ-সাহিত্যে বিরল ; সঙ্গে সঙ্গে এ সোজা হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাঁর রোমাঞ্চকর সারপ্লাস ভ্যালু ও শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কেও মনে সহসা প্রশ্ন জাগে না। পরবর্তীকালে রায়জানাভের টীকা ও টিপ্পনী এর তুলনায় নিতান্তই নীরস গদ্য। ইস্তাহার প্রকাশের আগে সোস্যালিজম শব্দটা ছিল, কিন্তু ইস্তাহার লেখকেরা ইউটোপিয়ায় সোস্যালিজম থেকে পৃথক করে একে বলেছেন সায়েন্টিফিক সোস্যালিজম। কিসে ? দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং বাস্তব প্রয়োগে। সেই প্রয়োগের প্রধান অবলম্বন ডায়েলেকটিক্স, দ্বন্দ্বপ্রগতি, অনিল রায় যাঁর বাংলা করেছেন দ্বন্দ্ব-সমন্বয়। সোজা বাংলায় বলতে গেলে পরিবর্তনের তিনটি স্তর Thesis, Anti-thesis, Synthesis, অনিলচন্দ্র তাদের সুন্দর বাংলা করেছেন স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি। সব কিছু এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে আবর্তিত, পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই পদ্ধতি অমোঘ, সব কিছু আবর্তিত পরিবর্তিত হচ্ছে এই পদ্ধতিতে কিন্তু এই পদ্ধতির নিজের কোন আবর্তন-পরিবর্তন নেই। মার্কস-এঙ্গেলস্ সব কিছুতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সব-কিছুর বিবর্তন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন ।

অনিলচন্দ্রের আপত্তি সেইখানেই ; তাঁর মতে সব-কিছুই বা কোনো কিছুই এইরকম একরোখা বা এক-রৈখিক গতিতে চলে না। এ ব্রহ্মাণ্ডে আরও অনেক কিছু আছে যা এই সরল রেখাকে আঁকাবাঁকা করে অথবা সর্পিল গতিতে নিয়ে যায়। তার মধ্যে সব চাইতে বড় কথা মানুষ, মানুষের জটিল কুটিল প্রকৃতি মন, তার ভাবনা, সব কিছুর ঊর্ধ্বে তার উত্তরণ। এই সংসারে তাই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির : আগে ভাব

এবং তারই আবিষ্কারে বস্তু? না, বস্তুজগত থেকে ভাবের উৎপত্তি। মার্কস বলেছেন, কারও অস্তিত্ব তার চেতনা থেকে নির্ণীত নয়, তার চেতনা তার অস্তিত্ব থেকেই নির্ণীত; it is not the consciousness that determines one's existence, it is the existence that determines one's consciousness। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদ অনুসারে man acted long before he thought। ভাববাদীরা একথা আদৌ মানেন না, বলেন, আমি, আমি চক্ষু উন্মীলন করলে তো জগৎ, আমিই জগতের স্রষ্টা। দুই বিপরীত মত। দু পক্ষ বিবর্তনে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় মানেন, কিন্তু ঘোড়া আগে, না আগে ঘোড়া এই নিয়ে তর্ক। এর মূলে আছেন হেগেল, তিনি তাঁর তত্ত্বে ভাবকে দিয়েছেন আগে কিন্তু গোলমাল বাঁধিয়েছেন পরম সত্যে, এবসলিউটে, যেখানে বিতর্ক শেষ, দ্বন্দ্বের প্রগতি সমাপ্ত। মার্কসবাদীদেরও তাই, পার্টি সংগঠনই শেষ, সেই রাষ্ট্র, সেখানে স্ট্যালিন-ট্রটস্কির রক্তারক্তি আছে, সাইবেরিয়া আছে, তার কনট্রাডিক্সান নেই, এন্টিথিসিস নেই, চিরস্থিতির প্রয়াস আছে। এই রাষ্ট্র অবিনশ্বর এবং এখানে ভাবের অন্ত্যেষ্টি, ফর্মুলাবহির্ভূত কোন কথা চলবে না, চিন্তা সমাপ্ত।

কি কি আছে এই মার্কসবাদে? অনিল রায়ের বিশ্লেষণ মতে (১) দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ (Dialectical Materialism) (২) ইতিহাসের জড়বাদী বা অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যা (Materialistic বা Economic Interpretation of History) (৩) উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব ও সমাজবাদ (Surplus value and Socialism) (৪) রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তিবাদ (Withering away of the State) (৫) বিবাহের ও পরিবারের বিলুপ্তি-বাদ (Abolition of Marriage and Family)।

মার্কসের দাবি তিনি হেগেল-ফয়ারবাকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদ নিয়েছেন বটে কিন্তু যার ছিল মাথা নীচে পা ওপরে, তাকে তিনি উল্টে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়েছেন: বস্তু আগে চেতনা পরে।

দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতির আর একটা কথা: একই সঙ্গে আছে এবং নেই। এই যে টেবিলটা এটা আছে বটে নেইও বটে। এর মধ্যে ক্ষয়ের বীজ রয়েছে, অবিশ্রান্ত এর অন্তর্য-বিনশন হয়ে চলেছে, এর ধ্বংসটা আকস্মিক নয়, ক্রমান্বিত। তেমনি এই যে আমরা বৃদ্ধি ও পরিবর্তন দেখি, ওর রীতিও তাই। অ্যানাবলিজম, ক্যাটাবলিজম মিলিয়ে মেটাবলিজম, জীবদেহে অসংখ্য কোষ জন্মাচ্ছে, অসংখ্য কোষ লয় পাচ্ছে। ফল কি হচ্ছে? বাচ্চুর গরু হচ্ছে, শিশু, কিশোর, যুবক প্রৌঢ়, বৃদ্ধ হচ্ছে, তারপর অস্তিম হচ্ছে। অর্থাৎ আদরের শিশু রাম আর যুবক রাম এক নয়, নামেই যা এক। অর্থাৎ ধীরে ধীরে পরিমাণগত পরিবর্তন হ'তে হ'তে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, শচীনদেব বর্মনের সেই গান—'তুমি আর নেই সে তুমি'।

অনিল রায়ের মতে, দুইটি বিরুদ্ধ সত্তা একই সময়ে একই অর্থে (অর্থাৎ রামও বটে রাম না-ও বটে) একই সত্তা হইতে পারে না। হেগেলের বিনশনের বিনশন বা Negation of Negation মূলতঃ ভুল। বস্তুতঃ, পরিবর্তন (change) আর বিলুপ্তি (Negation) একই বস্তু নয়। বীজ থেকে চারাগাছ, চারাগাছ থেকে বৃক্ষ,—বিনাশ বিলুপ্তির পরি-চায়ক নয়। এ বিকাশ (development), বিবৃদ্ধি (growth) বা পূর্ণতা প্রাপ্তি। রামের যুবকে পরিণতি রামের বিনাশ নয়, পূর্ণতা প্রাপ্তি। বিনাশ হবে কেন?

কয়েকটি উপাদানের অবর্তমানতা ঘটলে পরিবর্তন, সব উপাদানের বিলুপ্তি ঘটলে বিনাশ,—এই তাঁর মত।

এখানে অনিলচন্দ্রের সঙ্গে সহসা একমত হওয়া যায় না, বিশেষ করে তিনি যখন বলেন "যাহা সত্য তাহাই অসত্য হইতে পারে না", সেখানে কোষ ক্ষয়-বৃদ্ধি যে শারীর-ক্রিয়ার মেটাবলিজম তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় কথাটা দাঁড়ায় What is real, অর্থাৎ, এই যে আজ জনতা সরকার আছে, এইটেই সত্য। যে ভুল হেগেল করেছিলেন। সত্য ও সৌন্দর্য পরস্পরবিরোধী না হতে পারে, কিন্তু ও তো আপেক্ষিক। তিনি বলেছেন, পরিমাণের পরিবর্তন অর্থই আনুষঙ্গিক গুণগত পরিবর্তন। কিন্তু উত্তাপ ছাড়া তো বাষ্প হয় না, incubation ছাড়া ডিম ফোটে না।

তবে অনিলচন্দ্রের বিতর্ক মেনে একথা স্বীকার করতে হয় যে, ডিমের-মধ্যে বাচ্চার সম্ভাবনা থাকলেও তা আপনি ফোটেনা, বাইরের আর একটার স্পর্শ চাই, সেটা ঐ তিন অবস্থার, অর্থাৎ স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির বাইরে হয়ে গেল। অর্থাৎ একটা মীমাংসা এই যে, পারিপার্শ্বিকতা একটা গণ্য জিনিস। তাই থেকে বোধ হয়, efo ও ofe, অর্থাৎ environment-function-organism, organism-function বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, একটি আন্তঃক্রিয়ার ব্যাপার, আন্তঃক্রিয়ায় দু'পক্ষই সক্রিয়, কেউ যন্ত্রচালিত নয়, একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের ওপর প্রকৃতি ক্রিয়া করে, মানুষ আবার প্রকৃতির ওপর ক্রিয়া ক'রে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে; এই ভাবে সব কিছু চলছে। এই আন্তঃক্রিয়ার সমন্বিত ফল আজকের সভ্যতা বা সভ্যজগৎ। একটা সরল রেখার মত সে আসেনি, সর্পিল অথবা চক্রবৎ সে এসেছে। এই আন্তঃক্রিয়া না মানলে কিন্তু পার্টির ভূমিকাও থাকেনা। পার্টি পারিপার্শ্বিকতার ওপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্রিয়া।

অনিলরায়ের মতেও "কেবলমাত্র মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তিতে সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলে নাই। তেমনি শুধু পরিবেশও মানুষের ও সমাজের রূপান্তর ঘটাইতে পারে না। মানুষ এবং পরিবেশ এই দুই শক্তির সহযোগে ও সংঘাতে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। (পৃঃ ৫০) আধুনিক জ্ঞানের আলোকে ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই (pluralistic interpretation of history) বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত প্রমাণিত হইয়াছে।.....মানুষকে একদিকে প্রেরণা দিয়েছে তাহার জৈববৃত্তি, তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা, কামবৃত্তি এবং আত্মবিস্তারের তাগিদও; অন্য দিকে চালনা করিয়াছে তাহার মনোবৃত্তি, তাহার বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছা শক্তি ও ভাবশক্তি। এই বিভিন্নমুখী শক্তির সমাবেশে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং ইহাদেরই প্রেরণা তাহার মৌলিক প্রেরণা।

মূলত, ডায়লেকটিক্‌সকে মেনে আচরণবাদী আমি বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের এই বহুবাদী ব্যাখ্যাও মানি। একক মার্কস নয়, একক ডারুইন নয়, একক প্যাভ্‌লভ নয়, একক ফ্রয়েড নয়, আপাতঃদৃষ্টে একদেশদর্শী হলেও সব মূল সত্যের দিকে প্রধাবিত। ধন বৈষম্য যেখানে আছে সেখানে শ্রেণী সংগ্রামও আছে এবং তাইতেই তো চাই সমাজতন্ত্র, মানুষ যেখানে আছে সেখানে তার জৈবিক মানসিক বিবর্তনও আছে, সামাজিক চেতনার পেছনে অসামাজিক অবচেতন মনও সেখানে। আর আজ সমস্ত কিছুর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নির্ভর করছে ইলেকট্রনের রহস্যভেদের ওপর।

প্রথমটি
এখনই
নয়

দ্বিতীয়টি
যত দেরীতে
হয়

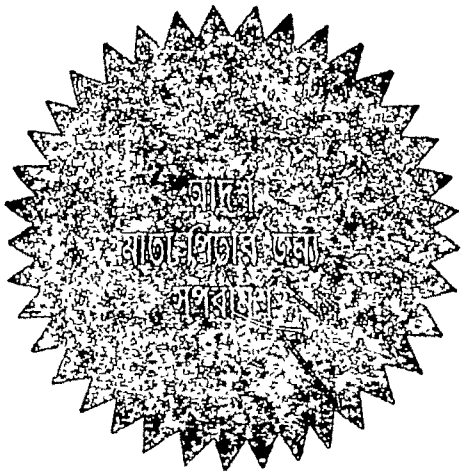

তৃতীয়টি?
কখনই
নয়

আপনার কাছাকাছি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
কিম্বা গ্রাম স্বাস্থ্য সহায়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং
সাজসরঞ্জাম দেবেন

আজই যোগাযোগ করুন

Davp 78/494

'সঞ্চয় যোজনা'-র এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করুন!

আপনি যে টাকা বিনিয়োগ করছেন তা আসলে জীবন বীমার সুরক্ষার জন্যেই কিনা—সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্যে এই ৫ টি প্রশ্ন!

এরপর যখন কেউ আপনাকে বীমার সুরক্ষা বিক্রী করতে আসবেন, তাঁকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন। তাহলে আপনার সুখ-সুবিধা আর নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবেন।

১) স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হলে কি আমি আমার পলিসি থেকে সুরক্ষা পাবো?

এল আই সি হল একমাত্র বীমা প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ লোককে স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হলে সুরক্ষা দেয়। আর শতকরা ৯২% ভাগ লোকের মৃত্যু এইভাবেই হয়ে থাকে। এছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেও এল আই সি সুরক্ষা দেয়। তথাকথিত বহু বীমা যোজনা কেবল আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেই সুরক্ষা দেয়। এল আই সি একই পলিসিতে আপনাকে দুয়ের জন্যেই সুরক্ষা দেয়।

২) আমার দাবী ন্যায়সঙ্গত হলে যে তা পূরণ করা হবেই—এ বিষয়ে কি আমি নিশ্চিত হতে পারি?

এল আই সি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, যারা সমাজসেবা আপনাকে জীবনবীমার সুরক্ষা দেয় বলে দাবী করে থাকে, মৃত্যুর ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যু সংবাদ না পেলে আপনার দাবী মেনে নেয় না। এল আই সি-তে এই ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই।

৩) আমি যে টাকা জমা দিচ্ছি তার ওপর কি আয়করের ছাড় পাওয়া যাবে?

এল আই সি-র প্রিমিয়ামের টাকার বিদ্যুৎ অংশ আয়করের ছাড় হিসেবে আপনার কাছে ফিরে আসে। অন্য কোনো 'যোজনায়' টাকা জমা দিলে তা থেকে এ ধরনের ছাড় পাওয়া যায় না।

৪) আমার জমা করা টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কি আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি?

এল আই সি-র পেছনে আছে ভারত সরকারের পুরোপুরি সমর্থন। আপনার সঞ্চয় যে সুরক্ষিত থাকে এবং আমরা যে আমাদের প্রতিশ্রুতি রাখি-এ হল তার গ্যারান্টী। অন্য কোনো 'যোজনা' আপনাকে এই গ্যারান্টী দিতে পারে না।

৫) পলিসি নেবার সময় থেকেই কি বীমার পুরোপুরি সুরক্ষা পাওয়া যায়?

এল আই সি হল একমাত্র বীমাকারী যে জমা দেওয়া 'প্রীমিক'-র দেয়ার পুরো হওয়া মাত্র মৃত্যু হলেও বীমার পুরো টাকা দিয়ে দেয়। অন্যান্য 'যোজনা'—হয় তা আংশিকভাবে দেয়, নয়তো একেবারেই দেয় না।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকেই বুঝতে পারবেন, আপনি আসল জীবনবীমার পলিসিতে বিনিয়োগ করছেন, না জীবনবীমার সুরক্ষার নামে আপনাকে অন্য কিছু গছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

জীবনবীমার কোনো বিকল্প নেই

daCunha/LIC/59 SN

বাংলা ভাষায় নেতাজী-চর্চা

পবিত্রকুমার ঘোষ

এ যুগে সুভাষচন্দ্রের লোকোত্তর জীবন, তাঁর ধৈর্য সহিষ্ণুতা, সংযম বীর্য, তাঁর আজীবন সংগ্রাম, বিশাল ভারতবর্ষের এমনকি বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত তাঁর জীবন, তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে মহাজাতির নবীন উত্থান-প্রয়াস, পদে পদে তাঁর বাধা, রামচন্দ্রের মতো বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাঁর লড়াই দেশের হৃত কল্যাণলক্ষ্মীর উদ্ধারে, পাণ্ডবদের মতো তাঁর লড়াই স্বজাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে—সেও এক গৃহযুদ্ধ—সুভাষচরিত্রে আমরা পাই এক মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও এক লোকজীবনের নিয়ন্তা পুরুষের অতল গভীরতা; তাই বাংলা সাহিত্যে সুভাষচন্দ্রের জীবন সম্পদ নতুন মহাকাব্যের আধার হয়ে উঠবে। যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান-বোধিত যুগে এ মহাজীবনের উন্মেষ ঘটেছে ও আধুনিক জটিল মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের জন্য যে মহাকাব্য রচিত হবে তাই সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দ বা বাংলা পয়ার ছন্দে তা রচিত হতে পারেনা—যদিও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য সে চেষ্টা করেছেন, বাংলা পয়ার ছন্দে সুভাষচন্দ্রের জীবন-কাহিনী পরিবেশন করেছেন তিনি—গদ্য ভাষাই আধুনিক কালের ভাষা এ কথা তিনি মনে রাখেননি। সুভাষচন্দ্রের জীবনকাব্য গদ্যভাষায়ই রচনা করতে হবে, নতুবা সে দূরবিসারী জীবনকথা, তাঁর জটিলতার গ্রন্থি-মোচন, সে জীবনে দেবতা ও অসুরের সংগ্রাম, সমুদ্রমন্থনে নীলকণ্ঠের মতো তাঁর বিষ পান—সাবেকী পদ্যে কোনো মতেই তা ফোটানো যাবে না।

সুভাষচন্দ্রের জীবন কবি-কল্পনাকেও উদ্বোধিত করেছে—এ কালের বহু কবি কবিতা লিখেছেন তাঁকে নিয়ে। যতীন্দ্রমোহন বাগচি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, বনফুল কাজী আবদুল ওদুদ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শান্তশীল দাস প্রমুখ প্রখ্যাত কবিরা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন—দিলীপকুমার রায় তাঁর কবিতা ও গান দুইই রচনা করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই নজরুল ইসলাম জানহারা অবস্থায় না থাকলে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বাংলা ভাষায় অসামান্য এক বা একাধিক কবিতা লিখতেন। আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনকথা 'উদ্যত খড়্গ' নামে এক পুস্তকে অনুপম ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্য ও রসসৃষ্টি ঝলমল করে উঠেছে এ বইয়ের পাতায়। অচিন্ত্যকুমারের সুনিপুণ লেখনী একখানি গদ্যকাব্য উপহার দিয়েছে আমাদের—এর সঙ্গে গভীরতা ও তন্ময় নিষ্ঠা যুক্ত হলে এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে কালোত্তীর্ণ এক সম্পদে পরিণত হতে পারত। সে পক্ষে বাদ সেধেছে লেখকের চঞ্চলতা ও বহু সেবাবুদ্ধির বিভ্রম।

ভাষার সম্পদে ও লিখন শৈলীর বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান গ্রন্থ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ'। এই লেখক ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী, তিনি স্মৃতি-চারণের রীতিতেই সুভাষ-কথা পরিবেশন করেছেন। তাঁর নিজের দেখা ও জানা অংশই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, পুরা সুভাষ জীবনকথা নয়। তবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অংশ তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ভুক্ত নয়—সে অংশ রচনায় তিনি গ্রন্থাদির সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর

গ্রন্থ সুলিখিত, কিছু নতুন বিষয় জানিয়েছে আমাদের, কিন্তু নাটকীয়তার দিকে তাঁর ঝোঁক প্রবল এবং গ্রন্থবর্ণিত কোনো কোনো ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিজের জীবন নিষ্ঠাযুক্ত না হলে সুভাষচন্দ্রের মহৎ জীবনকে স্পর্শ করা যায় না প্রবেশ করা যায় না তার গভীর তাৎপর্যে—এবং কালেরও একটা ব্যবধান থাকা চাই। সুভাষচন্দ্রের নিকট-সান্নিধ্যের মানুষদের পক্ষে যেমন সুবিধা তেমনই অসুবিধাও আছে তাঁর সম্পর্কে রচনায়—সে জীবনের পূর্ণায়ত মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে কিছু কালের ব্যবধান হয়তো দরকার।

স্মৃতিচারণী রীতিতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সবচেয়ে উজ্জ্বল রচনা অবশ্যই দিলীপকুমার রায়ের। কিন্তু তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে The Subhas I Knew, যার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'সুভাষকে আমি যেমন দেখিয়াছি' নামে। সেই বইয়ে এবং পরে আত্মজীবনীতে মূল বাংলা ভাষায়ই সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন দিলীপকুমার। অন্তরঙ্গ বন্ধুর লেখনীও যে বন্দনার স্তব রচনা করতে পারে দিলীপকুমার তা দেখিয়েছেন। তিনি আকৈশোর সুভাষের গুণমুগ্ধ বন্ধু-কিন্তু তাঁর লেখনীতে সুভাষচন্দ্রের দেবতাসদৃশ চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, এটা বিস্ময়কর। বন্ধু যে বন্ধুর মহত্ত্ব এমন অকুণ্ঠভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করতে পারে এ দৃষ্টান্ত বেশি নেই। তবু দিলীপকুমারের লেখায় অতি-রঞ্জন নেই, বানানো ঘটনা নেই, আন্তরিকতার দ্যুতিতে তাঁর রচনা উজ্জ্বল। তবু আক্ষেপ জাগে—দিলীপকুমার যদি কালের ব্যবধান পেতেন, কিংবা তাঁর যদি থাকত আরও একটু ইতিহাসবোধ! তাঁর প্রসন্ন উদারতা অনেক সময় মুড়ি-মিছরিকে এক দর করে ফেলেছে—এটা তাঁর রচনা-গৌরবের পক্ষে হানিকর।

স্মৃতিচারণী সাহিত্যে সুভাষ-চরিত্রকে উজ্জ্বলভাবে এঁকেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। 'বনস্পতির বৈঠক' গ্রন্থে প্রবোধকুমার বারবার সুভাষচন্দ্রের কথা এনেছেন। এই বইয়ে প্রবোধকুমার সমকালের বহু ব্যক্তির চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক উদ্ঘাটন করেছেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধায় উদ্দীপ্ত হয়েছে তাঁর লেখনী এক ভাস্বর রামধনুর রূপ এঁকেছেন সেই তরুণচিত্তহারী মানুষটির। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কিছু কথা পাই শিবরাম চক্রবর্তীর আত্মজীবনী 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য়। শিবরাম তাঁর বঙ্কিম দৃষ্টিতে ও ব্যঙ্গাত্মক রীতিতে তদানীন্তন কালের কথা লিখেছেন, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি কিছু তিক্ততাময়, কিন্তু সুভাষচরিত্রের মহত্ত্বও তিনি স্মরণ করেছেন। কিন্তু খুবই বিরস তিক্ত ভঙ্গীতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আমেদ লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়, যেমন একদা লিখেছিলেন মার্ক্সবাদী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বই থেকে পরে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কটু মন্তব্য বাদ দিয়ে দিয়েছেন। মার্ক্সবাদী পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জির স্মৃতি-কথা 'তীর থেকে তরী'তে এ ধরণের তিক্ত মনোভাব প্রকাশ পায়নি, বরং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তিনি সশ্রদ্ধ বর্ণনা ও মূল্যায়ন করেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যৌবনে ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী ও সুভাষচন্দ্রের অনুগামী। সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধে তিনি সুভাষচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তারাশঙ্করের সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যথোচিত মর্যাদা পেয়েছে। পরিণত বয়সে 'যোগভ্রষ্ট' ও 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাস দুটিতে তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন। 'যোগভ্রষ্টে'র নায়ক সুদর্শন জীবনসত্যের অনুসন্ধানে বেরিয়ে স্মরণ করেছে সুভাষচন্দ্রকে—যদি একবার তাঁর সান্নিধ্যে সে আসতে পারত তবে হয়তো তার জীবন সার্থক ও ফলবান হত; কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন এই তার দুঃখ। 'ঝড় ও ঝরাপাতা' আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকাহিনী প্রচারের ফলে ১৯৪৬ সালে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেশে সৃষ্টি হয়েছিল তারই জীবন্ত

আলেখ্য। এ উপন্যাসে এমন কি শরৎচন্দ্র বসুর কথাও আছে, যেমন আছে রসিদ আলি দিবসের উত্তাল কলকাতার বর্ণনা। তারাশঙ্কর কোনো কোনো প্রবন্ধেও সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর আন্তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কথাসাহিত্যে সুভাষচন্দ্রের ছায়াপাত আরও ঘটেছে। যুদ্ধকালের পটভূমিতে রচিত সমরেশ বসুর উপন্যাস 'যুগ যুগ জীয়ো' ও বরেন বসুর 'রঙরুট' উপন্যাসে আজাদ হিন্দের দূরাগত পদধ্বনি শোনা যায়।

জনপ্রিয় রচনা হিসাবে নারায়ণ সান্যালের 'আমি নেতাজীকে দেখেছি' ও শৈলেশ দে রচিত 'আমি সুভাষ বলছি' বই দুটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীসান্যাল কয়েকটি ডায়েরির উপর নির্ভর করে তথ্যভিত্তিক কিন্তু রোমান্সধর্মী বই লিখেছেন—আগাগোড়া তিনি বিষয়োপযোগী গাম্ভীর্য বজায় রেখেছেন। নেতাজী-চরিত্রের মহিমা এ বইয়ে সুপরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু শৈলেশ দে জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রচনা শৈলীকে তরল করে তুলেছেন, আপত্তিকর কাল্পনিক চরিত্র আমদানী করেছেন, একপেশে তথ্য পরিবেশন করেছেন কিংবা তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। শৈলেশ দের বই বহু প্রচারিত হয়েছে ও বর্তমান সময়ের ছাত্র ও তরুণরা এই বই থেকে নেতাজী ও ভারতের বিপ্লব অন্দোলন সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছে—সেদিক থেকে এ বইয়ের সার্থকতা অস্বীকার করা চলে না।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আরও কিছু জনপ্রিয় বইয়ের নাম উল্লেখ করা উচিত। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সুভাষচন্দ্র, ও নেতাজী', নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সুভাষচন্দ্র' দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল রচিত 'সুভাষচন্দ্র', দেবজ্যোতি বর্মণ রচিত 'নেতাজী' ভালো তথ্যভিত্তিক বই। এঁরা সকলেই বাংলা ভাষায় খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। দেবজ্যোতি বর্মণের বইখানি শারদীয় সংখ্যা 'যুগবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি, কিন্তু তিনি সংক্ষেপে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভূমিকা সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগমণ্ডিত ভাষায় সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন-কথা লিখেছিলেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সরল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষায় সুভাষ-চরিত্রের আলেখ্য নিপুণ হাতে এঁকেছিলেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে তাঁর প্রত্যক্ষ জানা কিছু নতুন ঘটনা লিখেছিলেন, যা সুভাষ-চরিত্র বুঝতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সুভাষজীবনের কোনো কোনো অংশের ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে রচিত বইগুলির মধ্যে হেমন্তকুমার সরকারের 'সুভাষের সঙ্গে বারোবছর' ও সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'সুভাষচন্দ্রের ছেলেবেলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারু গঙ্গোপাধ্যায় বাল্যে কটকে সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন—সে সময়ের অনেক কথা তাঁর প্রত্যক্ষ জানা ছিল। সেই সূত্রে সুবোধবাবু সেই সব ঘটনা তাঁর বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। হেমন্তকুমার সরকার সুভাষচন্দ্রের কৈশোর-যৌবনের সঙ্গী ও রাজনৈতিক সহকর্মী—পরে অবশ্য ভিন্ন মতে তিনি দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁর বই সুভাষচর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান।

সুভাষচন্দ্রের জীবনকাহিনীর অংশ বিশেষের ওপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে গবেষণা-গ্রন্থও কিছু রচিত হয়েছে। নেপাল মজুমদার লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র'। ভালো ও বিশ্লেষণধর্মী বই—কিন্তু লেখক তাঁর দৃষ্টির সংকীর্ণতাও চিত্তের অসূয়া মুক্ত হলে সুভাষচন্দ্রের নীতি ও কর্মপন্থা যথার্থভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারতেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু রচিত 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং' একখানি প্রকৃত গবেষণাধর্মী বই, লুপ্ত তথ্যকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন লেখক, তাঁর স্বচ্ছন্দ-গতি ভাষা নীরস তথ্যকেও উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। নন্দ মুখার্জি রচিত জার্মণীর চোখে নেতাজী' আর একখানি গবেষণা পুস্তক যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে

নেতাজীর ভূমিকা তথ্য ও সত্যের আলোয় প্রকাশিত করেছে। অশোক মুস্তাফি রচিত 'সুভাষচন্দ্র ও ব্রহ্মদেশ' একখানি সদ্য প্রকাশিত পুস্তক—যাতে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘদিনের যোগাযোগের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। অনেক নতুন তথ্য লেখক এ বইয়ে পেশ করেছেন ও ব্রহ্মে নেতাজীর কর্মসাধনার মূল্যায়নও করেছেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি রহস্যঘন চূড়ান্ত মুমূর্ষু—মহাযুদ্ধের সময় নিজ গৃহ থেকে তাঁর অন্তর্ধানের ক্ষণ, সেই যাত্রার জন্য দীর্ঘকালীন গোপন প্রস্তুতি, যাবার দিন ও রাতের কথা, গোমো পর্যন্ত যাত্রা, যুদ্ধের সময়ে শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর সংযোগ রক্ষার কথা—এই সব রহস্যাবৃত অজানা অধ্যায় আলোকিত হয়েছে ডাঃ শিশির বসুর সুলিখিত গ্রন্থ 'মহানিষ্ক্রমণ'-এ। ডাঃ বসু ভাষার সংযম ও বর্ণনার যথাযথ্যে বিষয়ের প্রতি সুবিচার করেছেন, বহু দুরূহ তথ্য উপহার দিয়েছেন আমাদের।

সুভাষচন্দ্রের সে মহাযাত্রার আর একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর যাত্রাসঙ্গী ভগৎ রামের লেখনী থেকে। ডাঃ শিশির বসু যেখানে তাঁর বর্ণনা শেষ করেছেন, ভগৎরাম সেখান থেকে আরম্ভ করেছেন। আফগানিস্থান থেকে সুভাষচন্দ্র ইয়োরোপের পথে চলে গেলেন—তারপরও কিভাবে দেশের বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন, ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব ঘটাবার অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন, ভগৎরাম সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। ভগৎরামের বই মূল ইংরেজিতে রচিত—কিন্তু তার বাংলা সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা উল্লেখ করলাম।

ইয়োরোপ ঘুরে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত আরও কিছু বিবরণ সংগ্রহ করে এনেছেন কৃষ্ণা বসু। তাঁর 'ইতিহাসের সন্ধানে' বইয়ে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কিছু আপত্তি আছে। যেমন, অধ্যাপক ওটেন সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষ্ণা বসুর ব্যাখ্যার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অধ্যাপক ভোলানাথ রায় তাঁর Oaten Incident গ্রন্থে। আমি ভোলানাথ রায়ের ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করেছিলাম, এখনও করি—কিন্তু এখন একটু সংশোধন করতে চাই। সুভাষচন্দ্র নিজে অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার করেননি বলে এখন পাকা তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তিনি দায়ীও ছিলেন না এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে।

বাংলা ভাষায় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আরও কয়েকটি গ্রন্থের আমি নাম উল্লেখ করছি : নির্মলচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'নেতাজী সুভাষ' (১৯৪৫), বিশ্বেশ্বর দাস রচিত 'রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র', জ্যোতিপ্রসাদ বসু রচিত 'নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ' (১৯৪৮), মণি বাগচি রচিত 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' (১৯৬৫) প্রকাশ ভট্টাচার্য রচিত 'নেতাজী ও কুইশলিং প্রসঙ্গ' (১৯৭৫) শৈলেশনাথ বিশী রচিত 'সুভাষ-স্মৃতি', রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র' (১৯৭০), শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'নেতাজী সুভাষ' (১৯৬৬), পূর্ণচন্দ্র দাস রচিত 'নেতাজী সুভাষ' (১৯৫০), শিশির দাস রচিত 'মহানায়ক নেতাজী সুভাষ' (১৯৬৮), মৃত্যুঞ্জয় দে রচিত 'নেতাজী সুভাষ' (১৯৪৮) বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'সুভাষ-স্মৃতি' (১৯৭০) সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'গান্ধীজী ও নেতাজী', (১৯৪৯), সমীর ঘোষ রচিত 'আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী' (১৯৪৬), সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ রচিত 'সবার প্রিয় সুভাষ' (১৯৭০), উমাপদ খান রচিত 'নেতাজীর পদক্ষেপ' (১৯৫২) হেমেন্দ্রবিজয় সেন রচিত 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' (১৯৪৭) মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'তোমাদের সুভাষচন্দ্র' (১৯৪৬)।

বাংলা ভাষায় নেতাজী সম্পর্কে প্রকাশিত সব গ্রন্থের নাম দিতে পারিনি—আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। তাছাড়া দিতে পারিনি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধের নাম, কেননা তা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট করতে পেরেছি যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকরা সুভাষচন্দ্রের জীবনসাধনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন—লিখেছেন তাঁর কথা প্রবন্ধে

কবিতায়, উপন্যাসে, জীবনী ও আত্মজীবনীতে। অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান লেখকরাও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে আগ্রহ বোধ করেছেন এবং এখনও মাঝে মাঝে কোনো না কোনো বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃত গবেষকরাও এগিয়ে আসছেন তথ্য উদ্ঘাটন ও নবতর মূল্যায়নের দাবী নিয়ে,—এ সবই আশার কথা।

তবু বলব এখন পর্যন্ত যা হয়েছে সুভাষচন্দ্রের মহাজীবন সম্পর্কে তা শুধু আলোচনার সূত্রপাত মাত্র। সকল তথ্য আবিষ্কার করতে ও বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করতে আরও বহু বছর লেগে যাবে আমাদের। সরকারী বা প্রতিষ্ঠানিক সাহায্য ও সম্মিলিত উদ্যোগ না হলে সম্ভবত সব তথ্য আবিষ্কার করা যাবেও না। তবু সব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বলব সুভাষচন্দ্রকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করে বঙ্গজননী যেমন ধন্য ও পরিতৃপ্ত, সে মহাজীবনের কথা আলোচনা, বর্ণনা ও অঙ্কিত করার সৌভাগ্যে বাংলা ভাষাও তেমনই ধন্য ও গর্বিত। বাংলা সাহিত্য নতুন রসসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সে মহাজীবনের অবলম্বনে—যাঁরই সাহিত্যবোধ আছে তিনিই সেকথা স্বীকার করবেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ প্রচারে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে এই প্রসঙ্গে তাদের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথম মনে আসে মহাজাতি সদনের কথা, সুভাষচন্দ্রই যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী উপলক্ষে এখন সদনের কর্তৃপক্ষ উৎসব ও আলোচনার ব্যবস্থা করেন—কিন্তু বাকি সারা বৎসর তাঁরা চুপচাপ থাকেন। মহাজাতি সদন এখন বিখ্যাত হয়েছে যাত্রা-থিয়েটার-যাদু প্রদর্শনী ও জনসভার জন্য হল ভাড়া দেবার কারণে, নেতাজীর পরিকল্পিত কর্মসূচী আদৌ সদন-কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেন না। মহাজাতি সদন সুভাষচর্চার তথা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয়নি।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো। এই সংস্থা সুভাষ চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সেমিনার, আলোচনা সভা, সঙ্গীত অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্রে নেতাজীর কর্মধারা প্রদর্শন, গ্রন্থাগার, গবেষণা, পুস্তক প্রকাশনা ইত্যাদি নানা দিকে ব্যাপ্ত এই সংস্থার কর্মসূচী। নেতাজীর নিজের রচনাগুলি প্রকাশ করে ও তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বহু গবেষণা-পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করে সংস্থা-কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নেতাজী ভবনে রক্ষিত তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও বিচিত্র আলোকচিত্র জাতির চিত্তে নেতাজীর স্মৃতি ও সান্নিধ্য জাগরূক রাখছে।

শরৎ বসু একাডেমী বহু বর্ষ যাবত নেতাজী ও শরৎচন্দ্র বসু সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করে আসছেন। বিশিষ্ট বিদ্বৎবৃন্দ প্রতি বছর একাডেমি কর্তৃক আহূত সভা ও সেমিনারে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভূমিকার ওপর নতুন নতুন আলোকপাত করে আসছেন, লিওনার্ড গর্ডনের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে সুভাষ-চন্দ্রের জীবন ও ভাবাদর্শ আলোচনা করতে গেলে শরৎচন্দ্র বসুর সক্রিয় ভূমিকাকে বাদ দিলে কোনোমতেই চলতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজও শরৎচন্দ্র বসুর কোনো বিস্তৃত ও উল্লেখযোগ্য জীবনী রচিত হয়নি। তাঁর কাছে বাংলা ও ভারতের ঋণ অনেক, এবং সে ঋণ পরিশোধের সামান্য চেষ্টাও আমরা করিনি। শরৎচন্দ্রের সাহসবিস্তৃত বক্ষপট সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে ধারণ ও বহন করার জন্য নিয়তই প্রসারিত ছিল—একথা আগেই বলেছি। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিভা ও খ্যাতির দ্বারা জাতীয় জীবনে শরৎচন্দ্রের ন্যায়সঙ্গত প্রতিষ্ঠা কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েছে একথাও অনস্বীকার্য। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা না হলে সুভাষ-জীবনের চিত্রও সম্পূর্ণ হবেনা, একজন মহান জাতীয় নেতার ঐতিহ্য ও অবদান সম্পর্কেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনবহিত থেকে যাবে। শরৎ বসু একাডেমি এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এই অনুরোধ জানাই।

মাঘ' ৮৫-৫

সম্প্রতি 'সুভাষ স্কুল অব পলিটিক্স' নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে সুভাষ-জীবন ও সুভাষদর্শন ও অন্য নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁরা আলোচনার অনুষ্ঠান করে আসছেন, গবেষণায়ও উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং সুভাষচন্দ্র বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশেও তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন।

সবশেষে যে প্রতিষ্ঠানটির নাম করছি গুরুত্বের দিক থেকে তাঁদের স্থান সবার শেষে নয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে একজন পুরোধা ও পথিকৃত, নারী জাগরণে অনন্য ভূমিকার অধিকারিণী, সুভাষবাদের অন্যতম প্রবক্তা লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত-সম্পাদিত জয়শ্রী পত্রিকার অসমান্য অবদান আছে সুভাষচর্চার ক্ষেত্রে। ত্রিশের দশকের গোড়া থেকে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবত সকল জাতীয় সংগ্রামে জয়শ্রী পত্রিকা তার নির্ভীক কণ্ঠের উচ্চারণে, তার আপসহীন সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গীতে, সুভাষচন্দ্রের আদর্শের অনুসরণ ও অনুশীলনে অবিচলিত থেকেছে। কোনো সঙ্কটেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কোনো বিপদেই সে কম্পিত হয়নি—নিদারুণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সুভাষচন্দ্রের জীবন ও আদর্শ ব্যাখ্যা ও প্রচারে জয়শ্রী অম্লান দীপ্তিতে তার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। ঐ পত্রিকাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে জয়শ্রী প্রকাশন যা সুভাষচন্দ্রের রচনাবলী ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী একের পর এক প্রকাশ করে চলেছে। গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের এই বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মধ্যেও সুভাষবাদের অনির্বাণ শিখা সচেতনভাবে বাংলায় কেউ যদি প্রজ্জ্বলিত করে রেখে থাকে তবে সে কৃতিত্ব এই নাতিবৃহৎ প্রতিষ্ঠানেরই প্রাপ্য।

আর একটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। কয়েক বছর যাবত সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সভায় ও সেমিনারে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে একটা বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। শান্ত আলোচনার পরিবেশে ধীর বিবেচনার বদলে 'নেতাজী জীবিত আছেন কিনা' একমাত্র এই প্রশ্ন সম্পর্কে উত্তেজিত আলোচনার জন্য ক্রুদ্ধ দাবী উঠে আলোচনার পরিবেশকেই ঘুলিয়ে তোলা হয়। যখন ধৈর্য ধারণ করাই প্রয়োজন তখন উত্তাল চঞ্চলতা কেন? বরং সুভাষচন্দ্রের আদর্শ, দর্শন, রাষ্ট্রীয় মতামত তাঁর জীবনের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সীরিয়াস পরিবেশ একেবারে বিপর্যস্ত করে তুললে কোনো সুস্থ চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানই তো চলে না। সুভাষ অনুরাগীদের কাছে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বনের জন্য আবেদন করব এবং ইতিহাস নতুন পথে বাঁক নেবার আগ্নেয় ইশারা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে কিনা তা ধীরভাবে অনুধাবন করার জন্য বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করার অনুরোধ জানাব।

আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী ও স্বাধীনতা

ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

২১শে অক্টোবর '৪৩-এ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র সেই সরকারের মন্ত্রী-সভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্র হ'ন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব। সরকারের ঘোষণাপত্রের মধ্যে বলা হয়, : 'এই অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে বৃটিশ ও তার মিত্রশক্তিকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করা, তারপর .....ভারতবাসীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁদের বিশ্বাসভাজন একটি স্থায়ী সরকার গঠন। এই সরকার প্রত্যেক নাগরিককে যে কোন ধর্ম-পন্থা অনুসরণের স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও সমান সুযোগ দিবার প্রতি-শ্রুতি দিচ্ছে। সমগ্রজাতির সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে আজাদ হিন্দ সরকার কৃতসংকল্প। বিদেশী সরকার ভারতবাসীদের মধ্যে যে নানাপ্রকার বিভেদসৃষ্টি করেছিল এই সরকার তা নিঃশেষ করবে। .... ভগবানের নামে, আমাদের যে সব পূর্বপুরুষ ভারতীয় জনগণকে এক-জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করে গেছেন তাঁদের নামে .... আমরা প্রত্যেক ভারতীয়কে আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছি। .....'

২২শে অক্টোবর '৪৩ সিঙ্গাপুরে ঝাঁসির রাণী বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত হয়। নয়টি রাষ্ট্র (জার্মানী, জাপান, ইটালী, চীন-নানকিং সরকার, মাঞ্চুকুয়ো, ক্রোয়েসিয়া ফিলিপাইন, বর্মা, শ্যামদেশ,) আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করে নেয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ডি, ভ্যালেরা নেতাজীকে ব্যক্তিগত অভিনন্দন পাঠান। ২৩শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে দুই ডিভিসন সৈন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং তৃতীয় ডিভিসন তৈরীর কাজ চ'লছিল। আর ও দু'টি ডিভিসনের জন্য সৈন্য সংগৃহীত হ'চ্ছিল।

১৯৪৫ সালে এই সৈন্যসংখ্যা ৪৫ হাজারের কম ছিল না।[১০] অনেকের মতে এই সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশী ছিল। .. সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাবকমিটিগুলি সাধারণভাষা, রোমানলিপি প্রবর্তন, নারীপুরুষের পোষাক, জয়হিন্দ অভিবাদন, স্মারকমেডেল ও উপাধিপ্রদান, সৈন্যদের ভাতা পেনসন ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে তা কার্যকরী করতে সাহায্য করে। মুক্তাঞ্চলে প্রশাসনিক সংগঠনের জন্য বিভাগ সৃষ্টি হয়। ২৫শে অক্টোবর নেতাজী বৃহৎ পূর্বএশীয় সম্মেলনে (Great East Asia Conference) যোগদানের জন্য টোকিয়ো যাত্রা করেন। মেঃ জেঃ ভোঁসলা (সৈন্যাধ্যক্ষ), এস, এ, আয়ার (প্রচার সচিব), এ, এম, সহায় (সরকারের সেক্রেটারী) এবং মেজর আবিদ হাসান নেতাজীর সঙ্গে যান। ৫ই নভেম্বর এই সম্মেলন সুরু হয়। নেতাজী এই সম্মেলনে সরকারের তরফে একজন দর্শক হিসাবে যোগ-দান করেন। সম্মেলনে রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে (১) স্বাধীনতা (২) ন্যায় ও (৩) পারস্পরিকতার নীতি গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র ৬ই নভেম্বর ১৯৪৩ এ, তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বলেন, বিভিন্ন সময়ে জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রচেষ্টা হয়েছে কিন্তু তা ফলবতী হয়নি, সংগঠন-

কারীদের তৎপরতা, লোলুপতা ও সন্দেহপরায়ণতাই ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ···রাষ্ট্রপ্রধানগণ! আপনারা জানেন বিশ্বজনীনেতা ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।...অনেক দুঃখ, কষ্ট ও অবমাননার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে শিখেছি মিথ্যা আন্তর্জাতিকতা আর সত্য আন্তর্জাতিকতার পার্থক্য কি? .. বুঝেছি সেই আন্তর্জাতিকতাই সত্য যা জাতীয়তাকে অবহেলা করে না এবং জাতীয়তাই যার ভিত্তি। ..... বৃটিশ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ থেকে মুছে যাবে ..পূর্ব এশিয়া থেকে ভীতির ছায়া চিরদিনের মত লুপ্ত হবে। .. ' ''

এই সম্মেলনেই তোজো আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। তিনি বলেন, নেতাজী ভারতের প্রধান হবেন। সুভাষচন্দ্র এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন— তোজো নন, ভারতের জনগণই স্থির করবেন স্বাধীন ভারতের প্রধান কে হবে। তিনি একজন সেবকমাত্র। নেতাজী ডিসেম্বরের ('৪৩) মধ্যেই আন্দামান যান এবং উক্ত দ্বীপ-পুঞ্জগুলির নামকরণ করেন শহীদ ও স্বরাজ-দ্বীপ। সেখানে আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলিত হয় এবং সেলুলার জেল থেকে সমস্ত রাজ-নৈতিক বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করা হয়। এই দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার মেঃ জেঃ এ ডি, লোগনাথনের উপর ন্যস্ত করেন। জানুয়ারী '৪৪ এ রেঙ্গুনে ফিরে আসেন এবং ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৪ এ সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে সরকার, ফৌজ ও স্বাধীনতালীগের হেড কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত হয়। আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে ভারতীয়দের অর্থে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

৪ঠা জুলাই ১৯৪৩ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেই অভা-বনীয় দ্রুততার সঙ্গে লীগ, ফৌজ ও সরকারী দপ্তর সমূহ সংগঠিত ক'রে আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। নভেম্বর '৪৩ এ প্রথম রেজিমেণ্টকে সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বাধীনতা লীগ সৈন্য বাহিনীকে এবং সরকারী দপ্তর সমূহকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। মালয়ে এই লীগের শাখা ছিল ৭০টি এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২লক্ষ। বর্মায় ও শ্যামে যথাক্রমে ১০০টি ও ২৪টি শাখা গঠিত হয়। আন্দামান সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, ফিলিপাইন, চীন মাঞ্চুকুয়ো এবং জাপানে লীগের শাখা স্থাপিত হয়। আজাদী বাহিনীগুলির নামকরণ করা হয়, আজাদ ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড প্রভৃতি। ঝাঁসির রাণীবাহিণী, বালসেনাদল, আত্মঘাতী স্কোয়াডও গঠিত হয়েছিল। সুভাষ ব্রিগেড গঠিত হ'লে নেতাজী ঐ নাম খারিজ ক'রে দেন। আজাদী সৈনিকগণ একই রন্ধনশালায় তৈরী খাবার একসঙ্গে আহার করতেন। নেতাজী নিজে আহার্য খেয়ে দেখতেন ও ব্যারাক পরিদর্শন করতেন।

১৮ই মার্চ ১৯৪৪ এ আজাদী ফৌজ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কোহিমা অধিকার ক'রে এপ্রিলে তারা ইমফলের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে আসে এবং সেখানে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজ দ্রুততালে চলতে থাকে। নাগারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজাদী বাহিনীকে সাহায্য করে। আরাকান, কালাদান, হাকা-ফালম, কোহিমা ইম্ফলের প্রান্তরে প্রান্তরে আজাদী বাহিনীর যুদ্ধজয়ের গৌরব সকলের মনে বিপুল উৎসাহের ও উন্মাদনার সৃষ্টি করে। কিন্তু সে বৎসর অনেক আগে মৌসুমীর দুর্ভাগ্যজনক আগমন ও জাপানী বাহিনী-গুলির কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রতিকূল হ'য়ে দাঁড়ায়। জুনের শেষে নেতাজীর আদেশে

প্রথম ডিভিসন পিছনে ফিরে আসতে থাকে। ৪ঠা থেকে ১১ই জুলাই (১৯৪৪) নেতাজী সপ্তাহ পালিত হয়। এক বৎসর আগে নেতাজী এই দিনে (৪ঠা জুলাই ১৯৪৪) নেতাজী সপ্তাহ পালিত হয়। এক বৎসর আগে নেতাজী (৪ঠা জুলাই ১৯৪৩) ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ই জুলাই ১৯৪৪ নেতাজী মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে ভাষণ দেন; 'ভারতের বাইবে যে সব ভারতীয় আছেন তাঁদের কাছে পদ্ধতিব অনৈক্য, পারিবারিক অনৈক্যের সমান। প্রবাসী ভারতীয়গণ আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন, ১৯৪২-এব আগষ্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব ঘোষণাব পর তা তাঁদের শতগুণ বেড়ে গিয়েছে। .. বাইরে না এলেও ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে এ আশা যদি আমার বিন্দুমাত্রও থাকতো, তা'হলে এই সঙ্কট মুহূর্তে আমি কখনও ভারতভূমি ত্যাগ করতাম না।· বৃটিশ রাজনীতিকরা যখন আমায় মিষ্টি কথায় বা জোর ক'রে প্রলোভিত করতে পারেনি তখন জগতের অন্য কোন দেশের রাজনীতিকদেরও সে সাধ্য নাই। যাতে দেশের অম্লান, আত্মমর্যাদা ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন কাজ আমি কোনদিনই করিনি ·· স্বদেশীয়রা যদি কোনরকমে নিজেদের চেষ্টায় দেশ স্বাধীন করতে পারেন অথবা বৃটিশরা যদি আপনার 'ভাবত ছাড়ো' প্রস্তাব মত ভারত ছেড়ে চলে যায় তা হ'লে আমাদের চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না।···আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছি এই দুইয়ের কোনটাই সম্ভব হবে না —তাই সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য · ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম সুরু হ'য়ে গেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাবতভূমিতেই এখন যুদ্ধ করছে·· আপনি আমাদের জাতির পিতা তাই ভারতের এই পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।'

যুদ্ধ-পরিস্থিতির আরও পরিবর্তন হ'লে বর্মার মধ্য থেকে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং মান্দালয়ে ডিভিসনাল হেড কোয়াটার্স স্থাপিত হয়। ১৯৪৪-এর অক্টোবরে নেতাজী মেমিও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এই সময়ে সেখানে শত্রুপক্ষ নির্বিচারে বোমা ফেলে এবং মেসিনগান থেকে গুলি চালায়। নেতাজী জরুরী সমর পরিষদ গঠন করেন। তিনি বলেন—'আমরা যদি '৪৪-এর জানুয়ারীর মধ্যে আক্রমণ শুরু করতে পারতাম এবং উপযুক্ত বিমান সাহায্য পাওয়া যেত তাহলে বর্ষা সুরু হবার আগেই ইমফল অধিকারের আশা করা যেত। বর্ষার আগে আমরা প্রতিফ্রন্টেই এগিয়েছিলাম বা শত্রুদেব ঠেকিয়ে রেখেছিলাম।' অক্টোবরের শেষ দিকে নেতাজী নূতন জাপানী প্রধানমন্ত্রী কাইসোর আমন্ত্রণে টোকিয়ো যান। সম্রাট হিরোহিতোও নেতাজীকে অভ্যর্থনা করেন। প্রধানমন্ত্রী কাইসো তাঁর আয়োজিত ভোজ সভায় ঘোষণা করেন : 'ভারতীয় ভূখণ্ডের উপব জাপানের কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই।' জাপন পুনরায় ভারতকে সবৈব সাহায্যেব প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আজাদ হিন্দ সবকারের বৈদেশিক দফ্‌তরের সঙ্গে জাপান সরকারের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এই সময় জাপানের যুদ্ধ-পরিস্থিতিও খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

নভেম্বর ১৯৪৪-এ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়েব আমন্ত্রণে সেখানে এক ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে বলেন, '·· অতীত ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।· কয়েক হাজার বছর আগেকার মত আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা যদিও মূলতঃ একই তথাপি আমরা পরিবর্তিত হয়েছি এবং সময়ের সাথে চলেছি। ·· আমাদের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল, আমরা চাই এক আধুনিক ভারতবর্ষ—অবশ্য অতীতের উপর যার ভিত্তি

থাকবে।' তারপর তিনি প্রথম প্রতিরক্ষা সংগঠন, দ্বিতীয় ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান ও তৃতীয় শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে বলেন, 'এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব ধারায় কাজ করতে চাই। আমরা স্বভাবতঃই অন্যান্য দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিবেচনা করব···পরিশেষে যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করবো তা হ'বে ভারতবাসীর প্রয়োজনের উপযোগী এবং ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী। .. শ্রমিক-কৃষকের···স্বার্থ আমাদের অন্তরে, সেজন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির মত একটি স্বতন্ত্র দলের কোন প্রয়োজন নাই।' দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি শক্তিশালী কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র চেয়েছেন—যে রাষ্ট্র জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করবে এবং যা ধনীদের চক্রান্তে পরিণত হবে না। তিনি জানান, দেশের সর্বপ্রকার বিভেদসৃষ্টির মূলে বৃটিশ সরকার। আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে ধর্ম, জাতি বা শ্রেণীর প্রশ্ন নাই। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন কি হবে—তার জবাব দিয়ে বলেন 'এই প্রশ্নে আমি আমার মতামত দশ বছর আগে Indian Struggle নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি।···যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একথা বলা বোকামি হবে যে কোন একটি পদ্ধতি মানব প্রগতির শেষ ধাপ।

পৃথিবীর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা নূতন পদ্ধতি তৈয়ারী করবো। ন্যাশনাল সোস্যালিজম, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধনে এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি বিধানে সক্ষম হয়েছে কিন্তু তা ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে রচিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে সক্ষম হয়নি···সোভিয়েত পদ্ধতি পরীক্ষা করা যাক, এতে এক বিরাট সাফল্য লক্ষ্য করবেন—তা হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতি। কম্যুনিজম যেখানে দুর্বল তা হ'চ্ছে কম্যুনিজম জাতীয় প্রবণতার মূল্য দেয় না। আমরা ভারতে চাই একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি যা সমগ্র জনতার সামাজিক প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ।·· ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবে।'

কঠিন যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র সতত তাঁর আদর্শের কথা, ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠনের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে নূতন ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন তা হবে বর্তমানের প্রচলিত রাষ্ট্রপদ্ধতিগুলি—যেমন ধনবাদ, ফ্যাসীবাদ ও কম্যুনিজম প্রভৃতি থেকে—স্বতন্ত্র এক সমাজ সভ্যতা। তিনি তাঁর রচিত Indian Struggle গ্রন্থে লিখেছেন, '···পরবর্তী ধাপে সংস্কৃতি সভ্যতার বিশিষ্ট অবদানের দায়িত্ব হবে ভারতবর্ষের।' [১২] ভয়ঙ্কর সামরিক পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রের অতন্দ্র দর্শনভাবনা তাঁকে আদর্শবাদী জীবন-সংগ্রামী ব'লে চিহ্নিত করে। আই. এন. এ-বিষয়ে একজন গবেষক তাঁর সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বলেছেন : তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) নেতৃত্ব ছিল বহুমাত্রিক (many dimensional)। তিনি যে শুধু সৈনিক ও সাধারণের মনে দেশপ্রীতির প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি একটি যুক্তিগ্রাহ্য কার্যকর পরিকল্পনা রচনা ক'রেছিলেন। ···গভীর যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে তিনি বিপ্লবের একটি আর্থিক-রাজনৈতিক দর্শন চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই বিরল ক্ষমতার মধ্যেই তাঁর নেতৃত্বের মহানতা নিহিত রয়েছে।' [১৩] ১০ই ফেব্রুয়ারী '৪৫ এ রেঙ্গুনের মিয়াং হাতপাতালে আমেরিকার Fly Fortress B-29 বিমান থেকে ভীষণ বোমাবর্ষণ হয়। অসংখ্য আহত ফৌজী মার যান—হাসপাতালের ত্রিশফুট উপরে রেডক্রস পতাকা উড্ডীন থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ ক'রে ব্রিটিশ-আমেরিকান বাহিনী কতৃক এই জঘন্যতম

অপরাধ সংঘটিত হয়। আজাদী সৈনিকেরা বর্মায় মিখটিলা, ন্যানঙ, পেগান, কাউকপাডাঙ, পোপা, লেগি, ও সাদি পাহাড় অঞ্চলে মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে ভয়াবহ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সময় বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনায় অনেক আজাদী সৈনিক অতর্কিতে আক্রান্ত হ'য়ে নিহত হ'ন। যুদ্ধ-পরিস্থিতি আরও খারাপ হ'লে নেতাজী অফিসারদের পরামর্শে ও চাপে ২৪শে এপ্রিল ১৯৪৫ রেঙ্গুন থেকে বিপদ সঙ্কুল পথে ব্যাঙ্কক যাত্রা করেন। বর্মা ত্যাগের আগে তিনি এক ভাষণে বলেন, ঃ 'ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ থেকে আপনারা দুঃসাহসিক যুদ্ধ করেছেন এবং এখনও ক'রে চলেছেন। ইমফলে ও বর্মায় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্বের পরাজয় ঘটেছে—আমাদের আরও অনেক পর্ব যুদ্ধ করতে হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে ইম্ফলে, আরাকানের জঙ্গলে, পর্বতে, বর্মার প্রান্তরে প্রান্তরে আপনাদের দুঃসাহসিক যুদ্ধের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। আপনাদের আত্মত্যাগের ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কৃতদাস হ'য়ে নয়, স্বাধীনদেশের নাগরিক হিসাবে জন্মলাভ ক'রে আপনাদের প্রশংসা করবে। জগতের কাছে বলতে পারবে তাদের পূর্ব-সূরীরা আসাম, মণিপুর বর্মার যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ ক'রেও পরিশেষে তাঁদের গৌরবসময় বিজয় এনে দিয়েছেন।... আপনাদের হাতে আমাদের জাতীয় সম্মান আর ভারতীয় যোদ্ধাদের গৌরবময় ঐতিহ্য রেখে যাচ্ছি...আজাদী অফিসারদের পরামর্শে, স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার স্বার্থে আমাকে বর্মা ত্যাগ করতে হচ্ছে।... আপনাদের দুঃখকষ্টভোগ বৃথা যাবে না। আপনারা বিশ্বাস করুন—ঊষার আসে আসে তমিস্রাঘন অমানিশা। ভারতবর্ষ অচিরেই স্বাধীন হবে।"

১৯৪৫-এর মে মাসে পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে আজাদী বাহিনীকে যুদ্ধ শেষ করতে হয়। নেতাজী জুন মাসের বেতার ভাষণগুলিতে ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। ২০শে জুন ১৯৪৫ এ ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে আবার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানান—যাতে বৃটিশের সঙ্গে কোন আপোষ সম্ভব না হয়। ২১শে জুন '৪৫ তিনি বলেন, ঃ 'বর্তমান যুদ্ধকালে স্বাধীনতালাভ না হ'লেও যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতালাভের সুযোগ আমরা পাব।' নেতাজী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য জুন-জুলাই মাসে '৪৫ মালয়ে আরও দুই ডিভিসন আজাদী সৈন্যবাহিনী-গঠনের তৎপরতা পরিদর্শন করেছিলেন। ৮ই জুলাই '৪৫ যুদ্ধে নিহত চারহাজার আজাদী সৈনিকের স্মরণে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে শহীদস্তম্ভের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই শহীদস্তম্ভ মাউন্টব্যাটেনের বর্বর আদেশে বিধ্বস্ত হয়।

সামরিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ আরও প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। ৬ই আগষ্ট '৪৫-এ আমেরিকা হিরোসিমায় আণবিক বোমা বর্ষণ করে, ১০ই আগষ্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৫ই আগষ্ট '৪৫ এ জাপান সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে। নেতাজীর পিছনে বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ১৮ই আগষ্ট '৪৫-এ বিমান দুর্ঘটনার অন্তরালে নেতাজী দ্বিতীয়বার অন্তর্ধান করেন। ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকার একবার বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছিল, তিনি তখন জার্মানীতে অবস্থান করছিলেন। এবার সেই কৌশল বৃটিশের বিরুদ্ধেই আরোপিত হ'ল। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও নানা ভাগ্য বিপর্যয়ে বিপ্লবী নায়ক ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রকে ফিরে যেতে হ'ল। কিন্তু বন্দী আজাদী বাহিনী ভারতবর্ষে আনীত

হ'লে সমগ্রে ভারতবর্ষ আন্দোলনের আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে। ৫ই নভেম্বর '৪৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লীর লাল কেল্লায় লেঃ কঃ জি, এস, ধীলন, লেঃ কঃ পি, কে, সাইগল, ও মেঃ জেঃ শাহনওয়াজ খাঁনের বিচাবের প্রহসনের সময় ভারতব্যাপী বিপুল গণ-আন্দোলনের চাপে এ'দের মৃত্যুদণ্ড মুকুব কবতে হয় এবং সমস্ত আজাদী সৈনিকের শাস্তির প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। হাজার হাজার আজাদী সৈন্য মুক্তি পেয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েন এবং ভারতবাসী তাঁদের মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর অপূর্ব অজ্ঞাত কাহিনী শুনে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হ'ন। '৪৬ এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ক্যাপ্টেন রসিদের ৭ বৎসর কারাদণ্ড হ'লে ১১ থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী '৪৬ দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতায় তীব্র হিংসাত্মক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম জনতা একত্রে রাস্তায় রাস্তায় বৃটিশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলে। নেহেরুজী অকিনলেককে লিখলেন—আই, এন, এ'র জনপ্রিয়তাব 'গভীবতা ও ব্যাপ্তি' আশ্চর্যজনক! জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে সীতারামাইয়া লিখেছেন, —'কিছু সময়ের জন্য আই, এন, এ'ব অফিসারবৃন্দ ভারতের জাতীয় নেতাদের গৌরব ম্লান করে দিয়েছিলেন। মনে হ'ল আই, এন, এ জাতীয় কংগ্রেসকেও ম্লান ক'রে দিয়েছে।' রেঙ্গুনে আজাদী সৈনিকেব সঙ্গে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর লোকেদের গভীব যোগাযোগ ঘটে এবং 'এ'দের মধ্যে ব্যাপক ভ্রাতৃত্বেব সম্পর্ক গড়ে ওঠে এর ফলে ভারতীয় বাহিনীগুলিতে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়।' [১৪] তারপর বৃটিশ সরকার ১৫ লক্ষ সৈনিক ও অফিসারকে ভারতীয় বাহিনী থেকে অপসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তাঁরা দ্রুত বৃটিশ সরকারের আনুগত্য হারিয়ে ফেলেন এবং আই, এন, এ'ব মর্যাদায় প্রভাবিত হ'য়ে তাঁরা 'অজ্ঞাতসারে ভারতের স্বাধীনতার সৈনিক হয়ে পড়েন।' [১৫] '৪৬-এ বিমান বাহিনীতে ধর্মঘট হয়। সমগ্র নৌ বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বোম্বাই, করাচী মাদ্রাজ, ক'লকাতা, কোচিন, বিশাখাপত্তনম, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাইতে ৭০০০ নৌ সেনা ধর্মঘটে যোগ দেয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অর্থবহ অনীহার ফলে এ আন্দোলন স্তিমিত হ'য়ে আসে। ভাবতবর্ষ বৃটিশের পক্ষে মারাত্মক এক বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়ায় কিন্তু জাতীয় নেতৃত্ব ভীত হয়ে বিপ্লব দমনের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ডাঃ কে, কে, ঘোষ তাঁর গবেষণা পুস্তকে (Indian National Army) ঠিকই লিখিছেন, 'কংগ্রেস ভারতে যে বিপ্লবাত্মক জোয়ার সৃষ্টিতে সাহায্য করলেন তাতে নেতৃত্ব দেবাব অনিচ্ছা ও সম্ভবতঃ অক্ষমতার জন্য তাঁবা সেই অবস্থা দমনে বৃটিশেব মতই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন।' ১৯৪৬ এর মার্চে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বললেন—'এ সময় বিপ্লবাত্মক লটনা কংগ্রেসের পথের বাধাস্বরূপ'।' বিদ্রোহ প্রশমিত হ'লেও বৃটিশ সরকার অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। একজন রক্ষণশীল প্রতিনিধি বৃটিশ পার্লা-মেণ্টে বলেন' : ভারতে যে আবহাওয়া হয়েছে তা বিপদ-সঙ্কুল,—যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাত সুরু ক'রে দিতে পারে।' বস্তুতঃ বৃটিশ সরকার সম্মান বাঁচিয়ে ভাবত ত্যাগে উদগ্রীব হলেন এবং সত্বর তা কার্যকর করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে ১৬ই আগষ্ট '৪৬ এ মুসলীম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড সুরু হয়ে গেল এবং লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবলি হতে লাগল। '৪৬ এর ফেব্রুয়ারীতে হিন্দু-মুসলিম জনতাব বৃটিশবিরোধী সমবেত উত্তাল আন্দোলনের সময় থেকে

মাত্র পাঁচটি মাসের ব্যবধানে বৃটিশের প্ররোচনায় তাদের কুটিল উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল। ধূর্ত বৃটিশ সরকার মুসলীম লীগের সাহায্যে, কংগ্রেসের অক্ষম নেতৃত্বের দুর্বলতায় ও কম্যুনিষ্ট সমর্থনে ভারত-বিভাগে সমর্থ হলো। অখণ্ড ভারতবর্ষ, ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হ'য়ে খণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করলো। বৃটিশ সরকার আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করবে—সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতিকে কটাক্ষ ক'রে এই হুঁসিয়ারী দিয়ে বলে-ছিলেন, 'ক্ষমতা হস্তান্তরকে অকেজো ক'রে দেওয়ার জন্য অন্তর্বিভাজন অনিবার্য···।' ১২ই সেপ্টেম্বর '৪৪ বর্মা থেকে এক বেতার ভাষণে বলেন, '···আমার স্বদেশ-বাসীগণ! প্রাচ্যে আমরা ভারতীয়রা স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের জন্য সংগ্রাম করছি।···আয়ার্ল্যাণ্ড, প্যালেষ্টা-ইন আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমরা বুঝেছি দেশের অন্তর্বিভাজন, তাকে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস ক'রে দেবে। ভারতবর্ষকে বিভক্ত ক'রে পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাই।···আমি নিশ্চিত যে পাকিস্তান স্বীকৃত হ'লে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের স্বর্গসম মাতৃভূমিকে খণ্ডিত ক'রো না।' [১৬] সুভাষ-নেতাজীর আবেদনে, হুঁসিয়ারীতে প্রধান ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্ণপাত করেননি। আজাদ হিন্দ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সৈন্য বাহিনীর আনুগত্য বিধ্বস্ত হ'লে বৃটিশ ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে হিউটন বলেছেন, 'এতে সন্দেহ নাই যে আজাদ হিন্দ বাহিনী তার বজ্র-ঝঞ্ঝাতুল্য ভাঙ্গনের মধ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান তরান্বিত করে দেয়।' [১৭] প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী কলকাতার গভর্ণর হাউসে (১৯৫৬ সালে) তদানীন্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল প্রধান বিচারপতি পি, বি, চক্রবর্তীকে বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ আন্দোলনের ফলে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীগুলির মধ্যে বৃটিশের প্রতি আনুগত্য শিথিল হ'য়ে যাওয়াই বৃটিশশক্তির ভারতত্যাগের প্রধান কারণ। [১৮]

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির পরাজয় ঘটলে অখণ্ড ভারতে আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নূতন এক সমাজবাদী বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে ওঠার যে সম্ভাবনা ছিল ভাগ্যের পরিহাসে তা প্রতারিত হ'ল। বিশ্ব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে পৌঁছবার জ্বলন্ত ভারতীয় প্রত্যাশা অন্তর্হিত হ'ল। ভারতীয় জনতার হাতে সব ক্ষমতা' তুলে দেওয়ার স্বপ্নের রূপায়ণ হ'ল ব্যাহত। বিধাতা ভারতবর্ষকে আবার সে সুযোগ এনে দেবেন কিনা—এ প্রশ্ন ভারতবাসীর মনে এক কঠিন জিজ্ঞাসার অবতারণা করে। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধীজী এক প্রার্থনা সভায় বলেন, 'আদিতে ও অন্তে তিনি (নেতাজী) ছিলেন ভারতবাসী। আর তাহার অধিক হইল এই যে তিনি অনুগামীদের অন্তরে উৎসাহের এমন আগুন জ্বালাইয়াছিলেন যে তাঁহার সম্মুখে তাহারা সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া একটিমাত্র মানুষের মত কাজ করিয়াছিল।···সেখানে (প্রাচ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্র গ্রথিত করিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহসী যুবকগণকে লইয়া তিনি একটি সৈন্যদল গঠন করিলেন এবং একটি শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। নেতাজী যে সকল পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়াছেন তাঁহা অপেক্ষা কম শক্তিশালী অপর কেহ হইলে তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন।' [১৯] টোকিয়োতে পূর্বএশীয় সম্মেলনে নেতাজীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিউটন লিখেছেন, 'টোকিয়োতে

উপস্থিত বিদেশী রাজনীতিকগণ রাজনৈতিক মর্যাদায় ও ব্যক্তিগত প্রভাবের দিক দিয়ে কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলনা —জাপান তা উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার ক'রেছিল—তিনি জাপানী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে স্তুতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন ··। [২০] নেতাজী সম্পর্কে আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও নৈতিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ইউরোপীয় দেশগুলির অনেকে এবং অন্যান্য দেশ এখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতির পক্ষপাতিত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কোনোও দেশ কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির বিচার নির্ভর করে কোন নীতির বিষয়ে সে দেশের সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে। কম্যুনিষ্ট বা অ-কম্যুনিষ্ট সবদেশের সম্পর্কেই একথা সত্য।···কাল যত এগিয়ে যাবে সুভাষচন্দ্রের খ্যাতি ততই বাড়বে অন্ততঃ সেই সব দেশে যেখানে এখনও তিনি স্বীকৃত নন এবং ভবিষ্যতে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতেও। [২১]

ইতিহাসের রথচক্রের গতিরোধের সাধ্য কারো নাই। তবে ভারতবাসী প্রার্থনা করে তিনি আবার আবির্ভূত হ'য়ে ভারতের আত্মাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করুন। যাঁরা সুভাষচন্দ্রের জীবনেতিহাস অনুধাবন করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন ১৮ই আগষ্টের (৪৫) বিমান দুর্ঘটনা একটি প্রয়োজনীয় ছলনামাত্র। ভারতীয় নেতৃবর্গ ও সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার গুরুদায়িত্বও এড়িয়ে চলেছেন। দু'টি কর্তাভজা কমিটি, কমিশনের মিথ্যা ও পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্তের প্রতারণা কাটিয়ে ওঠাই যথেষ্ট নয়।

ভারতবর্ষ তার ইপ্সিত অখণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। নূতন ও আদর্শ ভারত গঠনে রয়েছে এখনও দুস্তর বাধা। অনেক দুঃখ ও অশ্রুবরণের মধ্য দিয়ে আমাদের সে পথ বেয়ে যেতে হবে এবং নেতাজীর জ্বলন্ত, দেশপ্রেম ও দেশসেবার সংগ্রামী আদর্শই আমাদের সাফল্যে উত্তীর্ণ করতে পারে। সুভাষদর্শনের রূপকার বিপ্লবী নেতা অনিলচন্দ্র রায় তাই লিখে গেছেন, 'ভারতবর্ষ', বারবার তোমার ইতিহাসে আসবে অন্ধতমসাময় দুর্দিন। সেদিন ভুলোনা তোমার এই রুদ্রসাধককে, এই মরণ-বিজয়ী ভাবতপথিককে।' [২২]

১০—P. 152 K K G
১১—পৃঃ ৭১৭-৭২৭ জয়শ্রী পৌষ সংখ্যা ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।
১২—P. 372 I. S. (Indian Struggle)
১৩—P. 258 K. K. G.
১৪—P. 186 Toye (The Springing Tiger ; Hugh Toye.. Jaico Edition)
১৫—P. ২২৪ K K. G.
১৬—P. 223 to 225 Pub. Divn.
১৭—P. 191 Toye
১৮—দ্রঃ পৃঃ ১৫১-১৫২ জয়শ্রী আষাঢ় সংখ্যা—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লিখিত রচনা।
১৯—পৃঃ ৪৯ ষষ্ঠখণ্ড গান্ধী-রচনাসম্ভার।
২০—P. 107 Toye.
২১—P. 4 to 6, A. Werth...(Netaji in Germany. Alexander Werth & Walter Harbich : Netaji Research Bureau)
২২—পৃঃ ১ নেতাজীর ডাক।

২০৯, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, এড্‌ভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	২০ ০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১২·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭ ০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫ ০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১ ৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশাহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃঃ ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

7 MAY 1979

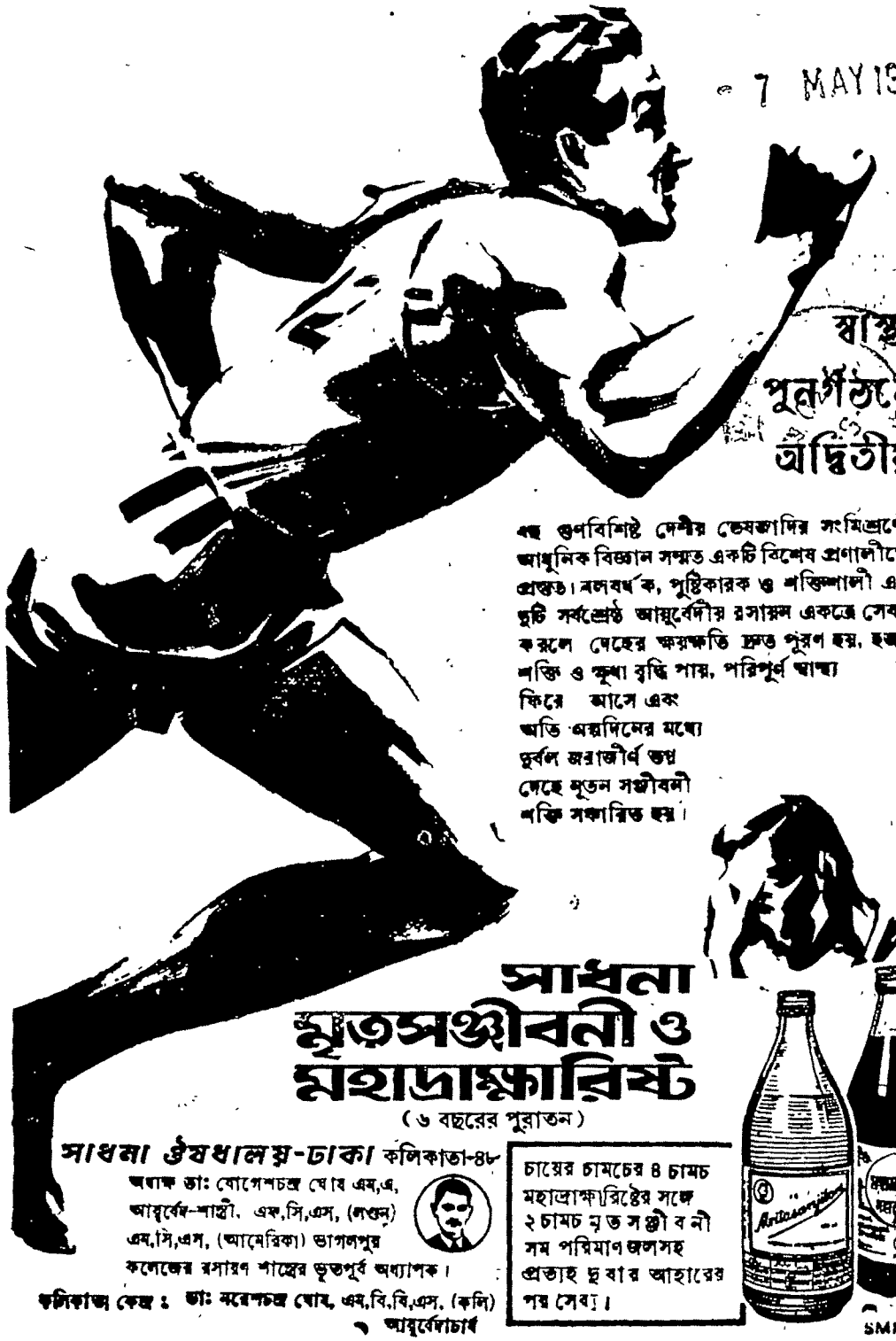

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2/66

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Re. 1·00 with Regd. Postage Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

ফাল্গুন সংখ্যা : ১৩৮৫

পুষ্পা

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

লীলা রায়

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠছে এই খণ্ডগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশ-নায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার সদন্ত জবাব বাংলায়। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। যাঁরা আজও গ্রাহক হননি তাঁরা এককালীন ১২০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন।

'সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা—বিশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁহার অভিভাষণ প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সাগ্রামের প্রধান সেনাপতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই অভাব দূর করিবার জনা 'জয়শ্রী প্রকাশন' ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

'বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়—তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একসূত্রে গাঁথা।

সত্যরঞ্জন বক্সী

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ ফাল্গুন। ১৩৮৫ একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

হিসাব-নিকাশ ৬৪৭

সমীক্ষা

১৯৭৯-৮০-র রেল ও পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ৬৫২

স্মৃতিকথা : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই
গোপাললাল সান্যাল ৬৫৫

আলোচনা

১৯৭৯-৮০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট
রাখাল দত্ত ৬৬৫

অতীত-স্মরণ

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি
বিনয় রায় ৬৬৯

কাহিনী

এক অজ্ঞাতনামা ব্রিটিশ সৈনিকের কাহিনী ৬৭৫
প্রণব চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থ-পরিচয়

মনীষী রজনীকান্ত গুপ্ত
রণেন্দ্রনাথ দেব ৬৭৮

স্মৃতি-তর্পণ ৬৭৯

মানবিক অনধিকার

মরিচঝাঁপির অন্তরালে ৬৮১

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

চাঁদা শেষের বিজ্ঞপ্তি

চৈত্র ১৩৮৫, যাঁদের গ্রাহক চাঁদার মেয়াদ ফুরিয়েছে তাঁদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে, চৈত্র সংখ্যা প্রাপ্তির সঙ্গে তাঁদের দেয় গ্রাহক চাঁদা জয়শ্রী কার্যালয়ে জমা দিতে নতুবা বৈশাখ ১৩৮৬ সংখ্যা ভি. পি. করা হবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার
জয়শ্রী

চাঁদার হার

বার্ষিক। ১২·০০ ষাম্মাসিক। ৬·০০

Bank Draft বা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠানো চলে।

জয়শ্রী

বৈশাখ। ১৩৮৬

বহুভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভাষার পারস্পরিক আদান প্রদান জাতীয় সংহতিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে। এবারকার সাহিত্য সংখ্যা তাই নিবেদিত—

'ষাট দশক উত্তর আঞ্চলিক ভাষায় ছোটগল্পের গতি প্রকৃতি'

প্রসঙ্গে

The Evolution of Malayalam Short Story : Prof M. Achuthan

মালয়ালাম ছোটগল্প ঃ নিলীনা আব্রাহাম

বিশ বছরের তেলুগু ছোটগল্প ঃ বোম্বানা বিশ্বনাথম্

ওড়িয়া ছোটগল্প ঃ অধ্যাপক ষতীন মহান্তী

তামিল ছোটগল্প ঃ ড. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অসমিয়া ছোটগল্প ঃ অধ্যাপক ভবেন বড়ুয়া

উর্দু ছোটগল্প ঃ শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য

আদিবাসী সাহিত্য ঃ ড. শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আঞ্চলিক সাহিত্য ও অনুবাদ ঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প ঃ ড. রমেন নাগ

এছাড়া

হিন্দী, গুজরাতি ও মারাঠী ছোটগল্প প্রসংগেও আলোচনা থাকবে।

দাম : চার টাকা

চরৈবেতি

৪৩ বর্ষ । ১১শ সংখ্যা । ফাল্গুন ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

হিসাব-নিকাশ

জনতা পার্টির দুই বছর পূর্তির দিন ১৯৭৯-এর ২২শে মার্চ কেন্দ্রীয় জনতা সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বোম্বের যশলোক হাসপাতালে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের 'মৃত্যু' ঘোষণা করে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন। প্রায় একটি উড়ো খবরের সত্যাসত্য বিচার না করে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসন থেকে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের মৃত্যু ঘোষণা এবং তার অল্প সময় বাদেই জাতিকে ভুল সংবাদ দেবার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীনের ,লোকসভায় ক্ষমা প্রার্থনা ক্ষমতাবানদের প্রতি চূড়ান্ত ধিক্কারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। বলতে গেলে জনতা দলের যিনি জনক-স্বরূপ জীবন্ত অবস্থায় তাঁকে 'মৃত' ঘোষণা ক'রে জনতা পার্টি বোধ হয় 'পিতৃঋণ'ই শোধ করলেন।

জনতা দলের অবিরাম অন্তর্বিরোধের পাশাপাশি সংহতিরও চেষ্টা চলছে, একথা জনতা-বিরোধীদেরও স্বীকার করতে হবে। ৬টি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে-গড়া জনতার মঞ্চে এ-দল ও-দল-এ গাঁটছড়া বাঁধা, ছাড়াছাড়ি, মাখামাখি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক দুষ্টচক্রের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে দল গড়ে ওঠে, সেখানে দলাদলিও অনিবার্য অনুসঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দলাদলির মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্বও যেমন নিহিত রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যক্তি-সংঘাত, য মহত্তর ভূমিতে ব্যক্তিত্বের সংঘাতরূপেও আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে। জনতা পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব এইসব উপাদানগুলিরই সমবেত ফল। কিন্তু জনতা দলকে যদি আত্মবিলয় থেকে কিংবা স্ব-বিরোধিতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হয়, জনতা দলের সচেতন সদস্যদের আদর্শগত মিলনভূমি খুঁজে বার করতে হবে। যারা সেই আদর্শগত মিলনভূমিকে স্বকীয়তা দানে বিরত থাকবেন, কিম্বা এই মিলনভূমিকে আদৌ স্থান দেবেন না, জনতা দল থেকে তাদের স্বেচ্ছা-নির্বাসন, নিষ্ক্রমণ, হয়তো বা বিতাড়নও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে।

উত্তর প্রদেশের জনতা দলে প্রাক্তন ভারতীয় লোক দলের অর্থাৎ বি, এল, ডি র অংশের সঙ্গে প্রাক্তন জনসঙ্ঘের অংশের বিরোধ বেধেছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সে কারণে আস্থা-ভোটের সম্মুখীন হয়ে পরাজয় বরণ করে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বারাণসী দাসের সঙ্গে এই বিরোধ আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। জনতা পার্টির এক অংশ উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় জনতা পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েও দলে রয়ে গেছেন। যারা বারাণসী দাসের বিরোধী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদবেরও তারা বিরোধী ছিলেন। ভারতবর্ষের পরিষদীয় গণতন্ত্রে এ-ও এক অপূর্ব নজীর। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর আস্থা-ভোটে পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁর স্থলবর্তী হয়েছেন বিহার জনতা পরিষদীয় দলের কর্পূরী-বিরোধী ভোটের রামসুন্দর দাস। হরিয়ানার বি, এল, ডি মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালকেও আজ হোক কাল হোক আস্থার সম্মুখীন হতে হবে। উড়িষ্যার বি, এল, ডি, মুখ্যমন্ত্রী নীলমণি রাউত রায় আস্থা-ভোটে জয়ী হয়েছেন।

বিরোধটা কেন? '৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় বি. এল, ডি-র মুখ্যমন্ত্রী এবং হিমাচল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে জনসঙ্ঘের মুখ্যমন্ত্রী কার্যভার নিয়েছিলেন এই দুই গোষ্ঠীর সমঝোতার ফলে। দিল্লীর মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের ক্ষমতার ভার পড়েছিলো জনসঙ্ঘের হাতে। কিন্তু দু'বছরে চাকা ঘুরে গেছে। বি, এল, ডি-র সঙ্গে জনসঙ্ঘের বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। চরণ সিং-মোরারজীর বিরোধ মিটে যাবার পর এবং চরণ সিং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পর মনে হয়েছিলো, জনতার বিরোধ মিটে এলো। কিন্তু বিপরীত ঘটনাই ঘটলো। জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ছায়া-মাত্র আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িকতাবাদী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ হিন্দুরাষ্ট্রে বিশ্বাসী, ভারতীয় সংস্কৃতিকে সংখ্যাগুরু হিন্দুদেরই সংস্কৃতি মনে করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের পৃথক রাজনৈতিক আদর্শ রয়েছে; তাদের কর্মপন্থায় ও ধ্যান-ধারণায় সেনাবাহিনীর মতই অবিচ্ছেদ্য আনুগত্যের স্থান রয়েছে। সুতরাং তাদের কাঠামোতে গণতান্ত্রিকতার পরিবর্তে একতান্ত্রিকতার ছাপ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি উত্থাপিত হয়েছে তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ যে মানুষ তৈরীকে, চারিত্রিক নিষ্ঠাকে এবং মানবিক মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, তাদের সদস্যদের তৈরী করে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তাদের সপক্ষে বলা চলে।

কথা উঠেছে দ্বৈত-আনুগত্য চলে কি করে? জনতা দলের আনুগত্য যাদের রয়েছে, তারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রতি অনুগত হবেন কি করে? এই সমস্যার সহজ মীমাংসা রয়েছে, যারা দ্বৈত-আনুগত্যের দোটানায় পড়বেন তাদের জনতা দলের আনুগত্য সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নিতে হবে। আর তারা যদি অন্য কোনো আনুগত্য দ্বারা প্রভাবিত হতে চান, অবিলম্বে তাদের জনতা দল থেকে পদ-ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের আনুগত্য আছে কি নাই, এই বন্ধ্যা গবেষণার অন্তহীন বিতর্ক নিয়ে কালক্ষেপণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই বিতর্কে চরণ সিং যোগদান ক'রে বিতর্কটিকে এক নূতন স্তরে নিয়ে গেছেন।

এই দলাদলি ও বিতর্কের চাইতেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা হবে জনতা পার্টি কি চেয়েছিলো এবং কি করতে পেরেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জনতা পার্টি দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্রুত প্রত্যাবর্তন সম্ভব করে তুলেছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৯-এর ৩১ শে মার্চ শেষ হবার কথা ছিল। এক বছর আগেই তার সমাপ্তি ঘোষণা করে জনতা সরকার ১৯৭৮-৮৩ পর্যায়ে একটি 'প্রবহবান পরিকল্পনা' ('Rolling Plan') প্রবর্তন করেছেন। জনতা সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য (১) দশ বছরে বেকারত্ব ঘোচানো, আংশিক কর্ম-সংস্থানের পরিমাণ হ্রাস ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে অগ্রগতি (২) সমাজের দরিদ্রতমদের জীবনযাপনের মানের যথেষ্ট উন্নয়ন (৩) নিম্ন-আয়সম্পন্নদের নিয়তম প্রয়োজন মেটানোর সরকারী ব্যবস্থাপনা। এ ছাড়া আরও লক্ষ্য রয়েছে, (৪) আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়নের হার বৃদ্ধি (৫) আয় ও সম্পদের বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস (৬) স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রগতি।

আর্থনীতির বিবৃদ্ধির হার ১৯৭৮-৭৯ সালে শতকরা প্রায় তিনভাগ হবে, ১৯৭৭-৭৮-এর শতকরা ৬ ভাগের তুলনায়, এমন কি ১৯৭৯-৮০ র শতকরা ৪·১ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার চাইতেও এই হার অনেক কম। প্রথম পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থনীতির বিবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩·৮, ৩·৭, ৩·২, ৪·৫ ও ৩·৩ ভাগ। সুতরাং জনতার আমলে প্রথম বছরে বিবৃদ্ধির হার ভাল হলেও পরের বছরে হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে অবশ্য রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে: ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টন। সেচ-ব্যবস্থা বহু-বিস্তৃত হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ড সেচের আয়োজন।

শিল্পের বিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ঘাটতি, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারে ব্যর্থতা, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি কারণগুলি অবরোধ সৃষ্টি করে রয়েছে। তাছাড়া, জনতা সরকারের শিল্পনীতিতে শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ হবে কি হবে না, এ নিয়ে দোদুল্যমানতা রয়েছে। জনতা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী টাটা ইস্পাত কারখানা রাষ্ট্রীয়করণের দাবী

তুলেছিলেন এবং কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন যে এই কারখানায় ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়োজিত পুঁজির অংশ শতকরা তিন ভাগ মাত্র, আর বাকী সবটাই বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের লগ্নী-করা সম্পদ। কিন্তু সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে লোকসানের বহর যেখানে বেশী, সেখানে ব্যবস্থাপনার হাজারো ছিদ্র রাষ্ট্রের আওতায় পরিচালিত শিল্পগুলিকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে, সেখানে ঘর না সামলে কর্ম-তৎপর, সুশৃঙ্খল, নিপুণ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিল্পগুলিকে অধিগ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।

শিল্পনীতির ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ভাবে পুঁজি-প্রধান বিনিয়োগের পরিবর্তে শ্রম-প্রধান বিনিয়োগের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দের ৪৩ ভাগ কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট উপাদানে—যেমন ক্ষুদ্র সেচে—বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই সঙ্গে বড়ো বড়ো শিল্পাশ্রয়ী ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলির একচেটিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করবার আয়োজন করা হয়েছে। শিল্পনীতির ক্ষেত্রে জনতা সরকারের এই অস্পষ্টতার দরুণ শিল্পে আর্থিক সাহায্যের মঞ্জুরীর পরিমাণ সঙ্কোচনের দিকে। ১৯৭৭-৭৮ সালে মঞ্জুরীকৃত আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৭ ভাগ তার পূর্বেকার বছরের শতকরা ৪৭·২ ভাগের তুলনায়।

পাবলিক সেক্টর বা সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলির ট্যাক্স-পূর্ব লাভের পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬-এর ৩০৫·৬৫ কোটি টাকার স্থলে ১৯৭৬-৭৭-এর ৪৭৮·১৭ কোটি টাকায় উঠে ১৯৭৭-৭৭ এ ২৫৭·৬১ কোটি টাকায় নেমে আসে। ১৭০টি সরকারী শিল্পোদ্যোগে (তার মধ্যে ১১টি নির্মীয়মাণ) ১২,৮০৩ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭-এ এই লগ্নীর প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত শতকরা ৯·৭ ভাগ থেকে ১৯৭৭-৭৮-এ শতকরা ৭·৪ ভাগ আশা করা যায়। অন্যান্য সরকারী সংস্থার মধ্যে কোল ইণ্ডিয়ার এই বছরের সম্ভাব্য লোকসান ১৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে। ১৯৭৭-৭৮ সিপিং করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার লোকসানের পরিমাণ ১৪·৭৪ কোটি টাকা, যদিও এ-যাবৎ এই শিল্প লাভ হোতো। ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৭৮-৭৯ র প্রথম তিনমাসে স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার ইস্পাত কারখানাগুলির সম্ভাব্য লোকসান হবে ৪·৮৮ কোটি টাকা। আর ইস্‌কোর কারখানা এই হিসেবের মধ্যে ধরলে লোকসান হবে ১১ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্যোগে জনতা পার্টির প্রতিশ্রুতি অনেকটা স্থান জুড়ে আছে ১৯৭৮-এ বেকারের সংখ্যা অনুমিত হয়েছে ৪৪ লক্ষ এবং শ্রমেচ্ছুদের সংখ্যা ২৬ কোটি ১০ লক্ষ। ১৯৭১ ও ১৯৭৭-এর মধ্যে শ্রমেচ্ছুদের সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে এদের মধ্যে কৃষিতে নিয়োজিত হয়েছেন ২ কোটি ৫০ লক্ষ অ-কৃষি কর্মসমূহে ৯০ লক্ষ—দশ লক্ষের কোনো সুরাহা হ'লো না। অর্ধবেকারের সমস্যাও মারাত্মক, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে। এদের সংখ্যা বছরে ২ কোটি ৬ লক্ষ তার শতকরা ৭৫ ভাগ গ্রামাঞ্চলে। বেকার ও অর্ধ-বেকারের সমস্যার জটিলতা সর্বগ্রাসী হয়ে গেছে।

কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ওপর জনতা সরকার যেমন জোর দিয়েছেন, কুটির ও ক্ষুদ্র-শিল্পের ওপরও তাদের ভরসা অনেক। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সর্বব্যাপী ব্যবস্থাপনার উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে—যা এখনও নির্মীয়মান!

জনতা সরকারের শ্রমনীতি যদিও শ্রমিকদের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল সরকারী পরিচালনার ত্রুটির ফলে জনতা সরকারের শিল্প-সম্পর্কিত বিল—Industrial Relations Bill—দলমতনির্বিশেষে সকল রং-এর শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা অর্জন করেছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ৭ লক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, ৩৫ লক্ষ শিক্ষক রয়েছেন, ১০ কোটি ছাত্র আছেন আর এই ব্যবস্থায় ব্যয় হয় বছরে ২১০০ কোটি টাকা। তবুও এই ব্যবস্থা দরিদ্রের দরজায় পৌঁছায় নাই। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের নাগরিকদের দুই স্তরে ভাগ করে দেয়, দুই সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। জাতীয় শিক্ষানীতি শীঘ্রই চালু হবে, এ-আশ্বাস পাওয়া গেছে। জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী, যা ১৯৭৮-এর ২রা অক্টোবর থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, তাতেও সকলের সমবেত সহযোগের অভাব রয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের হার লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক

পেছনে। ১৯৭৯-এ জন্মের হার হাজারে ত্রিশে নামাতে হবে। কিন্তু এই লক্ষ্য এখনও বহুদূর।

তফশীলি জাতি ও উপজাতিদের দেওয়া হাজারো প্রতিশ্রুতি নস্যাৎ হয়ে গেছে। বেলচি, পুরুলিয়া, বিক্রমপুর, কানজাভালা, বাঙ্গিতপুর এবং মারাঠাওয়াড়ার গ্রামে তপশীলি জাতিদের উপর অত্যাচারের ফিরিস্তি রয়েছে; ১৯৭৮ এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে-বছরটা শেষ হলো সে-বছরে উত্তর প্রদেশে তপশীলি জাতির ১৭৪ জন নিহত হন, ৫,৭৫২টি মামলা দায়ের হয়েছিলো আর সেই একই সময়ে মধ্য প্রদেশে খুন হয়েছেন ৬৩ জন, মামলা হয়েছে ৩৭৯৮ এবং রাজস্থানে খুন হয়েছেন ২৭ জন এবং মামলা দায়ের হয়েছে ৪৩২টি। সংখ্যালঘু কমিশন প্রতিষ্ঠা করে তাদের সমস্যার সুরাহা করা যায় নাই। বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গায় তাদের নিপীড়নের এবং নিহত হবার অভিযোগ রয়েছে।

১৯৭৮-৮১ র 'রোলিং প্ল্যানে' ৫,১০০ ব্লকের ৩,৫০০টিতে নিবিড় উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং এদের ২,০০০টির মধ্যে প্রায় পূর্ণ কর্মসংস্থানের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে। সম্প্রতি সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে ১৯৮১ সালের মধ্যে এদের ১,০০০ ব্লকে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। এ ছাড়া দরিদ্র মানুষের 'নিয়তম প্রয়োজন' মেটাবার কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছে।

ক্রীতদাস পর্যায়ভুক্ত শ্রমিক এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে রয়ে গেছে। জাতীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের— National Labour Institute এবং গান্ধী পিস্ ফাউণ্ডেশনের অনুসন্ধানে জানা যায় নয়টি রাজ্যে ২৩ লক্ষ ক্রীতদাস পর্যায়ভুক্ত শ্রমিক এখনও রয়েছে, যাদের সামাজিক মুক্তি সম্পন্ন হয় নাই। এদের মধ্যে শতকরা ৮০.৫ ভাগ কৃষি-শ্রমজীবী এবং এদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৩ ভাগ তপশীলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত।

চরণ সিং উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৭৯ ৮০এ প্রথম যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন, ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেবার মতই তার ফল হয়েছে। চরণ সিং প্রায় ৬৮৫ কোটি টাকার ট্যাক্স ধার্য করেছেন ১৯৭৫ কোটি টাকার ঘাটতি সামলাবার জন্য। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স ধার্য করার পরও ১৩৫৫ কোটি টাকার ঘাটতি রয়ে গেছে। আর ১৯৭৯-৮০ সালের সংশোধিত বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৯০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আয়ের বৈষম্য দূর করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যের সীমা নামিয়ে আনা, সাধারণ মানুষের সামাজিক আর্থিক সম্পর্কের উন্নয়নের দিক থেকে অনিবার্য দায়িত্ব। কিন্তু এই লক্ষ্য পূরণের নামে বিপরীত ঘটনা ঘটলে সেটা সমাজ-পরিবর্তন-মুখীন কাজ হবে না। গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী মানুষদের গড় বার্ষিক আয়ের বৈষম্য ধীরে ধীরে কমতির দিকে— একেবারে দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় যারা রয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্ এ্যাপ্লাইড ইকনমিক রিসার্চ-এর সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় গ্রামাঞ্চলে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পরিবার রয়েছেন যাদের বার্ষিক আয় ৩০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা এবং শহরে এ ধরণের পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। ৭০০০ টাকার উর্ধ্বে বার্ষিক আয়-সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা শহরে ১ কোটি হবে এবং গ্রামে এই মানুষদের সংখ্যা হবে ১ কোটি ৯০ লক্ষ। টুথপেষ্ট সাবানের শহরে এবং গ্রামে তুলনামূলক ব্যবহারের আর একটি তথ্যানুসন্ধানে (বিড়লা ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ) জানা গেলো শহরের প্রায় ২ কোটি থেকে আড়াই কোটি পরিবারের তুলনায় গ্রামের প্রায় ১ কোটি পরিবার টুথপেষ্ট ব্যবহার করে এবং গায়ের সাবান ব্যবহার-কারী পরিবার গ্রামে প্রায় ৩ কোটি শহরে প্রায় ২ থেকে আড়াই কোটি; কাপড়কাচা সাবানের ব্যবহারও গ্রামে অনেক বেশী। তাই অপ্রত্যক্ষ ট্যাক্সের সংগ্রহও গ্রাম থেকে বেশী হয়। সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গেছে ১৯৭৮ এর ১০,৭২০ কোটি টাকার অপ্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মধ্যে গ্রাম দিয়েছে ৬,১০০ কোটি টাকা আর শহর দিয়েছে ৪,৯১০ কোটি টাকা। সুতরাং অর্থমন্ত্রী চরণ সিং যে ৪৫৫ কোটি টাকার অপ্রত্যক্ষ কর (Excise duties) বসিয়েছেন তার বেশীর ভাগই আসবে গ্রামের মানুষের, অর্থাৎ কৃষকদের কাছ থেকে। এই শুল্কের প্রায় ২৩০ কোটি টাকা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের উপর, যার মধ্যে কেরোসিন অন্যতম; আর এই কেরোসিনের শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামের মানুষের আলোর ও রান্নার কাজে

লাগবে। সুতরাং নূতন এক্সাইজ শুল্কগুলি এবং অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মোট প্রায় ৪৫৫ কোটি টাকার ২৫৫ কোটি টাকাই গ্রামের মানুষ বহন করবে, শহরের উপর বর্তাবে ২০০ কোটি টাকা। সুতরাং, শহরে মধ্যবিত্তদের উৎখাত ক'রে চরণ সিং-এর প্রিয় কৃষকদের রক্ষা করবার জন্যই এই বাজেটে করের আরোপ—এই ধারণার সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি নেই বললেই চলে। বাজেটে কৃষকদের যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তার পরিমাণ মোট ২৮ কোটি টাকা (সার: ৩৫ কোটি টাকা, চাষ্কা ডিজেল: ১২ কোটি টাকা তামাক: ১২১ কোটি টাকা)।

ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে না বলে সরকার দাবী করেছেন, করলেও সামান্য প্রান্তিক মাত্রায়। আর ১৩৩৫ কোটি টাকার বিপুল ঘাটতি বাজেট মূল্যবৃদ্ধির কারণ হবে না, সরকার সে বিষয়েও নিশ্চিত করতে চাইছেন। সরকার খাদ্য বাবদ ব্যয় ১৯৭৯-৮০ সালে আগের বারের ৯,৭১৯ কোটি টাকার পরিবর্তে ৮,৫২৬ কোটি টাকা ব্যয় করবেন। ব্যয় হ্রাস মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী কাজ করবে। আর প্ল্যান-বরাদ্দ শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়ে সরকারী ব্যয় হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি-রোধের অনুকূল কাজ করবে। প্ল্যানের বরাদ্দ বাড়িয়ে ট্যাক্স বৃদ্ধির পথ তৈরী হতে পারতো। আসলে ৬৬৭ কোটি টাকার ট্যাক্স বৃদ্ধির সঙ্গে ২৪০ কোটি টাকার মাশুল মকুবও রয়েছে। কিন্তু সরকারী ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধি হ'লে এতো দুর্যোগের কারণ ছিল না। ট্যাক্স-বহির্ভূত রাজস্ববৃদ্ধি বাজেটের স্বাস্থ্যের নির্দেশক। ১৯৭৭-এর ১লা এপ্রিল পর্যন্ত সরকারী ব্যবসায়ে ১১,৮৫১ কোটি টাকা লগ্নি করা হয়েছে। ট্যাক্স দেবার পূর্বে এই খাতে লাভের ক্ষতিয়ান ২৩৬ কোটি টাকা অর্থাৎ লগ্নি করা পুঁজির ওপর উদ্বৃত্তের পরিমাণ মাত্র শতকরা ২ ভাগেরও কম। পূর্ববর্তী বছর লাভ ছিল শতকরা ৪ ৩ ভাগ, সেবার লগ্নির পরিমাণ ছিল, ১১,০৯৭ কোটি টাকা।

আর মনোপোলী শিল্প-ব্যবস্থা সংস্থাগুলি ভেঙে দেবার সিদ্ধান্তের কি হল?

পশ্চিমবঙ্গে আবার ১৯৬৯-এর মত আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তার, কি শহরে, কি গ্রামে—এতো মারাত্মকভাবে অভাব হবে কেন? শাসক-দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আমরা চাই তাঁরা তাঁদের পূর্ণ সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বাংলাদেশের জন-জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করুন। কিন্তু তাঁরা যদি সব ব্যবস্থাই দলীয় স্বার্থকে সামনে রেখে রূপায়িত করেন এবং গণতন্ত্রে 'মতভেদ'-এর অধিকারকে সন্ত্রাসের পরিবেশে খর্ব করতে সচেষ্ট হ'ন, তাঁরা সর্বনাশ ডেকে আনবেন। পশ্চিম বাংলায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বব্যাপী সঙ্কটের কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। তার উপর মনুষ্য-সৃষ্ট বিদ্যুৎ-সঙ্কট পশ্চিম বাংলার অর্থনীতির সর্বনাশ ডেকে আনছে। সারা দেশে সরকারীভাবে ঘোষিত ৩১৬টি 'রুগ্ন শিল্পের' (জুন, ১৯৭৮) ৭৮টি পশ্চিম বাংলায়। এখান থেকে মূলধনও অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। ১৯৬৬ সালে সারা দেশে শিল্পোৎপাদনের শতকরা ২০·১ ভাগ পশ্চিম বাংলার শিল্পে উৎপাদিত হোতো। এখন তা প্রায় শতকরা ৯ ভাগে নেমে এসেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য চলছে। এই সর্বগ্রাসী সঙ্কট থেকে উত্তরণ চাই। রুশ কিম্বা চীনের লেজুড় হয়ে দেশবাসীকে বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত করা যেতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্বের উদাত্ত প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। সেজন্য চাই ভারতীয়ত্ববোধের পুনরভ্যুত্থান। ত্যাগ, সেবা ও শক্তিসাধনার জয়ী আদর্শে নবতর কঠোর দীক্ষা।

১৯৭৯-৮০র রেল ও পশ্চিমবঙ্গ বাজেট

রেলমন্ত্রী পর পর তিনবার উদ্বৃত্ত বাজেট পরিবেশন করলেন। কিন্তু ১৯৭৯-৮০-র যাত্রীর ও মালের মাশুল বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে। বছর ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিবহনের মাশুল শতকরা ১০ ভাগ এবং পাঁচশো কিলোমিটারের বেশী দূরত্বের বেলায় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে—অবশ্য লবণ পরিবহনে নয়। এই মাশুল বৃদ্ধির কারণ হিসেবেও রেলমন্ত্রী বলেছেন নিয়মমূলক কাজের ব্যয়ভার বহন এবং রেলপরিবহনের স্তার ও বর্ধিত ব্যয়ভার বহনেরও উল্লেখ করেছেন। মাশুল বৃদ্ধি করেই রেলমন্ত্রী ক্ষান্ত থাকেন নাই, এতোকাল যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হতো তাও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। দশ মিটারের বেশী যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে মাসিক টিকিটের যে মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছিলো তারই বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ফলে মাসিক টিকিটের প্রস্তাবিত ভাড়ার শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রেলমন্ত্রীর ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবে রেল-কোষাগারে অতিরিক্ত ১৭৮ কোটি টাকার আয় জমা পড়লেও ব্যয় বাদ দিয়ে রেল বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৮'৩৯ কোটি টাকা। পণ্যের মাশুলবৃদ্ধি কিম্বা যাত্রীভাড়াবৃদ্ধি দুইটি ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মাশুলবৃদ্ধিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে ওঠে, কারণ দূর থেকে রেল-পরিবহনে যে সব পণ্য ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করতে হয়, মাশুল বৃদ্ধিতে তার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং তারই সহমর্মিতায় অন্যান্য অ-পরিবাহিত পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এই মাশুল-বৃদ্ধি তেল, চাল, ডাল, গুড়, অন্যান্য খাদ্যশস্য, চিনি, কাগজ, কেরোসিন, কয়লা, লোহা, সিমেন্ট ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে ক্রেতাসাধারণকে বিব্রত করবেই। এই সূত্রে কোনো কোনো অল্পপণ্যের সর্বভারতীয়-পরিবহনমাশুলের সমীকরণের অভাব পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিকে কি রকম বিপর্যস্ত করেছে, সে-কথা এসে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিম বাংলা থেকে কয়লা পরিবহনের মাশুল ভারতের সর্বত্র একই হারে নির্ধারিত হলেও, তুলার পরিবহন মাশুল ভারতের সর্বত্র সমীকরণ করা হয় নাই। পশ্চিম বাংলাকে মহারাষ্ট্র থেকে তুলা আনতে হলে অতিরিক্ত মাশুল দিয়েই আনতে হয়। এই বৈষম্য-মূলকনীতি ভারত সরকার আজও দূর করতে পারেন নাই, সুতরাং রেলমন্ত্রীর দিক থেকে এ-সম্বন্ধে কোনো মাথাব্যথা নাই।

১৯৭৭-৭৮-এর রেল বাজেটে অনুমিত উদ্বৃত্ত ৩২'৫ টাকার পরিবর্তে সংশোধিত উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৮৯ কোটি টাকা এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃত উদ্বৃত্ত হয়েছে ১২৬'২৩ কোটি টাকা। ১৯৭৮-৭৯-তে অনুমিত উদ্বৃত্ত ৬১ কোটি টাকার পরিবর্তে সংশোধিত উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২১'৭২ কোটি টাকা। এ-বছর অভূতপূর্ব বর্ষণ, বন্যা, লাইনে ভাঙন, লাইন ধ্বসে যাওয়া, বিপজ্জনক রেল সেতু, তিন সপ্তাহের ওপর বন্যাজনিত পরিস্থিতির ফলে ৩৫,০০০ হাজার অচল ওয়াগন এবং পোর্টে ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে ৩০ কোটি টাকা লোকসানের পরও এই উদ্বৃত্ত সম্ভব হয়েছে।

যাত্রীদের জন্য রেলমন্ত্রী কতকগুলি সুবিধা দিয়েছেন। কুড়িজন বা তার বেশী সংখ্যক কৃষক জাতীয়-শিল্প বা কৃষি-প্রদর্শনী দর্শনেচ্ছু হলে তারা স্বাভাবিক ভাড়ার তিন-চতুর্থাংশ হারে বিশেষ ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবেন। শিশুবর্ষ উপলক্ষ্যে শিশুদের ভাড়ার ছাড় এ-বছর পাঁচ বছর বয়স্কদের পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এ-ছাড়া মাটির ভাঁড়ে পানীয় জল পরিবেশনের, খাদ্য পরিবেশনের উন্নত-ব্যবস্থার উল্লেখও রেলমন্ত্রী করেছেন। যাত্রী-সাধারণের আরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার কথাও রেলমন্ত্রী ভাবছেন। কলকাতায়

পাতাল রেল-এর কাজ এগিয়ে যাবে, সেজন্য এ-বছর ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে।

অনেক যাত্রী-গাড়ী, ওয়াগন, ইঞ্জিন অকেজো হয়ে রয়েছে। নূতনভাবে রেলপথ বিন্যাস প্রয়োজন, তার পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মত। সেজন্য ডিপ্রিসিয়েশন রিজার্ভ তহবিল ১৪৫ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকায় বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া রেলের ৩৮৮ কোটি টাকা দেনা রয়েছে, রেল ভারত সরকারকে ছয় হাজার টাকার পুঁজি ব্যবহারের জন্য ২৪৫ কোটি টাকার ডিভিডেন্ট দেয়। পুঁজির পরিমাণ হিসাব থেকে বাদ দিলে ডিভিডেণ্ড এর পরিমাণ সীমিত হবে।

যাত্রীভাড়া এবং পণ্যভাড়ার মাশুল নির্ধারণের জন্য ডঃ এইচ কে, পরাঞ্জপের নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছিলো, তার সুপারিশ অনুযায়ী-ই এই মাশুলের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে। রেলওয়ে কনভেনশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রেলের পুঁজির গড়ন পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর উপর ভার দেওয়া হয়েছে। আর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর রেলের সামাজিক দায়-দায়িত্বের বিস্তারিত সমীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে।

রেলমন্ত্রী কিংবা ভারত সরকার, রেলকর্মীদের বোনাস সম্পর্কে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিতে পারার ফলে রেলে শ্রমিক-অসন্তোষ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের কর্মকুশলতা ব্যাহত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৯-৮০-র বাজেটে ঘাটতির বহর ৮০'৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রারম্ভিক তহবিলে ৫৩'৮০ কোটি টাকার ঘাটতি অড়িয়ে রয়েছে। প্রারম্ভিক তহবিলের ঘাটতি অনুমান করা হয়েছিল ২৫'৮৮ কোটি টাকার। বাস্তুত্যাগীদের দণ্ডকারণ্য থেকে প্রত্যাবর্তন এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সামলাবার জন্য প্রারম্ভিক তহবিলের ঘাটতি বেড়ে গেছে। এই বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধির আর একটি কারণ স্বরূপ বাজেটে বলা হয়েছে, রাজ্যের সর্বস্তরে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কিন্তু যাদের মোট উপার্জন মাসে ২৩৫ টাকার সীমানা অতিক্রম করবে না তাদের মাসে ২২ টাকা হারে অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে। এই নূতন হারে মহার্ঘভাতা বাবদ রাজ্য সরকারের বছরে অতিরিক্ত ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পৌনঃপৌনিক বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দারুণ সঙ্কটের মুখে পড়েছিলো। সেই বিপদে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সকল প্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব মিলিয়ে দুই বছরে ৫৫০ কোটি টাকার সাহায্য চেয়েছিলেন, অর্থাৎ, ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত ১৬৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়সীমা পর্যন্ত ৫১ কোটি টাকা সাহায্যে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তবুও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভার এবং শাসক দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্য অপ্রতুল অর্থ সাহায্যের অভিযোগ অবিরত উত্থাপিত হয়েছে।

১৯৭৯-৮০ সালে রাজ্যের প্রারম্ভিক তহবিল ৫৫'৮৩ কোটি টাকা ঘাটতি দিয়ে সুরু হয়ে, এ বছরের শেষে প্রারম্ভিক তহবিলসহ ঘাটতির পরিমাণ হবে ৮৪'৪৮ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী ঘাটতি মেটানোর জন্য ৩৭ কোটি টাকার অর্থসংগ্রহে মন দিয়েছেন, তার মধ্যে ৩ কোটি টাকা সি, এম, ডি-এর জন্য। পেশা বা বৃত্তিকর স্থাপনের পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রী উত্থাপন করেছেন। এর ফলে মাথাপিছু বছরে ২৪ টাকা থেকে ২৫০ টাকা করের বোঝা বাড়বে। এই কর দো'কর রূপে কাজ করছে এবং অনেক আয়কর দাতাদের ঘাড়ে এই কর চেপে বসবে। তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত বেতনভোগীদের সংখ্যাই অনেক হবে। ৫০০ টাকা মাসিক আয় যাদের তারা এই বৃত্তিকর থেকে রেহাই পেলেও এই দো'কর করের চাপ অনেক করদাতাকেই পীড়ন করবে। বিক্রয় কর আইনের আওতায় করের বিন্যাস পরিবর্তন করে বেঙ্গল ফিনান্স (সেলস ট্যাক্স) এ্যাক্ট। ১৯৪১ অনুযায়ী ধার্য কর শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বর্ধিত ট্যাক্স ক্রেতাসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, আইন যাই থাকুক না কেন?

১৯৭৯-৮০-র পরিকল্পনার ব্যয় নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধীর ভূমিকায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্র-নির্দিষ্ট ৩১০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৫৩১ কোটি টাকার পরিকল্পনা

নির্দিষ্ট করতে তারা বদ্ধপরিকর। "আমাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে একে খর্ব করা সম্ভব হবে।" অর্থমন্ত্রীর এই রণহুঙ্কার একেবারে শিশুসুলভ মনে হয়। তারা সম্পদ সংগ্রহ করে পরিকল্পনার বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে পারেন। কেন্দ্র তাতে বাদ সাধবেন কেন?

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন অর্থমন্ত্রীর বাজেটের অভিভাষণের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। সপ্তম অর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে রাজ্যের হাতে পূর্বেকার বছরগুলির চাইতে বেশী অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অথচ এ বিষয়েও অর্থমন্ত্রী স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। অর্থমন্ত্রীর মতে "ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালে কেন্দ্রীয় মোট রাজস্ব ৪৩,৯৭৬ কোটি টাকা থেকে ১১,১৬৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২৫·৪শতাংশ রাজ্যগুলির হাতে বর্তায়। সপ্তম অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৭৯-৮০ সময়কালে আনুমানিক কেন্দ্রীয় রাজস্ব ৮০,১২৬ কোটি টাকা থেকে রাজ্যগুলিকে হস্তান্তরিত টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ২০,৯০৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২৬·১ শতাংশ।" অর্থমন্ত্রীর চোখে এটা এমন কিছু নয়।

অথচ অন্যত্র অর্থমন্ত্রী কবুল করেছেন: "কেন্দ্র থেকে রাজ্যে বাড়তি সম্পদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে একটা সূচনা অন্তত হয়েছে।" ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের রায়ে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের মাত্র ২০ শতাংশ রাজ্যগুলি পেতো, সপ্তম অর্থ কমিশনে তা ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। আয়কর থেকে রাজ্যগুলির পাওনাও শতকরা ৮০ থেকে ৮ ভাগে বড়ানো হয়েছে।

দশ ক্লাশ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বিনা বেতনে ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি ভালো কাজ। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় নীতির মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য এই ভালো কাজটুকুকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

১৯৭৮-৮০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণ উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী সঙ্গতভাবেই বলেছেন যেখানে পশ্চিমাঞ্চলে ৫৮৫০ মেগাওয়াট, উত্তরাঞ্চলে ৪৭৬০ মেগাওয়াট, দক্ষিণাঞ্চলে ৪ ৬০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বরাদ্দ ৩,৪০৭ মেগাওয়াট। এর প্রতিকার চাই। কিন্তু সাঁওতালদির চতুর্থ ইউনিট, ব্যাণ্ডেলের পঞ্চম ইউনিট, কোলাঘাটের প্রথম তিনটি ইউনিট এবং টিটাগড়ের চারটি ইউনিট চালু করে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি ১,১০০ মেগাওয়াট বাড়াবার প্রস্তাবকে দ্রুত কাজে রূপায়ণের সম্ভাবনা বিলম্বিত করালো কে? এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী কি বলেন?

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পশিক্ষার ক্রমবিকাশ

(১৮৫৩-১৮৬৫)

৬·০০

লক্ষীশ্বর সিংহ বুনিয়াদী শিক্ষার মৌলিক ভাবনার অগ্রদূত। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যাবে।

যে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

১৯২৪ সালের শেষার্দ্ধে ফিরে যাওয়া যাক।

সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের পর ডিসেম্বরে কংগ্রেস অধিবেশন। দক্ষিণাঞ্চলের বেলগাঁও সহরে। সভাপতি স্বয়ং গান্ধীজী।

ইতিমধ্যে বাঙ্গলাদেশে নতুন অর্ডিনান্স ঘোষিত হয়েছে ২৩শে অক্টোবর। সঙ্গে সঙ্গে, বিপ্লববাদী সন্দেহে শত শত যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সুভাষচন্দ্র সহ স্বরাজ্য দলের বহু কর্মী গ্রেপ্তার ও অনির্দিষ্টকালের জন্য অজ্ঞাত কারায় স্থানান্তরিত।

রাজনীতিক্ষেত্রে তখন স্বরাজ্যদলের প্রভাব ও গৌরব সর্বোচ্চে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদে অন্যান্য দল-উপদলের সহযোগিতায় স্বরাজ্য-দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ—বার বার তারা সরকারী মন্ত্রীমণ্ডলীর বেতন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, বহু সরকারী গোপন তথ্য ফাঁস করে, বিনাবিচারে বন্দীদের মুক্তিপ্রস্তাব গ্রহণ করে, জেলখানার অনাচার ও অত্যাচারের বিরোধিতা করে সরকারপক্ষকে নাজেহাল করছে। প্রত্যেকটি আধা স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে সরকারী দলের সমর্থক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে, স্বরাজ্যদল গণ-প্রতিনিধিদের নির্বাচনে জয়যুক্ত করে একদিকে দেশবাসীর মনোবল বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে আধা-সরকারী বহু প্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড থেকে সুরু করে বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা, বা কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালনে জনপ্রতিনিধিদের অধিকারবৃদ্ধি ও পরিচালন-ক্ষমতা হস্তান্তরে এক নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশের রাজনীতিকদের মধ্যেও স্বরাজ্যদলের উদ্ভব, প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানবার আগ্রহ প্রবল হয়েছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট গ্রহণ করে বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়কে সরকারী সমর্থকের দলছুট করা হয়েছে। তাঁরা তখন স্বরাজ্য-দলেরই সমর্থক।

বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী এবং সঙ্গে সঙ্গে শত শত যুবককে গ্রেপ্তারের ফলে সারাদেশে বিপুল চাঞ্চল্য ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ং মহাত্মাজী, পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধুর সঙ্গে স্বাক্ষরিত যুক্ত-বিবৃতিতে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে একথাও জানিয়েছেন :

"যেহেতু বাঙ্গলার স্থানীয় শাসনপক্ষ কর্তৃক বড়লাটের সম্মতি নিয়ে দমন-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে এবং এ নীতি যথার্থই বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়ে স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়েছে, যার মানে বিধি-তন্ত্র ও শৃংখলানিষ্ঠ আন্দোলনমাত্রের বিরুদ্ধেই লক্ষীভূত হয়েছে, তজ্জন্য, (অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে) বেলগাঁও কংগ্রেসে উত্থাপনের জন্য এ প্রস্তাব করা হল যে;

"কংগ্রেসে অসহযোগ নীতি গ্রহণ করা স্থগিত থাকুক এবং উহার বিবিধ প্রকার কর্মগুলির ভার প্রয়োজনানুরূপভাবে বিভিন্ন দল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ও অঙ্গরূপে ত্যাগ করিয়া লওয়া হউক"—ইত্যাদি।

এইভাবে স্বরাজ্যদলকে "কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত একটি দল" বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল। বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনে হাজার হাজার দেশবাসী এ স্বীকৃতি অনুমোদন করে নিল।

স্বরাজ দলের পৃথক সত্তা আর রইল না।

দেশবন্ধুর কার্যপন্থাই কংগ্রেসের, তথা দেশের, আপন বলে গৃহীত হল।

পূর্বতন অসহযোগ-নীতির পরিবর্তে নিয়ত বাধাদান ও সংঘর্ষমুখী নীতির মাধ্যমে চলতি সরকারকে সর্বতোভাবে বিপর্যস্ত ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে দেশবাসী সংকল্পবদ্ধ হলেন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে, গয়া সহরের সুদূর পূর্বপ্রান্তে, ফল্গুতীরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি দেশবন্ধু তাঁর মূল অভিভাষণে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্য-পন্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছিলেন।

পণ্ডিত মতিলাল তখনকার চলতি অথচ ম্রিয়মান অসহযোগ নীতির পরিবর্তন এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন দ্বন্দ্বে যোগদানের সংবলয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

গান্ধীজী তখন কারাগারে।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তাঁর প্রতিভূরূপে পণ্ডিতজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, মহাত্মাজীর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুসৃত কার্যপন্থার একচুল পরিবর্তনও তিনি সহ্য করবেন না।

সেদিন রাজাগোপালাচারীজীর বিরোধিতারই জয় হয়েছিল। যার ফলে সৃষ্টি হল স্বরাজ্য দল। কংগ্রেসের পরিবর্তে এই নতুন দলই দেশের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে জাতীয় আন্দোলনে নতুন দিক্ নির্দেশ করে দিল।

দেশবাসীর মনে নতুন কর্মোদ্যম সৃষ্টি হল। পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন আইন-সভায় সরকার পক্ষকে বার বার পরাজিত করায় নতুন কর্মপন্থার উপযোগিতা প্রমাণিত হল।

দু'বছর পর বেলগাঁও কংগ্রেসে গয়া-অধিবেশনেরই অনুরূপ প্রস্তাব স্বয়ং মহাত্মাজীর সভাপতিত্বেই গৃহীত হল। স্বরাজ্যদলের কর্মপন্থাই কংগ্রেসের নিজস্ব ও-দল কংগ্রেসেরই অঙ্গবিশেষ মাত্র, কোনও পৃথকসত্তাবিশিষ্ট, ভিন্নপন্থী দল নয় বলে স্বীকৃত হল।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীজী কি এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন?

* * *

বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনেই দেশবন্ধুর রাজনীতিক জীবনের প্রধান অধ্যায়ের সমাধি বলা চলে।

দু'বছর পূর্বে তাঁরই নির্দেশিত নতুন কর্মপন্থা এবার কংগ্রেসে গৃহীত হবার পর, এবং স্বয়ং মহাত্মাজী কর্তৃক তা অনুমোদনের ব্যবস্থা দানের ফলে দেশবন্ধু বা তাঁর দলের পৃথক অস্তিত্বের আর প্রয়োজন রইল না।

দেশবন্ধু স্থির করলেন, এখন থেকে তিনি পল্লীসংস্কার ও পল্লীসংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করবেন।

ওদিকে মহাত্মাজী জানালেন কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যাবলী স্বরাজ্যদলই পরিচালন করবে। তিনি নিজে হরিজন সেবা, সাম্প্রদায়িক মিলন, চরকা-খদ্দর প্রচার ও বিদেশীবর্জনে আত্মনিয়োগ করবেন।

বস্তুতঃ বেলগাঁও কংগ্রেস জাতীয় জীবনের অন্যতম সন্ধি ও মিলনক্ষেত্র বলা চলে। এই অধিবেশনকালেই দেশবন্ধু সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হন। এই জ্বর ক্রমে অসামান্য থেকে মারাত্মক রূপ নেয়।

জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না।

আপাতদৃষ্টিতে যা সামান্য, পরবর্তী দু'মাসের মধ্যে তা এই কর্মযোগীর দেহ সম্পূর্ণ গ্রাস করবে, তা কি কেউ ভেবেছিল?

বেলগাঁও যাবার পূর্বেই দেশবন্ধু তাঁর বসা রোডের বাড়ী 'কালিমোহন ভবন' দেশসেবায় উৎসর্গ করেছেন। অসুস্থ হয়ে তিনি বেলগাঁও থেকে আর কলকাতায় ফেরেন নি, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য গেলেন পাটনায়, তাঁর ভাইয়ের কাছে।

তিনমাস বাদে প্রাদেশিক সম্মেলন। ফরিদপুরে। দেশ-বন্ধু সভাপতি। গান্ধীজীও ঐ অধিবেশনে যোগ দেবেন।

ঐ অধিবেশনকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ তথা ভবিষ্যত কর্মনীতি সম্বন্ধে দেশবন্ধু নতুন পথের নির্দেশ দেবেন এরূপ সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

সত্বর রোগমুক্তির জন্য কিছুকাল বিশ্রাম প্রয়োজন—

চিকিৎসকদের এই নির্দেশানুযায়ী দেশবন্ধু সরাসরি পাটনায় গেছেন, এ-কাহিনী প্রচারিত করা সত্ত্বেও, ওখানেই নানা শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের নিয়ত যাতায়াতে সন্দেহ হল—শুধু রোগ-মুক্তি নয়, আরও কিছু বিশেষ প্রয়োজনেই হয়ত তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশের আশায় পাটনায় রয়েছেন।

তাছাড়া ফরিদপুর সম্মেলনের দিনও আসন্ন। সভাপতির অভিভাষণ প্রণয়নের জন্যও কিছু অবসর প্রয়োজন। ঐ ভাষণ মাধ্যমেই কংগ্রেসের ভবিষ্যত ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার কথা।

সার বাঙলায় প্রচণ্ডভাবে ধর্ষণনীতি সুরু করে বৃটিশ শাসনের বড় কর্তারা আর একবার সন্ধি ও মিটমাটের চেষ্টা সুরু করলেন।

এবারও দেশবন্ধুর সঙ্গে। স্বরাজ্যদল তখন দেশময় এক নতুন রাষ্ট্রচেতনা, অভিনব কর্মপন্থা সৃষ্টি করেছে। এ পন্থা বৈপ্লবিক সন্দেহ নেই, তবে হিংসাপন্থী নয়। দেশবন্ধুকে সকল কাজে ঘিরে আছে পুরানো হিংসাপন্থীদল আর তাদের নিয়ত বর্দ্ধমান ছাত্র-যুবক অনুগামীবৃন্দ। এঁদের সঙ্গে দেশ-বন্ধু তিন বছরের 'সন্ধি চুক্তি'তে আবদ্ধ। দু বছর শেষ হয়েছে। এখন চলছে তৃতীয় ও শেষ বছর।

এদের প্রভাব থেকে যদি দেশবন্ধুকে সরিয়ে নেওয়া যায় তবে একটা আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হতে পারে।

এই ধারণার উপর নির্ভর করেই বাঙলায় নতুন নিপীড়ন আইন প্রয়োগে গ্রেপ্তার সুরু! কর্মিদলকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য, দেশবন্ধুর শক্তি ক্ষুণ্ন করা। শক্তিহীন হলেই তিনি হবেন অসহায়। তখন আপোষ-রফায় তিনি হবেন আগ্রহী, ভবিষ্যৎ শাসন-কাঠামো গঠনে পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করা তখনই সম্ভব হবে।

বেলগাঁও কংগ্রেসে মিলন প্রস্তাব গ্রহণের পর লর্ড বার্কেনহেডের দল আবার আশান্বিত হয়ে উঠলেন। এবার দেশবন্ধুই কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের নিয়ামক। মুস্লিম জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা আপোষ-রফার ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। অন্যান্য ছোট বড় সম্প্রদায়গুলির দাবী-দাওয়ার মীমাংসাও তিনি অনুরূপভাবে করে ফেলতে পারবেন এরূপ মনে করা যেতে পারে।

এখন হিংসাপন্থী বিপ্লববাদীদের দূরে সরিয়ে রেখে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক কর্মীদলকে যথাসম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যদি কংগ্রেস ও সরকারপন্থী পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল করানো যায়, তবে একদিকে ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন, অপরদিকে বৃটেনের আওতাভুক্ত সম-অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এক সমন্বয় সম্ভব হতে পারে।

এজন্য দেশবন্ধুর কর্মপন্থা ঘোষণার পূর্বে তাঁকে যতটা সম্ভব প্রভাবিত করার চেষ্টাই হল বার্কেনহেডপন্থীদের লক্ষ্য।

পদ্মা নদীর সুবিস্তীর্ণ বালুচরে, শহর থেকে কিছু দূরে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন। ঐ সঙ্গে এক স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা, ভূতপূর্ব সরকারী উকিল (রায় সাহেব) সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

অক্লান্ত পরিশ্রমী বিশ্বাস মহাশয় সকল কর্মের উদ্যোক্তা। মহাত্মাজী আসবেন, দেশবন্ধু থাকবেন—এঁদের দু'জনের অনুগামী, এতদিনের পৃথক দলভুক্ত শত শত কর্মীর শুভ প্রথম মিলন ক্ষেত্র হবে এই ফরিদপুর সম্মেলন। রাজনৈতিক প্রভাব যেমন হবে সুদূরপ্রসারী, সামাজিক মূল্যায়নও কম হবে না। গত দু' বছরে বহু বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়েছে। পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই একই সংসারে থেকে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে কত অন্তর্যাতনায় কাল কাটিয়েছেন।

এবার ফরিদপুরে তাদের মিলন আসন্ন। আবার সবাকার 'একমন একপ্রাণ' হবার পালা। নানা রকম আশা নিয়ে অনেকেই সমবেত হবেন ফরিদপুর।

এদের অবস্থান ও আপ্যায়নের সব ব্যবস্থা করতে হবে। এক কলকাতা থেকেই আসবেন বহু প্রতিনিধি, দর্শক, সংবাদপত্র প্রতিনিধি। মফঃস্বলের আগন্তুকের সংখ্যাও কম হবে না।

সেকালের ফরিদপুর ছিল ছোট্ট শহর। একখানি গ্রামেরই বিস্তারিত সংস্করণ। এরূপ শহরে হাজার হাজার নতুন লোকের সমাবেশ—তাদের খাওয়া-থাকা-আপ্যায়নের ব্যবস্থাসাধন দুদিনের জন্য হলেও, কম কথা নয়।

বিশ্বাসমশায় ভাল ব্যবস্থাই করেছিলেন। কারো কোনও অসুবিধার কথা শোনা যায় নি।

তাছাড়া যে-উদ্দেশ্যসাধনে এত জনসমাবেশ, তা সিদ্ধ হলেই সকলে সন্তুষ্ট। অন্য অসুবিধার কথা চিন্তা করবার অবসর কোথায়, প্রয়োজনই বা কি ?

বিরাট সভামণ্ডপে সহজ সরল ব্যবস্থা। নেতৃবৃন্দের বসবার বিশেষ আসনের স্থান নেই, একটু উচ্চ মঞ্চে সাধারণ মাদুর বিছিয়ে ঢালাও বসার ব্যবস্থা। না তাকিয়া, না চাদর। এতে সম্মুখে বসা হাজার হাজার দর্শকের সুবিধা ও সোয়াস্তি দুইই হয়েছিল। মহাত্মাজী ও দেশবন্ধু দু'জনে পাশাপাশি একই মাদুরে বসেছিলেন, দর্শকরা তা দেখেই তৃপ্ত।

মাঘ-ফাগুনের শেষ, দারুণ গরম। সম্মুখের বালি-রাশি পেরিয়েই পদ্মার প্রশস্ত রূপালী বক্ষ—টলটলে জলের দোল-লাগা ঢেউগুলি নিয়ে আসে স্নিগ্ধ-শীতল সমীরণ—রৌদ্রের তাপ কমিয়ে দেয়, সকল অবসাদ দূর করে। সভার কাজ চলে সুস্থির গতিতে।

সেকালে, দূরের ঐ অঞ্চলে তড়িৎ-পাখার চিন্তাও ছিল স্বপ্ন-বিলাস। হাতপাখা এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিল বটে। তার প্রয়োজন কেউ বিশেষ বোধ করেন নি। নেতৃবৃন্দের ভাষণ শুনবেন, না পাখা টানাটানি করবেন। গান্ধীজী নিজে ত' পাখায় হাত দেন না। তাঁর পাশে বসে অন্য কে বাতাস খাবে ?

যথাসময়ে সভার কাজ সুরু হল। মহাত্মাজী সম্মুখেই বসেছেন। ভাব-গম্ভীর ক্ষুদ্রাবয়ব, খালি গা, হাঁটুর প্রান্তে মোটা খদ্দরের পাড়হীন ধুতি, তখনো চরকা বা তকলী হাতে সভায় বসা সুরু করেন নি।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সুরেনবাবুর ভাষণের পর উঠলেন দেশবন্ধু। ধীরে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সম্মুখের বক্তৃতামঞ্চে।

'যুগে যুগে ভারতবর্ষে একই প্রশ্ন উঠিয়াছে', তিনি বললেন, 'মুক্তি কোন্ পথে ?'

এই মুক্তির নানা ব্যাখ্যা হয়েছে : রাষ্ট্রীয় আধ্যাত্মিক, মানসিক বা শারীরিক। এসব সম্বন্ধে দার্শনিকদের চিন্তা, চুলচেরা তর্কের শেষ নেই।

কিন্তু পথের সন্ধান আজও মেলে নি। সারা বিশ্বে আজও ঐ একই প্রশ্ন। নানারূপে তার বিচিত্র অভিব্যক্তি।

"পাশ্চাত্যের শিল্প-সমৃদ্ধ জাতিগুলির আগ্রাসী নীতি রোধ করতে পারে—এমন শক্তিধর জাতি আজ কোথায় ?...

"শুধু সীমাবদ্ধ বা সামান্য শক্তি ও সম্পদের জন্যই নয়, বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের বিকৃতিই আমাদের সকল প্রকার স্বাধিকার প্রয়াসকে ধূলিসাৎ ও জাতিগত দৈন্যকে প্রকট করে তুলছে।

"সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মদগর্বী ঔদ্ধত্য রোধ করতে হলে শুধু উচ্চ আদর্শবাদ বা নীতিবোধ প্রখর করলেই চলবে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দেশগুলির সম্মিলিত শক্তির বিরাট ব্যূহ সৃষ্টি করতে হবে।

"এর জন্য সর্বাগ্রে চাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা—যা হবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।"

"এর পরই প্রয়োজন, সমধর্মী শক্তি-মণ্ডলীর সমন্বয় সাধনের সংকল্প। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন দেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা—আগ্রাসী বৃহত্তর শক্তির দুরভিসন্ধি প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

"এর জন্য যে সর্বাত্মক সাধনা প্রয়োজন, কোনও ক্ষুদ্র জাতির একক চেষ্টায় তা সম্ভব নয়।

"বর্তমান শিল্পপ্রধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যানুসারী সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রূর চক্রান্তের বিরুদ্ধে একক চেষ্টায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, আত্মবিকাশ নয়, আত্মাহুতি মাত্র। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। একথা মনে রেখেই আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে হবে।

"ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি—এজন্য চাই প্রাচ্য-দেশের ছোটবড় সব রকম স্বাধীনতা প্রয়াসী দেশগুলির এক বিরাট সমন্বয় (Federation)—যার ভিত্তি হবে প্রত্যেকের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংকল্প; আত্মবিকাশ হবে স্বেচ্ছায়, সংঘবদ্ধ প্রয়াসে; প্রত্যেকের বিশিষ্টতার ধারার গতি অব্যাহত রেখে। পূর্ণ কর্মোদ্যমও জাতীয় চরিতার্থতার পথে অগ্রসর হবার শপথ গ্রহণেই হবে এর আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি।"

"এই পারস্পরিক সহযোগিতা, মৈত্রী ও আত্মবিকাশের

দৃঢ় সংকল্পই প্রাচ্য দেশগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার শ্রেষ্ঠ বর্মরূপ ধারণ করতে পারে। এই মৈত্রী ও সমন্বয়ই পাশ্চাত্যের আগ্রাসী নীতি রোধ করতে পারে।"

"হিংসা ও হিংসাশ্রয়ী আত্মধ্বংসী পথে যে মুক্তি অর্জনের পরিকল্পনা, তা শুধু আগামী দিনের বৃহত্তর হিংসা ও মরণ-যজ্ঞের পথই উন্মুক্ত করে। প্রকৃত মুক্তি-পথের সন্ধান নিতে হলে, প্রত্যেক মানুষের যেমন, ছোট বড় সব জাতির পক্ষেও তেমনি, আত্মস্থ হতে হবে, অন্তর্মুখী হতে হবে, অন্তরের সম্পদ বাড়াতে হবে এবং সেগুলির বিকাশ সাধনের জন্য জন-সেবার কাজে আরও আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে আশ্রয় নিতে হবে। এছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় পথ নেই।"

"এই পথের প্রথম ও প্রধান বাধা, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা। সেজন্য চাই স্বাধীনতা—ভারতের, তথা সমগ্র এশিয়ার, ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগুলির মুক্তিসাধনার প্রথম পদক্ষেপ।

"স্বাধীনতা অর্জনেও আমরা যদি নিজস্ব ঐতিহ্য স্মরণ করে অগ্রসর হতে পারি, তবেই মঙ্গল।

"সেজন্য আমরা শান্তিপূর্ণ, অহিংস পথই বেছে নিয়েছি। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে এই শান্তিপূর্ণ, অহিংস পথে চললেই আমরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছি।"—এই কথা বলেই দেশবন্ধু মহাত্মাজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলতে সুরু করলেন :

—আপনিই আমাদের নায়ক ও পথ প্রদর্শক। যে যাই বলুক, আপনি জানেন, ভালভাবেই জানেন, আমি কখনই আপনার বিরোধিতা করিনি। আপনার নির্দিষ্ট পথকেই আমরা আমাদের জীবনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছি। সংশয় বা বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হবার প্রয়োজন কি?"

কিন্তু বিরোধ মীমাংসার সব চেষ্টায়ই সময় নির্দেশ থাকা চাই। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আপোষের নামে দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নিয়ে দেশে নানারূপ দলাদলি ও নিপীড়নের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

"ভবিষ্যতে যাতে সেরূপ স্থগিত পন্থায় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা নিষ্পেষিত বা কলংকিত করবার চেষ্টা না হয়, তার পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমূলক শাসন-বিধি প্রণয়ন করা হবে—এই ঘোষণাও তার পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই আমরা আমাদের কার্যপন্থা নির্দ্ধারণ করতে পারি।

"যদি তা না পাই তবে ভবিষ্যতের সকল কাজের এবং তার ফলাফলের দায়িত্ব বহন করতে হবে শাসকবর্গকে এবং ওদের কুচক্রী হিতৈষীদের—ভারতের জনসাধারণের নয়।"

"আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য আজ কারও অজানা নেই—অভীষ্ট অর্জনের শান্তিপূর্ণ পথ অবলম্বনে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বরাজ লাভ আমরা করবই।

'কোন পথ অবলম্বনে এ স্বরাজ অর্জিত হবে, তা নির্দ্ধারিত হবে আমাদের বিরোধীপক্ষের আচরণে।"

"দেশবন্ধুর ভাষণের সারাংশ সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হল। মহাত্মাজীর প্রতি অবিচল আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার আশ্বাস দিয়ে দেশবন্ধু সরকারপক্ষের সঙ্গে 'সন্ধির' প্রস্তাবসহ অনেক কথা বলেছেন। তাঁর প্রস্তাবে মহাত্মাজীরও অনুমোদন ছিল।

এই সিদ্ধান্তই হল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিত।

বার্কেনহেডপন্থীরা এ আশ্বাস পেয়ে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন তা তখনই অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

* * *

ফরিদপুর সম্মেলনের পরও দেশবন্ধুর অসুস্থতার নিরসন হল না। জ্বর নিয়েই তিনি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, জ্বর নিয়েই ফিরলেন কলকাতায়। নিজের বাড়ীতে নয়, সে বাড়ী ত' ইতিপূর্বেই জনসেবায় উৎসর্গ করা হয়েছে।

উঠলেন তাঁর বন্ধু এটর্নী পি. সি. কর মহাশয়ের আমন্ত্রণে, ভবানীপুরে বিশপ লেফ্রয় রোডে, কর সাহেবেরই এক বাড়ীর ফ্ল্যাটে।

চিকিৎসার সুবিধা হবে ভেবেই বোধ হয় তিনি ওখানে উঠেছিলেন।

কলকাতায় নানা কাজ, নিত্য বহু জনসমাবেশ, নানা সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর পরামর্শ অপরিহার্য। এখানে বিশ্রাম নেই; অথচ বিশ্রামই তাঁর রোগ নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

অবশেষে চিকিৎসক ও বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে তাঁকে দার্জিলিং পাঠানো স্থির হল।

এখানেও বন্ধুবর ব্যারিষ্টার নৃপেন্দ্রনাথ (সরকার) দেশ-বন্ধুর থাকবার ব্যবস্থা করলেন তাঁরই এক বাড়ীতে, 'ষ্টেপ এসাইড' ভবনে'।

দার্জিলিং যাওয়ার প্রায় সব স্থির।

দেশবন্ধু একদিন ডাকলেন তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ, অনুগামীকে বিশপ লেফ্রয় রোডের আবাসে।

সকাল ন'টা হবে। তাঁর ঘরে যেতেই দেখা গেল. রাস্তার দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে তিনি যেন আপন মনেই বলে চলেছেন :

'কি হল ! এত হাততালি, এত ফুলের মালা, জয়ধ্বনি, চীৎকার, কোলাহল, এর পরিণতি কি ?'

সহসা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন আগন্তুকদের। বললেন,

'না, এ আমার ভাল লাগছে না। এত আদর-আপ্যায়ন, সব আমার জন্য। বড় লজ্জা করে।'

'শুধু থাকবার বাড়ী নয়, এরা একজন সরকার রেখে দিয়েছেন। সেই রোজ বাজার করে, কখন কি চাই বার বার খোঁজ নেয়।'

'শুনেছি, দার্জিলিং-এও এই ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানেও সরকার পাঠানো হয়েছে। আমার দেখাশোনা, বাজার, খরচ-পত্তর -সব সে করবে। এ আমার ভাল লাগছে না। বড় লজ্জা, কুণ্ঠিত বোধ হয়।'

'কতদিন বাঁচবো কে জানে ? সারা জীবন কি পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে নাকি ?

'তোমরা এক কাজ কর।

'কলকাতার কাছেই কোনও এক গ্রামে আমাকে ছোট্ট একখানি কুঁড়েঘর তুলে দাও। ওতেই চলে যাবে। ছোট্ট গ্রামে ছোট্ট একখানি খড়ের ঘর। সঙ্গে ছোট্ট উঠোন, কয়েকটি ফুলের গাছ। আর কিছু চাই না।

'মাসে তিনশ' টাকা হলেই চলে যাবে। 'ফরওয়ার্ড' থেকে আমাকে ঐ টাকাটা দেবার ব্যবস্থা কর। ওতে আমার বেশ চলে যাবে।'

ক'দিন বাদেই দেশবন্ধু দার্জিলিং রওনা হলেন।

পথে পথে সেই ফুলের মালা, জয়ধ্বনি, হাততালি ও কোলাহল কিছুরই অভাব হল না।

দেশবন্ধু তখন হয়ত দেখ্‌ছেন বাঙলার রূপ, শুনছেন বাঙলার কথা।

তিনি কি তখন অসুস্থ ; না আত্মস্থ ?

অবশেষে মহাপ্রয়াণ। ঐ 'ষ্টেপ এসাইড' ভবনেই। ১৬ই জুন, ১৯২৫।

মহাত্মাজী তখনো বাঙলাদেশের জেলায় জেলায়, সহরে গ্রামে তাঁর নতুন কর্মধারা প্রচারে নিয়ত ভ্রাম্যমান। সাম্প্রদায়িক মিলন, চরকা-প্রচার, খদ্দর ব্যবহার, অনুন্নতদের দুর্দশা দূরীকরণ, বিদেশী বস্ত্রবর্জন—এই তাঁর নতুন কর্মপ্রয়াস।

ভ্রাম্যমান অবস্থায় তিনি ইতিমধ্যে একবার দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর সঙ্গে অবস্থান করে এসেছেন।

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবরাখবর করতেই তিনি গেছেন —এ সংবাদ বাইরে প্রচারিত হলেও, গুজব রটে গেল, দেশবন্ধুর ফরিদপুর ভাষণে সম্ভাব্য রাজনৈতিক আপোষরফা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী তরফ থেকে শলা-পরামর্শের ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সাধনের জন্য দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর সঙ্গে মহাত্মাজীরও ব্যক্তিগত উপস্থিতি প্রয়োজন। বিশেষতঃ তিনি যখন কাছা-কাছিই ছিলেন সে সময়।

এই যোগাযোগ ও আলোচনার পর সাতদিনও অবসান হয় নি।

দেশবন্ধু চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

পরদিন প্রাতে তাঁর মরদেহ বহন করে ট্রেন শিয়ালদহে এল। মহাত্মাজী আর এক ট্রেনে খুলনা থেকে ষ্টেশনে পৌঁছেই দেশবন্ধুর শবাধার কাঁধে তুলে নিলেন।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! শিয়ালদহ ষ্টেশন, সম্মুখের সবগুলি রাজপথ ও ঘরবাড়ীর সর্বত্র বিরাট জনসমুদ্র, যতদূর যেদিকে দৃষ্টি যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ, অধিকাংশই নগ্নপদে ; অথচ কোনও চীৎকার নেই, সব নিস্তব্ধ।

অবশ্য, সামান্যকাল পরই নিশ্চুপ জনতা উত্তাল ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। দেশবন্ধুর মরদেহ তখন ষ্টেশনের বাইরে আনা হয়েছে।

কেওড়াতলা মহাশ্মশান। প্রজ্বলিত চিতা। সম্মুখে

সামান্য একটুখানি সংকীর্ণ স্থানে, হাঁটুদুটি উঁচু করে বসে আছেন গান্ধীজী।

হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছেন আগামী প্রভাতের "ফরওয়ার্ড"-এর প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, "জয়তু দেশবন্ধু"—Long live Deshabandhu.

চারিদিকে জন-সমুদ্র, কান্না, চীৎকার, কোলাহল। মহাত্মাজীর কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ হয় না। তিনি একমনে লিখে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর সামনেই গাছের ডালে বসা কয়েকটি ছেলে সমেত ডালটি ভেঙে পড়ল। মহাত্মাজী তাতেও অবিচল।

দেশবন্ধুর অবসানে, বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা লাঘবের ব্যবস্থাসাধনে, গান্ধীজী সপ্তাহকাল কলকাতায় রইলেন। দেশবন্ধুর উৎসর্গীকৃত গৃহে।

বিরাট বাড়ী। সব ঘর খালি। বলা বোডের দিকের টালি ঢাকা দোতলার গাড়ী-বারান্দার দিকের একাংশে মেঝের উপরেই তাঁর লম্বা আসন পাতা। নির্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত পরিবেশ। মাটিতে ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়।

বাঙলার বহু সমস্যা। দেশবন্ধু ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ব্যবস্থাপক সভার বিরোধীদলের নেতা, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি। এ ছাড়া, সারা ভারত স্বরাজ্যদলের সভাপতি বিধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য।

এতগুলি পদ পূরণের যোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায়? সরকারী ধর-পাকড়ের ফলে কর্মীদলও ক্ষীয়মান।

এ ছাড়া আছে দলাদলি, রেষারেষি।

এতদিন ছিল গান্ধীপন্থী 'নো চেঞ্জার' দল, আর এক স্বরাজ্যদল। এখন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলাদলি মিটেছে। তবু, দু'বছরের কলহের সব স্মৃতি কি সঙ্গে সঙ্গে দূর করা যায়?

গান্ধীজী বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন, বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলির সমাধান সম্বন্ধেও তাঁদের অভিমত জেনে নিলেন। বিপ্লববাদীদের মধ্যে যাঁরা তখনও কারাগারের বাইরে ছিলেন, তাঁদেরও বাদ দিলেন না।

সপ্তাহকাল বাদে, কলকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে, গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ই দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে 'ত্রিমুকুট' ধারণ করবেন—

কলকাতার মেয়র, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধীদলের নেতা তিনিই হবেন।

ফরওয়ার্ড পাবলিশিং-এর ডিরেক্টরবর্গের চেয়ারম্যান হবেন পণ্ডিত মতিলাল, সম্পাদক, ব্যারিষ্টার প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী (ডিরেক্টর বোর্ডের প্রস্তাবানুযায়ী গান্ধীজী ঐ নাম অনুমোদন করেন)।

সাময়িকভাবে বিভিন্ন দেশের সকল সদস্যই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। অসন্তোষ ধূমায়িত হতেও বিলম্ব হল না।

মেয়র পদে যতীন্দ্রমোহনের নির্বাচনে: একশ্রেণীর করদাতার আপত্তি। বক্তব্য, যিনি মেয়র হবেন, নগরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা চাই—যা শুধু এ নগরে যাঁদের জমিজমা ঘরবাড়ী আছে তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। (এ আপত্তি হাস্যকর। বহুদিন ধরে যে সব ইংরেজ সহরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্ণধাররূপে পরিচালন করছেন, তাঁদের কারো সহরে এক কণা জমিও ছিল না। তৎসত্ত্বেও কোন করদাতা তাদের যোগ্যতার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেন নি)।

ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধীদলের নেতৃত্ব করতে, সরকার পক্ষের বড় কর্তাদের বিপর্যস্ত করতে, দেশবন্ধু যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন, যতীন্দ্রমোহনের তা নেই। বিভিন্ন মতাবলম্বী নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সরকার-বিরোধী প্রস্তাবের সমর্থনে সম্মিলিত করতে যে দক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রয়োজন, যতীন্দ্রমোহনের তা আছে কি? (এ সন্দেহ কাল্পনিক। কার্যক্ষেত্রে তিনি কি করেন তা না দেখে এরূপ কোনও সিদ্ধান্ত করা ঈর্ষাকাতরতারই নামান্তর।)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের দাবীই ছিল অগ্রগণ্য। তিনি ১৯২০ সাল থেকেই সম্পাদক হিসেবে দেশবন্ধুর সহকারীরূপে কাজ করেছেন, কারাবরণ করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান দুই বিরোধীদলের মিলন, বিপ্লববাদী সন্দেহে যে সব যুবক ও কর্মী বন্দী, তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য বিভিন্ন দলীয় নেতার

সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই মহাত্মাজী যতীন্দ্রমোহনের নাম অনুমোদন করেছিলেন।

কংগ্রেস পরিচালিত প্রত্যেকটি সংস্থার নায়ক যদি পৃথক হয়, তবে প্রকৃত কাজের পরিবর্তে রেষারেষি ও বাদানুবাদই বৃদ্ধি পায়। এত' জানা কথা।

তাছাড়া শাসমল মহাশয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিরুদ্ধবাদীর সঙ্গে (সে মত পার্থক্যের জন্যই হোক বা কর্ম-পন্থার বিভিন্নতার জন্যই হোক) আপোষ-রফা করে সম্প্রীতির সঙ্গে কাজ করতে পারেন না। এরূপ ব্যক্তিকে নায়কের পদে অধিষ্ঠিত করলে ফল বিরূপ হতে পারে।

এই সব নানা কারণে বিরোধ ও গুঞ্জন সুরু হয়ে গেল।

এই মতদ্বৈধ ও সতত সংঘাতের মধ্যে সমতা রক্ষা করে দলীয় সংবাদপত্র পরিচালন যে কিরূপ কষ্টকর, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রত্যেক দল একই কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত; অথচ একের ইচ্ছা, অপরকে কোণঠাসা করে প্রাধান্য বিস্তার করা।

দলীয় সংবাদপত্রের কর্তব্য, বিবিধ কার্যাবলীর উপযোগিতা যাচাই করে তার প্রচারে সহায়তা করা।

অথচ, এতে অনেকেই সন্তুষ্ট হন না। ফলে, কলহ ও রেষারেষি বৃদ্ধি পায়। কাজ কিছুই হয় না।

দেশবন্ধুর পর এক বছর যেতে না যেতেই এই কলহ, দলাদলি আরও স্পষ্টভাবে দানা বাঁধতে সুরু করল। জাতীয় আন্দোলনে আদর্শবাদের স্থান গ্রহণ করল লাভের লোভ, মর্যাদার লড়াই, ব্যক্তিগত হানাহানি।

কলকাতা কর্পোরেশন স্বরাজ্যদলের শাসনাধীনে আসবার পর এ দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ শাসনকালে যা ছিল চল্‌তি রীতি, তা এখন আরও প্রবল হয়ে পরিণত হল দুর্নীতিতে। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই কর্মক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখায় ঐ চিরাচরিত দুর্বলতা বিশেষ বিকৃত রূপ নিতে পারে নি।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন সাগরপারের কারাগারে, দেশবন্ধু লোকান্তরিত।

প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থসাধনে সচেষ্ট। চাকরী চাই, কনট্রাক্ট চাই, ট্যাক্স নির্ধারণে ও দানে আমার জন্য বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ চাই। নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে কাউকে স্তোকবাক্য বর্ষণ, কাউকে বা ভয় প্রদর্শন, কিছুই অসঙ্গত রইল না। কর্পোরেশনে কাজ পরিচালনের জন্য যে সব কমিটি গঠন করা হয়, তার কয়েকটির সদস্যপদের জন্য জন-প্রতিনিধিদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। সেগুলিতে ঢুকতে পারলে আর পায় কে? টাকার পর টাকা, না চাইলেও নানাভাবে চলে আসে।

এছাড়া আছে চাকরী। এর লোভ যে কিরূপ সংক্রামক, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠাবান উকিল, বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও সম্পন্ন জমিদার গোষ্ঠীর সন্তান; সহরে বাড়ী-গাড়ীর অভাব নেই, তিনিও কর্পোরেশনে চাকরীর উমেদার। অবশ্য জীবিকা অর্জনের জন্য যে-কোনও চাকরী নয়, প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্বের জন্য উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কি কষ্ট, কি হীনতা তিনি অম্লানবদনে বরণ করেন তা দেখলেই বোঝা যায়, আমরা শিক্ষা-দীক্ষা, কালচার, মর্যাদা, সামাজিক সম্ভ্রম ইত্যাদি যে সব গালভরা শব্দ উচ্চারণ করি, কোন-কোনও ব্যক্তির স্বার্থ সাধন-সংগ্রামে সেগুলির মূল্য কতটুকু!

পূর্বেই বলেছি এ সব চাকরী ইত্যাদি নানা কাজের সুব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য আছে কমিটি। ওখানে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, তার কতকগুলি সরাসরি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়, কোন কোনটি বা কর্পোরেশনের সভ্যদের সাধারণ অধিবেশনে ভোটদ্বারা গৃহীত হয়।

এ উভয় পন্থাই শুধু সময়-সাপেক্ষ নয়, ভোট দ্বারা নির্দ্ধারিত। কারণ চাকরীর ব্যাপারে যেমন, কনট্রাক্ট বিলির ব্যাপারেও তেমনি। প্রার্থীসংখ্যা কম থাকে না।

ফলে চলে ধরাধরি। ইংরেজীতে "ক্যানভাসিং"—সরকারী শাস্ত্রমতে যা অশুদ্ধ বিষবৎ পরিত্যাজ্য! কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে যা অপরিহার্য।

এই ধরাধরি বা যোগাযোগ পর্বটি যিনি যেরূপ তৈলসিক্ত করতে পারেন, জয়লক্ষ্মী তাঁরই পক্ষে যাবেন—এ আশা দুরাশা নাও হতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনাও বিরক্তিকর।

যে সব ছাত্র-যুবক ১৯২০।২১ সালে পড়াশুনো ছেড়ে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছেন, আত্মীয়-স্বজনের নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় আন্দোলনে নানা কষ্ট স্বীকার করেছেন, বর্তমানে আন্দোলন স্থগিতের ফলে বেকার হয়ে ঘুরছেন, তাদের জন্য কোনও জনসেবা-মূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক সারা সহরে বিভিন্ন পল্লীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও দরিদ্র বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হল।

এসব বিদ্যালয়ে শত শত শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রয়োজন। প্রাক্তন কংগ্রেস কর্মীরা এ কাজে যোগ দেবার সুযোগ পেলেন।

স্বরাজ্যদল তখন মূল কংগ্রেসপক্ষীয়দের কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন। সেজন্য নিগৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে যাঁরা স্বরাজ্যদলভুক্ত, কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হল।

এর ফল যে ভাল হয়েছিল তা বলা যায় না। অনেকেই কাজ পাবার পূর্বে দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, পরে শুধু দলের বিরুদ্ধাচরণ নয়, বিরোধীদের শক্তিবৃদ্ধি করতেও কুণ্ঠিত হন নি।

এইভাবেই সুরু হল নানা অনাচার। শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলেও অনেক সময় যে তার ফল বিপরীত হয়, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেল এইসব রাজনৈতিক দলাদলি প্রণোদিত জনহিতকর কর্ম-প্রচেষ্টায়।

(ক্রমশঃ)

জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী]

(৮নং রুল দ্রষ্টব্য)

১.	প্রকাশের স্থান	২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
২.	প্রকাশের কাল	মাসিক
৩ ও ৪.	মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় ১০/৬৯এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩
৫.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	সুনীল দাস, ভারতীয় ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রো কলিকাতা-২৬
৬.	স্বত্বাধিকারীর নাম, ঠিকানা	১. সুনীল দাস ও ২. বিজয় নাগ ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

আমি কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ কিরণচন্দ্র মিত্র
প্রকাশক
৭/৩/৭৯

এল·আই·সি·-র সি·এ·পি·—
আপনার সন্তানের শুভযাত্রার মুকুট

নতুন

চিলড্রেনস অ্যাণ্টিসিপেটেড পলিসি

এল আই সি থেকে এখন পাবেন একটি নতুন লাভসহিত বীমা যেটি আপনাবপ্রিয় সন্তানের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত। চিলড্রেনস্ অ্যান্টিসিপেটেড পলিসির সংক্ষেপে সি.এ.পি) বৈশিষ্ট্য হ'ল আপনাব সন্তানের বয়স ১৮ অথবা ২১ হলেই এক থেকে টাকা পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে সে ভালভাবে কর্মজীবন শুরু কবতে পারবে। তাবপব মেয়াদ কাল উত্তীর্ণ হবার তারিখ পর্য্যন্ত তার জীবনের দায় গ্রহণ করা হবে। এবং প্রিমিয়ামের হারও খুব কম।

উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি আপনার ১ বছর বয়স্ক সন্তানের জন্য ৯ বছরের মেয়াদে ১৫০০০ টাকার একটি পলিসি নেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে মাসিক আনুমানিক ৩১ টাকা (বছরে ৩৬৭,২০ টাকা) প্রিমিয়াম দিতে হবে। ১৮ বছর বয়সে সে এক থোকে ৩১২১,২০ টাকা পাবে যার সাহায্যে সে ভালভাবে কর্মজীবন শুরু করতে পারবে। তারপরে তার জীবনের ঋণ দায় গ্রহণ করা থাকবে এবং ৪০ বছর বয়সে সে পাবে ১৫০০০ টাকা এবং তার সঙ্গে লভ্যাংশ (বর্তমানের হারে ১১০০ টাকা —সর্বসাকুল্যে মোট ২১,১০০টাকা। ১৮ বছর বয়সের পরে যে কোন সময়ে মৃত্যু হলে বীমাকৃত পুরো টাকা এবং তাব সঙ্গে লভ্যাংশ দেওয়া হবে। ১৮ বছর বয়সের আগে মৃত্যু হলে যে সমস্ত প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে সব ফেবৎ দেওয়া হবে।

এল এই সি-যে সর্বোচ্চ যে টাকা দিতে হবে তাহল ৩৬৭.২০ × ৩৯ = ১৪৩২০.৮০ টাকা (এর ওপর কর মকুবেব সুযোগ পাওয়া যাবে) অথচ এর বিনিময়ে এলআইসি-ব কাছ থেকে পাওয়া যাবে ১৮ বছর বয়সে ৩১২০.২০ টাকা এবং ৪০ বছর বয়সে ২১,১০০ বা ততোধিক টাকা।

১৪ বছব বয়স পর্য্যন্ত সন্তানদের ক্ষেত্রে সি.এ.পি. হ'ল একটি আদর্শ উপহাব। আজই আপনার সন্তানের জীবন বীমা করুন এবং কমহারে প্রিমিয়ামের সুযোগ নিন।

বিশদ বিববণের জন্য এখানে লিখুন:
পি. আর. এণ্ড পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, 'যোগক্ষেম', জীবন বীমা মার্গ, বোম্বাই-৪০০ ০২১

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
জীবনবীমার কোন বিকল্প নেই

daCunha-LIC-60 Ben

১৯৭৯-৮০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট

রাখাল দত্ত

গত ২৮শে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপ-প্রধান মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং আগামী বছরের জন্য সংসদে যে বাজেট পেশ করেছেন তা নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিগত বেশ কয়েক বছরের তুলনায় চরণ সিং-এর এই বাজেট বিতর্কমূলক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বাজেট নিয়ে আলোচনা যতটা যুক্তিনির্ভর ও তথ্যভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। অধিকাংশ লোকই নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ এবং ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আগামী বছরের বাজেট কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জনতাদলের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো বটেই, ভারতের বর্তমান আর্থনীতিক পরিস্থিতিরও উপযোগী। এ কথা বলার অর্থ এই না যে প্রস্তাবিত বাজেট নিখুঁত বা আদর্শস্থানীয়। শ্রীচরণ সিং নিজেই কিছু কিছু সংশোধন মেনে নিয়েছেন। হয়তো আরও কিছু সংশোধনের সুযোগও রয়েছে। কিন্তু এই বাজেটের পেছনে যে চিন্তাধারা কাজ করছে এবং যে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা মোটামুটিভাবে যথাযথ। একটু পরেই এ বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যাওয়া হবে। কিন্তু তার আগে এই বাজেটের প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার একটা ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

নিঃসন্দেহে এই বাজেটের দরুণ শহরাঞ্চলের আপেক্ষিকভাবে অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা অধিকতর চাপের মুখোমুখি হবেন। তাদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা আরও বাড়বে। দেশের এই অংশের জনমত নিয়ন্ত্রণে হাত অনেকটা পত্র পত্রিকা ইত্যাদি এঁরাই পরিচালনা করেন। সমাজের এই অংশ যে সব জিনিস ব্যবহার করে থাকেন সেগুলির অনেক কিছুর উপরই অর্থমন্ত্রী উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এসব ভোগ্যপণ্য ব্যবহারে আজ এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে তাঁরা ভুলে যান এগুলি আমাদের দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশের নাগালের বাইরে। শহরাঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী কর্মীরা সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে এনে ফেলেছেন যার কাছাকাছি যাওয়া গ্রামের আপেক্ষিকভাবে সম্পন্ন কৃষকের পক্ষেও সম্ভব নয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা শহরের লোক অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় (সমাজের দিক থেকে) কাজে নিযুক্ত। গান্ধীজী ভারতের গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্পর্কের এই অস্বাভাবিক চরিত্র ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে শহরের পরগাছা পরজীবী চরিত্র ধরা পড়েছিল। গ্রামীণ শিল্প ধ্বংস করে, কৃষির উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়ে শহরাঞ্চল ভারতের প্রায় ৫ লক্ষ গ্রামকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পরও এই বিষয়টি যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ সে সময়ে আমাদের নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ শিল্পায়নের মোহে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন আমাদের মত বিশাল দেশে বিরাট জনসংখ্যা একদিক দিয়ে যেমন এক সমস্যা অন্য দিক দিয়ে তেমন এক সুযোগ। গ্রামের লোকের উৎপাদন ও আয় বাড়াতে পারলে যে বিশাল বাজারের সৃষ্টি হবে সে আভ্যন্তরীণ বাজারের উপরই ভর করে দাঁড়াতে পারবে দেশের শিল্প। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন পরিকল্পনায় আমরা দেখতে পাই প্রথমে আমদানি বন্ধ করে সেই সব শিল্পের পত্তন করা হল, যেগুলি এইসব আমদানির পরিবর্ত বা বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু কৃষির যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ায় বাজার খুবই সংকীর্ণ থেকে গেল এবং উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হল

না। পরবর্তীকালে রপ্তানি বাড়াবার প্রয়াসে আংশিক সাফল্য পাওয়া গেছে কিন্তু এখানেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কাজ করতে বাধ্য। আসল কথা এই যে আমাদের মত দেশে সাধারণ লোকের আয় না বাড়লে শিল্পের সীমিত সম্প্রসারণই সম্ভব। শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে প্রকৃত শিল্পায়ন কখনই সম্ভব নয়। আবার যেহেতু সাধারণ লোকের ৯০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী, প্রয়োজন গ্রামের কৃষি ও অন্যান্য কাজকর্মের সম্প্রসারণ। একথা বলার অর্থ এ নয় যে কোনো রকম শিল্প বা ভারী শিল্পের প্রয়োজন নেই। কৃষির উন্নতির জন্যও দরকার রাসায়নিক সার সিমেন্ট, কীটনাশক পদার্থ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এসবই শিল্পজাত পণ্য। কাজেই আর্থনীতিক উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম: অধিকাংশ লোকের উৎপাদন ও আয় বাড়ানোর জন্য দরকার কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের সম্প্রসারণ। কৃষির সম্প্রসারণ করতে হলে বিশেষ বিশেষ ধরণের শিল্পের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সাধারণ লোকের আয় বাড়লেই সম্ভব হবে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের বহুল ব্যবহার। আভ্যন্তরীণ বাজার যতদিন সঙ্কীর্ণ থাকবে ততদিন শিল্পায়ন অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য হবে। তাই দেখতে পাই ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে কাপড়ের কলে কোটি কোটি টাকার কাপড় মজুত, চিনির পাহাড় জমে রয়েছে চিনির কলে।

আগামী বছরের বাজেট সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনার উপরের এই বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক বলেই বর্তমান লেখকের ধারণা। বর্তমান লেখকের এইটিও অভিমত যে শ্রীচরণ সিং এর বাজেট কোনও জোড়াতালি দেওয়া ব্যাপার নয়। এই বাজেটের পেছনে কাজ করছে ভারতীয় আর্থনীতির চরিত্র ও গতি সম্বন্ধে তাঁর সুনির্দিষ্ট চিন্তা এবং কৃষি ও গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়। শুধু তাই নয় ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেট রচনায় জনতা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও আর্থ-নীতির কার্যক্রমসংক্রান্ত দলিলও কাজ করছে। এক কথায় এই বাজেটকে "কুলাক" বাজেট বা ধনী চাষীর বাজেট বলে অভিহিত করলে শহরের বাবুদের হাততালি পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে নিজেদের অগাধ জ্ঞানহীনতার পরিচয়ও দেওয়া হয়।

এই বাজেটের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এতে গ্রামের সম্পন্ন লোকদের বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে দেখা যাক কী ধরণের সুবিধা অর্থমন্ত্রী দিতে চেয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী কৃষিজীবীদের পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কয়েকটি ছাড় দিয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল রাসায়নিক সারের উপর ধার্য কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক হ্রাস। বর্তমান উৎপাদন শুল্কের তুলনায় বাজেটে ৫০ শতাংশ কম হারে উৎপাদন শুল্কের কথা বলা হয়েছে। "ইউরিয়া" বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক সার। এই সারের দামের উপর ১৫ শতাংশ উৎপাদন শুল্ক রয়েছে। বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে এই উৎপাদন শুল্ক কমিয়ে ৭½ শতাংশ হবে। "ট্রিপল সুপার ফসফেট" এর উপর উৎপাদন শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ ৭৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে যে সার আমদানি করা হয় সেগুলির উপরেও অনুরূপ হারে আমদানি কর কমানো হবে। এইভাবে কর হ্রাস করার জন্য ইউরিয়ার দাম প্রতি টনে ১০০ টাকা কমে যাবে। অন্যান্য রাসায়নিক সারের দামও কমবে। কেন্দ্রীয় রাজ-কোষে এজন্য উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৭০৬ কোটি ও আমদানি কর বাবদ ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে।

অর্থমন্ত্রী হালকা ডিজেল তেলের উপর উৎপাদন শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল জলসেচের জন্য বহু চাষী ডিজেল চালিত পাম্পসেট ব্যবহার করে থাকেন। যাই হোক এই সুবিধা শেষ পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য কৃষিশিল্প কর্পোরেশন যে সব "পাওয়ার টিলার" আমদানি করেন সেগুলির উপর অর্থমন্ত্রী আমদানি কর তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছেন। ভারতে প্রস্তুত এ ধরনের পাওয়ার টিলারের উপর উৎপাদন শুল্ক আগে থেকেই তুলে নেওয়া হয়েছে।

জলসেচের কাজে পিডিসি রজন দিয়ে তৈরী নল বিশেষ কাজে লাগে। অর্থমন্ত্রী পরীক্ষামূলক ভাবে এ ধরনের রজনের উপর আমদানি কর তুলে নিয়েছেন।

কাঁচা তামাকের উপর উৎপাদন শুল্ক তুলে নিয়ে শ্রীচরণ সিং এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন। ১৯৪০ সাল থেকেই এই শুল্ক ছিল এবং লক্ষ লক্ষ তামাকপাতা উৎপাদক এতে বিব্রত হতেন। এই উৎপাদন শুল্ক তুলে নিয়ে শ্রীচরণ সিং চাষীদের মস্ত এক বিড়ম্বনা থেকে বাঁচালেন। রাজকোষে এজন্য ক্ষতি হবে ১২১·২০ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে ১১৫·৭১ কোটি টাকা অর্থমন্ত্রী তামাকপাতা দিয়ে তৈরী পণ্যের উপর করের পুনর্বিন্যাস করে ফিরে পাচ্ছেন।

এই বাজেটে ব্যয়ের দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের উন্নতির উপর অগ্রাধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে পরিকল্পনা খাতে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছিল ৭৫৪ কোটি টাকা। বর্তমান বাজেটে এ বাবদ ধরা হয়েছে ১৮১১ কোটি টাকা (১৯৭৯-৮০)। সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ২৫৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যা প্রায় ২৩০০ ব্লকে ব্যয় করা হবে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের জন্য ৫০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮-৭৯ সালে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৪০১ কোটি টাকা। ১৯৭৯-৮০ সালে এ বাবদ বরাদ্দ হয়েছে ১৫৮৮ কোটি টাকা। এই টাকার প্রায় সবটাই রাজ্যসরকারগুলি খরচ করবে। ১৯৭৮-৭৯ সালে অতিরিক্ত সেচ-ব্যবস্থা সমন্বিত কৃষিজমির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮ লক্ষ হেকটার। আগামী বছর এই লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে ৩২ লক্ষ হেকটার।

বিভিন্ন অর্থ-প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ঋণ পাওয়া যায় তারও কিছু কিছু ব্যবস্থা এই বাজেটে রয়েছে। কৃষি পুনর্নিয়োগ ও উন্নয়ন কর্পোরেশনকে আয়কর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফলে এই কর্পোরেশন যে হারে সুদ দেয় তা ১ শতাংশ কমানো যাবে।

৫২ কোটি টাকা জাতীয় গোপালন উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭৯-৮০ সালে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য ২৮৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে আগের বছর এই টাকার পরিমাণ ছিল ২১৭ কোটি টাকা। তাছাড়া কৃষিজাত পণ্য ঠিকমত গুদামে রাখার জন্য ভরতুকি দেবার কথাও সরকার চিন্তা করছেন।

সব গ্রামে নির্ভরযোগ্য পানীয় জল পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতিও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে আসছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে এজন্য ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগামী বছরের বাজেটে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। তপশীলী জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর অংশের জন্য ১১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই বাজেটে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য আরও ৭০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার একটা বড় অঙ্গ। গত বাজেটে এজন্য ধরা হয়েছিল ১৪০ কোটি টাকা। বর্তমান বাজেটে তা ১৯৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। তাঁত আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ শিল্প। এদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ তাঁতে প্রায় ১ কোটি লোক কাজ করছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে তাঁরা ২৫০ কোটি মিটার কাপড় তৈরী করেছিলেন। ১৯৭৯-৮০ সালের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে ২৭০ কোটি মিটার কাপড়। বর্তমান বাজেটে ২৮ কোটি টাকা রাখা হয়েছে যা দিয়ে তাঁত-শিল্পীদের সমবায় সমিতির সদস্য করা হবে।

এবার মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যেতে পারে। ১৯৭৯-৮০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে শ্রীচরণ সিং যে সব ব্যবস্থা করেছেন সেগুলি কোন অর্থে গ্রামের "ধনী" কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষিত করছে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল গ্রামের "ধনী" চাষী বা যাঁদের অবজ্ঞা করে বলা হয় "কুলাক" তাঁরা শহরের বহু লোকের তুলনায় অনেক কম আয় করে থাকেন। বিশেষত জমির মালিকানায় উচ্চসীমা বেঁধে দেবার পর কোন অর্থে "ধনী" কৃষক রয়েছে তা খুব স্পষ্ট নয়। অনেকেই এখানে বলবেন ভূমিসংস্কার আইনের অনেক ত্রুটি রয়েছে এবং বহু লোকের হাতে চাষের জমির পরিমাণ এখনও খুব বেশি। কিন্তু এ কথা সত্য হলে এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমাদের বিভিন্ন রাজ্য সরকার। অর্থমন্ত্রী তথা উপ-প্রধান মন্ত্রী বার বার একথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন তিনি পরিবার-ভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। শ্রীচরণ সিং পুঁজিবাদী খামার

বা যৌথ খামারে বিশ্বাস করেন না এবং তাঁর এই অবিশ্বাসের মূলে রয়েছে ভারতের আর্থনীতিক অবস্থা ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা। রাসায়নিক সারের দাম কমিয়ে, পাওয়ার টীলারের উপর আমদানি কর তুলে নিয়ে তিনি ধনী চাষীদের সুবিধা করে দিচ্ছেন এই যুক্তি ধোপে টেকে না। কারণ, আজ রাসায়নিক সার ছোট, বড়, মাঝারি সব চাষীই ব্যবহার করছেন। সারের দাম কম হলে ছোট চাষী যতটা ব্যবহার করতে পারবেন বেশি দামে তার চেয়ে ব্যবহার করতে পারবেন অনেক কম। আর যে সব চাষী মোটেই রাসায়নিক সার কিনতে সক্ষম নন তাঁদের সমস্যা সমাধান করতে হবে উপযুক্ত ঋণ ও অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই সার ও খাদ্যশস্য বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারকে আজ প্রায় ১১০০ কোটি টাকার মত ভরতুকি দিতে হচ্ছে। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে বর্তমান দশকের প্রায় গোড়া থেকে শিল্পজাত পণ্যের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের দাম বেড়েছে কম। অর্থাৎ, জাতীয় অর্থনীতির এই দুই অংশের মধ্যে বাণিজ্যের সর্ত ("টার্মস অব ট্রেড") কৃষির বিরুদ্ধে গেছে। ফলে কৃষি থেকে বিরাট পরিমাণে একটা অর্থ শিল্প তথা শহরাঞ্চলে চলে এসেছে। আজ ভারতীয় কৃষিতে সম্প্রসারণের যে ছোঁয়া লেগেছে তা যে কোনও উপায়েই হোক বজায় রাখতে হবে। কৃষিতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন হলে শুধু যে নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে তাই নয়। গ্রামের দরিদ্র অংশ প্রত্যক্ষ-ভাবে এর ফলে উপকৃত হবেন। দেখা গেছে কৃষি উৎপাদন কম হলে গ্রামীণ ভূমিহীন চাষীদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক বেড়ে যায় আর কৃষি উৎপাদন ভাল হলে খাদ্যশস্যের দাম কম থাকায় এই সূচক নেমে আসে।

সাবান, টুথপেষ্ট, টুথব্রাশ, রেফ্রিজারেটার, টি, ভি, কেট, সিগারেটের দাম বাড়ানোর জন্য শহরের সম্পন্ন মানুষকে নিশ্চয়ই আর একটু বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু একজন সাধারণ ভারতীয়ের তুলনায় তাঁদের জীবনযাত্রার মান অনেক বেশি উন্নত থেকেই যাবে। ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেট আলোচনায় এই সত্যটি যেন হারিয়ে না যায়।

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাঁধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি

বিনয় রায়

জেলার পূর্ব প্রান্তে শেষ রেলষ্টেশন একটা গঞ্জে। সেখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা কয়েকটা গ্রামের ভিতর দিয়ে সোজা চলে গেছে পূবদিকে। গ্রামের সীমানা পার হয়ে রাস্তাটা ঢুকেছে হাওরের ভিতর। বর্ষায় রাস্তাটা ডুবে যায়। কয়েক মাস জলের নীচে থাকে। পূব ও দক্ষিণে যতদূর চোখ যায় শুধু জল। সামান্য হাওয়াতেও বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলের শেষ সীমানায়। সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা চলে। এখানকার মানুষদের সমুদ্র দেখার কোন সুযোগ নেই, তার বিরাটত্ব সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না। কিন্তু এই হাওয়ারই তাদের কাছে সমুদ্র। বর্ষার ঢল নামবার আগেই এই হাওয়ারের উর্বর মাটি থেকে ফসল ফলিয়ে তারা ঘরে তোলে, সংগ্রহ করে সারা বছরের খাদ্য। বর্ষার জলে যখন হাওয়ারের জমিকে ডুবিয়ে দেয় দশ পনর বিশ হাত জলের নীচে, তখন অজস্র মাছ. নানা জাতের, আদিগন্ত জলের মাঝে ভেসে বেড়ায়। প্রান্তসীমার গাঁয়ের মানুষ তখন মাছের আনন্দে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে মাছ ধরে বড়শিতে, খড়া জালে অথবা ভর জালে। জালের কাঠিতে টান পড়লেই মাছগুলো লাফাতে থাকে। জাল গুটিয়ে মাছগুলোকে খোলা নৌকোয় ঢেলে দেয়। এতো মাছ! বিক্রি করবার কোন সুযোগ নেই। শহর-গঞ্জতো অনেক দূর। কাজেই খাও যত পার।

বর্ষা ও শীতে পারিপার্শ্বিকের কি বিরাট পরিবর্তন। বর্ষায় যে দিকেই তাকাবে শুধু জল, জল আর জল। ছলাৎ ছলাৎ করে পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছে। বাতাসে শন শন আওয়াজ। অনেক দূর দূর দিয়ে এক একটা নৌকো যাচ্ছে। মনে হয় যেন কাগজের খেলার নৌকো। যে কোন সময় হয়ত রাক্ষসী জল সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। না যে ফেলে তাও নয়। অনেক নৌকোইতো ডুবি হয় প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে। প্রাণও যায় অনেক লোকের। তবু এই জলের অদ্ভুত আকর্ষণে গ্রামবাসীরা ছোট ছোট নৌকো নিয়ে দিন রাত জলের উপর ভেসে বেড়ায়।

শীতকালে চেহারা অন্য রকম। দিগন্তের দিকে তাকালে দেখা যাবে শুধু সবুজ মাঠ। মাঝে মাঝে এক একটা বিলের জল রোদে চিক চিক করছে। অজস্র বুনো হাঁস তাতে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। গ্রামবাসীরা জাল পেতে হাঁস ধরে, খুবই সুস্বাদু মাংস। গ্রামগুলো থেকে মাঠের জমি অনেক নীচে, মাঠে দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে তাকালে মনে হয় যেন এক একটা টিলার উপর গ্রামের ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। শীত এবং বর্ষায় পরিবেশের এমনি পরিবর্তন দেখে যে কোন নবাগত অবাক হয়ে যান। মানুষগুলোর চেহারাতেও যেন এই পরিবর্তনের রূপ ফুটে উঠে। বর্ষায় যারা সংগ্রামী তারাই যেন শীতে কেমন আড়ষ্ট।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামগুলো মোটেই বর্দ্ধিষ্ণু নয়। নিম্নবিত্ত চাষা আর জেলেদেরই বাস বেশী। অবশ্য দু' একটা গ্রামে তালুকদার শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারও কিছু আছেন। আশে পাশের গ্রামের লোকেরা এদের মান্য করে। দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিযোগ জানাতে এদের কাছেই উপস্থিত হয়।

এমনি মধ্যবিত্ত পরিবারের এক তরুণ। তরুণটি অবশ্য মহকুমা শহরে আইনজীবী পিতার কাছে থাকে। স্কুলে পড়ে। কিন্তু গ্রামের প্রতি, সেখানকার পরিবেশের প্রতি তার আকর্ষণ অদম্য। শহরে তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। গ্রামে এলে সে মুক্তির আনন্দ পায়। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়; সন্ধ্যায় নিজেদের বাড়ীর বাইরের

চৌচালা ঘরের মেঝেয় চাটাই পেতে গ্রামের লোকজনদের নিয়ে সে গানের আসর বসায়। মহুয়া, মলুয়া ও সুজন বাইদ্যার পালা, বিচিত্র রকমের ভাটিয়ালী গান, ভক্তি রসাত্মক কীর্তন, আরো কত কি! বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে স্বরাজ, লাউ আর করতাল। সঙ্গীতের রেশ দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। রাতের প্রহর বাড়লে সেদিনকার মতো গানের আসর বন্ধ করে অন্ধকারে পায়ে হেঁটে অথবা ডিঙ্গি নৌকো করে যে যার বাড়ী চলে যায়।

তরুণটির রক্তে আছে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা। অপ্রাকৃত কোন কিছুর খবর পেলেই সে ছুটে যায়। অশিক্ষিত গ্রাম-বাসীদের মুখে কতো রকমের কিংবদন্তী যে শোনা যায়, তার শেষ নেই।

ঐ যে হাওরের মাঝখানে উঁচু ভিটা যেখানে বিরাট বিরাট চার পাঁচটা তেতুল গাছ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভিটাকে কেন্দ্র করে কতো রকম অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত। কেউ কেউ বলে গাছগুলোর বয়স কয়েক শ' বছর। এই ভিটাটার—যার নাম বলা হয় গল্‌গলিয়ার ভিটা—উৎপত্তি সম্পর্কেও অনেক বিচিত্র সব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। আশে পাশে কয়েক মাইলের ভিতর কোন গ্রাম নেই। প্রচলিত আছে, রাত দুপুরের পর ঐ ভিটাতে ধুনো জ্বালিয়ে কে বা কারা শবাসন করে। ভিটা থেকে খানিকটা দূর দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে উত্তর দিকে। সন্ধ্যার পর নাকি ঐ রাস্তা দিয়ে কেউ এগোলে আর ফিরে আসে না, কোন সন্ধানই আর পাওয়া যায় না। এ' রকম হারিয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যাও নাকি অনেক।

তরুণটির মনে অদ্ভুত বাসনা, ভিটাটার ব্যাপার নিজে একবার যাচাই করে দেখে। একবার দোলের ছুটিতে গ্রামে গেছে। মধ্যা একটা কাজের অজুহাতে কাকার অনুমতি নিয়ে নিজেদের দেশী ঘোড়ায় চড়ে ক্রোশ দুয়েক মাইল দূরের গঞ্জের বাজারে আসে একদিন সকালবেলা। সারাদিন সেখানে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটায় সন্ধ্যার খানিকক্ষণ আগে বাড়ী ফিরবার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সীমানা পার হয়ে ঘোড়া এসে নামল হাওরের মেঠো পথে। অন্ধকার হয়ে আসছে। বেশ খানিকটা দূরে বাঁ দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গল্‌গলিয়ার ভিটা। আলোর রেশটুকুও ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে গা যেন কেমন ছম ছম করছে। কোন জন মানুষ নেই। ভিটার কাছাকাছি এসে গেছে। সামনেই একটা ছোট বাঁশের সাঁকো। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে এসে সাঁকোটার সামনে থমকে গেল। সামনের দু' পা উপরের দিকে তুলে দিয়ে চিঁহি চিঁহি ডাকতে লাগল। তরুণটি যে ভয় না পেয়েছে তা নয়। কিন্তু এ অবস্থায় সাহস হারালেও চলবে না। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ধরে টানতে লাগল। চারদিক তখন অন্ধকারে ডুবে গেছে। নানা রকম বিচিত্র ধরণের আওয়াজ যেন তার কানে আসছে। বাতাসে একটা অপার্থিব শনশনানি আওয়াজ। টানতে টানতে ঘোড়াটাকে কোন প্রকারে সাঁকোর এপারে এনে আবার সে পিঠে চড়ে বসল। এবার ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়াটা একটা গ্রামে এসে ঢুকল। একটা বাড়ীর ছাওয়ায় কয়েকজন লোক বসেছিল। এই অসময়ে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখে তারা একেবারে হতভম্ব। কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পাচ্ছে না একজন ভরসা করে এগিয়ে এল। ভাল করে দেখে নিয়ে বলল—আরে, 'এ যে দেখছি আমাগো বড় বাড়ীর ছাওয়াল। কি সাংঘাতিক মানুষ, পরাণ লইয়া এমন খেইল খেলে? দেহনে নাই কিছু? ধরতে আহে নাই কেউ? ডর পান নাই!'

তরুণটি বলে—'না না কিছুই দেখি নাই। ধরতে আবার কে আসবে? আর ডরেরই বা কি আছে?'

ওর কথা যেন লোকগুলো ঠিক বিশ্বাস করল না। মশাল জ্বালিয়ে কয়েকজন তরুণটিকে সঙ্গে করে দু' তিনটা গ্রাম পেরিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিল। তরুণটিকে দেখতে পেয়েই কাকা রেগে একেবারে লাল। গজর গজর করতে করতে পাটকাঠি জ্বালিয়ে নিমপাতা এবং আরো কি সব পুড়িয়ে ওর গায়ে ধোঁয়া লাগালেন। সেদিন রাতেই তরুণটির প্রবল জ্বর এল। বেহুঁশ অবস্থায় কয়েকদিন কাটল। আস্তে আস্তে সেরে উঠল। আবার সে সহরে ফিরে এল।

সহরে তরুণটির দৈনন্দিন জীবন গতানুগতিকভাবে কেটে যায়। দশটায় স্কুলে যায়, পাঁচটায় বাড়ী ফিরে। খেয়েদেয়ে

বন্ধুদের সঙ্গে খেলার মাঠে যায় অথবা শহরের অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়।

কোন কোন দিন তরুণটি বিকালের দিকে একাই চলে রেল ষ্টেশনের দিকে। সন্ধ্যার একটু আগে অল্প সময়ের ব্যবধানে আপ এবং ডাউন দুটো গাড়ী এসে এখানে মিলিত হয়। তরুণটির ইচ্ছা করে যে কোন একটা গাড়ীতে উঠে নিরুদ্দেশে চলে যায়। অগ্রসরমান গাড়ীর দিকে সে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

শহুরে জীবনকে তরুণটির বড় কৃত্রিম মনে হয়। এক-ঘেয়েমির একশেষ। কোন বৈচিত্র নেই, সবই ছকে বাঁধা। প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত। গ্রামগুলোর কথা মনে হলে তার বুকের রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠে। সে বিশ্বাস করে ভগবান অকৃপণ হাতে গ্রামগুলোকে রূপ রস গন্ধে ভরিয়ে দিয়েছেন। কোন কৃত্রিমতার প্রলেপ সেখানে নেই।

* * *

এমনি করে দিন যায়। তরুণটি তখন স্কুলের উপরের শ্রেণীর ছাত্র। আসন্ন যৌবনের উন্মাদনা সমস্ত শরীরে।

কদিন যাবৎই শহরে একটা চাপা উত্তেজনা। মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন। এখানেও তার প্রস্তুতি চলছে। শহরের পূর্বপ্রান্তের স্কুলের মাঠে একদিন জনসভা হয়ে গেল। স্ত্রী-পুরুষ সমেত অনেক লোক তাতে যোগদান করেন। তরুণটি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সব শুনে যাচ্ছে। শহরের একজন আইনজীবী তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন—অন্ধকারের পর আলো যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি অধীনতার পর স্বাধীনতাও অবশ্যম্ভাবী।

শুরু হল আন্দোলন। গাঁজা এবং মদের দোকানের সামনে পিকেটিং। সত্যাগ্রহীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন দূর থেকে দেখা গেল পুলিশের লোকেরা ছুটে আসছে। উপস্থিত সকলকে ঘেরাও করে নিয়ে চলে গেল। তরুণটির ইচ্ছা, সেও এভাবে পিকেটিং করে। পরের দিন স্কুল কামাই করে দূরে থেকে গাঁজার দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকল। বিকেলের দিকে পুলিশ এল। তরুণটি সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশ জায়গাটা ঘিরে ফেলে, সকলকে পর পর সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। তরুণটিকে ঘাড়ে ধরে ঠেলতে ঠেলতে বেষ্টনীর বাইরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

এর মধ্যে এক দিন কানে এল চট্টগ্রামে নাকি ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে বিপ্লবীদের প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেছে। বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুঠ করেছেন। অনেক হতাহত হয়েছেন। লুণ্ঠিত অস্ত্রাদি নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবী পাহাড় ডিঙিয়ে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছেন।

বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই মহকুমাতেও কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে। কয়েক জায়গায় ডাকাতি হয়েছে। দু' একটি অত্যাচারী দারোগাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশের তৎপরতা খুবই বেড়ে গেছে। সমানে চলেছে ধর-পাকড়। তরুণটি জানতে পারল তার এক আত্মীয় গা ঢাকা দিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে পাহাড়ে পালিয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে তরুণটির বাড়ীতে খবর এল ওর নিজের দাদাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে রাজ বন্দীরূপে বহরমপুরে চালান দিয়েছে।

তরুণটি মন স্থির করে ফেলে। সেও এই পথেই যাবে। দু' একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছে। বিপ্লবী দলের যোগাযোগও হয়ে যায়। অল্পস্বল্প কাজের দায়িত্বও পায়। চলার পথের সন্ধান যেন পাওয়া গেল। পড়াশুনো সম্বন্ধে করেবি।

বিপ্লবী আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তখন অনেকগুলো দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে গেছে। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কগ্রস্ত। এ জেলাতেও বিপ্লবীদের কর্মোদ্যম চলছে পুরোদমে। এদের শায়েস্তা করবার জন্য একজন শ্বেতাঙ্গকে ম্যাজিস্ট্রেট করে পাঠানো হল। সে গ্রামে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। সঙ্গে জুটল এক কুখ্যাত ডি আই-বি অফিসার।

একদিন সকালবেলা তরুণটিকে এবং তার এক বন্ধুকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট যথারীতি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেয়। কিছুক্ষণ পরেই ওদের অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ডি-আই-বি

রয়েছে সেখানে। কয়েকটা ঘটনা সম্পর্কে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে অফিসারটি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেদম মারধোর আরম্ভ করে। বিকেলে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। গা-হাত-পায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে ওরা বাড়ী ফিরে আসে।

এই কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করবার জন্ত বিপ্লবীদের মধ্যে একটা প্রস্তুতি সম্ভবতঃ চলছিল। যেভাবেই হোক সেটা ফাঁস হয়ে যায়। শুরু হয় এক ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারে কয়েকজনের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে তরুণটি কলকাতার কলেজে পড়তে এল। এখানে এসে প্রথমে কিছুতেই তার মন টিকতে চায় না। বন্ধ আবহাওয়াতে সে যেন হাঁপিয়ে পড়েছে। দূরের সেই ছোট্ট সহর, সেই সব গ্রাম এবং অবারিত প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। ইচ্ছে করে পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যায় তার অতি প্রিয় সুস্থ সুন্দর গ্রাম্য আবহাওয়ার মাঝে। বুক ভরে টেনে নেয় মুক্ত বাতাস।

সময়ে সবই হয়ত সয়ে যায়। তরুণটি এখন পুরোপুরি যুবক। কলেজের গণ্ডির ভিতর জীবনটাকে গুটিয়ে রাখতে কিছুতেই মন চায় না। রক্তে আছে উদ্দামতার নেশা। দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। সেই গতিপথ কোন দিকে? কোলকাতা শহরের বিরাট পরিবেশে কোথায় পাবে সে পথের নিশানা?

পুরোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। তারই ছাত্র সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই তরুণ, বর্তমানে পরিপূর্ণ যুবক। সাংগঠনিক কাজে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন জেলায় সে ঘুরে বেরিয়েছে। দেখেছে সে বাংলার বিচিত্র রূপ। আদিগন্ত মাঠ, দিগন্ত-প্রসারী ধানের ক্ষেতের সোনালী ঢেউ। শুনেছে সে পদ্মা, যমুনা, মেঘনার জোয়ারের গর্জন। আর পেয়েছে সে গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের বুকভরা ভালবাসা। এদের সে ভালবাসা পরকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। যখনই যে কোন জেলায় যে কোন প্রান্তে যুবকটি গিয়েছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে সে অনুভব করেছে যেন অতি নিকট আত্মীয়ের কাছে সে এসেছে। এমনি ভালবাসা তুলনা-রহিত।

বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। বাতাসে যেন বারুদের গন্ধ। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও সব দিক দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের নেতৃবৃন্দও বসে নেই। এই যুদ্ধের সুযোগ নিতে হবে। দেশকে পরশাসন মুক্ত করবার এ এক সুবর্ণ লগ্ন। সর্বস্তরে চলেছে প্রস্তুতি। শাসকগোষ্ঠীও বসে নেই। তাদেরও চোখ কান খোলা। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল গ্রেপ্তার—চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে। বাংলার অনেক মহান বিপ্লবী বন্দী হলেন। এঁদের মধ্যে আছেন এমন একজন মহানায়ক যিনি ত্যাগে, বীরত্বে সাংগঠনিক দক্ষতায় প্রমাণ করে গেছেন যে মহান আদর্শের জন্ত সংগ্রাম করলে কোন জৈবিক শক্তিই অগ্রগমনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আজকে তিনি কিংবদন্তীর নায়ক। মহান আদর্শবাদী বিপ্লবীরূপে সারা দুনিয়ার পূজ্য।

কয়েক মাসের ব্যবধানে যুবকটিও গ্রেপ্তার হয়। তার পরম সৌভাগ্য সেই মহান দেবপূজ্য বিপ্লবী নায়কের সঙ্গে একই জেলে কিছুকাল বাস করবার সুযোগ সে পেয়েছিল। সে সময়কার কথা মনে হলে এখনো তার চোখ সজল হয়ে ওঠে। অনশনের ফলে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অতি নিপুণ পরিকল্পনামত দেশত্যাগ করে যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯৪১ সাল। আগষ্টের মাঝামাঝি সময় থেকে সমস্ত ভারতব্যাপী উত্তাল হয়ে উঠেছে বিপ্লবী সংগ্রাম। সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ বন্দী হলেন; হাজার সংগ্রামী কর্মীতে বন্দীনিবাসগুলো উপচে পড়লো। প্রাণ দিয়েছেন যে কতো তার কোন হিসেব নেই।

বিশ্বযুদ্ধে পর্যুদস্ত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের অশুভ ইঙ্গিত উপলব্ধি করেছে। স্বেচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পনা করে শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে সৃষ্টি করেছে দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার অসহায় মানুষ প্রাণ দিয়েছে। বন্দী নিবাসে বসে সংবাদপত্রে এ সব কাহিনী পড়ে যুবকটির মন অস্থির হয়ে উঠে। অসহায় গ্রাম্য নরনারীর পাশে ছুটে যাবার জন্ত

আকুল হয়। কিন্তু নিরুপায়। লৌহ কপাট কবে খুলবে কে জানে!

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে। মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত। হলও তাই। যুদ্ধ শেষ। অক্ষশক্তি নিশ্চিহ্ন। ভারতবর্ষের বুকেও পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত। রূপরেখা অনুমান করা কঠিন। বন্দীদের ক্রমান্বয়ে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেলেন। শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে শুরু হল পর্যায়ে পর্যায়ে আলোচনা।

মুক্তি পেয়েই যুবকটি ছুটে গেছে প্রথমে মহকুমা শহরে, পরে গ্রামে। যুদ্ধের অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষের করাল ছাপ যেন সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। একটা অনিশ্চিত ধ্বংসের আতঙ্কে সকলের মনই যেন কেমন বিষণ্ণ।

শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা শেষ। স্থির হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিখণ্ডিত হবে। ক্ষমতা হস্তান্তর হবে খণ্ডিত অংশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হাতে। সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ তা মেনে নিলেন। এই অবাস্তব ও ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কেউ থাকলেন না। অনিশ্চিত অবস্থার করাল গ্রাসে পড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিণতি কি হবে তা কেউ ভাবলেন না। ক্ষমতার মোহ নেতৃবৃন্দকে তখন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বেশ কিছু-কাল পরে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান মন্ত্রী একজন বিদেশী লেখকের কাছে স্বীকার করেছেন—"এ ছাড়া (দেশ বিভাগ) আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না। অবশ্য ভারতের জন্য যদি আমরা জেদ করতাম তবে আবার আমাদের জেলে যেতে হত। আমাদের বয়সও হয়ে গিয়েছিল। মানসিক দিক থেকে আবার জেল ভোগ করার জন্য আমাদের মধ্যে আর কেউই প্রস্তুত ছিলেন না।"

কোলকাতার 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস', স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বছর। জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একটা কলঙ্কময় অধ্যায়। মানুষের পশুপ্রবৃত্তি যদি একবার জেগে উঠে তখন সে যে হিংস্র নরখাদক জন্তুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে সেইটি ই যুবকটি দেখতে পেয়েছিল কয়েকদিন ধরে। এও এক পৈশাচিক উন্মাদনা। হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, সে দেখতে পেয়েছে কতো অনায়াসে, কতো নির্লিপ্তভাবে মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এ হেন নারকীয় হত্যালীলা পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসেই হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে কোন ধর্মই মানুষকে সহনশীল করে, স্থিতধী করে, উদার হতে শেখায়। এর ব্যতিক্রমও যে হতে পারে যুবকটি উপলব্ধি করল।

তার সামান্য শক্তি নিয়ে যুবকটি ছুটে গিয়েছে তাদের মাঝে, যারা ধ্বংস, হত্যা ও নারকীয়তায় উৎসর্গীকৃত। যতটুকু সাহায্য করা যায়। নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভুলে গেল। দেখেছে সে, কি সাংঘাতিক পৈশাচিক উল্লাসে একদল লোক মেতে উঠেছে। কোন দয়া নেই, মমতা নেই। নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে নারী, শিশু, বৃদ্ধ। কোন আক্ষেপ নেই, নেই বিবেকের দংশন। এর পরিণতি কি? এর থেকে পরিত্রাণের পথ কি? কে আজ পথের সন্ধান দেবে? কতো সুখের পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কতো অসহায় নারী নিজের জীবনের বিনিময়েও সম্মান রক্ষা করতে পারল না। কতো হতভাগ্য শিশু জীবনের সূচনাতে ঝরে গেল। কোথায় যাবে? কার কাছে নালিশ জানাবে? এই অবক্ষয় থেকে কে দেশকে বাঁচাতে পারবে?

কোলকাতার ধ্বংসলীলা প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে। দেশের জনক আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গিয়েছেন সেই লেলিহান অগ্নিশিখার মাঝে। যুবকটি ভাবল, এই সুযোগ। যাবে তাঁর কাছে। জানাবে মনের অন্তহীন বেদনার কথা।

চলে গেল সে নোয়াখালীতে। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনমানবের সাড়া পাওয়া যায় না। বাড়ীঘর পুড়ে ছারখার। জায়গায় জায়গায় মৃতদেহের স্তূপ। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করা যায় না। দিনের পর দিন যারা পাশাপাশি আত্মীয়ের মতো বাস করেছে, তারা আজ কোন নারকীয় উন্মাদনায় এমনি মারণযজ্ঞের হোতা হয়ে ভাইয়ের বুকে বন্ধুর বুকে ছুরি বসাতে পারল? এ কিসের ইঙ্গিত? এর শেষ কোথায়?

নতজানু হয়ে যুবকটি জাতির জনকের কাছে আবেদন জানাল—"বাপুজি, দেশকে বাঁচাও। অনেক রক্ত তো

ঝরে গেছে। এখনো সময় আছে। তুমি দেশের জনক। তোমার রুদ্র মূর্তি নিয়ে একবার মাথা তুলে দাঁড়াও। এমন কোন লোক নেই, এমন কোন শক্তি নেই যে তোমার বিরোধিতা করতে পারে, গতিরোধ করতে পারে। তোমার আমার আরো কোটি কোটি মানুষের আজীবনের স্বপ্নকে বিনষ্ট হতে দিও না।"

"যে চিন্ময় ভারতবর্ষের কল্পনা আমাদের মনের মণিকোঠায় গ্রথিত আছে, আজ ব্যাভিচারিদের মলুষিত হাতে তাকে খিণ্ডিত হতে দিও না। হাজার হাজার বছরের গাঙ্গেয় সভ্যতাকে বাঁচাও। ক্ষমতার লোভে লালায়িত তোমার স্নেহপুষ্ট সাথীদের ফিরিয়ে আন। তাদের বুঝিয়ে দাও, তারা ভ্রান্ত, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে তুমিই একমাত্র রুদ্র সাধক যে এই কলঙ্কময় ষড়যন্ত্র রোধ করতে পারে।"

বাপুজি নীরবে যুবকটির বেদনাকাতর আবেদন শুনলেন। তাঁর শুধু এক কথা—"আমার আর কোন শক্তি নেই, আমি নিঃশেষিত, ইতিহাসের গতি রোধ করার আর কোন পথ নেই।"

"কিসের ইতিহাস? গত তিন দশক ধরে ভারতের বুকে তুমিই তো ইতিহাস রচনা করে এসেছ। দক্ষিণ আফ্রিকার নবজন্মের ইতিহাস তো তোমারই সৃষ্টি। কেন তুমি আবার নতুন ইতিহাসের জন্ম দিতে পারবে না? কোটী কোটী ভারতবাসী তোমার কোমুনিনাদে সাড়া দেবে। আমরা জানি তোমার শক্তি কতো অসীম। আর তা যদি না হয় তবে অনাগত দিনের ভারতবাসী কি আমাদের ক্ষমা করবে? কি বলে তারা আমাদের আখ্যায়িত করবে? কি কৈফিয়ৎ আমরা তাদের কাছে রেখে যাব?"

বাপুজি নীরব। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে বেদনার চিহ্ন। হয়ত তিনি ব্যক্তিগত স্নেহের কাছে নিজের বিবেককে বলি দিলেন। যুবকটী বুঝতে পারল, আর কোন আশা নেই, ইতিহাসের গতি হয়ত আর রোধ মানবে না।

চোখে জল নিয়ে যুবকটী ফিরে এল। আরো কেটে গেলো একটা বছর। খিণ্ডিত স্বাধীনতার বোয়েদাদ বেরোল। বাংলা হল খিণ্ডিত। পূর্বপ্রান্তে দাঙ্গা বিধ্বস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর কোন নিরাপত্তা থাকল না। অসহায় গ্রাম্য সরল মানুষগুলো কার কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী জানাবে? তাদের পাশে এসে দাঁড়াবার আর কেউ থাকল না। যুবকটীর বুকটা মোড় দিয়ে উঠে। কিন্তু কি করবে সে, দেখতে পাচ্ছে অসহায় মানুষগুলোর জন্যে ভাববার অবকাশ আর কারো নেই। সবাই আত্মতুষ্টিতে মগ্ন। কয়েক লক্ষ অসহায় নরনারীর কথা ভাববার আর সময় কোথায়? তাদের নিরাপত্তার কথা, নিজ বাসভূমে বসবাস করবার অধিকারের কথা কেউই আর তেমন সোচ্চারভাবে প্রকাশ করছেন না। সামান্য মানবিক দৃষ্টিতেও এই হতভাগ্যদের দিকে কেউ আর ফিরে তাকাচ্ছেন না।

অসহায় নরনারী যথাসর্বস্ব ফেলে রেখে শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে হাজারে হাজারে পশ্চিমের দিকে ধাওয়া করেছে, দিন, মাস, বছর ধরে সমানে আসছে। সীমান্তের এপারে দাঁড়িয়ে যুবকটী দেখেছে কাতারে কাতারে নরনারী ধেয়ে আসছে, ভীতিবিহ্বল মুখ অজানা আশংকায় কাতর, সে ভাবে, কেন আজ এদের এই পরিণতি? কি এদের অপরাধ, যার ফলে অভিশপ্ত জীবনের গ্লানির ভার বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন ধরে? পথে প্রান্তরে এরা আশ্রয় নিচ্ছে। সংখ্যায় কত অনুমান করা কঠিন। কয়েক লক্ষ তো বটেই। বাসস্থান নেই, জীবনধারণের কোন ব্যবস্থা নেই। পুনর্বাসনের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচিত হয়নি। এরা উদ্বাস্তু—যার আভিধানিক অর্থ, আত্মরক্ষার্থে অন্যদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী। স্থায়ী বসবাসকারীদের কাছে এরা একটা পৃথক সম্প্রদায়—ঘৃণ্য, অবাঞ্ছিত, নিগৃহীত, পর্যুদস্ত। প্রায় তিন দশক ধরে এরা ভেসে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে অধিক সংখ্যক কেমন করে যে বেঁচে আছে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের মাঝে কান পেতে দাঁড়ালে শোনা যায় একটা গুমরানো কাতরোক্তি, ফেলে-আসা পরিবেশের জন্য অশ্রুসজল অভিব্যক্তি। এরাই স্বাধীনতার প্রধান বলি।

* * * *

বার্দ্ধক্যের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে যুবকটী আজ স্মৃতির পটে দেখতে পাচ্ছে তার সেই অতি প্রিয় হাওর, সেই গংগলিয়ার ভিটা, গ্রাম বাংলার উদার অকৃপণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সরল, সহজ, স্বজনবৎসল গ্রামের মানুষগুলো যেন এখনো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার কানে অনুরণিত হচ্ছে মহুয়া-মলুয়া পালাগানের ব্যঞ্জনাময় সুরের মোহনা, সে আর চাক্ষুষ দেখতে চায় না তার পরিবর্তিত রূপ, শুনতে চায় না নিগ্রহের কাহিনী। তার বুক ঠেলে শুধু একটা বাসনার সুরের আর্ত মূর্ছনা উঠছে—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশী।

এক অজ্ঞাতনামা ব্রিটিশ সৈনিকের কাহিনী

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা—[ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় সেনাদের গৌরবজনক ভূমিকার কথা আমাদের কাছে সুবিদিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্তিম পর্যায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নৌ-বিদ্রোহের মহান সংগ্রামের কথা ভারতের ইতিহাসে চিরকাল অমলিন হয়ে থাকবে। কিন্তু কোন ব্রিটিশ সেনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের সপক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, এমন নজির আমাদের চোখে পড়ে না। তাবতেই অবাক লাগে যে কোন ব্রিটিশ সৈন্য তাঁদের নিজ দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু এই রকমই এক অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা আজ তুলে ধরতে চাই। এক অজ্ঞাতনামা ব্রিটিশ সৈনিক কিভাবে নিজ জীবন বিপন্ন ক'রে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সাড়া দিয়েছিলেন সেই গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরলাম।]

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। একনায়কতন্ত্রী জার্মানী ও ইটালীর আগ্রাসী নীতির ফলেই এই বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। ব্রিটেন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলি জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল যে বিশ্বশান্তি ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই নাকি তারা এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের কথা বড়াই করে বলেও ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে রাজী হল না। ফলে ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রইল। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় নেতারা বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন কারণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ সমান শত্রু। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকবর্গ বুঝেছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধে পরিপূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে হলে তাদের প্রধান শক্তিভাণ্ডার ভারতবর্ষকে হাতছাড়া করা চলবে না। কাজেই তারা ভারতবাসীর মতামত উপেক্ষা করে ভারতকে বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে জড়িত করল।

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানী দুর্বার গতিতে এগোতে লাগল। ফ্রান্সের পতন ঘটল এবং এরপর ব্রিটেনের পালা। ব্রিটেন জীবন-মরণ সংগ্রামে নিয়োজিত হলো। এই নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও ব্রিটেনের জনগণের মনে এক অপরিসীম উদ্দীপনার সঞ্চার হল। বিশেষ করে সমগ্র যুব সমাজ দেশের এই দুর্দিনে এগিয়ে এলেন। স্কুল কলেজ ছেড়ে লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ যুবক মরণ পণ ক'রে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এই রকম একজন ব্রিটিশ যুবক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে এস ভারতে। নাম রবার্ট নেপিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নেপিয়ার ভাল চাকুরী ও সুখী জীবনের মোহ ত্যাগ ক'রে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে এক ছোট অফিসারের পদ গ্রহণ করল। ভারতে আসতে পেরে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল নেপিয়ার। এই ভারত তাকে অনেক দিন ধরেই হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। হবেই না কেন। ভারতের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। প্রায় একশত বছর আগে তারই ঠাকুর্দা স্যার চার্লস নেপিয়ার সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন। কতই না কাণ্ড-কারখানা করে গেছলেন তার ঠাকুর্দা। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের অন্যতম স্থপতি ছিলেন স্যার চার্লস নেপিয়ার। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার চার্লস সিন্ধু বিজেতা হিসাবে ভারতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন অর্জন করে

নিয়েছেন। প্রবল প্রতাপশালী চার্লসের বংশধর যুবক নেপিয়ারও ভারতে এল সামরিকবেশেই। তবে তরুণ নেপিয়ার ভারতবাসীর দর্প চূর্ণ করার দম্ভ নিয়ে আসে নি। এসেছে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। নেপিয়ারের মত যুবকেরা শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা নিরাপদ সুখী জীবনের মোহ ছিন্ন করে পাড়ি দিয়েছে অজানার পথে। কি আছে ভাগ্যে তা তারা জানে না—হয়তো অনেক সবুজ প্রাণ যুদ্ধের হোমানলে বিসর্জিত হবে। অনেক তাজা লাল রক্ত ঝরবে, কিন্তু জীবন দিয়েও তারা দেশের মর্যাদাকে ধূলিলুণ্ঠিত হতে দেবে না।

কিন্তু এ কি? ভারতে এসে তরুণ নেপিয়ার কি দেখল? এ এক ভিন্নতর চিত্র। ভারতে এসে সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপটি দেখে শিউরে উঠল। যে ব্রিটেন সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে দোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেই ব্রিটেন ভারতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে মোটেই কুণ্ঠিত নয়। কেন ব্রিটেন এই দুমুখো নীতি চালাচ্ছে? যদি সে গণতন্ত্রের জন্যই লড়ছে তবে কেন ভারতের জনমতকে দলিত মথিত করছে? যত দিন যেতে লাগল ততই নেপিয়ার ব্রিটিশ শাসনের কদর্য রূপটি প্রত্যক্ষ করতে লাগল। সে দেখতে পেল মিলিটারী ব্যারাকে ব্রিটিশ ফৌজের জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থা রয়েছে এবং ভারতীয় সেনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর আচরণ পায়। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশ সেনাদের জন্যই সংরক্ষিত। একদিকে ব্রিটিশ সামরিক অফিসাররা বিলাস ব্যসনে দিন কাটায় আর অন্যদিকে ভারতীয় সেনারা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না। অবাক লাগে নেপিয়ারের —অন্য ব্রিটিশ সেনার ও তার সমবয়সী অফিসাররা এ ব্যাপারে আদৌ বিচলিত নয়। তারা আনন্দে মত্ত হয়ে রয়েছে সুরার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে ভারতীয়দের উপর অত্যাচার চালাতেও কুণ্ঠিত হয় না। কেন হবে না? তারা যে শাসকের জাত তারাই প্রভু আর ভারতীয়রা ভৃত্য। এমন কি সুযোগ পেলে ব্রিটিশ সেনারা ভারতীয় নারীদের সম্ভোগ করতেও পিছ পা হয় না। ক্রমশ ব্যারাকের জীবন নেপিয়ারের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন সামরিক ব্যারাকে নেপিয়ার একই ঘৃণ্য চিত্র দেখতে পেল। সব কিছু তার কাছে অসহ্য ঠেকছে অন্য অফিসারদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে আনন্দের স্রোতে ভেসে যেতে পারছে না। নেপিয়ার নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে লাগল। ভাবতে লাগল এই জীবন থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে নেপিয়ার ব্যারাক জীবনের বাইরে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। গ্রামে-গঞ্জেও ভারতীয় জনগণের জীবন-যাত্রা দেখতে লাগল। কি অপরিসীম দুর্দশা ও দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে ভারতের মানুষ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার মধ্যে তারা মুখ বুজে দিন কাটায়। নিজ দেশেই তারা পরদেশীর মত আচরণ পায়। এদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ থাকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অটুট থাকবে। সবচেয়ে অবাক লাগে নেপিয়ারের এই ভেবে যে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয়দের শোষণ করছে মুষ্টিমেয় জমিদার, রাজা বাহাদুর সামন্ত প্রভুরা আর কতিপয় বণিক সম্প্রদায়। এরাও নির্বাক চিত্তে দেশবাসীকে শোষণ করছে। যুদ্ধের দৌলতে শোষণের মাত্রা আরও বেড়েছে। এদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা হচ্ছেন ব্রিটিশের পরম শত্রু এবং দেশবরেণ্য নেতারা যেমন গান্ধীজী, নেহরু, সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন। মিত্র কারা? মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক নেতারা। যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে ব্রিটিশ শাসকেরা জাতীয়তাবাদী নেতাদের কোণঠাসা করে মুসলীম লীগকে পিঠ চাপড়াচ্ছে আর ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে ধামাচাপা দিয়ে ভারত-বাসীর মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের রাজনৈতিক প্রশ্রয় দিচ্ছে। যতদিন যায়, নেপিয়ারের কাছে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের নোংরা রূপটি ততই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কি করবে নেপিয়ার? যা হচ্ছে তাই হোক মেনে নিয়ে আনন্দ স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে? না, সে চুপি চুপি সরে পড়বে কারণ যে গণতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষার ব্রত নিয়ে সে যুদ্ধে নেমেছে তা ভারতে ব্রিটিশ-শক্তিই বিপন্ন করছে। আদর্শ-বাদী নেপিয়ার কিছুতেই ব্রিটিশের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির

সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না। অনিদ্রায় ও চিন্তায় বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অতঃপর ঠিক করল যে সে সৈনিকের কাজ থেকে সরে পড়বে এবং ভারতে থেকে ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হবে। নেপিয়ার বুঝেছিল যে এই কাজে তাকে অসম্ভব ঝুঁকি নিতে হবে এমন কি ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু নেপিয়ার তার সিদ্ধান্তে অবিচল রইল।

কিন্তু কিভাবে সে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেবে? ঠিক করল যে সে সরাসরি জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করবে এবং তাঁকে সমস্ত বুঝিয়ে বলবে। নেহরুর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্ব-রাজনীতি সম্পর্কিত চিন্তাধারা নেপিয়ারকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে নেহরু খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এই নেহেরুই জোরালো কণ্ঠে বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার যমজ সন্তান; এই দুয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে, তা না হলে বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। নেপিয়ার একই ধারণা পোষণ করে। সে ফ্যাসিবাদকে রুখতেই বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, এখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারী নেপিয়ার ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে নতুন সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বদ্ধপরিকর।

পণ্ডিত নেহেরু বিশেষ কাজে বোম্বাই এসেছেন। একদিন কাজ সেরে দুপুরে বোনের বাড়ীতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময় তাঁর কাছে একজন আগন্তুক এসে হাজির। জওহরলাল হকচকিয়ে গেলেন। একি খাদির পোষাক পরিহিত এক তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত ইংরেজ যুবক তাঁর দর্শনপ্রার্থী। হাঁ, নেপিয়ার এসে হাজির। নতুন সৈনিকের বেশে খাঁকি ছেড়ে খাদি বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন ছেড়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অহিংস সংগ্রামের অভিনয়ে হাজির হয়েছে নেপিয়ার। নেপিয়ার সব কিছু খোলাখুলি জানালেন পণ্ডিত নেহেরুকে। সামরিক রীতি-নীতি ভঙ্গ করে সে বে-আইনীভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য। পণ্ডিত নেহেরু সব কিছু শুনলেন। তিনি নেপিয়ারকে পরামর্শ দিলেন যে সে আগুন নিয়ে খেলতে চলেছে। সে পলাতক—ব্রিটিশ সৈন্য তাকে খুঁজে বের করবেই এবং ধরা পড়লে তার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। তাছাড়া সে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দিলে তাতে ভারতেরও অভীষ্ট সাধিত হবে না কারণ সে ধরা পড়লে ব্রিটিশ প্রচার করবে যে ভারতীয় নেতারা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এইভাবে নেপিয়ার তার ব্যক্তিগত ক্ষতি টেনে আনবে অথচ ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের কোন শক্তি বৃদ্ধি হবে না। পণ্ডিত নেহেরু নেপিয়ারকে শিবিরে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বললেন। নেপিয়ারের যুবক মন নেহেরুর বিচক্ষণ পরামর্শে কতটা সায় দিয়েছিল তাতে সন্দেহ আছে। অবশ্য নেপিয়ার কোন মতামত না জানিয়েই বিদায় নিয়েছিল।

নেপিয়ারের নাটকীয় আগমন ও প্রস্থান নেহেরুর মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে। নেপিয়ারের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে তিনি শিউরে উঠলেন। নেপিয়ার কোথায় আছে এবং কি করছে এই কথা ভাবতে ভাবতে নেহেরু অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি কি নেপিয়ারকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলেন? কয়েকদিন মানসিক কষ্ট ভোগ করার পর সব ব্যাপারটা সবিস্তারে জানালেন তিনি বাপুজীকে। হাঁা, মহাত্মাজীকে জানালেই মন হাল্কা হয়ে যাবে। বাপুজী অভয় দিলেন যে তিনি সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন এবং এতে নেপিয়ারের শুভ হবে।

কিছুদিন পর নেহেরু স্বয়ং নেপিয়ারের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। হাঁা, তাঁরই পরামর্শ মত নেপিয়ার সামরিক শিবিরে ফিরে গিয়েছিলেন এবং তারপর কর্তৃপক্ষকে ওস্কির ক'রে সে ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিয়েছে। নেপিয়ার ঠিক করেছে সে যুদ্ধ করবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে; তবে ভারতের মাটিতে থাকবে না, যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটা মহান দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতার পবিত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

জানি না, আজ নেপিয়ার কোথায়। হয়তো আজ সে বেঁচে নেই অথবা হয়তো বৃদ্ধ বয়সে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। সে ফ্যাসিবাদের পতন দেখেছে আবার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানও দেখেছে। নিজ জীবন বিপন্ন ক'রেও তার মত একজন বিদেশী সৈনিক পরাধীন জাতির সুখ দুঃখের শরিক হতে চেয়েছিল—এ কথা ভাবলে আমাদের মনে বিস্ময় জাগে।

[নিউ দিল্লীর নেহেরু স্মারক লাইব্রেরীতে রক্ষিত নেহেরু নথিপত্রে প্রাপ্ত গান্ধীজীকে লিখিত নেহেরুর এক পত্র অবলম্বনে রচিত।]

মনীষী রজনীকান্ত গুপ্ত

উনিশ শতকের বাঙালী মনীষীদের সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে নতুনভাবে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও জ্যোৎস্না সিংহরায় সম্পাদিত "রজনীকান্ত গুপ্ত : ব্যক্তিত্ব ও মনীষা" বইখানি তার একটি মূল্যবান নিদর্শন। অন্যতম সম্পাদক শ্রী সেনগুপ্ত রজনীকান্তের সঙ্গে রক্তসূত্রে যুক্ত। তিনি এই গ্রন্থ সম্পাদনার দ্বারা শুধু নিজ বংশের প্রতি কর্তব্য পালন করেন নি, ঋষিঋণও পরিশোধের চেষ্টা করেছেন। ১৯৭৪ সালে রজনীকান্তের ১২৫-তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বহু মনীষী অংশ গ্রহণ করেন। সেই সভার একটি ফলস্বরূপ পূর্বোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

রজনীকান্তের মৃত্যুর পর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন আলোচ্য সংকলনে তা পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের প্রবন্ধেও রজনীকান্তের ব্যক্তিত্বের আলোচনা রয়েছে। রজনীকান্তের প্রতিভার সামগ্রিক রূপটিকে সংক্ষেপে ধরা হয়েছে নিমাইসাধন বসুর "মনীষী রজনীকান্ত" প্রবন্ধে। শ্রী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রবন্ধ "রজনীকান্ত গুপ্ত : সাহিত্যচিন্তা ও ব্যক্তিত্ব" মানুষ রজনীকান্তের একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। রজনীকান্তের সাহিত্যসেবা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীশঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ("বাঙালীর জন্মদেবচর্চা ও রজনীকান্ত গুপ্ত"), শ্রীহারাধন দত্ত ("রজনীকান্ত গুপ্ত ও বঙ্গবাণী") এবং ভবতোষ দত্ত ("ইতিহাস-সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত")। তিনটি প্রবন্ধে রজনীকান্তের ইতিহাসবোধ ও জাতীয়তা প্রীতির বিশ্লেষণমূলক—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার প্রণীত "জাতীয়তাবাদের প্রতিচ্ছবি রজনীকান্ত গুপ্ত," শ্রী বিনয় ঘোষ প্রণীত "রজনীকান্তের ইতিহাসবোধ" এবং ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী কৃত "সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-প্রসঙ্গে"। আলোচ্য সংকলনটির আর একটি দামী অংশ রজনীকান্তের রচনা থেকে সংগৃহীত তিনটি প্রবন্ধ—"ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন," "ভারতে মুসলমান স্বাধীনতা," এবং "আমাদের জাতীয় ভাব"। এ ছাড়া রজনীকান্তের কয়েকটি পত্রের নিদর্শন ও বিস্তৃত রচনাপঞ্জীও দেওয়া হয়েছে। সব জড়িয়ে সংকলনটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গৃহীত হবার যোগ্য।

মানুষ রজনীকান্তের যে হৃদ্য পরিচয় এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি উৎসাহব্যঞ্জক। বাল্যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে শ্রুতিশক্তি বহুলাংশে নষ্ট হলেও রজনীকান্ত হতোদ্যম হন নি। স্কুল-কলেজের লেখাপড়াও তিনি সমাপ্ত করার সুযোগ পান নি। তা সত্ত্বেও রজনীকান্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং তাঁর অর্জিত জ্ঞান বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিয়োগ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর রচনায় আগাগোড়া ছড়িয়ে আছে। বৃত্তি নির্বাচনেও রজনীকান্ত স্বাধীনচিত্ততার দৃষ্টান্ত রেখে যান। কবিরাজীবিদ্যা শিক্ষা করলেও সে বৃত্তি তাঁর মনঃপূত হয় নি এবং ইংরাজ সরকারের অধীনে উচ্চপদ লাভ করেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। একমাত্র সাহিত্য সেবাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে এর দ্বারাই তিনি পরিবারের ভরণ পোষণ করেছেন। পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহ, সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন, কলকাতায় দ্বিতল গৃহ নির্মাণ, একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এ সমস্ত কাজই তিনি শুধুমাত্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার দ্বারা অর্জিত অর্থে সম্পন্ন করেছিলেন। মাত্র একান্ন বছর বয়সে লোকান্তরিত হবার পূর্বে রজনীকান্ত এত কাজ সমাধা করেছিলেন যে তার তালিকা আমাদের বিস্মিত করে।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে নিবিড় যোগের ফলে রজনীকান্তর গদ্যরীতিতে একটি গম্ভীর মহিমা ও আভিজাত্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের যে ধারাটি বিশেষভাবে সাহিত্যের সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়েছিল তাতে সংস্কৃতপন্থী ভাষারীতিই সমাদৃত হত। রজনীকান্তের গদ্যরীতির রাজোচিত ভাব ও সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ আমাদের গদ্যসাহিত্যের বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য স্তররূপে পরিগণিত হবে। রজনীকান্তর রচিত পাঠ্যগ্রন্থগুলি ছাত্রদের সামনে বাংলা গদ্যের একটি সুস্থ আদর্শ তুলে ধরেছিল সন্দেহ নেই।

আধুনিক পাঠকের কাছে অবশ্য রজনীকান্তের ইতিহাস-বোধ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সর্বাধিক কৌতূহলের বস্তু। রজনীকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও স্বাদেশিকতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথা সঙ্কলন কার্যে তিনি স্বদেশ প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাদেশিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস"। সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র বাইশ বছর পরেই রজনীকান্ত বাংলা ভাষায় সেই বিদ্রোহের প্রামাণ্য ও মৌলিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এ তাঁর অসামান্য কীর্তি। একথা সত্য, রজনীকান্তর রচনা প্রকাশিত হবার আগেই ইংরাজীতে বিদ্রোহ বিষয়ে আলোচনা মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু তাতে রজনীকান্তর গ্রন্থের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রজনীকান্ত মৌলিক ও অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং বিদ্রোহের নায়কদের চরিত্র চিত্রণেও তিনি ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতো অন্ধত্ব প্রদর্শন করেন নি। বিশেষতঃ ঝাঁসীর রাণীর চরিত্র বর্ণনায় রজনীকান্ত উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যভূয়িষ্ঠতা এবং দেশপ্রীতির আবেগ এই দুটি বস্তু সমপরিমাণে মিশ্রিত হয়ে "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসকে" একটি ক্লাসিক গ্রন্থের গৌরব দান করেছিল।

রজনীকান্তর রচনা থেকে উৎকলিত অংশগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ "ভারতে মুদ্রণ স্বাধীনতা"। এই দীর্ঘ রচনাটি বারবার পড়বার যোগ্য। রজনীকান্ত এই প্রসঙ্গে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যার অনেকগুলি কখনো শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত নয়। অ্যারিও প্যাজিটিকার সঙ্গে এ প্রবন্ধটির তুলনা করা হয়তো সঙ্গত হবে না কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধটির অনুরূপ দ্বিতীয় কোনো লেখা নজরে পড়ে না। এ রচনাটি পাঠ করে আমরা উপলব্ধি করি রজনীকান্তের সমগ্র রচনাবলী পুনরায় মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য সংকলনগ্রন্থের সম্পাদকেরা সচেষ্ট হলে বাংলা সাহিত্যের এ অভাবটি দূর হবে।

রণেন্দ্রনাথ দেব

স্মৃতি-তর্পন

বিপ্লবী বারীণ রায়

গত ১৮ই মার্চ, রবিবার প্রাক্তন বিপ্লবী বারীণ রায় ৭৫ বছর বয়সে মহাজাতি সদনে তাঁর বাসভবনে অকস্মাৎ লোকান্তরিত হয়েছেন। বারীণ রায় ঢাকা শহরে তাঁর বিপ্লবী জীবন সুরু করেন, বিপ্লবী নেতা অনিল রায়-এর সংস্পর্শে এসে। সেদিন সংগঠক-নেতার প্রতিষ্ঠা নিয়ে, যুবশক্তিকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে অনিল রায় যে দল গড়ে তুলেছিলেন পরবর্তীকালে শ্রীসঙ্ঘ নামে সেই বিপ্লবী দলটি চিহ্নিত হয়। বিপ্লবী বারীণ রায়ও সে-দলেরই একজন উদ্যোগী সদস্যরূপে বহু যুবককে সে-দলের মন্ত্রগুপ্তির দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই দীক্ষাপ্রাপ্ত যুবশক্তির সাহায্যে বারীণ রায় কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রও 'শ্রীসঙ্ঘ'-এর অস্ত্রভাণ্ডারের জন্য সংগ্রহ করতে সফল হয়েছিলেন। বারীণ রায় বন্দীশালায় কয়েক বছর আটক ছিলেন। তাঁর শেষজীবনে 'মহাজাতি সদনে'র তদারকির ভার নিয়ে, সেখানেই সপরিবারে বসবাস করতেন। আমরা তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রভিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

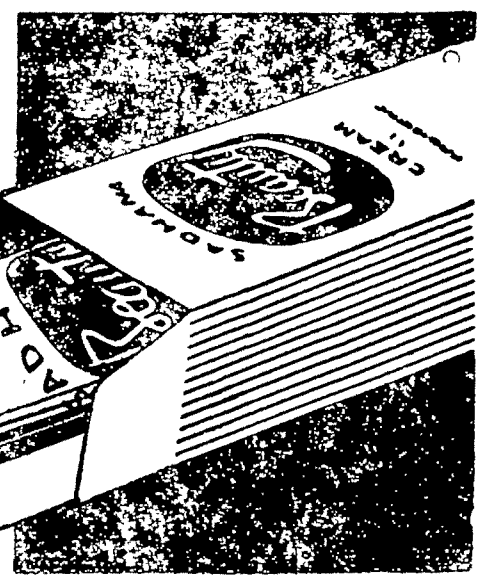

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

SBC. 5/71

মরিচঝাঁপির অন্তরালে

মরিচঝাঁপি হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরবনের এই ছোট্ট দ্বীপটির নাম কিছুদিন পূর্বেও বেশী মানুষের জানা ছিল না। পূর্ববঙ্গের কয়েক সহস্র ভিটে-মাটি-ছাড়া মানুষের শেষ আশ্রয়রূপে মরিচঝাঁপি শুধু পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে নয়, গোটা ভারতবর্ষের মানচিত্রে ভেসে উঠেছে।

মরিচঝাঁপির গোড় খুঁজতে গেলে সেই ১৯৪৭-এর ভারত- বিভাগের ও বাংলা-বিভাগের দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে। দেশ-বিভাগের পর সেদিনকার পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাস্তত্যাগীদের অবিরাম স্রোত ১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের দিকে অব্যাহত ছিল। এই বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ।

এই বাস্তুত্যাগীদের সরকারী দৃষ্টিতে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে:

১। যারা ১৯৪৬-এর নোয়াখালী দাঙ্গার পর থেকে ১৯৭৮-এর মার্চ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতে এসেছেন। সরকারী হিসাবে এদের সংখ্যা ৪১·১৭ লক্ষ, এদের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় রয়ে গেছেন ৩১·৩২ লক্ষ।

২। ১৯৭৮-এর এপ্রিল থেকে ১৯৬৩-র ডিসেম্বরের মধ্যে যারা ভারতে চলে আসেন তাদের সংখ্যা প্রায় ৬১,০০০ হাজার। তাদের মধ্যে ৫০,০০০ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৩। ১৯৬৪-র জানুয়ারী থেকে ১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত ১১·১৪ লক্ষ মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুত্যাগ ক'রে ভারতে এসেছেন, তাদের মধ্যে ৬ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করেন। সরকারী পরিভাষায় প্রথম দলের বাস্তুত্যাগীদের বলা হয় 'পুরানো বাস্তুত্যাগী' ('Old migrants') এবং তৃতীয় দলকে বলা হয় নূতন বাস্তুত্যাগী ('New migrants')।

১৯৭৮-এর জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গের সকল উদ্বাস্তু-শিবিরগুলি এক বছরের মধ্যে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং শিবিরে অবস্থানকারী দশ হাজার পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দেওয়া স্থির হয় এবং অবশিষ্টদের পশ্চিম-বঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। দণ্ডকারণ্য এই পুনর্বাসন ক্ষেত্রের অন্যতম।

১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে 'নূতন বাস্তুত্যাগী'দের ('new migrants') মধ্যে যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন নিতে সম্মত হবেন কেবলমাত্র তাদেরই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সহায়তা দেওয়া হবে।

এই 'নূতন বাস্তুত্যাগী'দের নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে গেলো। দণ্ডকারণ্যের প্রশস্ত পুনর্বাসন ক্ষেত্রের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী শিবির খুলে পশ্চিমবাংলার বাইরে পুনর্বাসনে সম্মত বাস্তুত্যাগীদের সাময়িকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হ'লো। দণ্ডকারণ্যে যে জমিতে বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হ'ল তা যেমন অনুর্বর তেমনি জলাভাবক্লিষ্ট মাটির তলায় জলের দুর্ঘট। সেচের ব্যবস্থারহিত চাষ থেকে জীবিকা নির্বাহ করা—সে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বাঁচার সংগ্রামের রূপ নিলো, অতি অল্পকালের মধ্যেই। বাস্তুত্যাগীরা বুঝে নিল, এ-বড় কঠিন ঠাঁই। কৃষি-ব্যবস্থায় জীবিকার্জন এক দুরূহ সাধনা। এর পর বোঝার উপর শাকের আঁটি। পুনর্বাসন ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবার পূর্বে শিবিরে বসবাস, বাস্তুত্যাগীদের জন্য নরক-যন্ত্রণার সামিল করে তুলেছিলো, ক্ষুদে শিবির-প্রশাসকদের দুর্ব্যবহার। আর পুনর্বাসন ক্ষেত্রেও শান্তি নাই। স্থানীয় প্রশাসকদের সম-বেদনা-বিহীন আচরণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বৈরীসুলভ মনোভাব, বাস্তুত্যাগীদের অবস্থা অসহনীয় করে তুলবে—তা আর বিচিত্র কি? আর এই বাস্তুত্যাগী-বিদ্বেষ

দণ্ডকারণ্যের সর্বত্রই কম-বেশী ছড়িয়ে ছিল, তারই মধ্যে মালকানগিরি, পারালকোট এলাকাগুলি এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অগ্রণী ছিল।

এমনি টানা-পোড়েনের মধ্যে সংগ্রামের শুভবুদ্ধি অবলম্বন করে ১৯৭৩-এ বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি আত্মপ্রকাশ করলো। তার পূর্বেই বাস্তুত্যাগীদের সঙ্গে প্রশাসনের সংঘাতের স্বাক্ষর বহন করে পর পর অনশনের মহড়া শুরু হয়ে গেলো। এই Relay hunger-strike-এ ৮০,০০০ হাজার বাস্তুত্যাগী জড়িয়ে পড়েছিলো। তারপর এলো 'আমৃত্যু অনশন-এর মহড়া। প্রশাসন এগিয়ে এসে সময় থাকতে ১৯৭৪-এর ১০ই মে আপস করে নিলো।

পুলিশের গুলিও চলেছে এবং তাতে বাস্তুত্যাগীদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। ১৯৬৮র হিসাবে এরকম ১৬ জন প্রাণ দিয়েছেন। ১৯৭৪-৭৫-এ পুলিশের গুলিতে ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে সংবাদ। সুতরাং বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে অস্থৈর্য ছিল, চাঞ্চল্য ছিল, ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগও ছিল। তাদের ভাবনা এই প্রতিকূল পরিবেশে অতঃপর তাদের করণীয় কি!

এই অস্থৈর্যের প্রকাশও দেখা গেলো অল্পকালের মধ্যে। ১৯৭৮-এর গোড়ায় প্রায় একলক্ষ ত্রিশ হাজার বাস্তুত্যাগী দণ্ডকারণ্যে তাদের দশ-পনের বছরের বাসভূমি ছেড়ে অজানার পথে বেড়িয়ে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে। এঁরা বেশীর ভাগ এলেন মালকানগিরি ও পারালকোট অঞ্চল থেকে। ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে এরা পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছলেন, সুন্দরবনের পথে। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় দীর্ঘকালের বাসভূমি ছেড়ে সুন্দরবনের অজানা ভবিষ্যতের কোন্ প্রলোভনে, আর্থিক জীবনে দুর্গত, সমাজ-জীবনে প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিহত, এককালের ছিন্নমূল এতো বৃহৎ সংখ্যক মানুষ চলে এলেন,—সে সম্বন্ধে তাদের কি কোনো সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ সম্বন্ধে না কেন্দ্রীয় সরকার, কিম্বা না রাজ্য সরকার অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন, এই হতভাগ্য মানুষগুলির—যাদের শতকরা ৯৯ ভাগই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত—জীবন কোন্ দুর্বিসহ যন্ত্রণায় প্রকোপে অসহনীয় হয়ে উঠবার ফলে তাদের প্রায় দুই দশকের বসবাসের বাড়ী-ঘর ফেলে তারা অজানার পথে পা বাড়িয়েছেন? এদের প্রতি সরকার কি আচরণ করেছেন? অপর পক্ষে ভারত সরকার তাদের দণ্ডকারণ্য ত্যাগের কারণ নির্ণয় না করে কেবলই বলছেন তাদের সেখানেই ফিরে যেতে হবে একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে। এতোদিন সেই সময়-সীমা ছিল এ বছরের ৩১শে মার্চ, সেই সময়সীমা বৃদ্ধি করে ভারত সরকার ধার্য করেছেন এ বছরের ৩ শে মে পর্যন্ত

আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করছেন? এই হাজার হাজার দণ্ডকারণ্য প্রত্যাগত সুন্দরবনের প্রায় প্রান্তবর্তী একটি ছোট দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে বসবাসের চেষ্টায় মধ্য প্রদেশের রায়পুর থেকে রেলে, লরিতে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন। এই দণ্ডকারণ্যবাসীরা তাদের বাড়ী-ঘর, বাসনপত্র, গরু বাছুর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে রওয়ানা হয়েছেন। কিন্তু রায়পুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে কোন শহর পর্যন্ত লরি ভাড়ার প্রচুর টাকা, রেলের টিকিটের টাকা তাদের কে জোগালো? ধ্রুবতারার মত 'মরিচঝাঁপি'র নামের যাদুমন্ত্রই বা তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে এলো কেন? এ সম্বন্ধে উদ্বাস্তুরা যে অভিযোগ করে এসেছেন, তাতে কর্তৃপক্ষরা কান দেন নি। তাদের মূল বক্তব্য, যারা আজ পশ্চিমবঙ্গে শাসন-ক্ষমতায় আসীন রয়েছেন, শাসন-ক্ষমতায় আসবার পূর্বে ১৯৭৪ থেকেই তাঁদের নেতৃস্থানীয়রা দণ্ডকারণ্যবাসী উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির কর্মকর্তাদের আশ্বাস দিয়ে আসছেন যে তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী বাস্তুত্যাগীদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে সুন্দরবনে পুনর্বাসন সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক-দলের কয়েকজন মন্ত্রীর ও নেতাদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ থেকে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির কর্তৃপক্ষ সুন্দর-বনে পুনর্বাসনের আশ্বাস পেয়েছেন। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা খোলাখুলি প্রচার করেছেন ১৯৭৭-এর

৭ই ডিসেম্বর তাদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দিয়ে বলেন যে দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত না নিলে, তারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে। এ ছাড়া ১৯৭৮-এর জানুয়ারী মাসেও কোনও মন্ত্রী এবং সরকারপক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দণ্ডকারণ্যে সংক্ষিপ্ত সেখানকার বসবাসকারীদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করে আসেন।

এ-ছাড়া উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির পক্ষ থেকে এ কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে রায়পুর এবং দুরগ্ স্টেশনে সমবেত দণ্ডকারণ্যবাসীদের কলকাতার রেল-টিকিট রায়পুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিনে দেন। এতো প্রকাশ্য অভিযোগের কোনো তদন্তেরই কেউ প্রয়োজন বোধ করলেন না! কর্তৃপক্ষীয়দের কাছ থেকে এতো আশ্বাস পাবার পর যদি কয়েক সহস্র মানুষ পশ্চিম বাংলায় ফিরে এসে থাকেন, তাদের অপরাধ কোথায়? এদের দণ্ডকারণ্য ত্যাগের কারণ অনুসন্ধান না করে এবং সেই সম্ভাব্য কারণগুলি দূর না করে জোর-জবরদস্তি ক'রে তাদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে পাঠাবার উদ্যোগে মানবিক আচরণের কোন্ স্বাক্ষর রয়েছে? আর এমনি অমানবিক আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত বাস্তুত্যাগীরা। 'মানবিক অধিকার' একটি বুলিমাত্র নয়। মানবিক অধিকার অবিভাজ্য, যেমন স্বাধীনতা অবিভাজ্য। আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণদের জন্য সঙ্গতভাবেই মানবিক অধিকার দাবী করবো, আর নিজের দেশের অসহায়, দরিদ্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের উপর অত্যাচার নিপীড়নের চরম পর্যায়ে পৌঁছাবো, মানবিক অধিকারের নামে কপটাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

পশ্চিমবঙ্গে মরিচঝাঁপির অভিযাত্রীদের নিয়ে সেই কাণ্ডই হয়েছে। ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে দণ্ডকারণ্য থেকে এই অভিযাত্রীর দল পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছাবার পর থেকে নির্মম নিষ্পেষণের সম্মুখীন হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে বর্ধমানের কাশীপুর শিবিরে মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯-এর জানুয়ারীর শেষের দিনগুলিতে পুলিশ লঞ্চের বেষ্টনী দিয়ে মরিচঝাঁপি অবরোধের ফলে গুলিতে, কাঁদুনে গ্যাসে, অনাহারে, অ-চিকিৎসায় এবং জবরদস্তি নৌকা জলে ডুবিয়ে দেবার ফলে মৃত্যুর সমারোহ চলেছে। মাঝখানে হাসনাবাদ থেকে মরিচঝাঁপি যাবার পথে চরে হাসনাবাদে অগুণতি মৃত্যুর ইতিহাস রয়ে গেছে।

মৃত্যুটা তো জীবনের আনুষঙ্গিক ঘটনা। এদের সুন্দরবনে অভিযাত্রার বাঁকে বাঁকে রাজ্য-সরকার বাধার সৃষ্টি করে চলেছেন। নিরস্ত্র নিরীহ, দরিদ্র অভুক্ত হরিজন-সম্প্রদায়ের এই মানুষদের অভিযাত্রার পথে ১৯৭৮-এর ৭ই এপ্রিল রাজ্য সরকার অবরোধ সৃষ্টি করলেন, তারা নৌকার মাঝিদের হুকুম দিলেন হাসনাবাদ থেকে নদীর ওপারে তাদের যেন পার করে না দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে ফল হোল না, অভিযাত্রীরা নদী পেরিয়ে গেলেন। ১৯শে আগষ্ট, ১৯৭৮ সাল ২০টি লঞ্চ বহু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে অবরোধের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে চাইলেন। কিন্তু পাকা হাড়ের গরীব কৃষক এরা, সামাজিক অত্যাচারের শিকার এরা, কারণ এরা যাদের বলা হয় হরিজন, সেই সম্প্রদায়ের লোক—এরা বাঁচবার প্রচণ্ড তাগিদে অবরোধ অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে গেলেন। আরো বিপদ এলো ১৯৭৮-এর ৬ই সেপ্টেম্বর, যেদিন অভিযাত্রীদলের প্রায় ২০০ ছোটো ছোটো নৌকো—দলের সকলের জন্য খাদ্যসম্ভার ও জ্বালানীতে ভর্তি—সরকারী লঞ্চগুলি ধাক্কা মেরে ভেঙে ডুবিয়ে দিলো। গরীবের সঞ্চয়, খাদ্যের সংস্থান ধ্বংস করে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষগুলিকে সাজা দিয়ে গরীবের বন্ধু রাজ্য সরকার কর্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখালেন।

সকল বাধা ও অবরোধ ডিঙিয়ে মরিচঝাঁপিতে পৌঁছে, এই অভিযাত্রীরা কি করেছিলেন? তারা ঝিল্লা ১ ও ৩ নং ব্লকে ২৫,০০০ একর পরিমাণ জমিতে বসবাসের উদ্যোগের জন্য এই জমি পঁচটি লাগু ভাগ করে নিয়েছেন, পরিবার পিছু পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করেছেন। এই বসতির পরিচালকরূপে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি স্থানীয় বাস্তুহীনদের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ জমি বরাদ্দ করেছেন এবং কুমীরমারি, মোল্লাখালি প্রভৃতি সংলগ্ন এলাকার ৪২৫টি বাস্তুহীন পরিবার মরিচ-

ঝাঁপিতে বসতি নিয়েছেন। সমিতির হিসাবে মরিচঝাঁপির অভিযাত্রী দলে প্রায় ৩০,০০০ মানুষ রয়েছেন, ৫০০ দোকান-সহ চারটি বাজার উন্নয়নশীল সমিতি মরিচঝাঁপিতে বসিয়েছেন। এখানে নৌকো তৈরীর ঘাঁটি রয়েছে। উন্নয়নশীল সমিতির অবিসম্বাদী নেতা সতীশ মণ্ডল বলেছেন পুলিশ তাদের নৌকোগুলি ভেঙে ডুবিয়ে দেবার পর মরিচঝাঁপির বড় গাছ-গুলি কাটতে সুরু করেছেন। এরা বিড়ির কারখানা করেছেন। তেরী বানিয়েছেন ৫০০০ বিঘা জমির ওপর। এই ভেরীতে ভেটকী, বড় চিংড়ি, পার্শে নানা জাতের মাছ চাষ করা হয়েছিলো। দামও কম ছিল। ভেটকির দাম ৪৫ টাকা কেজি, চিংড়ির দাম ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা কেজি, এ ছাড়া নুন তৈরীর, কটি তৈরীর এবং তাঁতের কারখানারও পত্তন হয়েছিলো।

এরা স্কুল তৈরী করেছিলেন। স্কুলে আটটি ক্লাস। শিক্ষক দশ জন। বেলা ১১টায় স্কুল বসে বিকেল সাড়ে চারটায় ছুটি হয়। দশ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪ জন মহিলা। দুই-একজন গ্রাজুয়েটও আছেন। স্কুলে একটি লাইব্রেরীও আছে। স্থানীয় পাঠক্রম অনুযায়ী স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে।

পানীয় জলের দুরন্ত অভাব মরিচঝাঁপিবাসীদের মস্ত সমস্যা। সেখানকার পাঁচটি টিউবওয়েল-এ চা ছাড়া মিষ্টজল নেই। ওষুধের অভাব। খাদ্য সংগ্রহের পথেও বিস্তর বিঘ্ন। রাজ্য সরকারের বনবিভাগ মরিচঝাঁপির বসতি সম্পর্কে গোড়া থেকেই উদ্বিগ্ন। তাদের আশঙ্কা সংরক্ষিত অঞ্চলের বহু গাছ বসতির মানুষেরা কেটে ফেলছে, আরও ফেলবে। বসতিও সংরক্ষিত বনঅঞ্চলে আরও ছড়িয়ে যাবে। উন্নয়নশীল সমিতি অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন পশ্চিম বঙ্গে যেমন আরও বহু জবরদখল উদ্বাস্তু-কলোনী গড়ে উঠেছে এবং তাদের সরকারী স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে, মরিচঝাঁপিকেও সেই পর্যায়ে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

কিন্তু মরিচঝাঁপির অভিযাত্রীদের অর্থনৈতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা-প্রচেষ্টার কে মূল্য দেবে? দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য সকল রং-এর সরকারেরই কাম্য স্বয়ং-নিযুক্তির মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের জন্য দেশের যুবশক্তি উদ্বুদ্ধ হোক। কিন্তু মরিচঝাঁপির সহায়-সম্বলহীন সমাজের নিম্নতম স্তরের দরিদ্র মানুষগুলি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার যে আয়োজন করেছিলেন, রাজ্য সরকার সেগুলি ধ্বংস ক'রে দিলেন। তার একমাত্র কারণ সুন্দরবনে এই দণ্ডকারণ্য-আগত বাস্তু-ত্যাগীদের স্থান হবে না। যে কোনোভাবেই হোক দণ্ড-কারণ্যে তাদের ফেরৎ পাঠাতে হবে—প্রয়োজন হ'লে জোর জবরদস্তির পথ নিতেও রাজ্যসরকার পেছ-পা হবেন না।

তারা পেছ-পা হনও নাই। রাজ্যসরকার মরিয়া হয়ে এই নিরীহ মানুষগুলিকে মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত করবার দুরন্ত অভিযান সুরু করলেন ১৯৭৯-এর ২৪শে জানুয়ারী থেকে। সে যেন এই নিরাশ্রয় তপশীলজাতি মানুষগুলির বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ সুরু হয়ে গেলো—একেবারে 'টোটাল ওয়ার'। ৫০টী লঞ্চ এবং মাত্রাতিরিক্ত পুলিশ দিয়ে মরিচঝাঁপির ছোট দ্বীপটী ঘিরে ফেলে এমন অবরোধের সৃষ্টি করা হোলো যে এক কণা দানা কিম্বা এক বিন্দু জলও সেই অবরোধ ডিঙিয়ে মরিচঝাঁপির হতভাগ্য অধিবাসীদের কাছে না পৌঁছাতে পারে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। মরিচঝাঁপির অবরুদ্ধ দ্বীপবাসীরা ৪৩ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন, যারা অনাহারে ও জলতৃষ্ণায় প্রাণ হারিয়েছেন। আরও ১৯ জনের তালিকা দিয়েছেন, যাদের বিভিন্ন রোগে মৃত্যু হয়েছে। অনাহারে মৃতকল্প মানুষগুলি গাছের পাতা; ঘাসের শিকড় খেয়ে প্রাণধারণের চেষ্টা করেছেন। তৃষ্ণায় তাড়িত হয়ে ২৮শে জানুয়ারী মরিচঝাঁপি দ্বীপের কিছু সংখ্যক নারী অধিবাসী অবরোধ ডিঙিয়ে নদীর অপরপারে কুমীরমারিতে জলসংগ্রহের জন্য পৌঁছাবার চেষ্টা করলে পুলিশ লঞ্চগুলি প্রচণ্ড আঘাতে নৌকাগুলি ভেঙে ফেলে তাদের জলে ফেলে দেয় এবং পরে তাদের ওপর টীয়ারগ্যাস ছুঁড়তে থাকে। পরের দিনও তা অব্যাহত থাকে। ৩০শে জানুয়ারী টীয়ার গ্যাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ৩১শে জানুয়ারী প্রবল বর্ষণের মত টীয়ারগ্যাস মরিচঝাঁপির অগুণতি নরনারীর উপর বর্ষিত হয়। খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের জন্য সাহসে ভর করে মরিচঝাঁপির যে

সব নরনারী নৌকা নিয়ে নদীর পারে যাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন তাদের নৌকাই শুধু ডুবিয়ে দেওয়া হ'লে না, টিয়ার গ্যাসে তাদের পর্যুদস্ত করা হোলো। সেদিন শুধু টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েই পুলিশ ক্ষান্ত থাকেনি। গুলিও ছোঁড়ে যার ফলে মরিচঝাঁপির অধিবাসীদের দাবী তাদের অন্তত ত্রিশজন নিহত হয়েছেন। আর নৌকা ডুবে যাবার ফলে যারা জলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্তত ১২৮ জন নিখোঁজ। এদের নাম-ধাম দিয়ে মরিচঝাঁপির অধিবাসীরা তালিকা প্রকাশ করেছেন। তারা আরও অভিযোগ করেন যে, যাদের নৌকা ভেঙ্গে জলে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে ৪ জন নারী-অধিবাসীকে চুলের মুঠি ধরে পুলিশ জল থেকে টেনে তুলে বাগ্‌না রিজার্ভ ফরেষ্ট ক্যাম্পে নিয়ে মর্মান্তিক হানি করে।

মরিচঝাঁপিতে অন্তত ছয় হাজার শিশু রয়েছে। তাদের অভুক্ত রেখে, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করেই কি মরিচঝাঁপির পুলিসী অবরোধের আর কি-ই বা পরিণতি হতে পারে—এবার পশ্চিম বাংলায় আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ পালনের ভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছে? সে-ও এক বিস্ময়। মরিচঝাঁপিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যদের, সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের প্রবেশ নিষেধ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি গোপন করতে চাইছিলেন? দণ্ডকারণ্য-প্রত্যাগত বাস্তুত্যাগীদের ওপর পুলিশী অত্যাচার গোপনের জন্যই কি এই নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু অত্যাচার, পীড়ন তারা গোপন রাখতে পারেন নাই। তাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই বিধান সভার সদস্যরা এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ১১ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯-এ মরিচঝাঁপি যান। ফেরবার পথে বিধান সভার সদস্যদের বিশিষ্টরাজনীতিবিদদের এবং সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ক'রে পশ্চিম বঙ্গ সরকার আর এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সাংবাদিকদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের গ্রেপ্তার ক'রে দেশে এমার্জেন্সীর সময় ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণকেও পশ্চিম বঙ্গ সরকার হার মানিয়েছেন।

মরিচঝাঁপির অধিবাসীদের প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্যরা তীব্র ভাষায় মরিচঝাঁপি অবরোধের নিন্দা করে মরিচঝাঁপির মানুষকে অনশনে, বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুবরণে বাধ্য করার ঘটনাকে "ক্ষুদে জালিয়ানওয়ালাবাগ" রূপে অখ্যায়িত করেছেন। মরিচঝাঁপি সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অবরোধের নীতির বিরুদ্ধে আলোড়নের ফলে জনতা দলের সংসদীয় দল, জনতা দলের এম. পিদের নিয়ে তিন-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মরিচঝাঁপির তথ্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করেন। ২১ শে মার্চ ১৯৭৯-এ তারা কলকাতায় পৌঁছে রাজ্যপাল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের বিভিন্ন দলের বিধান-মণ্ডলীর এবং রাজ্যের জনতা দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। পর দিন ২২ শে মার্চ রাজ্য জনতা দল আয়োজিত ব্যবস্থাপনায় তারা মরিচঝাঁপি পরিদর্শন করে ২৩ শে মার্চ দিল্লী ফিরে যান। মরিচঝাঁপি যাবার পথে কয়েকবারই পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের লঞ্চ নদীতে অবরোধ সৃষ্টি করে, যার ফলে প্রতিনিধিদল পুলিশী আচরণের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে দিল্লী ফিরে গেছেন। মরিচঝাঁপির অধিবাসীদের ৩১ শে মার্চের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবার মেয়াদ ৩১ শে মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে, তিন-সদস্য-বিশিষ্ট সংসদীয় প্রতিনিধিদের রিপোর্ট'ও পেশ করা হয়ে যাবে।

সুন্দরবন সম্বন্ধে আর একটি দিকও বিবেচনার রয়েছে। সুন্দরবনে আর বসতির সুযোগ নাই, এটাই সরকারী প্রচার। সুন্দরবনের ৯১৩০ বর্গ কিলোমিটারের শতকরা ৪৪ ভাগ বনাঞ্চল। সারা ভারতের গড় বনাঞ্চল শতকরা ২২ ভাগ, পশ্চিম বাংলার এই গড় শতকরা ১৩ ভাগ। আর শতকরা ৩৩ ভাগ বনাঞ্চলের সীমানা সুষ্ঠ মানরূপে স্বীকৃত। সুন্দরবনে প্রায় ২ লক্ষ লোকের বাস (১৯৭১ লোকসংখ্যা)। সুতরাং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২০০ লোক বাস করেন। মরিচঝাঁপির ৬০০০ অনুন্নত সম্প্রদায়ের পরিবারের জন্য প্রয়োজন ১৫০ বর্গ কিলোমিটার, সুন্দরবনের সংরক্ষিত শতকরা ৪৪ ভাগ বনাঞ্চল থেকে সামান্যভাগ মাত্র জমি নিয়ে মরিচঝাঁপির অধিবাসিদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থাপনা অসম্ভব নয়। বনাঞ্চল মাত্র সামান্যতম শতকরা ভাগ হ্রাস পেলে সুন্দরবনের পরিবেশগত (ecological balance) ভারসাম্য বা সংহতি বিনষ্ট হবে না।

১০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা ৭০০০০৪ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র বিশ্বাস, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা) —এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

প্রকাশের অপেক্ষায় আরো বই

চারনিক

ঐ মহামানব আসে

B. N. Bardhan

LEARN JAPANESE

N. N. Ghosh

JEWELS OF ASIA

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	২০ ০০
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১২ ০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭ ০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫ ০০
Srimad Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
নিত্যপাঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১ ৫০
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks (ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

"শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী জাতীয় সম্পদ।

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

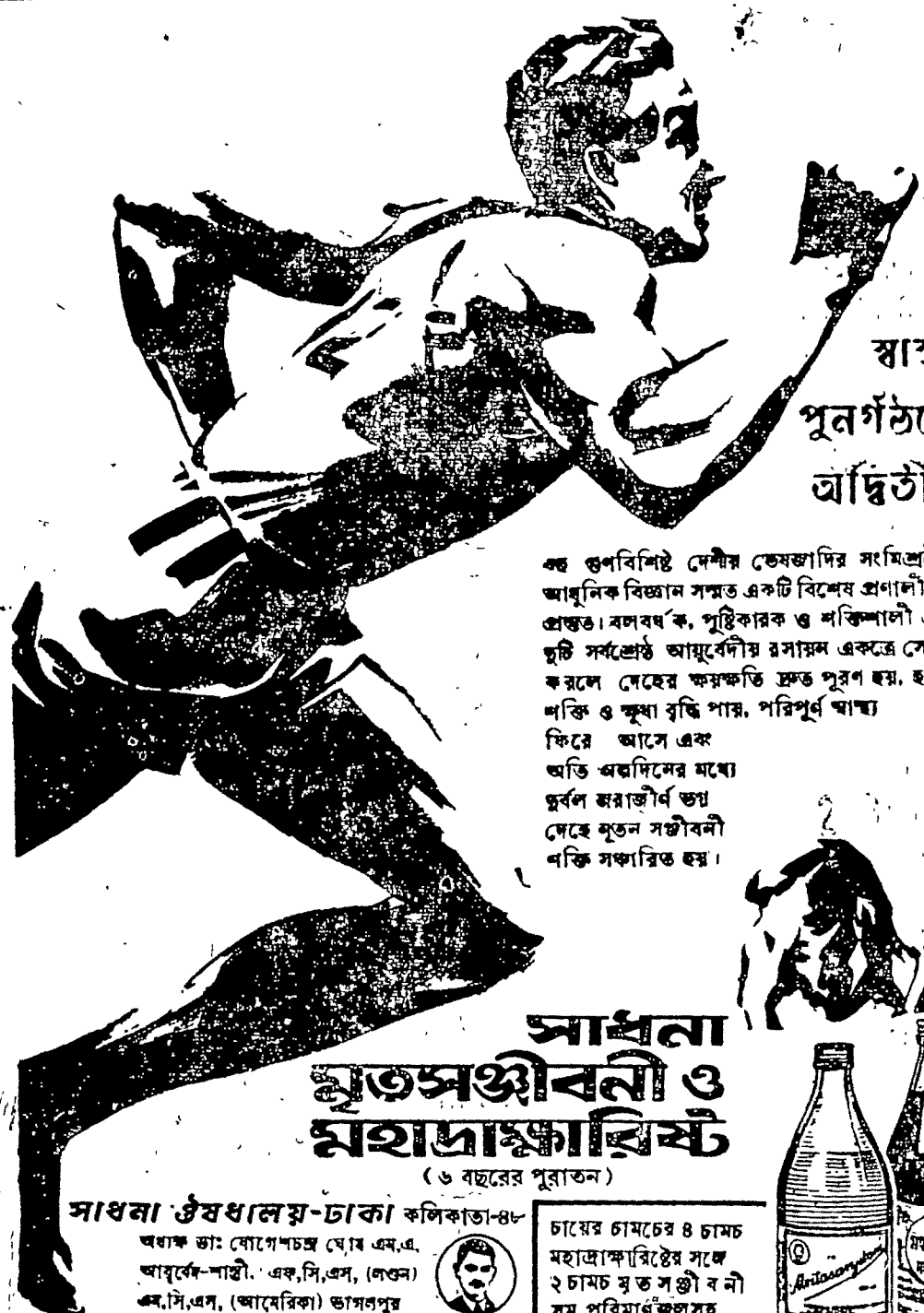

স্বাস্থ্য পুনর্গঠনে অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) ও আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SAM-2/84

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Re. 1·00 with Regd. Postage Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116

সম্পাদক—সুনীল দাস

চৈত্র সংখ্যা : ১৩৮৫

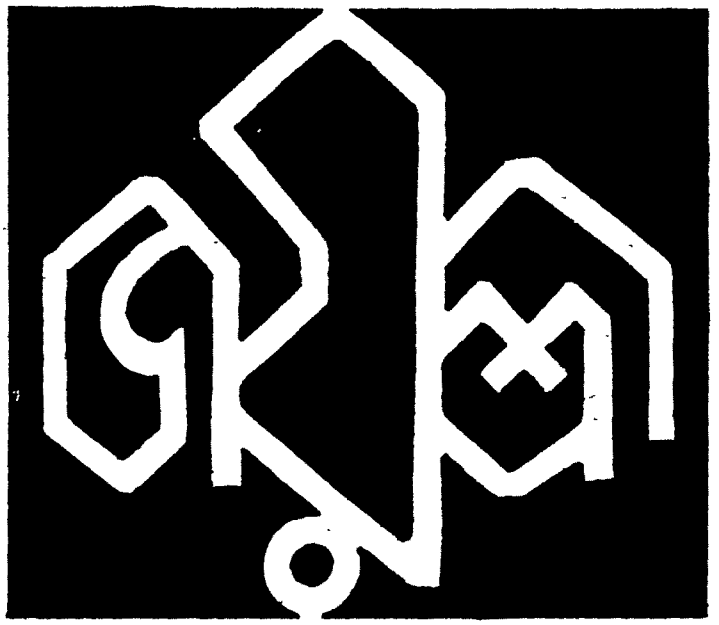

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা

লীলা রায়

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠছে এই খণ্ডগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশ-নায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার সদম্ভ জবাব বাংলায় ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা। যাঁরা আজও গ্রাহক হননি তাঁরা এককালীন ১২০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন।

'সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা—বিশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁহার অভিভাষণ প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সাগ্রামের প্রধান সেনাপতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য 'জয়শ্রী প্রকাশন' ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

'বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়—তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর লেখা-তাঁর কথা, সবই যেন একসূত্রে গাঁথা। সত্যরঞ্জন বক্সী

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

জয়শ্রী সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা
৪৩ বর্ষ চৈত্র। ১৩৮৫ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ঘটনা ও রটনা ৬৮১

স্মৃতি-তর্পণ ৬৬৮

স্মৃতিকথন : ধারাবাহিক

যে কথার শেষ নাই ৬৮৯
গোপাললাল সান্যাল

আলোচনা

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক
অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য্য ৬৯৪

প্রবন্ধ

কবিতা : স্পষ্ট, অস্পষ্ট ইত্যাদি
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ৬৯৮

সাহিত্য-সমালোচনা

ইচ্ছাকলম
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০২

কবিতা

দেখা হলেই : শঙ্কর ব্রহ্ম ৭০৭
খোঁজাখুঁজি : দিব্য মুখোপাধ্যায় ৭০৭

আলোচনা

অধ্যাত্ম সাধন-মার্গে ভারতীয় নারী
রুচিরা মুখোপাধ্যায় ৭০৮

বর্ষসূচী

বৈশাখ—চৈত্র : ১৩৮৫ ৭১৩

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
সম্পাদক : সুনীল দাস

চাঁদা শেষের বিজ্ঞপ্তি

চৈত্র ১৩৮৫, যাঁদের গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ ফুরোলো, তাঁদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে, চৈত্র সংখ্যা প্রাপ্তির সঙ্গে তাঁদের দেয় চাঁদা জয়শ্রী কার্যালয়ে জমা দিতে নতুবা বৈশাখ ১৩৮৬ সংখ্যা ভি. পি. করা হবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার
জয়শ্রী

চাঁদার হার

বার্ষিক। ১২·০০ ষান্মাসিক। ৬·০০

Bank Draft বা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠানো চলে।

জয়শ্রী

বৈশাখ। ১৩৮৬

বহুভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভাষার পারস্পরিক আদান-প্রদান জাতীয় সংহতিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে। এবারকার সাহিত্য সংখ্যা তাই নিবেদিত—

'ষাট দশক উত্তর আঞ্চলিক ভাষায় ছোটগল্পের গতি প্রকৃতি'

প্রসঙ্গে

Trends in Modern Marathi Literatrue (1958-78)
Dr. Prabhakar Machwe

The Evolution of Malayalam Short Story : Prof. M. Achuthan

গুজরাতি সাহিত্য : নলিন প্যাটেল

গুজরাতি ছোটগল্প : ষাট দশকের আগে-পরে : আর্যদেব

মারাঠী ছোটগল্পের দু চার কথা : রেবতী কুন্ডু

ষাট দশক থেকে মালয়ালাম সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি : নিলীনা আব্রাহাম

বিশ বছরের তেলুগু সাহিত্য : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

ওড়িয়া ছোটগল্প : অধ্যাপক ষড়ানন মহান্তী

উর্দু ছোটগল্প : শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য

আঞ্চলিক সাহিত্য ও অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিবাসী সাহিত্য : ড. শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প : ড. রমেন নাগ

এছাড়া

অসমীয়া, তামিল, হিন্দি, ছোটগল্প প্রসঙ্গেও আলোচনা থাকবে।

দাম : চার টাকা

চতুরঙ্গ

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ । ১২শ সংখ্যা । চৈত্র ১৩৮৫

ঘটনা ও রটনা

অবশেষে পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর রাওয়ালপিণ্ডি ডিস্ট্রিক্ট জেলে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৯-এর শেষ রাত্রির নিঝুম নির্জনতায় ৫১ বছর বয়সে ফাঁসি হয়ে গেলো। পাকিস্তানের জল্লাদ তারা মাশিস ভুট্টোর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবার পরই ফাঁসির আঙিনায় উপস্থিত বিচারকের 'হাঙ্গ' ধ্বনির সঙ্কেতের সঙ্গেই ভুট্টোর পায়ের নীচের তক্তা সরে গেলো, তার দেহ চল্লিশ ফুট নীচের গহ্বরে সবেগে নেবে গেলো। ১৯৭৮-এর ৮ই মার্চ লাহোর হাইকোর্টে ভুট্টোর প্রাণদণ্ডাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৭৭-এর ৫ই জুলাই পাকিস্তানের সেনাধিনায়ক জেনারেল জিয়াউল হক্ সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করে ভুট্টোকে গ্রেপ্তার করে এবং সে-বছর সেপ্টেম্বর মাসে ভুট্টোর বিরুদ্ধে ১৯৭৪-এর ১০ই নভেম্বর ভুট্টোর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আহমেদ রাজা কাসুরীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের এবং কাসুরীর পিতা নবাব মহম্মদ আমেদ খানের হত্যার দায়ে লাহোর হাইকোর্টে মামলা সুরু হয়। অদৃষ্টের পরিহাস ১৯৭৬-এর মার্চে জেনারেল জিয়া-উল-হককে সাতজন সেনানায়কের দাবী ডিঙিয়ে ভুট্টোই প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।

পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের ৭ জন বিচারক ভুট্টোর আপিল বিচার করে ৪-৩ ভোটে ভুট্টোকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ১৯৭৯-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভুট্টোর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল রেখে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সেই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার জন্ত ভুট্টোর আইনজীবীরা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। ১৯৭৯-এর ২৪শে মার্চ পুনর্বিবেচনার আবেদন সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করলেও, প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ভুট্টোর প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানেরা করুণা প্রদর্শনের সুপারিশ করেন। জেনারেল জিয়া-উল-হক বিশ্বের বড়ো বড়ো রাষ্ট্রপ্রধানদের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে দ্রুত ভুট্টোর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করেছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করবার যুক্তি দিয়ে ভুট্টোর প্রাণরক্ষার জন্ত কোনো আবেদন করা হয় নাই। এটা বাস্তব সত্য যে ভুট্টো তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করবার জন্ত যে কোনো পন্থা অবলম্বনে—তা যদি হীনও হয়—পেছ-পা হন নি। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের মতো বর্বরোচিত ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মূল্যমানের ক্ষেত্রে, বরদেয় সময় এসেছে কিনা সেটাই বিচার্য। এই নিরিখেই ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড বিষয়টিও বিচার সাপেক্ষ। ভুট্টোর ফাঁসি পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে বিলম্বে হলেও ঝড় তুলবে। জিয়া-উল-হক নির্বাচন ঘোষণা করে তা লামলাতে চাইছেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এতো দাঙ্গা বেধে উঠছে কেন? সিডিউল্ড ট্রাইব, সিডিউল্ড কাস্ট, মাইনরিটিজ কমিশন—সব রকম আয়োজন রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলিগড়, জামশেদপুর-এ দাঙ্গা হয়ে গেলো কেনো? জামশেদপুরের দাঙ্গা তো প্রচণ্ড বেগে ও ব্যাপকভাবে হয়েছে, আলিগড়,

দাদরী সেখানকার দাঙ্গার ঘাত-প্রতিঘাতও উপেক্ষণীয় নয়। কোন্ স্বার্থসন্ধ মানুষেরা এই জঘন্য অপরাধে লিপ্ত রয়েছেন, সেটা যেমন খুঁজে বার করতে হবে, তেমনি এই ধরণের ঘটনার পাশাপাশি নানা উত্তেজক ঘটনাও না দেখা দেয়, সে সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রকৃতির ঘটনা ও ঘটনার গ্লানিকর পরিণামের সচেতনতাও যেন অবরুদ্ধ হয়ে গেছে—এই ধরণের মানসিকতা আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় পেয়ে লালিত হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান অবিচল থাকুক, কিন্তু মানবতাবিরোধী গ্লানিকর আবর্তের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে আমরা আমাদের অখণ্ড জাতীয়-মানসে যেন চিড় না ধরাই। এই সাবধানবাণীকে সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মনে লালন করতে হবে, পরিপোষণ করতে হবে। আর যারা এই স্বকীয়ভূমি থেকে স্খলিত হয়ে জাতিকে অকল্যাণকর, অন্তত পারিপার্শ্বের দিকে ঠেলে দিতে চাইবে, ক্ষমাহীন সঙ্কল্প নিয়ে যেন তাদের দমন করতে পারি। এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এ-ধরণের ঘটনাকে স্বার্থসন্ধ মহল সাম্প্রদায়িক মোড় দেবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে উদ্যোগী রয়েছেন। সেজন্যই এই ঘটনাসমূহের নিরপেক্ষ এবং আশু তদন্ত ক'রে তাঁর দ্রুত কারণ নির্ণয় ক'রে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধান করতে হবে।

ভারতবর্ষে কোনও কোনও রাজ্যে এক নূতন আলোড়ন দেখা দিয়েছে। এটা শুধু আলোড়নই নয়, একে 'পুলিস বিদ্রোহ' বললেও বেশী বলা হবে না। পাঞ্জাব, হরিয়ানায় এই আলোড়নের ঢেউ প্রথম আক্রমণ করেছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে এই পুলিশ-বিদ্রোহ সামলাবার চেষ্টা হয়েছে, তারপর বহু পুলিশকে বরখাস্তও করা হয়েছে এবং সব শেষে তাদের বেতন, ভাতা বৃদ্ধি করে তাদের কর্মজীবনের অসন্তোষের ঢলে বাঁধ দেবার উদ্যোগ হয়েছে। মধ্যপ্রদেশও এই আলোড়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে, রাজস্থানও যে কোনো সময় এই আবর্তের টানে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। পুলিশ-বিদ্রোহের পেছনে শুধু অর্থনৈতিক কারণ কাজ করেছে তা নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক কারণও এরই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আজকাল শিক্ষিত ছেলেরা পুলিশের কাজে যোগ দেন। সমাজ-জীবনে তাদের প্রত্যাশা রয়েছে তারা কর্মজীবনে কেবলমাত্র হুকুমবরদারী করবেন না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হবেন না, মানবীয় মর্যাদার স্পর্শ পেয়ে কর্তব্যকর্মে এগিয়ে যাবেন—এটাই তাদের প্রত্যাশা। বলাই বাহুল্য সেই সঙ্গে বেতন-ভাতা-বাসস্থানগুলিও তাদের জীবনের মূল্যকে স্বীকৃতি দেবে, এ-ও তাদের প্রত্যাশা! সিপাহীদের কর্তব্যের কাঠামোর যে কত পরিবর্তন হয়েছে, সে-সম্পর্কে তাদের উর্ধ্বতন স্তর আদৌ অবহিত নন। তাঁরা এখনও তাদের নিম্নস্তরের মানুষরূপেই গণ্য ক'রে, সিপাহীদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দেন।

সব চাইতে অবাক লাগে কংগ্রেস-শাসকদের মৌরসীপাট্টা খতম হবার পরও, নূতন যাঁরা কেন্দ্রে কিম্বা রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা গত দুই বছরে পুলিসদের কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনাগুলির পরিবর্তন সাধন করে তাদের কর্মজীবনের রূপান্তর ঘটালেন না কেন? কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল ধরমবীর-এর সভাপতিত্বে জাতীয় পুলিস কমিশন গঠন করেছেন। তাদের মধ্যবর্তীকালীন সুপারিশও কেন্দ্রের নিকট কমিশন দাখিল করেছেন। পুলিসের কর্মক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা নিঃসন্দেহে একটি অনিবার্য সর্ত। তাই পুলিশের কাজে যারা নিয়োজিত তারা সামান্যতম অজুহাতেই সেই সর্ত ভেঙে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে না। চরম শাস্তির ঝুঁকি নিয়ে অনন্যোপায় হয়ে তারা শৃঙ্খলা ভাঙবার কথা ভাবতে পারেন। একজন কনেস্টবলের সঙ্গে পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল-এর বেতনের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে লোকসভার সদস্যরা কেউ বলেছেন এই পার্থক্যের হার হবে ১ : ১০০। কেউ বলেছেন ১ : ৫০। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এতোটা স্বীকার না করলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন এই প্রভেদের হার ১ : ২০ তো হবেই। এই পুলিস বিক্ষোভের পেছনে বিরোধী দলের কেউ কেউ রয়েছেন—এই অভিযোগ পাঞ্জাব সরকারের। বিক্ষোভের সঙ্গত কারণ না থাকলেও অকারণে বিরোধী দলগুলির প্ররোচনায় পুলিস নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে রাস্তায় নেমে পড়বেন—এটাও একেবারে অযৌক্তিক কথা। আসলে এদের দিকে ইতিপূর্বে নজর দেবার প্রয়োজন

বোধ করেন নাই, বিভিন্ন রাজ্য-কর্তৃপক্ষ। অথচ এরাই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার মেরুদণ্ড। এদের সংঘ গঠনে বাধা দান, ইউনিয়ন গঠনে অস্বীকৃতি, ইংরেজ আমলে চলতো। সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রাম যে-সময় বেগবান হয়ে উঠেছে সে-সময় এই বাধা-নিষেধ এদের স্বাধীনতার পক্ষেই অন্তরায়রূপে কাজ করে।

জনতা দলের অন্তর্বিরোধ মিটছে না। ছয়-প্রধানের কমিটি, পার্লামেন্টারী বোর্ড, জাতীয় পরিষদ—সবই হিমসিম খেয়ে গেছে। অবশেষে দুইটি সংগঠনের সদস্য থাকা চলবে কিনা (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও জনতা দলের); সাংগঠনিক নির্বাচন হবে কিনা এবং নিয়মশৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে—এই সব সমস্যা মীমাংসার ভার প্রধান-মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সদস্যদের মধ্যে মতভেদের তীব্রতার ফলে সম্মিলিত আলাপ-আলোচনা মীমাংসার আশা ত্যাগ ক'রে প্রধানমন্ত্রীকেই সবাই সালিশ মেনে নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত জনতা দলের ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ নয়। সমবেত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা যত বেশী কমে যাবে জনতা দলের পারস্পরিকতা তত বেশী লুপ্ত হবে। তাছাড়া, এই সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রধান মন্ত্রীর মতটাই দলে প্রধান হয়ে দাঁড়াবে। জনসঙ্ঘ ও বি, এল, ডি'র বিরোধে প্রধান মন্ত্রী দ্বৈত-সদস্যপদের বিরোধী নন। অর্থাৎ যিনি জনতার সদস্য হবেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘেরও সদস্য হতে পারেন। চরণ সিং ও প্রাক্তন বি, এল, ডি'র এই দ্বৈত-সদস্যপদের বিরোধী। এঁরা সাংগঠনিক নির্বাচনেরও বিরোধী, প্রধান মন্ত্রী অবশ্যি নির্বাচনের পক্ষপাতী। নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্যাটি জটিল। এই খড়্গের আঘাত সব গোষ্ঠীর ওপরই পড়বে। কারণ সব গোষ্ঠীর সদস্যরাই এই অপরাধে অপরাধী।

৮ই মে থেকে কয়লাখনির শ্রমিকদের ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার করা হয়েছে। দুইদিন আলোচনার পর মজুরী নিয়ে মীমাংসা হওয়ায় পাঁচটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কয়লাখনির জন্য বর্তমানে মাসে ৪৩৮ টাকার নিম্নতম মজুরীর পরিবর্তে নূতন নিম্নতম মজুরীর হার মাসে ৫১২ টাকা নির্দিষ্ট হয়েছে। এ-ছাড়া কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্য স্থির হয়েছে: (১) শতকরা ৫ ভাগ মাটির নীচে খাদের কাজের এলাউয়েন্স, (২) বাড়ীভাড়া বাবদ ন্যূনতম মাসিক ১২ টাকা এলাউয়েন্স, (৩) ২১ দিনের ক্যাজুয়েল ছুটি, (৪) গ্রুপ ইনসিওরেন্স পরিকল্পনা চালু করা, (৫) বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ। ১৯৭৯-এর ১লা জানুয়ারী থেকে এই চুক্তি কার্যকর হবে। একজন কয়লা খাদের শ্রমিকের নিম্নতম মূল বেতন হবে ৩৯০ টাকা, এ ছাড়া উপস্থিতির জন্য বোনাস পাবে ৩৯ টাকা, মহার্ঘ ভাতা পাবে ৭৬ টাকা এবং উপস্থিতি বোনাসের সুযোগ বাবদ ৭ টাকা।

৬ লক্ষ কয়লাখনির মজুর এই চুক্তিতে অতিরিক্ত ১১৬ কোটি টাকা পেলেন। Coal India'র বর্তমান মজুরীর বাবদ ব্যয় ছিল ৪৮০ কোটি টাকা। এই চুক্তির ফলে প্রতি টন কয়লার উৎপাদন ব্যয় ১২ টাকা বৃদ্ধি পেলো। অর্থাৎ পূর্বেকার টন প্রতি ২১ টাকার পরিবর্তে দাম বেড়ে ৩৩ টাকা দাঁড়ালো। ১৯৭৩-এর জানুয়ারীতে জাতীয়করণের পর প্রথমবার কয়লার দাম বাড়ানো হয় ১৯৭৪-এর ১লা এপ্রিল। সে সময় টন প্রতি দশ টাকা বাড়িয়ে মজুরীবৃদ্ধির ঝোঁক সামলানো হয়েছিল। ১৯৭৫-এর ১লা জানুয়ারী দ্বিতীয়বার কয়লার টন প্রতি ১৭·৫০ টাকা হারে মূল্য-বৃদ্ধি করা হয়, মজুরী বৃদ্ধি ইত্যাদি সামলাবার জন্য। এবারও কয়লার দাম বৃদ্ধির জন্য শক্তি মন্ত্রককে ক্যাবিনেটের দ্বারস্থ হতে হবে। এদিকে ধান-উৎপাদক রাজ্যগুলি ধান-সংগ্রহের মূল্য বৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য কৃষি-মূল্য নির্ধারক কমিশন (Agricultural Prices Commission) ধানের কুইন্টাল প্রতি সংগ্রহ মূল্য ৯০ টাকা ধার্য করেছেন। এদিকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে দাবী উঠেছে ধানের সংগ্রহ মূল্য (গড় ভাল ধানের) কুইন্টাল প্রতি ১১৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু ধানে ঘাটতি রাজ্যগুলি সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির বিরোধী। তারা চায় ৯৫ টাকা কুইন্টাল প্রতি দামের বেশী মূল্য যেন ধার্য না করা

হয়। পশ্চিমবঙ্গ চাইছে এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস কমিশনের ধার্য-মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৯০ টাকাই রাখা হউক। ঘাটতি রাজ্যগুলি তো রেশন দোকান থেকে বিক্রয় মূল্য (Issue Price) বৃদ্ধির ঘোরতর বিরোধী। চাউলের বর্তমান বিক্রয় মূল্য (Issue Price) কুইন্টাল প্রতি মোটা দানা চালের জন্য ১৩৫ টাকা এবং মিহি চালের জন্য ১৭২ টাকা। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ভরতুকি দিয়ে ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে এই বিক্রয় মূল স্তর রাখা হয়েছে। ক্রয় মূল্য (Procurement price) এবং রেশন দোকান থেকে বিক্রয় মূল্যের (Issue price) মধ্যে প্রভেদ বর্তমানের মত ১৫ থেকে ৩০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ক্রয় মূল্য (Procurement Price) বৃদ্ধি পেলে বিক্রয় মূল্যে তার অন্তত ৫০ ভাগ প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তার অর্থই হোলো বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি।

আমাদের অর্থনীতিতে সব কারণ মিলিয়ে মূল্যবৃদ্ধির চাপ আসছে। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছে। বাজেটে ছয়শত কোটি টাকার ওপর ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, ভারত সরকারের অর্থ-মন্ত্রক সে-কথা স্বীকার না করলেও, বাজেটের পর দুই মাসে প্রায় শতকরা ৭ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। সেই স্তর অনায়াসেই শতকরা ১০-এ পৌঁছে যাবে। আর্থিক কাঠামোতে টাকার সঞ্চালন বৃদ্ধিও মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকবে। তাছাড়া বাজেটে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার ঘাটতি, ফাঁপাই মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধিই বা কেন ঘটাবে না? তাই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে অনুৎপাদক এবং অনাবশ্যক ব্যয় সঙ্কোচ অবিলম্বে প্রয়োজন। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচের পথ প্রদর্শনের জন্য অর্থমন্ত্রী, লোকসভার সদস্য শ্রী এস, এন, মিশ্রের সভাপতিত্বে একটি ব্যয় সংক্রান্ত কমিশনও গঠন করেছেন।

ভারত সরকারের বার্ষিক ২৮,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কোন্ দিকে সঙ্কোচন করলে মুদ্রাস্ফীতি হবে না সেটা প্রধান মন্ত্রী, প্ল্যানিং কমিশন, অর্থমন্ত্রী, এঁরা সবাই ভাবছেন—কোন্ দিকে এই বিপুল পরিমাণ বার্ষিক ব্যয় ছাঁটাই করা যায়। প্ল্যানিং কমিশন ভাবছেন ২০০০ কোটি টাকার মতো ব্যয় কমাতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু এই পরিমাণ ব্যয়-সঙ্কোচনের খড়্গ কোথায় পড়বে? ভারত সরকার বাজেটের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর যে ভরতুকি দিচ্ছেন, তার সবটাই কী সঙ্গত বা প্রয়োজন? তার পরিমাণই বা কত? কারণ হিসাবে ১৯৫৪-৫৫ সালে এই ভরতুকির পরিমাণ ৭ কোটি টাকা থেকে গত বছর ১১৭২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিলো। এই হিসাবেই বলা হয়েছে ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে নির্ধারিত ব্যয়ের মাত্রাকে বর্তমান ভরতুকির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং তা ১৯৭৮-৭৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ব্যয়ের শতকরা ৬ ভাগ। খাদ্য এবং রপ্তানীর ভরতুকির জন্য মোট ভরতুকির তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় হয়। কিন্তু এই দুই খাতে ভরতুকির কী আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? কারণ খাদ্যের মজুদের বহর প্রচুর, ভাল ক'রে গুদামজাত রাখবার ব্যবস্থাও নেই এবং বৈদেশিক মুদ্রায় সঞ্চয়ও বেশ মানানসই। সুতরাং খাদ্য ও রপ্তানী বাবদ বছরে ১২০০ কোটি টাকার ভরতুকি দিয়ে জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিত্তবান যারা, তাদের বিত্তের সঞ্চয় বৃদ্ধির সুযোগ ক'রে দেওয়া কী অনিবার্য? সারের জন্য ৪৪৮ কোটি টাকার ভরতুকি দেওয়া হয়। এর সবটার সুযোগই কী গরীব কৃষকের ঘরে পৌঁছায়? এটা ভাববার কথা? না, গরীব কৃষকের নামে বিত্তশালী কৃষক, আমলারা অকারণ সরকারী দাক্ষিণ্যের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

ব্যয় কমাবার কথা উঠতে পারে প্রতিরক্ষা দপ্তরে, যেখানে বাজেটের শতকরা ত্রিশ ভাগ ব্যয় হয়। সেখানে কী হাত দেওয়া সম্ভব? রব উঠবে, না, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গেলো, গেলো!

মাদক বর্জনের খেসারতও কম নয়। প্ল্যানে ৪০০ কোটি টাকা এ-বাবদ বরাদ্দ রয়েছে। নৈতিকতার দিক থেকে মাদক বর্জনের প্রস্তাব অনস্বীকার্য। কিন্তু মাদক-বর্জনের পূর্বে প্রতিটি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, নিরন্নের জন্য দুমুঠো খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে—এই অগ্রাধিকার চাই, নিরক্ষরদের মধ্যে সাক্ষর-জ্ঞান সঞ্চারিত করতে হবে।

লোকসভার সদস্যরা, মন্ত্রীদের সমেত, কতটা কর্তব্য-সচেতন তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে, সংবিধানের ৪৬তম

সংশোধনীর স্বপক্ষে ভোট দেবার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যদের সভাকক্ষে খুঁজে পাওয়া গেলো না। অথচ দিল্লীতে সে-সময় বহু সংখ্যক সদস্য হাজির রয়েছেন। সরকারী দলের হুইপ কি তাঁর ছড়িটা ধাপে ভরে রেঃ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন? এবারকার লোকসভায় বিচিত্র নজীর সৃষ্টি হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এখানেও উল্টো-রথের নজীর জমে উঠছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বোর্ড—এইসব সংস্থার প্রশাসকদের, বলতে গেলে, ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করে পশ্চিম বাংলায় শাসকেরা এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দলীয় সদস্য কিম্বা সমর্থক নিযুক্ত করেছেন। শিক্ষার পাঠক্রমে ও শিক্ষাসূচীতে রদ-বদল করে নৈরাজ্যের পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন শাসকেরা। তাছাড়া প্রাথমিক স্তরে ভাষা ঐচ্ছিক ক'রে, ভাষার নৈরাজ্যও সৃষ্টি করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে কোনো কোনো স্থানে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। শাসকদের দলীয় পোষকরা তাদের প্রতিপক্ষকে নির্মম অত্যাচারে হতাহত করছে। কিন্তু আক্রান্তদের রক্ষা করবার জন্য আইনের বাহু প্রসারিত হচ্ছে না, পুলিশ কোথাও নিষ্ক্রিয় থাকছে, কোথাও বা অত্যাচারীর শরিক হয়ে আক্রান্তদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিম্বা আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করা দূরে থাকুক আক্রান্তদের গ্রেপ্তার করছে। নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিতে শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, গ্রামাঞ্চলে এই দলের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এনে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পাবে—সেতো বিধিসম্মত ব্যবস্থা। কিন্তু পঞ্চায়েতের ক্ষমতার অঙ্কুশ দিয়ে যদি বিরোধীপক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করা সুরু হয়, অহরহ সন্ত্রাস ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যদি কেবলই বেঁচে থাকার মহড়া নিতে হয়, সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। গত এক বছরে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একটি অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, সরকারের ভূমিনীতিকে ঘিরে। সরকার বর্গাদারদের নাম তালিকাভুক্ত করছেন। পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারদের সংখ্যা প্রায় বত্রিশ লক্ষ। এদের মধ্যে আট লক্ষ মাত্র তালিকাভুক্ত ছিলেন। সরকারী নীতি অনুযায়ী শাসকদলের অনুরাগী ভূমিহীনদের বর্গাদারের প্রতিষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে, জোর-জবরদস্তি অপরের জমিতে। অনেক সময় এক বর্গাদারের জমিতে নূতন বর্গাদারকে তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে, নূতন বর্গাদাররূপে যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে তিনি আদৌ ঐ জমির বর্গাদার নন, হয়তো কোনো জমিরই নন। দলের জোর, লাঠির জোর, প্রশাসনের জোর, সংখ্যার জোর— সব মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে এই ভাবে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে ভূমি-সংক্রান্ত নীতির মূল্যায়নে 'লাঙল যার, জমি তার'—এই নীতি প্রয়োগ করে জমির মালিকানা নির্ধারিত হোতো। পশ্চিম বাংলায় বিগত যুক্ত ফ্রন্টগুলির আমল থেকে এক নূতন নীতি অনুসৃত হচ্ছে—যে-নীতির অন্তর্নিহিত সূত্রের পরিভাষা হ'লো 'ঝাণ্ডা যার, জমি তার'। অবাক্ত যে সে-ঝাণ্ডা হলে চলবে না, শাসকদলের দলীয় ঝাণ্ডা যে-চাষী বহন করবে, জমির মালিকরূপে সে-চাষীই স্বীকৃতি পাবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, সে-কথা বলা মুস্কিল। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা গেছে পাঁচ বছর অন্তর বিদ্যুতের চাহিদা দ্বিগুণিত হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলিতে মনোযোগ সহকারে ঘাটতির পরিমাণ ও চাহিদার স্তর নির্ণয় করা হয় নাই। বলা যেতে পারে চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে এ-বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সালেই ১৯৭৮-৭৯তে পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুতের চাহিদা অনুমান করা হয়েছিলো ৩৭০৭ মেগাওয়াট। ইতিমধ্যে নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত না হ'লে হিসাব করা হয়েছিলো সে-সময় পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত বিদ্যুত কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১৮৫৬ মেগাওয়াট। এই ফাঁক পূরণের জন্য সে-সময়ই প্রায় ১৪০০ মেগাওয়াট সম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কথা ছিলো এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে (১) সাঁওতালদির ৪টি কেন্দ্রই ১৯৭১-এর মে'র মধ্যেই প্রতি ইউনিট ১২০ মেগাওয়াট দেবে। (২) তার দশ মাসের মধ্যেই দুর্গাপুর প্রজেক্টস্ লিমিটেডের ষষ্ঠ ইউনিট ১১০ মেগা-ওয়াট বিদ্যুৎ দিতে সুরু করবে। (৩) ব্যাণ্ডেলের পঞ্চম ইউনিট ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবে। (৪) কোলাঘাটের তিনটি ইউনিটের প্রতিটি ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবে।

(৫) কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন টিটাগড়ে ৬০ মেগাওয়াট বিশিষ্ট চারটি ইউনিট ২৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবে। এ-সব মরীচিকা মাত্র। সাঁওতালদির চতুর্থ ইউ নট আরম্ভই হয় নাই। তৃতীয় ইউনিটটি ১৯৭৮-এর ডিসেম্বরে চালু হলেও এ-বছর মার্চের মধ্যেই বিকল হয়েছে। আর এই কেন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিট বার বার বিকল হচ্ছে। ব্যাণ্ডেলের পঞ্চম ইউনিটের কাজ অত্যন্ত ধীর গতি, কোলাঘাটের ক্ষেত্রেও তাই। আদলে শাসকদল নূতন ইউনিয়ন গঠন করে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের শ্রমিকদের দলের আওতায় টেনে আনবার জন্য উদ্যোগী হয়ে পুরাণো শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে খর্ব করতে প্রাণপণ করার ফলে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। শাসকদলের দলীয় রাজনীতির শিকার হয়েছে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি। ফলে যন্ত্রগুলি অকেজো হয়ে মারাত্মক ঘাটতি পশ্চিম বাংলার নাগরিক ও অর্থনৈতিক জীবনে দারুণ সঙ্কট ডেকে এনেছে।

পশ্চিম বাংলার শাসক দল তাদের এক বছরের শাসন পূর্ণ হবার পর ১৯৭৮-এর জুন মাসে উল্লাস সহকারে ঘোষণা করেন : শাসক দল সাধ্যমত অবস্থার উন্নতির জন্য উদ্যোগী হয়েছেন এবং এই দিন থেকে সাঁওতালদি ও ব্যাণ্ডেলের নূতন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছে (খ) রক্ষণাবেক্ষণের মান উন্নত করা হয়েছে (গ) প্ল্যান্ট এবং মেশিনারীর অচল হবার সম্ভাবনা হ্রাস করা হয়েছে (ঘ) সুতরাং, বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে (ঙ) সাঁওতালদির বিশৃঙ্খলা এবং স্যাবোটেজ রোধ করা হয়েছে এবং (চ) গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে ব্যবস্থাপনার এবং অবিরাম বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারের সুনিশ্চয়তার জন্য নূতন কর্মী নিযুক্ত হয়েছে।

সরকারের এই বীরোচিত ঘোষণার আগে এবং পরে ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সাল ব্যাপী মাসে গড়ে ২৫ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা শিল্পে উৎপাদনে লোকসান হয়। এরই মধ্যে দেখা গেলো এ-বছর এপ্রিলের গোড়ায় বিদ্যুৎ ঘাটতি ৩০০ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। ২৪শে এপ্রিল এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৯ মেগাওয়াট। হুড়মুড় ক'রে করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬ই এপ্রিল থেকে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত ৩৩০০ ভোল্ট ব্যবহারকারী সকল বৃহৎ শিল্প বন্ধ করে দিলেন। সন্ধ্যা ৭টার পর দোকান-পাট বন্ধ করে দিলেন এবং মাঝারী এবং অল্প ভোল্টেজ ব্যবহারকারী সকল শিল্প বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। বাণিজ্য সংগঠনগুলির মতে এর ফলে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা উৎপাদনে লোকসান হয়েছে।

১৯৭৩-এর জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গে শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বিদ্যুৎ রেশনিং করে ঘাটতি সামলানো হয়েছিলো। এবারকার দরকার সে ভাবে প্রস্তুত না থেকে শিল্প-বাণিজ্যের দরজা-জানালা বন্ধ করে পশ্চিম বাংলার অর্থনীতির যেমন সর্বনাশ করলেন তেমনি বেকার অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিকের রুজি-রোজগার বন্ধ ক'রে এবং প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিকের আর্থিক স্থিতি অনিশ্চিত ক'রে তুললেন কেন? তারপরও মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছেন, সে-ও এক তাজ্জব ব্যাপার! বিদ্যুৎ-ঘাটতি পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে, অচিরে তার ভয়াল রূপ প্রকট হয়ে পড়বে। এই সরকার আইন-শৃঙ্খলায় গঙ্গা-যাত্রার উদ্যোগ করেছেন, সে-সঙ্গে আর্থিক স্থিতিরও। এই রাজ্য থেকে অতঃপর শিল্প-বাণিজ্য যে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হতে থাকে—যা ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে—বর্তমান শাসকদের কপালে করাঘাত করা আর চক্রান্তের দুঃস্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকবে না।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক পরিণতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসহায় মানুষের প্রতি সীমাহীন নির্মমতার এক লজ্জা হয়ে থাকবে। পার্লামেন্টের তিনসদস্য-বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল মরিচঝাঁপি সম্বন্ধে তাদের রিপোর্টে বলেছেন : (১) এই দেড় লক্ষ উদ্বাস্তুর দণ্ডকারণ্য থেকে সুন্দরবন চলে আসার পেছনে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারী দলের প্রেরণা ছিল। (২) মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎসাদনের জন্য সরকারের আচরণও জবরদস্তিমূলক হয়েছে। (৩) এদের সমস্যাটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বার বার বলেছেনএদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মরিচঝাঁপি থেকে স্থানান্তরিত করতে হবে, জোর-জবরদস্ত করে নয়। মুখ্যমন্ত্রীও এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, তবে দেখা গেলো সেটা কপটাচরণ মাত্র। কারণ গত ১৩ই ও ১৪ই মে নির্মম নৃশংসতায় কয়েক

সহস্র সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ও কয়েক সহস্র শাসকদলের দলীয় উগ্রবাহিনী উদ্বাস্তু নর-নারী শিশুদের দারুণভাবে মারপিট জবরদস্তি করে তুলোর বস্তার মত তাদের অপেক্ষমান লঞ্চে আছড়ে ফেলেছে। এই বাহিনীরা তাদের কুটিরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষগুলিকে ঘরের বাইরে আসতে বাধ্য করে। তারপর বেদম প্রহার ও লঞ্চে নিক্ষেপ। কুটিরে অগ্নিসংযোগের ফলে শিশু-বৃদ্ধদের মৃত্যু হয়েছে। অগ্নি-দগ্ধ নর-নারীদের চিকিৎসা না করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফলে শিশু, পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, স্ত্রী, স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু নিখোঁজ হবার সংবাদও পাওয়া যায়। এদের নিয়ে রাখা হয়েছে বানপুরে এবং দুধকুণ্ডিতে। দুধকুণ্ডিতে মাথার ওপর আকাশ ছাড়া কোনো আশ্রয় নাই, খাদ্য নাই, পানীয় জল নাই, ওষুধ নাই। প্রধান মন্ত্রীর বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিহাসে পরিণত করে, সীমাহীন অত্যাচারের ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গে নূতন নাৎসীদের অভ্যুদয়ের আতঙ্কের শিহরণ দিয়ে গেলো।

স্মৃতি-তর্পণ

প্রাক্তন বিপ্লবী সারদাপ্রসন্ন বসু

আন্দামানে নির্বাসিত প্রাক্তন বিপ্লবী সারদাপ্রসন্ন বসু ৬৯ বছর বয়সে বিষড়া হাসপাতালে গত ২৪শে এপ্রিল কিছুকাল রোগভোগের পর লোকান্তরিত হ'ন। বিপ্লবী সারদা বসু বিপ্লবকর্মে জড়িত হ'ন বাংলার অন্যতম বিপ্লবী দল 'শ্রীসংঘে'র সদস্যরূপে এবং ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় ৺রেবতী বর্মণ, ডাঃ নরেন সরকার, ডঃ ৺অতীন বসু, ৺সু নির্মল দত্ত প্রভৃতি শ্রীসঙ্ঘের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ত্রিশ দশকের এক পোষ্টাল ডাকাতি মামলায় জড়িত থাকার দরুণ সাজা পেয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন। মুক্তির পর সারদা বসু নেতা অনিল রায় ও নেত্রী লীলা রায়ের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে মাণিকগঞ্জের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সাংগঠনিক দায়িত্ব নেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪০-এ এই দুই নেতার আহ্বানে মাণিকগঞ্জ সফরে গেলে সারদা বসু অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে তাঁর সফর সফল করতে কঠোর পরিশ্রম করেন। আমরা এই প্রাক্তন বিপ্লবী ও শ্রীসঙ্ঘের সহযাত্রীর স্মৃতি-তর্পণ করছি।

জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে স্নাত বিপ্লবী জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীয় দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা) —এই তিনটি গ্রন্থে মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারায় পূর্ণতা প্রাপ্তি।

প্রকাশের অপেক্ষায় আরো বই

চারনিক

ঐ মহামানব আসে

B. N. Bardhan

LEARN JAPANESE

N. N. Ghosh

JEWELS OF ASIA

জয়শ্রী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

যে কথার শেষ নেই

গোপাললাল সান্যাল

কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কলহ, নেতৃবৃন্দের পরস্পর ঈর্ষা ও রেষারেষি, কার্যপন্থা অনুসরণে বাধা ও ভ্রান্তি—সব মিলে সারাদেশে যখন হতাশা ও অবিশ্বাসের বিষাক্ত প্রবাহ অব্যাহত, তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ ও কংগ্রেসের নায়কত্বেই মুক্তি-প্রচেষ্টায় সাফল্য লভব—জাতীয়তার এই ভাবমূর্তি দেশবাসীর মনে নিয়ত জাগরূক রাখার গুরুদায়িত্ব বহন করতে হল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির।

'ফরওয়ার্ড' যে এক্ষেত্রে যোগ্যতা ও সাহসের সঙ্গে সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হয়নি, সেদিনের জনমানসে এ পত্রিকার প্রভাব ও প্রীতির চিত্রটি স্মরণ করলেই তা উপলব্ধি হয়।

প্রত্যূষে দুটি রোটারী মেশিনে প্রভাতী বৈদিকের ছাপা সুরু হয়। তা সকলের আগে পাবার জন্য বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে ফরওয়ার্ডের দরজায় 'হকার'দের ভীড় জমতে থাকে পূর্বদিন রাত দশটা থেকে। অনেকে ঐ গেটের পাশেই রাত কাটিয়ে দেয়। ভোর থেকে ভীড় আরও বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হল্লা, চেঁচামেচি, চীৎকার। মারামারি পর্যন্ত কে আগে কাগজ নিয়ে ছুটে চলে যাবে তারই প্রতিযোগিতা। তাই নিয়ে কলহ-বিবাদ।

'ফরওয়ার্ড' আপিসের অপরদিকে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল—অভিজাত বিদেশীদের শ্রেষ্ঠ আবাস। প্রত্যূষের চীৎকার-হোলাহলে তাদের কাঁচা ঘুম ভাঙে। হোটেল কর্তাদের কাছে নালিশ যায়। রাস্তায় পোলমাল নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে পুলিশের সাহায্য নাও। নইলে আমরা অন্যত্র আস্তানা নেব।

'ফরওয়ার্ড'-এর বিরুদ্ধে যে-কোনও অভিযোগ শুনতে পুলিশ তখন সর্বদাই প্রস্তুত। হোটেলের অভিযোগ পেয়েই কর্তারা ছুটলেন বেন্টিঙ্ক রুস হাতে নিয়ে।

সব ঘটনা শুনে তাঁরা স্থির করলেন, রাত্রে ওখানে পুলিশ মোতায়েন রাখবেন, টহলদারী পুলিশভ্যানও বার বার ঐ পথে সারারাত চলাচল করবে।

পত্রিকা-পরিচালকগণ এতে আপত্তি জানালেন। সংবাদপত্র আপিসে অনেক রাত পর্যন্ত লোক যাতায়াত হবেই। তাছাড়া রাত্রে একাধিকবার কর্মীদের 'ডিউটি' বদল হয়। একদল নতুন আসে, আর একদল বাড়ী ফেরে। পুলিশ দরজায় দাঁড়ালেই আগন্তুকরা মনে করবে খানাতল্লাসী চলছে আপিসে। সবাই বলবে, 'পাস, পাস' নইলে হাজত-বাস। আগে হাজত, তারপরত' বিচার।

অবশেষে দরজায় পুলিশ-পাহারা দেওয়া হল না তবে টহলদারী আরও তৎপর করা হল। হকারদের হল্লা ক'দিন কিছু কমল। দুদিন যেতে না যেতে যে-কে সেই। চীৎকার, হল্লা, কোলাহল।

এবার আর এক হুমকী এল হোটেল-কর্তাদের কাছ থেকে। 'তোমরা তোরবেলা যেসব মেশিন চালাও, সেগুলির বিকট শব্দে আমাদের 'গেস্ট'দের রোজ ঘুমের ব্যাঘাত হয়। অনেকে এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যদি অবিলম্বে এর প্রতিকারকল্পে ভোররাতে মেশিন চালানো বন্ধ না রাখো, তবে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং তৎসহ খেসারতের দাবী করতে বাধ্য হব।'

ফরওয়ার্ডের পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' ছিল বৃটিশ বড় কর্তাদের দৈনিক। সে পত্রিকা ঐ একই ঠিকানায়, একই মেশিনে অন্ততঃ পঁচিশ বছর পূর্ব থেকে নিত্য প্রভুদের ছাপা হয়েছে।

তা সত্ত্বেও হোটেলবাসীদের সুখনিদ্রায় কোনও ব্যাঘাত হয় নি। আজই বা হঠাৎ অনিদ্রার এত কি কারণ হল? কারণ খুবই স্পষ্ট।

পত্রিকা-পরিচালকগণ বুঝলেন, এ নিয়ে আপাততঃ বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ নেই। তখন হাইকোর্টে বৃটিশ বিচারকদের সংখ্যা ও প্রাধান্য, দুইই বেশী। তাঁরা এ সুযোগ তৎপর হয়ে উঠে যদি নিষেধাজ্ঞা জারী করে বসেন, তবে মুল মামলা সুরু হবার আগেই এক বা দুদিনের জন্য, বাধ্য হয়ে পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখতে হতে পারে। তাই বা হতে দেব কেন?

অনেক বিবেচনার পর হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হল, অন্যত্র উপযুক্ত পরিবেশে নূতন বাড়ী সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। বাড়ী পেলেই সব যন্ত্রপাতি সরিয়ে নূতন বাড়ীতে চলে যাওয়া হবে।

কিছু দিনের মধ্যেই হোটেল সংলগ্ন খোলা জমি—যা ছিল পুরানো আমলের মিলিটারিদের প্যারেড গ্রাউণ্ড বা আস্তাবল-বাড়ী তা হোটেল কর্তৃপক্ষ নিয়ে নিলেন। সুরু করলেন নতুন সুদৃশ্য, বহুতল-বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্মাণ। এ আধুনিক অট্টালিকায় গ্রেট ইষ্টার্নের গৌরব যাতে আরও বৃদ্ধি পায় তার সব ব্যবস্থাই করা হতে থাকল।

প্রচুর ইলেকট্রিক্যাল আলো-পাখা-লিফটিং-শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ঠাণ্ডাজল-গরমজল-পাম্প ইত্যাদির ব্যবস্থা ছাড়াও একতলার একাংশে 'ফরওয়ার্ড' এর জন্য ঠিক সমুদ্রের, রুটি-কেক-পেষ্ট্রী ইত্যাদি তৈরির জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হতে থাকল।

এ সবের জন্য মাসের পর মাস দিনরাত অবিরত বিকট শব্দ সংকেত চলল ভিত্ গঠনের জন্য পাইলিং, গভীর নলকূপ বসানোর জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ, আরও কত কি!

প্রাথমিক পর্ব শেষ হতে না হতে সুরু হল ইট-কাঠ-লোহা-লক্কড় যন্ত্রপাতি বসানোর হাঙ্গামা, সবদাই কর্কশ শব্দের সমারোহ। বাস-লরীর যাতায়াত। রাস্তা জরাজীর্ণ। সর্বদাই জলময়। পথচারীদের দুর্ভোগের একশেষ। পত্রিকা কার্যালয়ে স্থিরচিত্তে কাজ করা দুঃসাধ্য।

কিন্তু হোটেলের "গেষ্ট"দের এখন আর সুখনিদ্রায় কোনও বাধা হল না।

এইভাবে চলল কয়েক মাস। মাস থেকে বছর গেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে 'আত্মশক্তি'র মামলা চলছে হাইকোর্টে। বিচারক স্যার গারু.প্রসাদ ঘোষ, আর একজন বৃটিশ।

ঐ যে ব সাহেবই ১৯নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের মালিক। তাঁর বিচারে সম্পাদকের দণ্ড ও জরিমানা ৩' বহাল রইল-ই অধিকন্তু পেনাল কোডের রাজদ্রোহ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যায় এক নূতন 'ফতোয়া' যোগ হল,—সমগ্র প্রবন্ধ পাঠে যে ধারণাই হোক্ না কেন, প্রবন্ধের যে কোনও অংশ বা এক টি বিচ্ছিন্ন লাইন পাঠে যদি রাজ-বিদ্বেষের গন্ধ পাওয়া যায়, তবে সমগ্র প্রবন্ধটিই রাজদ্রোহমূলক বলে গণ্য হবে।

এই রায় দেবার পর-সপ্তাহেই ঘোষসাহেব ফরওয়ার্ড পরিচালকদের জানালেন, তিনি অমুক তারিখে, অমুক সময়ে ফরওয়ার্ড কার্যালয়ে যাবেন। পুলিশের কাছ থেকে চিঠি এসেছে। বাড়ীটি অত্যন্ত জীর্ণ ও পুরানো। ওরূপ বাড়ীতে বড় বড় মেশিন চালানো খুবই বিপজ্জনক। কখন কি হয় বলা যায় না। প্রতিবেশীরাও বার বার তাঁদের আপত্তি ও আশঙ্কা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। ঘোষসাহেব তাই নিজে বাড়ীটি দেখে কর্তব্য স্থির করবেন।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে তিনি এলেন। একতলারই নানা দিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

ভিতর দিকের মেশিনটি তখন চালু করা হয়েছে। সে-সপ্তাহের 'আত্মশক্তি' ছাপা হচ্ছে।

মেশিনের আওয়াজ শুনে ঘোষসাহেব পাশে এসে দাঁড়ালেন। পত্রিকা ছাপা ও ভাঁজ হয়ে তাঁর সম্মুখেই এসে পড়ছে। কর্মীরা তাড়াতাড়ি সব তুলে, সাজিয়ে রাখছে।

'দেখি দেখি আমাকে একখানা কাগজ দাও ত'। এ সপ্তাহে আমার রায় সম্পর্কে নিশ্চয় খুব নিন্দা করা হয়েছে'

—বলেই ঘোষসাহেব সম্মুখের একখানা বাংলা তুলে নিয়ে দেখতে সুরু করলেন।

'কত যেন দাম? ও' এক আনা'—বলেই অজসাহেব তাঁর কোটের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগলেন।

আপিসের ম্যানেজার ওঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন; তিনি অজ সাহেবের অসহায় অবস্থা দেখে বলে উঠলেন,

—আপনি ব্যস্ত হবেন না। এর জন্য দাম দিতে হবে না।

অজ সাহেবের এই অভিসারের পর আর বেশীদিন এ বাড়ীতে থাকা যাবে না—এ ত' জানা কথা।

কিন্তু সব রকম যন্ত্রপাতি-সমেত সমস্ত বিরাট সংস্থা এমনভাবে সরাতে হবে যাতে একদিনের জন্যও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ না হয়।

সেই ভাবেই নতুন বাড়ীর সন্ধান চলতে থাকল। বছরের পর বছর। অবশেষে স্থান পরিবর্তন হল। তবে ঐ ঘটনার চার বছর পর।

* * *

শেষ পর্যন্ত দলাদলি ও বোঝাবুঝির আবহাওয়া থেকে কয়েদ্বার্ড কর্যালয়ও মুক্তি পেল না। সুরু হল পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যেই।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর—শেষ থেকেই বিভিন্ন জেলখানায় অসহযোগী রাজবন্দীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এ কথা পূর্বেই জানানো হয়েছে।

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তখনই উপলব্ধি করেছিলেন, দেশবন্ধু কারামুক্ত হলেই বর্তমানের মতবিরোধ পাকাপাকি দলাদলিতে পরিণত হবে। কারণ একদল গান্ধীজীর ভক্ত, আর একদল সমগ্র দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়াসী। একদল ব্যক্তি-পূজায় অবিচল, অপর দল স্বাধীনতা-লাভের প্রতিজ্ঞায় অটল। পথের শুদ্ধতা, না অভীপ্সিতের আগ্রহ—কি শ্রেয়, কিংবা শ্রেষ্ঠ, তার বিচার কে করবে?

এ রাজনৈতিক কচকচি নিয়েই সংবাদপত্রের নিত্যকার কারবার। এখানেও মতবিরোধের অবকাশ আছে। দলাদলি যখন অনিবার্য, সংবাদপত্রগুলিরও তখন মন স্থির করে ফেলা প্রয়োজন। 'মতভেদের অধিকার'-এর অনুহাতে আজ একরকম, কাল আর একরকম মত সমর্থন করলে ভাবের ঘরে চুরি বা স্বার্থান্বেষীতার অভিযোগ আসতে পারে।

কোন কোন পত্রিকা এইরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন মতবাদের কখনো সমর্থন, কখনো বা প্রত্যাখ্যান করে পাঠক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ফেলেন।

স্বর্গীয় মৃণালকান্ত বসু ও তাঁর সংযোগী শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তখন অমৃতবাজারে। সম্পাদকীয় বিভাগে ওঁরা দুজনই ছিলেন প্রধান। এ ছাড়াও ছিলেন অধ্যাপক মহীতোষ রায়চৌধুরী ও স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

এঁদের মধ্যে মৃণালবাবু ও মহীতোষবাবু পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়া কোন কোনও কলেজে অধ্যাপনাও করতেন। বিশোরীবাবুও পুলিশ কোর্টে উকীল ছিলেন। নামে মাত্র। তিনি শ্রমিক আন্দোলনেও উৎসাহী ছিলেন। সেকালে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী ও শ্রমিকদের সংগঠন ও পরিচালনে মৃণালবাবু ও বিশোরীবাবু উভয়েই ছিলেন পথিকৃৎ। ভারতীয় সংবাদপত্র সেবিসঙ্ঘ স্থাপনেও এঁরা দুজনেই ছিলেন অগ্রণী এবং উভয়েই এ সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাথমিক পরিচালকরূপে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

মৃণালবাবু, কিশোরীবাবু ও উপেনবাবু—তিনজনই শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহী ও সমর্থক হলেও অমৃতবাজারের পরিচালকবর্গ কোনও ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। 'যত কর বাধা আস্তে ধীরে'—এই ছিল ওঁদের নীতি। বিচক্ষণ ব্যবসায়ী নীতি সন্দেহ নেই।

রাজনীতিক মতবাদ সম্পর্কেও তাঁরা এই নীতি মেনে নিয়েছিলেন। এক সময় তাঁরা গান্ধীজীকে প্রশংসা করতেন। তবে তাঁর অনুষ্ঠিত আন্দোলনকে নয়। পরবর্তীকালে তাঁরা দেশবন্ধুর ত্যাগের প্রশংসা করতেন কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদকে নয়।

এই ভাবেই চলছিল এক রকম।

গোলমাল বাধলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের যশোহর অধিবেশনে, ১৯২২ সালের মাঝামাঝি।

দেশবন্ধু তখনো কারাগারে। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

মহাশয় মুক্তি পেয়েছেন। দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের পর শ্যামবাবুই প্রাদেশিক কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতিরূপে কারাগমন করেন এবং ফিরে এসে পুনরায় ঐ পদেই অধিষ্ঠিত হন।

এবার বার্ষিক অধিবেশনে তিনিই সভাপতি।

শ্যামবাবু কারামুক্তির পর থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী দের মত ও পথের ভ্রান্তি এবং গান্ধীজীর মহিমা প্রচারে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। অমৃতবাজার তাঁর সমর্থনরূপে নানাভাবে আপ্যায়িত করতে থাকেন। 'দৈনিক সার্ভাণ্ট'-এর তখন মুমূর্ষু অবস্থা। শ্যামবাবুর কারাগমনের পূর্ব থেকেই এ-কাগজের অবস্থা ভাল চলছিল না। ওঁর অবর্তমানে প্রাক্তন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সার্ভাণ্ট এর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

কিন্তু অবস্থা ক্রমশ ই খারাপ হতে থাকে। অবশেষে সেলুনের এক ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক হয়ে তিনি বর্মা চলে যান। শ্যামবাবুর দৈনিক তখন চরম অবস্থায়।

যশোহর জেলা অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর 'দেশ'। তাঁদের দেশের প্রতিভূ হিসেবে পত্রিকা-পরিচালকগণ যশোহরে শ্যামবাবুর বাস ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা সমারোহ সহকারেই সম্পন্ন করেন।

মূল অধিবেশনে যোগদানের পূর্বেই (অত্যধিক আদর-আপ্যায়নের জন্যই হোক, বা অন্য কোনও কারণেই হোক) শ্যামবাবু এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তাঁর পক্ষে সভামণ্ডপে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব হয় না। তাঁকে সত্বর কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

এখন সমস্যা, মূল সভার কাজ পরিচালনা করবে কে?

এ কাজে বেছে বেছে দেওয়া হল বরিশালের সুবিখ্যাত বক্তা ও অসহযোগী শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়কে। ঘোষ মহাশয় আগে ছিলেন কোনও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বাঙ্গলার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলনের প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করেন।

শরৎবাবুও কারাগার থেকে মুক্ত। তিনিও নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সম্যক পরিচিত। সুতরাং যশোহর সম্মেলনের মূল প্রস্তাব (গান্ধীজী প্রবর্তিত আন্দোলনে অবিচল আস্থা ও তার কোনও পরিবর্তনের ঘোর বিরোধিতা-সূচক) যে ঘোষ মহাশয় যোগ্যতার সঙ্গেই উত্থাপন করবেন ও সমবেত প্রতিনিধিবর্গ তা সমর্থন করবেন এ বিষয়ে শ্যামবাবু ও তাঁর অনুগামীদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

তৎসত্ত্বেও সম্মেলনের মূল অধিবেশনে শরৎবাবুর বক্তৃতাই সভার উদ্দেশ্য পণ্ডের সহায়ক হল।

শরৎবাবু সুবক্তা। ভাবের আতিশয্যে, আবেগময়ী ভাষায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও বেদ-বেদান্ত, দর্শন-উপনিষদ, রামায়ণ-পুরাণ-মহাভারত ইত্যাদি থেকে অজস্র উদ্ধৃতি ও কাহিনী আবৃত্তি করে শ্রোতৃবর্গের নিদারুণ হাততালি ও বাহবা লাভে আরও উৎসাহিত হয়ে যতই আগ্রহভরে তাঁর বাক্‌জাল বিস্তার করতে থাকেন, ধীর-স্থির শ্রোতাদের ততই মনে হয়, অবিরত বাগ্‌বিস্তারের শেষ কোথায়?

বক্তৃতার সময় ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব উপলব্ধি হল ভালভাবেই।

মণ্ডপের বাইরে তখন কালোমেঘের ঘনঘটা। ঝড়ের আর বিলম্ব নেই। মফঃস্বলের ধোপা মাঠে পলকা খড়-দড়ি-বাঁশ দিয়ে যে মণ্ডপ তৈরী হয়েছে, ঝুনো-ঝড়ের ঝাপটায় কি তা টিকে থাকবে, না সমবেত মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গকে পাখা-চাপা দিয়ে সভার কাজ পণ্ড করবে?

অবশেষে শ্রোতাদের চাঞ্চল্য ও বাইরে ঝড় ও মেঘের গর্জনে বক্তার বিছুটা সম্বিৎ যেন ফিরে এল। আতঙ্কগ্রস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্বস্ত করবার জন্যই তিনি যেন তুমুল করতালি ও জয়ধ্বনির মধ্যে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে আসন গ্রহণ করলেন।

মূল প্রস্তাব ত' জানা গেল। কিন্তু এর বিরোধিতায় কে অগ্রণী হবেন?

এ ভার পড়ল সুভাষচন্দ্রের উপর। তিনি সদ্য কারামুক্ত হয়ে এ সভায় এসেছেন। এরূপ জনসভায় এই তাঁর প্রথম উপস্থিতি। বক্তা হিসেবেও তাই। এর পূর্বে তিনি শ্রোতা-রূপে কোন কোন সভায় যোগ দিয়েছেন। বক্তা হিসেবে এই প্রথম।

অনেকের অনুরোধে ও আগ্রহে তাঁকেই উঠতে হল বক্তৃতামঞ্চে।

বেশী সময় নষ্ট করবারও উপায় নেই। তিনি সংক্ষেপে শরৎবাবুকে ধন্যবাদ জানালেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণের প্রশংসা করলেন। কিন্তু মূল রাজনৈতিক প্রশ্নের উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না। প্রতিবাদ বা আলোচনাও নয়। জানালেন, আকাশের যেরূপ অবস্থা তাতে মনে হয় দুর্যোগ আসন্ন। এ অবস্থায় ধীরভাবে কোনও গুরুতর বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। আগামীকাল যদি দুর্যোগ দূর হয় সভার অধিবেশন চলে, তবে তিনি তখন আলোচ্য প্রস্তাবের বিশদ ব্যাখ্যা করবেন।

আপাততঃ তিনি প্রস্তাবটির সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েই আসন গ্রহণ করছেন।

সুভাষচন্দ্র বক্তৃতামঞ্চ ত্যাগ করতে না করতেই সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ নিজ নিজ আসন ছেড়ে বাইরের দিকে ছুটলেন।

বৃষ্টি, প্রচণ্ড বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। ঝড়ও অব্যাহত গতিতে তাণ্ডব সুরু করেছে। কখন কি হয় বলা যায় না।

ঐ ঝড়-জল অগ্রাহ্য করে সবাই ছুটলেন নিজ নিজ নিকেতন পানে।

কলকাতা ও মফঃস্বলের প্রতিনিধিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সেটি তখন বন্ধ ছিল।

সে রাত্রে আর খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা কারো নেই। সবাই ব্যস্ত বাড়ী ফেরবার জন্য। সভায় কি হবে না হবে তা অনুধাবন করার অসুবিধা হল না। শুধু কাহরণ করে কি লাভ? হয়ত কাল শোনা যাবে, কোন নদীর পুল ভেঙ্গে গেছে, ট্রেন বন্ধ। তারচেয়ে আজই ফিরে যাওয়া যাক।

লপ্‌সপে জামাকাপড় নিয়ে, সামান্য যা বিছানা-পত্তর ছিল সেগুলি বগলে নিয়ে সবাই চললেন রেলষ্টেশনে।

ভাগ্যক্রমে ট্রেন পাওয়া গেল। নিজ নিজ আবাসে ফিরে যেতে বিশেষ অসুবিধা হল না।

সেবার সুভাষবাবু ছিলেন নড়াইল রাজবাড়ীতে। তাঁদের অতিথি হিসেবে। সে রাতে তিনি ওখানেই রইলেন, পরদিনের অধিবেশনের প্রতীক্ষায়।

সে প্রতীক্ষা কি ফলবতী হয়েছিল? মনে ত' পড়ে না।

এই অধিবেশনের পর, আলোচ্য প্রস্তাব ও শ্যামসুন্দরবাবুর লিখিত ভাষণ সম্বন্ধে অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিঞ্চিৎ তিক্ত-কষায় মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল।

তার ফলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মন কষাকষি। মৃণালবাবু, কিশোরীবাবু ও উপেনবাবু—তিনজনেরই পদত্যাগ।

কিছুদিন পর দেশবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেলেন। জেলে থাকতেই ভবিষ্যতের পথ তিনি একরূপ স্থির করেই ফেলেছিলেন। নতুন কার্যপন্থা গ্রহণ করা হবে, অবস্থানুযায়ী প্রচারব্যবস্থা করতে হবে, স্বাধীনতার আদর্শ ও কর্মধারা সম্বন্ধে দেশময় আন্দোলন চালাতে হবে। কংগ্রেসে যাতে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা হয়, নতুন কর্মপন্থা অনুমোদিত হয়, তার সব আয়োজন এখন থেকেই নানাভাবে সুরু করা প্রয়োজন।

মৃণালবাবুদের স্বাগত জানিয়ে দেশবন্ধু বলেন, নতুন দৈনিক তিনি অতি সত্বর সুরু করবেন। আপাততঃ মৃণালবাবু যেন সম্পাদকীয় বিভাগের কার্যাবলী ও প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের আনুমানিক হিসেব তৈরী করেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও নির্দেশ দিলেন, ওঁদের সহযোগিতায় নতুন পত্রিকা প্রকাশের সব ব্যবস্থা সুরু করতে।

(ক্রমশঃ)

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক

ধীরেশ ভট্টাচার্য

বিচারপতি শেলাতকে মুখ্য প্রবক্তারূপে নিয়োগ করিয়া ১৯৭৭ সনে যে অর্থ-কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি প্রধান আলোচ্য বিষয় লইয়া বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালে প্রবর্তিত হইবার পর ইতিপূর্বে আরও ছয়টি অর্থ-কমিশন বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত হইয়াছিল বর্তমান কমিশন ক্রমানুযায়ী সপ্তম। অনধিক পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর সংবিধানের নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রপতির আদেশে এই অর্থ কমিশন গঠিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ একজন বিচারপতি ছাড়াও এই কমিশনের সদস্যপদে নিয়োগ করা হয় একজন অর্থনীতিবিদকে এবং সরকারী অর্থ-দপ্তরের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক কিংবা একাধিক সরকারী কর্মচারীকে। ইদানীং আরও একটি নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে যে পরিকল্পনা-কমিশনের কোনো একজন সদস্য অর্থ-কমিশনের কার্যেও অংশ গ্রহণ করিবেন। অর্থ-কমিশনের প্রধান কাজ বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় যাহাতে সংকুলান হইতে পারে তাহার জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের সন্ধান করা। পরিকল্পনার অন্তর্গত ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের। কিন্তু যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই অর্থের উৎস অভিন্ন, সেইজন্য অর্থ-কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশনের কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন।

ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পরিচালিত প্রত্যেক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তীয়, এই দুই ধরণের সরকারের হাতেই রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রাজস্ব আদায়ের কাজটি কেন্দ্রীভূত হইলে আদায়ের দিক হইতে সুবিধা হয়, অথচ ব্যয় নির্বাহের কাজটিকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত করা হইলে শাসনকার্যের সুবিধা হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে তাহার আদায় করা রাজস্বের মধ্য হইতে কিছু অংশ বিভিন্ন প্রান্তের (বা রাজ্যের) সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে হয়। এই বণ্টোয়ারার ব্যাপারে নানা ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের প্রয়োজনে মোট আদায়ের কত অংশ রাখিবেন, আর কতটা রাজ্য-সরকারগুলিকে বণ্টন করিয়া দিবেন, ইহাই প্রথম সমস্যা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারগুলিকে মোট আদায়ের ২৫-৩০ শতাংশের বেশী দিতে পারেন না। বাকী কেন্দ্রীয় রাজস্ব কেন্দ্রের প্রয়োজন মিটাইতে ব্যয়িত হয়। প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থার পরিচালনা, বৈদেশিক দূতাবাস ও বাণিজ্যের পরিচালনা ইত্যাদি বিশেষ দায়িত্ব ছাড়াও কেন্দ্র কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদির জন্যও বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করেন। অনেকে মনে করেন কেন্দ্রের কাজের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করিয়া কেন্দ্রীয় রাজস্বের আরও বেশী অংশ রাজ্য-সরকারগুলির হাতে তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত। মোট কেন্দ্রীয় রাজস্বের ২৫ শতাংশেই কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করা চলে এবং বাকী ৭৫ শতাংশ রাজ্য-প্রশাসনের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব এইরূপ বক্তব্যও অনেকে পেশ করিয়াছেন।

রাজ্য-সরকার কেন্দ্রের নিকট হইতে যে অর্থ পাইবেন তাহা কি কেন্দ্রের বিচারের মুখাপেক্ষী হইবে, না বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে সেই অর্থ পাইতে রাজ্য সরকারের অধিকার থাকিবে? বাস্তবে দেখা যায় কিছু অর্থ রাজ্য সরকারের হাতে আসে বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে, যেমন, ব্যক্তিগত আয়-কর হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কবাবদ ৮০ ৮৯ ভাগ রাজ্য-সরকারসমূহের আইনতঃ প্রাপ্য। কিন্তু কিছু অর্থের জন্য রাজ্য-সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে

হয়, বিশেষতঃ পরিকল্পনার জন্য অর্থ-বরাদ্দের ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার ক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া রাজ্য-সংকার-সমূহের অধিকারের পরিধিকে বাড়ানোর কথা বেশ কিছুদিন যাবৎ চিন্তা করা হইতেছে। কিন্তু পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের আওতার বাহিরে রাখা হয়, তবে পরিকল্পনাকে একটি সুসংহত রূপ দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা তাহাও বিবেচ্য। আর্থিক ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-পরিকল্পনার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। এই প্রভাব অন্তর্হিত হইলে বিভিন্ন রাজ্য যে নিজের নিজের পথে চলিবে না এবং পরিকল্পনার অখণ্ডতা বিনষ্ট হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

আরও একটি জটিল সমস্যা দেখা দেয় বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের জন্য বিভিন্ন পরিমাণের অর্থ বরাদ্দ করার দরুন। আবার সকল রাজ্য সরকারকে একই অভিন্ন পরিমাণ অর্থ দিতে গেলেও তাহাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। বস্তুতঃ এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অর্থ-বণ্টনের ক্ষেত্রে রাজ্যের জনসংখ্যার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। কিন্তু অধিক-জনসংখ্যা-বিশিষ্ট রাজ্য যে সর্বদাই প্রয়োজনের দিক দিয়া অগ্রাধিকার লাভ করিবে, এই নীতিই কি সঙ্গত? অধিক জনসংখ্যা থাকার অন্যতম শুভ ফল হিসাবে রাজটি যদি শিল্পসমৃদ্ধ হয়, যদি তাহার নিজেরই সম্পদ আহরণের প্রচুর ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও কি সে জনসংখ্যার অনুপাতে অধিকতর কেন্দ্রীয় সহায়তা পাইবার যোগ্য? একটু ভাবিলেই বোঝা যাইবে যে জনসংখ্যার আয়তন দ্বারা কোনো রাজ্যের আর্থিক প্রয়োজনকে যাচাই করা চলে না। অনেকে মনে করেন, রাজ্যের জনসাধারণের মাথা পিছু আয়ই অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মাথা-পিছু আয় হিসাবের হের-ফের দ্বারা কম করিয়া দেখানো অসম্ভব নয়। তা' ছাড়া মাথাপিছু আয় বেশী হইলেই যে রাজ্য সরকার নিজের প্রয়োজন মিটাইতে বেশী করিয়া সম্পদ আহরণ করিতে পারিবে তাহাও সব ক্ষেত্রে ধরিয়া নেওয়া যায় না। তবে রাজ্যের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বেশী, অথচ রাজ্য সরকার আর্থিক দিক দিয়া দুর্বল, এই ধরণের অবস্থাকেও চলিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। রাজ্যের মাথা-পিছু আয় যাই হোক না কেন, রাজ্যের জনসংখ্যার কত অধিক অংশ জীবনধারণের ন্যূনতম মানের নিম্নে দুর্দশায় দিন কাটাইতেছে, রাজ্যগুলিকে অর্থ-বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইহাই বোধ-হয় প্রধান বিচার্য হওয়া সঙ্গত। কিন্তু এখানেও সমস্যা বিদ্যমান। রাজ্যের দরিদ্রতম শ্রেণীর মঙ্গলকর কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তার বরাদ্দ পাইবার পর রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট অর্থ যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে ব্যয় করিতে পারিবেন কিনা তাহা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। একটু ঘুরাইয়া বলা যায় যে জনকল্যাণের প্রকল্পকে সুষ্ঠুরূপে কার্যকর করিতে গেলে প্রথমে রাজ্যের প্রশাসনকে সুদৃঢ় এবং বিকাশ-মুখী করিয়া তোলা নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং যে রাজ্যের প্রশাসন অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তাহাকে বল সঞ্চয় করিতে সাহায্য করার জন্যও কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

উপরের আলোচনা হইতে আশা করি বোঝা গিয়াছে যে অর্থ কমিশন এবং পরিকল্পনা-কমিশন, কাহারও দায়-দায়িত্ব খুব লঘু নয়। বিভিন্ন রাজ্যের নানা ধরণের বিশেষ বিশেষ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সকল রাজ্যের প্রতি যথাসম্ভব সুবিচার করার চেষ্টা এই উভয় কমিশনকেই করিতে হয়। তবে দুইটি কমিশনের কার্যপদ্ধতি হুবহু এক নয়। পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যসরকারের নিকটে প্রথমেই জানিতে চান তাহারা নিজেরা পরিকল্পনার ব্যয়ের জন্য নিজেদের রাজস্বের কত অংশ বরাদ্দ করিতে পারিবে। সেই আশ্বাস অনুসারে রাজ্যের পরিকল্পনায় মোট কত ব্যয় হওয়া সঙ্গত এবং কেন্দ্রীয় সহায়তা পরিকল্পনায় কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করা হয়। অর্থ-কমিশনের কার্যপদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরণের। তাঁহারা রাজ্যসরকারের নিকট জানিতে চান অতিরিক্ত কোনো কর না বসাইয়া আগামী পাঁচ বৎসরে রাষ্ট্রের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব কিনা। যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের আরও বৃহত্তর অংশ কিভাবে রাজ্যসরকারসমূহের নিকট হস্তান্তর করা যায় সেই প্রশ্ন স্বভাবতই গুরুত্ব লাভ করে। কেন্দ্রীয় রাজস্বের বণ্টনের

নীতিতে রদ-বদল করিয়া, রাজস্ব হইতে অনুদান দিবার ব্যবস্থা করিয়া, প্রাচীন ঋণ মকুব করিয়া কিংবা ঋণ আদায় স্থগিত রাখিয়া রাজ্যসরকার যাহাতে সাধারণতঃ কোন ঘাটতির বোঝা বহন করিতে বাধ্য না হয়, সেই ধরণের ব্যবস্থা অর্থ-কমিশন তাহাদের সুপারিশ-পত্রে পেশ করেন। ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা না করার অধিকার অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদের। তবে এখনও পর্যন্ত অর্থ-কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কখনোই অমর্যাদা দেখায় নাই।

পেশাত কমিশন আর্থিক বিলি-ব্যবস্থায় প্রধানতঃ যে-সকল পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ: (১) ব্যক্তিগত আয়-কর হিসাবে কেন্দ্র যে রাজস্ব আদায় করেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের জন্য ২.১৯ শতাংশ কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট রাজস্বের ৮৪ শতাংশ (পূর্বে ইহা ছিল ৮০ শতাংশ) নির্দিষ্ট সহ ২২টি অঙ্গ-রাজ্যের মধ্যে বিলি করা হইবে। সুতরাং কেন্দ্র নিজস্ব প্রয়োজনে আয়করের মাত্র ১২.৮১ শতাংশ ব্যবহার করা চলিবে। (২) কেন্দ্রীয় আবগারী রাজস্বের আদায় হইতে বিদ্যুতের উপর আরোপিত শুল্ক সম্পূর্ণরূপেই রাজ্যসমূহের হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং বাকী আবগারী রাজস্বের ৪০ শতাংশ (পূর্বে ইহা ছিল ২৫ শতাংশ) অঙ্গ-রাজ্য সমূহের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) কৃষি-সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর, বিক্রয় করের পরিবর্ত হিসাবে আরোপিত আবগারী কর, রেলের যাত্রী-ভাড়ার উপর করের পরিবর্ত হিসাবে প্রদত্ত অনুদান, এই করেকটি খাতেও ২২টি রাজ্য কেন্দ্রীয় আদায়ের একটা বৃহৎ অংশ পাইতে থাকিবে, যদিও এই ধরণের করের মোট আদায় খুব বৃহৎ পরিমাণের নয়। (৪) পূর্বে উল্লিখিত রাজস্বের ভাগ পাইবার পরও যে-কয়টি রাজ্যের বাজেটে ঘাটতি দেখা দিবে তাহাদের জন্য কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে অনুদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই রাজ্যগুলির সংখ্যা হইল আট এবং ইহাদের নাম জম্মু-কাশ্মীর, ওড়িশা, সিকিম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাভূমি, হিমাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরা। একমাত্র ওড়িশা ভিন্ন এই সবগুলি রাজ্যই অপেক্ষাকৃত নব-গঠিত এবং প্রশাসনিক দিক হইতে দুর্বল। ১৯৭৯-৮০ হইতে ১৯৮৯-৮৯ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে এই আটটি রাজ্য মোট ১১৭৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা অনুদান পাইবে। (৫) রাজ্য সরকার সমূহ কেন্দ্রের নিকট হইতে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোনো কোনো ঋণ মকুব করিয়া এবং অন্যান্য ঋণের সুদ কমাইয়া এবং পরিশোধের সময় বাড়াইয়া দিয়া অর্থ কমিশন রাজ্য বাজেটের ঘাটতির একটি বড় কারণকে দূর করিতে চাহিয়াছেন। (৬) অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে দুর্গত রাজ্যের সরকারকে সাময়িক সাহায্য দিতে হয়। এই বিষয়ে নিয়মের কঠোরতা শিথিল করিতে অর্থ-কমিশন কিছু কিছু সুপারিশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের বিতরণ কোন্ নীতি অনুযায়ী হইবে সেই সম্পর্কে অর্থ-কমিশনের সদস্যগণের মধ্যেই মতভেদ ছিল। তবে রাজ্যের দরিদ্রতম অধিবাসীদের সংখ্যা যে এই নীতির অন্যতম বিচার্য হওয়া উচিত সে বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন। অর্থ-কমিশন প্রতি রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা সম্বন্ধেও পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বিতরণের ব্যাপারে রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ আহরণ প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

অর্থ-কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হইলে আগামী পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে ২০৯০৭ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগারে জমা পড়িবে। ইহা ছাড়া ঋণ মকুব ব্যবস্থার জন্য রাজ্য বাজেটে ২১৫৬ কোটি টাকার সুরাহা হইবে। এই বরাদ্দের সহিত ইহার পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে কেন্দ্র হইতে রাজ্যে অর্থ হস্তান্তর-করণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ১৯৭৮-৭৯ সনে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইল, সেই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ভাণ্ডার হইতে রাজ্যসমূহ প্রায় ১১১১৮ কোটি টাকা পাইয়াছিল। অবশ্য কেন্দ্রীয় রাজস্ব-ভাণ্ডার উত্তরোত্তর স্ফীত হইবার ফলে এই দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ করিতে কেন্দ্রের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ১৯৭০-৭১ হইতে ১৯৭৬-৭৭ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় কর আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় দেড়গুণ (৩২০ কোটি

টাকা হইতে ৮২৭০ কোটি টাকা)। অর্থ-কমিশনের হিসাবে দেখানো হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহের প্রায় ৫৫ শতাংশ রাজ্য-সরকারসমূহের হাতে চলিয়া আসিবে। কর ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের অন্যান্য উৎস রহিয়াছে। সেই সকল রাজস্বকে অন্তর্ভুক্ত করিলে কেন্দ্রীয় আদায়ের ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকারসমূহের প্রাপ্য হইবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে অর্থ-কমিশনের রায় অনুযায়ী রাজ্য-সরকারসমূহ যে কেন্দ্রীয় সহায়তা লাভ করেন, তাহা ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন-ব্যয়ের জন্য আরও কিছু সহায়তার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিগত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ২০৭০ কোটি টাকা এই রাজ্যসরকারদের কোষাগারে জমা পড়িয়াছে। ইহা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের জন্য বৎসরে আরও ৭৫০ কোটি টাকা রাজ্যগুলির হাতে আসিয়াছে। এই সমস্ত অর্থের পরিমাণকে একযোগে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে কেন্দ্র হইতে রাজ্যে অর্থ হস্তান্তর করণের পরিমাণ বৎসরে গড়ে ৫০০০ কোটি টাকার কম হইবে না। ভবিষ্যতে এই অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিবে বলিয়াই আশা করা যায়। কেন্দ্রীয় রাজস্ব-ভাণ্ডার হইতে রাজ্যসমূহকে আরও বেশী পরিমাণে অর্থ দেওয়া সম্ভব কিংবা সংগত কিনা তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করিবার জন্য উভয় পর্যায়ের সরকারের দায় দায়িত্ব নিয়া বিস্তৃত আলোচনা করার আবশ্যকতা রহিয়াছে। শুধু কেন্দ্রের প্রতি 'আরও অর্থ চাই' এই দাবী বারংবার জানাইলেই মূল প্রশ্নটির সুমীমাংসা হইবে না।

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুস্থ সুন্দর বিকাশের সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর বাঁধাই ও ছাপা,

দাম দশ টাকা

কবিতা ঃ স্পষ্ট, অস্পষ্ট ইত্যাদি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রুস্ত তাঁর কোন উপন্যাসের এক জায়গায় বলেছিলেন, বিটোফেনের শেষ কোয়ার্টেট একবার শুনিয়ে এবং সমালোচকদের কাছ থেকে উন্মাদ আখ্যা পেয়ে তা যদি পঁচাত্তর বছর না বাজিয়ে তারপর বাজানো হয়, তাহলে তখনো সমালোচকরা ঐ শিল্পকর্মকে পাগলামি বলবে—কারণ এতদিন ধরে শিল্প ধীরে ধীরে তার স্টাইলের সঙ্গে পরিচিত করে নি শ্রোতাকে।[১] তার নিজস্ব ভাষাতেই শিল্প স্বাস্থ্যবান। সে-ভাষার পরিচয় অভ্যাসের মাধ্যমেই মেলে।

সব শিল্পকর্ম সম্পর্কেই কমবেশি একথা সত্য। প্রথমে যা কঠিন, অস্পষ্ট এবং দুরূহ মনে হয়, পরে তাই পরিচিত হতে হতে খুবই সহজ এবং স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হয়। কবিতার এই অস্পষ্টতা, কঠিনতা কতদিনের? একি ইচ্ছাকৃত, নাকি কাব্যের সঙ্গে খানিকটা অস্পষ্টতা অচ্ছেদ্য? নেমেরভ বলেছেন, কিছু পাঠক আছেন যাঁরা কাব্যে লিখিত সব কিছুই কঠিন বলে মনে করেন, এবং তাঁদের প্রসঙ্গ 'এ.হা বাহ্'।[২] তাঁর মতে অনেক কবিও আছেন যাঁরা বাগবাহুল্যের দ্বারা কবিতাকে জটিল করেন; যদিও বৈয়াকরণিক সংক্ষেপ অনেকের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যও এনে দিয়েছে—যেমন, মিলটন, হপকিন্স, ইয়েটস, কামিংস।

কবিতা যেদিন থেকে তার সাঙ্গীতিক ভূমিকা থেকে সরিয়ে এনেছে, হয়ত সেইদিন থেকেই সে দুর্বোধ্য বলে আখ্যাত। প্রাচীন মন্ত্র, গাঁথা, কবিতা যখন উদ্গীত হত, এবং বর্তমানেও যখন লোককবিতা বা লোকসঙ্গীত ও পুরাণকথা উদ্গীত হয় তখন কবি ও শ্রোতার মধ্যে বিভেদ বা দুরত্ব থাকে না।[৩]

জনৈক আধুনিক কবি বলেছেন যে, যেহেতু বেশির ভাগ লোকই আধুনিক কবিকে অস্পষ্ট, কঠিন বা উপেক্ষিত বলে মনে করে, সেকারণে কবি অপঠিত থাকেন। কথনো কখনো একথা সত্য হলেও, উল্টোটাও সত্য—অর্থাৎ কবিকে কঠিন মনে হয় কারণ তিনি অপঠিত থাকেন, অথবা পাঠক তাঁর বা অন্য কারো কবিতা পাঠ করতে অভ্যস্ত হন না। আসলে কোন কারণই শেষ কারণ বলে গণ্য হতে পারে না—কবি ও পাঠকের এই বিচ্ছেদ দীর্ঘস্থায়ী পৃথিবী-উল্টানো সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবেরই ফলশ্রুতি।[৪]

একদা কবি ছিলেন একাধারে সমাজের অভিভাবক বা নীতিনির্দেশক এবং সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যবাদ যে নীতি-নিষ্ঠাব্যতিরেকেই দাঁড়াতে পারে একথা তখন কেউ ভাবতো না। কার্যত, আধুনিক কবিকেই দেখা গেল যে তিনি শুধু কাব্যশিল্প ও সৌন্দর্যবাদকেই মুখ্য বলে অবলম্বন করেছেন—নীতির প্রতি আনুগত্য থেকে তিনি অনেক দূরে সরে গেছেন। এইখান থেকেই বিশুদ্ধ কবিতা ও অস্পষ্ট কবিতার বিভেদ সুরু।

বিশুদ্ধ কবিতা বলতে অনেকে বুঝেছেন তা এক অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী কবিতা যা নাকি ফরাসী প্রতীকীদের অস্পষ্ট কবিতা থেকে পৃথক। শেষোক্তদের মধ্যে অবশ্যই মালার্মে বা পরবর্তীকালের ভালেরি পড়েন যাঁরা শিল্পকর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। বোধির সীমানায় তাঁর আদর্শ জগত খুঁজতে গিয়েই মালার্মে যে অন্তর্মুখী এ খবরটা জানা থাকলে তাঁর কবিতারই অস্পষ্টতার আবরণ উন্মোচিত হয়।

মানবচেতনামুখী রেনেশাঁর স্পষ্টতা, মানবের জয়গানের কাল যেদিন শেষ হয়ে গেল সেদিন থেকেই কবি ক্রমশই অন্তর্মুখী হয়ে পড়লেন। আমাদের দেশে উনবিংশ শতকের রবীন্দ্রনাথে সুরু হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধেরও কিছুটা পর পর্যন্ত এই মানবিকতা ও স্পষ্টভাষিতার প্রচলন ছিল রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই। বিদেশেও যেমন, এদেশেও তেমনি। সেই উত্তুঙ্গ সামাজিক মানব নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণ-

সমূহের ক্রমশই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার ভাষা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আগে আমরা কি দেখেছি? ঈশ্বর গুপ্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—অগ্রজ কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন। ঈশ্বরগুপ্তের কালে অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠা সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের বেলাতেও তাই। কবিতার বহিরঙ্গে তিনি যে নতুনত্ব এনেছিলেন, তাতে আধুনিক অর্থে অস্পষ্টতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কালেই বিরূপ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি নানা কটাক্ষের সূত্রপাত হয়েছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাক্-পদ্ধতি যে আমূল পরিবর্তন এনে দিল তা উত্তরসূরীদেরই মঙ্গলস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবধারার জন্য অনেক কবিতায় অস্পষ্টতা খুঁজে (সোনার তরী) নানারকম অর্থ সন্ধান করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার রহস্য-সন্ধান কি এখন বিরক্তি জাগায় না!

রিলকের অন্তত শেষ দিকের কবিতায় দর্শন খুঁজতে গিয়েই তাঁকে অস্পষ্ট ভেবেছেন সমালোচক; তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে খুঁজলে হয়ত অতটা অস্পষ্টতা মনে হত না।[৫]

রবীন্দ্র সুর থেকে পৃথক যে বিষণ্ণ মানুষের বাক্-ভঙ্গিমায় আধুনিক কবিতার সুর, সেই কবিতার কলাকার কোন কোন কবির রচনায় দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা ইত্যাদি গুণগুলি আরোপিত হতে আরম্ভ করেছিল (বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' এবং সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা)। জীবনানন্দের বহু কবিতাও এইভাবে অস্পষ্ট মনে হয়েছিল। অর্থ-সন্ধানের প্রবল প্রচেষ্টায় 'বনলতা সেন'-এ ইতিহাস-চেতনা ইত্যাদি নানারকম বৈচিত্র্যের সন্ধান করা হয়েছিল—আসলে সেটি যে একটি কবিতা, এবং কবিতাতে বক্রোক্তি থাকবে, আলোছায়ার কম্পন থাকবে সর্বোপরি সর্বাতিশায়ী একটা ভাললাগা থাকবে এবথাই ভুলে গিয়েছিলেন তখনকার পাঠক। আজ ঐসব কবিতা পঠিত হতে হতে এখন আর অস্পষ্ট মনে হয় না। কারণ ঐ প্রিয়তম বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে এখন অনেকেই পরিচিত হয়ে গেছেন। জীবনানন্দ নিজেও তখন বলেছিলেন যে তাঁকে কেউ বলেছে নির্জনতম, এবং তাঁর কোন কবিতা ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার বা নিশ্চেতনায় প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিষ্ট—এগুলি আংশিক সত্য। তাঁর মতে, কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুইই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার। কিন্তু জীবনানন্দের এই কবিতার অর্থ কি দ্রুত বোধগম্য?—

পটভূমি বার-বার পটভূমিচ্ছেদ
ক'রে ফেলে আঁধারকে আলোর বিলয়
আলোককে আঁধারের ক্ষয়
শেখায় শুক্ল সূর্যে; গ্লানি রক্তসাগরের জয়
দেখায় কৃষ্ণ সূর্যে; ক্রমেই গভীর কৃষ্ণ হয়।

('স্থান থেকে')

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেছেন যে তা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ—অভিধানের সাহায্যে দুরূহতার গ্রন্থি উন্মোচিত হয়।[৭] তিনি যে ঐতিহ্য, অন্বিত, কলাকৈবল্য ক্রন্দসী প্রভৃতি শব্দ সর্বপ্রথম ব্যবহার করে বাংলায় তাদের প্রচলন করে গেছেন সেকথা ঠিকই বলে গেছেন বুদ্ধদেব।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য চালের কবিতায় স্বভাবতই অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়, নেইও—তাঁর দুরূহ শব্দাবলী অভিধানের সাহায্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বরং সেই সময়ের সময় ভট্টাচার্যের অনেক কবিতাই আমাদের অস্পষ্ট মনে হয়। তা সম্ভব হয়ত কবির নানারকম ছন্দ অনুসরণের জন্যে, কিংবা নানারকম পৌরাণিক চিত্রের খণ্ড প্রয়োগে। সে হিসেবে অমিয় চক্রবর্তীর আমেরিকী জীবনচিত্র উদ্ঘাটনের যে-সব কবিতা তা কি অস্পষ্ট নয়? বা বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতকালের বহু কবিতাও?

তাহলে, ব্যাপারটা হয়ত এইরকম দাঁড়াচ্ছে:

১। কবিতা মানেই বক্রোক্তি, সে যাযাবর কবিতা গদ্যের মত স্পষ্ট না ও হতে পারে। তার অস্পষ্টতা, তার একটা গুণই বলতে হবে—অস্পষ্ট কবিতার বহুবিধ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

২। তথাকথিত দুরূহতা অস্পষ্টতা নয়। রোমান্টিক আত্মমুখী কবিদের মধ্যেই অস্পষ্টতা লক্ষণীয়।

৩। কবিতা এখন যেহেতু পাঠ্য, শ্রব্য নয়, সেকারণে তার অস্পষ্ট হতে বাধা নেই।

৪। আধুনিক কবিতায় উত্তরোত্তর ব্যক্তিক চিত্র

চিত্রণের ফলে তার সাধারণ মূল্য হারিয়ে যায়, ফলে কোথাও কোথাও তা অস্পষ্ট হয়।

৫. কবিতায় একটিই মাত্র অর্থ খোঁজা বিড়ম্বনামাত্র। একই কবিতার বহু দ্যোতনা থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র পেছনে ঘুরে ঘুরে আমরা কবিতার কথাই ভুলে যাই।

৬. সব বিদ্যাই সাম্প্রতিককালে তাদের গঠনমূলক (structural) দিকের ওপর জোর দিচ্ছে। তাদের বর্ণনামূলক চরিত্রের ওপর সকলের নজর। কবিতার বেলাতেও সে-ঘটনা ঘটছে। কবিতা তার ভাষায়, চিত্রে কবিতাই হতে চাইছে।

৭. সকলেই নৈরাজ্যের কবি বলেই ব্যক্তিক চিন্তা, রূপকল্প ইত্যাদি প্রয়োগে কবিতাকে অস্পষ্ট করতে দ্বিধা করছেন না। কবিতা সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী অর্থের মাধ্যমে নয়, ইংগিতের সাহায্যে।৮

উপরি লিখিত কয়েকটি কথা বলা সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে নান্দনিক অর্থে পুরোপুরি বিশুদ্ধ কবিতা না হলেও আপিস ক্লাবে, পাড়ায় পাড়ায়, সাধারণ পাঠকের কাছে নজরুল, সুকান্তর সমাদর একটুও কমে নি। এই সমাদর একদা বিমলচন্দ্র ঘোষের ছিল, এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আছে। কেন এমন হয়? এঁদের ভিন্ন সুর বলে? এঁদের সুর বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের বলে? তাহলে কি এঁদের কবিতা আবার সেই পুরনো দিনের মত পাঠকের, শ্রোতার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে? কবিতার অস্পষ্টতা কি তাহলে নেহাৎই বানানো? যাঁরা (অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিবাদী উচ্চকণ্ঠ কবিরা) জীবনের অন্ধকার দিকটা বিবৃত করলেও তাঁদের ভাষায় কোন অস্পষ্টতা নেই—অথচ অস্পষ্টতা না কি জীবনের নানারকম বিচ্ছেদভাবনারই ফলশ্রুতি?

আমার কিন্তু অস্পষ্টতা সম্পর্কে এইরকম মনে হয়:

১। আধুনিক কালে উদার মানবিক কবি রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবধারা, জীবনদেবতা ইত্যাদি খুঁজতে গিয়ে তাঁর প্রতি অস্পষ্টতা আরোপিত হয়েছে।

২। জীবনানন্দের চিত্রলতায় কোথাও কোথাও অর্থ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে (হলেই বা!)—সেইজন্যে তাঁকেও অস্পষ্ট মনে হয়।

৩। আমাদের ত' কোন ফরাসী একাডেমি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এসব কাজ করে না) নেই, কাজেই শাসন করার কেউ নেই।

৪। একদিকে সংবাদপত্রশাসিত পত্রিকার রচনা, অন্যদিকে অজস্র লিট্‌ল ম্যাগাজিন—কেউ কারো পরোয়া করে না, যার যা খুশি লেখে। প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সাহিত্যের তৃতীয় জগত গড়ে উঠছে।

৫। তাৎক্ষণিক বাহবার যুগ বলে এখন শিল্পকর্মের প্রতি নজর নেই। যুগটাই অবক্ষয়ের, নৈরাজ্যের—অস্পষ্টতার কারণ সম্ভবত অহেতুক বাগবাহুল্য বানানো ভাঙা চিত্রকল্প বানানো দুর্বোধ্যতা। বাগ্‌বাহুল্য সম্পর্কে জনৈক বিদেশীর সেই কথা মনে পড়ে 'circumlocution, or periphrasis gives the words a spurious importance; spurious because the words exist over a kind of void, something in the manner of florid ornamentations or a facade on a building with weak foundations. ৯

৬। এখন কবিতায় কেবলমাত্র একটিই অর্থ—বা আদৌ কোন অর্থ—খোঁজা হয় না বলে কবি তার শব্দ ও চিত্রবাহুল্যের জন্যে অস্পষ্ট হতে পারেন কবিতার বহু অর্থ তার ambiguity কবিতার অস্পষ্টতা এনে দেয়। Pluri-siznation বা বহু অর্থ কবিতার পক্ষে ভাল এবং মন্দ দুই।

৭। পাঠক কবিতায় কিছু বক্তব্য আশা করতে গিয়ে ব্যাপারটা গোলমেলে করে ফেলে তার মধ্যে অস্পষ্টতা খুঁজে ফেরেন। এলিয়টের ভাষায়, Instead of begining, as he should, in a state of sensitivity he obfuscates his senses by the desire to be clever and to look very hard for something—he doesn't know what—or else by the desire to be taken in. ১০

৮। সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন ঞপদী কেতাবী নির্দেশ মেনে চলে না, ডিমাণ্ড-সাপ্লাই থিওরিকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যেমন কোন অসাধু ধনী ব্যবসায়ী উক্ত অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আমাদের ছোট্ট পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে গুটি-

কয়েক অর্থশালী ব্যবসায়ী। সে অবস্থায় অস্পষ্টতা ইত্যাদি সমালোচনার শব্দগুলি শুধুই কেতাবী মনে হয়।

শেষ কথা বলতে গেলে (যদিও কোন কথারই শেষ নেই) বলতে হয়, কবিতার দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা আধুনিক যুগমানসের অবদান। বিদেশে শিল্পবিপ্লব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সময়কে জনৈক লেখক কবিতার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাল বলে ধরেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগকেই এই কাল হিসেবে ধরা যায়। এই অস্পষ্টতা —যদি কেউ অস্পষ্টতা বলে ধরেন—থাকবেই যতদিন না রুচি বদলায়। স্পষ্ট কবিতাও বহু লিখিত হচ্ছে—তাতে কি পাঠক তৃপ্তি পাচ্ছেন ?

আসলে বাংলাদেশ অত্যন্ত ছোট জায়গা, তার সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যম সীমিত, নিয়ন্ত্রিত (নিয়ন্ত্রিত হলেও লোকে কাগজপত্র পয়সা দিয়ে কেনে, সেকারণে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না)। নতুন কবিকে নানা বাধা, লোকের ভিড় এড়িয়ে নজের মুখ তুলে ধরতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় —সকলের পক্ষেই নিজেদের ক্ষুদে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা বিদেশী কবিদের সম্পর্কে যেমন মানায়, আমাদের দেশে তেমন মানায় না।

উল্লেখপঞ্জী

১। Howard Nemerov, The difficulty of difficult poetry. In Reflexions on Poetry & Poetics, New Jersey. ১৯৭১, পৃঃ ২১।

২। তদেব,, পৃঃ ২৪ : "These readers get their entire pleasure, not from reading poems, but from wrangling interminably over 'communication', as though each of them lived in his own telephone booth."

৩। Geroge Thomson, Marxism and Poetry, নিউ দিল্লী, ১৯৪৪, পৃঃ ২২-৩ : 'In antiquity and the middle ages, and even today among the peasantry, the poet is not divided from his audience by the barrier of literacy.....Civilised poetry is the work of a more highly individualised society'.

৪। Randall Jarrell, The Obscurity of the poet. In Poetry and the Age, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭ নং, পৃঃ ৪

৫। J. E. Leishman (ed.) *Selected Poems : Rilke*, ভূমিকা, ১৯৭২।

৬। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা, না জানা সং।

৭। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা।

৮। 'Now, the difference between naming and suggesting is the difference between communicating to the reader and offering him something to unriddle' (S. Burnshaw, *The Poem Itself*, ভূমিকা, ১৯৬০)।

৯। H. Coombes, *Literature and Criticism*, ১৯৬০, পৃঃ ১১৯।

১০। *Selected Pros*, ১৯৩৩, পৃঃ ৯০।

ইচ্ছাকলম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনানুদিন

শীত তেমন পড়ল না ভালো করে। গায়ের আঁচ মরছে না, গরম জামা জমেই রয়েছে বাকশোবন্দী; ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর মিহি মুদ্রে ছাপা আমন্ত্রণ চিঠির পিঠ পিঠ দুর পাল্লার বাস ছাড়ছে একটার পর একটা—ভেতরকার সবাইকে জানান দিয়ে শহরের রাস্তা পার হয়ে ঝকড় ঝকড় ঝম ঝম ঝকড় ঝকড় ঝম ঝম বাজতে বাজতে চলল বাতাসগাড়ি—তবু সে আর ক জনার? ভোর থেকে রাত যেখানটাতেই দাঁড়াতে যাই নিত্যযাত্রী লক্ষ গম্যার্থীর মরণপণ ঝাঁপের ঠেলায় হটতে হটতে ফুটপাতের দোকানসই—আর সরব কোনখানে? পিই করে ফুর্তি শিস ছুড়ে বেরিয়ে গেল মিনি-খানদানি-বাসট্রাম ট্যাকসি গাড়ি—পেট এত কেঁপে উঠেছে মনে হচ্ছে এই বুঝি ফেঁসে গেল—এই বুঝি ডাইভ খেয়ে পড়ল মেট্রো রেলের নঈ দরিয়ার মুক্তোঝিনুকের লোভে। দরিয়া তো নয়, শহরের পেটের মধ্যেকার তাল তাল পেঁকোসবুজ নাড়িভুঁড়ি ডাঁই হয়ে উঠেছে রাস্তা ভরতি, যন্ত্র-মানুষের কোনটা কল কোনটা লোক বুঝতে না পেরে দুর থেকে ভয়ে ছুপিয়ে দেখে বিদায় হয়ে যায় ছেলেমেয়ে, গেরস্থপাড়ার মাঝখানেও রাতবিরেতে যন্ত্র আছাড় পড়ছে হুমহুম, বুক চমকে যায়। দশ মিনিটের পথ যাচ্ছি ঘণ্টাভর—উদরে নিস্প্রোটিন তিতিক্ষা নিয়ে মিনি-ওলা ছোকরার ধমক খেয়ে আরো অসম্ভব ফাঁকে সেঁধোবার ব্যর্থ আয়াসে কাঠ—চিলতে জানালাফাঁক দিয়ে নজর যায় সুন্দরী মেয়েমুখ রঙানো থামে দেয়ালে একের পর এক জনকল্যাণ সমাজকল্যাণ দেশকল্যাণ পরিবারকল্যাণ পথকল্যাণ জাতিকল্যাণ শতকল্যাণ প্রকল্পের সমিতি উপসমিতি অভিভাবকসমিতি সাহায্যকারীসমিতি পরামর্শদাতাসমিতির ঝকঝকে আঁকা পোস্টার সাইনবোর্ড—এই যে নিন, দিলুম, একটার পর একটা—এই নিন, হাত উলটে পালটে দেখতে গিয়ে মনে হয় চোখের জোর কমে গেছে, বিনত প্রজার মতন পথপাশের পসারীকে পকেটসুদ্ধু নজরানা দিয়ে একটু জোর কিনতে গিয়ে অলৌকিক বিশ্বাসে গিলতে থাকি লাল নীল হলদে সরবতি সুপারস্যোনিক, তারপর মুছতে থাকি একটু একটু করে একটা আয়েস সিগ্রেটের ধোঁয়ায়, ফ্ল্যাক বক্স থেকে রাজঅনুজ্ঞায় বিগলিত সাত বর্ণিল আলো কুলকুল করে বয়ে এসে আরো আবছা করে দেয় খানিকটা।

তাইতেই ফিরতে গিয়ে মনে হয় আছড়ে পড়লুম—ক্ষিপ্ত উল্লাস গর্জে ওঠা দুপুরমিছিলের মুখে—নিয়ুত তীরে নিবিদ্ধ দুপহরী আঁচ, সার সার ঘাস দাঁড়িয়ে নিজের স্বেদজলে সেদ্ধ হচ্ছে আপনাআপনি—কোথাও যাবার নেই কেবল ঝিম লাগা মগজে পরতের পর পরত জমে উঠছে একটুকরো প্রত্যয় সংধ্বনি—যদি বাঁচতে হয় এরও পর, লড়তে হবে লড়ে যেতে হবে, যতদিন বাঁচি।

বুঝে উঠতে পারি না শুধু কিসের, কার সঙ্গে? এই যে হাজারবার ছুটে গেলুম বুড়োআঙুলটুকুর ভর রেখে যার নিরুপায় গন্তব্যে, এই যে মিনতি করলুম এতবার করে বিনময়ের অপরাধটুকু ফিরে পেতে যাকে দেখেছিলুম আমারই পড়শি-সহচারী। শিষ্ট বুঝদার নাগরিক, হতবেয়ার হদিশ করতে মেজো সেজো ছোটো তস্য ছোটো রাজকর্মচারীর শাহী ধমক খেয়ে পিছনবাগে গিয়ে জল্পনা করছি কী করবে বেচারাদের ওভারটাইম উঠে গেছে, টুটোফুটো নিত্য-গেরস্থালি নতুন-বাঁধা উপরিদরের ওপরেও দুনো গুণে দিয়ে হা পিত্যেশে চেয়ে আছি কখন নজর পাব পসরাদারের—একটু বেশি সে তো দিতেই হবে মিলছে যখন। দুর অপেক্ষার শেষে স্মিত ঔদাসীন্যের মোড়কে পাচ্ছি দাগি পাচকো ধুলো-

মাটি কাঁকরপাথর ডোবার পানি—তাই তুলছি থলি ভরতি এখান থেকে ওখান থেকে যেখান থেকে পারি—দশজনে হুমড়ে পড়েছে দশদিক দিয়ে তারই ভাগ নিতে—ঘেঁষেপিষে-দলেমুষে সবাই সবাইকে হটিয়ে পরাস্ত করে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাস, তারপর হঠাৎ একসময় পুঞ্জ চলজলতরঙ্গের এসকালেটরে চেপে হুশহুশিয়ে সোজা দিনান্তকিনারাতে। কে কখন লড়বে এর ভেতর কেন, কার সঙ্গে? শেষবারের মতন শেয়ালদা স্টেশন থেকে বাকি থলি বোঝাই শস্তার কপি উঠিয়ে নিয়ে এ ফাঁক গলে ও ফাঁক গলে হন্তদন্ত ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে পাঁচটা সতরর বনগাঁ লোকাল—চুকল আজকের মতন। এবার তাসপাশা খেলতে খেলতে গাভাসকারের গুণ গাইতে গাইতে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা না আসার অন্যায়ে রুখতে বাড়ি পৌঁছবার শেষ দেড়মাইলটুকুর জন্য বেশি পয়সা কবুল করে সাধাসাধি—তুষ্ণী পাওয়া রিকশাওলায়। তারপর কয়েক ঘণ্টার মতন আর কিচ্ছু নেই।

রেলগাড়ি না চড়ে যান বেদেঘাটা দমদম তিলজলা কুদঘাট—কিচ্ছু নেই কোনোখানে, এই একটুখানি সময়। অনবচ্ছেদে বাড়ছে শুধু শহর, ক্রমাগত, সেই হুতোমের শহর আড়েদিঘে কেবলই ছাড়িয়ে যাচ্ছে নিজেকে—ঘুমের ভেতর চমকে চুকে পড়ে তার অস্থির চিৎকার, ক্রমাগত। চেঁচাচ্ছে সমস্তটা দিন—অবিশ্রান্ত, একটু সময়ে যায় আন্তর্জাতিক গুণীদের নতুন স্ট্যাচুর সামনে পড়তেই, বিশতলা হর্ম্যের নীচে আঁটাশ ইঞ্চি জীনের ফেয়ার চড়ানো চকরাবকরা যুবকযুবতীর রোদচশমার ছায়ায় রয়ে যায় একলহমা—সে হল দেড়মিনিটের মেঘছাউনির ছড়া। আবার কলকল করে ওঠে বস্তির দুপালী যেই বেমক্কা রঙ সামলাতে সচেতন, দেয়ালমোড়া দাবি আদায়ের লালকালি ফতোয়া গনগন করে উঠেছে যে মুহূর্তে, চোরা হাত বাজি রাখল যখনই বন্ধুকে বন্ধুর পিছন পিঠে। নিচ মাটি ওপর ওপর মাটি নিচ করতে করতে এ মুড়ো ও মুড়ো চলেছে ট্র্যাক্টর সব অবক্ষয় ওলোটপালোট করে নতুন জমিন বানাবার দৃপ্তোদ্যমে। দেখছেন না আস্তে আস্তে মানুষের মন কত ধোয়ামোছা বদল হয়ে যাচ্ছে সহজ সাগাভাগি আত্মীয়তার স্থিতসংকল্পে।

এরই ভেতর একদিন দেখি দেশি মুদ্রণের দুশো বছর নিয়ে সাজসাজ মাঠের চত্বরে—কৌতূহলে ভিড়ছে পথচারী, কিংবা সংস্কৃতির লালসে—কী লম্বা লাইন, ফুরোয়ই না, ঝালমুড়ি আইসক্রীম বিক্রি হল অনেক। কিন্তু এ বছরকার মুদ্রণের হল কী। নিতান্ত গেরস্ত শিল্প এই বাঙালির—বেশির ভাগ মাঝারি মালিকের উঞ্ছ বৃত্তি, বেশির ভাগ অসন্তুষ্ট শ্রমিকের না পার অবলম্বন, আর নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সম্ভবইসী মধ্যবইসীর বিকল্পহীন ইচ্ছাপূরণের আশ্রয়। যত অন্যায় চলেছে এইখানে, যত মুদ্রা বাইরে রয়ে যাচ্ছে অনাচারের প্রতিবিধিৎসায়—চারচপাটে চাইলে আর দশটার মধ্যে তা নজরই হয় না। ছাপাপাড়ার বন্ধগলির বন্ধতর আলো হাওয়া বাতাস মুড়োনো এক প্রেস ঘরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর নতুন বইয়ের ছাপা দেখতে এসে তীব্র বালব্ মুখে বসে ঝরঝরশ্রী কম্পোজিটর ছেলের দিকে চেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এ এমন জায়গা যেখান থেকে বদল শুরু করতে গেলে হিতে বিপরীত হবার ভয়। আমাদের সমগ্র সমাজের মাঝখানে ছোট্ট গৌণ এই অণুবিন্দুটুকুতে আমাদের অভিভাবকস্থানীয় কারো নজর বা ধারণা নেই ভালো। যিনি জানেন তিনিই জানেন এত বড় সাংস্কৃতিগরবী বাঙালিজাতের এই নেপথ্যজগৎটি এখনো বহুদূর মধ্যযুগে—বহুকালে। বাঙলা ছাপার দুশো বছর যদি হত দুশো বছরের অগ্রগতির ইতিহাস। তবু এতগুলো আপাতগুরুত্বহীন মানুষকে অর্ধাশন থেকে অভুক্তির দিকে ঠেলে দিলেই যে ভাগ্য বদলাতে শুরু করবে এদের, তা নাও হতে পারে। বরং আশপাশের সংস্কারের দুখতাপ একটু একটু সইয়ে সইয়ে যদি বওয়ানো যায় এই কানাকুঠুরির মধ্যে, ভালো।

শোকস্তবক

বাঙালী পাঠকের সুদীর্ঘ দিনের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ও সচিব বনফুল ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন সম্প্রতি। শতাধিক বইয়ের গ্রন্থকার বনফুল রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছিলেন 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের জন্য যদিও প্রবণতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল তাঁর ছোট গল্পের দিকে, সেই ছোট গল্প যথার্থই ছোট—চূর্ণ আখ্যান—শত শব্দের মধ্যেই

এমন একটি তিনি খাড়া করে তুলতে পারতেন রসেবশে পূর্ণায়ত। ছোট গল্পের শাস্ত্রীরা সপ্রশংস উল্লেখ করেন দেখেছি—সমারসেট মম হাজার দেড়েক শব্দেই গড়ে তুলতে পারতেন বটে সুন্দর ছোট গল্প, অথবা ক্রাঙ্ক সার্গেসন—শ' পাঁচেক শব্দই তাঁর যথেষ্ট, বনফুলের লেখা দেখে তাঁরা চমৎকৃত হতেন নিঃসন্দেহে।

একটু অমুখা হয়ে আছে বনফুলের কবিপরিচয় একখানি তাঁর উপন্যাসের মুখ্যমাত্র আপাদমস্তক কবি—'ডানা'. আপাদমস্তক এক কবিকে নিয়ে মঞ্চসফল করা নাটক লিখেছেন তিনি "শ্রীমধুসূদন', পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী মেডিকেল হুতাবাসের বিহারপ্রবাসাগত তরুণ ছাত্রটির প্রথম সলজ্জ সাহিত্যচর্চা কবিতার চর্চা। তবু কত দেরি করে বেরোলো তার কবিতার বই 'অঙ্গারপর্ণী'—বলা যায় সাহিত্যজীবনের উত্তরার্ধে, আর সেও লঘুরসের লেখা। কবিতার পরিহাস ভবেছেন যে কবিতা নিয়ে সেইটিই তাঁর পৃথক অভিধা গড়ে দিয়েছে। সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠায় একবার সবিস্তারে উল্লেখ করেছিলেন: 'কবি বনফুল একবার আমাদের কাছে বড়াই করিয়াছিলেন যে, যে কোনও আধুনিক ধরণের কবিতা (প্রমাণ মাইজ) তিনি দশ মিনিটের মধ্যে রচনা করিয়া দিবেন; না পারিলে তাঁহার নিত্যপ্রয়োজনীয় বহুমূল্য মাইক্রোস্কোপটি বাঁধা রাখিবেন।' আধুনিক কবিতার তথাকথিত বীতরাগীদের মধ্যে থিকে তিনি পড়েছিলেন, হয়তো বা মুক্তির উপায় হিসেবেই কেছ নিয়েছিলেন সরস কবিতা, সেও তাঁর কবিতার একাংশ। পুরোনো আচার জড়ানো অসঘু এই ভাগটুকু যদি বাদও দি, সরস কবিতার আধুনিক কবি বলেও তাঁর একটা মান্য আসন আছে আমাদের কবিতায়। হয়তো বুদ্ধদেব বসু সংকলন থেকে না পেয়ে তার খোঁজ নিতে হবে প্রমথনাথ বিশীর কাব্যসংকলনে।

বনফুলের একটি নিতান্ত হালকা কবিতা বিস্মৃত পত্রান্তরাল থেকে তুলে দিচ্ছি ইচ্ছাকলমের পাঠকদের জন্য, বলা বাহুল্য বিস্মৃত বলেই।

যুগান্তর

কবিতা কি লিখি বন্ধু ক্যালেণ্ডারে যে সাল
ছাড়িতে হইল বুঝি কবিতার hobby
সেকালের নানা রঙে কল্পনা রঙিন
আপনি উঠিত বাজি কবিতার বীণ।
খোঁপায় পলাশফুল, চোখায় আগুন
টকটকে পাছাপাড় করে দিত খুন,
পানে রাঙা ঠোঁট দুটি, আলত'-চরণ
লালে লালায়িত ছিল কবিদের মন।
একালেতে সাদা সব—আসলেই ফাঁকি
প্রেয়সীরা হয়ে গেছে কম red নাকি!

এই সঙ্গে একছত্র থাকুক অন্যাভাগেরও পরিচয়—

হে অগ্নি, লইয়া চল সুপথে আমারে
কর্মফল অভিমুখে মম
তুমি জানো সকলই আমার
দূর কর চিত্ত হতে পাপ তাপ তম
তোমাকেই নমি বারম্বার।

বনফুল ঈশোপনিষদের অনুবাদ করছিলেন, এটি তারই অংশ।

আরেকটি শোক স্মরণ করি, পঁয়ষট্টি বছরে অকালপ্রয়াত কমলকুমার মজুমদার। ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকেই গল্পকবিতার তরুণ চর্চাকারীদের উদ্দীপ্ত বিতর্কআলোচনার বিষয় ছিলেন কমলকুমার। বাজারী কোনো বৃহৎ কাগজ বা প্রকাশনসংস্থার আনুকূল্য না নিয়ে শেষদিন অবধি তাঁর লেখা অব্যাহতভাবে জীবন্ত ছিল গাঢ়মনস্ক রচনাচর্চাকারীর। যত্নকৃত কৃত্রিম বা অনচ্ছ লেখার শৈলিতে তাঁর তীক্ষ্ণ ঈক্ষণ বা কাস্তিমান কল্পনা ঢাকা পড়ে নি, অর্থাৎ পাঠকও যে প্রতিহত হন নি তাতে তার কারণ লেখার অনচ্ছতার পুরোভাগে আছেন জাগ্রত সচেতন লেখক। গত বছরের শরৎসংখ্যা এক্ষণ পত্রিকায় ছাপা গল্পটির সূত্রে সম্পাদক মশায়কে লেখা তাঁর চিঠিটি ছাপা হয়েছে, এই রকম: 'এখন আমার অনুরোধ যদি প্রেসে না দিয়া থাক তাহা হইলে আমাকে ফিরত দাও—আমি উহাকে আর কয়েকবার ঘষামাজা করিয়া গল্প তৈয়ারী করি...'। আরো একটি প্রণিধানযোগ্য ছত্র দেখা যায় চিঠিটিতে, এই: 'লেখা ব্যাপারটিকে আমি গান আঁকার মতই শক্ত ভাবি...' লেখকের স্বভাবটি চেনা যায় এর ভেতর, কেন যে অনুরাগ আবর্তন করেছেন তিনি একই ভাবে, বোঝা যায়।

কমলকুমারের লেখার সংখ্যা বেশি নয়। দু-তিন বছর আগে পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা তাঁর বিভিন্ন রচনার একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী, সেই সঙ্গে শ্রীকমলকুমার মজুমদারের উপর বিভিন্ন আলোচনার তালিকা। তাতে দেখা যায় লেখা আর আলোচনার সংখ্যা প্রায় সমান সমান। লেখার সংখ্যা তারপর কিছু বেড়েছে। আলোচনার সংখ্যা বেড়েছে তার অনেক বেশি। অবধান-আকর্ষণ—নিশ্চয় তারও চেয়ে বেশি। তা বিশেষ করে দেখা গেল মৃত্যুর পর। অল্পদিন প্রকাশিত বইও ফুরিয়ে গেছে, পাওয়া যায় না। দিনে দিনে আরো বাড়বে তাঁর পাঠক. জগচ্চল প্রবাহের পাশে বিচ্যুত গোদিকলকের মতো তাঁর রচনাবলী আরাধিত হবে ভক্ত পাঠকের শ্রদ্ধানির্মাল্যে।

তৃতীয় যাঁর শোক উচ্চারণ করছি তিনি আমাদের বহ্নিবানিতা বিদেশিনী, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, রবীন্দ্রনাথের বিজয়া, 'বিজয়ার করকমলে' কবি উপহার দিয়েছিলেন 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ, বুয়েনোস আইরেসের এই দূরবাসিনীকে আমাদের 'দেশিকোত্তম' বলে বরণ করে নিয়েছেন বিশ্বভারতী ১৯৭৩তে। শ্রীশঙ্খ ঘোষ তাঁর 'মান ইসিজোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' অনুবাদ করেছেন সহস্র তথ্যানুষঙ্গের বিশদ বিবরণে সাজিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই বিজয়া আমাদের আত্মীয়গণমধ্যে গণ্যা, কিন্তু যখন দেখি প্রৌঢ় সন্ধ্যায় প্রাচ্যদেশীয় কবিকে শিরোধার্য করেছিলেন যিনি লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অগ্রকর্মিণী, গর্বিত বোধ হয়। ওকাম্পোর 'সুর' পত্রিকায় বুয়েনোস আইরেসের কসমোপোলিটান চরিত্রে আবিশ্বনব্যভার বায়ু-প্রবাহে স্পন্দিত হয়ে ওঠে, আধুনিক লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতিইতিহাসের এক লেখিকা শ্রীমতী জীন ফ্রাঙ্কো এই বলে লিখেছেন: 'Over the years, Sur has brought together the best of contemporary writing throughout the world, and has set the tone for Argentinian avant-garde.' এর ভেতর আমাদেরও তাহলে কিছু রয়ে গেছে—'রৌদ্রবিভাময় উষ্ণতায় ভরা এক বসন্তে যিনি এসেছিলেন ওকাম্পোর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হয়ে, অবিশ্বাস্য যাঁর সৌন্দর্য, সত্তর চেয়েও যিনি বড় জীবনপ্রেমিক, কেবল প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধি নন, যিনি প্রাচীপ্রতীচীর মধ্যে গড়ে ওঠা এক নবীন সেতু' সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে। সবে বেরিয়েছে ওকাম্পোর একখানি জীবনীগ্রন্থ, পড়তে পেলে আরো সামনাসামনি দেখতে পাব বিজয়ার মুখ। অপেক্ষা করে আছি।

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পশিক্ষার ক্রমবিকাশ

(১৮৫৩-১৮৬৫)

৬·০০

লক্ষীশ্বর সিংহ বুনিয়াদী শিক্ষার মৌলিক ভাবনার অগ্রদূত। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যাবে।

ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন
কিন্তু জাতি ঐক্যবদ্ধ
এই আমাদের গৌরব

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জন্য ভারত বিশ্বে চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে। এ দেশে সব কটি ধর্মের অনুগামী আছেন এবং আমাদের সংবিধানে তাঁদের প্রত্যেকের সম-অধিকার ও ব্যক্তিগত মর্যাদা স্বীকৃত।

ধর্ম হল পবিত্র বিষয়। ধর্ম উপলক্ষ্য করে কারও কোনও অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেওয়া হবে না।

ভদ্র সজ্জন নাগরিকরা বিভ্রান্তি, উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক হিংসার প্ররোচকদের নীরবে দীর্ঘকাল বরদাস্ত করে এসেছেন। আইন শৃঙ্খলা যখনই ভেঙেছে তার মূল্য দিতে হয়েছে আইনমান্যকারী নাগরিকদের। একটি নয় দুটি নয়, অসংখ্য পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বাধা পড়েছে, শ্রমজীবীদের জীবিকা ও ব্যবসায়ীদের আয়ের পথ রুদ্ধ হয়েছে। আমাদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বজনীন সম্পত্তি নষ্ট ভ্রষ্ট করা হয়েছে।

নির্দোষকে ওর পরিণাম ভুগতে হবে কেন?

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের অভিন্ন অধিকারে কাউকে কোনও হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্যচ্যুতি কঠোরভাবে বিচার করা হবে।

আসুন আমরা শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়মূল করতে সচেষ্ট হই

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ক্ষুণ্ণকারী সমাজবিরোধীদের প্রতিরোধ করুন

davp 78 387

খোঁজাখুজি

দিব্য মুখোপাধ্যায়

বাঁশীর সুর শুনে
অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে
এগিয়ে যাই বাদকের সন্ধানে।
যতই এগোই—
সুর ততই পিছিয়ে যায়।
সারারাত
দু চোখ দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে
যখন ক্লান্ত হই
তখন ফিরে আসি ঘরে—
অথচ তখন বাঁশীর সুর
হাওয়ার শব্দে
আমাকে খুঁজতে খুঁজতে
এগিয়ে আসে।

দেখা হলেই :

শংকর ব্রহ্ম

দেখা হলেই তোমার চোখে
এক সমুদ্র কান্না
কিংবা এক আকাশ বিষাদ
অথবা পাহাড় পাহাড় দুঃখ
জমে থাকে

দেখা হলেই
সামনে মাইল মাইল পথ
কিংবা ধু ধু মাঠ
অথবা একটা ধুলোর ঝড়
সব ঢেকে রাখে

হয়তো এর একটাও সত্যি নয়
সব মিথ্যে সব
দেখা হলেই কেবল দেখা হয়
কিংবা হয় না
অদেখাই থাকে

অধ্যাত্ম সাধন-মার্গে ভারতীয় নারী

ডঃ চিন্না মুখোপাধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য গৃহত্যাগ করবার সময় যখন তাঁর পত্নীদের সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হন, তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এ সব নিয়ে কি অমৃত লাভ করা যায়!' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না তা যায় না। তবে এ সব উপকরণ নিয়ে সংসারী লোকের মত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারবে।' এ কথা শুনে মৈত্রেয়ী দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' অর্থাৎ যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা দিয়ে আমি কি করব!

মৈত্রেয়ী-কণ্ঠের এই বাণী তাঁকে ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। মৈত্রেয়ী পার্থিব বিষয় সম্পত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। তিনি এমন কিছু চেয়েছিলেন যা পেলে মানুষের আর কিছু চাওয়ার থাকে না। আকাঙ্ক্ষা অন্তরকে কেবলই এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। 'অমৃতা' হওয়া মানে পার্থিব দেহটাকে চিরকাল বয়ে বেড়ানো নয়। দেহের অমরত্ব মৈত্রেয়ী চান নি। তিনি তাঁর জীবনে যা পরম শ্রেয় তাকে লাভ করে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন তাঁকে যিনি সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি অসীম, অনন্ত, অনির্বচনীয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত সুপণ্ডিত দার্শনিক মিত্রের কন্যা মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে সুললিত, অবিস্মরণীয় প্রার্থনা মন্ত্রে—

অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণ মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হতে আমাকে সৎস্বরূপে নিয়ে যাও, গভীর তমসা থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতস্বরূপে নিয়ে যাও। হে চিরপ্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর, তোমার প্রসন্ন, প্রেমময় মুখ আমাকে দেখতে দাও। আমাকে রক্ষা করো। তোমার প্রসন্ন মুখ যেন আমি চিরকাল দেখতে পাই।

মৈত্রেয়ী মরজীবনের অমরতার আবর্তের মধ্যে নিয়ত ঘূর্ণিত হয়ে থাকতে চান নি। এই মায়াময় সংসার, অনিত্য জগৎ, নশ্বর দেহকে অতিক্রম করে তিনি সাধনার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেছিলেন। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুল। তাঁর অন্তর কি এসব তুচ্ছ বস্তু বিষয়াদিতে বাঁধা পড়তে পারে। তিনি অনায়াসে পার্থিব বিষয় বাসনা আবর্জনার মত দূরে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম্।

মৈত্রেয়ীর কণ্ঠ-নিঃসৃত এই দুটি অমৃতময় বাণী মানবের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অনন্ত ও চিরভাস্বর হয়ে আছে, থাকবে। এর ওজস্বিতা ও গভীরতা এমনই যে মনে হয় না এ কোনো কোমল নারী হৃদয়ের উপলব্ধির বাণী। অধ্যাত্ম চিন্তার জগতে মৈত্রেয়ী এক বরণীয়া ব্রহ্মজ্ঞা নারী।

উপনিষদের আর এক মনস্বিনী নারী আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে অতুলনীয়া হয়ে রয়েছেন তিনি ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

এঁর ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রজ্ঞা অত্যন্ত সুগভীর ছিল। তাঁর

সেই প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় একটি স্মরণীয় আধ্যাত্মিক আলোচনা সভাতে।

রাজর্ষি জনকের সভায় বহু প্রখ্যাত ব্রহ্মবাদীদের সমাবেশে বহু নারীও ছিলেন। এঁদের মধ্যে গার্গী শীর্ষ-স্থানীয়া। বহু জটিল দার্শনিক তত্ত্ব, নানা শাস্ত্রীয় সমস্যাদির আলোচনা ও মীমাংসায় অংশ গ্রহণ করতেন এই সব ব্রহ্মজ্ঞা নারীগণ। একবার জনক ঘোষণা করলেন যে তাঁর সভায় উপস্থিত সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন তাঁকে তিনি সহস্র দুগ্ধবতী গাভী ও স্বর্ণমুদ্রা দান করবেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ঘোষণার কথা শোনামাত্র তাঁর শিষ্যদের গাভীগুলি নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করলেন। উপস্থিত সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি মনে করেন আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ?' ঋষি উত্তরে বললেন যে তা তিনি মনে করেন না তবে তাঁর গাভীর বিশেষ প্রয়োজন বলে গাভীগুলি তিনি নিয়ে যেতে চান। এর পর যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার জন্য সকল ঋষিদের আহ্বান জানালেন। উপস্থিত পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞরা কেউ কেউ দুয়েকটি প্রশ্ন মাত্র করে নিবৃত্ত হলেন। অধিকাংশ ব্রহ্মজ্ঞরা যাজ্ঞবল্ক্যের মত মহান ব্রহ্মবাদীর সম্মুখীন হবার স্পর্ধা করলেন না। সকল পুরুষ ঋষিদের নিবৃত্ত হতে দেখে ব্রহ্ম-বাদিনী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন। কিছুতেই নিবৃত্ত হলেন না। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে এই বলে নিরস্ত করলেন—গার্গী এই প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন। এর পর আর কোনো প্রশ্ন বা তর্ক তোলা যায় না।

এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সভার ঘটনা থেকে বেশ স্পষ্ট হয় যে গার্গী ব্রহ্মতত্ত্বে সকল মহান প্রজ্ঞাশীল ঋষি অপেক্ষা বেশী প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে যাজ্ঞবল্ক্যের মত সর্বোত্তম ব্রহ্মজ্ঞর সঙ্গে ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্ন করতে এতটুকু দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন নি।

উপনিষদ যুগের এই দুই দার্শনিক নারীর পূর্বে বৈদিক যুগে অধ্যাত্ম জ্ঞানে সম নারী বিদুষী ছিলেন না। বেদের বিভিন্ন মন্ত্র এই সব প্রজ্ঞাশীলা নারীরা রচনা করেন। এঁদের মধ্যে দেবজামি প্রভৃতি ইন্দ্র ঋষির মাতৃগণ, অভূত ঋষিকন্যা বাক্ এবং বিশ্ববারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। দেবজামি প্রভৃতি ইন্দ্রমাতৃগণ একযোগে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৫টি ঋক্ প্রণয়ন করেন। বাক্ রচনা করেন দেবীসূক্ত নামে পরিচিত আটটি মন্ত্র। বিশ্ববারা ছয়টি ঋক্ রচনা করেন। এই মন্ত্রগুলি অদ্বৈতবাদের বীজস্বরূপ। এঁরা ছাড়া রোমশা (১.১২৬), লোপামুদ্রা (১.১৭৯), অপালা (৮.৯১.৭), যমী (১০,১০), বসুক্রজায়া (১০.২৮-২৮), ঘোষা (১০.৩৯), সূর্যা (১০.৮৫), উর্বশী (১০,৯৫), ইন্দ্রাণী (১০.১৪৫) বিবস্বৎ-কন্যা যমী (১০.১৫৪), শার্পরাজ্ঞী (১০.১৮৯); এঁরা পার্শ্বে উল্লিখিত সূক্তের মন্ত্রগুলি রচনা করেন। এঁরা ছাড়া ঋগ্বেদে ও অন্যান্য বেদে আরও নারী-ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। অগস্ত্য ভগিনী অদিতি, উপনিষৎ, নিষৎ, গোধা, শ্রদ্ধা, দক্ষিণা, সাবিত্রী প্রভৃতি এঁদের মধ্যে অন্যতমা। উপ-নিষদের যুগের আরও মনস্বিনী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে বৃহদারণ্যকের গন্ধর্বগৃহীতা ও কেন উপনিষদের উমা ও হৈমবতী অসাধারণ অধ্যাত্ম জ্ঞানশীলা নারী ছিলেন। এঁদের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রজ্ঞা কোনো পুরুষ ঋষির চেয়ে কম ছিল না।

বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগের অধ্যাত্ম-জ্ঞানী নারীদের বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবাহুতি। ইনি দুর্জয় জ্ঞান স্পৃহার জন্য দরিদ্র সুমহান এক ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন। ইনি পতির সমুদয় জ্ঞান ভাণ্ডার আয়ত্ত করেন। সাঙ্খ্য-দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল এঁর পুত্র। বস্তুত মাতা দেবাহুতির শিক্ষাই তাঁকে সাঙ্খ্য-দর্শন প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে। পুরাণে বর্ণিত আর এক মনস্বিনী নারী মদালসা। এই বিদুষী নারীর জ্ঞান প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর তিন পুত্র রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

রামায়ণে বর্ণিত তপস্বিনী স্বয়ংপ্রভা সাধনার ক্ষেত্রে বিশিষ্টা।

মহাভারতে বর্ণিত তাপসী, বেদজ্ঞা ও ধর্মজ্ঞা সকল নারীর কথা সবিস্তারে উল্লেখ করতে গেলে প্রবন্ধ বৃহৎ কলেবর

ধারণ করবে তাই দুই-একজন প্রজ্ঞাশালিনী ও অধ্যাত্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় নারীর উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথমে, শান্তিপর্বের ৩২০ অধ্যায়ের সুলভা নাম্নী তাপসিনীর বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। এই রমণীর শাস্ত্রজ্ঞান, যোগসূত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার, মোক্ষ বিষয়ক সুচিন্তিত আলোচনা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মননশীল। এই মহাযোগিনী মিথিলার জনক রাজার বংশসম্ভূত সন্ন্যাসধর্মতত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ নরপতি ধর্মধ্বজের সঙ্গে যোগতত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর বিচার এবং আলোচনা তথা তর্কযুদ্ধে বেদ-যোগ ও মোক্ষ শাস্ত্র বিষয়ে সুপণ্ডিত জনক রাজ ধর্মধ্বজ সুলভার নিকট পরাজয় বরণ করেন। সুলভা ধর্মধ্বজকে বলেন, আপনি মোক্ষধর্মে সুনিপুণ শ্রবণ করে ধর্ম জিজ্ঞাসার্থ আপনার নিকট সমাগত হয়েছিলাম। এক্ষণে অপক্ষপাত চিত্তে বলছি, যে-ব্যক্তি বিতণ্ডাপরায়ণ হয়, সে কখনই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় না। আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন হয়, তারই মুক্তিলাভ ঘটে।

এই জ্ঞানী সন্ন্যাসিনী অধ্যাত্মজ্ঞান সম্পদে এতই সমৃদ্ধ ছিলেন যে অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ধর্মধ্বজের মত বেদজ্ঞ রাজর্ষিকে বলতে পেরেছিলেন—আপনি কখনই বেদ-শাস্ত্র শ্রবণ করেন নি, আর যদিও শ্রবণ করে থাকেন, তাহাতে আপনার কোনো ফলোদয় হয় নি অথবা আপনি বেদ মনে করে তার তুল্য অন্য কোনো শাস্ত্র শ্রবণ করে থাকবেন। ফলতঃ আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নেই। আপনি কেবল লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন রয়েছেন। আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির মত স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা রুদ্ধ হয়েছেন।

সুলভার এই সমস্ত অভিযোগ শুনে ধর্মধ্বজ কোনো প্রত্যুত্তর করতে পারেন নি। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করে ছিলেন।

রাজা ধর্মধ্বজ মহান ব্রহ্মবিদ ও রাজর্ষি হয়েও সুলভার পাদ-শৌচ করে স্বাগত জানান। এমন একটা ঘটনা সমগ্র মানবের ইতিহাসে সম্ভবতঃ বিরল। সুলভার মত এমন তেজস্বিনী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টান্ত বড় সুলভ নয়। সুলভার মুখ থেকেই জানা যায় তাঁর সমান উপযুক্ত পাত্র সে যুগেও দুর্লভ হয়েছিল বলে তাঁর পিতা তাঁকে প্রব্রজ্যা নেবার নির্দেশ দেন।

সুলভা ছিলেন উচ্চবংশ সম্ভূতা। তাঁর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বংশগতভাবে অনেকটা সহজ ছিল। কিন্তু মহাভারতের এক সামান্য বারাঙ্গনাও যে ভূমানন্দের আস্বাদ লাভ করেছিলেন তা শান্তিপর্বের পিঙ্গলা নাম্নী বারবনিতার উপাখ্যান পাঠ করলে সুস্পষ্ট হয়। পিঙ্গলা তাঁর বাঞ্ছিত প্রিয়তম কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। হওয়ার পর তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। তাঁর মনে হল—যে সর্বান্তর্যামী নির্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করছিলেন আমি এতকাল কামাদি দ্বারা তাঁকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছি। একদিনও হৃদয়নন্দনকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নি। আজ আমি জ্ঞানবলে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করেছি।

পিঙ্গলা প্রেমের বেদনার মধ্যে দিয়ে সেই একেশ্বর পরমাত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে পরম প্রশান্তি ও মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহাভারতের আর এক মহীয়সী ও অধ্যাত্মজ্ঞানে নিবেদিতপ্রাণ নারী বিদুলা। তিনি বহু বেদ অধ্যয়ন করে তপস্বিনী হয়েছিলেন। তাঁর মত তেজস্বিনী ও আদর্শ মাতা সমগ্র মহাভারতে বিরল। আপন পুত্র সঞ্জয়ের বীর্যের অভাব দেখে তাঁর বজ্র ও তেজোদীপ্ত কণ্ঠে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল তা চিরদিন মানব হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগাবে।

"মাত্মানমবমন্যস্ত মৈনমল্পেন বীভরঃ।
মনঃ কৃত্বা সুকল্যাণং মা ত্বৈতৎ প্রতি সংহর।

(উদ্যোগ ১৩৩.৭)

'পুত্রে; ক্ষণিক জীবনের ক্ষুদ্র সুখের মোহে সন্তুষ্ট থেকে নিজের মহান্ আত্মাকে অপমান করো না। ভয় ছেড়ে সুমহৎ কল্যাণের জন্য মনকে মুক্ত করো।'

মহাভারতে অন্যান্য বহু অধ্যাত্ম চিন্তাশীলা তপস্বিনীর কথা পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনুশাসন পর্বে বর্ণিত শম, দম ও শান্ত গুণাবলম্বী স্থবিরা গৌতমী ও সর্বতত্ত্বজ্ঞা শাণ্ডিলীর নাম উল্লেখ্য। মহাভারতের প্রসিদ্ধ রমণী গান্ধারী, কুন্তি ও

দ্রৌপদীও বেদ পাঠ করেছিলেন। এঁরা তিনজনই ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে প্রজ্ঞাবতী ছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈন যুগের ইতিহাসে বহু নারী তপস্বিনীর বিস্তৃত পরিচয় থেরিগাথায় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে বৌদ্ধ যুগে গৌতমী; বিশাখা; মিত্তা; ভদ্দা; ধীরা; উপশমা প্রভৃতি বহু শাক্য নারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এছাড়া সংঘমিত্তা, হেমা, অগ্গিমিত্তা, অঞ্জলি প্রভৃতি নারীরা গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। এঁরা ছাড়া অনাথপিণ্ডদ দুহিতা সুপ্রিয়া সাধনার ক্ষেত্রে বিশিষ্টা রমণী ছিলেন।

জৈন ভিক্ষুণীদের মধ্যে ব্রাহ্মী ও সুন্দরী নাম্নী ভগিনীদ্বয়, চেতক-দুহিতা চন্দনার নাম উল্লেখ্য। ব্রহ্মচারিণী চন্দনা ছিলেন মহাবীরের শিষ্যা ও ছত্রিশ হাজার ভিক্ষুণীর মধ্যে মুখ্য ভিক্ষুণী।

মধ্যযুগের সাধক সন্তদের মধ্যেও বহু সাধিকা নারী ছিলেন। এঁদের মধ্যে ক্ষেমা, পদ্মাবতী, দাদুর কন্যা নানীবাঈ ও মাতাবাঈ গভীর সাধনার দ্বারা প্রখ্যাতা হয়েছেন। মীরাবাঈ-এর নাম তো আধ্যাত্মিক জগতে চির-ভাস্বর হয়ে আছে।

অধ্যাত্মজ্ঞান-সম্পদে প্রজ্ঞাশালিনী ভারতী (উভয়ভারতী) নামে নারী এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারিণী। ইনি সুপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের পত্নী। ইনি তীক্ষ্ণ ও অসাধারণ ধীশক্তির দ্বারা মাত্র ষোড়শবর্ষ বয়সের মধ্যেই বেদ বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য-অলঙ্কার শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

এই প্রজ্ঞাবতী নারীর পতি মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে অদ্বৈত-বাদের স্রষ্টা দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্যের যে বিতর্ক যুদ্ধ হয় তাতে মধ্যস্থতা করেন উভয়ভারতী। ইনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে শঙ্করাচার্যকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। তবে স্বামীর পরাজয় স্বীকার করবার পূর্বে ইনি শঙ্করাচার্যের মত মহান দার্শনিক ও ব্রহ্মজ্ঞ সুপণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করবার জন্য আহ্বান করেন। তেজস্বিনী ধীশক্তিসম্পন্না এই নারী শঙ্করাচার্যকে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রশ্নোত্তর চলে। অবশেষে শঙ্করাচার্য উভয়ভারতীর প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হলেন; উভয়ভারতী আচার্যকে কামশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি প্রশ্ন করেন। শঙ্করাচার্য কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলেন—'আমি ব্রহ্মচারী। এ প্রশ্নের উত্তর দেব কি প্রকারে!' অতঃপর আচার্য উভয়ভারতীর নিকট একটি প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন যে যদি তাঁকে কিছু-কাল সময় দেওয়া হয় তবে তিনি কামশাস্ত্র বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। এর পরের ইতিহাস এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে উভয়-ভারতী পতিসহ শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসধর্ম নিয়েছিলেন।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেশ কিছু রমণী তাঁদের জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনাকে ব্রত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে যোধপুরের তপস্বিনী অজনখণী, মহারাষ্ট্রে সখুবাঈ, মহীশূরে শান্তিবাঈ, মধ্যপ্রদেশে মায়াবাঈ এবং দিল্লীর সূফী সাধিকা বাউরী সাহেবা এবং আমাদের এই বাংলায় শ্রীশ্রীসারদাময়ী দেবীর নাম উল্লেখ্য। কাশীর এক সামান্যা নারী আধ্যাত্ম সাধনার সুউচ্চ মার্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এঁর অধ্যাত্ম চিন্তা ও সাধনা বিখ্যাত সাধু-সন্তদের নিকটও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। ইনি মাহেশ্বরী দেবী নামে পরিচিতা ছিলেন। ইনি এবং কাশীর বরুণাসঙ্গমের মাতাজী বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও জীবিত ছিলেন এবং এঁদের উভয়ের সাধন-কর্ম সকল মহান সাধকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

বাংলার আর এক গৃহস্থ সাধারণ রমণী সাধনার ক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এই বিধবা বালিকা শ্বশুর লয়ে ক্রমাগত ধিক্কৃতা ও অবহেলিতা হয়ে দিন রাত আকুল হয়ে পরমেশ্বরকে আহ্বান করতেন। একদিন গঙ্গা-স্নান করতে গিয়ে তিনি এক অপার্থিব ও অলৌকিক অনুভূতি অন্তরে উপলব্ধি করলেন। সেইদিন থেকে তিনি সবিস্ময়ে অনুভব করলেন তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়ে গেছে। এই 'ক্ষুধা'ই ছিল শ্বশুরালয়ে তাঁর লাঞ্ছনার মূল কারণ। সেই-দিন থেকে তিনি খাদ্যগ্রহণ পরিত্যাগ করলেন এবং সেই বালিকা বয়সে মন-প্রাণ পরমেশ্বরের পদতলে নিবেদিত করলেন। শোনা যায় দীর্ঘ বারো বছর তিনি কিছুমাত্র খাদ্য গ্রহণ করেন নি।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর মহান ভূমিকার আলোচনা করলে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই বাণীটির স্মরণ হয়—'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি।' তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ। একই আত্মা বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন রূপ নেয় মাত্র—স্ত্রী ও পুরুষে কোনো ভেদ নেই। বাহ্য দেহের ভেদে আত্মার ভেদ হতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সেই পরমাত্মা বিরাজ করছেন—

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেব চ চৈবায়ং ন পুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে।"

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

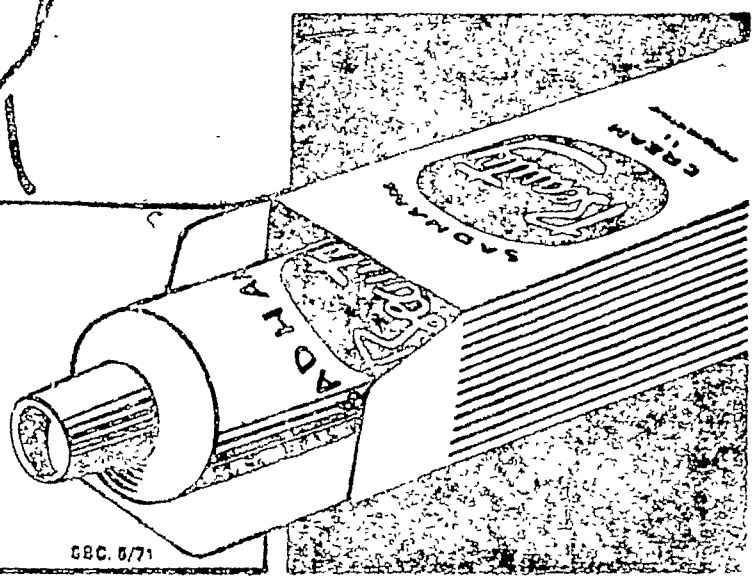

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

GBC. 6/71

জয়শ্রী । বর্ষসূচী

বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৫

লেখক	বিষয়	
অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সূর্যের জীবন-প্রগতি (প্রবন্ধ)	
অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র (মূল্যায়ন)	
অনিলচন্দ্র ঘোষ	শহীদ অনিল দাস (শহীদ স্মরণ)	
অন্নদামোহন বাগচী	বাহার একটি পরুর নাম (ছোটগল্প)	
অভয়শঙ্কর শর্মা	'হেজিমনি'র তোলপাড় (বিশ্বরাজনীতি)	
অমলেন্দু বসু	ইতিহাসের সাধক : আচার্য রমেশচন্দ্র (মূল্যায়ন), শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে (আলোচনা)	৪৭
অমিয়কুমার দাশগুপ্ত	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার : যেমন তাঁকে দেখেছি (স্মৃতিচারণ)	
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	কাছের মানুষ রমেশচন্দ্র মজুমদার (স্মৃতিচারণ)	
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	সার্থক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (আলোচনা)	
অমূল্যভূষণ সেন	আচার্যদেব (আলোচনা)	
অসিত ঘোষ	ঢাকা শহরে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড : দিনদুপুরে লশস্ত্র অভিযান (পুরানো কাহিনী)	
আশুতোষ ভট্টাচার্য	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার (স্মৃতিচারণ)	
আর্যদেব	লোক্যাল ট্রেনের ছায়ায় (কাহিনী)	
কালীপ্রসন্ন পিপলাই	স্মৃতিচারণ	
কালীকিঙ্কর দত্ত	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার (স্মৃতিচারণ)	
কালীচরণ ঘোষ	ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার (স্মৃতিচারণ)	
কালীপদ রায়	সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রার্থনা)	
কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়	আচ্ছন্ন (কবিতা)	
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	শিকড়ের দিকে (কবিতা)	
কৃষ্ণ ধর	বন্ধুরা শোনো : ডেভিড ডিয়ন (সেনেগাল) । অনুবাদ কবিতা	
গোপাললাল সান্যাল	যে কথার শেষ নেই (ধারাবাহিক স্মৃতিকথা)	১৬৭, ১২৭ ২৯৫; ৪৪৭ ৫৭৯, ৬১৫ ৬৮৯
গৌতম হাজরা	অন্তরূপ (কবিতা)	
চন্দ্রশেখর রায়	নায়কের মুখ (ছোট গল্প)	

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
চারণিক	আঁখিমোর ঘুম না জানে	৩৪৫
	না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথ	৫৫৭
জগদীশ নারায়ণ সরকার	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার আমি তাঁকে যেভাবে জেনেছি	৯১
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	চাঁপা আগুনের ধোঁয়া (কবিতা)	৪৩০
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	'অন্তবিহীন অজানাকে'	৩৩৯
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	স্বাধীন ভারতের শিক্ষায় ভাষা-সমস্যা (আলোচনা)	৩৭০
দিবা মুখোপাধ্যায়	খোঁজাখুঁজি (কবিতা)	৭০৭
দীনেশচন্দ্র সরকার	নমঃ শ্রীরমেশচন্দ্রায়	৫১
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ইচ্ছাকলম	১৮৩, ২৩২, ৪৩১, ৪৭৫, ৫২১, ৭০২
	সারারাত ঘুমের আগুনে (কবিতা)	৪২৭
ধীরেশ ভট্টাচার্য	জাতীয় পর্যায়ে মজুরী আয় ও মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা (প্রবন্ধ)	১৯৩
	কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক (প্রবন্ধ)	৬৯৪
ননীকুমার চক্রবর্তী	তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ (স্মৃতিচারণ)	৪৪
নিমাইসাধন বসু	রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস-চিন্তা	৯৩
নির্মাল্যভূষণ দাশগুপ্ত	সাধারণ ব্যবহারোপযোগী শক্তির সহজলভ্য বিকল্প উৎস	২৮২
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ	এশিয়ার রত্নমালা : ইব্‌ন্ সৌদ (১৮৮০-১৯৫৬)	১৫৯
	আবদুল গাফফর খান	২০৫
	চিরঞ্জীব মুজিব	২৫৬, ৩০৭
	সূর্য সেন	৩৮৩
	মার্কস কথা	২৬৯
	গ্রীস/তুর্কী (স্বদেশের পথে চিঠি)	৪৫৬
	বাঙালী বিপ্লবের গতি ও পরিণতি (বিপ্লব কথা)	৫১৫
	২৩শে	৬০০
পবিত্রকুমার ঘোষ	বাংলায় সুভাষচর্চা (সেমিনার)	৫৭১, ৬৩৩
পদ্মিমল চক্রবর্তী	গঙ্গা-বাণী (কবিতা)	৪২৮
পুলকেশ দে সরকার	অনিলচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা	৬১৮
প্রবীর সরকার	দুঃখ পেলে (কবিতা)	৪২৮
প্রণব চট্টোপাধ্যায়	এক অজ্ঞাতনামা ব্রিটিশ সৈনিকের কাহিনী	৬৭৫
বাসুদেব দেব	ঘর (কবিতা)	৪২৬
	লাল সেরা (কবিতা)	৪৮৯

লেখক	বিষয়	পৃ
বিজনকুমার ঘোষ	কাছে দূরে (গল্প)	৪০
বিজয়কুমার দত্ত	স্মৃতিচিহ্ন (কবিতা)	৪২৬
বিনয় রায়	হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি (অতীত-স্মরণ)	৬৬৯
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (স্মরণ)	১৪৩
বিমলেন্দু মিত্র	আইনস্টাইন ও মহাবিশ্ব (শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য)	৩৭৫
বীরেন্দ্রকুমার সাহা	কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন (গ্রাম-সমীক্ষা)	২৬৪
ভূদেব চৌধুরী	উচ্চশিক্ষায় ভাষা পাঠের ভাবনা (আলোচনা)	৩৬৬
মনোরমা সিংহ রায়	স্বদেশ (কবিতা)	৫০৮
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	ডিনামাইট (কবিতা)	৪২৭
মন্মথ রায়	অর্ঘ্য	২৮
মাধবচন্দ্র নাথ	আচার্যদেব ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার	১০৪
মানসী মুখোপাধ্যায়	গাড়োয়ালী লোকগীতে সমাজচিত্রের একদিক (আলোচনা)	৫২৬
যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রদ্ধেয় আচার্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার	৭৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাসন্তিকা (কবিতা)	১
	চিঠি/আচার্য রমেশচন্দ্রকে	২
রথীন্দ্রনাথ রায়	যাওয়া (কবিতা)	৪২৯
রমেন্দ্রনাথ দেব	মনীষী রজনীকান্ত গুপ্ত (গ্রন্থ-পরিচয়)	৬৭৮
রঞ্জন বর্মা	আমেরিকায় সুভাষবাদ (সেমিনার)	৫৯৭
রাখাল দত্ত	১৯৭৯-৮০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট (আলোচনা)	৬৬৫
রাজীব চক্রবর্তী	নেতাজীকে প্রণাম (কবিতা)	৫৯৩
	৮২-তম জন্মদিনে (কবিতা)	৫৯৩
	সেদিন আসবে কবে (কবিতা)	৫৯৩
রুচিরা মুখোপাধ্যায়	কবন্ধের মুখ (গল্প)	৪০৩
	অধ্যাত্ম সাধন-মার্গে ভারতীয় নারী (প্রবন্ধ)	৭০৮
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	শ্রদ্ধাঞ্জলি	৫৪
লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কেরাণী দেখবি—ঐ তাখ	১৭৩
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চিঠি/আচার্য রমেশচন্দ্রকে	২
শান্তি বসু	ঢাকা শহরে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড :	
	দিনহুপুরে সশস্ত্র অভিযান (পুরানো কাহিনী)	২২১
শান্তশীল দাশ	কেন বলি (কবিতা)	৪২৫
শিবদাস চক্রবর্তী	জীবনকে নিয়ে যারা (কবিতা)	৪২৫
শেখর বসু	দুঃখ-সুখ (কবিতা), দেখা হলে (কবিতা)	২৬৮ ৭০৭

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	যদিও লক্ষ মানুষ (কবিতা)	৪২৬
	কবিতা : স্পষ্ট, অস্পষ্ট ইত্যাদি (প্রবন্ধ)	৬৯৮
শংকর দে	মন্দিরা (কবিতা)	৪২৯
শ্যামলকুমার দাশ	ছেলেটা (কবিতা)	৪২৯
সমর গুহ	সত্যার্থী ঐতিহাসিক	১০১
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়	কাছে এবং দূরে (কবিতা)	২১৮
সন্তোষ চক্রবর্তী	আশ্চর্য মাতাল (কবিতা)	৪৩০
সামসুল হক	পুরাতনী : হৃদয় হৃদয় (কবিতা)	৪২৬
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	ভগবদ্গীতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ (অপ্রকাশিত রচনা)	১৫১
সুখময় মুখোপাধ্যায়	আমার দৃষ্টিতে আচার্য রমেশচন্দ্র	৬৮
সুলতা গুহ চৌধুরী	দিদিকে যেমন দেখেছি (স্মৃতিচারণ)	২১৩
সুকুমার রায়	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার	৫৮
সুকোমল বসু	আমার দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু-সাহিত্য (আলোচনা)	৪০৭
সুনীল দাস	ইতিহাস-দার্শনিক আচার্য রমেশচন্দ্র : জয়শ্রীর নিবেদন	১২৫
	বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	১৪০, ২৮৪, ৩২৯
সুমনা দাস	মহাযাত্রিক (কবিতা)	৪২৮
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	তস্মৈ নমঃ	৭৬
সুশীল মুখার্জী, সুকুমার দত্ত	ঢাকা শহরে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড :	
	দিনহুপুরে সশস্ত্র অভিযান (পুরানো কাহিনী)	২২১
সুধাংশু দাল	শকুন্তলা (কবিতা)	৫০৫
হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	গুরু প্রণাম	২৬
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	নিষ্কম্প অগ্নিশিখা (স্মৃতিচারণ)	৪৬৩
হিরাংশুভূষণ সরকার	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ইতিহাস-চর্চা	৬২
ক্ষণেশ্বর ঘোষাল	আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী ও স্বাধীনতা (আলোচনা)	৫৬৩, ৬৩৯
ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী	ভারত অন্বেষণে আরব মনীষী (অপ্রকাশিত রচনা)	৩৫১
সম্পাদকীয়	ঘটনার গতি কোন্ দিকে. ঝড়ের শেষ কোথায়,	১৩৫, ১৮৯,
	বাইশে শ্রাবণ, এ কেমন স্বাধীনতা, প্রবীণ নেতা	২৩৯, ২৪০,
	নিশীথনাথ কুণ্ডুর লোকান্তর, পট পরিবর্তন,	২৪৪, ২৮৭
	শারদীয়া, হাওয়া বদল, বস্ত্রাঞ্চল,	৩৩৫, ৪৩৯, ৪৮৫,
	রাজনীতির চেউ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া,	৪৯০, ৫৬১,
	ঝড়-তুফান, হিসাব-নিকাশ,	৬০৫, ৬৭
	১৯৭৯-৮০র রেল ও পশ্চিমবঙ্গ বাজেট, ঘটনা ও রটনা	৬৫২,

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবিধ	বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের অষ্টম স্মৃতি-বার্ষিকী	২১৭
	ভাষা-বর্জন : নোঙরহীন নৌকা (সমীক্ষা),	২১৮
	শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষানীতি (আলোচনা),	৪৫৭
	বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলারায়ের ৭৮-তম জন্মবার্ষিকী,	৪৭৯
	জননেতা নিশীথনাথ কুণ্ডুর ৮৬-তম জন্মদিবস	৪৭৯
	বিপ্লবী নেপাল নাগের লোকান্তর	৪৮০
	সরকারী নথিপত্রে গোপন দলিল	৫৯৫
	অনিল রায় স্মৃতি বক্তৃতামালা	৬০৩
	স্মৃতিতর্পণ	১৮৭, ৬০৪
	মরিচঝাঁপির অন্তরালে (মানবিক অনধিকার), স্মৃতিতর্পণ	৬৮১, ৬৭৯, ৬৮৭
পুস্তক পরিচয়	Netaji Dead or Alive ? Samar Guha	২৭২
	ব্যক্তি বনাম ব্যক্তিত্ব : গান্ধীজী ও নেতাজী— ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৭৪
	জীবন-স্মৃতির ভূমিকা : ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	২৭৭
	গণতন্ত্র মুখোস ও মুখশ্রী : কাশীকান্ত মৈত্র	২৭৯
	মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড) জগদীশ মণ্ডল	৪৮৪
A. Berridale Keith	Letter to Acharya Ramesh Chandra	১২
B. C. Mukherjee	Dr. R. C. Majumdar : The Historian	৩৮
Bisweswar Prasad	Acharya Ramesh Chandra Majumdar— A Humble Tribute	১১৮
E. W. Hopkins	Letter to Acharya Ramesh Chandra	১২
H. V. Kamath	The Freedom Movement within the Indian National Congress	৫৪৩
J. W. Thomas	Letter to Acharya Ramesh Chandra	১৩
L. D. Barnett	Letter to Acharya Ramesh Chandra	১১
P. N. Chopra	Dr. R. C. Majumdar : My Reminiscences	১১৩
Prabhudayal Himatsinka	Sweet Memories	৫৯১
S. B. Chaudhury	On Dr. R. C. Majumdar : The Historian of India	১০৭
Samarendra Kundu	Netaji in Burma	৫৮৭
Vincent A. Smith	Letter to Acharya Ramesh Chandra	১১
V, V. Mirashi	Nonagenerian Acharya : A Tribute	১১২
Biographical Notes on Dr. R. C. Majumdar & Bibliography		১২৮

চিত্রসূচী

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯২৬	বৈশাখ ১৩৮৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ	বৈশাখ ১৩৮৫

২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী প্রকাশনের বই

সুভাষ-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-১৯২৮
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ডে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলেছিল জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী' তার জবাব। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের জন্য ১২০ টাকা।

H. V. KAMATH
THE LAST DAYS OF JAWAHARLAL NEHRU : Rs. 15/-

NANDA MOOKERJEE
NETAJI THROUGH GERMAN LENS : Rs. 20/-
VIVEKANANDAS INFLUENCE ON SUBHAS : Rs. 6/-
NETAJI SPEAKS : VOL. I Rs. 4/-

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায়। দাম : ৪·৫০

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ : অনিল রায়। দাম : ৬.০০

ধর্ম ও বিজ্ঞান : অনিল রায়। দাম : ২.০০

সুভাষচন্দ্র : পবিত্রকুমার ঘোষ ১-৩ খণ্ড দাম : ৩৪·৫০

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও ৬১টি বৃক্ষের পরিচয় : লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

পুবদেশি উপকথা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পুব এশিয়ার নানা দেশের দু ডজন গল্প, গণেশ পাইনের আঁকা ছবি ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। দাম : ৯.০০

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম : ৯.০০

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন : ড. নরেশচন্দ্র ঘোষ। দাম : ২০.০০

রামমোহন : সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দাম : ৬.০০

১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯
২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

...শাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

...তা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)	২০·০০
...তা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১২·০০
...কেট গীতা	৭·০০
...ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০
...d Bhagavad Gita (in English) (Jagadish Ch. Ghosh)	
...পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ)	২·৫০
পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)	২·৫০
...ষ্ঠ্য গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক)	১·৫০
...া (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কৃত শ্লোক)	১·০০
...প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০
...ী	১·৫০
...তী (পকেট সংস্করণ)	৫·০০
...র ধর্মশিক্ষা	১·৫০
...ত্মার বাণী	৭·৫০
...India Speaks ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজী)	৭·৫০

...গীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান ...দীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর গীতা ভারতী ...া সম্পদ।

...কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের ...ারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ ...ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন ...ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের ...ার জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর ...ন্দিরে।"

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

...কৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম"—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে ...র্ষ আলোচনা। শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ।

...মা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

...সাগর	৩·০০
...টদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ)	৩·০০

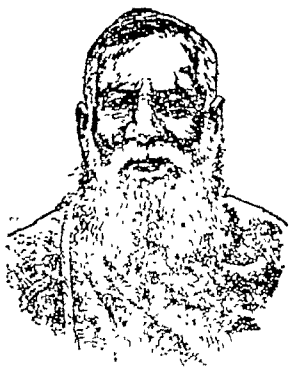

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র—জীবনী ও আবিষ্কার	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০
জীবন গড়া	২·০০

কয়েকটি অভিমত—বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।—প্রবাসী

ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।—ভারতবর্ষ

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে।—আত্মশক্তি

গ্রন্থটি (বাংলার ঋষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।

—অল ইণ্ডিয়া রেডিও

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।—আনন্দবাজার।

ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৫·০০

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।—আকাশবাণী

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-৭৩

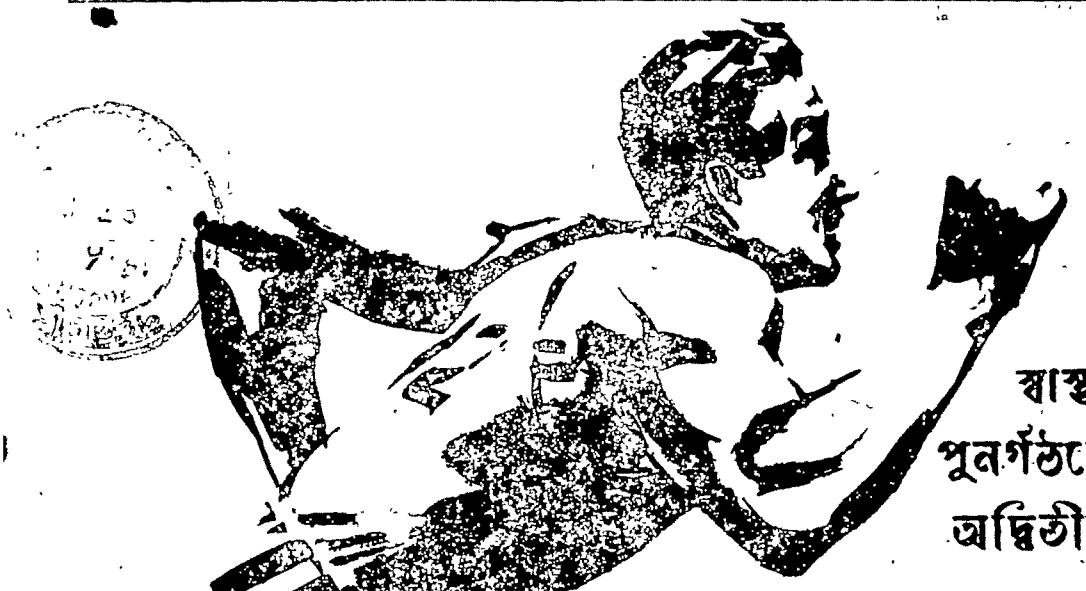

স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

বহু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পুরণ হয়, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) ও আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-2

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Re. 1·00 with Regd. Post: Rs. 3·20 : 20-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116